অঙ্গনা থেকে মহিলা : গল্পে

শ্রী শ্যামলী গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা আন্দোলনের একজন নেত্রীস্থানীয়া ব্যক্তি। তিনি তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার মাঝখানে এমন একটি গল্পসংকলনের পরিকল্পনা করেছেন যার অভিনবত্ব বিস্ময়কর। ছোটগল্পের নানা সংকলন বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেরিয়েছে — সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি রীতিমত সাধুবাদের যোগ্য। শ্যামলী গুপ্তর সংকলনটি সে জায়গায় অনন্য। বাংলার তেরশ সাল থেকে চৌদ্দশ সাল পর্যন্ত এই একশতাব্দীর প্রতিটি বছরের একটি করে গল্প নিয়ে এই একশ গল্পের সংকলন—প্রতিটি গল্পের রচয়িতাই মহিলা। এই পরিকল্পনাটিই অভিনন্দনীয়। হয়তো যে আন্দোলনের সঙ্গে শ্যামলী যুক্ত তারই নৈতিক দায়িত্ব পরোক্ষে তাঁকে চালিত করেছে এই সংকলন কর্মের দিকে। তিনি যে কর্মসূত্রে আবদ্ধ তার আকর্ষণ এমনই যে তাঁর পক্ষে অন্য কোনো সংকলন করার কথা ভাবা সম্ভব হলেও—এই সংকলনটি তারই করার কথা—তিনি তা করেছেন।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই নবজাত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে ধীরে ধীরে সামাজিক সমগ্রতার বিষয়টি প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হতে থাকে। বাড়ির মেয়েদের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে চিন্তা ভাবনার ঢেউ — একাজ করতে গিয়ে বা করবার জন্য বাংলা লেখ্য গদ্যরীতি তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। রামমোহন বিদ্যাসাগরের কর্ম-মর্ম-সহযোগিতা নিঃসন্দেহে সমাজের অর্ধাংশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে বলেই এমনটা হয়েছে, হয়তো এটাই সব কথা নয়। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে পুরুষ প্রধান সমাজে বুদ্ধিবাদী পুরুষ অধিনায়কেরা নারীদের ভূমিকা নির্ধারণে তৎপর হয়েছেন। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী যে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড শুরু করলেন তা সংখ্যাগত ভাবে না হলেও গুণগত ভাবে একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছে। পরোক্ষে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি ব্যঙ্গ রচনায়—দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন নামে 'লোকরহস্য'-এর অন্তর্গত লেখায় স্ত্রী স্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা বলছেন—'সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন?' লেখাটি অবশ্য ব্যঙ্গাত্মক আতিশয্যে একটু বেশি বেঁকে গেছে, তথাপি 'স্বত্ব' বা অধিকারের প্রশ্ন যে নারী সমাজে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে, 'স্বত্ব' শব্দটি তার প্রমাণ। পুরুষ লেখকের সৃষ্ট চরিত্রে বাস্তবের নারীর কণ্ঠস্বর বুঝি খানিকটা ধরা পড়েছে। 'লোকরহস্য' থেকে আরেকটি রচনার উল্লেখ এখানে অনিবার্য—'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর'। এই নাটকল্প রচনার 'Dramatis Personce' দুজন উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীবাবু ও তস্যভার্যা। এই রচনার তাৎপর্য এখানে যে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর বঙ্কিমচন্দ্র কথিত রুচি বিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র তাঁর বাংলাশিক্ষিত স্ত্রী। বাঙ্গালীবাবু সেকালের ছকে ফেলা ইংরাজিজানা বাঙ্গালী-বাবু। বঙ্গললনাটি চতুর্দিগ্‌বর্তী এ হেন রুচিবিকারের মাঝখানে আপন স্বাধীন ও স্বোপার্জিত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন। এ সচেতনতার মূল সেই মহিলার নিজমাতৃ ভাষা সম্বন্ধে সুদৃঢ়

অনুরাগ। স্বামীর অভিমত বাংলা বই পড়লে demoralize হয়। ভার্যা তার জবাবে বললেন— 'স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয় তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনারের পর যে ভাষায় কথাবার্তা কন শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের কোন ভয় নাই—আর আমি গরিবের মেয়ে একখানি বাঙ্গালা বই পড়িলে গোল্লায় যাব'। এ কথা আমরা পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার মুখ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলম থেকেই আমরা পেয়েছিলাম ইন্দিরাকে। ইন্দিরা তার নিজের জবানিতে যা বলবার সব বলেছে। তার চোখে ধরা পড়েছে কমিসারিয়েটের কেরানিবাবুর তির্যক চরিত্রের ছবি। চরিত্রগুলি বঙ্কিমের কল্পনাসঞ্জাত বটে, কিন্তু বাস্তবে বঙ্কিমচন্দ্র এমন চরিত্র নিশ্চয় দেখেছেন যাদের আত্মসচেতনতা কেবল উপন্যাসের বিষয় নয়, সংসারের প্রত্যক্ষ বিষয়ও বটে। মহিলাদের মন্থর কিন্তু ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতা যে আর কেবলমাত্র ইংরাজিশিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের কল্পনার সামগ্রী নয়, তা যে বাস্তব ঘটনা, তার প্রমাণ রয়েছে মহিলাদের লেখা বিভিন্ন আত্মজীবনীতে। কেউ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির দিক থেকে অগ্রসর না হলে আত্মকথা লেখায় মনোযোগী হয় না। ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'নবপ্রবন্ধ' সম্পাদক সমীপে শ্রীকুমুদিনী দেবী নাম্নী এক রাঢ়ী কুলীনের কন্যা এক পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি মুদ্রিত হয়। দশবৎসর বয়সে সেই কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। বালিকার এক কাকা ইংরাজিশিক্ষিত এবং কলিকাতা প্রবাসী। তিনি এ বিবাহে বাধা দিলেন। বালিকার বিবাহ হল না—লেখাপড়া শেখা মধ্যপথে ব্যাহত হল। কুড়ি বছর বয়সের সেই মেয়েটির জন্য এক অষ্টআশি বছরের বৃদ্ধের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তিনিই পাত্রীটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন—কারণ পাত্রী 'অগ্নিদগ্ধা'—অর্থাৎ কন্যার ভাই নেই। পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে ক্লান্ত হতাশ্বাস সেই মহিলা সম্পাদক মহাশয়কে লিখছেন বৃদ্ধবিবাহের পর তিনি নবপরিনীত তরুবরের সহগমন করবেন, মৃত্যুকালে তিনি বিধাতার নিকট এই বর চেয়ে নেবেন যে বঙ্গদেশে যেন মেয়ে হয়ে আর জন্মগ্রহণ না করেন। এই চিঠিখানি প্রত্যক্ষে যেমন সমাজ সমালোচনা, পরোক্ষে তেমনই নারীর আর্থসামাজিক অসহায়তার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতও বটে। এই নাতিদীর্ঘ পত্র এক হিসাবে কুমুদিনী দেবীর আত্মকথা। অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাতে জাগ্রত ও জ্বলন্ত চেতনা ব্যতীত এমন আত্মকথা এভাবে সংহত হয়ে উঠতে পারে না।

একথা বলা হয় সর্বপ্রথমে, এমন কি দাসপ্রথারও আগে, মেয়েদেরই শিকল পরানোর ব্যবস্থা কায়েম হয়। বোধ হয় সে শিকল ভাঙবে ও সব থেকে শেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণতা এলে। নারীর সামাজিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থান অবিচ্ছেদ্য—শুধু নারীর কেন সকলের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। এবং যখন মুক্তির প্রশ্নটা ওঠে তখন অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তথা স্বাধীনতাই পরিগণনীয় প্রথম প্রধান সর্ত। আমাদের আধুনিকতার ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে যে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধিতা এসেছে—সতীদাহ প্রসঙ্গে, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে,

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে, সহবাস-সম্মতি প্রসঙ্গে, সমস্ত বাধাগুলির পিছনে যেমন রয়েছে, এবং সেগুলির মূলে যেমন রয়েছে ঔপনিবেশিকতা জর্জর সংস্কৃতির আত্মরক্ষার অমূল উপায় অনুধাবনের সঙ্কট, তেমনি তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে আর্থ-সামাজিক প্রশ্ন। বিদেশেও দেখা যায় প্রত্যেক নারীকে অধিকার লড়ে উপায় করতে হয়েছে—হাতে তুলে কেউ দেয়নি। তা সে ভোটাধিকারই হোক, পুনর্বিবাহের অধিকারই হোক, অথবা সম্পত্তির অধিকারই হোক। কিন্তু মনে হয় একটা বড়ো দরের আন্দোলন বড়ো মাপে হওয়া উচিত ছিল—মায়ের পরিচয়েও সন্তানের পরিচয়ের অধিকার অর্জনের আন্দোলন। বুর্জোয়া সমাজে নারীর সৌখিন যত অধিকারের গিল্টির গয়নার ফাঁকি তাহলে ধরা পড়ে যেত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুরুষ প্রাধান্য জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে রয়েছে তার ভিত্তিভূমি ধ্বসিয়ে দেবার জন্য এই আন্দোলন দরকার। নৈতিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে পৃথিবী ব্যাপী এই আন্দোলনের সফলতায়।

তথাপি ন্যূনতম সর্ত যে আর্থিক স্বনির্ভরতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, যে নিজের বিয়ের বিলিব্যবস্থা নিজেই করতে পারে, উদ্যোগ নিজেই নিতে পারে তার প্রধান কারণ তার আর্থিক স্বনির্ভরতা। প্রফুল্ল যে তার শ্বশুরবাড়িকে দাবিয়ে দিল, অথবা সাগরকে জিতিয়ে দিল, তার কারণ প্রফুল্লর সাতঘড়া মোহর ছিল। রজনী বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো প্রেম এবং কৃতজ্ঞতার তফাৎ করেছে নিজের সম্পত্তির মালিক হবার পরে। ইন্দিরা পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করার অনুবর্তী অভিজ্ঞতায় জগৎ জীবনকে প্রকৃত প্রেক্ষিতে বুঝতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের এলা স্বাধীনতার মূল সমস্যার মুখোমুখি হবার আগে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। প্রশ্নটা এখানে বটেই। বঙ্কিমবাবুর ইন্দিরা চারপাশের কেরানি বাবুদের পাতিবুর্জোয়া মনোভাবকে ট্রেজারি গার্ড বলে উপহাস করেছে। অর্থনৈতিক সচেতনতা ছাড়া এমন কথা বলা যায় না। টাকা আর অকৃত্রিম আবেগ যে একাসনে বসেনা, দ্বিতীয় ব্যাপারটি যে প্রথমটি থেকে অনেক খাঁটি এ কথাও সে বলেছে।

আমার বলার কথাটি তাহলে বোধ হয় একটু স্পষ্ট করা গেল যে, মহিলারা—তা সে গল্পে উপন্যাসে চরিত্রবাস্তবতার লজিক ধরেই হোক, অথবা বাস্তবে কলম ধরেই হোক—নিজেরা যখনই কথা বলতে চেয়েছেন তখনই তা চিহ্নিত হয়েছে তাঁদের পারিবারিক সামাজিক অবস্থানগত সচেতনতার দ্বারা। শ্যামলী গুপ্তের সংকলনটি এ কারণে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। একশ বছর বড় কম সময় নয়। বিশেষ করে গত একশ বছর পৃথিবীর ইতিহাসে নানা ঢেউ উঠেছে পড়েছে। প্রায় দশকে দশকে তার ভারতবর্ষীয় জীবনে সেই ঢেউয়ের দাগ পড়েছে। অনেক কিছু ভেঙেছে। চূর্ণ হয়েছে প্রাক্ বিংশের সংস্কার, বিশ্বাস। অন্তত সমাজের একাংশে—এবং সে অংশ ক্রমবর্ধমান—চরিতার্থতা এবং সার্থকতার সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ পাল্টে গেছে। জীবন যেমন ছিল জীবন আর তেমন নয়। সুতরাং শতাব্দীর প্রতিনিধি হিসাবে যে কোনো সংকলনে শতাব্দীব্যাপী স্তরান্বিত টেনশনের বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যাবে। তার মধ্যে আলোচ্য সংকলনটি একটা কথা আলাদা করে জানাচ্ছে—

সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিভিন্ন অভিঘাতে কী ভেবেছিলেন বাঙ্গালী মহিলারা, কী ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, কোন্ ভাষায় তাঁরা তাঁদের সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, কী তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে।

এই গ্রন্থ যেহেতু একটি গল্প সংকলন, সে কারণে সংকলয়িতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। একই সঙ্গে দুদিকে— গল্পগুলিতে প্রতিফলিত সমাজবোধ এবং গল্পগুলির শিল্পরূপের দিকে। শ্যামলী গুপ্ত সে ব্যাপারে অবহিত থেকেছেন। সে অবধানতার ফল সর্বত্র সমান মাত্রা পেতে পারে না। কখনো সমাজপ্রগতির সূত্র সংকলয়িতাকে বেশি আকর্ষণ করেছে—কখনোবা গল্পের শিল্পরূপকে অধিক মর্যাদা দিতে হয়েছে। তবে সুখের বিষয়, একটা ন্যূনতম মাত্রা সংকলয়িতা রক্ষা করেছেন। একেবারে গল্প হয়নি, সমাজ চেতনার দিকে তাকিয়েও এমন লেখাকে সংকলয়িতা সংকলনে স্থান দেন নি। আবার গল্পের জন্যই বলা হয়েছে যে গল্প, যাতে সমাজপট হারিয়ে গেছে, তাও এই গ্রন্থে ঠাঁই পায়নি। অর্থাৎ জীবন ও শিল্প এই দুই দিকে সংকলয়িতার দৃষ্টি বিভাজিত হয়নি— সে দুটিকে তিনি যথাসম্ভব একীভূত রাখার চেষ্টা করেছেন। এবং এই সঙ্গে তিনি আরো একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। মহিলাদের লেখা এমন গল্পও তিনি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন যে-গল্প কোনো মহিলা না লিখে কোনো মহোদয়ও লিখতে পারতেন। এমন মহিলা লেখকের সংখ্যা খুব যে কম তা নয়, যাঁদের হাত থেকে আমরা দুই ভাগের গল্প পেয়েছি—দুই ভাগের গল্পেই তাঁরা সমান কৃতিত্বের প্রমাণ রেখেছেন। বাঙালী মহিলালেখকদের (আমি লেখক লেখিকা মিলিয়েও বলতে পারি কথাটা) মধ্যে সবচেয়ে ধারালো অসিকল্প লেখনী মহাশ্বেতার। 'স্তন্যদায়িনী' অথবা 'ধৌলী' তাঁর সে গল্প মঘাই ডোমের গল্প সে জাতীয় গল্প নয়। আমাদের আলোচ্য এই সংকলনের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, এক্ষেত্রে সংকলয়িতার পক্ষপাত প্রথমোক্ত প্রকারের গল্পের দিকে ঝুঁকেছে। সমস্ত সংকলনকে প্রেক্ষাপটে রাখলে আমরা তাঁর নির্বাচন সূত্রকে যথাযথ ও সঙ্গতিযুক্ত বলে মনে করি। স্বভাবতই এই নির্বাচন-সূত্র অনুসরণ করার ফলে এই সংকলন আরেকটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েছে—তা হল প্রায় সব গল্পেই, অন্তত প্রথম পঁচাত্তরটি গল্পের কথকতায় বা ন্যারেশনে একটি মহিলা সম্ভব সহজাত ছাঁদ প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি, এক আধটি গল্পকে আমার সন্দেহ হয়েছে। সত্যবানী গুপ্তার লেখা 'পিঞ্জরের বাহিরে' (১৩২১) একটি বিস্ময়কর গল্প। প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে এই গল্প লেখা হয়েছে যার বিষয় বস্তু ট্রামে বাসে সদ্য বহির্গত নারীর অভিজ্ঞতা। আজকের অল্পবয়সী মহিলাদের অভিজ্ঞতার পাশে রেখে পড়া যায় সে কাহিনী। বান্ধবীকে লেখা বান্ধবীর চিঠির ফর্মে গল্পটি রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার দূরাগত ছায়া গল্পটিকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু 'সত্যবাণী গুপ্তা' নামটি কেমন যেন ঠিকমতো বাজছে না। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় নারীসমাজে চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে এগচ্ছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে লেখা সরোজকুমারী দেবীর 'খান তিনেক চিঠি' গল্পে মেয়েদের চাকরির প্রসঙ্গ উঠেছে। নিষ্ক্রিয় সহযোগীর ভূমিকায় তাঁরা যে আর থাকতে চাইছেন না তার ইঙ্গিত

পাওয়া যাচ্ছে। অস্পষ্ট ভাবনায় তা সঞ্চারিত হচ্ছে। আগে বলেছি দশকে দশকে ইতিহাস যে দূরত্ব জ্ঞাপক পাথর গুলি বসিয়ে বসিয়ে চলেছে গল্প গুলিতে তার ছায়া পড়বেই। স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং বিদেশী বয়কটের প্রসঙ্গ উঠেছে এমন গল্প যেমন আছে—সুশীলা সেনের লেখা 'আত্মোৎসর্গ', তেমনি মহাত্মাগান্ধীর আদর্শ গ্রহণ করার কথা উঠেছে ঊর্মিলা দেবীর লেখা 'কল্যানী' গল্পে। আবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনে লেখা গল্প শান্তি দেবীর 'কিউ'-তে সময়ের দর্পণকে ব্যবহার করা হয়েছে শৈল্পিক তাৎপর্যে। একটা ব্যাপার লক্ষনীয়, প্রায় গল্পে নারীজীবনের সমস্যাকে অর্থনৈতিক স্তরে রেখে দেখার চেষ্টা হয়েছে। সমস্যার প্রকার ভেদ আছে, তা না হলে গল্প হবে কী করে। কিন্তু আর্থ সামাজিক প্যার্টাণকে ধরার চেষ্টা বেশি। অমিয়া চৌধুরীর 'অনাদৃতা', সীতা দেবীর 'পূজার তত্ত্ব', সুরুচি বালা রায়ের 'কল্লোল'-এর গল্প, বিষয় বস্তুতে যতই বৈচিত্র্য সঞ্চারী হোক, নারীর অর্থনৈতিক অসহায়তার দিকটিকে সম্মুখে এগিয়ে দিতে কেউ ভুল করেন নি। পণ প্রথা, তত্ত্ব তল্লাস, বিধবা বিবাহ, অসম বিবাহ, বিপত্নীকের বালিকা বিবাহ-প্রাক স্বাধীনতা পর্বের অধিকাংশ গল্পে এই সব সমস্যা বারেবারে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এমন গল্পও আছে যেখানে পুরুষ জীবনের দুঃকষ্টের কথা মহিলারা বলেছেন, যেমন হাসিরাশি দেবীর 'মরুতৃষ্ণা'—কিন্তু সে দেখাও নারীর চোখে দেখা। স্বাধীনতা পরবর্তী কালের নারী জীবনের গল্পে দেখা যায় নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন, তার বিবাহিত জীবনে অপসন্ধির প্রশ্ন নানা আকারে প্রাধান্য বিস্তার করছে। অসহায়তার প্রশ্নটি থেকে গেছে বটে, কিন্তু লড়াইয়ের প্রশ্ন এবার জোরদার হয়েছে।

একশ বছরের এই গল্পসংকলনে সংকলয়িতার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অবশ্য করণীয়। এমন গল্পের দেখা এই সংকলনে প্রায় নেই, যে গল্পের মূল বিষয় নারীর দুঃখের আত্যন্তিক অশ্রুবাহী বর্ণনা। একেবারের নেই, এমনটা বলা যাবে না, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। সংকলয়িতার একশ বছরের গল্পবিন্যাসে নারীর জন্য সহানুভূতি ভিক্ষার গল্প একেবারেই নেই। গল্পগুলির সেই জোরের কথাও আমরা ভুলতে পাবি না। সমগ্র সংকলনটি শেষ করার পর আমাদের সামনে গত শতাব্দীর নারী জীবনের তিনটি অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে মুখ্য হয়েছে নারীর পারিবারিক জীবনে অবস্থানগত সমস্যা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে সম্পর্কগত জটিলতার মাঝখানে নারীর ভূমিকা সঙ্কট। উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে লেখা হেমলতা বসুর 'সাবধানী' গল্প; তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় ধীরে প্রতিবাদের প্রয়াস প্রতিষ্ঠার সংকল্পে পরিণত হচ্ছে। এই গল্পের ক্রমসজ্জায় অভিব্যক্ত হয়েছে বাঙ্গালী নারীর গত একশ বছরের ইতিহাস। সমস্ত সংকলনটি শেষ পর্যন্ত—সংকলয়িতার ইচ্ছাক্রমে নয়, ইতিহাসের নির্দেশক্রমে একটি অমোঘ সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে তুলে দেয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিকার থেকে, মধ্যযুগীয় জট থেকে, বুর্জোয়া মানসের বিলাসী ব্যভিচার থেকে মুক্তি পেতে নারীকে এগিয়ে আসতে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের দিকে। সেটিও এই সংকলনে আরো একটি বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করেছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলন প্রসঙ্গে

গল্প-সংকলনের কাজটি শুরু করেছিলাম নিতান্তই খেয়ালের বশে। শতবর্ষের গল্পসংকলন আরো আছে। সে দিক থেকে আমার সংকলন অভিনব নয়। কিন্তু আমার চিন্তাটা ছিল ১৩০১ সাল থেকে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রতি বর্ষের একজন লেখিকার একটি করে গল্প সংগ্রহ করে উপহার দেব এই শতকের এবং আগামী প্রজন্মের পাঠিকাদের। বিগত শতাব্দী ধরে বঙ্গদেশের লেখিকাকুল যা সৃষ্টি করে গেছেন, তার বেশির ভাগই থেকে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের যে প্রয়াস ঘটে তাঁর ছোঁয়ায় বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের ললনারা অনেকেই সৃষ্টিধর্মী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েন। সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও সেই সময়ে যাঁরা সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকসম্প্রদায় আন্তরিকভাবে তাঁদের কাছে সেইজন্য কৃতজ্ঞ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বঙ্গমহিলাদের সাহিত্যকীর্তি লক্ষণীয়। অগ্রণী লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন কবি কৃষ্ণকামিনী দাসী, বামাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী প্রমুখ।

আমার গল্পসংকলনের প্রারম্ভসীমা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই শতকের প্রথমার্ধেই মহিলাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হতে শুরু করে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকেরা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর ফলে অন্দরমহলে শিক্ষার সোনার কাঠির পরশে নিদ্রাভঙ্গ হয় অনেক অভিশপ্ত কন্যার। লোকাচার-দেশাচারের বেড়া অতিক্রম করে সাহিত্যসাধনায় যুক্ত হতে সময় লেগেছে কিছু। কিন্তু বাঁধ যখন ভেঙেছে তখন অনেক মহিলাই এগিয়ে এসেছেন নিজেকে শুধু প্রকাশ করতেই নয়, আপন বিকাশের তাগিদেও। প্রচলিত সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। সতীদাহ, কুলীন প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের বিষয়গুলি নিয়ে বামাকুলের মননশীল অনেক লেখনী কালের দাবীকে ছাপিয়ে কালোত্তীর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের সামগ্রিক টানাপোড়েনে নারীরা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেননি। ঘোমটার আড়ালে অদৃশ্য থেকে তাঁরা কেবল পারিবারিক কর্তব্যই পালন করেননি—নিষেধের বেড়াজাল ও ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অনুভূতির স্পর্শে যুক্তিবুদ্ধির আলোয় পুষ্ট করেছেন সাহিত্যকর্মকে। অবশ্য সৃজনশীলতায়, মননশীলতায় কিম্বা শিল্পচেতনায় সব রচনাই যে মানোত্তীর্ণ তা বলা যায় না। তবে নিজেকে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশের আকুলতায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে-পদচারণা শুরু হয়েছিল— ছোটোগল্পসৃষ্টি সেগুলির অন্যতম মহল। দুঃখের বিষয়, সেই স্বীকৃতি কিন্তু বেশির ভাগ লেখিকারই মেলেনি। কালের অতলে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই।

মহিলাদের লেখা বা রচনা এখনও শ্রমসাপেক্ষ গবেষণালব্ধ আলোকপাতের প্রতীক্ষায়। আমি গবেষক নই, বাংলা সাহিত্য-জগতে আগন্তুক মাত্র—এ আমার অনধিকার প্রবেশও মনে হতে পারে। আমার বিশ্বাস যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন, যাঁরা এই সাধনায় রত, তাঁরাই পারবেন সামগ্রিক ও অনুপুঙ্খ উদ্যোগ নিতে। সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা বাণী রায়, প্রতিষ্ঠিত

গবেষক আরতি গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই মহিলা-লেখিকাদের নিয়ে দুটি সংকলন করেছেন— 'লেখিকা মন'এবং 'নারী মনের আলোয়'।

নারী আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে এই কাজ করার প্রশ্নে একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করেছি। মনে হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে উপনীত হয়ে আজকের নারীদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পর্যালোচনা করতে গিয়ে একটু অতীতকে দেখা প্রয়োজন—দেখাই যাক্ না কী ভাবছিলেন শতবর্ষ আগে আমাদের বঙ্গদেশের নারী সমাজ। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক গবেষণাগ্রন্থাদির থেকেও অনেক সময় সমকালীন সাহিত্য নির্মোহ ও নিঁখুতভাবে উপস্থিত করতে পারে সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সংকট, বিশ্লেষণ করতে পারে সামাজিক পরিমণ্ডলকে বাস্তবোচিত নিষ্ঠায়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সব থেকে বড়ো ঐতিহাসিক দলিল দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ'। এঙ্গেলস বলেছিলেন, ফ্রান্সের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক বই পড়েও ফ্রান্সকে সে ভাবে নয়, যতটা গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বালজাকের উপন্যাস গুলির মাধ্যমে।

উপন্যাস ও নাটকের মতোই ছোটগল্পেও প্রতিফলিত হয় সামাজিক পারিবারিক সম্পর্ক, নারীপুরুষের সম্পর্ক, সামগ্রিকভাবে সমাজে নারীর অবস্থান। সংগৃহীত গল্পগুলির বেশিরভাগের মধ্যেই তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে শাণিত বাস্তবচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে। ধনীদরিদ্র, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তর মানসিকতা, গ্রাম-শহর উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত অংশের মানুষের জীবনযাত্রা এক-একটি গল্পে এক-এক রকমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। যে-বিশেষ বিষয়ে আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছি, তা হলো নারীর অধিকারের প্রশ্ন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর অবমূল্যায়ন ও তার বিরুদ্ধে স্বাধিকার সন্ধান ও প্রতিষ্ঠার আর্তি বেশ কয়েকটি গল্পে নারী চরিত্রগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নারীর অধিকারের দাবিতে সংগঠিত কোনো আন্দোলন তখন ছিলনা, কিন্তু ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগ থেকেই নারীরা নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছেন। সামাজিক-পারিবারিক অবিচার, অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে কতিপয় গল্পে।

একশত গল্প সংকলনের ভাবনার পাশাপাশি একশত লেখিকাকেও পাঠকসমাজের দরবারে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা থেকেই প্রতিবর্ষের একটিমাত্র গল্পের একজন লেখিকারই গল্প নির্বাচিত তালিকায় স্থান পেয়েছে। গল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, প্রথম পঞ্চাশটি গল্প আগে প্রকাশের চিন্তা থেকে ১৩০১ - ১৩৫০ সালের কালসীমার অন্তর্ভুক্তি নির্বাচন করেছি। নির্বাচন সবটাই সুচারু বা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, এ দাবি আমি করছি না। কারণ একাজটি করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় তিন বছর। এই সময়টাও আমার কাছে মনে হয়েছে অপ্রতুল। প্রথম পঞ্চাশটি গল্প সংগ্রহ করতে আমি প্রায় ১৫০টি সাময়িক পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। সব পত্রিকাতে গল্প পাইনি—আবার পেলেও তা নানা কারণেই নির্বিচারে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রথম কুড়ি বছরের গল্প সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যা সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত যেটি ভালো, সেটিই সংকলিত হলো। ফাঁক থেকে গেছে অনেকটাই। দু'-একটি ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে ভালো গল্প হলেও স্থান দিতে পারিনি। সেই লেখিকারই

অন্যকোনো গল্প অন্য কোনো বর্ষবাবদ যুক্ত হয়েছে। একই বর্ষে হয়তো বেশ কয়েকটি একই ধরনের গল্প পেয়েছি। সেগুলির মধ্যে একটিকেই মাত্র সংকলনে জায়গা দিতে পেরেছি। প্রথম দিকে গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে পছন্দের দাবি মানাও সম্ভব হয়নি। কারণ, হয়তো একটি বর্ষে একটিই মাত্র গল্প সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেক্ষেত্রে মান বিচারের সুযোগ আমার ছিলনা। এই সীমাবদ্ধতাও মনে রাখা ভালো।

গল্পগুলি বাছাই করতে গিয়ে আমি প্রায় হাজার খানেক গল্প পড়েছি। অধিকাংশ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় নারীর পারিবারিক-সামাজিক অবস্থান। সমাজ ও জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তৎকালীন সমাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমাজ সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক লেখিকাই ছিলেন সচেতন। আবার হিন্দু যৌথ পরিবারকে ঘিরে যে গল্পগুলি, তাতে পরিলক্ষিত হয়েছে কি ভাবে হিন্দু পরিবারের পরিশুদ্ধ আদর্শকে মূলধন করেই, এর স্থবিরতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন এক একজন লেখিকা। এর অভ্যান্তরেই ঘটেছে তার আত্মবিকাশ। এই সময়ের অনেক গল্পতেই সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা গেছে পুরাতন যুগের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কার, ও রীতি নীতির সঙ্গে সংঘাত বাঁধছে নতুন চিন্তা ও ধারণার। কিন্তু নতুনের উদ্ভব তখন সম্পূর্ণতা লাভ করেনি তাই অনেক দোলাচলের মধ্যে নবীনকে বরণ করার সৎ প্রয়াস নিয়ে বেশ কয়েকজন লেখিকা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন। পঞ্চাশটি গল্পে মাত্র দুইজন মুশ্লিম লেখিকার গল্প সংযোজিত হয়েছে। আবার দুজন হিন্দু লেখিকা মুশ্লিমচরিত্র নিয়ে গল্প লিখেছেন। যে গল্পগুলি সংকলনে জায়গা পেয়েছে অথবা যেগুলিকে জায়গা করে দিতে পারিনি সেগুলির অধিকাংশের মধ্যেই উনিশ-বিশ পার্থক্য। একই লেখিকার কয়েকটি ভালোগল্পের মধ্যে যেমন একটিকেই বেছে নিতে হয়েছে। তেমনি আবার প্রয়োজন মতো অপেক্ষাকৃত কম ভালোগল্পও সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। ক্রমবর্ষপঞ্জি অনুযায়ী একজন লেখিকার একটির বেশী গল্প অন্তর্ভুক্ত না করার পরিকল্পনা অনুসারে। এক্ষেত্রে অনবধানতার বশত কোন ত্রুটি হলে পরবর্তী কালে তা অবশ্যই সংশোধন করে নেব।

অধিকাংশ গল্পই সামাজিক, পারিবারিক নির্দিষ্ট একটি চৌহদ্দির মধ্যে রচিত হলেও ব্যতিক্রমও আছে। জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম, মানবতাবোধ, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে কিছু গল্পে। সামাজের উপরতলার মানুষের সঙ্গে নীচের তলার মানুষের সম্পর্ক, ক্ষুধা, বুভুক্ষা, দারিদ্র্য, মানবিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তার যেমন প্রতিফলন আছে তেমনি সংসার ও পরিবারের জীবনের ক্ষুদ্রতর বন্ধন কাটিয়ে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে কোনো-কোনো চরিত্রের পদচারণা গল্পগুলিকে বৈচিত্র্য দান করেছে। এরই পাশাপাশি নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ-ব্যথা বেদনার অনুভবে গল্পগুলি কমবেশি শিঞ্চিত হয়েছে। প্রেমপ্রীতি, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, সংসারজীবনের প্রতি-দিনের আনন্দ, বা গ্লানির ছোঁয়ায় মূর্ত হয়ে উঠেছে এক-একটি চরিত্র। গ্রামীণ মহিলাদের জীবনকাহিনী যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি অর্থনৈতিক সমস্যাক্লিষ্ট বিত্তহীন ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের টুকরো টুকরো চিত্রও ফুটে উঠেছে। কয়েকটি গল্প খুবই মর্মস্পর্শী ও সংবেদনশীলতায় বহতা নদীর মতো আজও মনকে নাড়া দেয়।

এই সমস্ত গল্পভাণ্ডারে অজস্র মণিমুক্তা লুকানো আছে—খুঁজে বার করা সময়সাধ্য,

ব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রমসাধ্যও বটে। এ গুলি সংগ্রহ করার জরুরী তাগিদ অনুভব করছি এই কারণেই যে, পুরাতন মাসিক পত্রিকা বা সাময়িক পত্রিকা অনেকগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে যা প্রায় ধ্বংসের মুখে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এর মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ না করলে অনেক সৃষ্টিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পুরাতন সাহিত্যকীর্তি গুলি সংরক্ষণের তাগিদ সাহিত্যপ্রেমীরা নিশ্চয়ই অনুভব করবেন। এই রত্নখনি যাচাই করার উপযুক্ত জহুরী আমি নই, আমার বাস ভিন্ন গ্রহে, তাই আমার এই প্রয়াস ছন্দপতনও ঘটাতে পারে। এই বলয়ের সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগ থাকলেও যে তাগিদ নিয়ে কাজটি করতে ব্রতী হয়েছি, তাহলো বিগত শতকের নারীদের জীবনের ক্রমবিবর্তন সহ সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্ম প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাঙময় হয়ে-ওঠার তাৎপর্যপূর্ণ যে-সংগ্রাম, গল্পগুলির মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করা। বিগত শতকের এই পট-পরিবর্তন নারীদের প্রগতির পথকে কতটা প্রশস্ত করেছে, পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা, তারও একটা মূল্যায়ন আমার কাঙ্ক্ষিত ছিল। নারী জীবনের যে-বিচিত্র সমস্যাবলী নানা তুলিতে চিত্রিত হয়েছে তার অন্তর্লীন বক্তব্য কতটা প্রাসঙ্গিক বা প্রবহমান, সেটিও একই সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

পুরুষপ্রধান সমাজে নারীদের নির্যাতিত ও শৃঙ্খলিত জীবনের প্রতিও সচেতন দৃষ্টিপাত করেছেন লেখিকারা। কোনো-কোনোগল্পে নায়িকা প্রচলিত সমাজবিধির কাছে করুণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, আবার কোথাও-বা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে শৃঙ্খলিত জীবনের চেয়ে পথের অনিশ্চয়তাকে শ্রেয়তর মনে করেছেন। যদিও তেজস্বী প্রতিবাদী চরিত্র গল্পগুলিতে স্থান পেয়েছে স্বল্পই—তবু সময়ের মাপকাঠিতে তারই মূল্য অপরিসীম। বিগত শতকের বাংলার লেখিকা সমাজ কলম ধরেছেন অন্তঃপুরের তমসের আড়ালে বোবাকান্নার যে-ইতিহাস আছে তাকে আলোয় আনার জন্য। তাঁরা চেয়েছেন দুর্দশাগ্রস্ত, অবদমিত, অবহেলিত নারীসমাজকে এক সম্ভাবনাময় নতুন জীবনের সন্ধান দিতে। গোড়ার দিকের দশকগুলিতে এ-প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে সার্থক না হলেও চল্লিশের দশক থেকে পরিবর্তন এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে। বাঙালির দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন লেখিকাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। অবশ্য ক্রমশ তাঁদের ভাষায়, প্রকাশভঙ্গিতে, উপস্থাপনায়, আঙ্গীকে অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে প্রকরণে নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এসেছে পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সমস্যাও। ভাষার ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে লক্ষণীয় সাধুভাষা রূপান্তরিত হয়েছে চলতি ভাষায়। গল্পগুলির আকর্ষণই শুধু এর ফলে বাড়েনি, ভাষাভঙ্গিমা ও রূপরীতিও অনেক সহজতর হয়েছে। ফলত, গল্পগুলিতে বিচিত্র মানসিকতার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে— সেগুলি তেমনই পরিশ্রুত হয়েছে বিভিন্ন রসধারায়।

গল্পসংগ্রহের মধ্যে লেখিকাদের চোখ দিয়ে নারী মনের যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে সামাজিক প্রথার প্রতি আনুগত্য ও প্রতিবাদ দুটিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় যে-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার পরিচয় মেলে এই গ্রন্থের শেষতম গল্পটিতে। সমসাময়িক সমস্যাকে মূল উপজীব্য করেছেন যেমন কেউ-কেউ, আবার তাকে সযত্নে এড়িয়েও গেছেন অনেকে। লেখিকাদের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা-

উন্মেষের বিচিত্র স্তরভেদে সমাজের গতি প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও জ্বালা তাঁদের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও স্বচ্ছন্দে তাঁরা বিচরণ করছেন—সমাজের শাণিত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই।

ছোটোগল্পের ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত মহিলা কথাশিল্পীর সংখ্যা কম নয়। তাঁদের মধ্যে থেকে একশোজন লেখিকা বাছাই করে এক এক খণ্ডে পঞ্চাশ জনের গল্প মোট একশোটি গল্প সাজিয়ে দেওয়া বহুলাংশে দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসিক কাজও বটে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে কালানুক্রমিক ধারা বজায় রেখে গল্প সংকলনের জন্য সব লেখিকা ও সব ছোটোগল্পের প্রসঙ্গে সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনের দাবির দায় থেকে এই সংকলনটি মুক্ত। যে-লেখিকাদের গল্প সংকলনে যুক্ত করতে পেরেছি, তার বাইরে অনেক লেখিকাই থেকে গেছেন। অনিচ্ছাকৃত হলেও ত্রুটি, তাই এর জন্যও পাঠকসমাজের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে পুরুষ লেখকদের মতোই নারী লেখিকারা একই ভাবে গল্প পরিবেশন করেছেন। সমকালীন পুরুষ-লেখকদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, লেখিকাদের সব গল্পগুলিই হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু বেশ কিছু গল্প একই পঙক্তিতে স্থান করে নিতে পারে। অবশ্য গল্প রচয়িতা হিসাবে নারী-পুরুষের বিভাজন যথেষ্ট রুচি ও [illegible] সম্মত নয়। যেহেতু নারী-লেখিকারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টির জগতে ব্রাত্য ছিলেন, তাই সময় এসেছে তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়নের। বাংলা ছোটোগল্প নিয়ে আগামীদিনে যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, যে কিছুসংখ্যক লেখিকা বাংলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন কিন্তু থেকে গেছেন উপেক্ষিতা বা অনাদৃতা, তাঁদের যেন নিয়ে আসা হয় পাদ-প্রদীপের আলোয়। নারী-লেখিকা হিসাবে নয়, তাঁরা যেন সমাদর পান সমসাময়িক পুরুষ-লেখকদের সঙ্গে সমমর্যাদায়। তাঁদের মূক সৃষ্টি গবেষকদের সোনার কাঠির স্পর্শে মুখর হয়ে উঠলেই সার্থক হবে এই লেখিকাদের কষ্টার্জিত ভূমিকা। অধুনা অবশ্য এক লুপ্ত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে মহিলাদের লেখা নিয়ে। নারী মুক্তির দিক্ চিহ্ন উন্মোচিত হয়েছে অনেক লেখিকার গল্প উপন্যাসে; বহু অপরিচিত লেখনীতেও এটি ব্যক্ত হয়েছে, হয়ত বা পরোক্ষ ভাবেই—কিন্তু তার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত সংকলিত হয়নি।

আমাদের সাহিত্য প্রগতির ইতিহাস রচনার কাজে মহিলাদের লেখা এবং মহিলা বিষয়ক লেখা এই দুইয়েরই বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। বাংলাসাহিত্যের নব দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হবে এই প্রয়াস।

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প বিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শুধু জনকই নন, সার্থকতম রূপকারও। তাই সমকালীন তো বটেই, তাঁর পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পে অপরিসীম। এই সংগ্রহের কয়েকটি গল্পেও তার ছাপ অনস্বীকার্য। দেনাপাওনার নিরুপমার মতোই পণের কারণে, নির্যাতিত নারী চরিত্র কয়েকটি গল্পেও পরিস্ফুট। আবার 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালের মতো প্রতিবাদী চরিত্রেরও সন্ধান মেলে লেখিকারচিত গল্পে। মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্পেরও ছোঁয়া আছে একটি দুটি গল্পে। উন্নত মানের সৃজনশীল

রচনার সম্ভার নিয়ে লেখিকারা উল্লেখযোগ্য দান রেখেছেন গল্পসাহিত্যে। পৃথক-পৃথকভাবে গল্প বা লেখিকার বিশ্লেষণ করছি না, কারণ লেখার পরিধি তাহলে আরও বিস্তৃত হবে। তাই পাঠকরা নিজেরাই বিচারের ভার গ্রহণ করবেন, এই আমার প্রত্যাশা।

এই সংকলন সম্পূর্ণ করতে প্রথমেই যাঁর কাছে আমি আমার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নেব, তিনি হলেন সমরেন্দ্র দাস। যিনি গল্প বাছাই-এর ক্ষেত্রে সযত্ন প্রয়াস নিয়েছেন বলেই এতগুলি গল্পর মধ্য থেকে প্রথম পর্যায়ের পঞ্চাশটি বাছাই করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে।

যে-গ্রন্থাগারগুলি আমি ব্যবহার করেছি, সেগুলি পরিচালক ও কর্মীবৃন্দরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। বিশেষত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অরুণা চট্টোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক অশোক উপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদীপ চৌধুরী, বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের সমীর বোস এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের বাসুদেব গুপ্ত সবরকম প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমাকে করেছেন।

বন্ধুবর শিপ্রা রাহা, আমার অনুজপ্রতিম অনুশীলা দাশগুপ্ত এবং শুক্লা ঘোষের আন্তরিক সহযোগিতা গ্রন্থপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। শিখা রায় গল্পগুলি যত্নসহকারে কপি করে দিয়েছেন। এরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

যাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে এই সংকলন তৈরী করতে প্রথম থেকেই প্রেরণা জগিয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড° জ্যোতির্ময় ঘোষ। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাহিত্যলোক এই গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অধ্যাপক ঘোষকে আমি ছোটো করতে চাইনা। সাহিত্যলোক প্রকাশনার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও ধৈর্যসহকারে এই গল্পসংগ্রহ প্রকাশে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সে-কারণে তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

এই সংকলনের সব লেখিকাদের পরিচিতি সংগ্রহ করতে পারিনি। কোন সহৃদয় পাঠক যদি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করে নেব।

এই গ্রন্থসংকলনটি প্রকাশ করার জন্য মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা এই বিশেষ অংশটি সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মূল্যবান কিছু সময় আমার জন্য ব্যায় করায় তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, পুরাতন গল্পগুলির বানান অপরিবর্তিত রেখেই বইটি মুদ্রিত হল। এতে বিভ্রান্তির অবকাশ পাঠকের যেন না থাকে। এই সংকলনটি বাংলার পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে—বুকভরা এই আশা নিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দিলাম গ্রন্থটি।

ইতি

শ্যামলি গুপ্ত

সূচীপত্র

কবির পরিণাম

শ্রীমা

সতীশ বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখে। যখন সতীশ স্কুলের বালক ছিল, তখন তাহার সহপাঠীরা বিস্মিত নেত্রে দেখে যে আকাশে নীল মেঘস্তবক অথবা জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্রা রাত্রি দেখিলে, প্রফুল্ল ফুলবন বা শ্যামল প্রস্তরবাহিনী নদীকূলে বেড়াইতে গেলে বালক সতীশ মুগ্ধবৎ বসিয়া কি ভাবিতে থাকে; তার পরে বিনা আয়াসে—বিনা অভিধানে, একটা সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলে।

একথা যখন অনেকের কাণে পৌঁছিল, তখন অনেকে সতীশের উপরে বড় অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বলিল "ও ছেলের লেখাপড়া হইবে না," কেহ বলিল এ "ছেলের প্রকৃত বুদ্ধি হইবে না," যাঁহারা সাধারণের নিকটে আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মাথা খারাপ বলিয়া সতীশের ঐ একটা রোগ হইয়াছে।" এসব কথার মধ্যে কোন গুলা সত্য কোন গুলা মিথ্যা আমরা তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে "যে রোগের জন্য" সতীশ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ধমক খাইল, গুরুজনদিগের কাছে গালি খাইল, বন্ধুরা "কালিদাস, শেলি, মাইকেল দত্ত" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল, তাহার সে দারুণ রোগ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

ক্রমে সতীশের বয়স তেরো ছাড়াইয়া তেইশ, তেইশ ছাড়াইয়া তেত্রিশে পৌঁছিল, সতীশচন্দ্রও স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, কলেজ ছাড়িয়া আপিসে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে সেই "দুশ্চিকিৎস্য রোগ" ও প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কাজে কাজেই সতীশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই কবিতা রোগগ্রস্তের "আরোগ্য" আশা ছাড়িয়া দিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন।

অন্য লোকে এইরূপ "নিশ্চেষ্ট" হইলেও একজনের চেষ্টায় "নির" উপসর্গ যোগ করিতে আমাদের সাধ্য হইল না। কারণ সতীশের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি সরোজিনী দেবী স্বামীর এই "দুরারোগ্য রোগ" দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—যখন সতীশ কলিকাতায় কলেজে পড়িত, যখন ছুটীর সময়ে বাড়ী গিয়া, গভীর রাত্রিতে অচিরজাগ্রতা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয়া ভার্য্যা সরোজিনীকে "সুন্দর পূর্ণিমা নিশি" কিম্বা "ফুটিছে বকুল ফুল" অথবা "কার মুখ পড়ে মনে" প্রভৃতি, মধুর পদাবলী যুক্ত নিজের রচিত কবিতা গুলি সরল ব্যাখ্যা সহ শুনাইতেন, তখন যে সরোজিনীর তাহা ভাল লাগিত না, একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা হইত না, তাহা কখনই নহে। বরং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সতীশের সে মধুর গাথা, বসন্ত কোকিলের ঝঙ্কারের মত সরোজিনীর হৃদয়ে অতি নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত। আরও শুনিয়াছি "কবির ভার্য্যা" বলিয়া সরোজিনীর মনে বেশ একটু গর্ব্বও জন্মিত।

যাহা হউক এখন আর সরোজিনীর সে দিন নাই। এখন সরোজিনী ঘরে গৃহিনী, শিশু

সন্তানের জননী, দাস দাসীগণের শাসন কাবিনী ; তাই এখন আর কবিতা বা কবি-হৃদয় লইয়া সরোজিনীর চলে না। এখন নিজের পুরাতন বালা দুগাছি নূতন করিয়া গড়ান চাই; খোকা খুকীর সাটীনের পোষাক চাই, লোক জনের কাছে লৌকিকতা ও প্রতিপত্তি চাই। যে সময়ে যা শোভা পায়। চিরদিন ও সব ছেলেমী ভাল লাগিবে কেন?

সুতরাং স্বামীর "ছেলেমী" ঘুচাইতে সবোজিনী রাগ করিল, অশ্রু ফেলিল, কোনও দিন "প্রচণ্ড" মুখঝামটা সহ তীব্র বাক্য বাণ, সেই কবিতা রোগগ্রস্ত, উপরওয়ালার জ্বালায় ত্রস্ত, স্বামীটাব হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হৃদয় কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত হইল না! সে হৃদয় জড় কি পাষাণ তাহা জানি না, কিন্তু সরোজিনীর তীক্ষ্ণাস্ত্র সকল ভোঁতা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সরোজিনী "ব্রহ্মাস্ত্র" প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন—উপবাস করিলেন; তখন কবিতা-রোগী বিনয় বচনে বলিল "তোমার বালা ও ছোট খোকার পোষাক কিনিয়া দিব, কিন্তু দিন কতক পরে, সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে, তাহা দিয়া শীঘ্র একখানি পুস্তক ছাপাইব। সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে সে সকল কবিতা লিখিয়াছি, সে সকল যতক্ষণ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার মনের তৃপ্তি নাই।—আগে বইখানি হউক, তার পরে তুমি যা চাও তাই দিব"।

রাগে সরোজিনীর মুখ লাল হইল। এ রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পুরুষের উপরে রাগ করিয়া উপবাস করা বিফল, তাই সরোজিনী উঠিয়া ভাত খাইল। সেই দিন হইতে সহধর্ম্মিণী সতীশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না; কেবল মনে মনে ডাকিল "হে ঠাকুর ! হে সিদ্ধেশ্বরি! তোমরা ওঁর এ রোগ দূর কর, আমি তোমাদের পূজা দিব।"

যথাসময়ে সতীশের কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সতীশ অতি সুন্দর কাগজে, অতি সুন্দর অক্ষরে, তাঁহার প্রাণময়ী কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেন। বাঁধানও খুব সুন্দর হইল। সতীশ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীনাথ বাবু নূতন সমালোচক। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রধান লেখক। গ্রন্থ সমালোচনায় তিনি কৃতী শুনিয়া সতীশ একখানি পুস্তক জামার পকেটে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দুই চারি কথার পরে, নূতন মক্কেল যেরূপ সঙ্কোচে উকীলের নিকটে কথা কহে, কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সঙ্কোচে পাশ করা ছেলের পিতার নিকটে কথা কহে, সেইরূপ সঙ্কোচে— সেইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া সতীশ শ্রীনাথ বাবুকে, নিজের লিখিত পুস্তক খানির বিষয়ে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সতীশকে "কৃপাপ্রার্থী" জানিয়াই শ্রীনাথ বাবুর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্য উদিত হইল। অনেকেরই এ রকম হইয়া থাকে। সতীশের প্রার্থনায় কোনও উত্তর না দিয়া, নিজে কি কি কাগজে লেখেন এবং সম্পাদকগণ তাঁহার লেখা পাইবার জন্য কিরূপ "লালায়িত" হন কল্পনা দেবীর সহায়তায় শ্রীনাথ বাবু সেই সকল পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে বেচারাকে অগত্যা সেই সকল কথা ধীর মনোযোগে শুনিতে এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে হইল।

আরও খানিক ক্ষণ পরে, শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনার গ্রন্থখানির নাম কি?'' ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিলেন আজ্ঞে এখানির নাম ''অশ্রুধারা'' পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে শ্রীনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, ''অশ্রুধারা ! নামটা আমি ভাল বিবেচনা করি না। কথা কি জানেন, নামের ভিতরে মাধুর্য্য গুণের অপেক্ষা রজো গুণই অধিকতর হৃদয় গ্রাহী হয়। কৃতী লেখক সেই রূপই করেন।''

অতর্কিত ভাবে সতীশের এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সতীশ কি তবে অকৃতী লেখক?

ডিবা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন ''আপনার গ্রন্থের একটু পড়ুন দেখি।'' সতীশ পুস্তক হাতে করিয়া পড়িতে লাগিলেন; প্রথমে কবিতার নাম পড়িলেন ''গঙ্গা স্তোত্র'' তার পরে কবিতা পড়িলেন—

''নমো দেবি সুরধূনী পতিত পাবনি!—''

একছত্র না ফুরাইতেই সমালোচক বাধা দিয়া, ''এ যে ভট্টাচার্য্যদিগের পাঠ্য মন্ত্র—এ রকম কবিতার এখন চলন নাই। আপনি আর একটি পড়ুন।''

আমরা সত্য কথা বলিব; সতীশ যদি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ পক্ষ সর্মথনে দুইটা কথা বলিতে পারিতেন;

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। লোহার গায়ে অনেক আঘাত সহে, কিন্তু ফুলের গায়ে হাতের ভর সহে না। যাহা হউক সতীশ কম্পিত হৃদয়ে কম্পিত কণ্ঠে, তাহার ''বরষা'' শীর্ষক কবিতা পড়িলেন—

''পরাণ কেমন করে!
আকাশে বরষা, ধরায় তমসা,
একেলা রয়েছি ঘরে!
মোহন ঠমকে, চপলা চমকে,
হেরিয়া নয়ন ঝরে!—''

শ্রীনাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন ''থাক, আর আবশ্যক নাই। স্বভাব কবিতায় যেরূপ উঁচুদরের ভাষা ও জীবন্ত ভাব থাকে, ইহাতে সে সব কিছুই নাই। আপনার কবিতা কৃত্রিমতা – দুষ্ট; আপনি কষ্ট কল্পনার কবি।''

ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে হীরার ধার ভাঙ্গিল। বেচারা সতীশ, এতকালের পরে আজি সমালোচকের কাছে আখ্যা পাইল কষ্ট কল্পনার কবি। এতদিনের পরিশ্রম, এত দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস আজি সমালোচনার আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইল! সতীশ নীরব, নিষ্পন্দ।

করুণ হৃদয় শ্রীনাথ বাবু তখন অনুগ্রহ পরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন ''আপনি দুঃখিত হবেন না; চেষ্টা করুন, কালে ভালো ফল হতে পারে। জানেন সতীশ বাবু; আমার ভগিনী-পতি এক জন সুকবি—স্বভাব কবি; তিনি 'চিদানন্দ বিকাসিনী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা সকলে সেখানি 'বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য' বলিয়াছি আপনাকে তা থেকে কয় ছত্র শুনাই।'' অতি কষ্টে সতীশ ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া বসিলেন; সমালোচক

"চিদানন্দ বিকাসিনী" খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; কবিতার নাম পড়িলেন "বিদ্যুৎ"। তার পরে পড়িলেন—

"হে বিদ্যুৎ! হে বজ্রাগ্নি!
তব স্রোতে ভাসিছে গগণ,
আরো, প্লাবিত হতেছে সারা বিশ্ব,
কি প্রখর তেজস্বিনী,
কিবা বঙ্কিম হাসিনী,
কোথা মিলে হেন অপূর্ব্ব সুদৃশ্য!
সম্বর্ত আর্বত পুষ্করাজি মহামেঘ যত
সবে চায় লইতে আশ্রয়, তব পদাম্বুজে অবিরত।"

সতীশ আর বসিলেন না। শ্রীনাথ বাবুকে পুস্তক দিলেন না। এক পলকের মধ্যে এক নির্জ্জনে উপস্থিত হইলেন। তার পরে সাশ্রুনেত্রে সেই কবিতা পুস্তক খানি বুকে চাপিয়া বলিলেন "কবিতে! তোমার জন্যে আত্মীয় পরের অবাধ্য হইয়াছি, বিদ্বেষভাজন হইয়াছি, গালি খাইয়াছি, তোমার জন্য সবই সহিতে পারি, কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রা কীটের মত নির্ম্মম সমালোচক যে তোমার সুকোমল প্রাণ চিবাইতে থাকিবে—আমার হৃৎপিণ্ড তাহার ভোঁতা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিতে থাকিবে, তাহা আমি কখনই সহিতে পারিব না। পরের প্রীতিকামনায় অথবা নিজের যশোবাসনায় আর তোমাকে বাহিরে পাঠাইব না—আমার হৃদয়ান্তপুর বাসিনী কবিতা দেবী! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিলেই আমার সকল সুখ, আমার স্বর্গসুখ! তোমার জন্যে খ্যাতি সম্মান ছাড়িয়াছি, ভার্য্যার প্রণয় ছাড়িয়াছি, এবারে চল, লোকালয় ছাড়িব; কেবল তোমাকেই ছাড়িব না!"

আর সতীশ চাকরি করিল না, বাড়ী আসিল না; কোথায় গেল সে সংবাদও পাওয়া গেল না! সরোজিনী পিতৃগৃহে বাস করিয়া সন্তান কয়টাকে মানুষ করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজে জীবন্মৃতা।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'—১৩০১

চণ্ড ও মুকুলজী

শ্রীমতী হেমলতা সরকার

আষাঢ় মাসের "মুকুলে" মিবারের রাণা প্রতাপসিংহের বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে। এবার সেই বংশজাত আর এক মহাত্মার বিষয়ে কিছু বলিব, ইঁহার নাম চণ্ড। ইনি মিবাররাজ রাণা লাক্ষের পুত্র। লাক্ষের রাজত্ব-কালে মিবারের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা ছিল। তন্মধ্যে কুমার চণ্ড সকলের বড়।

একদিন রাণা লাক্ষ মন্ত্রী পরিষদ প্রভৃতিকে লইয়া রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় মাড়বার রাজ রণমল্লের নিকট হইতে 'নারিকেল' ফল (রাজপুতদিগের মধ্যে নারিকেল ফল পাঠাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার রীতি ছিল) লইয়া একজন দূত তথায় উপস্থিত হইল। রাণা তাহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাড়বার রাজ চণ্ডের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। রাণা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—তাই ভাল! আমি ভাবছিলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে কে আবার আমার বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠাবে। চণ্ড সে সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসিয়া পিতার পরিহাসের কথা শুনিয়া বলিলেন—"পিতা যখন পরিহাস করিয়াও সে কন্যার সহিত নিজের বিবাহের কথা ভাবিয়াছেন, তখন আমি আর তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না।" সুতরাং তিনি কোনও মতেই সে কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। রাণা লাক্ষ পুত্রকে কত বুঝাইলেন, কত তিরস্কার করিলেন, কত অনুরোধ করিলেন, কিছুতেই তাহাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—কি! আমি পিতা হইয়া এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছুতেই তোমার গ্রাহ্য হইল না? আমি তো মাড়বার রাজাকে অপমানিত করিতে পারি না। আমি তার কন্যাকে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু তুমি আজ আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, চিরদিনের মত তুমি মিবারের সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিলে, এই বিবাহে যদি আমার পুত্র জন্মে, সেই মিবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। চণ্ড পিতার নিকট বিধিপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। কালে নূতন মহিষীর একটি পুত্র জন্মিল। তাহার নাম মুকুলজী। মুকুলজীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন রাণা লাক্ষ মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে গয়াতীর্থ রক্ষা করিবার জন্য গমন করেন। যাইবার পূর্বে রাজ্যের বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—আমি তো চলিলাম, আর যে ফিরিব এরূপ আশা নাই, এখন আমি কোন্ ভূসম্পত্তি মুকুলকে দান করিয়া যাই? কুমার চণ্ড অমনি দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন মিবারের রাজসিংহাসন!" শুধু এই কথা বলা নয়, কিন্তু পিতার গমনের পূর্ব্বে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া চণ্ড মুকুলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন; এবং নিজে তাহার মন্ত্রী হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাণা লাক্ষ মুকুলকে সিংহাসনে—বসাইয়া তীর্থে গমন করিলেন। কুমার চণ্ড বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ভ্রাতার রাজ্য শাসন করিতে

লাগিলেন। ক্ষুদ্র বালক মুকুল সিংহাসনে বসিয়া আছে, আর চণ্ড দীন দাসের ন্যায় নিম্ন আসনে উপবিষ্ট। এ দৃশ্য দেখিয়া সভাস্থ সকলের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। সকলে চণ্ডকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। কিন্তু হায়! এত বড় মিবার রাজ্যে কেবল একজন ছিলেন, যিনি চণ্ডের কাজ কর্ম্ম ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার সকল কাজেই একটা না একটা দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেন। সে কে জান? চণ্ডের বিমাতা মুকুলের জননী। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া চণ্ডের নামে অনেক নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। চণ্ড প্রথম প্রথম বিমাতার এইরূপ ব্যবহার মনে লইতেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন, তাঁর কোন কাজেই পার নাই, সকল কাজেই সন্দেহ তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মুকুলের জননী কেবলই বলিতেন, চণ্ডই প্রকৃত রাজা, আমার পুত্র কেবল সাক্ষীগোপাল। বিমাতার কথাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন চণ্ড তাঁহাকে বলিলেন, মা, আপনি নাকি বলেন যে, মুকুলকে বঞ্চিত করিয়া আমি নিজে রাজা হইবার চেষ্টাতে আছি, একবার ভাবেন না যে, আমার যদি রাজা হইবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আজ আর আপনাকে রাজমাতা হতে হতো না। যা হোক, আপনার মনে যখন এমন ভয়, তখন আমার এ রাজ্য ছাড়াই ভাল। আমি আপনার পুত্রের রাজ্য ছাড়িয়া চলিলাম। আপনি পুত্রের কল্যাণ দেখুন। কিন্তু সাবধান আমার পিতার রাজ্য যেন ছারখার না হয়। আর আপনার পুত্রের যেন কোন বিপদ না হয়। এই বলিয়া চণ্ড বিমাতার পদধূলি লইয়া ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মিবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শূন্য হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন। বিমাতা একটী কথাও বলিলেন না। মুকুলের জননী অচিরে আপনার পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনকে ডাকিলেন। তাঁহারা রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। মাড়বার রাজ প্রথম প্রথম দৌহিত্রকে কোলে লইয়া সিংহাসনে বসিতেন। পরে একাই বসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার পিতা পুত্রে সকলই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এমন কি মুকুলকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রও চলিতে লাগিল। তথাপি মুকুলের জননীর চেতনা নাই। শেষে একদিন মুকুলের বৃদ্ধা ধাত্রী রাণীকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া কহিল,—আপনি কি একেবারে অন্ধ হইয়াছেন? পুত্রের রাজ্য ও জীবন সকলই যায়, তবু কোন্ সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন? ধাত্রীর তিরস্কারে রাণীর চক্ষু ফুটিল। "তাই ত কি সর্ব্বনাশ! পিতা ও ভ্রাতার হস্ত হইতে রক্ষা পাই কিরূপে?" ভাবিয়া দেখিলেন তিনি নিরুপায় ও অসহায়। তখন অন্য গতি না দেখিয়া চণ্ডকে বলিয়া পাঠাইলেন, "চণ্ড, তুমি ভিন্ন এ বিপদে আর রক্ষা নাই। তুমি শীঘ্র আসিয়া তোমার পিতার রাজ্য ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা কর।"—চণ্ড সংবাদ পাইবামাত্র উপস্থিত হইলেন। সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি বিশ্বাসঘাতক মাড়বার রাজকে হত্যা করিয়া, তাঁর পুত্রকে সদলে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। শত্রুকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতার রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিয়া মহামনা চণ্ড আবার বিদায় লইলেন। এবার বিমাতা বলিলেন, "তুমি আর দূরে যাইও না। তুমি এখানেই থাক।"—চণ্ডের হৃদয় বিমাতার পূর্ব্বাচরণে এতই দুঃখিত হইয়াছিল যে তিনি কোন ক্রমেই আর থাকিতে সম্মত হইলেন

না। বলিলেন। ''জননী! বিপদে পড়িলেই আমাকে ডাকিবেন, আমি চিরদিন আপনার পুত্রের রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু আমি আর এখানে থাকিতে পারি না, কি জানি আপনার মনে আবার যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়। শত্রুর অস্ত্রাঘাত বুক পাতিয়া লইতে পারি, কিন্তু আত্মীয়ের অবিশ্বাস সহ্য হয় না।''—এই বলিয়া চণ্ড জন্মের মত পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাগণ হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'মুকুল'—১৩০২

নিরুপমা

কুলবালা দেবী

নবগ্রামের দেবেন্দ্রনাথ রায় বনিয়াদি বড় লোক, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র আরও অধিক উচ্চতর ছিল; একটি পুত্র ও একটি কন্যা ব্যতীত আর সন্তানাদি ছিল না। পুত্র শচীন্দ্রনাথ দয়া দাক্ষিণ্যে বুদ্ধি ও বিদ্যায় পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম এ পড়িতেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের কন্যা নিরুপমা সকল বিষয়েই নিরুপমা নামের যোগ্যা ছিল। উপন্যাস বর্ণিতা সুন্দরীদিগের ন্যায় আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, তিলফুল জিনি নাসা, কম্বুকণ্ঠ প্রভৃতি না থাকিলেও সে সুন্দরী, কারণ সেই শান্ত, সমুজ্জ্বল নয়ন, সুগৌর সুঠাম কান্তি যে একেবারে দেখিত সে আর সহসা নয়ন ফিরাইতে পারিত না। সে স্বর্গীয় সরলতাময় প্রীতিমাখা মুখখানি যে একবার দেখিয়াছে সে বুঝি ইহ জীবনে তাহা ভুলিবে না।

দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী বিমলা দেবী সুগৃহিণী ছিলেন; কি রন্ধনে কি গৃহকর্মে কি শিল্প বিদ্যায় কি লেখাপড়ায়, নবগ্রামে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতিতে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যা যে সর্বগুণে গুণবতী হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

নিরুপমা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, এখনও বিবাহ হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের অর্থের অভাব নাই তাহাতে একটিমাত্র কন্যা, সুতরাং কন্যাটি যাহাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না পায় ইহাই তাঁহার কামনা ; প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও তাঁহার আশানুযায়ী বর মিলিতেছে না; এদিকে কন্যাও ক্রমে বয়স্থা হইয়া উঠিল। বিমলা দেবী বড়ই চিন্তিত হইলেন। নিরুপমা এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। সে বুঝিল যে তাহার জন্যই তাহার পিতামাতার এত ভাবনা চিন্তা, আরও বুঝিতে পারিল যে তাহাকে দেখিলে পিতামাতা আর পূর্বের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করেন না বরং তাহার মুখপানে চাহিয়া আরও যেন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া তাহার প্রফুল্ল শতদলবৎ মলিন হইয়া যাইত; ধীরে ধীরে এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের শান্তির সংসারে একটি অশান্তির ছায়া পড়িল।

২

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, নিরুপমা ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখন মনে করিতেছেন "যাক্ আর খুঁজিব না, যে স্বম্বন্ধগুলি উপস্থিত আছে ইহারই মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া একটি স্থির করিয়া ফেলি; কিন্তু নিরুপমার মুখের দিকে চাহিলেই তাঁহার সে সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইত, ভাবিতেন হায়! কেমন করিয়া এই স্নেহপুত্তলীকে স্বেচ্ছায় দুঃখ সাগরে ভাসাইব?"

এদিকে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল, বিমলা দেবী স্বভাবতঃই কিছু রুগ্ন ছিলেন তাহার উপর কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আরও কাতর হইয়া পড়িলেন, ক্রমে একেবারে শয্যাগত হইলেন। তখন গ্রামে ভাল চিকিৎসক ছিল না, সুতরাং নানা স্থান হইতে ভাল ভাল চিকিৎসক আনাইলেন, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে বালিকা মাতার সেবা করিত, দিন রাত্রি নীরবে সেই রুগ্ন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; জননী যখন তাহার মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত, মনে হইত বুঝি আমিই মাতার সমুদয় যন্ত্রণার মূল কারণ; কাতর হৃদয়ে বালিকা বিপদ ভঞ্জন হরির নিকটে মাতার আরোগ্য প্রার্থনা করিত। ভক্তবৎসল হরির চরণে সে ব্যাকুল, প্রার্থনা পৌঁছিল।

প্রায় এক মাস পরে বিমলা দেবী আরোগ্য হইলেন, কিন্তু পীড়া সম্পূর্ণরূপে উপশম হইল না। চিকিৎসকগণ জল বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিল। এলাহাবাদে দেবেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি ডাক্তারি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে যাওয়াই সুবিধাজনক মনে করিয়া, একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিবার জন্য বন্ধুকে পত্র লিখিলেন।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। বন্ধু লিখিয়াছেন "তোমার স্ত্রী পীড়িতা সংবাদে চিন্তিত হইলাম; চিকিৎসকগণ জল বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন, তুমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে লইয়া রওয়ানা হইবে, আর বাড়ীর জন্য চিন্তা করিও না, এখানে আসিলেই একটা ঠিক করা যাইবে।" পত্র পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

৩

প্রায় দুই মাস হইল দেবেন্দ্রবাবু সপরিবারে এলাহাবাদে আসিয়াছেন, বিমলা দেবী পথের অনিয়মে প্রথমে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত বন্ধুর বাড়ীতেই আছেন, বাসা করার কথা তুলিলেই বন্ধু উমেশচন্দ্র রাগ করেন, বলেন কেন, এখানে কি তোমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে, আরও বলেন যে এখান হইতে যাওয়ার আর এক অন্তরায় দেখিতেছি; তোমার গৃহিণী সবে একটু ভাল হইয়াছেন, এখন তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, কিন্তু এখান হইতে গেলে আমি সর্বদা দেখিতে পারিব সে ভরসা কম। যাহা হউক নানা কারণে দেবেন্দ্রনাথের বাসা করা ঘটে নাই।

উমেশচন্দ্র মৈত্র এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার বাড়ী বঙ্গদেশে, কলিকাতায় পাঠাভ্যাসকালে দেবেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব জন্মে, সেই বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত হয়। দেশে আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় উমেশবাবু চাকুরীস্থলেই বাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র কন্যা নলিনী। একটি পুত্র সন্তান ছিল, কিন্তু সেটি তাঁহার ঔরসজাত পুত্র নহে। চাকুরী হওয়ার অব্যবহিত

পরেই উমেশবাবু একবার দেশে গিয়াছিলেন. তখন দেশে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রকোপ, উমেশবাবুর বাড়ীর সন্নিকটে তাঁহার এক জ্ঞাতির ওলাউঠা হয়। উমেশবাবু অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি প্রাণপণে জ্ঞাতির চিকিৎসা করেন, কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডণীয়, কয়েক দিন পরে জ্ঞাতির মৃত্যু হইল। পরে জ্ঞাতিপত্নীরও ঐ পীড়া হয়, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া বিধবা অনাথিনী অন্ধের যষ্টি দরিদ্রের সম্বল একমাত্র পুত্র নির্ম্মলকে ডাক্তারবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া পতির অনুগমন করিল। পরদুঃখ-কাতর উমেশচন্দ্র নির্মলকে আপনার আলয়ে লইয়া আসিলেন, এবং অপত্য নির্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নির্মল, এখন বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবক। অতি শৈশবে নির্মল পিতা মাতা হারাইয়াছে; শৈশবের স্মৃতি অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় তাহার মনে ছিল; কিন্তু ডাক্তারবাবুর স্নেহে সেজন্য তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। নলিনী নির্মলকে আপন সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই জানিত। ডাক্তারবাবু নির্মলের পরিচয় কাহারও নিকট দেন নাই, সুতরাং সকলে নির্মলকে ডাক্তারবাবুর পুত্র বলিয়াই জানিত।

বিদেশে আসিবার আগে নিরুপমার বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। প্রতিভাময়ী নলিনীর সরলতা মাখা মুখখানি দেখিয়া সে দেশের কথা ভুলিয়া গেল।

৪

উমেশবাবুর বাড়ীখানি বড় সুন্দর, বাড়ীর কর্তা যে একজন সুরুচিসম্পন্ন লোক বাড়ীখানি দেখিলে তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সন্ধ্যাকালে বৈঠকখানায় বসিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছিলেন শীঘ্রই বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়। উপেন্দ্রবাবু বলিলেন "কেন? এত কি প্রয়োজন পড়িয়াছে যে শীঘ্র না গেলেই চলিবে না।"

দেবেন্দ্র।—দুই মাসের অধিক হইল বাড়ী হইতে আসিয়াছি আসিবার সময় ব্যস্ততা প্রযুক্ত বাড়ীর সেরূপ কোন ভাল বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারি নাই, সুতরাং শীঘ্রই যাওয়া প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে আমার কন্যাটি এক্ষণে বয়স্থা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র অভাবে বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু কোথাও ইচ্ছানুরূপ বর খুঁজিয়া পাইতেছি না, সে জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি। স্ত্রীর পীড়ার জন্য সে কথা এতদিন ভাবিবার অবসর পাই নাই, এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নহে।

উমেশ। দেখ, আমার কন্যাটিও বয়স্থা হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার মত চিন্তা করি না; বস্তুতঃ বলিতে কি, আমার নলিনীর উপযুক্ত বর আমি দেখিতে পাই না, সর্বগুণ সমন্বিত পাত্র না পাইলে আমার নলিনীর বিবাহ দিব না এ বিষয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞ। সে যাহা হউক তোমার কন্যার বিবাহের কথায় আমার একটি কথা মনে পড়িল; আমাদের নির্মলের সহিত বিবাহ দাও না কেন? নির্মল সকল বিষয়েই নিরুপমার যোগ্য বর, আর নিরুপমাও আমার পুত্রবধু হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। দেখ যথার্থ কথা বলিতে কি এ সম্বন্ধ হইলে আমাদের বন্ধুত্বের মূল দৃঢ়কৃত হইবে, সেই জন্যই আমার একান্ত ইচ্ছা।

পূর্বেই বলিয়াছি উমেশবাবু অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি, সরলভাবে বন্ধুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, যেন তাঁহারই কন্যাদায় উপস্থিত।

দেবেন্দ্রবাবু যেন অকূল পাথারে কূল পাইলেন, বন্ধুর নিঃস্বার্থ সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন, আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি কথা মনে পড়িবামাত্র সে আনন্দরাশি হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল নির্মল ত উমেশের ঔরসজাত পুত্র নহে, স্নেহ পালিত হইলেও সে সম্পত্তির অধিকারী নহে, আইন অনুসারে নলিনীই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। নির্মল যে পথের ভিখারী। হায়! শেষে কি তাঁহার স্বর্ণ প্রতিমা নিরুপমা পথের কাঙ্গালিনী হইবে? একথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বন্ধুর কথার প্রকৃত উত্তব দিতে পারিলেন না, বলিলেন আমার স্ত্রীর মত জানিয়া তোমাকে বলিব; সে দিন আর কোন কথা হইল না।

যথাকালে দেবেন্দ্রনাথ বিমলা দেবীকে একথা জানাইলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিমলা দেবী বলিলেন "দেখ, নির্মলের ন্যায় রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্র মিলা কঠিন। নির্মলের ন্যায় জামাতা পাইতে কাহার না অভিলাষ হয়? কিন্তু নির্মলেব কর্পদকেবও সম্বল নাই। যদি ঈশ্বরাশীর্বাদে আমাদের অর্থেব অপ্রতুল নাই, তথাপি সকল দিক ভাবিয়া কাজ করা উচিত। যদি কিছু অর্থ থাকিত তবে একার্যে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। সে যাহোক্ কিছু দিন দেখ যদি নিতান্তই না মিলে তখন না হয় এ সম্বন্ধই করা যাইবে। ঘর বব দুই ভাল পাওয়া কঠিন, বিশেষতঃ এমন সুন্দর ছেলে কোথায় পাইবে?"

পরদিন সন্ধ্যাকালে উমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? এ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত?"

"দেবেন্দ্র নির্মলের ন্যায় ছেলের সহিত নিরুপমার বিবাহ দিতে আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই একটু থামিলেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া উমেশচন্দ্র বলিলেন "বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না, নির্মলেব অর্থ নাই এই আপত্তি! নির্মল আমার ঔরসজাত পুত্র না হইলেও আমি পুত্রাধিক স্নেহে তাহাব প্রতিপালন করিয়াছি; সে স্নেহ মৌখিক নহে, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল আবক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি বাক্স খুলিয়া একখানি সযত্ন রক্ষিত কাগজ বাহির করিয়া দেবেন্দ্রনাথেব হস্তে দিয়া বলিলেন ইহা দেখাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল তোমাব ভ্রম দূর করার জন্যই দেখাইলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন সেখানি উইল। উইলের মর্ম এই—উমেশচন্দ্র অবর্তমানে অর্দ্ধেক সম্পত্তি নির্মলের, অর্দ্ধাংশ তাঁর স্ত্রীর, স্ত্রীর অবর্তমানে সেই অর্দ্ধাংশ তাঁহার কন্যা নলিনী প্রাপ্ত হইবে।

লজ্জিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ উইলখানি রাখিলেন, উমেশচন্দ্রকে বলিলেন "ভাই, ক্ষমা কর, তোমার হৃদয়ের মহত্ব আমি বুঝি নাই, এ বিবাহে আমার কোনই আপত্তি নাই। নানা কারণে তোমার নিকট চিব ঋণী হইলাম, জীবনে কখন ইহার প্রতিদান করিতে পারিব কিনা বিধাতা জানেন।"

উমেশ। শুভকার্যে বিলম্ব করা অনুচিত, এই মাসের ২৭শে তারিখে দিন ভাল আছে, সেই তারিখেই বিবাহ হইবে, তুমি শচীন্‌কে ও তোমার বন্ধুবান্ধবকে পত্র লেখ। শচীন্ আসিলেই একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করা যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথ আহ্লাদিত চিত্তে বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫

পিতার পত্র পাইয়া শচীন্দ্রনাথ তিন সপ্তাহের ছুটি লইয়া এলাহাবাদে আসিলেন, ভগিনীর বিবাহের জন্য আসিয়া নিজে এক নূতন বিপদে পড়িলেন।

নলিনীর অনিন্দনীয় রূপরাশি দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ মোহিত হইলেন। এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অপূর্ব মাধুরীময়, অনুপম সৌন্দর্য বুঝি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। এ দেবীপ্রতিমা কি তাঁহার হইতে পারে? শচীন্দ্রনাথ সে পথ তত দুরূহ মনে করিলেন না। সযত্নে আশালতা হৃদয়ে রোপণ করিলেন। কিন্তু হায়! জগতে মানবের কয়টা আশা ফলবতী হয়? অলক্ষ্যে অদৃষ্ট নিষ্ঠুর হাসি হাসিল, শচীন্দ্রনাথ তাহা তখন জানিতে পারিলেন না।

নির্দিষ্ট দিবসে মহাসমারোহে নির্মলচন্দ্রের সহিত নিরুপমার বিবাহ হইয়া গেল। উমেশবাবুর বাটীর অনতিদূরে দেবেন্দ্রনাথ একটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন; আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কেহ আসিয়াছিলেন, দূর দেশ বলিয়া সকলে আসিতে পারেন নাই।

বিবাহের কয়েক দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ দেশে যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত রাত্র হইতে নলিনীর বড় জ্বর হইয়াছে, ডাক্তারবাবু তাঁহাকে যাইতে বলিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ কালবিলম্ব না করিয়া তখনই চলিয়া আসিলেন, আসিয়া কি দেখিলেন? স্বর্ণ প্রতিমা নলিনী অচৈতন্য অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে, দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল রাত্রে জ্বর হইয়াছে, কে দেখিতেছে? উমেশবাবু বলিলেন "কাল রাত্রে জ্বর আসিয়াছে, সেই অবধি অচৈতন্য অবস্থায় আছে, ডাক্তার সাহেবকে ও দুজন বাঙ্গালী ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইয়াছি"। উমেশবাবুর কথা শেষ না হইতেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তার আসিয়াছেন। উমেশ বাবুর স্ত্রী শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন। রোগের অবস্থা শুনিয়া ও রোগী দেখিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালী ডাক্তার দুজন রহিলেন। নির্জনে দেবেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন দেখিলেন মহাশয়? ডাক্তার বাবু বলিলেন পীড়া কঠিন জীবন সংশয়, তবে বলা যায় না বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। বাঙ্গলায় বিকার জ্বর বলে তাহাই হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন, কম্পিত হৃদয়ে নীচে আসিয়া শচীনকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

প্রাণপণ যত্নে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নলিনীকে কে না ভালবাসে? দাস দাসী পর্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, কিন্তু হায়! নিয়তি খণ্ডন করে কাহার সাধ্য?

জননীকে লইয়া শচীন আসিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কম্পিত হৃদয়ে শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। নলিনীর কুসুমসুকুমার দেহখানি নীহার-ক্লিষ্ট পদ্মিনীবৎ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তিন দিন পরে উমেশ বাবুর প্রকাণ্ড ভবনে হাহাকার উঠিল। পিতামাতার হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া, আত্মীয়স্বজনকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া দেবীপ্রতিমা নলিনী দিব্যধামে চলিয়া গেল। হায় কাল! তোমার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। ডাক্তারবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী কন্যার শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন। আর শচীন্দ্র! শচীন্দ্রনাথ সযত্নে হৃদয় উদ্যানে যে আশালতা রোপণ করিয়াছিলেন, নিদারুণ কাল তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিল, নৈরাশ্যের তীব্র যাতনায় শচীন্দ্রনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

কয়েক দিন পূর্বে যে ভবন আনন্দ উৎসবে পূর্ণ ছিল, সেই অট্টালিকা এক্ষণে বিষাদের চিত্র স্বরূপ হইল। হায়! নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ সংসারে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

৬

নলিনীর মৃত্যুর পরে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, নিরুপমার একটি কন্যা হইয়াছে, মেয়েটি বড় সুন্দর; কাল কাল কোঁক্‌ড়ান চুলগুলি, কৃষ্ণতার-শোভিত আয়ত চক্ষু দুটিতে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইত। কন্যাটি পাইয়া ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নলিনীর শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মেয়েটির নাম রাখিয়াছেন সুষমা। তিনি সুষমাকে একদণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না, এই নিরুপমার পিত্রালয় আসা বড় ঘটিত না।

প্রায় দুই বৎসর পরে নিরুপমা পিত্রালয় আসিয়াছে, পনের ষোল দিনের বেশী থাকিতে পারিবে না। সংবাদ পাইবামাত্র তাহার প্রাণের সখি বিমলা ছুটিয়া দেখা করিতে আসিল। বিমলাও কিছুদিন পূর্বে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল!

কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নিরুপমা বিমলাকে বলিল "চল ভাই আমার গাছগুলি দেখে আসি," এই বলিয়া নিরুপমা সস্নেহে বিমলার হাতখানি ধরিয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিল। বহুক্ষণ উদ্যান মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত ভাবে নিরুপমা বিমলাকে লইয়া তাহাদের সেই পুকুরঘাটের বকুল গাছের তলায় বেদীর উপর আসিয়া বসিল। বিমলার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছিল, সে দৃশ্য নিরুপমার চক্ষে বড় সুন্দর বোধ হইল, সাদরে সেই চুলের রাশি নাড়িয়া নিরুপমা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর এমন সুন্দর চাঁচর কেশ কোথা হ'তে এ'ল, আগে ত তোর চুল ভারি খারাপ ছিল?"

মৃদু হাসিয়া বিমলা বলিল, "সত্যি ভাই, আগে আমার এমন চুল ছিল না, তোমাদের এলাহাবাদ যাওয়ার কিছু দিন পরে আমি অতিশয় পীড়িতা হইয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া আমার স্বামী আসিলেন এবং চিকিৎসার্থে কলিকাতা লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে আমি আরোগ্য হইলাম বটে, কিন্তু আমার চুলগুলি প্রায় সমুদয় উঠিয়া গেল। নানা প্রকার তৈল

মাখিলাম, কিছুই হইল না, বরং যা কিছু ছিল দাও গেল, মস্তকটি একেবারে কেশশূন্য হইয়া গেল।

"একদিন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আমার স্বামী "কুন্তলীন" নামক একটি তেল এক বোতল আনিয়া দিলেন, সেই এক বোতল তেলেই অনেকটা উপকার পাইলাম, তারপর ক্রমাগত ছয়মাস উক্ত তেল ব্যবহার করিয়া এই রকম চুল হইয়াছে। এখন আমি 'কুন্তলীন' ছাড়া আর অন্য কোন তেল মাখি না, ইহাতে চুল বেশ পরিষ্কার থাকে— এবং গন্ধও বেশ মিষ্ট।"

নিরুপমা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ তেল কোথায় পাওয়া যায় বিমলা? বিমলা বলিলেন, "প্রায় সমস্ত খবরের কাগজেই ইহার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবে।"

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "খুকী বড় কাঁদছে, মা কিছুতেই থামাইতে পারিতেছেন না, শীঘ্র এস।" নিরুপমা বলিলেন আয় ভাই, বাড়ীর ভিতর যাই। বিমলা বলিলেন, বেলা একেবারে গেছে আজ আমি বাড়ী যাই কাল আবার আসিব।

* * * * *

যথাকালে নিরুপমা এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন, এবং স্বামীকে বলিয়া 'কুন্তলীন' আনিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 'কুন্তলীন' তাঁহার এত পছন্দ হইয়াছে যে, এখন তিনি অন্য কোন তৈলের নামও শুনিতে পারেন না।

কোন ধনবানের সুন্দরী কন্যার সহিত শচীন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদে জীবনের যে শান্তিটুকু হারাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আর ফিরিয়া পাইলেন না। সে স্মৃতি সে শোকচিত্র চিরজীবনের তরে তাহার হৃদয় মাঝে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

'কুন্তলীন গল্প সংগ্রহ' —১৩০৩

নিশি

সরলাবালা দাসী

রামকান্ত বাবুকে বড়ই নির্লিপ্ত স্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটি পরিয়া ছাতিটী মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসা এই দুইটি কেবল তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য। লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজন বশতঃ মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই চারিটী কথা বলিতেন এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন "রামকান্তের মন সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে।" কিন্তু যথার্থ কথা, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহার গুড়গুড়িটী ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সঙ্গী ছিল না।

রামকান্তবাবুর সংসারটি ক্ষুদ্র। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে কচিৎ হইত একথাটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়ি তাখিয়া ও দুই এক খানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী গৃহের পারিপাট্য করিতে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালক বালিকার কোলাহল নাই এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে একটী আলো জ্বলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাকালে সহসা আনন্দহীন শান্তিভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দ কোলাহল উঠিল। যেন দেবতা পূজার একটী নির্ম্মাল্য দেবপাদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীর শূন্য অঙ্গে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশীনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতিবিধি ছিল না, কিন্তু আজ সে নিয়ম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিনের পর রামকান্তের একটা মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্ব্বিকারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুরোধে একবার সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া কন্যাটিকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কিনা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনবজ্জু তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটী যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। একি শক্তি; মাতৃঅঙ্গশায়ী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটির এত ক্ষমতা! আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ করিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়া বৈসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন এখন ঠিক আর সেরূপ হয় না। ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের শান্তি-সুখ একেবারে গিয়াছে। গৃহ অভিভাবক শূন্য, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটিরও যত্ন

হয় না। রামকান্তের এই বিপদের সময় যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে আসিতেন না, তাঁহাদের অনেকে, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী এখন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। রামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

এরূপ বিপদ বিশৃঙ্খলায় দুই মাস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় মাসে রামকান্তের গৃহলক্ষ্মী কন্যারত্নটি স্বামীকে দান করিয়া স্বর্গগামিনী হইলেন।

২

পত্নীর আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটীকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত! পত্নী জীবিত থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভাল বাসিতেন কিনা তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটী ভালবাসার কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদা-প্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা অন্তিম বাক্য সমস্তই আজ মনে পড়িল। "খুকিকে একবার কোলে নাও।" এই রাজলক্ষ্মীর শেষকথা। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রামকান্তের সে কথা মনে পড়িল। বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "ছি! চোখ মুছে ফেল। আমার স্মৃতিচিহ্ন ত তোমায় দিয়া আসিয়াছি। একবার আমার খুকিকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন—"এমন করে আর কতদিন থাকিবে, মেয়েটাকে তো বাঁচিতে হবে। আবার বিবাহ কর।" প্রবীণগণ বলিলেন "এত অল্প বয়সে কি গৃহশূন্য শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি কি সুন্দর মুখশ্রী। একি বাঁচিবে? ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটি দান করিবেন।

মেয়েটি বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়াই বুঝি বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিল "নিশি"।

৩

রামকান্তের আয় অল্প সংসারটীও ক্ষুদ্র। একটি পিতা একটি কন্যা, কিম্বা একটি মা আর একটি ছেলে। বেশীর ভাগ একটি ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু সে এখনই বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে সেই এ সংসারের গৃহিণী। ঘরের জিনিস পত্র সে ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস থেকে আসিবার পূর্ব্বে জলের

ঘটীটি, গামছা খানি, কাপড় খানি এ সকল সে কখনই ঝিকে রাখিতে দেয়না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কড়া শাসন। যদি কোন দিন তিনি ভুলক্রমে ছাতিটি বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিশি "এত রোদ্ লাগিয়াছে, দেখো অসুখ করবে।" এই সমস্ত বলিয়া যথেষ্ট শাসন করে। রামকান্ত কাছারী যাইবার সময় "বাবা তোমার পানের ডিবে নিলেনা? পাগড়ীটে বাঁকা করে পরেছ কেন? লাঠি নিতে ভুলে গিয়েছ বুঝি" এই রকম নিশি দশ বারটা ভুল সংশোধন করিয়া দেয়। রামকান্ত সর্ব্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিল মাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া "গল্প বল ও বাবা একটা গল্প বল" বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোন দিন যদি আফিস থেকে এসে "আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি" বলিয়া শয়ন করেন সেদিন নিশির খেলাধূলা একেবারে বন্ধ হয়। "বাবা তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? তোমার পা টিপে দেব? একটু জল খাবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। মনের ভাবটা যে হয়ত বাবা বলিতেছেন না বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দুটি ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া অফিসে যাইতেন, নিশির ক্রমে সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধিতে শিখেছি। তুমি দেখইনা কেন! তুমি তাড়াতাড়ি পার না আমি বেশ ভাল করে রাঁধব।" ইত্যাদি নানা প্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোন দিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সেদিন রান্নার ধুম দেখে কে? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকী থাকিত না, তাহার পর দিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, তবে আজ আমরা দুই জনেই রাঁধিব।

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়ীটির জানেলার দিকে চেয়ে একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপাগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। দুখানি ছোট ছোট হাত সরাইতেছে। যেই ছাতি হাতে রামকান্ত গলির মোড়ে দর্শন দিতেন অমনি চারিটি চোখে চোখাচোখি হইত।

৪

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে নয় বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই, সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে তাহাতে এখনকার দিনে অসৎপাত্রই জুটিয়া উঠে না। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করেন "আহা মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে। হাজার হোক এখন বড়টি হয়েছে বিয়েতে কি আর সাধ হয় না? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি মলিন করে থাকে।" তাহা, সত্যই আজকাল নিশির মুখখানি বড় ম্লান।

রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি সর্ব্বদা হাসি মাখা থাকিত আজকাল কেন জানিনা সে ওষ্ঠে আর হাসি নাই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক, যে একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল নিয়া গেলে আর "আমার মা লক্ষ্মী" বলে আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের এত অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না।

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতামাতার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলেই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্ল্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানেলায় আসিতেছে, কত ঠাকুর দেবতাকে মানিতেছে তবু রামকান্তের দেখা নাই; প্রতি মুহূর্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে; ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়, কই কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল "বাবা, এত দেরী কেন?" রামকান্ত কেবল বলিলেন "একটু কাজে" আর কিছু বলিলেন না, বিমর্ষ ভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটী ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

৫

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয়মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এত দিনে একটী ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎস্বভাব, বাপ মা কেহই নাই, আসামের পোষ্টাপিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয়মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুর বাড়ীর সকলে ভাল বাসিবে কি না এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাবী জামাতার মধুর চরিত্র ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন ততই হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে

ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে নিশি জানেলায় বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে এক বিন্দু জল আসিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিশির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল যেন অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন "মা লক্ষ্মী এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুবিন্দুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন "ছিমা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "বাবা কাল কি রাঁধব, বলনা?" পিতা বলিলেন "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলে, এখন ছেলেটীকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে", নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি, বাবা, আমি, কোথা যাব?" রামকান্ত বলিলেন "চিরকালই কি মা, তুমি আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে থাকিবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন "মা লক্ষ্মী স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হয়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন করে তোকে পরের হাতে দিব। দেবতা করুন, চির জীবন সুখী হয়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না! নিশি অর্দ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, আমি কোথাও যাব না।" আর কোন কথা হইল না।

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটী পাছে আবার হাত ছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিস পত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময় অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটী ফুরাইয়া গেল, তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন "সম্মুখে অকাল, আর আমার শীঘ্র ছুটী পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্ব্বদা লিখিবেন"। রামকান্ত বাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধর পল্লব দুখানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার নিদ্রা নাই, দিবা রাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কখনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে "বাবা, আমার অসুখ ভাল হলে কি খাব সেই গল্প কবি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই, "ও

বাবা শোও না"। রামকান্ত বলেন, "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ করে ঘুমাও।" নিশি বলে "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমোলে আমি ঘুমাব না।

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় নিশির শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন ডাক্তার মুহুর্মুহু নাড়ি দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার বাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন "নিশি, মা আমার!" নিশি জাগিয়া উঠিল। "বাবা বলিয়া হাত দুখানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়া দিল, সেই মুহূর্তেই রামকান্তে গৃহের আলো জন্মের মত নিভিয়া গেল।

ইহার ৪ দিন পরে একদিন রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন, অমনি জানেলার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানেলায় উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন "মা আমার, তোমাকে নিয়া আমার বড় ভাবনা ছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকুল পাথাবে ভাসিতে ছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কিনা; এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি, যাঁর ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না বন্ধনের মুক্তি ভাল এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।" নিশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।

'ভাবতী'—১৩০৪

হেমমালা

সুমতিবালা দেবী

কপালীপুরের রাজাদের দেওয়ান, চক্রধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একমাত্র সুরূপ পুত্র ধরণীধরের বিবাহ দিয়া, কৌলীন্য মর্যাদাস্বরূপ বহু অর্থ সংগ্রহ করিবেন, আশা করিয়া ছিলেন। পুত্রটি যাহাতে 'পাশকরা' নামে আখ্যাত হইয়া, বধূ সহিত পাঁচ সহস্র টাকার অলঙ্কার, রূপার দান ও তৎসঙ্গে নগদ হাজার দশেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সেজন্য তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বহু অর্থব্যয়ে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন; কিন্তু পুত্র ধরণীধর কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, যৌবনে পদার্পণের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অপেক্ষা, কুসঙ্গে মিশিয়া নানা ব্যসনে শিক্ষিত হওয়া অধিক মূল্যবান মনে করিল!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন লোকমুখে ধরণীধরের কীর্তিকাহিনী শুনিলেন তখন অচিরে তাহার সুখের বাসা ভস্ম হইয়া গেল। পুনরায় তাহাকে দেশে আসিয়া পিতৃশাসনের অধীন হইতে হইল। বাহিরে পিতার যথেষ্ট শাসন রহিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধরণীর পিতামহী ও জননী সময়ে সময়ে একমাত্র বংশধরের একটুকু আদর আবদার না রাখিয়া পারিতেন না। যাহা হউক বাটী আসিয়া ধরণীধরের উৎসন্ন যাইবার পথটি কিছু সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে পাপের মোহময় লালসা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

বিচক্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রটীকে সুপথে আনিবার শেষ উপায়, একটি সুন্দরী বধূ গৃহে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভূত ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিন চারি মাস পর বেলডাঙ্গার আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইল। হেমমালার বিধবা মাতার চারি সহস্র টাকা, এবং এই রূপবতী কন্যা ভিন্ন সংসারে কোন আশার স্থল ছিল না। একজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি ভগ্নীকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেও তাঁহার পত্নীর নিকট হেমমালার জননী কখনও সৎব্যবহার পাইতেন না। তাঁহাদের গ্রামস্থ বিদ্বান বুদ্ধিমান জমিদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী হেমমালার রূপলাবণ্য এবং মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজ ভয়ে ভীতা হইয়া হেমমালার মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কুলীনকন্যা হেমমালাকে গোত্রীয় ব্রাহ্মণে দান করিয়া স্বর্গীয় স্বামীর বংশে কলঙ্ক অর্পণ করিতে ভীতা হইলেন; কিন্তু এই সৎ যুবকের করে কন্যা অর্পিত হইলে হেমমালার ও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যে কত সুখের হইত, সে বিষয় চিন্তা করিলেন না। এমন সময় হেমমালার মাতুল ধনুর্দ্ধর ধরণীধরের সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিয়া দিলেন। হেমমালার মাতা তাঁহার শেষের সংস্থানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব চারি সহস্র টাকা জামাতার মানমর্যাদা, দানসামগ্রী এবং কন্যার অলঙ্কারে ব্যয় করিতে সম্মত হইলেন, তিনি ভ্রাতার হস্তে বিবাহের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার

জামাতা ধনীর সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত কুলীন. ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সুখের বিষয় হইল। তখনও অভাগিনী জননী জানিতেন না, যে এই বিবাহই হেমমালার কালস্বরূপ হইবে।

তাঁহার যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া জামাতার যোগ্য ধূমধামে বিবাহ সম্পন্ন হইল, কিন্তু তাহাতেও বরপক্ষের মনস্তুষ্টি হইল না। হেমমালা শ্বশুরালয়ে গমন করিল। বৃদ্ধ শ্বশুর তাহার কমনীয় মুখকান্তি দেখিয়া ধনলোভ সম্বরণ করিলেন। তিনি তাহাকে মাতৃ-সম্বোধনে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। তাহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী মনে মনে রূপবতী বধূর প্রশংসা করিলেও এই বধূ গৃহে আনিয়া যে তাঁহার গুণধর পুত্রের মানমর্যাদাযোগ্যপ্রাপ্য পাওয়া যায় নাই, এই বিষয় সকলকার সমক্ষে বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হেমমালাকেও এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত।

মায়ের আদরিণী কন্যা শ্বশুর গৃহের অনাদরে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। সে সভয়ে কাতর নয়নে সকলের মুখপানে চাহিত, যেন কতই করুণা ভিখারিণী। কিন্তু একজন তাহাকে কন্যার ন্যায় অতি আদরে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইতেন, তাঁহার আগমনে শ্বশ্রূর কঠোর কটু বাক্য সংযত হইত, তিনি হেমমালার স্নেহশীল শ্বশুর। হেমমালা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিত; যখন তিনি 'মা জননী' সম্বোধনে অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেন, তখন কারারুদ্ধা বন্দিনীপ্রায় হেমমালার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। সে অৰ্দ্ধঘোম্‌টাবৃত হইয়া শ্বশ্রূর আদেশে কখন জলখাবারের রিকাবীখানা, কখন পানের ডিবাটি হস্তে লইয়া তাঁহার সমীপবর্তিনী হইত। লজ্জায় তাহার মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিত, সেই লজ্জারঞ্জিত কমনীয় মুখ, সেই সুগৌর সুঠাম দেহ, বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তরে আনন্দরাশি ঢালিয়া দিত!

কিন্তু সেই বিনীতা বধূর অন্তরে বড়ই বেদনা। বিবাহের পর একদিনের জন্যও সে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় নাই। দুঃখিনী মায়ের বিষাদময়ী মূর্তি সর্বদা তাহার অন্তরে জাগিয়া থাকে। তাহার দুঃখে সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, তাহাকে রোদন করিতে দেখিলে শ্বশ্রূ তিরস্কার করেন।

বিবাহের পর কয়েক দিন ধরণীধরের অন্তরে হেমমালার সুন্দরী বালিকা মূর্তি জাগিয়া উঠিত। সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সে দুই একবার তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য গিয়াছিল। কিন্তু তাহার নির্বাক ক্রন্দনে ত্যক্ত হইয়া মাতার নিকট হেমমালাকে কিছু দিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধও করিয়াছিল; কিন্তু ধনীর কন্যা ধনীরঘরণী হেমমালার শ্বশ্রূ দরিদ্রা বৈবাহিকার গৃহে বধূ প্রেরণ করিতে বড়ই আপত্তি করিলেন। তাঁহার গর্বোক্তিতে ধরণীর মত নিমিষে পরিবর্তিত হইল।

দিবসে বধূর সহিত সাক্ষাৎ করা ধরণীধরের নিষিদ্ধ ছিল, রাত্রেও সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ ঘটিত না। এই সকল কারণে ধরণীধরের সহিত হেমমালার কোন সংস্রবই ছিল না। হেমমালারও প্রত্যহ দানের রৌপ্য ডিবাটি মার্জিত করিয়া কয়েকটি তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া রাখা ভিন্ন স্বামীর প্রতি অন্য কোন করণীয় ছিল না। দৈবাৎ ধরণীর সম্মুখে পড়িয়া গেলে সে ছুটিয়া গৃহকোণে লুকাইত। পুত্র যাহাতে বধূর বশ না হইয়া যায়, ধরণীর

মাতা সে বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। অসৎ পুত্রকে বধূর সংসর্গে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তিনি বৃথা ধনমানের গর্বে মত্ত হইয়া বরং তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ধরণীর বৃদ্ধ পিতা ও পুত্র ও পত্নীর কুব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদের আর কোন কথাই বলেন না। তাঁহারা তাঁহার শাসনের বাহির হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কুনীতি কুসংসর্গ ধরণীধরকে কিছুতেই সৎপথে অগ্রসর হইতে দিল না।

সে বাটীতে দাসী বগলাই তাহার সখী ও প্রহরী। সে ভিন্ন হেমমালার সুখ দুঃখের সংবাদ লইতে অপর কেহ ছিল না। যখন রজনীতে শয্যায় শুইয়া মাতার স্নেহময় মুখ স্মরণ হইলে, তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত, তখন বগলা আসিয়া সস্নেহ বাক্যে সান্ত্বনা দিত, চক্ষের জল মুছাইয়া দিত।

মধ্যে মধ্যে তাহার দুঃখিনী জননীর দুঃখকাহিনী, তিনি যে তাহার অদর্শনে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন, এই সকল কথা লোকমুখে সংবাদ পাইত। তাহাতে তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিত, মাতৃবৎসলা কন্যা চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিত. 'মা দুর্গা, আমার দুঃখিনী মাতার দুর্গতি হরণ কর'। ইহা ভিন্ন তাহার অপর কোন শক্তিই ছিল না।

এইরূপে দুই বৎসর চলিয়া গেল। হেমমালা এখন চর্তুদশ বর্ষীয়া যুবতী; জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অর্দ্ধস্ফুট কুসুমের ন্যায় তাহার রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামী দুশ্চরিত্র; তাহার সেই লাবণ্য পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি দেখিবার কেহ নাই।

একদিন বৈকালে বগলা তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দিয়া গাত্র ধৌত করিবার জন্য খিড়কীর পুষ্করিণীতে লইয়া গেল। শুভক্ষণে এমন সময় ধরণীধর খিড়কীর বাগানে গিয়াছিলেন। তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। নিঃশঙ্কচিত্তে হেমমালা অবগাহন করিয়া ধৌত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া বগলার অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়ে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা কহিতে লাগিল। ধরণীধর এমন সময় ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বগলা ধরণীকে দেখিয়াও হেমমালাকে জানাইল না; তাহার সহিত সহাস্যে কৌতুক করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

ধরণী একদৃষ্টে সেই অনুপম রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে হতভাগ্য নিজ পত্নীর রূপ কখন চাহিয়া দেখে নাই। সে অনুতপ্ত হইয়া মনে মনে বলিল, ধিক্ আমাকে এমন হেমকুসুম অযত্নে ফেলিয়া, কি কুহকে মজিয়া আছি? তাহার অন্তর ব্যথিত হইল। সে দিন হেমমালা তাহাকে যে হেমনিগড়ে বদ্ধ করিল, সে সহসা সে বন্ধন মুক্ত করিতে পারিল না।

গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য হেমমালা ফিরিয়া দাঁড়াইল, ধরণীধরকে উপরে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইল। ভাবিল না জানি অদ্য অদৃষ্টে কি আছে! সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, বগলার পশ্চাৎবর্তী হইল। যাইবার সময় সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভিতর হইতে দেখিতে পাইল, অদ্য সেই রূদ্রমূর্ত্তি নহে, করুণ কমনীয় দৃষ্টি! সে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সেই দিন রজনীতে সে যখন একাকী নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া বগলার অপেক্ষা করিতেছিল; তখন বৈকালীন ঘটনা স্মরণ হইয়া, তাহার দুর্ভাগ্য তাহার নিষ্ফল প্রেম,

অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করিতে লাগিল। সে সেই মর্ম্মবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাসের সহিত সকল যাতনা দূর করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

সহসা কক্ষে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া ভাবিল, বগলা কার্যশেষে শয়ন করিতে আসিয়াছে। সে অবসাদক্লিষ্ট নয়ন মেলিল না। কিছুক্ষণ পরে বগলাকে নির্বাক থাকিতে দেখিয়া নয়ন মেলিয়া দেখে, পালঙ্কের অদূরে ধরণীধর দাঁড়াইয়া। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে ত্রস্ত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইল। ধরণীধর নীরবে আসিয়া পালঙ্কে উপবেশন করিল। হস্তের কয়েকটী কাগজবেষ্টিত দ্রব্য পার্শ্বে রাখিয়া হেমমালার হস্ত ধরিয়া নিকটে আনিয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল।

হেমমালার অন্তরে প্রবল ঝড় বহিতেছে, সে অবাক! সংজ্ঞাশূন্যাপ্রায় সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া গেল।

ধরণীধর হেমমালার অবস্থা কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। সে পবিত্র প্রেমের মর্যাদা কি বুঝিবে? আজ যে সে হেমমালার কক্ষে আসিয়াছে, সে কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়া। তার অন্তর কিছু অনুতপ্ত। ক্ষণেক পরে বলিল, "হেমমালা! তুমি কি আমাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছ? তুমি আমাকে ঘৃণা করিও না। আমি একদিনও তোমার মুখপানে চাই নাই, যা খুশী করিয়াছি; এখন হইতে আমি ভাল হইব।" হেমমালা স্বামীর নিকট এমন ব্যবহার পাইবে? এযে স্বপ্নের অগোচর!

হেমমালার কণ্ঠ শুষ্ক; তাহার মুখ দিয়া, কোন কথাই বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ পরে ধরণীধর বলিল, "আমি এখন যাই; তোমাকে এই কয়টী জিনিস দিয়া গেলাম তুমি ব্যবহার করিও। আমি মধ্যে মধ্যে আসিব।" আবেগে হেমমালার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু স্বভাবের দোষ যায় নাই। পতির সহিত আলাপ করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল।

ধরণীধর প্রস্থান করিল। হেমমালা তন্ময়চিত্তে জীবনের মধুময় ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে বগলা আসিয়া সস্নেহে বলিল, বৌদিদি, মাটীতে শুইয়া কেন? দাদাবাবু আজ এঘরে আসিয়াছিলেন দেখিলাম, তোমাকে কিছু বলিলেন কি? হেমমালা লজ্জিত হইয়া, উঠিয়া খাটে বসিল। এমন সময়ে বগলার সেই কাগজ বেষ্টিত জিনিসগুলির উপর দৃষ্টি পড়িল। সেইগুলি হস্তে লইয়া সে হেমমালাকে বলিল, এগুলি বুঝি দাদাবাবু দিয়া গেলেন? দেখ দেখি কি? হেমমালা আগ্রহে খুলিয়া দেখিল, একটি সুন্দর জাপান-বাক্সের ভিতর এক শিশি "কুন্তলীন", এক শিশি এসেন্স "দেল্‌খোস্", একখানি সুন্দর চিরুণী ও একখানা সুগন্ধি সাবান। বগলা হাসিয়া বলিল, বৌদিদি তোমার কপাল এবার ফিরেছে, দেখ দাদাবাবু আদর করিয়া তোমাকে কত সুগন্ধি দিয়া গিয়াছেন ; এস তোমাকে একটু মাখাইয়া দি। সে এসেন্সের শিশিটি খুলিয়া দুচারি ফোঁটা তাহার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল; হেমমালা সহাস্যে বলিল, এযে ফুলের গন্ধে মাতিয়ে দিল, যেন ফুলশয্যা আর কি! যা আর দিতে হবে না। বগলা তাহার গাল টিপিয়া

বলিল, না আমি আর দিব না, কাল দাদাবাবু নিজে আসিয়া দিয়ে দিবেন; তখন ফুলশয্যাটী ভাল ক'রে মাত্‌বে, না? কথাবার্তা কহিতে কহিতে বগলা ঘুমাইয়া পড়িল। হেমমালাও কত সুখের কল্পনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইল। স্বামীপ্রদত্ত সুবাসে ভূষিতা হইয়া না জানি সে কত সুখের স্বপ্নে সুখরজনী প্রভাত করিল!

কয়দিন যাবত হেমমালা বড়ই প্রফুল্ল। তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখা করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে দেখা করিবেন বলিয়াছিলেন; সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বড়ই আগ্রহের সহিত প্রতি রাত্রে অপেক্ষা করে।

বগলা প্রত্যহ বৈকালে পরিপাটী করিয়া, তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দেয়; দু'এক বিন্দু কুন্তলীনে সিন্দুর গুলিয়া, তাহার ললাট ও সীমন্ত শোভিত করিয়া দেয়। হেমমালার আশার বিরাম নাই। সে তেমনি প্রতিদিন তাম্বুলাধারটী সুমার্জ্জিত করিয়া সযত্নে তাম্বুলগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখে। তেমনি করিয়া প্রত্যহ অবসর কালে জানালায় দাঁড়াইয়া বহির্বাটির উদ্যানের দিকে চাহিয়া থাকে, যদি সহসা তাহার প্রণয়াস্পদের দেখা পায়। এইরূপে ৬/৭ দিন কাটিয়া গেল, অভাগিনীর আশা আর পূর্ণ হইল না।

একদিন মর্ম্মব্যথা গোপন করিতে না পারিয়া বগলাকে বলিল, কৈ আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন, আর ত আসিলেন না? বগলা বলিল, কি বলিব বৌদিদি সকলি অদৃষ্টের দোষ, নতুবা তোমার মত সুন্দরী গুণবতী মেয়ের এমন দশা হয়! দাদাবাবু যে কেন এমন হইয়া রহিলেন জানি না; রথের ধুমে কি আর তাঁর তোমাকে মনে আছে। রাজবাড়ীতে রাজকুমারের মহলে যে গান বাজনার ঘটা দেখিয়া আসিলাম, তিনিও সেখানেই মত্ত। এ সংবাদে হেমমালা অন্তরে বড়ই আঘাত পাইল। ধীরে ধীরে জানালার পাখিটী খুলিয়া ধাপের উপর বসিয়া পড়িল। অন্য মনে কতই কি ভাবিতে লাগিল, তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

এমন সময় গাড়ীর শব্দে তাহার চৈতন্য হইল; চাহিয়া দেখিল, ধরণীধর টলিতে টলিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বহির্বাটির নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ঘৃণিত দৃশ্য তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লইল। মনে মনে বলিল, যদি স্ত্রী হইয়া স্বামীকে সুপথে না আনিতে পারিলাম; স্বামী যদি আমা দ্বারা সুখী না হইয়া, ঘৃণিত কার্য্যেই সুখ পাইলেন; তবে আমার জীবনে ফল কি! আমি কেন এই সকল দেখিয়া জ্বলিয়া মরি! ইহাপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। সে অবসাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে সেখান হইতে জানালাটী বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল।

পরদিন দ্বি-প্রহরে ধরণীধর আহারে বসিয়াছেন। হেমমালা স্নানান্তে ভাণ্ডার গৃহের দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া, মাতাপুত্রের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। আহারান্তে ধরণীমাতা পুত্রকে তাম্বুল দিবার জন্য তাম্বুলাধারটী হস্তে লইয়া বধূর চতুর্দ্দশ পুরুষকে পর্যন্ত পরুষ ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। হেমমালা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ভাবিল, কি দুষ্কর্ম করিলাম! হেমমালার শ্বশ্রূ ডিবাটী আছড়াইয়া বলিলেন, " দেখেছ, জুয়াচোরেরা রূপার দান দিয়াছে! এযে পিতল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৌএর রূপ ধুয়ে কি জল খাইব? ছি! ছি! ভয় নাই

লজ্জা নাই, মায়ে ঝিয়ে গলায় দড়ি দিয়া মরুক; আমি কালই ছেলের বিয়ে দিচ্চি।'' বাটীর সকলে আসিয়া দেখিল, সত্যই ডিবাটী মার্জিত করিতে করিতে পিতল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সকলে অবাক, দেওয়ান মহাশয়ের চক্ষে ধূলা দেওয়া; কি সাহসী স্ত্রীলোক! এদিকে অর্থলোভে হেমমালার মাতুল যে বিধবার এমন সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একখানি গহনাও গিন্টির পাওয়া গেল; হেমমালার গঞ্জনার সীমা রহিল না। ধরণীধর তর্জন গর্জন করিয়া বলিল, ''বেটীর এত বড় স্পর্দ্ধা! হয়েছে কি, বেটীকে আদালতে দাঁড় করাইব।'' শুনিয়া ঘৃণায় ভয়ে হেমমালা মরিয়া গেল। ভাবিল সত্যই যদি ইহারা মাকে নির্যাতন করে, তা আর দেখিতে পারিব না; ইহার আগে পালাইতে হইবে। আর সহ্য হয় না; কত লোক দুঃখে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। আমারও যথেষ্ট হইয়াছে; আজ আফিং খাইয়া সকল জ্বালা দূর করিব।

অহিফেন সংগ্রহ করিতে তাহাকে অধিক কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। বৃদ্ধ শ্বশুরের অনুপস্থিতির সময় তাঁহার কক্ষে গিয়া, তাঁহার শয্যাতল হইতে অহিফেনের কৌটাটী লইয়া লুকাইল।

যখন সন্ধ্যার অন্ধকার, পৃথিবীকে ঢাকিতেছে; তখন মরণের ভীষণ অন্ধকার, হেমমালাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। হেমমালা অতি আগ্রহের সহিত জীবননাশক পরিমাণ অহিফেন ভক্ষণ করিল। নির্বাক বধূ এতদিন যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছিল, তাহা আজ অসহ্য হইয়াছে। স্বামীর দুর্ব্যবহার, শ্বশ্রূর কটূক্তি, মাতার অদর্শন, তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লইল। সে শান্তির আশায় নিজেকে স্বহস্তে মৃত্যুর পদতলে টানিয়া লইয়া, যেন চিরশান্তিদাতার শরণাগত হইল।

দিবসের ব্যাপারে সকলেই নিন্দাচর্চায় ব্যাপৃত; সমস্ত দিবস, কেহই হেমমালার সন্ধান করে নাই কর্ত্রীর ভয়ে বগলাও তাহার কক্ষের সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। অনেক রাত্রে যখন গৃহিণী বিশ্রামার্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন বগলা উপবাসিনী হেমকে আহারকরাইবার জন্য চেষ্টা করিতে আসিল।

হায়! কাহাকে আহার করাইবে। এতক্ষণ নীরবে মৃত্যু যাতনা ভোগ করিয়া হেমমালা অচেতন। তাহার চক্ষুতারা স্থির। চতুর্দশ বর্ষীয়া স্ফুরিত যৌবনা বালিকার লাবণ্যে দেহ ঢল ঢল করিতেছে; আজ আর সে চাঁদমুখ অবগুণ্ঠনাবৃত নহে। কিন্তু হায়! সুগৌব কমনীয় বদন বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

বগলা এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া, ভূমিতে লুটিয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শব্দে বাটীর সকলে সেই কক্ষে একত্রিত হইল। হেমমালার অপঘাত মৃত্যু দর্শনে, সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কিন্তু রাক্ষসী শ্বশ্রূর অন্তরে আঘাত লাগিল না। তিনি গালে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন; ''মুখে কথাটী ছিল না, কিন্তু অন্তরে বিষম রাগী না হইলে কি এমন হয়? অভাগীর মেয়ে বিষ খেয়ে মরিবে তা জানিতাম না; আমি আর উহাকে কি অন্যায় বলিয়াছিলাম, এতেই বিষ খাওয়া! একালের মেয়েদের চাল চরিত্রি বুঝা ভার!''

হেমমালাব সুখ-দুঃখভাগিনী স্নেহময়ী দাসী বগলা, পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দাবাক্রীড়ামত্ত ধরণীধর যখন সহসা হেমমালার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে কঠোরস্বরে বলিল; "তুই এই নির্দ্দোষী বালিকার হন্তা।" সে ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

তখন হেমমালার প্রাণপাখী সুন্দর দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে! কিন্তু তার বিষাদক্লিষ্ট করুণ নয়ন দুটী, কাহাকে দেখিবার জন্য যেন বড় আগ্রহভরে চাহিয়া আছে! বুকের ভিতর যে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, লজ্জাশীলা বধূ যেন গুরুজনের নিকট তাহা গোপন করিবার জন্য ভূমিতে বুক দিয়া চাপিয়া আছে!

আত্মীয় স্বজনগণ যখন সেই লক্ষ্মীরূপার ক্ষুদ্র দেহখানি সৎকারার্থ উঠাইয়া লইল, তখন সকলে সাগ্রহে দেখিল; হেমমালা একটী বাক্স অতি যত্নে বুকে করিয়া আছে। হতভাগ্য ধরণীধর চাহিয়া দেখিল, সেটী তাহার প্রদত্ত সেই উপহার! সেই জাপান বাক্সে সেই কুন্তলীন ও এসেন্স দেল্‌খোসের শিশি ইত্যাদি; সেই সকল উপহার সামগ্রী। অভাগিনী সেই কয়টীকে বুকে করিয়া, যেন মৃত্যুযাতনা শমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে! আহা! তাহার ঐ ভিন্ন প্রেমাস্পদ বস্তু ত পৃথিবীতে কিছুই ছিল না।

ধরণীর অন্তরে শতবৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে নির্ম্মল প্রেমের নিদর্শন সেই কয়টী জিনিস উঠাইয়া লইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। আজ হতভাগ্য বুঝিল, যাহা পাইলে হৃদয় শান্ত হয়, সেই মহামূল্য রত্ন পবিত্র প্রেম সে হারাইল! এতদিন যাহা চাহিয়া দেখে নাই, আজ তাহা তাহাকে ফেলিয়া পলাইল। তাহার অদৃষ্টে শান্তির আশা ঘুচিল। হতভাগ্যের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না।

যখন সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা চিতায় বিসর্জ্জন করিবার জন্য,—"হরিবোল" শব্দে বাটীব বাহির করা হইল; তখন সকলে অন্তঃপুরের একটী কক্ষে হৃদয়বিদারক "মা, মা" ধ্বনি শুনিতে পাইল।

কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে হেমমালার দেহ চিতাশয্যায় শয়ন করিল। এক মাস পূর্বে এমনি সময়ে স্বামীপ্রদত্ত সুবাসে ভূষিতা হইয়া, পালঙ্কে শয়ানা নিদ্রিতা হেমমালা কত সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিল!

'কুন্তলীন'—১৩০৫

পেনে প্রীতি

স্বর্ণকুমারী দেবী

আমরা এখন টুরে ফিরিতেছি; অর্থাৎ ঘুরে বেড়াইতেছি, বেদিয়া জাতির জীবন যাপন করিতেছি। আজ কোনো এক গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষ ছায়া সঙ্কুল নিস্তব্ধ বিজন ক্ষেত্রস্থল আমাদিগের বস্ত্রাবাস মণ্ডলী এবং সিপাই সান্ত্রী ভৃত্যাদিবর্গে পরিবৃত হইয়া জাগ্রত যমালয় হইয়া উঠিল, সেখানে আবেদন পত্রধারী গ্রাম্যলোকের দলে দলে সমাগম চলিল; শুষ্ক বিবর্ণ চিন্তা-পীড়িত আসামী নীরব বেদনায়, ফরিয়াদীর ক্রোধ ও ঈর্ষাজনিত অব্যক্ত আস্ফালনে, উভয় পক্ষীয় উকিল মোক্তারের বক্তৃতা কলরবে, এবং একই সাক্ষীর তিন তিন বার নামডাক চীৎকারে বনতল ব্যথিত কম্পিত হইতে লাগিল, আবার দুদিনে সমস্তই অন্তর্ধান। প্রান্ত প্রদেশ পূর্ববৎ বিজনতা বক্ষে ধারণ করিয়া একাকী ধ্যাননিমগ্ন, আর আমরা আমাদের গড়া বাস ভাঙ্গিয়া, ভাঙ্গাবাসা পুনর্বার গড়িতে, কভু ক্ষেত্র, কভু প্রান্তর, কভু চড়াই, কভু উৎরাই, কভু সজল, কভু শিলাকঙ্করময় শুষ্ক নদী গহ্বর দিয়া সমান অগম্য পথে, বিষম ঝাঁকানি খাইতে খাইতে অন্যত্র টঙ্গায় ধাবিত। ইহাই ক্যাম্প লাইফ। আয়াস আছে বলিয়া ইহাতে আয়েসও আছে। নিত্য নবদৃশ্য, বিশ্ব তাই বড় মধুর, নিত্য নব গতিতে স্থিতিটুকু অতীব শান্তিজনক। অন্যান্যরূপ সুখস্বচ্ছন্দতারই বা এখানে অভাব কি। ভৃত্যগণ অবিরাম আরাম জোগাইয়া চলিয়াছে। আমরা নূতন কোনো জায়গায় যাইব, আমাদের একদিন বা একবেলা পূর্বে অধিকাংশ তাম্বু ও আসবাব দ্রব্যাদি গোরুর গাড়ির উপর বোঝাই দিয়া সিপাহী এবং তাম্বু বাবুর্চি খানসামা একদল, নির্দিষ্ট স্থানে আড্ডা বাঁধিয়া, আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে চলিল, আমরা পরে সেখানে পৌঁছিয়া সমস্ত পাইলাম। আমাদিগের শেষ পরিত্যক্ত তাম্বু প্রভৃতি লইয়া অন্য ভৃত্যদল পরে আসিতেছে। অসুবিধার মধ্যে ভৃত্য এবং ভ্রমণসরঞ্জাম এজন্য কিছু অধিক সংখ্যায় রাখিতে হয়।

এইরূপ অ্যাসিস্টেন্ট কলেক্টরগণ এদেশে বৎসরে সাতমাস ধরিয়া বনচারী যদি বা হন বিজনচারী, হেড কোয়ার্টার ছাড়িয়া এ কয়মাস কাল ইঁহাদিগকে সাবডিভিসনের গ্রামে গ্রামে অধীনস্থ ক্ষুদ্রতম কর্মচারীটি হইতে উচ্চপদ মামলাদারের পর্যন্ত রাজকার্য তত্ত্বাবধান এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রামনিবাসীগণের আর্জি গ্রহণ করিয়া সর্বতোভাবে ডিস্‌ট্রিক্‌টের সুবিচার রক্ষায় ভ্রমণনিযুক্ত থাকিতে হয়। বৎসরের অন্য পাঁচ মাস বৃষ্টির কাল, সেজন্য সেই সময় তাঁহারা হেডকোয়ার্টরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপাতত এই সঙ্গে ইহাদিগের আর একটি কার্য বাড়িয়াছে।

প্লেগের তদারক, তাহার সংক্রামক কোপপ্রশম সংকল্পে সুনিয়ম প্রচার এবং সেই সকল নিয়মবলী যাহাতে পালিত হয় তদ্দর্শন, ইঁহাদের অধুনাতন একটি প্রধান কর্তব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সাব ডিবিসন প্রান্ত শব্দে অনুবাদিত, ইহা হইতে অ্যাসিস্টেন্ট কলেক্টরগণ প্রান্ত সাহেব নামে অভিহিত। অনুবাদ কি সুসঙ্গত?

কোলাবা ডিসট্রিক্ট বম্বে শহরের খুবই কাছে, আলিবাগ ইহার হেড কোয়ার্টার। আলিবাগ সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, বম্বে সহর হইতে স্টীমারে এক ঘণ্টার পথ মাত্র। আমি অতি অল্প দিন এ ডিসট্রিক্টে আসিয়াছি, একমাসও এখনো হয় না, আসিয়া অবধি ইহার পদপ্রান্তেই ঘুরিতেছি। তবে মন্‌সুন্ সন্নিকট, শীঘ্রই মাথায় চড়িব এরূপ আশা করিতেছি। প্রতি গ্রাম ছাড়িয়া সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছি; এখন পেনে আসিয়াছি, এখান হইতে বম্বের তোপ দেখা যায়।

কলিকাতা হইতে একটানা মেল ট্রেনে কল্যাণ জংশনে পৌঁছিতে প্রায় ৪৪ ঘণ্টা লাগে। সেখান হইতে ভিন্ন লাইন ধরিয়া আরো দুই ঘণ্টার মধ্যে কর্জৎস্টেশনে নামিয়া একখানি ডগ্‌কার্টে ওঠা গেল। গাড়িতে উঠিবার অবসরটুকুমাত্র দিয়া, তৎযোজিত ঘনঘোর লোহিতকান্তি (Bay) সুচিক্কণ, সুগঠন, সুদর্শন আরব্যাশ্ব মুহূর্তে কেশরগুচ্ছ বিকম্পিত, বক্রগ্রীবা স্ফীত করিয়া, সুবঙ্কিম সুঠাম পদক্ষেপণে বায়ুগতিতেই যেন ধাবিত হইয়া দুই চারি মিনিটের মধ্যে এক নিভৃত নিকুঞ্জতলস্থাপিত বস্ত্রাবাসমণ্ডলীর নিকট আমাদিগকে আনিয়া ফেলিল।

প্রায় মাইল ধরিয়া আম্রকানন, নিবিড় নহে, বৃক্ষদল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিভক্ত ও বিরাজিত হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ভ্রমণপথ রাখিয়া গিয়াছে। কাননের এক প্রান্তে সুনির্মিত গ্রাম্যপথ, অন্যপ্রান্ত অবধি জলপূর্ণ নদী; নদীর তীরে একদিকে কর্জুতের গ্রাম্য শহর, অন্যদিকে স্থানে স্থানে কুটীরাবলী; দূরে চতুর্দিকে ছবির মতো পাহাড় চিত্র। কাননাভ্যন্তরে এক একটি তরুচ্ছায়াতলে আমাদিগের এক একটি তাম্বু স্থাপিত, ইহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নয়; আফিস, আফিসের লোকদিগের ঘর, ভৃত্যদিগের ঘর স্নানাগার, রন্ধনশালা আমাদিগের দুইজনের স্বতন্ত্র শয়নকক্ষ প্রভৃতিতে এই আবাসকুঞ্জ বহুদূর বিস্তৃত। এখানে পদার্পণ করিবামাত্র সুকণ্ঠ পক্ষীগণ শাখার মধ্যে লুকাইয়া তাহাদের এক শান্তিনিকেতনে আমাদের স্বাগত করিয়া লইল; কি এক অমৃতময় ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

বনতলে একটি বস্ত্রছাউনির মধ্যে একাকী এই আমার প্রথম শয়ন। পূর্বেও এই বম্বে প্রেসিডেন্সিতেই অল্পদিন তাম্বুবাস করিয়াছি, কিন্তু এরূপ একাকী স্বতন্ত্র তাম্বুতে রাত্রিবাস করি নাই। আমার তাম্বুটি খুব ছোট এবং অন্যগুলি হইতে খানিকটা তফাতে। ছায়াবহুল গাছ বাছিয়া তাহার নীচে তাম্বু খাটাইতে হয়, এই কারণে আমার তাম্বু অন্য তাম্বু হইতে অল্পবিস্তর দূরে পড়িয়া যায়। রাত্রিকালে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে জনমানবের ত্রিসীমায় আছি, ইহা বুঝিতে পারি না; পরিপূর্ণ বিজনতার মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া সহসা স্নায়ু প্রণালীতে কি এক প্রকার নূতনতর অনুভূতির ক্রিয়াতরঙ্গ সঞ্চারিত হইয়া আবার মিলাইয়া পড়ে; চিরাভ্যস্ত মনুষ্যশ্বাস নিঃশ্বাস পূর্ণ বদ্ধ প্রাসাদভবনে তাহার রঞ্জিত কড়ি বরগা, মার্জিত মেজিয়াতল, কাষ্ঠময় দ্বার, বাতায়ন ও প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে দেখিতে গিয়া তরুলতা শুষ্ক তৃণময় স্তব্ধ মাঠের অন্ধকার ও আকাশের শান্ত ম্লান তারকালোক নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। দ্বিতল ত্রিতল গৃহের পরিবর্তে, ভূমির সমতলে একাকী আপনাকে খট্টাঙ্গ শায়িত দেখিয়া প্রথমে কেমন যেন একটি বিস্ময় বিভ্রমভাবে সমস্ত ভুল হইয়া যায়, পরে

ঈষৎ আতঙ্কে যেন দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে। ক্রমশ সম্পূর্ণ জাগরণে এই অজ্ঞাত আতঙ্ক স্পষ্ট আশঙ্কায় পরিণত হয়। কোনো বন্য পশু গৃহে প্রবেশ করিয়া যদি আক্রমণ করে এইরূপ ভয় হইতে থাকে। কিন্তু চারিদিকের পরিপূর্ণ শান্তিময় নিস্তব্ধতায় সে ভয় ধীরে ধীরে অতি শীঘ্রই আবার নিদ্রাবিলুপ্ত হইয়া পড়ে। বলিব কি এতদিন তাম্বুবাস করিতেছি একটি শৃগালের ডাক পর্যন্ত শুনি নাই।

কর্জতে আমরা ছয়দিন ছিলাম। মধ্যাহ্ন হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত সেখানে কি ভয়ানক গরম হইত। উষ্ণ বাতাস দেহের যেখানে স্পর্শ করিয়া যাইত মনে হইত যেন ফোস্কা পড়িতেছে। এই শান্তিকাননের সহিত বিদায় গ্রহণের সময়ও তাই শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। এখন মনে হয় গরমের সময় তাম্বুর পর্দা কেন ফেলিয়া দিতাম না। ক্রমশ শিক্ষা লাভ করিতেছি। কর্জৎ হইতে চৌক্ ছয় মাইল, চৌক্ হইতে (Panuel) পানুয়েল ১২ মাইল। আমরা দুই রাত্র চৌকের বাঙ্গলায় বাস করিয়া এক রাত্র পানুয়েল কাটাইয়া পরে পেনে আসিয়াছি। চৌকের বাঙ্গলাটি বেশ উচ্চ স্থানের উপর। ইহার চারিদিকে গোলক চাঁপার গাছ, নিষ্পত্র গাছের শাখায় শাখায় থরে থরে ঝাঁকে ঝাঁকে কেবলি ফুল, গাছতলা পর্যন্ত ফুলে ফুলে ঢাকা। প্রবল বাতাসে সেই ফুলদল উড়িয়া উড়িয়া আমাদের পূজা লইয়াই যেন বারান্দায় আসিয়া জমা হইত।

পানুয়েলের চিঠিপত্রাদি বহিয়া সমুদ্রখালের যে বন্দর হইতে স্টীমার বম্বে যাতায়াত করে, সেই বন্দরের নাম উলুয়া বন্দর, ইহা পানুয়েল হইতে ৭ মাইল দূরে। উলুয়া গ্রামের পুরাতন অংশ এখন কি শোচনীয় শেষ দৃশ্যময়। গ্রামকে গ্রাম শূন্য পরিত্যক্ত; ভগ্ন কুটীরের মৃত্তিকা প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট, প্লেগের প্রাদুর্ভাবেই ইহার এইরূপ দশা। কয়েকখানি অবরুদ্ধ সুন্দর বাঙ্গালা দেখিলাম—শুনিলাম একসময় একদিনের জন্যও খালি পড়িয়া থাকিত না। তৎসংলগ্ন বহুদূর-বিস্তৃত আম্র কাননে অসংখ্য আম ফলিয়াছে, বৃক্ষরাশি ফলভারে যেন অবনত; কিন্তু সে সকল ফল ভোগ করিবে কে কে জানে? দেখিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

পানুয়েল ও পেনে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম; বাড়ি, ঘর, দোকান প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র শহরতুল্য। এমন কি রাস্তায় কলের জল, দীপ আছে, পানুয়েলে আমরা যেখানে ছিলাম, আর পেনে গ্রামপ্রান্ত যেখানে আছি, ইহার মধ্যে পথব্যবধান ২২ মাইল। যাতায়াতে মধ্যে দুই বার দুইটি জল পার হইতে হয়। পানুয়েল হইতে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রথম জলের নিকট পৌঁছিলাম। শুনিয়াছিলাম জল এখানে খুবই কম, ঘোড়া ইহার উপর দিয়া পায়ে চলিয়া যায়। কিন্তু তীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম বিপরীত; সুবিস্তৃত সুগভীর ভরা নদী কূলে কূলে ছাপিয়া স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে। টঙ্গায় পার হইব কিরূপে? তখন জানিলাম আসলে ইহা নদীই নহে, সমুদ্রের খোলা জোয়ারে বড় নদীর মতো জলে ভরিয়া উঠে; ভাঁটায় নাবিলেই ঘোড়া মানুষ স্বচ্ছন্দে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হয়। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন ভরা জোয়ার একজন কৌপিনধারী প্রবীণ মাঝির সহিত কথা কহিয়া জানা গেল পাঁচটার আগে এ জলে গাড়ি যাইবে না। আমরা একটার সময় তীরে আসিয়াছি

তাহা হইলে আর ৪ ঘণ্টা কাল এই রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে হইবে। সে বড় সুখের কল্পনা নহে। আমাদিগের বিপন্নভাব দেখিয়া মাঝি বলিল, "পার হইবে নৌকায় চল না, টঙ্গা ঘোড়া সবই পার করিতেছি।" দেখিলাম নিতান্ত ক্ষুদ্র একখানি ডোঙ্গা তীরের জলে ভাসিতেছে। দেড় হাত পরিসর হইবে কিনা সন্দেহ, লম্বায় হাত আষ্টক হইতে পারে। এই নৌকায় টঙ্গা ঘোড়া সব পার করিবে। প্রান্তসাহেব অবিশ্বাসজনক বিস্ময় দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিলেন। সে তাঁহার অবিশ্বাস বুঝিয়া সদর্পে গম্ভীরভাবে কহিল, "বড় বড় বয়েল ও বয়েল গাড়ি আমি অনায়াসে পার করি", তথাপি টঙ্গা পারের হুকুম না পাইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিতান্ত নিষ্পরোয়াভাবে অদূরে গাছের তলায় গিয়া তামাকু টানিতে বসিল। তাহার ভাবটা এই "ভাল পরামর্শ দিলাম শুনিলে না আচ্ছা সেই ৫টা অবধি এখানে বসিয়া থাক না, আমার ত ভারি গরজ"। তাহার সেই খাতিরনদারৎ ভাবটা লাগিল ভাল, আমার ত মনে হইল ইহার হাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। তাহা ছাড়া ৫টা পর্যন্ত তীরে বসিয়া থাকাটাও কিছু বিশেষ লোভনীয় নহে; আমাদের আপনাদের মধ্যে একটু কথাবার্তা হইবার পর টঙ্গাওলাকে বলা গেল, "মাঝিকে বল নৌকায় টঙ্গা পার করুক", তাহারা গাড়ি ভাসাইতে গেল, আমি কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ঐটুকু ছোট ডিঙ্গিতে অতবড় গাড়ি উঠায় কিরূপে। দেখিলাম অতি সহজ, গাড়ি ঠেলিয়া তাহার দুই চাকার মধ্যে নৌকাখানি প্রবেশ করাইয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল, তাহার পর টঙ্গাওয়ালা উঠিয়া গাড়ি ধরিয়া বসিলে, মাঝি তাহার বাঁশের লগী ঠেলিয়া নৌকা ওপারে লইয়া লাগাইল। তখন এত জল যে একবাঁশে ঠাঁই পাওয়া যাইতে ছিল না। নৌকা চলিবার সময় গাড়ির দুইচাকা, নৌকার দুইটি চাকার মতো ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া পার করা ইহা হইতেও সরেস। ঘোড়ার মুখের লাগাম নৌকার মাঝির হাতে রহিল, ঘোড়া দুইটি নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। সর্বশেষে আমরা পার হইলাম।

এ সমস্তক্ষণের মধ্যে মাঝিকে একবার গাম্ভীর্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। কিন্তু ওপারে গিয়া প্রান্তসাহেব বক্‌সিস্ সমেত মেহনতি যখন তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তখন সহসা আত্মবিস্মৃতি জন্মিল, ছেলেমানুষের মতো গালভরা হাসিতে তাহার আকর্ণ কুঞ্চিত হইয়া পড়িল।

ইহার পর আরো একবার ডিঙ্গিতে সমুদ্রখানা পার হইয়া দুইবার টঙ্গা চক্রে দুইটি ছোট নালা উত্তীর্ণ হইয়া ঘোড়াকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত দুইবার সেই রৌদ্রে পদব্রজে দুইটি চড়াই পথ ভাঙ্গিয়া অবশেষে ২২ মাইল পথ ৫ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে পেনে আসিয়া পড়িলাম।

এখানে আমাদের বাসক্ষেত্রে আসিয়াই প্রথমে নজরে পড়িল একটি ভাঙ্গা কুটীর; কুটীরখানি আমাদের তাম্বুর এত কাছে। শুনিলাম এখানে কোনো ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিত; একজনের প্লেগ হওয়াতে সকলকেই গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে; এখন কুটীরের এই দশা, তাহাদের দশা কি হইয়াছে কে জানে:

এখানেও আম্রনিকুঞ্জতলে আমাদেব বসবাস; কিন্তু কর্জতেব ন্যায় ইহা পরিষ্কার

সুমার্জিত নিকুঞ্জকানন নহে। এই শুষ্কক্ষেত্রে প্রান্তরের সর্বত্রই প্রায় লাঙ্গল চষা উচ্চ নীচ ভূমি; এক পা বাড়াইতে শুষ্ক তৃণগুল্মে তাহা আটকাইয়া যায়। তরুরাজি এখানে অসংলগ্ন অসম্বদ্ধভাবে যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত; এক একটি আম গাছ বহু পুরাতন, প্রকাণ্ড ও বহুল শাখাকাণ্ডে বিপুলাকার, তাহার এক একটি সুবিস্তৃত শাখার নীচে সুবিশাল ছায়া। গাছগুলি পরগাছায় ভরা, কোনটি বা বৃহৎ অশ্বত্থ তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এত আম গাছের মধ্যে মোটে দুই চারিটির মধ্যে আম ঝুলিতে দেখিলাম, আর সবে মাত্র এ ক্ষেত্রে যে একটি কাঁঠাল গাছ তাহা কাঁঠালে কাঁঠালে ভরা। এখানে নানা জাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষী নাই, শ্যামা দয়েলেরই ডাক সারাদিন শুনিতে পাই, এমন বনতল কোকিল পাপিয়ার গীতরবে ধ্বনিত হইয়া উঠে না। এখন শুক্লপক্ষ, হঠাৎ দুইদিন হইতে সন্ধ্যার ম্লান জ্যোৎস্নায় একটি পাপিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, ডাকিয়াই আবার নীরব হইয়া পড়ে, বুঝি তাহার প্রতিধ্বনি গীতি শুনিতে পায় না বলিয়া। কর্জতের ন্যায় এখানেও এই ক্ষেত্রস্থলের এক প্রান্তে গ্রাম্যপথ অহরহ গোরুরগাড়ির চক্রঘর্ষণে শোষিত, নিনাদিত, আর অন্য প্রান্তে নদী, কিন্তু কর্জতের সে ভরা নদী নহে, ইহা শিলা কঙ্করময় শুষ্ক গহ্বর সার। দূর দূরান্তর প্রসারিত এই শুষ্ক গহ্বরের কদাচ কোনো অংশে একটুখানি জলের চিহ্ন দেখা যায়; কোনো শিলাতলে বা একটুখানি জল গুপ্তভাবে বিরাজিত। এপারে ওপারে পরস্পর হইতে দূরদূরান্তরসংস্থিত দুইচারিখানি করিয়া যে কুটীর গৃহ দেখা যাইতেছে, তাহার লোকেরা এই গুপ্তস্থানের সন্ধান জানে।

পেনে আসিয়াছি বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক রহিত, পেনে হইতে এই বিজন ক্ষেত্রস্থল প্রায় দুইমাইল দূরে; কিন্তু আমি ইহাকেই পেনে বলিয়া জানি। নাগরিক সুবিধা স্বচ্ছন্দ আয়েস বিলাসের চিহ্নমাত্র এখানে নাই, তথাপি লোকালয় চিহ্ন আছে। একদিকে সুদূরব্যাপী মাঠ, অন্যদিকে স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমোন্নত শ্যামকান্তিশূন্য শুষ্ক শৈলমালার পদপ্রান্তে, বৃক্ষে, চূড়ায় পর্যন্ত স্থানে স্থানে কুটীর। এবং এই পার্বত্য দুর্গম পথেও এক একখানি গোরুর গাড়ি মাঝে মাঝে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগ্রামের কোন একখানির উদ্দেশ্যে চলিয়াছে দেখা যায়। সাহস দেখিয়া অবাক হইতে হয়। রেল গাড়ির গতি সুনির্মিত যন্ত্রগঠিত মসৃণ পথে, আর গোরুর গাড়ির গতি সম অসম সুগম দুর্গম সর্বস্থানে। কাহার কার্যকারিতা অধিক বলা দুঃসাধ্য।

এ দেশে কাটকরী বলিয়া একরূপ আদিম অসভ্য জাতি আছে, পাহাড়চূড়ার বিরল কুটীরগুলি তাহাদেরই বাসস্থান। ইহারা সভ্যজাতির সংস্রবে বড় একটি আসিতে চাহে না, মাঝে মাঝে কেবল কাষ্ঠ ফলমূল প্রভৃতি বন্যজাত দ্রব্যাদি শহরে বিক্রয়ার্থ আনে। তীর ধনুকে বন্যপশু শিকার করিয়া প্রায় ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

নদীর ধারে উচ্চপাড়ে একটুখানি বেশ মসৃণ বেড়াইবার স্থান আছে। আমি রোজ বিকালে ঐখানে বেড়াইতে বেড়াইতে শৈল প্রদেশস্থিত দূর দূরান্তর বিক্ষিপ্ত ঐ কুটীরগুলির প্রতি চাহিয়া ভাবি—এখানেও লোক আছে। কে জানে কোনো অজ্ঞাত অনুপম সুকোমল রূপচ্ছায়ায় এই নীরস শুষ্ক রুদ্র কঠোরতাও তাহাদের নেত্রে সুকুমার কমনীয় কান্তিতে বিভাসিত কি না? কে বলিবে, কোনও সুদুর্লভ স্নিগ্ধ সুধাসিঞ্চিত হইয়া এখানকার শত

অভাব, শত অসুখ লইয়াও তাহারা পুলক পরিপূর্ণ কি না?

আমার পার্শ্বদেশে যূথিকার ন্যায় আর একরূপ বনফুল এক বৃন্তে রাশি রাশি ফুটিয়া দুলিতে থাকে, দুলিয়া দুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া যেন উত্তরে কহে "এখানকার এই রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে সুকোমল সুখ কি চাহিয়া দেখ"।

খাতা একখানি কোলে, কলমটি হাতে লইয়া তাম্বুর মধ্যে আরাম চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছি, কি লিখি; অনেক দিন হইতে গল্প লিখিতে অনুরুদ্ধ, লিখিতে ইচ্ছাও খুব, কিন্তু শূন্য মস্তিষ্ক মন্থনে বিষামৃত কিছুই উঠাইতে পারিতেছি না, নিরাশচিত্তে মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া আছি, দেখিলাম পুষ্পগুচ্ছ হস্তা, পীতবসনা এক মহারাষ্ট্রী কন্যা। এই আম্রনিকুঞ্জতলে প্রবেশ করিয়া অদূরে তাম্বুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একজন সিপাহী তাহাকে আমাব তাম্বু দেখাইয়া কি বলিল, সে প্রফুল্ল হরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে ইহার দ্বারবর্তী হইয়া হঠাৎ একটু যেন থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর হাস্যমুখে সেলাম করিয়া ফুলের তোড়াটি আমাকে সমর্পণ করিল। দেখিলাম বালা কিশোরী, শ্যামা সুবদনী ললিতা। তাহার সুকোমল সহাস্য আনন, তাহার সুহাবভাব, এমন কি ফুল সমর্পণে তাহার সেই যে ভঙ্গীটি তাহাতে পর্যন্ত আমার প্রীতি উৎপাদন করিল। কেবল তাহাই নহে, আমাকে দেখিয়া লজ্জাবতী লতাটিব মতো সহসা সে যে একটু বিষম কুণ্ঠিতভাব ধারণ করিয়াছিল, পরিচিত প্রার্থিতের স্থলে অপরিচিত অজ্ঞাত মূর্তি দর্শনে তাহার যে একটুখানি হতাশা জন্মিয়াছিল, তাহা পর্যন্ত আমার ভাল লাগিল। আমি ফুল লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা থেকে ফুল নিয়ে এলে?" সে বলিল, "গাঁ থেকে!" অবশ্যই গাঁ থেকে; এই ক্ষেত্র প্রান্তরের ত্রিসীমায় গোলাপ বেল প্রভৃতি কাননফুলের চিহ্নও দেখিতে পাই না। কিন্তু "কোন গাঁ থেকে? গাঁ কি আছে? ও পাবে?" ভাবিয়াছিলাম নিকটের গ্রাম হইতেই আসিয়াছে। সে বলিল, "অনেক দূরে"—আর কিছু জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া ও অতঃপর অভিবাদনপূর্বক চলিয়া গেল। প্রান্তসাহেব প্লেগ তদারকী হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহাকে বলিলাম, "একটি মেয়ে একটি ফুলের তোড়া এনেছিল," তিনি সাগ্রহে বলিলেন "নিয়েছ ত?" "ঐ যে টেবিলের উপর।"

"তার সঙ্গে ভাল করে দু-চারটে কথা কইলে? শুনেছি বেচারা অনেক দূর থেকে ফুল আনে।"

"তা অবশ্য কইলুম। কিন্তু আমাকে নতুন দেখে সে যেন একটু থম্‌কে গেল। পুরানো লোকের হাতে ফুলটি দিতে পারলেই যেন বেশি খুশি হত।"

"সত্যি নাকি?"

"আমি কি ঠাট্টা করছি? ও মেয়েটি কে? কেন ফুল আনে?"

আমাকে তিনি চেনেন, এক জন গরীব ফুল বিক্রেতার সম্বন্ধে এইরূপ অপরূপ প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, বুঝিলেন ইহার মধ্যেই কোন একটি কল্পনা-শিখরের অনেকদূর উঠিয়াছি। হাসিয়া বলিলেন—

"বলতে পারছিনে ও মেয়েটি কে?"

"তা যেন নাই পারলে, কিন্তু ফুল দেয় কেন—তার উত্তর?"

"ওদের ফুলের বাগান আছে বলে।"

"ফুলের বাগানতো অনেকেরই আছে।"

"ভাগ্য ফেরে এই ব্যক্তিটিই কলেক্টরের ফুল জোগাত। নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের কোনরূপ নির্বন্ধ ছিল না?"

"কিন্তু কোন নির্বন্ধে"—

"আমাকে জোগাচ্ছে; সেটা নির্বন্ধ নয় নিতান্তই বিধির বিপাক। একদিন ব্যক্তিটি কলেক্টরকে ফুল দিতে এসে দেখলে আমি এখানে তাদের ছবি তুলছি, আমাকেও একটি দিলে।"

"সেই বাড়তিটি বুঝি? রোজই ওর হাতে যেন একটি তোড়া দেখি, বোধহয় অন্য কাউকে দেবার জন্য নিয়ে আসে, এখান থেকে সেখানে যায়।"

কিংবা নদীর জলে মানৎ ভাসাবার জন্যেও নিয়ে আসতে পারে; যে জন্যই আনুক আমার জন্য অবশ্য আনেনি।"

"তা কি করে বলা যায়। সে দিন হয়ত শুনেছিল"—

"হ্যাঁ শুনেছিল! একটি কাজে আগের দিন নেমে এসেছি, পরদিন চলে যাব, এই দু-একদিন মাত্র কলেক্টরের অতিথি; এ খবরটা অমনি গাঁ রাষ্ট্র হয়ে গেল।"

"তা বুঝি হতে পারে না?"

"পারে? তবে হয়েছিল। ফুলগুলি আমার উদ্দেশ্যেই যদি সেদিন গুচ্ছাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাতেই বা এত দুঃখ কি।"

"সুখ হবারই ত কথা।"

"তা যদিও হচ্ছে না। বক্সিসটা দিয়ে যাওয়া হয়নি—তাই মনে মনে একটু অপরাধী আছি!"

"এবার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সহজেই হবে।"

"হ্যাঁ এবার ত আমাকে কলেক্টরের পদবীতে বসিয়ে রীতিমত খরিদ্দারভুক্ত করে ফেলেছে। যাহোক বেচারা অনেক দূর থেকে ফুল আনে, ওকে একখানি ভালো কাপড় দিও, তার উপর আর যা দাও", বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম—তা যেন দেব, কিন্তু সবই মিথ্যা। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা কিছুই নয়। সুন্দরী মালিনীর ফুলোপহারে মধুর সুন্দর কোন ভাবেই বিজড়ন নাই। পয়সার জন্য এ শুধু ফুল বিক্রয়।' অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। প্রান্তসাহেব মিথ্যা আঁচেন নাই, আমি সত্যই ইতিমধ্যেই বাতাসে মস্ত প্রাসাদ ফাঁদিয়া বসিয়া ছিলাম। প্লেগ সম্বন্ধে ইহার খুব সুনাম আছে জানি। এখানে অবশ্য অল্প দিন আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্বেই যেখানে ছিলেন সেখানে ইহার সকরুণ যত্নে গরীব গ্রামবাসীগণ কিরূপ বশীভূত ছিল সে গল্প শুনিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিয়া, সেই ভিত্তির উপর ঐ ভগ্ন কুটীরে— প্লেগ শুশ্রূষা নিরত এই বিপন্ন বালিকা, এবং তাহার বিপদভঞ্জন পুরুষপ্রবরকে, ঔপন্যাসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গাঁথিয়া, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই ফুলোপহারে গরীব ফুলওয়ালীর কৃতজ্ঞতারূপ অসীম হৃদয়বিভব উৎসর্গীকৃত দেখিয়া

মনে মনে দিব্য আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম। ভ্রম সংশোধনে তাই বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া ফুলওয়ালীব সম্বন্ধে এত যে কৌতুহল, এতটা যে ভাবোচ্ছ্বাস, কল্পনা ভঙ্গে সে সমস্তই যে শুধু শূন্যে বিলীন হইল এমন নহে, অধিকন্তু তাহার প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জন্মিল যে পরদিন তাহার মুর্তির মাধুর্য-বৈশিষ্ট্যটুকু পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। অন্নচেষ্টারত সাধারণ গ্রাম্যকন্যার ভাব ধরিয়াই সে আত্মার নেত্রগোচর হইল।

তথাপি ভদ্রতার নিয়ম সর্বস্থলেই অভঙ্গনীয়, আমি তৎপ্রদত্ত ফুলগুচ্ছ হস্তে লইয়া পূর্ব দিনের মতই সাদরে বলিলাম—

"চমৎকার ফুল? বাগান তোমার নিজের হাতে?"

সে সেলাম করিয়া বলিল, "না সাব, মালী আছে, আমরা শুধু দেখি।"

"বাড়িতে তোমার কে কে আছে?"

"মা।"

"আর কেউ নেই তোমার।"

"আছে। বিদেশে।"

"ফুলবিক্রীতে যা পাও তাতে তোমাদের বেশ চলে?"

"না আমাদের ধানের ক্ষেত আছে।"

"ফুল কি তুমিই রোজ বাজারে বিক্রয করিতে নিয়ে যাও?"

সে ইহার উত্তরে কোন কথা কহিল না, কেবল জিহ্বা ও তালুকার সংস্পর্শে একরূপ শব্দ করিয়া জানাইল, বাজারে ফুল বিক্রী করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে অপমানজনক। আমি ভাবিলাম স্বার্থকুশল যুক্তিতে মানুষ কিরূপ যুক্তির বিরোধী। বাজারে ফুল বিক্রয় করিতে যাওয়া যদি অপমানজনক হয় তাহা হইলে এখানে বিক্রয় করিতে আসাই বা অপমানের নয় কিসে? বলিয়াও ফেলিলাম "এখানে যে আস তবে" সে তাম্বুর স্তম্ভে ঠেসান দিয়া নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। এই নীরবতা তাহার লুক্কায়িত গুপ্ত রহস্যের সন্ধান করিয়া দিল, আমার স্বাভাবিক কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তুমি বাজারে যাও না; আর একলাটি ছেলেমানুষ এতদূর ফুল বিক্রী করতে এস; তাতে তোমার মা কিছু বলেন না?"

"তিনি জানেন না।"

"তিনি জানেন না? তুমি নিজে লুকিয়ে আস? কেন?" সে একটু ইতস্তত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার যাহা বলিবার আছে বলিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমি তাই বিশেষ অনুনয়ের ভাবে মিষ্ট করিয়া বলিলাম।

"বল না, বল, তাতে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। আমিও খুব খুশি হব।" সে বলিল—

"যদি তার দেখা পাই, দেখতে।"

"কার?"

"প্রান্তসাহেবের।"

কি আবার আজগুবি কথা। আস্পর্ধাও কম নহে—যদিও আমি নিজেই পূর্বে প্রান্তসাহেবের সহিত এ বিষয়ে কৌতুক করিয়াছি, কিন্তু এখন ভারি রাগ ধরিল, অথচ কি বলিব হঠাৎ জোগাইল না। সে আমার ভুল বুঝিয়াই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কহিল—

"এ প্রান্তসাব নন; আর একজন।"

"কে তিনি?"

"আমার বোনের স্বামী।"

"তিনি প্রান্তসাহেব? বিলাতফেরত মহারাষ্ট্রী বুঝি?"

"না ইংরেজ।"

ইংরেজ। কিছুদিন পূর্বে একজন পারসি ইঞ্জিনীয়ার আমাদের ক্যাম্পে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি এদেশের উচ্চ পদধারী গভর্নমেন্ট কর্মচারীদিগের নানারূপ গল্প করিতেন, তন্মধ্যে দু-একজনের সম্বন্ধে 'নেটিভ' বিবাহ রহস্যের কথাও বলেন। ফুলওয়ালীর কথায় তাই আমার দ্বিগুণ কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম—

"ইংরাজ তোমার ভগিনীপতি, তোমরা ত হিন্দু?"

"না মুসলমান। আমরা বিজাপুর নবাবকন্যার বংশ।"

মুসলমান। কিন্তু ঠিক হিন্দু কন্যারই বেশ। ইহার আগে আমি এদেশে মুসলমানী দেখি নাই।

নবাব বংশীয় হউক নাই হউক সে যে ভদ্রবংশীয় তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল। হাবভাব কথাবার্তা ধরনধারণ সবেতেই একটি কৌলীন্য মর্যাদা প্রকাশ পাইতেছিল বটে। আমি বলিলাম—

"তোমার দিদিকে তিনি কি করে জানলেন?"

"আমার বাবা তাঁর সিপাই ছিলেন, মরবার সময় আমাদের ভার তাঁকে দিয়া যান।"

"তখন তোমার দিদির বয়স কত?"

"ষোল। দিদিকে প্রান্তসাব পুনার স্কুলে দিয়েছিলেন সেখানেই দেখাশুনা হত।"

"বিয়ে হল কতদিন পরে?"

এক বছর পরে পুনাতেই। তারপর এই পেনেই। তারপর এই বনেই এই বাগানে প্রান্ত সাহেব দিদিকে নিয়ে এসেছিলেন, আমরা সবাই এসে দেখা করলাম। সেসব কথা আমার খুবই মনে আছে।"

"তখন তোমার বয়স কত?"

"সাত বৎসর। মা আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "সাহেব— তোমার জন্যে আমাদের জাতকুল গেল, আমার এ মেয়েকে এখন ভাল লোকে বিয়ে করবে না, একটিকে তুমি নিয়েছ। এটিকেও নাও, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"তিনি কি বললেন?"

"তিনি তাঁর বৌদির কাছে আমাকে টেনে নিয়ে আমার চুলে হাত দিতে দিতে বললেন—এখন এর বিয়ে কি? এখনো খুব ছোট।"

"তা ঠিকই বলেছিলেন।" ফুলওয়ালী আমার কথা না শুনিয়াই আপন মনে কহিয়া গেল।

আমার হাতে একটি ফুলের তোড়া ছিল, আমি সেইটি তাকে দিয়ে বললেম,—"বড় হলে বিয়ে করবে?"

"তিনি কি উত্তর দিলেন?"

"তিনি হেসে আমাকে চুমো খেয়ে বললেন—'করব'। বলিতে বলিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। আমি তাহার দুঃখের কারণ ঠিক উপলব্ধি না করিয়া কহিলাম—"দিদিকে বুঝি খুব ভালবাসতে! তারপর দেখাশুনা হয়েছে?"

"না তাঁরা সেই যে চলে গেলেন আর আসেন নি। দশ বৎসর থেকে আমি তাঁদের পথ চেয়ে আছি, এখানে তাম্বু পড়লেই তাদের দেখব প্রত্যাশা করে আসি।"

"ফুল বুঝি তাদের জন্যই আন?"

"হ্যাঁ তাঁদের জন্য এনে অন্যকে দিয়ে যাই।"

"তা দেও কেন? ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই হয়।"

"কি ছুতায় তাহলে ফের এখানে আসব যাব? যেটি তাঁরই জন্যেই মনে করে আনি সেটি ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

ফুলওয়ালীর বাড়তি তোড়ার ইতিহাস এতক্ষণে পাওয়া গেল। বলিলাম, "কি কর সেটি?"

"বাবার গোরের উপর রেখে দিই।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, সে কহিল, "রোজ ফিরে যাই, রোজ মনে হয় পর দিন তাকে দেখব, সাহেব লোকদের কাছে কত বন্ধুলোক আসেন, এক দিন তিনিও ত আসতে পারেন।" বহুবচনে ছাড়িয়া সে দেখিলাম এইবারে একবচনে আসিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ত কথা কহা চলে না, কি তবে বলি; বলিলাম, "তোমার বয়স এখন সতের না?"

"হ্যাঁ সাহেব।"

"এখনো বিয়ে হয় নি?"

সে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কি করে হবে; তিনি ত আসেন নি এখনো।"

বালিকার মনের কথা এতক্ষণে সমুদয় বুঝিলাম। সে তাহার ভগিনীপতির উপহাস বাক্য অঙ্গীকাররূপে হৃদয়ে গাঁথিয়া তাহাতে নিজে অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভ্রান্তময় সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি জান না ইংরাজেরা এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না; আর শ্যালিকে বিয়ে করার নিয়মও তাদের মধ্যে নেই।"

"তিনি মুসলমান। দিদিকে বিয়ে করার জন্য মুসলমান হয়েছিলেন। আমাদের বংশে ত অন্য বিয়ে হবার যো নেই।"

বিয়ে করার জন্য মুসলমান হয়েছিলেন। সম্প্রতি বিগামির চার্চে যে সিলন সিভিলিয়ান গবর্নমেণ্ট কর্তৃক কর্মচ্যুত হইয়া বিলাতে দরখাস্ত করিয়াছেন তিনিই কি তবে ইহার ভগ্নিপতি? তিনিও ইংরাজ পত্নী থাকিতে মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহকরেন, কিংবা

ভুলিতেছি; প্রথম বিবাহিতা মুসলমানী ভার্য্যাত্যাগ করিয়াই বুঝি পুনরায় স্বদেশীয়া ভার্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই দ্বিজ'তি দ্বিপত্নী পরিণযের পর্যায় পরস্পরার আবৃত্তিতে আমার ভুলচুক হউক, কিন্তু মূল ঘটনাটি সত্য। উক্ত শোচনীয় পরিণাম—ফুলওয়ালীকে কহিয়া তাহার মনঃক্ষোভ জন্মাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি শুধু জিজাসা করিলাম, "তিনি কি সিলন সিভিলিয়ান হইয়া যান?" সে বলিল, "সে কোথা? আমি জানি না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভগিনীপতির নাম কি?"

সে যাহা বলিল সিলন সিভিলিয়ানের নামের সহিত মিলিল না। সম্ভবত তবে এ আর একজন—যদি না ইহারা নাম বিকৃত করিয়া থাকে। আমি চুপ করিয়া এ সম্বন্ধেই ভাবিতেছি-- সে সহসা বলিল, "সাব একটি আর্জি আছে।"

"কি বল।"

"প্রান্ত সাহেব তসবীর তোলেন—না।"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর তসবীর এঁর কাছে আছে কি?"

হাসিয়া বলিলাম "এ প্রান্তসাহেব চার বৎসর এদেশে এসেছেন তাও তুমি বলছ্ তোমার প্রান্তসাব ১০ বছর এখানে আসেন নি?"

"অন্য জায়গায় ত দেখা হতে পারে?"

"তা বটে, কিন্তু ইনি ও নামের কাউকে চেনেন বলে আমি ত জানিনে। জিজ্ঞাসা করব এখন।"

সে বহুদিন হইতে ভবিষ্যতের মুখপানে চাহিয়া নিরাশ, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য পর্যন্ত আবার ধৈর্য ধরিতে চাহিল না, বলিল, "সাব, প্রান্ত সাহেবের ছবিগুলি একবার আমাকে দেখান না।" আমি তাহাতে অসম্মত হইবার কোন কারণ না দেখিয়া সিপাইকে ডাকিয়া তাহার টেবিল বইতে ছবিগুলি আনিতে আদেশ করিলাম। জানিতাম তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে, কিন্তু কি করিব।

সিপাই ছবির রাশি আনিয়া আমার শয্যায় রাখিয়া চলিয়া গেল। ফুলওয়ালী আমার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই সোৎসুকে একের পর একে ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একেবার বিস্ময়ে আহ্লাদে "এই এই" করিয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ছবির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার মুখের দিকে লক্ষ করিতেছিলাম। তাহার কথায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম প্রান্তসাহেবের ছবির সঙ্গে দুচারখানি রং জ্বলা ফটোগ্রাফ রহিয়াছে, সেগুলি সেই পার্সি ইঞ্জিনীয়ারের সম্পত্তি, তিনি একদিন আমাদের দেখাইবার জন্য বাক্স হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহার পর দেখিতেছি ভুলিয়া ফেলিয়া গেছেন। সেই ছবিরই একখানি দেখিয়া সে হর্ষবিহ্বল হইয়া উঠিল, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "সাব, আমাকে এইখানি দিতে হুকুম হোক।" আমি বলিলাম, "ছবিখানি আমাদের নয়, আমাদের একজন বন্ধুর, তিনি ফেলে গেছেন। আচ্ছা তাঁকে চিঠি লিখব; যদি তিনি দিতে বলেন ত তোমাকে দিব।"

সে বলিল, ‘‘কবে টের পাব সাব্?’’

‘‘কাল বা পরশুই উত্তর পাওয়া যাবে।’’

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ছবিখানি রাখিল। শয্যার উপর অন্যান্য ছবিগুলির সহিত একত্রে না রাখিয়া আমার ক্ষুদ্র বেতের টেবিলটির উপর সেখানি রাখিয়া তাহার বাড়তি ফুলের তোড়াটি তাহাকে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় দিনে নহে, আজ চতুর্থ দিনে পার্সি সাহেবের উত্তর পাইয়াছি, তিনি ছবিখানি লইতে বলিয়াছেন। আমি তাই আগ্রহ সহকারে ফুলওয়ালীর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। সে প্রতিদিন তাম্বু প্রবেশ করিয়াই সাভিবাদনে সর্বাগ্রে ঐ প্রশ্ন করে;—উত্তরে হতমান হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আমার ফুলের তোড়াটি আমাকে দিয়া অন্যটি ছবির পদপ্রান্তে রাখিয়া সজল নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকে। তাহার পর মুখ তুলিয়া আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে সেলাম করিয়া চলিয়া যায়।

ঐ সে আসিতেছে। তাহার ফুলের রূপে, তাহার নিজের রূপে ফুল্লপ্রভাত ফুল্লতর করিয়া ঐ সে চঞ্চল চরণে আসিতেছে। এই তাম্বু প্রবেশ করিয়া সাভিবাদনে আমার নিকট দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, আমি তাহার হৃদকম্পন অনুভব করিতেছি।

আজ সে প্রথমেই ফুলের তোড়াগুলির যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল ‘‘খবর পেয়েছেন আর?’’ আমি বলিলাম, ‘‘পেয়েছি, ছবিখানি তোমার।’’

তাহার নয়নে, আনন্দে কি সানন্দ উদ্ভাসিত হইল, সর্বাঙ্গে প্রীতিপুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠিল, সেই তরঙ্গাবেগ আমাকেও স্পর্শ কবিতেছে। সে মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার নীরব কৃতজ্ঞতা অভিবাদন অধিকতর মর্মগ্রাহী। তাহার সে সুখে আমি কেমন দুঃখিত হইয়া পড়িলাম—ভাবিলাম কি অপরূপ ঘটনা। এই যৌবনবতী রূপবতী রমণী কি ঐ নির্জীব ছবিখানির দর্শনে পূজায় আপনার জ্বলন্ত জীবন্ত শত প্রাণবন্ত অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা চিরসমাধিস্থ করিবে?

ফুলওয়ালীর মুখে এরূপ কোন দুঃখের ছায়াও দেখিলাম না। প্রীতিময়ী রমণী তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত মিলাতেই যেন অসীম প্রীতিপূর্ণ হইয়া অঞ্চল হিল্লোলে দিগদিগন্তে সে আনন্দ প্রীতি বিস্তার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শুষ্ক নীরস কঠোর পেন কাহাব রূপে নবীন সরস সুকোমল। এখানকার শত অভাব, শত অসুখ কোন স্নিগ্ধতা সিঞ্চনে পুলক প্রচ্ছন্ন তাহা আমি এইবার হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

‘ভাবতী’—১৩০৬

প্রভাময়ী

সরোজিনী চৌধুরী

প্রদোষের ধূসর অঞ্চল সংসারকে আবৃত করিয়াছে। দূরে ভাগীরথীর তীরস্থিত শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে, দিবাকরের রক্তিমচ্ছায়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। নীলতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে রক্তিম তপনের প্রতিবিম্ব, স্তরে স্তরে গঠিত সুবর্ণস্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। গগনমণ্ডল প্রায় মেঘ নির্ম্মুক্ত। কোথাও ক্বচিৎ দুই একখানি শুভ্র হইতেও শুভ্রত্তর মেঘ, সুনীল সাগরবক্ষে ভাষমান তুষার শৈলের ন্যায়, ইতস্ততঃ প্রভাবিত হইতেছে। মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণ বিটপীপত্র কাঁপাইয়া, লতা বল্লরীর কোলে প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি দুলাইয়া, জাহ্নবীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া সেই ঊর্ম্মিরাশির তালে তালে নাচিতেছে। পাঠক পাঠিকা! ঐ শুন, ভাগীরথীর কলধ্বনি কেমন মধুর। আবার ঐ দেখ, কলনাদিনী ভাগীরথীতীরে, ঐ ফুল্ল কুসুমের ন্যায়, বালক বালিকা দুইটী এক মনে এক সাথে কি করিতেছে,—কেমন পল্লব কোমল হস্তে ফুলের মালা গাঁথিতেছে। ওই কচি কচি হাতগুলির চেয়ে কি ওই ফুলগুলি বেশী কোমল? বালকের মালা গাঁথা, হইল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বালক বলিল "দেখ? আমার মালা গাঁথা তোমার আগে হইয়াছে।" বালিকা তাহার সরল বড় বড় চক্ষু দুইটী তুলিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বালকের মালা গাছটীর প্রতি চাহিল। সে দৃষ্টি বড় মধুর! তাহা জটিল ঈর্ষার কটাক্ষ না হইলেও সরলতাময় ক্ষোভব্যঞ্জক। তাহার পর বালিকা সেই পটল চেরা চক্ষু দুটাতে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল," তা আর হবে না, তুমি যে আমার কত আগে মালা গাঁথা আরম্ভ করেছিলে!" বালক।—তা" ত বুঝলাম, আমার মালা কেমন ভাল হয়েছে দেখেচো? তোমার ত আর এমন হচ্ছে না।" ক্রমশ এইরূপ কথায় কথায় একটা ছোটখাটো রকমের বিবাদ বাধিল। বালিকা রাগ কবিয়া অর্দ্ধ গ্রথিত মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। বালক হাসিতে হাসিতে নিজের মালা ছড়াটা বালিকার কবরীতে পরাইয়া দিল। বালিকার মুখে এবার হাসি ফুটিল। দুজনে ছিন্নমালার ফুলগুলি লইয়া একটা একটা করিয়া ভাগীরথীর জলে ভাসাইতে আরম্ভ করিল। বালিকা বলিল, "দেখ এবারে আমার ফুলটী কেমন সকলের আগে ভাসিয়া চলিয়াছে।" বালক হাসিয়া বলিল, "বা! মজা যে"। বালক আর কিছু বলিল না। তাহার বয়স অধিক হইলে সে হয়ত বালিকাকে বলিত, "আচ্ছা এবারে তোমারই জয়।"

এইরূপে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইল। বিধুকর বিধৌত নির্ম্মল গগনে অযুত নক্ষত্র হাসিল। অদূরে দেবালয় হইতে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। বালিকা বলিল, "চল রাত হয়ে এলো, বাড়ী যাই।" উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল। একটি চৌমাথার উপরে যাইয়া বালক বলিল, "আমি তবে চল্লাম।" বালিকা— "এসো না, আমাদের বাড়ী হয়ে যেও।" বালক—"না তা'হ্লে মাষ্টার মহাশয় এসে বসে থাকবেন। কাল সকাল বেলা আবার যাব।"

এই বলিয়া বালক বিদায় লইল। বালিকাও চৌমাথার অনতিদূরে একটি দ্বিতল বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল।

২

যোগেন্দ্র বাবু পাটনার একজন ধনী জমিদার। পল্লীগ্রাম অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই পাটনা শহরের বাড়ীতে বাস করেন। প্রথমা স্ত্রীর পরলোক গমনের পর ইনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব পক্ষের একমাত্র বালিকা কন্যা প্রভাময়ীর সহিত, পূর্ব্বে আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। প্রভার সহিত আমাদের যখন প্রথম দেখা হয় তখন প্রভার বয়স মাত্র ৮ বৎসর।

প্রভার সঙ্গী সেই বালকের নাম বিমল। ভাগীরথীর তীরে যখন বিমলের সহিত পাঠক পাঠিকার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম। বিমলের পিতা পরলোক গত দীনেশবাবু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ভূসম্পত্তিতে প্রায় হাজার বারশ টাকা বাৎসরিক আয় ছিল। বিমল পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়। অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে তাহার লক্ষ্মীরূপা মাতৃদেবীও ইহলোক ত্যাগ করেন। বিমল এই শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইল।

দীনেশবাবু যখন পাটনায় বদলি হইয়াছিলেন, সেই সময় সহরের উপর একটা পাকা বাটী ক্রয় করেন। পিতৃস্বসা ও একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিমল পাটনা স্কুলে অধ্যয়ন করে।

৩

খেলা ধূলায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। প্রভার বয়স এখন একাদশ বৎসর। বিমলের ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের বালোচিত সরল ভালবাসা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে চলিল। সুতরাং ক্রমে উভয়ের দেখা শুনা একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। উভয়ের মনে এখন পরস্পরের জন্য কেমন এক রকমের ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভার এখন আর সে সরল, মধুর হাসি নাই। সে এখন মনের ভাব গোপন করিতে শিখিয়াছে। বিমলের এখন আর সে সদানন্দ ভাব নাই।

প্রভার অদৃষ্ট যোগ বিমাতা তাহারপ্রতি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। প্রভা যদি এখনও বিমলদের বাড়ী যাইত, তাহা হইলে বিমাতার অম্ল মধুর বাণীর ভাণ্ডার প্রভার কল্যাণে কিছু শূন্য হইত। প্রভা সহাস্য মুখে যাইয়া বিমাতার আঁচল ধরিত, কিন্তু প্রভার দুর্ভাগ্য বশতঃই, বিমাতা ঠাকুরাণীর সেই চির অসন্তুষ্টমুখে ভুলিয়াও হাসি ফুটিত না। প্রভা কিন্তু সুযোগ পাইলেই বিমলদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইত। বিমলও মধ্যে মধ্যে প্রভাদের বাড়ী আসিত।

যোগেন্দ্র বাবু স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আশৈশব কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। প্রভার বিমাতার ইহাতে সনাতন অসন্তোষের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ তিনি সরস্বতীর কৃপায় 'ক' অক্ষর লিখিতে তিনটা কলম ভাঙ্গিতেন। সুবিধামত

তাঁর কল্পনাকুশল মনের সাহায্যে, প্রভাময়ীর নানারূপ নিন্দার সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেন। বিমাতার এরূপ আচরণেও, প্রভা তাঁহার সহিত কোন দিন বড় করিয়া কথাটা কহে নাই।

যোগেন্দ্রবাবুর ইচ্ছা বিমলের সহিত কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু প্রভার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়া, বিমল যোগেন্দ্র বাবুর অশেষ গুণবতী স্ত্রীর কুটিল কটাক্ষে পড়িয়াছিলেন। ঐ নিমিত্ত যোগেন্দ্র বাবুর মানস সিদ্ধির পক্ষে একটা কঠিন রকমের কণ্টক সৃষ্টি হইল। যোগেন্দ্র বাবু স্ত্রীর নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, স্ত্রী বলিলেন, "ও ছেলের যে রকম সকম, তাহাতে ও যে কালে ভাল হবে, বোধ হয় না; তবে তোমার মেয়েকে তুমি দুঃখী করিবে; আমি বাধা দেই কেন! তবে যদি আমার মত চাও, আমি বলি এ বিবাহে ভবিষ্যতে ভাল হইবে না। ঘরে শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাই, ইহাওত দেখিতে হইবে?" স্ত্রীর শেষের যুক্তিটা যোগেন্দ্র বাবুর মনে বড় ধরিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়া বা প্রভা সুখী হয়, এই জন্য প্রভার হিতাকাঙ্ক্ষিনী বিমাতার এত যুক্তিতর্ক। প্রভার অদৃষ্ট অলক্ষ্যে নিষ্ঠুর হাসি হাসিল।

৪

সন্ধ্যা হইয়াছে। পাটনার পার্শ্বদেশ ধৌত করিয়া পুতসলিলা ভাগীরথী কল কল নাদে ছুটিয়াছে। ভাগীরথীর তীরে অগণিত সৌধমালা, সহরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ইহারই একটা দ্বিতল গৃহে ফুল্লকুসুম সদৃশ একটা বালিকা, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে, ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ শোভিত জাহ্নবী বক্ষের প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। ওই ভাগীরথীর শ্রুতি সুখকর। জলকল্লোল কি বালিকার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছিল? বালিকা জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু সে স্থির ধীর উদাস নেত্রযুগল দেখিলে বোধ হয় না যে, বালিকার দৃষ্টি কোন বিশেষ পদার্থের উপর পতিত হইয়াছে।

তবে কি বালিকা আকাশের দিকে চাহিয়া আছে! জড় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, ওই অপার্থিব দৃষ্টি কি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে? সে দৃষ্টি কালোচিত নহে, গভীর চিন্তাপূর্ণ।

সহসা প্রকোষ্ঠে কে প্রবেশ করিল। প্রভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইল। দেখিল, বিমল আসিয়াছে। সে গম্ভীর মুখখানিতে একটু হাসি দেখা দিল। বিমল ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, "প্রভা অমন এক মনে কার কথা ভাবছিলে! যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার কথা কি?"

প্রভা। "যাও তোমার ত কেবল ঐ কথা।"

বিমল। "তবে অমন করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে যে?" বিমল প্রভার বামকপোলে একটি মধুর করাঘাত করিলেন। পাঠক পাঠিকা, তোমরা কি তাহাকে "আঘাত" বলিতে চাও!

৫

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সময় বড় নির্দয়। এক দণ্ডও বসিয়া থাকিতে পারে না।

তাহা যদি পারিত, তবে কত লোকের সুখের স্বপ্ন এমন সহসা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাদিগের জীবনকে এমন চির অবসাদময় করিতে পারিত কি?

প্রভার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। হরিদাসপুরের জমীদার প্রতুল রায়ের পুত্র কিরণচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবে ইহাই নির্ধারিত হইল।

বিমল শুনিলেন বরের নাকি অশেষ গুণ। বিদ্যায় দিগ্‌গজ! মদিরাদেবীর প্রিয় শিষ্য। ভাবিলেন, ''প্রভা আমার হইল না ইহাতেও তত কষ্ট পাইতাম না, কিন্তু প্রভা এমন পশুর হাতে পড়িল, ইহা সহ্য হয় না। বিধাতা প্রভার কপালে এত দুঃখ লিখিয়া ছিলেন!''

প্রচুর সম্পত্তিলোভে যোগেন্দ্র বাবু প্রভাকে এমন অকূল পাথারে ভাসাইবেন, তাহা বিমল কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল না। বিমল সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

৬

একদিন অপরাহ্নে প্রভা নিজের প্রকোষ্ঠে একাকী পালঙ্কের উপর বসিয়া একখানি চিঠি লিখিতেছিলেন দুই, তিন খানি ছিঁড়িয়া অবশেষে একখানিতে লিখিল। ''বিমল তুমি বলিয়া গিয়াছিলে আজ আসিবে, কৈ কতক্ষণ, যে গেল''। এমন সময় বিমল পা টিপিয়া টিপিয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া প্রভার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় সামান্য পদশব্দ হইয়াছিল। প্রভা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বিমলকে দেখিয়া অমনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া চিঠির কাগজ খানি বস্ত্রান্তরালে লুকাইয়া উঠিয়া দাড়াইল। সেই বিষাদ গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু উভয়েই নীরব। বিমল ভাবিলেন প্রভা এখনও তেমনই হাসিতেছে। তবে কি অভাগিনী এখনও বিবাহের কথা জানিতে পারে নাই।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিমল বলিলেন, ''প্রভা, তুমি চিঠিতে যাহা লিখিতেছিলে তাহা কিন্তু আমি দেখিয়াছি। তুমি কি, এখনও কিছু শুনিতে পাও নাই?'' প্রভা যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে হাসি অধরের প্রান্তে মিলাইয়া গেল। ভীত কম্পিত স্বরে প্রভা বলিল, ''কৈ শুনি নাই শীঘ্র খুলিয়া বল, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।'' বিমল তাহাকে সে বিষম সংবাদ দিলো। প্রভার সকল শরীর কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। প্রভা ভাবিল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে! প্রভার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া আসিল। কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত বিমলের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমল অদৃষ্টের দোহাই-দিয়া প্রভাকে অনেক বুঝাইলেন। সংসারে যে দুঃখ সহিত পারে সেই সুখী তাহাও বলিলেন। কিন্তু তাঁহারও গণ্ডদেশ হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভা আর কি থাকিতে পারে? দুই হাতে মুখ চাপিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কোমল হৃদয়ে আজ যে ক্ষত হইয়াছে তাহা আরোগ্য করিবার ক্ষমতা এ সংসারে কাহারও নাই। সে ক্ষত তাহার জীবনের সঙ্গী।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিমল অনেক কষ্টে প্রভার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

৭

ইহার পর কাল প্রবাহের অবিরাম গতিতে দুই বৎসর অতীতের অতল সিন্ধু জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রভা আজ বিবাহিতা। প্রভা সেই যে বিবাহের তিন মাস পরে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে তাহার পরে পিত্রালয় দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ শ্বশ্রূদেবী ছাড়িয়া দিতে বড় নারাজ কারণও আছে। পুত্রবধূ নিকটে না থাকিলে তাঁহার গালি গালাজপ্রিয়তা অথবা প্রভুত্ব প্রিয়তা মাঠে মারা যায়।

যাহা হউক প্রভা প্রায় দুই বৎসর হইল পিত্রালয়ে যায় নাই। পাঠিকা, প্রভা এখন আর সে প্রভা নাই। দিনরাত্রি ভাবিতে ভাবিতে প্রভার সোনার শরীর কালি হইয়া গিয়াছে। সে ভাসা ভাসা চোখ দুইটি কোটরগত হইয়াছে। তাহাতে আবার স্বামী উচ্ছৃঙখল চরিত্র; কোন দিন মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া কথাটীও বলেন না। শ্বাশুড়ীও কটু ভাষিণী।

প্রভার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। প্রভা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইল। অসুখের মধ্যেও প্রভা শ্বাশুড়ীর ভয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া কত কাজ করিত। সময় সময় এককাজ করিতে অন্য কাজ করিয়া ফেলিত। শ্বাশুড়ির নিকট কত বকুনি খাইত। এইরূপ অত্যাচার জ্বর ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের শক্তি আর প্রভার রহিলনা। অবশেষে কিরণ বাবুর খেয়াল হইল বৌয়ের জ্বর হইয়াছে বটে। এরূপ নিষ্কর্ম্মা একটা স্ত্রীলোককে এখন ঔষধ পত্র ও আহার যোগান কিরণ বাবুর নিকট বিরক্তিকর ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল। যোগেন্দ্র বাবুর নিকট চিঠি লেখা হইল, তিনি যেন অচিরে আসিয়া কন্যাকে লইয়া যান।

যোগেন্দ্র বাবু সহসা কন্যার এইরূপ পীড়ার সংবাদে মহাচিন্তিত মনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই প্রভাময়ীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তারেরা রকম সকম বুঝিয়া প্রভাকে নৌকাপথে পাটনা লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। যোগেন্দ্র বাবু একখানি নাতিবৃহৎ পান্সী ভাড়া করিয়া কন্যাকে লইয়া একজন ডাক্তার সমভিব্যাহারে পাটনা যাত্রা করিলেন।

৮

যেদিন প্রভার বিবাহ হইয়া গেল, সে দিন হইতে প্রভা পরের হইল সেই দিন হইতেই বিমল গৃহত্যাগী।

বিমল নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বারাণসী ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিমল ভাগীরথী তীরে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন সেই ভাগীরথী সেই একই কলকল নিনাদে সাগরের দিকে ছুটিয়াছে। আর আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে চন্দ্র কিরণ প্রতিফলিত হইয়া জাহ্নবীজলে অসংখ্য হীরকখণ্ড সদৃশ ভাসিতেছে। জাহ্নবী প্রাণের উচ্ছ্বাস ভরে সাগরের দিকে ছুটিয়াছে। সংসারের কোনও বাধা বিঘ্নইত তাহার সে গতি ফিরাইতে পারে নাই। তবে মানুষের প্রতি মানুষের প্রাণের গতি নির্দ্দয় সংসারের বাধা বিঘ্নে লক্ষ ভ্রষ্ট হয় কেন? বিমল ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইলেন। স্বভাবের সেই

রমণীয় সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয় বিমোহিত করিতে পারিল না। বিমল আজও সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই।

বিমল এইরূপ চিন্তামগ্ন চিত্তে ভাগীরথীর তীরে বসিয়া আছেন। এমন সময় সেই স্থানে একখানি নৌকা আসিয়া ভিড়িল। নৌকার ভিতর হইতে একটা ভদ্রলোক বাহির হইলেন। সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিবা-মাত্রই বিমল চিনিলেন—প্রভার পিতা যোগেন্দ্র বাবু। বিমল যোগেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। যোগেন্দ্র বাবু নৌকার উপর হইতে বিমলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যেন চেনা মুখ। অথচ ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। হঠাৎ সেই বিষন্ন মুখে বিস্ময় পূর্ণ হাসি দেখা দিল। নৌকা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিমলের হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিমল! এই সন্ন্যাসীর বেশে এতদিন কোথায় ছিলে?" বিমল লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার সেই দুই বৎসরব্যাপী জীবন কাহিনী বলিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখন এখানে কোথা হইতে আসিলেন? প্রয়োজনই বা কি?"

যোগেন্দ্র বাবু সকলকথা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে নৌকায় পাটনায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। বিমলের সেই বিষাদ গম্ভীর মুখে যেন আর একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। বিমল কি আর তীরে থাকিতে পারেন। যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। "যাও প্রভাকে দেখিয়া আইস" বলিয়া যোগেন্দ্রবাবু নৌকার ছাদে গিয়া বসিলেন। বিমল ভিতরে যাইয়া দেখিলেন প্রভা অজ্ঞানাবস্থায় বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। প্রভার সে সোনার কান্তি কালিমাময় হইয়া গিয়াছে। সে সুগঠিত সোনার দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে। সে আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু কোঠরগত—নির্মীলিত। সে দৃশ্য দেখিয়া বিমলের বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে প্রভার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সহসা প্রভা চক্ষু উন্মীলন করিল। বিমলের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষুতে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি প্রতিদিন এমন স্বপ্ন দেখি না কেন? ঠিক যেন সত্যি বলে বোধ হয়।" বিমল দেখিলেন প্রভা অত্যধিক জ্বরের যন্ত্রণায় অচিন্তপূর্ব্বব্যাপার স্বপ্ন মনে করিয়াছে। বিমল বলিলেন, "প্রভা, এ স্বপ্ন নহে, আমি সত্যই এখানে আসিয়াছি। জ্বরের গ্লানি বশতঃ এরূপ মনে করিতেছ।" প্রভার সেই রোগক্লিষ্ট মুখে বিস্ময়পূর্ণ হাসির রেখা ফুটিতে না ফুটিতে মিলাইয়া গেল। প্রভা সবিস্ময়ে একদৃষ্টে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাম চক্ষুর প্রান্ত দিয়া একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। পাঠক পাঠিকা, সে চিত্র অঙ্কিত করিবার শক্তি আমার নাই। তুমি হৃদয়ে অনুভব করিয়া লও।

৯

গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। আকাশে এক একটি করিয়া কত তারা ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখে ভাল কূল মিলিবে এই আশায় যোগেন্দ্র বাবুর পান্সীখানি সেই সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার বাম তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দক্ষিণের দূরবর্তী তীরের উপর

একখানি কৃষ্ণবর্ণ গ্রামের ছায়া গঙ্গার শান্তজলে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর বামের অদূরবর্ত্তী তীরের উপর ঘর বাড়ী কোথাও কিছু নাই সেই সন্ধ্যা অন্ধকার ভেদ করিয়া, যত দূর দৃষ্টি যায় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে।

নৌকার ভিতরে প্রভাময়ী মৃত্যু শয্যায় প্রভার শিয়রে বিমল অধোবদনে বসিয়া আছে, চক্ষু রক্তবর্ণ। লোকলজ্জা আজ তাঁহার হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত রাখিতে পারে নাই। বিমলের নিরাশ বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে মধ্যে মধ্যে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। শয্যার এক পার্শ্বে যোগেন্দ্র বাবু, অন্য পার্শ্বে ডাক্তার বসিয়া ঘন ঘন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন ও ২/১ মিনিট অন্তরই কি একটা ঔষধ দিতেছেন, কাহারও মুখে কথা নাই; সকলের মুখেই কি একটা ভয়ানক আতঙ্ক ও বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে, প্রভার চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ— নির্মীলিত। কেবল মধ্যে মধ্যে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কখন পিতার দিকে আবার কখন বিমলের দিকে চাহিতেছে। সে চাহনি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল।

এই ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন দেখিতেছেন?"

ডাক্তার বাবু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "অবস্থা ক্রমেই খারাপ দেখিতেছি। ভগবান কূলে আনিবেন এরূপ আশা দেখি না।"

প্রভা আর এক বার বিস্ফারিত চক্ষে পিতার দিকে চাহিল;—প্রাণের কত অপূর্ণ আশা সে দৃষ্টি ক্রমে বিমলের প্রতি স্থাপিত হইল। অনেকক্ষণ পর অতি ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে "যা—ই —" কথাটা শুনা গেল। চক্ষু নিমীলিত হইল। চিরদিনের জন্য সংসারের আলোক নিবিল। স্বর্গের প্রাণী আপনার আলয়ে ছুটিয়া গেল। বাহিরে মাঝিরা আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। দেখিল সেই বিরল নক্ষত্র সান্ধ্যগগনের একটা উজ্বল তারকা স্থান হইতে সবেগে ছুটিয়া আসিয়া দূরস্থিত গঙ্গা ও আকাশের সঙ্গম স্থলে মিশিয়া গেল। নৌকা তীরে ভিড়িল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার রজনীর গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল। গঙ্গার সেই শান্ত তীরে, আশ্বিনের সেই প্রথম রজনীতে সেই ঘন নৈশ তিমির ভেদ করিয়া চিতাগ্নি হূ হূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রভার শেষ চিহ্ন অনন্তে বিলীন হইয়া গেল।

'অন্তঃপুর'—১৩০৭

বনভোজন

শ্রীনি দেবী

মে মাসের প্রারম্ভে আমার ছুটি হইয়াছে। কলেজ বন্দ হইলে বাড়ী যাবার চেষ্টা। আবার মেডিকেল কলেজে ফাষ্ট সেকেণ্ড ইয়ারে (১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে) এই সময় ছুটি হয়। একবারে আমাদের সহপাঠীরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে গেলেন, আমি এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। আজ এক সপ্তাহ হইল বাড়ী আসিয়াছি, তবু প্রবাসের গল্প আর ফুরায় না। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে যতটুকু ডাক্তারী পাঠাদি, তাহাও বউ দিদি ও আমার ছোট বোন শেলির কাছে বল্‌তে হচ্চে। শেলির সম্পূর্ণ নাম শেফালি, কিন্তু আমরা "শেলি' বলে ডাকি, অবশ্য তার ছোট মুখে একটি কবিত্বের ছায়া প্রতিভাসিত হইত। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ঐ একটি ভগ্নী, তাই সকলে বলে 'তোমরা একে ভারি আদুরে মেয়ে করেছ।' শেলি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। আমার পিতা কুলীন ব্রাহ্মণ, তাই আমাদের মেয়ে বড় হলেও তত দোষ হয় না। কিন্তু এখানে তা নয়, আমরা পশ্চিমে থাকি, তাই পাত্রের অভাব আর গত বৎসর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মারা যাওয়াতে আরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। মা আমার দিদির অভাবে বড় কাতরা। এক বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু একদিনও পিতা মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ বৎসর বি, এল, পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বেনারসে প্রাক্‌টিস করেন ও পিতাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার সুযোগ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠা শেফালীর বিবাহই প্রধান অন্তরায়। ছোট ভাইটি মিড্‌ল ক্লাসে পড়ে। সেও আমার বড় অনুগত। আমরা সকলে ভাই ভগ্নী মিলিয়া শোকাতুরা মাতাকে সান্ত্বনা করিতে দিবানিশি চেষ্টা করি। মাকে অবসর পাইলেই মহাভারত ও রামায়ণের সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা গুলি শুনাই, কখন কখন সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাই। এই প্রকার আনন্দে ছুটির দিনগুলি শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইয়া যাইতেছে। একদিন শেলি বল্লে, 'এস, দাদা একদিন বনভোজনে যাই চল না।" বউ দিদি সৌৎসুক্যে তাহাভে উৎসাহ দিলেন। আমি বলিলাম "বেশত।" কিন্তু মাতার অনুমতির অপেক্ষা, বিশেষ আমরা তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে চাহি না। অথচ তিনি নির্জ্জনে থাকিতেই ভাল বাসেন। শেলির আগ্রহে মা বলিলেন 'আচ্ছা, তোমরা যেও, আমার কাল যাওয়া হবে না যেহেতু শ্বশুর মহাশয়ের বাৎসরিক তিথি, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।" সকলে তাহাতেই আনন্দে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। শেলি বল্লে "কাল না গেলে আমার যাওয়া হবে না, কাল শনিবারে আমার স্কুলের ছুটি আছে।" অগত্যা তাহাই স্থির হইল। এখন কথা কোথায় যাওয়া হবে।

বউ দিদি বললেন, "ভাই, আমি ঝুঁসি কখনও দেখি নাই, এইবার চল ওপারে নৌকা করে বেড়িয়ে আসি, দেশ থেকে এসে অবধি নৌকায় উঠিনাই।" সকলে তাহাতেই রাজি হইলেন। সেখানে গিয়ে বউদিদি রাঁধবেন আমরা খাব, ইহাও তাঁহার সঙ্গে ঠিক্ করা হলো, যেহেতু বউ দিদি মহাশয়া হাঁড়ি হেঁশেলকে বড় ভয় করিতেন। রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখলেই

চোক লাল হয়ে মাথা ধরিত। কিন্তু আজ আর তিনি পিছপা নন। আমার ছোট ভাই গুণনাথ সেও প্রস্তুত হইল। শেলির কথাই নাই,অধিকন্তু তাহার সঙ্গিনী নলিও সেই সময় আমন্ত্রিত হইলেন। নলিনী আমার পিতার বন্ধুর কন্যা, শেলির সমবয়স্কা ও সহপাঠিনী। আমরা পাঁচ জন বনভোজনের যাত্রী, ইহা ছাড়া একজন দাসী ও চাকর ও সঙ্গে যাইবে মা বলিলেন। কোন মতে রাতটা পোহাইল। সর্ব্বাগ্রে শেলি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া নলিকে আনাইয়া লইল। ক্রমে আমরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মা আমাদের আহারের সামগ্রী সকল গুছাইয়া দিলেন। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দারাগঞ্জের ঘাট পর্য্যন্ত গেলাম। সেদিনকার প্রাতঃকাল তত পরিচ্ছন্ন ছিল না, আকাশ যেন ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। মা একবার উপরদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাচ্চ, তোমরা, মেঘ করেছে যেন।" আমাদের যাইবার উৎসাহ এত বেশী যে সে কথার প্রতি আর কাহারও মনোযোগ হইল না। মহানন্দে আমরা যাত্রা করিলাম ও দারাগঞ্জেব ঘাটহইতে একখানি নৌকা করিয়া সকলে পারে চলিলাম। গুণা ঘড়ি খুলিয়া দেখিল বেলা ৯টা হইয়াছে, কিন্তু রবির নবীন ছবি গঙ্গাবক্ষে শোভিতেছে না। নৌকা তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রভাত পবন চপলমতি বালকের ন্যায় জাহ্নবীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ধরিয়া নাচিতেছে, কখন ঘোমটা খুলিয়া দিতেছে, কখন আঁচল খানি লইয়া দোলাইতেছে, গঙ্গাবধূর বীচিমালা যেন বঙ্গ কামিনীর অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় মতন যেখানে সেখানে ছড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে। দুধারে সৈকত তীরে আজ আর বেশী লোক জনের সমাগম নাই। পক্ষিগণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া নীড় ছাড়িয়া উঠিতেছে না। আমরা সকলে সূর্য্যদেবের অভাবে যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। বউদিদির আর সে হর্ষোৎফুল্লতা দেখা যাইতেছে না। শেলি নলিও চুপ করিয়া বসিয়া কেবল নৌকার গতি, জলের তরঙ্গ, পবনের রঙ্গ ও মেঘের গম্ভীর বদন দেখিতেছে। মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বায়ু প্রতিকূল নহে। ক্রমেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। নৌকা ঘাটে লাগিল, আমরা সদলে নামিলাম ও কিছুদূরে গিয়া একটি বাগানে বৃহৎ বকুল বৃক্ষতলে বসিলাম। দাসী ও চাকর আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। শেলি নলি বউদিদির সঙ্গে গেল ফুল তুলিতে। আমরা দুই ভাই উদ্যানের পার্শ্বস্থ একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলাম। গঙ্গাতীরের উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে এক খানি বাড়ী, কিন্তু প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন। একখানিতে যত ফকির সাধু আসিয়া আশ্রয় লয়, অপরটিতে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও শিষ্যেরা বাস করে ও তদুপরিস্থ ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে একটি কূপ, শুনিলাম ইহা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলিয়া ইহার জল বিখ্যাত। সেই কূপের সন্নিকটে একটি ছোট খাট ফুল বাগান। ক্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলার সহিত ভাব করিয়া বাবাজীর নিকটে গেলাম। বাবাজী একখানি মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট ও শীর্ণকায়, বয়স পঞ্চাশতের কম নহে। প্রশান্ত মূর্ত্তি। আমাদিগকে ইঙ্গিতে বলিলেন, এ সময় কেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ? পরে অন্যান্য অনেক প্রকার উপদেশ পূর্ণ আখ্যান কহিলেন। বাবাজীর গৃহে একটি সেতার ও কতকগুলি পুরাতন পুঁথি গেরুয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শিষ্যজি কহিলেন গুরু ইচ্ছামত গীতা আবৃত্তি করেন। ইহার পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ইচ্ছা হইল সহযাত্রীদিগকে ফিরিবার সময় দেখাইয়া লইয়া যাইব। সেখান হইতে

ফিরিয়া দেখি, বাগানে মহা ধুম, বউদিদির হাতে হাঁড়ি। শেলি নলি চাল ধুইতেছেন, কুটনা কুটিতেছেন, দাসী চাকরকে বাধা দিয়া জল আনিতেছেন। বড় আনন্দ। আমিও ইহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আত্মার স্ফূর্ত্তি কমিয়া গিয়াছে। যা হোক খাওয়া দাওয়া হইলো, ক্রমেই আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে আসিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম দেখিতেছে, এখন কি নৌকা ছাড়িবে?" তাহারা কহিল "এখনও কোন ভয় নাই, আমরা বাড়ী পৌছাঁইয়া যাইব, ঢের সময় আছে।" সেই বিজ্ঞ কর্ণধারের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমারা যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইতে যাইতে বায়ুর বেগ প্রবল হইতে লাগিল, তখন মাঝ গঙ্গায় নৌকা আর কি হইবে? মাঝিরা পাল খুলিয়া গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূরিয়া গেল, ঝড় দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গঙ্গার তরঙ্গের ধ্বনি বায়ুভরে কম্পমান! ঢেউগুলি গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। ক্রমে নৌকার তলভাগে লাগিতেছে—কূলে কূলে গিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঝড় সত্যসত্যই প্রবল বেগে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া মাটি ধূলা বালি উড়াইয়া সবেগে নৌকা আক্রমণ করিল। গুণের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, মাঝিরা আছাড় খাইয়া পড়িল। বালিকা দুইটি এ উহাকে প্রাণপণে ধরিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বৌদিদি গুণনাথকে আশ্রয় করিয়া আছে। জলে যেমন তরঙ্গ, আমাদের প্রাণে তেমনি ভয়ের তরঙ্গ, হৃৎপিণ্ড ধক্ধক করিয়া আসন্ন মৃত্যু গণিতেছে। আমার ভাবনা—কি করিয়া এই বিপদ হইতে ভাই ভগিনী গুলির প্রাণ বাঁচাইব। কোনও উপায়ই ঠাওরাইতে পারিতেছি না। ঝড়ের জোরে নৌকা ঘুরিয়া ফিরিয়া জলে পরিয়া গেল। তখন আমরা উহা হইতে লাফান স্থির করিলাম। কিন্তু হতভাগ্য বালিকারা যে সাঁতার জানে না। তবু আমি শেলি নলিকে বলিলাম "আমার কোমর ধর।" বউদিদিও গুণা সাঁতার জানিতেন। নৌকা ছাড়িয়া আমরা সেই অন্ধকারে তরঙ্গ সঙ্কুল জাহ্নবীর কোলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোভিমুখে চলিলাম। দুইটি বালিকাকে টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আর পারি না, কূল কিনারা বা কোথায়? এক একবার বিদ্যুদালোকে কেবল জলের তোলপাড় চক্ষে পড়িতেছে। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া যে কোন্ দিকে গেলেন, তাহার ত চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আরও বিপদে মগ্ন হইলাম। মেয়ে দুটির হাত আমার কোমর হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই আমি নিজে হালকা হইয়াছি। এদিকে ঝড়ের বেগও প্রশমিত হইয়া আসিল। আমি যথাসাধ্য বলে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলাম। তখনও বাতাস এক এক বার সোঁ সোঁ রবে ক্রোধাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। কূলে গিয়া সেই বালু ভূমিতে আর্দ্রবস্ত্রে পড়িয়া থাকিলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত। নির্জ্জন নীরব তটদেশে জন মানবের চিহ্ন নাই, কেবল দূরে একখানি কুটীরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। অবসন্ন দেহ প্রাণ লইয়া উঠিলাম। এ মুমূর্ষু প্রাণে কিসের বল, কোথা হইতে আসিল, পাঠক পাঠিকারা সহজেই অনুভব্ করিতে পারিবেন। আমার জীবনের জীবন ভাই ভগ্নীগুলির উদ্দেশ এক্ষণে প্রাণে শতবল শত উদ্যম যোগাইতেছে। আমি সেই ক্ষীণালোক ধরিয়া কুটীর অভিমুখে গমন করিলাম। বাহির হইতে দেখি কেহ কোথায় নাই, একটি

স্ত্রীলোক বসিয়া কেবল জপ করিতেছেন। আমি যাইতেই জপ ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ং জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি এমন দুর্যোগে?"

আমি, মনুষ্য কণ্ঠস্বরে যেন কত বল ভরসা পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আর্ত্তস্বরে কহিলাম "মাগো! ঘোর বিপদাপন্ন জনকে একটু স্থান দেও।" তখন ভিতরে গিয়া দেখি কুটীর খানির মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আছে। আমি নিজের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম ও কিঞ্চিৎ অগ্নিসেকে হাত পা সোজা করিয়া নদীর কূলে কূলে ভ্রাতা ভগ্নীর নাম করিয়া অতি চিৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কুটীর বাসিনী বৃদ্ধার নিকট জানিলাম আমি বেণীঘাটে আসিয়া পড়িয়াছি। পরে গঙ্গাতীরে তীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি কতকগুলি লোক সন্ধ্যার আঁধার ভেদ করিয়া বড় বড় মশাল লইয়া আমার দিকে আসিতেছে। নিকটস্থ হইয়া দেখি নিদারুণ উদ্বিগ্নমনা পিতা স্বয়ং আমাদিগকে খুজিতে বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া আর ক্লিষ্ট, প্রাণের আবেগ সামলাইতে পারিলাম না, দুই চক্ষুর জলে অন্ধ হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলাম "বাবা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সব হারাইয়াছি।" পিতা হৃদয়ের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া বলিলেন "আর এখন বিলম্ব করা উচিত নহে, চল খুঁজি গিয়া।"

মশাল লইয়া ডুবুরীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে গুণা ও ভ্রাতৃজায়াকে পাইল, কিন্তু তাহারা অচেতন। পিতা শেলি নলির জন্য দারুণ ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। আমাকে কহিলেন ইঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ চিকিৎসালয়ে গিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা কর, আমি মেয়ে দুটির অনুসন্ধান করিব।' উহাদিগকে লইয়া চিকিৎসকের নিকটে গেলাম। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উভয়েরই চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, বালিকারা দুটি কোথায় জানিতে চাহিলেন। চিকিৎসকের আজ্ঞামত আমি কহিলাম তাহারা অন্য ঘরে আছে। তাহাদিগের জীবনের আশা দেখিয়া নিজে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পিতার কাছে গেলাম। নৈরাশ্যকাতর; পীড়িত ও সমস্ত রাত্রি জাগরণে অপরিসীম শ্রমে শ্রান্ত পিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই সকল লোক জন লইয়া হতাশমনে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যত খুঁজিতেছেন, তত আরও গঙ্গার গভীরতর তলদেশ হইতে গভীরতম প্রদেশে যাইতে ইচ্ছে হইতেছে— কিছুতেই নয়ন মনকে বুঝাইতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পরম স্নেহের শেলি আর নাই। তাঁহার এই অপ্রত্যক্ষ দারুণ ক্ষতির জন্য অবিশ্বাসী হৃদয়কে আর গঙ্গাতীর হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। মানব-চক্ষু পদে পদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চায়, চক্ষুর অগোচর কার্য্যে বিশ্বাস কোথায়? তাই হাতে হাতে প্রমাণ না পাইলে নয়নের সাধ মিটে না। মনুষ্যের সকল সাধনা চক্ষুর তলে— মুদিয়াই থাকি, মেলিয়াই থাকি। যোগী, ভোগী, সাধু, অসাধু, সৎ, অসৎ সকল ব্যাপার না দেখিলে মনুষ্য জীবন পূর্ণ হয় না। তাই আজ পিতার নৈরাশ্যে আশা-মিশ্রিত সন্দিহান হৃদয় লইয়া পীড়া। আজ যদি শেলির মৃতদেহ খানি তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে এরূপ চিত্তের বৈকল্য থাকিত না—একেবারে শেষ সীমায় গিয়া দাঁড়াইতেন। অনেক

অনুসন্ধানে পরাজিত হইলাম। আমি বহু কষ্টে সৃষ্টে একখানি গাড়ি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইলাম ও নিজে হাঁসপাতাল হইতে ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া বাড়ী গেলাম। সকল শোক দুঃখের অপেক্ষা প্রধান আশঙ্কা, ভয় ও ভাবনা—মাতার নিকটে কি বলিয়া মুখ দেখাইব। অকালে তাঁহার লক্ষ্মী সরস্বতী বিসর্জ্জন দিয়া আমার অশক্ত পদদ্বয় তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় না। বাটী পৌঁছিয়া বহির্ব্বাটীতে থাকিলাম। মাতা কনিষ্ঠ পুত্র ও বধূকে দেখিয়া দারুণ হৃদয়-বিদারক স্বরে তাঁহার প্রাণের শেলির অভাব জানাইলেন। সেই অশ্রুপ্রবাহে কত অশ্রু মিলিত হইয়া শোক-সিন্ধু প্রত্যেক অন্তরকে ভীষণ তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। অশান্তি, অনিদ্রা, অনাহার, অনুতাপ ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া আমাদের পরিবারের দুঃসহ দিনগুলা কাটিতে লাগিল। প্রভাত হয়, সন্ধ্যায় ঢাকে। রাজনীর গাঢ় তিমির সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে ধুইয়া যায়, কিন্তু মানব প্রাণের ঘোর শোকাচ্ছন্নতা কিছুতেই দূর হয় না। কালের সৈকত রাশি স্তরে স্তরে নদীকে আবৃত ও রুদ্ধ করে, কিন্তু মরমের গূঢ়তম প্রদেশের অন্তঃসলিলা চির-প্রবাহিতা।

ইহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্ত্তন শীল প্রকৃতির কত রূপান্তর। আমাদেরও তাই। আমি মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইয়া চাকরী পাইয়াছি। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে শাহারণ পূরে আসিষ্টান্ট সার্জনের পদাভিষিক্ত হইয়াছি। সাংসারিক সুখ দুঃখের বোঝা পৃষ্ঠে বহিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা চিন্তা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কণিষ্ঠা শেলির সেই সরল মুখ খানির প্রতিবিম্ব হৃদয় দর্পণ হইতে সরাইতে পারি না; কিন্তু পিতা মাতার নির্ব্বাপিত আগুন জ্বলিয়া উঠিবার ভয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করিবারও যো নাই।

বড়দিনের ছুটিতে দাদা সকল পরিবারকে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেরাদুনে গিয়া কিছু দিন থাকিবেন। কেবল আমার পিতা এলাহাবাদের বাড়ীতেই রহিলেন। তিনি এখনও শেলির বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত। তাঁহার প্রাণের কন্যার মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকাল বিকাল প্রত্যহ সেই গঙ্গাতীরে গিয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, চক্ষু প্রসারিত করত খুঁজিয়ালন, ও কল্পনার সাহায্যে এই দেখেন যেন জাহ্নবীর বিশাল বক্ষভেদ করিয়া কোমল স্বর্ণবলয়—শোভিত হাত দুখানি বাড়াইয়া কে বলিতেছে "আমায় ধর, আমায় তোল, আমি ভাসিতেছি।" এইরূপে বিষম সন্দেহ দোলায় দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার জীবন কাটিতেছে।

আমি মাতাকে হরিদ্বারে লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। তিন দিনের ছুটি পাইয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় গেলাম। হরিদ্বার এখান হইতে নিকট, ৩/৪ ঘণ্টার পথ। আমরা ভোরে ৭টায় উঠিয়া, লুকসের ষ্টেশনে একবার গাড়ী বদলাইয়া বেলা ১১টার সময় তীর্থস্থানে পৌঁছিলাম কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন জ্বালাপুর হইতে মা গঙ্গার পেয়াদা আমাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। পরে হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র মধুচক্রে মধুমক্ষিকাদল-প্রায় তাহারা চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিল। আমরা যেন ব্যূহের ভিতর পড়িলাম। সকলেই পাণ্ডা হইতে চায়, তাহাদের ঐ এক প্রশ্ন "মশা কোথা বাড়ী? চাটুর্জি, মুখুর্জি কি আছে?" সকলের

হাতে এক এক খানি খাতা বহি। এখানকার রীতিই এই, গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপুত্রের খাতায় স্ব স্ব নাম ধাম লেখা। এমন কি পিতা পিতামহ ইত্যাদির নাম গোত্র লেখাইতে হয়, তাহা হইলে উহারা যজমান বাঁধিয়া রাখেন। আমি অনেক কষ্টে উহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু একটি লোক নাছাড়বান্দা হইয়া আমাদের সঙ্গ লইল। অবশেষে তাহার খাতায় পিসিমার নাম গোত্র প্রকাশিত হইল, এজন্য তাহার দাবী দাওয়া অধিক। যাহোক আমরা ষ্টেশন হইতে নামিয়া সোজা গঙ্গাতীরে যাইব কিম্বা বাসায় ফিরিব ইহাই বিবেচনা করিতেছি, তখন সেই হরিদ্বার পথপ্রদর্শক পাণ্ডা মহারাজ কহিলেন "এখানে একটি বাঙ্গালী মাইর আশ্রম আছে, সেইখানে সকল বাঙ্গালী বাসা লয়, অতএব আপনারাও গিয়া সেই খানে বাসা লইবেন।" মাতার মনে সেই পরামর্শ ভাল বোধ হইল। অতএব আমরা দুইখানি এক্কানামক মর্ত্তরথ ভাড়া করিলাম। একখানিতে আমরা মাতাপুত্রে ও অপর খানিতে ভৃত্যরাজ জিনিস পত্র লইয়া উঠিলেন। পাণ্ডাজি পিছু পিছু চলিলেন। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক রকমের লোক কেহ পদব্রজে কেহ রথে চলিলেন। সকলেই তীর্থযাত্রী। একই আশা—একই ভরসা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের এক্কা বেগে যাইতে চেষ্টা করিয়া পারিতেছে না, পথ বড় অসরল—উঁচু নিচু, বাঁকা চোরা। কিন্তু কাহারও সে বিষয় গ্রাহ্য নাই। সকলেই সানন্দে সৌৎসুক্যে প্রকৃতির নবীন দৃশ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে ব্যগ্র। অদূরে শৈবালিক গিরিবর অলস ভাবে ভীমকায় বিস্তার করিয়া শুইয়া আছেন। তদুপরি কত তরু গুল্ম কোমল হরিৎ লতা পাতা ছড়াইয়া সাদরে শৈবালিকের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে, যেন সুকুমার শিশুগুলি মায়ের বক্ষে থাকিয়া গলা জড়াইয়া মধুর চুম্বন দানে ব্যস্ত। সর্ব্ব প্রাণ-তোষক পবন দুলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এইপার্ব্বতীয় শোভাপূর্ণ নির্ম্মল স্বচ্ছবায়ু সেবিত প্রকৃতির লীলা-ভূমি হরিদ্বার কিম্বা হরদ্বারকে স্বর্গদ্বার বলিতে কাহার না ইচ্ছা করে? পূত ধারাময়ী জাহ্নবীর জন্মস্থান এখানে। এক কালে সাগর বংশীয় ভগীরথ এই স্থান হইতে গঙ্গা প্রবাহের সৃষ্টি করেন। হিমাদ্রি শিখর ভেদ করিয়া সে স্থান হইতে এই অমৃত ধারা নিঃসারিত হইতেছে, তাহাও ইহার সন্নিকটেই। সেই স্থান গঙ্গোত্রি নামে অভিহিত। যাহোক্ আমরা বাঙ্গালী মাইর আশ্রমে উপনীত হইলাম। আশ্রম একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ি, ভিতরে নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির গৃহ, তৎপার্শ্বে আর একখানি দালান ও উঠান, তার সম্মুখে একখানি রাঁধিবার চালা ও অন্যান্য আবশ্যক স্থান। বাড়িটি ছোট কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানে পুঁইশাকের একটি মাচা, কয়েকটি ফুল গাছও আছে। গৃহস্বামিনী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, কিন্তু সুদীর্ঘ জটাধারিণী, বয়স অণুমান পঞ্চাশৎ। দেখিতে গৌরবর্ণা। ব্রাহ্মণ তনয়ার মত প্রকার বটে। অবস্থা সম্পূর্ণ গৃহীর মত হইলেও তিনি নিজ বৈধব্য-দগ্ধ জীবন এই পবিত্র স্থানে এই ভাবে কাটাইতেছেন বলিয়া সাধু ফকির মধ্যে পরিগণিত। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সেই রমণী সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গা স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহ স্বামিনী কহিলেন "আপনারা কতক্ষণে ফিরিবেন? আমি আপনাদের জন্য পাক করিয়া রাখিতে

ইচ্ছা করি, কিন্তু আজ আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে—'' বলিয়াই আবার কহিলেন ''আপনারাও কি যাইবেন? গতকল্য এখানে এক জন মহাত্মা আসিয়াছেন, তিনি না কি ত্রিকালজ্ঞ অতি বৃদ্ধ প্রাচীন সন্ন্যাসী, সকলেই তাঁহার দর্শনে যাইতেছে, আমিও তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাইব। তিনি চণ্ডীর পাহাড়ে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন।'' এই কথায় আমরাও তাঁহার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা করিলাম ও বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর নহে। অল্পক্ষণ পরে আমরা ''হরকি পইড়িতে'' পৌঁছিলাম। হরিদ্বারে এই খানেই সকল যাত্রী স্নান দানাদি করিয়া থাকেন ও অপর পার্শ্বে কুশাবর্ত্তঘাটে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়। ''হরকি পইড়ির'' ঘাটের উপরেই প্রয়োজন উপযোগী দোকান পশার। ইহা ছাড়া ফুলতোলা মালী, দুগ্ধবিক্রেতা, ফলবিক্রেতাও মাঝে মাঝে বসিয়াছে। ঘাটের উপরেও অনেক দেব দেবীর মন্দির। আমরা সম্মুখস্থ সোপানোপরি বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে নামিলাম। পাণ্ডাজী সেই খানে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন—''মা সঙ্কল্প কর, হাতে জল নাও, আমি মন্ত্রপাঠ করিতেছি। কিন্তু তুমি বল এইখানে পঞ্চমুদ্রা দিয়া হরির চরণ পুজা করিব।'' আমি তাহার এই অযথা আদেশের অপ্রতিপাল্যতা তাহাকে বুঝাইয়া কহিলাম ''তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা অবশ্যই পাইবে।'' এই রূপে ক্রমেক্রমে সকল দান অপ্রতিহত ভাবে প্রদত্ত হইল। যথা নিয়মে সেখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী অভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। ঘাটে ও পথে অনেকের মুখেই সেই প্রচীন সাধুর আগমন বার্ত্তা শুনিলাম ও অনেকেই যাইতেছে দেখা গেল! অতএব আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া সাধু সন্দর্শনে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। বাসায় আসিয়া গৃহস্বামিনীর প্রদত্ত ভাত কলাইয়ের ডাল আর পুঁইশাক চড়চড়ি পরমানন্দে আহার করিয়া চন্ডীর পাহাড়ে চলিলাম। আমার ত কোন কষ্ট হইল না, কিন্তু মা আমার রোগে শোকে কাতর ও ক্লিষ্ট, তিনি যে আরও শ্রান্ত হইবেন ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। অবশেষে নীলধারা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিলাম। শত শত যাত্রী অবাধে উঠিতেছে নামিতেছে। আজ অপেক্ষাকৃত লোকের ভিড় বেশী। সকলের মুখে সাধুর মাহাত্ম্য বর্ণিত, আমাদের পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। মা অতি ধীরে ধীরে হাঁটেন, তাহাতে বেলা অবসান প্রায়, অপরাহ্ন ৫টার সময় পর্ব্বতের উপরে গিয়া উপনীত হইলাম। দর্শনার্থিগণ এ সময় আসিতে ভয় পায়, পাছে ফিরিয়া যাইতে অন্ধকার হয়। মন্দিরের পার্শ্বে মহাত্মার আসন শুনিলাম। আমরা মাতা পুত্রে যখন গেলাম, তখন চণ্ডীদেবীর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহই তথায় ছিল না। মৃগচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট একটি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ যোগী। শ্বেত জটা ও শুভ্র শশ্রূগুম্ফে মুখমণ্ডল শোভিত। গৌরিক বসনে দেহ আবৃত। ঋষিবর নয়নমুদ্রিত করিয়া একান্তচিত্তে ওঁকার ধ্যান করিতেছেন। কেমন পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি যেন স্বয়ং মহাদেব তপস্যায় রত! আর কি দেখিলাম সে অতি বিচিত্র অভাবনীয় দৃশ্য; উহারা কি দেবতা কি মনুষ্য, তাহাও নয়নে মনে ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেলো। কি দেখিতেছি সত্য না স্বপ্ন আসিয়া এই ক্লান্ত দেহে কুহকাবৃত করিয়াছে কিছুই ত বোধগম্য হইতেছে না। যেন জয়া বিজয়া দক্ষিণে বামে মহাদেবের দুই পার্শ্বে অবস্থিতা, রমণী দুইটির সন্ন্যাসিনী বেশ। বয়ঃক্রম ২০/২২ বছরের অধিক নয়। এই কোমল প্রাণে কিসের বৈরাগ্য? কেন

নবীন বয়সে তাপসী বেশ? এই সুন্দর মুখমণ্ডলে কেন প্রীতি প্রফুল্লতার অভাব? পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্যামল মেঘে আচ্ছাদিত। আমরা মাতা পুত্রে নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া অনিমেশে চাহিয়া আছি, প্রাণের ভিতর ঘোর সন্দেহ কম্পন হইতে লাগিল। এ যেন শত পরিচিত স্নেহসিক্ত মুখ। মায়ের মনে পুরাণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। অতীতের কাহিনী যেন স্মৃতির ভিতর চমকিয়া উঠিল। তিনি আশার বিদ্যুদালোকে জগতের স্থায়িত্ব দেখিতেছেন, তাঁহার স্নেহের তরু- লতাগুলি বাঁচিয়া আছে, কাননখানি পূর্ণ! কিন্তু সন্দেহের মেঘে ঘোর আচ্ছন্ন, তাই আবার অন্ধ। নয়ন মন সকলি অন্ধ। অবশেষে মা আমার গললগ্নীকৃতবাসে সেই নবীন যোগিনী দ্বয়কেই প্রথম প্রণাম করিতে উদ্যতা হইলেন। তাহারা আপত্তি করিয়া কহিল ''ক্ষান্ত হউন, আমাদের গুরুদেবের সমক্ষে আমরা প্রণাম লইতে পারি না।'' এই কথা শুনিবামাত্র মাতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সেই রমণীর হাত ধরিয়া নিজের বক্ষের ভিতর টানিয়া কহিলেন ''ওগো মা! একবার ত মা বলিয়া ডাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। এ যে সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ দশ বৎসর শুনি নাই, যে মুখ দেখিবার জন্য নয়ন ব্যাকুল, যে বাক্য শুনিবার জন্য কর্ণ আকুল, একবার ডাক্ মা।'' আমার মাতার এই ভাব দেখিয়া নবীন সন্ন্যাসীনির চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সে কহিল ''মা কোথায়? আমি কোথায়?'' এই বলিতে বলিতে মোহভাবাপন্ন হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়া রমণী আগন্তুক দ্বয়ের আগমনে এমন ঘটিল কেন ভাবিয়া গুরুদেবের পদবন্দনা করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করাইল। তিনি কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ কমণ্ডলুর জল সেচনে প্রথমা চৈতন্য জন্মাইয়া পুনরায় স্বস্থানে বসিলেন। আমি তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলাম ''অদ্য সুপ্রভাত, সফল হইলাম চরণ দর্শনে।'' সন্ন্যাসী ঈষদ্ হাস্যে চাহিলেন ও কহিলেন ''দর্শন পাইলে, এখন প্রস্থান কর, নচেৎ রাত্রিকালে এখান হইতে নামা কষ্টকর হইবে।'' মা শুনিবামাত্র কহিলেন ''না ঠাকুর, আর যাইব না যে পর্য্যন্ত না আমার অন্ধ নয়ন খুলিবে। আমি যে সেই সকল দেখিতেছি। সেই মুখ, সেই কথা, সেই স্নেহের টান আমার অন্তরে উথলিয়া যাইতেছে। আমাকে দয়া করিয়া ঐ শিষ্যা দুইটি দান করুন। মানব যখন নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে পারে না, তখনই প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। তাহাকে দেখিতে না পাই, তাহারই চিত্র আঁকিয়া চক্ষের সম্মুখে রাখি। স্বরূপের পরিবর্তে প্রতিরূপ কি মনুষ্যের চিত্ত শান্ত করে না?'' সন্ন্যাসী কহিলেন ''কেন মা ব্যাকুল হইতেছ? ইহারা এখন সংসারের বন্ধন কাটাইয়া পরম সুখের পথ অবলম্বন করিতেছেন। অনেক শিক্ষাতে ইহাদের মনের ময়লা কাটিয়াছে। তুমি কে? ইহারাই বা কে? ইহাদের জন্য এত ব্যাকুল কেন? সংসারের সম্বন্ধ অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা গৃহে যাও, ইহারা পরম তাপসী।'' তখন আমি করপুটে বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম ''আমাদের সন্দেহ অপনোদন যদি দয়া করিয়া করেন; কৃতার্থ হই।'' তিনি কহিলেন ''বল''। ''আপনার আগমন কোথা হইতে?'' ''কাশীধাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি, সেইখানে আমার মঠ। উত্তরাখণ্ডে যাইব। আর ত কিছু বলিবার নাই? আমি কহিলাম ''আর একটি কথা জিজ্ঞাসিব ক্ষমা করিবেন, এই সন্ন্যাসিনী দুটীর পরিচয়।'' সন্ন্যাসী কহিলেন ''ইহারা আমার শিষ্যা, এই পরিচয়।'' আমার মনে তৃপ্তি হইল না, কিন্তু

যুবতী স্ত্রীলোকের বিষয় বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলাম। মা আমার সেই রমণীদ্বয়কে বারম্বার কহিতে লাগিলেন "আহা! কার বাছা, কে এমন সোণার অঙ্গে ছাই মাখাইয়াছে?" প্রথমা রমণী অতি সাবধান দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ন্যাসী রমণীদ্বয়ের পরিচয় দিতেছেন না, এদিকে সন্ধ্যার মলিন ছায়া আসিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিল। আর বিলম্বে বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া মাতাকে কহিলাম। তিনি যাইতে অসম্মতা, অবশেষে সন্ন্যাসীকে কহিলেন এই রমণীদ্বয়কে যদি দয়া করিয়া একবার আমার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মন্দিরের মধ্যে যাইতে আজ্ঞা দেন, তবে আমি বিদায় লই।' মায়ের এরূপ কাতর অনুরোধে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। তখন উহারা তিনজনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, আমরা বাহিরে রহিলাম। পরক্ষণেই মাতা আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ক্রমে আমার সন্দেহ সরিয়া সত্যে পরিণত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমা রমণী "দাদা কি এই?" আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম চক্ষের উপর ভ্রূমধ্যে ভাগে সেই কাল তিলটি এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। তখন আর থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম এই কি আমার শেলি? হা ভগবান্। সত্য প্রকাশকর।" সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদিগকে কহিলেন "শান্ত হও। আমি তোমাদের সন্দেহ ঘুচাইব।" মাতা কহিলেন "এযে আমার কন্যা ও তাহার সঙ্গিনী, আমি সম্পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছি, পরিচয়ে হউক আর নাই হউক। এক্ষণে দয়া করিয়া প্রকাশ করুন কোথায় পাইলেন। আমি জানি আপনি ইহাদের জীবনদাতা; আমি ত জাহ্নবীর কোলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।" সন্ন্যাসী পূর্ব কথা আরম্ভ করিলেনঃ—

"তবে শুন। বহুদিন হইল অর্থাৎ প্রায় দশ বৎসর অতীতপ্রায়, আমি একদিন রাত্রে সমাধিস্থ ভাবে কাশীধামের গঙ্গাতীর হইতে স্রোতে বহিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় এই দুইটি বালিকা উভয়ে উভয়কে ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। আমার গাত্র স্পর্শে আমি দেখিলাম মনুষ্য দেহ, মৃতকল্প হইলেও জীবিত, সুতরাং আমি উহাদিগকে টানিযা কূলে তুলিলাম। নিজ মঠে আনিয়া সেবাযত্নে চৈতন্য লাভ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত জ্বরভোগ করিতে লাগিল। একমাস পরে চিকিৎসার আরোগ লাভ হইল, কিন্তু দুইটিরই একটু একটু শরীরের ক্ষতি হইল। আপনি যাহাকে কন্যা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার শ্রবণাক্তি কিছু নষ্ট হইয়াছে ও দ্বিতীয় টির দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহা হউক আমি উহাদের আকার প্রকারে সম্ভ্রান্ত-বংশজা অনুভব করিলাম। প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া দীক্ষিত করিলাম ও রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হইল। পরে ইহাদের বিদ্যা চর্চ্চার সঙ্গে জ্ঞানের তৃষাও বাড়িল। শিষ্যত্ব গ্রহণের উপযুক্তা জ্ঞান করিয়া আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। এই সংক্ষেপে পরিচয়।" মাতা কহিলেন "যথেষ্ট হইয়াছে, আর কি শুনিব! আমার কন্যার বক্ষে যে দুর্গানাম অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নিদর্শন।" এই বলিয়া মাতা শেলির বক্ষ স্থিত দুর্গনাম যাহা উল্কি দ্বারা বাল্যকালে আমার ঠাকুরমাতা আদরের উপহার দিয়াছিলেন, খুলিয়া দেখাইলেন। সেই চিহ্নের নীচে আমার দাদার ইচ্ছামত "মা" লেখা হয়।

'বামাবোধিনী পত্রিকা' —১৩০৮

বিপত্নীকের পত্নী

নৃত্যকালী দেবী

১

পিতা মাতা তাহাদের একমাত্র কন্যা সত্যশীলাকে সৎপাত্রে দিবার জন্যে যথোচিত চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে নারায়ণ দহের জমীদার কৃষ্ণরাম বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্র বসুকে জামাতারূপে পাইলেন, এইরূপ সামাজিক সর্ব্বগুণে গুণান্বিত চির প্রার্থনীয় জামাতা পাইবেন, তাহা সত্যশীলার পিতা দেবেন্দ্র বাবু আশাও করেন নাই। বিশেষতঃ সুধীর বিবাহিত, ভগবানের কাম্য মানবের আশা ও কল্পনার অতীত, হঠাৎ সুধীরের পত্নীবিয়োগ হইল, শোকের ঝড় না থামিতেই পুনঃ পরিণয়ের মলয় বহিতে লাগিল, দেবেন বাবু এ সুযোগ ছাড়িলেন না। মলয়ানীল পুণ বসন্তকাল, হৃদয়-উদ্যান হইতে সযতনে পালিতা দশমবর্ষীয়া কুমারী কুসুমকলিকা তুলিয়া সাদরে জামাতৃরূপি দেবতা বিংশ বর্ষিয় যুবক সুধীরচন্দ্রের পদসরোজে অঞ্জলী প্রদান করিলেন। পত্নীবিয়োগে শোক জর্জ্জরিত যুবক নিজ হৃদয়ের স্নেহ ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ জন্যই যে অশ্রুজলে ভাসাইয়া সেই অস্ফুট কলিকুসুম সাদরে কণ্ঠে ধারণের জন্য অগ্রসর হইলেন, উভয় পক্ষই ধনকুবের, খুব সমারহ সহকারে বালিকা যুবক পরিণয় শেষ হইল।

২

বিবাহের এক বৎসর পর সত্যশীলা "শ্বশুর—ঘর" করিতে যাইতেছে। বিদায়ের দৃশ্য কি শোকদ্দীপক, লক্ষীগাঁও হইতে নারায়ণদহ একদিবসের রাস্তা, নৌকায় সব বন্দোবস্ত করিয়া দরজায় পাল্কি, দেবেন্দ্র বাবু ঠিক করিয়া দিয়া অন্দরে আসিয়া মাতাকে বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন?"

সত্যের স্নেহ ময়ী পিতামহী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেবু সতির কান্না তো দেখতে পারি না, মেয়ের বড় যন্ত্রনা, দেবু বড় যন্ত্রনা।" স্নেহময় পিতার নয়নদ্বয় জলে সপূর্ণ হইল করুন কণ্ঠে কহিলেন, "মা এর তো উপায় নাই, সতি কোথায়?" পিতামহী রোরুদ্যমান পৌত্রীকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। বালিকা পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিল, "আমি যাব না, আমি যাব না। তোমাদের ছেড়ে আমি যাব না।" বলিয়া উচ্চস্বরে গগন বিদির্ণ করিয়া কাঁদতে লাগিল। অন্য দিকে সত্যশীলার জননী, "আমার সোনার প্রতিমা আজ আমি কাকে দিচ্ছি, কে আমার বাছার মুখ চেয়ে খেতে বলবে" ইত্যাদি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীনীরা পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, উঃ সে কি দৃশ্য?

বহুক্ষন পর পিতামহী ঈষৎ শান্ত ভাবে গত রাতের উপদেশাবলী আবার একটু স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা সতি, সে পরের বাড়ী সারা দিন মনে রাখিস সুধীর খুব ভাল ছেলে যা বলে তাই শুনিস, তাঁকে যেন রাগাসনে সেখানে তোর রাগ কেউ সহ্য করবে না", বলিতে বলিতে বৃদ্ধা উচ্চঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, সত্যশীলার আর কাঁদিবার শক্তি

ছিল না। একটা থাম ধরিয়া কেবল ওঃ ওঃ করিয়া যন্ত্রনা প্রকাশ করিতে লাগিল।

দেবেন বাবু অশ্রু নয়নে জননীকে বলিলেন, "মা কর কি তোমরা সবাই এমন করে কাঁদ কেন," তৎপরে কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মা আমার লক্ষী, তুমি তো সব বুঝ, মা সেই তো তোমার বাড়ী, তোমার মার, ঠাকুরমার যেমন এই বাড়ী, তোমার তেমনি সেই বাড়ী," ইত্যাদি বলিয়া সান্তনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শান্ত হইবে কে?

সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যশীলা শ্বশুর বাড়ী চলিল, সঙ্গে পিত্রালয়ের একমাত্র দাসী "ক্ষেমা"। এখন ক্ষেমাই সত্যশীলার আনন্দ ও শান্তির স্থল।

৩

সত্যশীলার আসার পর নারায়ণদহের কামিনীগণ একবার মনের সাধে নব বধুর সর্ব্বাঙ্গীন সমালোচনা করিয়া লইল। সত্যশীলার দেবরবধু বলিলেন, "একে তো দিদি বলতেই আমার লজ্জা বোধ হয়, আহা! আমার পোড়া কপাল, নইলে অমন বোনের মত জা হয়। শ্বাশুরী সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "এও অমনি হবে, সুধীরের আমার স্ত্রী ভাগ্য ভাল।" একজন কুটুম্বীনী বলিলেন, "সে কি আর হয় মাসী, যেমন যায় তেমন আর হয় না'। শ্বাশুরীর চক্ষে জল আসিল, বলিলেন, "তা কি আর হয়, আহা সে আমার লক্ষী বৌ তেমন কি আর হবে?'

গৃহীনীর কনিষ্ঠ পুত্র সুকুমারচন্দ্র সেইখানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "মা বৌ মলেই তোমাদের কাছে সতি লক্ষী আর ঘরকরা যায়, আজ যদি এ বৌ-দিদি মরে যান, তবে কাল তুমি একেও সতী লক্ষী ঘর আলো করা বৌ বলবে। গৃহিনী চমকিয়া বলিলেন, "ওকি কথা, শুভ দিনে অমন কথা বলে না, চুপ কর।'

নুতন বৌ এসেছে খাওয়া দাওয়া মিটিতে রাত্র ১১টা হইতে চলিল। বিধবা শ্বাশুরীর জলযোগের পর সত্যশীলা পিতামহীর শিক্ষা মত এক খুরী তেল লইয়া শশ্রূর পদ সেবার জন্য আসিলেন। ছোট বৌ সুহাসিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, 'বৌ, ওকি করছ, ওসব চাল আমাদের বাড়ী নাই।" নব বধু বালিকা সত্যশীলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এখনও তো সে তাঁহার মাকে রোজ ঠাকুমার পায়ে তেল দিয়া দিতে দেখে। শ্বশ্রূ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বৌ আমার লক্ষী এখন যাও মা, শোও গে " তৎপর সুহাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "যাও মা, বড় বৌকে ঘরে দিয়ে এস।" সুহাসিনী মুখে কাপড় দিয়া বলিলেন, "আমি পারব না মা, ভাসুরের ঘরে জা কে দিয়ে আসতে পারবো না।" তৎপরে গৃহিনীর বিধবা বোনঝি সরলা সত্যশীলার হাত ধরিয়া লইয়া শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিল। সরলা এক সম্পর্কে সত্যশীলার কাকীমা হইত।

যাইবার সময় ঘোমটাবৃতা সত্যশীলার পুনঃ পুনঃ পদ স্খলন হইতে ছিল। সত্য শীলাকে এইরূপ ভীতা দেখিয়া সরলা সস্নেহে বলিল, "সত্য, কাঁপছ কেন?"

সত্য কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কাকীমা আমি আপনার কাছে শোব।"

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলী মেয়ে তাকি হয়।" পরের বাড়ী সত্যশীলা আর

কিছু বলিতে সাহস পাইল না। কম্পিত হৃদয়ে বালিকা আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিল। সুধীরচন্দ্র প্রবেশ করিলে সরলা প্রস্থান করিল। সুধীর ধীরে ধীরে গিয়া নব পরীণীতা বালিকার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। স্বর্গীয়া পত্নীর জন্য হৃদয় হইতে একটী নিশ্বাস পড়িল। নব পরীণীতা বালিকা পত্নী পার্শ্বে শয়িতা, যুবক সুধীর ধীরে ধীরে পত্নীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ''তুমি এত লজ্জা কেন করছ, তোমায় আমায় লজ্জার সম্বন্ধ নয়, কথা বল।''

বালিকা কথা বলিতে পারিলেন না, ''তোমার আমার লজ্জার সম্বন্ধ নয়'' ইহাও বালিকার বিশ্বাস হইল না, কেননা তাহার মা এখনও তাহার পিতাকে খুব বেশী লজ্জা করিয়া থাকেন।

সুধীর একটু থাকিয়া আবার বলিলেন, কথার স্বর অভিমানে ও বিষাদে পূর্ণ। ''সত্য; আমার সঙ্গে তুমি কথা বলছ না, আমর হৃদয়ে কি যন্ত্রনা, তা কি তুমি জান না, ভেবেছিলাম তোমার দ্বারা আমার এ যন্ত্রনা শীতল হবে।'' বালিকা, একদশ বর্ষিয়া বালিকা উত্তর কি দিতে পারে? যন্ত্রনা ও শীতল এই দুটি শব্দ বালিকার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে যন্ত্রনা কি এবং তাহা শীতল করিবার প্রক্রিয়া কি, তাহা বালিকা কি করিয়া জানিবে? এইখানেই বলিতে বাসনা হয়, বিপত্নীক যুবকদিগের বিবাহার্থে বিধবা যুবতী স্থিব করা কর্ত্তব্য, সমঅবস্থাতেই বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি আসিয়া থাকে, বালিকা যুবক মিলনে সমাজের অমঙ্গ ল ও ব্যক্তি বিশেষের অশান্তি সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। যুবক স্বামীর হৃদয তাপদগ্ধ, প্রেম, মিলন বিরহ সবই তাহার পুরাতন, অপর পক্ষে কুসুম সুকোমল হৃদয়া বালিকার সবই নূতন। তাহার মন স্বামীকেও নূতনত্বে ভরা খেলার সাথীর মত দেখিতে চায়, অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীর নিকট অষ্টবিংশ বর্ষীয় যুবক, বড় নহে, কিন্তু একাদশ বর্ষীযা বালিকার পার্শ্বে একবিংশ বর্ষিয় যুবককে মানাইবে কেন?

পুনরায় যুবক সুধীর অতৃপ্ত আবেগ স্বরে বলিলেন, ''সত্য একটী কথা বলো আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, একটী কথা বল।''

নিদ্রায় বালিকার চক্ষু মুদ্রিত হয়ে আসিতেছিল, ভয়ে জিহ্বা জড়িত হইতেছিল, সেই অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে জড়িত ও কম্পিত কণ্ঠে বালিকা সত্যশীলা বলিল, ''বলুন, কি বলব।''

৪

গত ঘটনার ছয় বৎসরের অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল জগতে ও বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইরূপ স্থলে আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটিতেও যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহা লেখাই বাহুল্য। সত্যশীলা এখন আর কম্পিতা-হৃদয়া লজ্জা ও ভয়ময়ী বালিকা নয়, সপ্তদশ বর্ষীয়া সহৃদয়া, গাম্ভীর্য্যময়ী, যুবতী, সন্তানের জননী, ও গৃহের গৃহিণী, সত্যশীলাকে ''দিদি'' বলিয়া ডাকিতে এখন আর সুহাসিনীর লজ্জা হয় না, এখন আর পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় সত্যশীলার আকুল ক্রন্দনে বাড়ী আন্দোলিত হয় না। সত্যশীলার স্থির নয়নে এখন নীরব ক্রন্দনেরই পূর্ণ অধিকার। বয়োবৃদ্ধির সহিত সত্যশীলার

বাল্যস্বভাবের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা সকলেরই হয়, বেশীর মধ্যে সেই পরিবর্ত্তনে যেন বিষাদের একটী সুগভীর রেখা পড়িয়াছে। সে রেখা এত সুক্ষ্ম, যে সাধারণ চক্ষে বড় পড়িত না। সাধারণে জানিত সত্যশীলা রমণীরত্ন, ধীরা, স্থিরা, শান্ত ও মৃদু মধুর ভাষিণী। যাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও কুটিলতায় পূর্ণ, তাহারা বলিত, "দেমাকী ও অহঙ্কারী"। ইহাতে সত্যশীলার বড় কিছু আসিত না। "তুমি কেন এত গম্ভীর" এ প্রশ্ন সাধারণে করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সত্যশীলা স্বামী সুধীরচন্দ্রের চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। সত্যশীলার গাঢ় চিন্তাপূর্ণ গম্ভীরবদন, মৃদুবাক্য, উদাস স্থির নয়ন ও হৃদয়স্থিত অতি যত্নে লুক্কায়িত বিষাদরাশি সুধীরচন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। সুধীর যাহা চাহিতেন, স্ত্রী ঠিক তাহা পাইতেন না, অথচ কি পাইতেন না, তাহাও বুঝিতে পারিতেন না। সুধীর হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে প্রেমময়ী পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন, তখন তিনি বুঝিতেন, অপর পক্ষে সেরূপ প্রাণ মন উন্মাদকারী আবেগ উচ্ছাস নাই। তিনি সবিস্ময়ে পত্নীর মুখপানে চাহিতেন, পত্নী, পতির সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না, সলজ্জে শান্ত কোমল নয়ন দুটী ভূতলে স্থাপন করিতেন।

সুধীরেব হৃদয়েব বাসনা স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নিকট কিছু গোপন না রাখেন, এরূপ বাসনা দম্পতিদিগের স্বাভাবিক। সুধীর নিজ হৃদয় দ্বার উদঘাটন করিয়া সত্যশিলার নিকট সবই খুলিয়া বলিতেন, আব নীরব ও প্রেমিকা সত্যশীলা সেই উচ্ছ্বাসময়ী কাহিনীর উত্তর "হাঁ, না" ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিতেন না! ইহাও সুধীরের অশান্তির কারণ, মধ্যে মধ্যে সুধীরচন্দ্র আকুলভাবে সত্যশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সকলের নিকটই তুমি কি শ্রোতা থাক, কখনই কি বক্তা হও না?' এ কথার কি উত্তর দিলে ঠিক হয়, সত্যশীলা তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া বলিতেন, "আমি সে বুঝতে পারি না"। স্বামীর ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বলিতেন, "এই কি এক উত্তর মুখস্ত করে রেখেছ।"

সত্যশীলার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িত, বলিতেন, "বোধ হয় তোমার স্বর্গীয়া পত্নী এমন ছিলেন না।"

"তাঁর কথা আর কেন পুনঃ পুনঃ বল" বলিয়া সুধীরচন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, সত্যশীলার গম্ভীরমুখ আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। দিন এইরূপ ভাবেই কাটিয়া যাইতেছে, বাহিরে কোন গোলযোগ নাই।

৫

সন্ধ্যা লাগিতেছে, শান্তময়ী সন্ধ্যাসতীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্যেই যেন পাখীকুল নানা রবে বৈতালিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, প্রকৃতি রাণী নবীণা অতিথি সমাগমে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তারাদীপ গুলি জ্বালিতে জ্বালিতে মলয়ানিলে সন্ধ্যাসুন্দরীকে ব্যঞ্জন করিতেছে। সায়াহ্নবালাও যেন তাহার ধুসর উড়ানীখানী রাখিয়া ধীরে ধীরে তিমিরাসনে উপবেশন করিতেছেন, সত্যশীলা রকের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, মার হাঁটু ধরিয়া

দুই বৎসরের খুকী মাধুর্য্য, খেলিতেছে, এমন সময় প্রফুল্ল মুখে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে সুকুমার, সুন্দর দুটী বেল ফুলের মালা হস্তে লইয়া বৌদিদির নিকট আসিলেন, সত্যশীলা তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন ললাট পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন, কাকাকে দেখিবামাত্র বালিকা মাধুর্য্য মাকে ছাড়িয়া কাকার নিকট আসিয়া মালা দুটি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সুকুমার শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "বৌদিদি তোমার জন্যে মালা এনেছি।" সত্যশীলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ফুল আমি বড় ভালবাসি।" সুকুমার কহিলেন, "আমি দাদার কাছে শুনেছি, সেই জন্য ফুল পেলেই তোমার জন্য আনি।"

আমার জন্যে বুঝি আনা হয় না" বলিতে বলিতে স্বভাব সরলা সুহাসিনী সেই খানে আসিয়া সত্যশীলার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, সুহাস সত্যশীলার অতি স্নেহের, বয়ঃকনিষ্ঠা হলেও সত্যশীলা বড় দিদির মত সুহাসের সকল আবদার সহ্য করিতেন। সুকুমার স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার জন্যেও এনেছি— কিন্তু স্থান ভেদে পরতে হবে, বৌদিদির পায় আর তোমার গলায়, তৎপর মালা দুটি সত্যশীলার চরণ তলে রাখিলেন। সত্যশীলা, "কী কর ঠাকুর পো" বলিয়া মালা দুটি লইয়া একটী সুহাসের ও অপরটি মাধুর্য্যের গলায় পরাইয়া দিলেন। সুকুমার প্রস্থান করিলে সত্যশীলা একখানি মাদুর পাতিয়া সুহাসকে লইয়া বসিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই 'খুকি' ঘুমাইয়া পড়িল। খুকির পার্শ্বে খুকির মা ও কাকীমা শয়ন করিয়া নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের কথার স্রোত কোথা হইতে কোথা চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গৃহ হইতে সমাজরীতি, সমাজ হইতে সংসার, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিধ লহরী লইয়া সে বাক্যে স্রোতস্বিনীর বেগ বৃদ্ধি করিতেছিল। বিবাহ বিষয় আলোচনা করিতে সুহাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দিদি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?" একটু ভাবিয়া সত্যশীলা বলিলেন, "আমার মত বিপত্নীক বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ও সেরূপ।"

সুহাস আশ্চর্য্যে হইয়া বলিলেন, "বিপত্নীক বিবাহে আবার মত কি?" সত্যশীলার অধরে ঈষৎ হাস্য রেখা পড়িল। বলিলেন, "বাঃ, যত অপরাধ করেছে বুঝি বিধবা? আমার মতে বিধবাবিবাহ যেরূপ গর্হিত বিপত্নীকের পুনরায় বিবাহ সেইরূপ গর্হিত। তবে পতি-পত্নি অনভিজ্ঞের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বাল্য বিবাহ যে আমার মত নয় তা তুমি জান।"

সুহাস। "তুমি আজ আমায় নূতন কথা শুনালে, দিদি তাহলে বিপত্নীক বিবাহও প্রণয়ের অবমাননা, ঘোর নিষ্ঠুরতা!" সত্যশীলা গম্ভির মুখে বলিলেন, "অবশ্য তুমি জান না আমাদের শাস্ত্রে আছে প্রথম পত্নীই পত্নী, আর সব রিপুচরিতার্থের জন্য।' সুহাস "তা তো ঠিকই, এখন আমি দেখছি এ খুব অধর্ম্মের কাজ।" সত্যশীলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ"।

তাহার পর দুই জনে আরও অনেক কথা হইল। অবশেষে আহারান্তে যে যাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সত্যশীলা ধীর পদক্ষেপে শয়নাগারে আসিলেন তখনও স্বামী আসে নাই, গৃহ নীরব, সেই নীরবতার মধ্যে শিশু মাধুর্য্যের মৃদু নিশ্বাস ও ঘড়ি টুক্ টুক্ শব্দ সুস্পষ্টরূপে শুনা

যাইতেছিল, জানালা দিয়া সুধাকরের সুধা আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িতেছে, সত্যশীলা মুক্ত বাতায়নে কিছুক্ষণ, দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না সুন্দরীর এই অনধিকার প্রবেশ ভাবিতে লাগিলেন, তৎপরে একখানা আরাম চেয়ার সেইখানে আনিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে জ্যোৎস্না ভাসিতে লাগিল। সত্যশীলার নয়ন দুটি ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিল, কিছুক্ষণ পরে সুধীরচন্দ্র শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্নালোকে শয়িতা পত্নীকে আজ তাঁহার চক্ষে অতি সুন্দর দেখাইল. দুরে দাঁড়াইয়া তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বর্গের এই সুষমারাশী সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে অতি ধীরে সত্যশীলার নিকটস্থ হইয়া অতি সন্তর্পনে পত্নীর মুখ চুম্বন করিলেন। পতি পত্নীর আঁখি মিলিত হইল।

চক্ষু চতুষ্টয় মিলিত হইবা মাত্র লাজময়ী সত্যশীলার নেত্রদ্বয় নত হইয়া আসিল। সুধীরচন্দ্র পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। সত্যশীলাও উঠিয়া বসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, ''আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন এসেছো?

সুধীব, অনেকক্ষণ।

সত্য। আমায় ডাকনি কেন?

সুধীর ঈষৎ হাসিমুখে কৌতুহলপূর্ণ কোমল স্বরে বলিলেন, ''ভেবেছিলুম চুপে চুপে একটী চুম্বন করে শোব।'' সত্যের অধরদ্বয় হাস্যে রঞ্জিত হইল। বলিলেন ''চুপে চুপে কেন?'' সুধীর সেইরূপ সুমধুর স্বরে বলিলেন, 'বিরক্ত হবে বলে।'' সত্যশীলার মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বিরক্ত হই?'

সুধীর। 'মুখে হও না সত্য কিন্তু মনে তো হতে পার।'' সত্যশীলা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এ কথা কোথায় পেলে?''

সুধীর। অনুমান কর।

সত্যশীলা গম্ভীর মুখে একবার গগনমণ্ডলস্থ দ্বাদশীর চন্দ্রের প্রতি চাহিলেন তৎপর মুহুর্তের জন্য স্বামীর মুখোপরি নয়ন দুটি স্থাপিত করিয়া আবার চক্ষু দুটি নত করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, ''কই তুমি ডাকলে কখন বিবক্ত হয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।' সুধীর সত্যশীলার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, ''বিরক্ত হও না, কিন্তু আনন্দও প্রকাশ কর না'। কই কর? এই আজকেই আমার চুম্বনের পর কই তুমি তো আনন্দ করে গলা ধরে প্রতি চুম্বন দিলে না'', সত্যশীলার মস্তকটি নত হইয়া পড়িল কহিলেন, ''তা আমি পারি না।''

সুধীর। ' কেন পার না।''

সত্যশীলা অপরাধীনীর ন্যায় ধীরে ধীরে বলিলেন ''বুঝতে পারি না।''

''বুঝতে পার না, সত্যই বুঝতে পার না, আমি যে তোমকে কত ভালবাসি তা তুমি বুঝতে পাব না, বুঝ না যে তুমি আমার জীবনের অপেক্ষাও প্রিয়।'' বলিতে বলিতে সুধীরচন্দ্র আবেগ ভবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরের আবেগ অভিমান সত্যশীলা না বুঝতে পারেন এমন নয়, তথাপি বলিলেন ''বোধ হয় তোমার পূর্ব্ব পত্নীকেও এ পদটি অনেকবার বলিয়াছ।'' পত্নীর এই কথা পতি

কর্ণে দারুণ শ্লেষ মিশ্রিত বোধ হইল, অভিমানে বলিলেন, "ওকথাই বলেছি, এ আর আশ্চর্য্য কি?" সত্যশীলা কহিলেন আশ্চর্য্য আর কি মান কুমারী বলেছেন, "অনন্ত অনন্ত প্রণয় ভাই জোয়ারের জল" তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সুধীর বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এরূপ ভাবে প্রণয়ের অবমাননা কর না।" সত্যশীলা স্বাভাবিক সহজ ভাবে বলিলেন, "আমি প্রণয়ের অবমাননা করি নাই, করে থাক তুমিই করেছ।"

সুধীর বুদ্ধিমানের মত আর কথা কাটাকাটী না করিয়া কহিলেন, "থাক এ আর শুনতে চাই না, নিদ্রার সময় অতীত প্রায় চল ঘুমাবে।" বলিয়া পত্নীর হস্ত দুখানি ধরিলেন।

"তুমি যাও খুকিকে দুধ খাইয়ে নিয়ে আমি যাচ্ছি। সুধীর পুনরায় পত্নীর হাত ধরিয়া সাগ্রহ সহকারে কহিলেন, "ঝি খাওয়াবে, এখন ওঠ।"

সত্যশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ ঝির কর্ত্তব্য নয়, মার কর্ত্তব্য। রাত্রি এগারটা বেজে গেছে, যাও শোও গে।" সুধীরচন্দ্র ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

৬

বেলা প্রায় ছটা সত্যশীলা স্নান ও জলযোগের পর কেবল সেলাইয়ের কল লইয়া বসিতেছেন, সুহাসিনীরও স্নানাদি শেষ হইয়াছে তিনি মাধুর্য্যকে লইয়া ব্যস্ত, এখন সময় সুকুমার চন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "বৌদি আর একটা বড় মাছ এসেছে।" বৌদিদি কথা কহিবার পূর্ব্বেই ছোট বৌ সুহাস সুকুমারের মুখের উপরে চঞ্চল চক্ষু দুটি স্থির করিয়া কহিলেন, "এসেছে তো কি হয়েছে?"

সুকুমার হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিয়াই কহিলেন, "সুহাস তুমি ভারি দুষ্ট হয়েচো।"

সুহাসের চক্ষুদুটি হাসিতেছিল দর্শনে ঈষৎ অধর চাপিয়া কহিলেন, 'তুমি ভারি লক্ষী হয়েছো।'

সুকুমার হাসি কৌতুক মিশ্রিত মুখে সুহাসকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিলেন, "রোস তোমার সব দুষ্টমির কথা বৌদিদির কাছে বলে দিচ্ছি।"

"আমিও বলে দিচ্চি" বলিয়া সুহাসিনী সত্যশীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কানে ফিস ফিস্ করিতে লাগিলেন। সুকুমার ছাড়িবার পাত্র নহেন, কহিলেন "দেখ দেখি তুমি বিচার কর।"

বৌদিদি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ দেওরকে বিশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, দেবরের এ কথায় কিছু উত্তর না দিয়া স্বভাব সুধীরা সত্যশীলা মৃদুস্বরে কহিলেন, "মাছের কথা কি বলছিলে ঠাকুর পো?" আশ্চর্য্য! গাম্ভীর্য্যের কাছে সকলেই নম্র, এতক্ষণ সুকুমারের চক্ষে মুখে হাস্য ও কৌতুক নৃত্য করিতেছিল, সত্যশীলার সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। ধীরে প্রশান্ত মুখে বৌদিদির চরণ যুগলে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, আমার দুজন বন্ধু এসেছেন, একটা বড় মাছও পাওয়া গেছে, বৌদিদি দুটী পোলাও পাক করে দেবে?" "আচ্ছা আমি পাকের উদ্যোগ করে দিচ্ছিগে, সুহাস খুকিকে দেখ।" বলিয়া সত্যশীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুকুমার কহিলেন, "বৌদিদি শুনেছ? দাদা ঢাকা যাচ্ছেন।"

বৌদিদি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কই, না। কেন যাচ্ছেন জান?"

সুকুমার। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু কি একটা মোকদ্দমায় বড় বিপদে পড়েছেন তিনিই দাদার কাছে টেলিগ্রাফ করেছেন।" "ও" বলিয়া সত্যশীলা রন্ধনার্থে প্রস্থান করিলেন। সুকুমার ও সুহাসিনী বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহারাদির পর যাত্রার সময় সুধীর চন্দ্র সত্যশীলার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সত্যশীলা মৃদুস্বরে করিলেন, "কবে আসবে।" "সুধীর, শীগগীর আসবো।"

সত্যশীলার স্বর অতি কোমল, করুণ স্বরে কহিলেন, "খুব সাবধানে থেক!"

সুধীর হাসিয়া কহিলেন, "অবশ্যই, তবে এখন আসি?" সত্যশীলা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গ্রীবাটী ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। সুধীরচন্দ্র যাইবার সময় সাদরে সত্যশীলার অধর চুম্বন করিলেন। অদ্য সত্যশীলাও পতিকণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রিয় মুখ চুম্বন করিলেন।

৭

এক সপ্তাহ পর সুধীরচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। যে জন্য গিয়া ছিলেন, তাহাতে সফল হওয়াতে মন খুব প্রফুল্ল হইয়াছে, সন্ধ্যাব পরই সত্যশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সত্যশীলা তাঁহার উদ্যানে একটী মর্ম্মর বেদিকার উপর শয়ন করিয়া ছিলেন, সুধীর আসিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "বসো বসো" বলিতে বলিতে সুধীর হাসিয়া বসিলেন, সত্যশীলা পুনরায় শয়ন করিলেন এবার তাঁহার উপাধান হইল "স্বামীর উপদেশ"।

সুধীর ঢাকার কত গল্প করিলেন, তথাকার রীতি, নীতি কথা বার্ত্তার এরূপ নকল করিয়া বলিতে লাগিলেন যে সত্যশীলা হাসিতে হাসিতে কর দ্বারা মুখাবৃত্ত করিতে লাগিলেন। সুধীর মুগ্ধ নয়নে এই হাসি রাশী দর্শন করিতে ছিলেন, বহুদিন তিনি এরূপ ভাবে স্ত্রীকে হাসিতে দেখেন নাই।

ক্রমে রাত্রি বেশী হইয়া আসিল চতুর্থীর ম্লান চন্দ্র ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই ম্লান মধুর স্নিগ্ধ শান্ত আলো রাশি আম গাছের ভিতর দিয়া স্বামীর অঙ্কশায়িনী সত্যশীলার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

উদ্যান নীরব, স্থির, চারিদিকে বেলা চামেলী ফুটিয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, সত্য ও সুধীর নীরব। বহুক্ষণ পর এই নিস্তব্দতা ভঙ্গ করিয়া সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "কি ভাবছো সত্য?"

সত্যশীলা সচকিতে কহিলেন, "কই কিছুই না।"

সুধীর। "তবে যে চুপ করে আছে"।

সত্য। "সে তো তুমি জান"।

সুধীর। "কই আমি জানি? তুমি কেন চুপ করে থাক। তাতো খুলে বল না।"

আবার বহুক্ষণ উভয় নীরব। অদ্য এই নীরবতা সুধীরচন্দ্রের অতি অসহনীয় হইয়া উঠিল, তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সবিষাদে পত্নীর ললাটে হস্তার্পণ করিয়া

কহিলেন, "সত্যশীলা আমি তোমার মনোমত নই? তুমি কি আমায় ভাল বাসিতে পার না?"

একি কথা, স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া কোন সাধ্বী স্ত্রী নীরবে থাকিতে পারে। সত্যশীলা সবেগে উঠিয়া বসিয়া উত্তেজনা সহকারে কহিলেন, "এ কথা বলে যে তুমি আমায় কেবল মর্ম্মাহিত করলে তা নয়, অপমানিত ও করলে, এ কথা তুমি কি করে বল্লে? তুমি যদি আমার মনমতো না হতে, আমি যদি তোমায় ভালবাসতে না পারতেম, তা হলে যে শিশু তাকে কখনই দেখতে পেতে না।" খুব তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সরলা সত্যশীলার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

সুধীর চন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে পুনরায় পত্নীকে অঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে কহিলেন, "আমি অন্যায় করেছি সত্যশীলা, আমাকে ক্ষমা কর, তোমার এই অস্বাভাবিক নীরবতায় আমার মনে এ প্রশ্ন উঠিয়াছে।" সত্যশীলা অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে কহিলেন,—"আমার এ গম্ভীর ভাবটা। যে একটু অস্বাভাবিক তা আমি বুঝি, আর এর কারণ—" সত্যশীলা চুপ করিলেন।

সুধীর অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "এর কারণ কি বল, বল, জানবার জন্য আমার ভারি আগ্রহ হচ্ছে।'

সত্যশীলা ধীরে কম্পিত গলায় কহিলেন, 'যখন আমার মনে হয় স্বামী অতি হৃদয় বিহীনের ন্যায় কেবল রিপু চরিতার্থের জন্যই আমাকে বিবাহ করেছেন তখনি আমার মন বড় খারাপ হয়।

সুধীর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি এই ভাবো? এতো আমি কখনই ভাবি নাই, আমি তো কখনই তোমাকে বিলাসের বস্তু বলে ভাবিনা জীবন সঙ্গিনীই মনে করি।"

সত্যশীলা ছিন্নতার বীণার মতো কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "জীবন সঙ্গিনী তুমি কাহাকে বল? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ও কি শুধু জীবন পর্য্যন্ত? মরে গেলে কি সে স্মৃতি থাকে না? যখন তুমি আমায় আদর করতে এস, ভালবাসি বলে প্রণয় প্রকাশ কর, তখনি আমাব মনে হয় এসব ভণ্ডামী। অবশ্য তুমি তোমার স্বর্গীয়া পত্নীকে এমনি সরল ভাবে বলিতে "আমি তোমার" এখন আমার হয়েছ আবাব আমি যদি আজ মরে যাই কাল কোন এক দশম বর্ষীয়া বালিকাকে আদর করে ভুলাবার জন্য বলবে. "আমি তোমার" এমন অস্থায়ী প্রেমে কে তৃপ্ত হতে পারে? বিপত্নীকের পত্নী হয়ে পতির বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেম পেলাম কিন্তু সে প্রেমে, পবিত্র গন্ধ ও আনন্দ কখনই পাওয়া যায় না।"

সত্যশীলাব কথা অবসানের পর সুধীব কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন সত্যশীলাব মুখে একসঙ্গে এতগুলি কথা, বিশেষতঃ তাহাব দুঃখের কারণ জানিয়া বিষাদে কিছুক্ষণ বাক স্ফুর্ত্তি হইল না, তৎপব একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ আমি ভাবি নাই, তাঁকে ভালবাসি নাই বলে, সত্যের অপলাপ করিতে আমার বাসনা নাই, তাঁর মৃত্যুর পর একবার আমাব মনে উঠেছিল· আব বিয়ে করবো না, কিন্তু সে কথা মুখ থেকে না বের কবতেই মা, ঠাকুরমা, সেটা এত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি মুখ থেকে বের

করতেই পারলাম না, কিন্তু তখন আমার মনে হয় নাই, যাঁকে বিবাহ করবো এই জন্য তিনি চিরদিনের জন্য অসুখী থাকবেন। সত্যই আমি বড় হতভাগ্য।

সত্য। "তুমি ভুল বল্লে। তুমি হয়তো সব ভুলে গেছো, কিন্তু আমি ভুলি নাই। সেই যে দিন সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন তুমি কথা বলবার জন্যে বল্লে "সত্য তুমি জান না আমার হৃদয়ে কি যন্ত্রনা ভেবেছিলাম এ যন্ত্রনা তুমি শীতল করবে।" বহুদিন হয়েছে তবু আমি তোমার সেই কথাটী ভুলি নাই, সেই কথাটী স্মরণ রেখে সর্ব্বদা তুমি যাতে শান্তি পাও, আমার সেই বাসনা। আমি ভাগ্যহীনা, নইলে তুমি নিজেকে কেন হতভাগ্য বলবে।" বলিতে বলিতে সত্যশীলা উঠিয়া বসিলেন। অশ্রুবিন্দু কপোল বহিয়া বস্ত্র সিক্ত করিতে লাগিল। সুধীরচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্ত্রীর নয়ন মার্জ্জনা করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন 'চুপ কর, চুপ কর, আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার এরূপ কান্না আমার বড় অসহনীয়, সত্যশীলা এখন আমি বুঝতে পারছি, এক পত্নীকে ভালোবাসিয়া আর একজনকে পত্নীকে বরণ করা অতি নির্ম্মম কাজ। যদি দ্বিতীয়া পত্নীকে হৃদয়ের সব ভাল বাসা দেওয়া যায় তবু তিনি ভাবিতে পারেন, "স্বামী কি নিষ্ঠুর" সুধীর বসিলেন।

সত্যশীলা বহুক্ষণ নীরব রহিলেন তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি ধীরে নীরব ভাব ধারণ করিল।

হঠাৎ খুকির ক্রন্দনধ্বনী, মার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে রোদনের শব্দে সত্যশীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "মাধুর্য্যের দুধ খাবার সময় হয়েছে, সে কাঁদচে, আমি আসি," সুধীর চন্দ্র ও উঠিলেন।

'অন্তঃপুর' —১৩০৯

নির্ব্বন্ধ

শ্রীগিবিবালা সেনগুপ্তা

সে আজ ৫/৬ বৎসরের কথা কলিকাতায় সেবার প্রথম "প্লেগ" দেখা দিয়াছে। নানা দেশ হইতে আসিয়া যাঁহারা কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন, এ সময় তাঁহারা অনেকেই স্ব স্ব পরিবার সহ অনতিবিলম্বে, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সেবার আমি বি, এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা হইতে স্বদেশে বিক্রমপুরে যাত্রা করিলাম। পরীক্ষার ৫/৭ দিন পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বাবা পত্র লিখিয়া দিলেন পরীক্ষা শেষ হইলে যেন আমি আর কলিকাতায় কালবিলম্ব না করি। শিয়ালদহ আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেন ছাড়িলে আমার ঘুম পাইতে লাগিল। ট্রেনের সহিত নিদ্রার কি সম্পর্ক জানি না; আমার কিন্তু ট্রেনে চড়িলেই শরীর অবশ হইয়া নিদ্রার আবেশ হইয়া থাকে।

আমার গন্তব্য স্থানের মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমার নিকটে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক আমাকে জাগ্রত দেখিয়া আমার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিলাম। আমি কলেজে পড়ি এবং ভদ্রঘরের সন্তান জানিয়া তিনি কাতর স্বরে বলিলেন,—"মহাশয় যদি অনুগ্রহ করে শ্রবণ করেন তা হ'লে আমি একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি।" আমি একটু নম্রস্বরে বলিলাম— "তা আপনি ভদ্রলোক, বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার একটা কথা শুন্‌বো তাতে আর আপত্তি কি হ'তে পারে?"

"দেখুন, আমারও বাড়ী বিক্রমপুরে; সম্প্রতি স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাসহ ছুটি নিয়া দেশে যাইতেছি। কিন্তু আমি একটী ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করিতেছি বলিয়া আপনাকে একটা অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি। আমার শরীরে অবস্থানুভবে বুঝিতেছি আমার জ্বর হয়েছে। আপনি জানেন গোয়ালন্দ ষ্টেসনে নামলে প্লেগ-ডাক্তার যখন পরীক্ষা করে আমার জ্বর হয়েছে জানতে পারবে আমাকে অবশ্যই তখন প্লেগ হাঁসপাতালে যেতে হবে। আমার স্ত্রী কন্যাটির কি উপায় হবে তা ভেবে আমি একটু অস্থির হয়েছি। আপনি শিক্ষিত লোক, যদি এ অসময়ে আমার উপকার করেন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ভদ্রলোকটীর নাম রমেশ বাবু। উহার কথা বলিবার স্বরেই বুঝিলাম যে উহার শরীর কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম,—"তা আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমাদ্বারা যে পর্য্যন্ত উপকার হতে পারে তাহা আমি নিশ্চয় করবো।"

গোয়ালন্দ ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিলে আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। রমেশ বাবু নামিতে পড়িয়া যাইতে ছিলেন, আমি তাহাকে ধরিয়া মেয়ে গাড়ীর নিকট লইয়া গেলাম। ক্রমে ক্রমে সব লোক চলিয়া গেলে আমরা টিকেট দিয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইবার জন্য চলিলাম। আমি অগ্রে অগ্রে রমেশ বাবুকে ধরিয়া আনিয়া ডাক্তারের নিকটে আসিয়া তাহার অদৃশ্যে রমেশ বাবুর হাত ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দেওয়ার কারণ, ডাক্তার পাছে ধরিয়া আনিতে দেখিয়াই সন্দেহ করেন। ডাক্তার বাবু কিন্তু তাঁহার হাত

ধরিয়াই ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, —"মহাশয়ের হাঁসপাতালে যেতে হতেছে; আপনার জ্বর হয়েছে।" রমেশ বাবু তজ্জন্য একপ্রকার প্রস্তুতই ছিলেন। আমরা বিনা আপত্তিতে হাঁসপাতালে গেলাম। তথায় রমেশ বাবু ভয়ানক প্লেগ জ্বরে অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। সরকারি ডাক্তার আপনা হইতেই আসিয়া ঔষধাদি দিয়া গেলেন।

আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম রমেশ বাবুর পরিবার শিক্ষিত, আধুনিক উদার সম্প্রদায় ভুক্ত। মেয়েটী অবিবাহিতা, বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইবে, দেখিতে সুন্দরী। রমেশ বাবুর স্ত্রী স্বামীর এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইলেন, কাঁদিয়া আমাকে বলিলেন,— "এ বিপদের সময় আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে উহাকে আর কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না। আপনি যদি ভীত না হইয়া এই সময়ে এই অবলা দুটীর সাহায্য করেন, তা হলে চিরকাল এ উপকার স্মরণ করবো।"

ইহাদের অবস্থা দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম,—'চিন্তা করবেন না, ভগবান আছেন। এ অবস্থায় মানুষ মানষকে ফেলে যেতে পারে না; আমি আপনাদের একটা উপায় না করে কোথাও যাব না।"

রমেশ বাবুর কন্যা শৈলজা অশ্রুবিগলিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি যে এই বিপদের সময় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম এই জন্য তাহার সরল আঁখি দুটী যেন তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আমাকে জ্ঞাপন করিল।

তিনজন সারারাত্রি পরিশ্রম সহকারে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। প্লেগের হৃদয় বিদারক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিশাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্ত্রীকন্যাকে সংসার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া রমেশ বাবু মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

আমি মহাবিপদে পড়িলাম। দুইটী স্ত্রীলোক অন্তঃস্থলস্পর্শী করুণ ক্রন্দনে একে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তাহাতে আবার শব সৎকারের কঠোর কর্ত্তব্য আশু সম্পাদন আবশ্যক হইল। অনেক বলিয়া কহিয়া উহাদের একটু শান্ত করিয়া একটী লোকের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। প্লেগের মড়া পুড়িতে সহজে কেহই স্বীকৃত হইল না। অনেক ঘুরিয়া পাঁচটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একটী লোক সংগ্রহ করিলাম। তাহার সাহায্যে যথাসাধ্য শব সৎকার করিয়া বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় শৈলজা ও তাহার মাকে বলিয়া কহিয়া স্নান করাইয়া নিজে স্নান করিলাম। রমেশ বাবুর সঙ্গে বেশী টাকা ছিল না। যাহা কিছু ছিল তাহাতে সৎকারের কাঠ ইত্যাদি খরচ এবং একটি লোকের পারিশ্রমিক হইতে পারে না। রমেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন- "আমার নিকট আর একটি পয়সাও নাই; আপনি আমার এই বালা বিক্রি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করতঃ উপস্থিত খরচ সংকুলান করুন।"

আমার নিকটও বেশী টাকা ছিল না। তথাপি সদ্য বিধবার হস্তাপসারিত স্বর্ণবলয় বিক্রি করিতে আমার মন কিছুতেই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম,—"এখন রাখুন, আমি অন্য উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারি কিনা দেখি। অবশ্য আমার নিকট টাকা থাকিলে ভাববার কোন কারণই ছিল না।"

আমি ভাবিতে ভাবিতে বাজারের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে আসিবার

সময় ৫০্ টাকা মূল্যে ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির একটি ঘড়ি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। বাজারে যাইয়া ২৫্ টাকায় ঘড়িটী বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম একথা প্রকাশ করিব না; কিন্তু শৈলজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। আমি ঘরে ঢুকিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছি বলাতে শৈলজা তাহার হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—"আপনার ঘড়িটি দেখিতেছিনা, বোধ হয় বিক্রয় করতে হয়েছে।"

শৈলজা এত সহজেই বিষয়টা ধরিয়া ফেলিল দেখিয়া একটু লজ্জিত হইলাম, কোন উত্তর করিলাম না। শৈলজা কৃতজ্ঞ নেত্রে একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক অবনত করিল।

পরদিন প্রাতে ষ্টীমারে চড়িয়া রাত্রিতে রমেশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীতে এক খানা মাত্র পুরাতন্ দালান, কপাট বাহির হইতেতালাবন্ধ। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র সপরিবারে বাস করেন তাঁহাদের অনেকের বাড়ীই এই প্রকার তালাবন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

সে দিনকার রাত্রি তথায়ই অতিবাহিত করিলাম। আমাদের নিজ বাড়ী তথা হইতে ৪/৫ ঘণ্টার পথ ব্যবধান হইবে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া শৈলজা এবং তাহার মাতার নিকট বিদায় লইলাম। ঘড়ি বিক্রির টাকা খরচ বাদে আমার নিকট যাহা ছিল তৎসমুদয় রমেশ বাবুর স্ত্রীর নিকট দিয়া বলিলাম,—'এখন আপনাদের সব ঠিক ক'রে নিতে একটু সময় লাগবে। এই সময় ইহা দ্বারা আপনাদের খরচ চালাবেন এবং ইহা গ্রহণ করতে কোন আপত্তি করলে বড়ই দুঃখিত হব।" চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লজ্জা ও কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া দিলেন,—আপনার উপকার এ জন্মে ভুলবো না। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। সময় সময় আমাদের খবর নিবেন, সংসারে আমাদের দিগে চাহিবার আর কেহ নাই।"

সর্ব্বদা তাহাদের অনুসন্ধান করিব এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় হইব এমন সময় শৈলজার বাষ্পপূর্ণ কোমল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল; সে প্রকোষ্ঠের এক কোণে দাঁড়াইয়া আমার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিলে সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না।

অনিমেষ নেত্রে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া মস্তক নত করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিত। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম,—"শৈলজা, এখন যাই, সুবিধা পেলে শীঘ্রই তোমাদিগকে দেখে যাব। কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িলে আমাকে চিঠি লিখো।"

"অবশ্য একবার আসবেন।" শৈলজা আরও কিছু বলিতে চাহিতেছে বুঝিলাম, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। আমি আর বিলম্ব না করিয়া শৈলজার প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে বাড়ী অভিমুখে চলিলাম।

সমস্ত পথ কেবল শৈলজার কথাই ভাবিলাম। শৈলজা বেশ সুন্দরী ও সুশীলা সে আমার সহিত কথা বলিতে সময় সময় এত লজ্জিত হইত কেন, তাহার জন্য মন এত চঞ্চল হইল কেন, আবার তাহাকে দেখিতে আসিব কি না, ইত্যাদি ভাবনায় মন বড়ই

অস্থির হইল। বাড়ী পৌঁছিয়া এ সব ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না।

বাড়ী আসিয়া নিয়মিত সময়ে স্নানাহার কবি বটে কিন্তু মনে একেবারেই প্রফুল্লতা নাই। কাহারও সহিত বড় বিশেষ আলাপ পরিচয় করি না। পূর্ব্বে আমার একমাত্র বৌদিদি কোন কথাচ্ছলে কোন রূপ বিদ্রূপ করিলে তাহার সমুচিত উত্তর শুনিয়া পরাস্ত হইয়া যাইতেন। এবার বাড়ী আসিয়া তাঁহার কোন বিদ্রূপে আর সেইরূপ উত্তর প্রদান করি না, আমি বি, এ. পরীক্ষা দিয়াছি, ভালরূপ পাস হইব সকলেই আশা করিতেছে। আর চতুর্দ্দিক হইতে মৌমাছির ন্যায় ঘটকগণ আসিয়া আমার বৃদ্ধ পিতাকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং তাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিকাদির ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। বাবা বৃদ্ধ হইয়াছেন, সংসারের কাজ কর্ম্ম নিজে দেখিতে পারেন না। বড় ভাইর উপরই সংসারে সম্পূর্ণ ভার। প্রত্যহ অসংখ্য ঘটক আসিতেছে দেখিয়া বাবা তাহাদিগকে একদিন বলিয়া দিলেন,—"আপনারা আমার বড় ছেলের সহিত এ বিষয়ে প্রস্তাব করুন, সে যা হয় একটা করবে।"

দাদা বৌদিদির দ্বারা পরোক্ষে আমার অভিমত জানিতে চাহিলেন। আমি বৌদিদিকে স্পষ্ট বলিলাম যে এখন আমি বিবাহ করিব না। বৌদিদি অত্যন্ত চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, তিনি আমার পূর্ব্বাপর ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"ঠাকুর পো! আপনি নিশ্চয়ই কোন কারণে মনঃকষ্টে আছেন; তা আমাকে খুলে বলুন, আমা দ্বারা আপনার উপকার বৈ অপকার হবে না। আমি আপনার মানসিক অবস্থা কতকটা বুঝতে না পেরেছি এমন নয়।"

বৌদিদির করুণ বাক্যে আমার মনে একটু, শান্তি আসিল; আমি সরল চিত্তে শৈলজা ঘটিত সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন,—"আমরা সাধারণ ওঝা নই, মনের বিষ টেনে বের করতে পারি। আপনি যে এরূপ একখানা উপন্যাস তৈয়ার করে বসে আছেন তা অনুমানেই বুঝতে পেরে ছিলাম।" আমার জীবনে বৌদিদির নিকট বিদ্রূপে এই প্রথম হারিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে ভাবিলাম আজি একটা কাণ্ড হইবে, দাদা ও বাবার কাণে আজ নিশ্চয়ই এই কথা উঠিবে। আমার মনে ভয়ানক উদ্বেগ উপস্থিত হইল। যদি বাবা এবং দাদা আমার ইচ্ছার বিরোধী হন তবেই সর্ব্বনাশ হইবে।

আহারান্তে রাত্রে শয়ন করিতে চলিয়াছি; বাবা যে ঘরে থাকেন তাহার পার্শ্ব দিয়াই আমার ঘরে যাইতে হয়। আমার পায়ে রবারসোলের জুতা ছিল; আমি নিঃশব্দে শয়ণ কক্ষে যাইতেছি, শুনিতে পাইলাম বাবা ও দাদা বিবাহ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমি দাঁড়াইলাম শুনিলাম বাবা বলিতেছেন,—"তা হবে না, এই মেয়ে আমি কিছুতেই ঘরে আন্‌তে পারি না। মাথার কাপড় ফেলে, চুলে ফুল গুঁজে, গা ফুঁদিয়ে চলবেন এমন লক্ষ্মী বউ আমি চাই না। যতীন্দ্রের ইচ্ছা হয় সে সেই বিয়ে করতে পারে, কিন্তু আমি তাতে নেই জানবে,—এ বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিতে পারব না। তুমিও এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ কর্‌তে এস না।"

শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি নিঃশব্দে যাইয়া বিছানায় শয়ন করিয়া আকাশ

পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। হায়! শৈলজা আমার এত আদরের হইল কিসে?

প্রাতে বর্হিবাটিতে কেদারায় বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বিষবৃক্ষের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য হরদেব ঘোষালের পত্রখানা পড়িব। এমন সময় ডাক পিয়ন চিঠি বিলি করিয়া গেল। আর বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষালের পত্র খোঁজা হইল না, ব্যস্ত হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িলাম। শৈলজা ও তাহার মাতা একই কাগজে ভিন্ন ভিন্ন দুই খানা চিঠি লিখিয়াছে। আমি বাড়ীতে আসিয়া উহাদের জন্য গোপনে নিজ হইতে যে কয়টী টাকা সাহায্য করিয়া ছিলাম তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়াই দুই পত্রেব উদ্দেশ্য। শৈলজার মাতা তাঁহার পত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "সংসারে আমাদের আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, আপনি আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল, কাজেই আপনার নিকট একটী বিষয় না লিখিয়া পারিলাম না। শৈলজার বয়স অনেক হইয়াছে, এখন উহাকে যে প্রকারে হউক বিবাহ দেওয়া দরকার। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কন্যাদায় হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইতে পারি না। আপনি অনুসন্ধান করিলে শ্রীমতির জন্য একটি সৎপাত্র যোগাড় করিতে পারিবেন আশা করি।"

চিঠি পড়িয়া মন আরও খারাপ হইল। ভাবিলাম যাহার সুখ-স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া আছি তাহাকে নিজে চেষ্টা করিয়া অন্যের হাতে তুলিয়া দিব?—না, তাহা কিছুতেই পারিব না। আবার বিপরীত ভাবিলাম—মনে করিলাম আমি ত পিতার অমতে কিছুতেই শৈলজাকে বিবাহ করিতে পারিব না। তবে কি সে চিরজীবন কষ্ট পাইবে?—আমি সুখী হইতে পারিব না বলিয়া কি তাহাকেও সুখী হইতে দিব না? ভাবিতে ভাবিতে চিঠি খানা হাতে করিয়া একদিকে চলিয়া গেলাম।

আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি ইংরাজী ও ফিলসফিতে অনার পাশ করিয়াছি দেখিলাম। দাদা ও বৌদিদির একান্ত ইচ্ছা যে বিবাহটা এখন শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আমি কিন্তু বৌদিদির নিকট স্পষ্ট বলিলাম যে এখন কিছুতেই বিবাহ করিব না। বৌদিদি আমার ভাব স্বভাব দেখিয়া কেবল হাসিতেন; আমার কিন্তু সে হাসি একটুও ভাল লাগিত না।

কলেজ খুলিলে আমি এম্ এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। তথায় যাইয়া মনে ঠিক করিলাম,—আমার নিজের জন্য শৈলজার জীবন নষ্ট করিব না, স্থির করিলাম। একটা সৎপাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া নিজে চির জীবন অবিবাহিত থাকিব মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। শৈলজার জন্য আমার একজন বি, এ, পাস সহাধ্যায়ীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করাতে তিনি এ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শৈলজার মাকে সে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলাম। মনের কি প্রকার অবস্থা লইয়া চিঠি খানা লিখিলাম তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারি না। ডাকবাক্সে চিঠি দিয়া আসিয়া নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম।

ইহার কয়েকদিন পর শৈলজার এক পত্র পাইলাম। পত্রখানা এইরূপঃ—

শ্রদ্ধেয় যতীন বাবু, আপনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আপনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, বলিতে গেলে আমাদের জাতি-কুল-মান

সব রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি। কিন্তু আপনি সম্প্রতি যাহা করিতেছেন তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনি জানেন যে আমি ব্যতীত মার আপনার বলিবার আর কেহই নাই, এমতাবস্থায় আমি অন্যের অধীনা হইলে তাঁহার কষ্টের আর সীমা থাকিবে না; তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কিছুতেই চলিবে না। আমার বিবাহ হয় ভগবানের বোধ হয় সেইরূপ ইচ্ছা নয়, কাজেই অনুনয় করিয়া লিখিতেছি আপনি সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন। অনেক উপকার করিয়াছেন এটীও করিবেন। রমণীর প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

আপনার কৃপাকাঙ্ক্ষিণী

শৈলজা।

চিঠি পড়িয়া সব বুঝিলাম। আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছে সে আগুন যে শৈলজার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে তাহা বেশ জানিলাম। হতভাগিনীর জন্য বড়ই কষ্ট হইল। তাহাকে লিখিলাম—"তোমার চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। স্ত্রী-লোকের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ্ না হইলে ধর্ম্ম ও সমাজের নিকট অপরাধিনী হইতে হয়। কাজেই আমার অনুরোধ, তোমার মত পরিবর্ত্তন কর, নতুবা আমি বড়ই দুঃখিত হইব।"

প্রায় একমাস যাবং কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে আসিয়া উহাদিগকে কিছুই সাহায্য করিতে পারি নাই। সেই জন্য এই চিঠির সহিত ১০্ টাকার একখানা নোট পাঠাইয়া দিলাম। চিঠিখানা ডাকে দিয়া সাতপাঁচ ভাবিতেছি এমন সময় এক আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাইলাম! খুলিয়া দেখি দাদা পাঠাইয়াছেন সংবাদ— "টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র বাড়ী রওনা হইয়া আইস।"

চিন্তার উপর আবার চিন্তা আসিল। একমাস হইল মাত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছি, ইতিমধ্যেই আবার বাড়ী যাইবার জন্য জরুরী টেলিগ্রাম কেন? কারো কি কোন ব্যারাম হইল?—বাবা বৃদ্ধ, এক প্রকার চলচ্ছক্তিহীন, তাঁহার তো কোন অমঙ্গল হইল না? ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে পৃথিবী আঁধার ঠেকিতে লাগিল। আর চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া সেই দিনকার রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী রওনা হইলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় বাড়ীতে নীরব বিমর্ষ ভাব দেখিবার আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আর তৎপরিবর্ত্তে সমবেত পাড়াপড়্সীদের আনন্দ কোলাহল ও মঙ্গল ধ্বনিতে আমার প্রাণ কেমন হইয়া গেল। দেখিয়াই বুঝিলাম আর কিছুই নয়, এ যতীন্দ্র-মেদ যজ্ঞের আয়োজন মাত্র। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বরাবর আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলাম। বৌদিদি আসিয়া আহারের জন্য ডাকিলেন। শরীর ভাল নয়, কিছু খাব না বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

সারারাত্রি কি ভাবে কাটাইলাম তাহা ভগবানই জানেন। পরদিন আমার "অধিবাস,"—আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। আমি শয্যা পরিত্যাগ করিতে সহজে স্বীকৃত হইলাম না।

বৌদিদি আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন—এ অপরাধ সম্পূর্ণ তাঁহার,

তাঁহাকে ক্ষমা করিতেই হইবে—ইত্যাদি বলিয়া আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। এবং তাঁহার ঘটকালির নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিলেন ঃ—

"দেখুন, আমার একটী দূর-সম্পর্কান্বিতা ভগ্নী—সংসারে তাহার কেউ নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, অবস্থা নিতান্ত খারাপ।

দেখিতে সুন্দরী বটে। তার জন্য আমার নিকট অনুরোধ আস্‌লে আমি ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরে তাঁহাকে সম্মত করাইয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেছি। দেখুন্ আপনি শিক্ষিত; আপনি যদি গরীবের এ উপকার না করেন তবে কে করবে? আমার বোন্‌টী নিতান্ত গরীব, এই কথা মনে করে আমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল, বলিলাম,—"আপনাকে বিশ্বাস করে মনের কথা বলেছিলেম বলেই আমাকে এই শাস্তি দিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে আপনি জেনে শুনে একটী স্ত্রীলোকের জীবন চিরকালের জন্য নষ্ট করেন; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই স্ত্রীলোকটী নাকি আবার আপনারই আত্মীয়া।"

যত ভাবিতে লাগিলাম মনের আবেগ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পুনরায় বলিলাম,—"এইরূপেই কি আত্মীয়ের উপকার করতে হয়। আপনারা জোর করে যা কর্‌তেছেন তার নাম যে বিবাহ নয় তা হয় তো বুঝতে পারেন। তবে রীতি রক্ষা হবে মাত্র; আপনার বোন্ আপনারই থাকবে"।

বৌদিদি যেন বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"রীতি রক্ষা ও জাতি রক্ষা দুই-ই হবে।"

"কেন, আমি কি ঘরের বে'র হয়ে যাচ্ছিলাম?"

"আপনার কথা নয়, আমার বোনের কথা বল্‌ছি। তার বয়স কিছু বেশী হয়েছে, হিন্দু সমাজে এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা কচিৎ দেখা যায়। আপনি শিক্ষিত লোক, তার জাতি রক্ষা না করলে কে করবে?"

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ের যন্ত্রণায় সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। আমার এ অবস্থায় অন্যে পড়িলে কি করিত জানি না; আমি কিন্তু অহিফেন সেবন করিয়া বা গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিলাম না। অবশ্য সে জন্য আমার অকৃত্রিম ভালবাসায় কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যাহা হউক, বৌদিদির নিকট আমার কোন কথাই খাটিল না। পরদিন যথাশাস্ত্র আমার বিবাহ ঘটিয়া গেল। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তোতার মত কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। মুখচন্দ্রিকার সময় দুঃখে কষ্টে ও ক্ষোভে চক্ষু বুজিয়া রহিলাম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন আমার মাথার উপর ঘুরিতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম,—"জগদীশ! এই অসীম সংসারের এককোণে এই দুইটী সামান্য জীবনের উপর তোমার এত প্রখর দৃষ্টি পড়িল কেন! এ জীবন দুটী মাটি করিয়া তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সাধন করিবে?"

বিবাহের পর গোলযোগ মিটিয়া গেলে বৌদিদির আদেশে পুত্তলিকার মত ফুলশয্যায় শুইতে গেলাম। জীবনে প্রথম স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে যাইতে লোকে মনে কিরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকে জানি না; আমি হতভাগা কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রবেশ করিলাম।

অবনত মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অদৃষ্ট ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত আলোক সম্মুখে আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। "কে! শৈ-শৈলজা!" বলিতেই আমার কণ্ঠরোধ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার নিকটে পড়িয়া অচৈতন্য হইলাম।

পরদিন প্রাতে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেছি, দ্বারের নিকটেই বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ হইল; যেন তিনি আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি ঘরের বাহির হইতেই মুখের হাসি চাপিয়া, মুখখানা একটু কৃত্রিম ভাব করিয়া বলিলেন,—"আপনার অনুগ্রহে আমার বোনের জাতি তো কোন প্রকারে রক্ষা কর্‌লেম। আপনার বোধ হয় অশান্তি বোধ হইতেছে! বলেন তো আজই তাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিই।"

আমি অনেক দিন পর আজ প্রকৃত মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"এ ঘটকালী কোথায় শিখ্‌লে বৌদিদি? আজ হতে তোমার পূজাটাই আগে করবো।"

বৌদিদি এবার আর হাসি রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"এখন পূজা করবার দেবতা আরও পাবেন। কিন্তু সাবধান, ঘট্‌কালীর বাহাদুরিটা যেন সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়ে না পড়ে। শ্বশুর ঠাকুরের কানে উঠ্‌লে আর এ বাড়ীতে আমার ঠাঁই হবে না।

'অন্তঃপুর'—১৩১০

সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি

শ্রীস্নেহলতা সেন

দার্জিলিং পাহাড় হইতে ফিরিবাব এক মাস পরেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। বড় দিনের ছুটিতে পত্নীকে লইয়া শ্বশুব গৃহে গেলাম। বিবাহেব পর এই প্রথম নতুন জামাই বাড়ীতে আসাতে অত্যন্ত ধূম ধাম পড়িয়া গেল। আমার শ্যালিকা, বীণার খুড়তত ভগ্নী, নূতন ভগ্নীপতিকে জলযোগ করাইয়া বলিলেন. "প্রমথ বাবু, আপনার ঘড়ির চেনে এ সব কি ঝুলছে? দেখি, একটি হীরে বসান পেন্সিল, একটি সোনাব কম্পাস্, আর একটা --এটা কি একটা নূতন পয়সা?"

প্রমথ বাবু বলিলেন, "তা বেশত। কিছু দোষ আছে কি?"

"তা কি বলছি। কিন্তু কেন রেখেছ তাহা বল্‌তে কি দোষ আছে?"

"উহা একটা Charm।"

"কি রকম চার্ম?"

"বিয়ের দিন রাত্রে তোমার দিদি আমার চেনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না, মিথ্যা কথা।"

"না সত্যি স্বামী বশ করবার মন্ত্র পড়ে তোমার দিদি জেদ করে পবিয়ে দিলেন।"

আমার শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা আর কিছু বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহার উপহাসের জ্বালার ভয়ে বলিতে সাহসও হইল না, কিন্তু যদি কেহ শুনিতে চাহে তাই বলিতেছি।

আমি বিলাত না গিয়াই ষোল আনা সাহেব ছিলাম, কাজেই মাঝে মাঝে বিলাতি দোকানে যাইতে হইত— সেলের (Sale) সময়ত কথাই নাই। গ্রীষ্মের উপযুক্ত কয়েকটা কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, তাহা কিনিবার নিমিত্ত White away-র দোকানের জন্য বাহির হইলাম। এই দোকানে (Chronic state of sale) সেল চলিত, রোগটা কখনও বেশি কখনও কম। আজ দেখিলাম আর এক সেলের বিজ্ঞাপন দোকানের দেওযালে রহিয়াছে। এখান হইতে দুচারখান জিনিষ কিনিয়া অন্য দুএক দোকানে ঘুবিয়া ঘুবিযা অবশেষে সন্ধ্যাব সময় Harri son Hathaway-র দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম (Half price) অর্দ্ধেক মূল্যের সেল হচ্ছে। ইংরাজ সাহেব মেম, বাঙ্গালি সাহেব মেম, পার্সি, বাঙ্গালি বাবু, মাড়ওয়াড়ি, দর্জি মহাশয়, চান্দনির দোকানদার ইত্যাদিতে ঘরগুলি পরিপূর্ণ, নড়িবার জায়গা নাই। দর্জি, মাড়ওয়াড়ি ও দোকানদারগুলি কাপড়ের থান যে টেবিলের উপর রাশীকৃত ছিল, তাহা আক্রমণ করিয়াছেন। মেমগণ লেস ফিতা ইত্যাদির নিকট মৌচাকের চতুর্দ্দিকে মৌমাছির ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, বাঙ্গালি বাবুগণ সস্তা দরে বিলাতি বুট ও জুতা আনন্দিত মনে উৎসাহের সহিত কিনিতেছেন, সাহেবগণ এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। আমার-বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সস্তা একটি রেশমের ছাতা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহা কিনিয়া দোকানের সাহেবের হাতে একটা গিনি দিয়া ৫ ব৫ টাকার জন্য কাউন্টারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম।

সে বৎসর সরকার গরিব ভারতবাসীদিগের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা (গিনি) বিতরণ করিয়াছিলেন। একজন দ্বারবান বা পাখা-কুলি চারি মাসের মাহিনা হইতে অতি কষ্টে ষোলটি টাকা সঞ্চয় করিয়া সুদূর গ্রামে তাহার জননী বা পত্নীকে মনি ওর্ডার পাঠাইলে, সেখানে তাহার হাতে ডাকওয়ালা একটি গিনি ও একটি টাকা দিয়া আসিত। সে দুঃখিনী জন্মে একবার সোনা স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিত, কিন্তু তাহা পুনরায় ভাঙ্গাইতে গিয়া প্রাণান্ত হইত ও পাঁচটি বা ছয়টি পয়সা ব্যয় করিতে হইত।

আমি ভাবিলাম বেশ হয়েছে এখানেই গিনিটা ভাঙ্গান হইবে। চারিদিকে কি হইতেছে তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলাম, এমন সময় সাহেব আসিয়া কহিল, "মশায় এ গিনিটা কি রকম?" (Sir this guinea looks queer) আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহা হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম যথার্থ Queer কারণ ইহা গিনি নহে, একটি মাজা ঘসা ঝক্‌ঝকে নূতন পয়সা! আমার পার্সে গিনি রাখিয়া ছিলাম পয়সাটা কি আসিল! তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে আমার পূজনীয়া বৌঠানেদের মধ্যে কাহারও কাণ্ড। আমি পয়সাটা রাখিয়া, একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলাম। সাহেবটি আমার মুখপ্রতি তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চেঞ্জ (Change) আনিতে গেল। এমন সময় আমার পার্শ্বে কাউন্টারের সম্মুখে আর একজন আমারই মত বাঙ্গালি সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বা অধিক হইবে, তাঁহার পশ্চাতে এক চৌদ্দ পনের বৎসরে বালিকা সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রতি আমার মন ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল। নাটক নভেলে নায়িকার ন্যায় ইহার যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নিখুঁত মুখমণ্ডল তাহা বলিতে পারি না, তবে এমন অনির্বচনীয় কমনীয় কোমল লাবণ্যময়ী মুখশ্রী আর কখনও দেখি নাই। আধুনিক বিলাত প্রত্যাগত সমাজের ন্যায় বেশভূষা, মস্তক অনাবৃত, ঘন মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠ ছাইয়াছে, একটি সরু জরীর ফিতা মস্তকে বাঁধা রহিয়াছে। বালিকা এত লোকের মধ্যে যেন জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একজন বেহারা বাবুর বিবিধ আকারের চারি পাঁচটি পার্সেল লইয়া আসিল, তখন তিনি একটি ৫০ টাকার নোট একজন সাহেবের হাতে দিলেন। সে হিসাব করিয়া একটি গিনি এবং কয়েকটা টাকা ও পয়সা ফিরাইয়া বাবুর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। ঠিক এই সময় দোকানের একজন মেম ঠক্ ঠক্ ক'রে বাবুর ও আমার মাঝখানে আসিয়া কেরানী বাবুকে কি একটা তাড়াতাড়ি বলিয়া একখানা কাগজ ফেলিয়া ফিরিলেন। মনে হইল যেন একটি ছোট রকম ঝড় বহিয়া গেল। এমন সময় অন্য সাহেব আমার হাতে আমার ফেরত টাকা ও রেজকী দিয়া গেল, আমি অন্যমনস্কভাবে পার্সে ভরিলাম কিন্তু উহা বন্ধ করিতে আর সময় পেলাম না। ঠিক সেই সময় মেমের নূতন ফ্যাসনের পাঞ্জাবি কুর্ত্তার ন্যায় আস্তিনের এক ঝাপটা লাগিয়া টেবিলের উপরে বাবুর টাকা পয়সা ও গিনি সমুদায় ঝনাৎ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মেমটি মধুর স্বরে বলিলেন, "Oh I beg your pardon" এবং সে স্থান হইতে সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া গেলেন। বাবু এদিকে ঝুঁকিয়া কুড়াইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঝুকিলাম; আমার খোলা

পার্সের সমুদায় এবার-ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল। তখন আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কত ছিল?"

"একটা গিনি ও সাড়ে চারিটা টাকা।" আমি সব একত্র করিয়া তাহার পর তাঁহার হাতে একটি গিনি ও চারি টাকা আট আনা দিয়া নিজের পার্সে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ভরিলাম। এদিকে দোকান বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে, দুই তিনজন দোকানের সাহেব মেম তাহাদের অধৈর্য্য স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছিল। আমি আর একবার বালিকার সুন্দর-মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার ছাতা হাতে লইয়া প্রস্থান করিব এমন সময় বাবুটি উচ্চৈস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "I say how's this? what did you give me? This is not a guinea!"

আমি একটু থমকিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম সত্য গিনি নহে, আমার সেই লক্ষ্মী ছাড়া পয়সাটা; বোধহয় উঠাইবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ও তাড়াতাড়িতে এই ভুলটা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে সাহেবকে ভুলক্রমে উহা দিয়াছিলাম সে বিদ্রুপ ও সন্দেহযুক্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "Why, that's the very coin You gave me just now for a guinea"! (এইটাইত আপনি আমাকে গিনি বলিয়া দিয়াছিলেন) ইতিমধ্যে চারি পাঁচ জন দোকানের লোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলের মুখে সন্দেহের ভাব। বাবু হাত বাড়াইয়া ঝুটা গিনিটা আমায় দিলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বিস্ময়পূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখ প্রতি চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িল, তাহার মুখ লাল হইল আমি চারিদিকে পুনর্বার চাহিলাম। মনে মনে বলিলাম "ধরণী দ্বিধা হও" কিন্তু ধরণী দ্বিধা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে, তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, "ডাইনেমাইট্ এক্সপ্লোসন হউক, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হউক, কলিকাতা জাহান্নমে যাক্, (Russian) "রাসিয়ান"রা এখনই আসুক। আবার ভাবিলাম যে এক লাফ দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ি; কিন্তু হায় কিছুই হইল না। আমি সেখানেই নির্ব্বিঘ্নে বেষ্টিত হইয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম ও থতমত ভাবে কহিলাম "উঠাইবার সময় গোলমাল হইয়াছিল বোধহয়। এই নিন্ আপনার গিনি।"

"সুবিধারকম ভুল"! এই কথা শুষ্ক ভাবে বলিয়া তিনি পার্সে ভরিলেন।

আমি আর একবার চেষ্টা করিযা বলিলাম, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি পার্সে একটা গিনি রাখিয়াছিলাম, বোধ হয় বাড়ীতে কেহ ঠাট্টা করিয়া উহা বদলাইয়া দিয়াছিল, তাই আমি—"

"ওঃ তাই বুঝি আপনি ঠাট্টাটা আমার উপর চালালেন।" একটু বিদ্রূপের হাসি অধরে দেখা দিল। বালিকা তিরস্কারের স্বরে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

একটি কথা কেবল, কিন্তু আমার কানে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। দেখিলাম আর কিছু বলা বৃথা। বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবার চাহিলাম, তাহার পর বৌঠানকে কি রূপে জব্দ করিব তাই ভাবিতে ভাবিতে কোন রকমে দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাড়ী গিয়া আমার দুই বৌঠানকে সম্মুখে হাজির করিয়া খুব ঝগড়া করিলাম। ঝগড়াটা

এক পক্ষীয় কারণ দুইজনেই হেসে হেসে কুটি কুটি হইলেন। যখন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন তখন একজন বলিলেন, "বাবা গেলুম!" আর একজন বলিলেন, "ঠাকুরপো কেমন জব্দ হয়েছেন আজ।" আমি খুব চটিয়া বলিলাম, "আচ্ছা দেখা যাবে, দুইজনেই পরে বুঝিবে।" এতক্ষণে আমার রাগটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, আর সেই মধুর কণ্ঠস্বরের একটি কথা "বাবা!" কানে লাগিয়াছিল, সেই মুখ কেবল মনে আসিতেছিল, মেজজাটা শিগ্‌গিরই ঠাণ্ডা হইল। তখন বলিলাম, "আচ্ছা এখন তোমাদের আনন্দটা যদি একটু ক'মে থাকে তবে এখন বল ত কে করেছে, এই কাজটা?" কেহ কিছু স্বীকার করিল না। তখন বলিলাম, "যদি Sherlock Holmes-এর মত (Detective) ডিটেক্‌টিভ হতুম, তা হ'লে এখনি বলে দিতে পারতাম্।"

ছোট বৌঠানকে চোখ দুটি বড় করিয়া বলিলেন, "সে আবার কি?"

"Sherlock Holmes ব'লে একজন ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ ছিল; তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল। সে খুনের বা ডাকাতির স্থানে যাইয়া একটা কাগজের টুকরা বা একটা পয়সা উঠাইয়া বলিয়া দিত, "যে যাহার'এই কাগজ বা পয়সা তাহার এক চোখ কানা, লাল চুল, ৪০ বৎসর বয়স বেঁটে, রাগী আর খুব দুধ .... তার এমন শক্তি যে ঐ কাগজটা .... এই সব বাহির করিত।"

"যাও, আর গল্প বলে ....

"সত্যি বৌঠান, এ রকম একটা .... ছিল। আচ্ছা Count of Mo.... Cristoর গল্পটা বলা শেষ হ'লে, এই বইয়ের গল্প বলিব। কিন্তু আজকের কথা ভুলছি না, এর শোধ নেবো।" আর বাস্তবিকই লইয়াছিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি যে আমি মাঝে মাঝে বৌঠানদের ছুটীর সময় কোন ইংরাজি বইয়ের গল্প বলিতাম।

তার পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতে হঠাৎ আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। একটি প্যারাতে লেখা আছে, "The dangers of shopping in English shops"—তাহার মর্ম্ম এই যে আজ কাল বিলাতি দোকানের সেলে নানাপ্রকার লোক যায়। জুয়াচোর ভদ্রলোক, সাহেব সেজে যায়। গত কল্য সন্ধ্যা বেলা একজন লোক একটি পয়সা গিনি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছিল ইত্যাদি।" প্যারাটার নিম্নে নাম ছিল "By one who knows" আমি নীরবে একা একা ইহা তিনবার পড়িয়া, উহা কাটিয়া বাহির করিয়া আমার বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। আর সেই লোকটিও তাহার কন্যা কে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

তিন চারি মাস পরে আমি পূজার ছুটীতে দার্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি একটি বেঞ্চে বসিব ভাবিতেছি— দেখিলাম নিকটেই এক বেঞ্চ দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহার উপর দুইজন উপবিষ্ট, পুরুষ কি রমণী হঠাৎ ক্ষীণ আলোকে বোঝা গেল না। যখন একেবারে নিকটে গেলাম তখন থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম দোকানের সেই ব্যক্তি ও তাহার কন্যা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকও আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, আমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি. তুমি আবার দেখা দিয়েছ?"

আমি অতি ভদ্রতাব সহিত কহিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানে বসিতে পারি?"

"অবশ্য, বসিবে না কেন, ইহাত আমার বেঞ্চ নহে।" বলিয়া তিনি কন্যাকে ঠেলিয়া দুইজনে একেবার এক কিনারায় গিয়া সরিয়া বসিলেন।

"আপনার যদি আপত্তি থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

"না, সরকারি বেঞ্চে কেহ বসিবে তাহাতে আর আপত্তি কি, Practical Jokes (ঠাট্টা) পছন্দ করি না, আর কোন আপত্তি নাই।"

"আপনি দেখিতেছি, সে কথা এখনও ভুলেন নাই, কিন্তু--"

"না আমার স্মৃতিশক্তিটা খুব ভাল।"

"সে দিনকার ঘটনাটা যে একটা মস্ত ভুল, আমি কে, তাহা একবাব শুনিলে বোধ হয আর অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মহাশয়, আমার এখন ওসব ইতিহাস শুনিবার সময় নাই। চল বীণা, অন্ধকাব হয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কন্যা একবাব চকিতদৃষ্টিতে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া পিতার সহিত চলিল। সে চাহনিতে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—যেন বলিতেছে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিছু মনে করো না।" অবিলম্বে পিতা ও কন্যা অক্ল্যাণ্ড রোডে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা কবিলাম, যে কালই ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয দিব ও কলঙ্ক দূব করিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমার পিতার বন্ধু ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের পবিচিত। উক্ত ডাক্তার আমার ন্যায় স্যানিটেবিয়ামে ঘর লইয়া ছিলেন। আমি তাঁহাব নিকট হইতে একটি পত্র Letter of introduction পাইলাম। আহারের পব জলাপাহাড়ে বীণাব পিতাব বাড়ী Cecil Cot-এর গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীণা বাহিরে একখানি বই হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র মুখ লাল হইয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি টুপি তুলিলাম কিন্তু ততক্ষণে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একটু পরে তাহাব পিতা বাহির হইযা আসিলেন। বলিলেন, "কি হে, আবার এখানে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করি আরও অনেক বার আসিব।"

"বটে?"

"এ চিঠিটা অনুগ্রহ করিয়া পড়ুন।"

তিনি কৌতূহলী হইয়া হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে, চোখ তুলিয়া আমাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাত বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি প্রকাশ বাবুর পুত্র জানিতাম না। তোমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলাম বলিয়া মাপ কর, তবে যে রকম কাণ্ডটা হয়েছিল, আমার বড় দোষ নাই, কি বল?

"একটু দোষ আছে, আমার কি জুয়াচোরের মত চেহারা?"

"জুয়াচোরের কি কপালে "জুয়াচোর" লেখা থাকে, তা হ'লে আর লোকে ঠক্‌তো না। থাক সে সব কথা, তোমার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। বীণা, এদিকে এসত।"

বীণা সলজ্জ ভাবে হাসি মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বীণা, ইনি মিষ্টার চৌধুরী, প্রকাশ বাবুর পুত্র। আমাদের কমলার স্বামীর খুড়তত ভাই।"

বীণার সহিত পরিচয় হইল, দু-একটি কথা কহিলাম; তাহার পিতার সহিত নানা প্রকার গল্প করিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সেখানে আমার আহারের নিমন্ত্রণ রহিল। সময়মত আসিলাম, সারা দিন থাকিয়া চা খাইয়া বৈকালে বিদায় লইলাম। শুনিলাম বীণা মাতৃহীনা, পিতার একমাত্র কন্যা। যাইবার সময় বীণা আমার হাতে একটা কি দিয়া দ্রতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। দেখিলাম সেই নূতন পয়সাটা। তখন মনে হইল যে উহা ভুলিয়া দোকানেই টেবিলের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। এত দিন বালিকা উহা তাহার নিকটে রাখিয়া দিয়াছিল, আমাকে কখনও অবিশ্বাস করে নাই। এসব ভাবিতে হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইল। ইহার পর কয়দিন যেন সুখস্বপ্নে কাটিল। প্রতিদিন সেখানে চা পান করিতাম আর বীণার সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতাম; সমস্ত জগৎ যেন আমার কাছে নূতন সৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। একদিন বীণার পিতার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, পিতাকেও এক পত্র লিখিলাম। দুজনের অনুমতি পাইয়া একদিন বৈকালে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বীণার নিকটে গেলাম। বীণা বাহিরে রেলিঙ্গ ধরিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল তাহা দেখিতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের লাল আভা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত চূড়ায় পড়িয়া তাহাতে যেন ক্ষণকালের জন্য স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিল,—ক্ষণকালের জন্য মানব স্বর্গশোভা দেখিয়া লইল, পরমুহুর্ত্তে সূর্য্যদেব পর্ব্বতের পশ্চাতে ডুবিয়া গেলেন। বীণার কোমল হাতখানি হাতে লইয়া কহিলাম, "বীণা, একদিন তোমার বাবার সোনার গিনি লইয়া একটি ঝুটা গিনি দিয়াছিলাম আজ একটি রত্ন লইতে আসিয়াছি।" বীণা বুঝিল, মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল কিন্তু সে কথায় কাহারও কাছে হার মানে না। অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "রত্নের পরিবর্তে কি দেবেন?"

"এই ঝুটা রত্নটি।" আপনাকে দেখাইলাম। তার পর দুজনের অনেক কথা বার্ত্তা হইল; সে সব বাজে কথা আর বলিয়া কি হইবে; বিবাহের পরে নূতন পয়সাটাতে একটি ছেঁদা করিয়া ঘড়ির চেনে ঝুলাইয়া রাখিলাম। বীণা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিয়া দেয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি, "উহা একটা চার্ম।" তাত সত্যি কথা!

'পরিচারিকা'— ১৩১১ আশ্বিন

নব উদাসীন

ফতেমা খাতুন

১

সূর্যকান্ত এন্ট্রান্স পাস করিয়াছিল। অর্থাভাব নিবন্ধন পড়াটা বন্ধ রাখিয়া সে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ২৫ টাকা বেতনে মাষ্টারি যোগাড় করিল।

জজ আদালতের বড় উকীল দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার পিতার জানা শুনা ছিল। উকীল মহলে ইঁহার খুব সুনাম ছিল; কেননা ইনি দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হারিয়াও অনেক মক্কেলও বলিত;—"হায়রে, আমার অদৃষ্ট মন্দ, কেননা, দেবেন বাবু যেরূপ বলেছিলেন এ'তে কখনও আমি মোকদ্দমা হারতে পারি না। কিন্তু জজ বেটা একেবারে বোকা; কিছুই বোঝে সোজে না তাই ডিস মিস্ করে ফেল্‌ল।

পাঠে সূর্য্যকান্তের অপরিসীম মনোযোগিতা ও পরিশ্রমের কথা দেবেন্দ্র নাথের অজানা ছিল না। তিনি তাহাকে নিজের গৃহে ডাকাইলেন। অর্থভাবেই তাহার পড়া বন্ধ হইয়াছে জানিয়া তিনি কিছু আফসোসের ভাব দেখাইলেন এবং এফ, এ, পড়ার সুবিধা করিয়া দিবেন বলিলেন।

দুইদিন পরেই দেবেন্দ্রবাবুর চাকর সূর্য্যকে ডাকিতে আসিল। সূর্য্য দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গেল। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন;—"জগন্নাথ কলেজে তুমি যাতে বিনা বেতনে পড়তে পার তার বন্দোবস্ত করেছি। ভর্ত্তি হয়ে পড়া আরম্ভ কর।

সূর্য্য উত্তর করিল;—"আমি মহাশয়ের নিকট চিরবাধিত রহিলাম। আমারও নিতান্ত ইচ্ছা আরও পড়ি; কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বাধা দেখিতেছি।"

"কি বাধা?"

আমি আর না পড়ি ইহাই মায়ের ইচ্ছা। তিনি বলেন, "আর বেশী প'ড়ে কি করবি? যে ২৫ টাকার চাক্‌রিটে পেয়েছিস্ তাতেই মা-ছেলের সংসার কেটেও কোন রকমে ৮/১০ টাকা হাতে থাক্‌বে।

দেবেন্দ্রনাথ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন—"বাপু, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নিয়ে চল্লে কি কাজ হয়? তাদের যদি ভালমন্দ জ্ঞানের ক্ষমতা থাক্‌ত তা'হলে কি তাদের দুর্ব্বলা জাতি বলা হ'ত? তাদের অধীনতায় চলা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।"

সূর্য্যকান্ত—মহাশয় অবগত আছেন, সংসারে আমার এক মা ভিন্ন আর কেহই নাই। আমিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি আমার মুখ চাহিয়াই সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছেন। এন্ট্রান্স পড়িবার সময় খরচের জন্য প্রায় ৫০ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। উহা সুদে আসলে এখন প্রায় ১০০ টাকা হইয়াছে। বিশেষতঃ বাবাও কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। মা বলিতেছেন—"কাজটি নিয়ে থাক্, এতে দুজনের ভরণ পোষণের ব্যয় বাদে যা থাকবে তা' দিয়ে ক্রমশঃ ঋণ শোধ হবে। মহাজনেরাও বড় পীড়াপীড়ি কত্তে আরম্ভ করেছে।—"

দেবেন্দ্রনাথ একগাল আশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—'আরে, তার জন্যে ভাবনা কি?

তোমার মাকে ব'লে ক'য়ে আজই জিনিষপত্র নিয়ে আমার এখানে এসে পড়। কাল ভর্ত্তি হ'তে হবে।''

সূর্য্যকান্তের নিকট ইহা স্বপ্নবৎ বোধ হইল। সে দেবেন্দ্রনাথের সদাশয়তায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। কত সুন্দর করিয়াই সে মনে তাঁহার ছবিটি আঁকিতে লাগিল; তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াও তাহার মনস্তুষ্টি হইল না। সে শত করিয়াও দেবেন্দ্রবাবুর স্বরূপ নিজের হৃদয়কারায় ধরিতে পারিল না, তাহার কল্পনার নিকট তিনি এতই মহান।

অনেক বুঝাইয়া সূর্য্য মায়ের সম্মতি গ্রহণ করিল এবং দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া পরদিনই কলেজে ভর্ত্তি হইল।

এদিকে বিদায় না পাওয়ায় বাধ্য হইয়াই স্কুলের চাকরিটা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

২

সূর্য্যকান্তের শীলতা, নম্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী অল্পদিন মধ্যেই দেবেন্দ্রপরিবারে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিল। কিন্তু একটি হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যকান্তের প্রশংসা শুনিলে সে হৃদয়টি আনন্দে উৎফুল্ল হইত; কেন হইত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। দু'জনের কথোপকথনের মধ্যে সূর্য্যকান্তের নাম শুনিলে সে হৃদয়টি বেগে সে দিকে ধাবিত হইত। * * * * দেখিবার সম্ভব হইলে হয়ত অনেক সময়ে দেখা যাইত সেই হৃদয়ামনটিতে শ্রীমান সূর্য্যকান্ত ঘোষ আসীন রহিয়াছে।

কলেজের ছুটীর পর সূর্য্য একদিন বাসায় ফিরিতেছিল। পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল;— দেখিল তাহারই কাষ্ঠাসনে বসিয়া স্বয়ং বীণাপাণি যেন 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' পড়িতেছেন! কালবিলম্ব না করিয়া সূর্য্যকান্ত পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—''সরোজিনী!''

দেবেন্দ্রনাথের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা সরোজিনী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল; লজ্জায় তাহার গণ্ডস্থল রক্তিমাভা ধারণ করিল। কিয়ৎকালের জন্য সূর্য্য-হৃদয়ের তমোরাশি বিদূরিত করিয়া সে বিজলীর মত বেগে পলায়ন করিল।

সূর্য্যের ভাবিবার সময় আসিল। দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসা অবধি যে মনোমোহিনীকে সে (কল্পনায়) স্বকীয় হৃদয়াসন পাতিয়া দিয়াছিল, অদ্য প্রকৃতই নিজের কাষ্ঠাসনে সে মূর্ত্তি উপবিষ্ট দেখিতে পাইল।

ক্রমে উভয়ের ভালবাসা ঘনীভূত হইল। তখন আর কলেজের ছুটীর পর পাঠাগারে প্রবেশোদ্যত সূর্য্যকে দেখিয়া অধ্যয়ননিরতা সরোজিনী বেগে পলায়ন করিত না। অধিকন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহার জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত।

একদিন সূর্য্য কলেজ হইতে ফিরিয়া পাঠাগারে বিশ্রাম করিতেছিল। সরোজিনী মৃদু হাসিয়া বলিল;—''তুমি আমার কিছু চুরি ক'রেছ?''

সূর্য্যকান্ত হাসিয়া বলিল—''হাঁ, করেছি বই কি।''

''বল দেখি কি?''

"তোমার মন"

"দেখ, আমি উপহাস করছি না।"

না আমিও উপহাস কল্লেম কই? চুরি না কল্লে কি চোরের পাঠাগারটা রোজ রোজ এমন করে পবিত্র হতো? বলি, হারান জিনিসটি ফিরে পাবার জন্যই নাকি প্রত্যহ এখানে আসা হয়?

সরোজিনী কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখাইল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিটা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিল;—"চোরের আবার এত দীর্ঘ ছন্দের কথা কেন? এই দেখত আমার বইখানি চুরি করে রেখেছ।"

সূর্য্যকান্তর পুস্তকরাশির মধ্য হইতে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর কাব্যকুসুমাঞ্জলি বাহির করিয়া উহার ১ম পৃষ্ঠা খুলিয়া সরোজিনী সূর্য্যকান্তের সম্মুখে ধরিল। সূর্য্যকান্ত পড়িল—"ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমতী সরোজিনীকে উপহার প্রদত্ত হইল। S. K. G.

বলা বাহুল্য বইখানি সূর্য্যকান্তই ক্রয় করিয়া এরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিল। সূর্য্যকান্ত একটু মুচকি হাসিল। রহস্য করিয়া বলিল;— কোন্ প্রেমিকের ভালবাসার নির্দেশ?

সুশীলার আবার ক'টি থাকে?"

"থাকলেই বা দোষ কি? কার্য্যেত দেখছি তাই।" পরক্ষণেই বলিল—"বাস্তবিকই জিজ্ঞসা কচ্ছি এই S. K. G. মহাশয়ই কি তা হ'লে তোমার একমাত্র—"

সরোজিনী বাধা দিয়ে ইষৎ হাস্যে বলিল;—"না"।

প্রেমের অভিধানে যে 'না' শব্দের অর্থ হ্যাঁ সূর্যকান্তর খুব জানা ছিল। তবুও পুনরুক্তি করিল;—বাস্তবিকই "না"?

"না।"

"না?"

"না" সরোজিনী সূর্য্যের গলদেশ বেষ্টন করিয়া প্রত্যুত্তর করিল;—"না।" দুজনেই হাসিল।

দেবেন্দ্রবাবুকেও অনেক সময় বলিতে শুনা গিয়াছিল যে পরীক্ষার পরই তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা সরোজিনীকে সূর্য্যকান্তের করে অর্পণ করিবেন।

কথাটি সূর্য্য-সরোজিনীর কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল। তাহারা ব্যগ্রতার সহিত সেই সুখময় মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে ছিল এবং পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আশা করিতেছিল—মিলন।

"মানুষ ভাবে এক, ভগবান ঘটান আর।" এবার সূর্য্যের পরীক্ষার বৎসর; পরীক্ষার আর মাত্র ৬ মাস আছে। এমন সময়ে তাহার প্রেমের বিমল আকাশে ক্ষুদ্র একখানি মেঘের সঞ্চার হইল, ক্রমে তাহা সারাটি আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

৩

নরেন্দ্রনাথ নামে দেবেন্দ্রের এক ভ্রাতা ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের খুব বিবাদ ছিল। দেবেন্দ্রবাবুরই চক্রান্তে একবার নরেন্দ্রকে ফৌজদারী

মোকদ্দমায় বিংশ মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। নরেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় রমণীমোহন ও নগেন্দ্রনাথের সহিতও দেবেন্দ্রবাবুর বড় সদ্ভাব ছিল না। রমণী জজ আদালতের নূতন পাশ করা উকীল—একেলে যুবক; সুতরাং খুড়া মহাশয়ের পরিপক্ক ওকালতি বুদ্ধির উপরও সে অনেক সময় টেক্কা মারিতে পারিত।

রমণীমোহন খুড়ার সহিত বেশ একটু মিশামিশি করিতেছিল। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথও শত্রুতার কথা ভুলিয়া গেলেন। এখন রমণীকে তিনি তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রমোহনের ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। কোন বিষয়েই তাহার উপর অবিশ্বাস ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। রমণীমোহন তথায় প্রবেশ করিল বলিল—"কাকাবাবু, আপনি এই সম্বন্ধ ছেড়ে দিন্। একটি উপযুক্ত বর পাওয়া গিয়াছে। মনোমোহন গেলবার এফ, এ, পাশ করে সেন্ট জেভিয়ারে বি, এ, পড়ছে। তার পিতা সুরেন্দ্রকুমারের বিষয় সম্পত্তি ও বড় কম নয়; প্রায় ২৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ করেছেন, ৫০,০০ টাকা মহাজনীতে আছে; বাড়ীতে খড়ের ঘর একখানিও রাখেন্নি।"

আলবোলার নলটি ফরাসের উপর রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন—"বল কি?"

"আজ্ঞে, আমি কি আর মিছে বল্‌ছি?"

চুপি চুপি অনেক কথার পর দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—"দেখ বাবা, তুমি আজই সুরেন্দ্রবাবুর নিকট চিঠি লিখে দাও। আমি ত সূর্য্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইনি; তবে কি; তাবেৎ "হাতের পাঁচ" বলে রেখেছিলেম, যখন অন্যদিকে ভাল সুবিধে না ঘট্‌ত তখন হাতের পাঁচ যোগ ক'রে নিতেম।"

"হ্যাঁ, এই ত বুদ্ধিমানের কাজ। 'যখন যেমন, তখন তেমন' হতে না পাল্লে কি আর আজকাল সংসারে চলা যায়? আর এমন গরীবের ছেলেকে কি সরোজিনীর মত রত্ন সম্প্রদান করা উচিত? ইহাতে কি সম্মান রক্ষা হয়?" বলিয়া রমণীমোহন বাহির হইল। যদি কেহ তখন তাহার মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিত তবে ঘৃণাজনক শঠতাপূর্ণ ক্রুর হাস্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইত না। কেননা, তাহার চির-ঈপ্সিত প্রতিশোধ ও মতলব হাসিলের পথ পরিষ্কার হইল বলিয়া তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিয়েছিল।

৪

যথাসময়ে সুরেন্দ্রকুমারের প্রত্যুত্তর আসিল। দেবেন্দ্রনাথের মাথায়ও অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তের সঞ্চার হইল। একদিন তিনি গৃহিণী ও যতীন্দ্রমোহনের নিকট পরিণয় প্রসঙ্গ পাড়িলেন।

যতীন্দ্রমোহন মেডিকেল কলেজে পাশ দিয়া বাড়ীতেই ডাক্তারখানা খুলিয়াছিল। শিশুবেলা হইতেই ধর্ম্মভয়টা তাহার একটু বেশী।

সে বলিল—'অসম্ভব। আপনি অনেক ভদ্রলোকের সম্মুখে ব'লেছেন সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ করবেন। বিশেযতঃ আপনি তাঁকে আশাও দিয়েছেন। তা না কল্লে লোকে আপনার নিন্দে করবে; পরমেশ্বরের নিকটেও আপনি দায়ী হবেন।"

"আমি কার কাছে বলেছি?"

"কেন, কার কাছে না বলেছেন?" সহরের বড় ছোট কে না জানে আপনি সূর্য্যের সহিত সরোজিনীর বিয়ে দেবেন?

দেবেন্দ্রনাথ—আমিত আর প্রতিজ্ঞা কবিনি, বলেছিলেম মাত্র। এখন আমার ইচ্ছে, আমি এ সম্বন্ধ ছেড়ে দেব।

যতীন্দ্রমোহন—তা' হ'লেই গরীবের ছেলেটার সর্ব্বনাশ হবে এখন বেশ সুখে চাকরিটে কচ্ছিল, আপনি পরামর্শ দিয়ে এ'নে ওর সর্ব্বনাশ কল্লেন।

দেবেন—সর্ব্বনাশ হ'ল কিসে? অর্থাভাবে পড়্‌তে পাচ্ছিল না; কত চেষ্টায় বিনাবেতনে পড়বার জোগাড় করে দিয়ে, নিজের বাসায় রেখে পড়াচ্ছি; পাশটাস্ করে বেশ চাকরি করবে; তাই ব'লে আমার দোষ হ'ল।

যতীন—ওর আর পরীক্ষা ও দিতে হবে না; পড়াও কত্তে হবে না। সরোজিনীর প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখছি তাতে তাঁকে না পেলে কি আর ওর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকবে?—পরীক্ষাত দূরের কথা। তাই বলেছিলেম সর্ব্বনাশ হচ্ছে। কেননা এতে ছেলেটার দুইদিক নষ্ট হ'ল—পড়াত হ'লই না ওদিকে চাকরিটেও নষ্ট হ'ল। এণ্ট্রান্স পাশ করে এখন চাকরী আজকাল মিলে? ঋণ শোধ করে দেবেন বলে কর্ম্মছাড়া কল্লেন এতদিন চাক্‌রিতে থাক্‌লে ওর সব ঋণটা শোধ হয়ে যেত। আপনি যত করেছেন সবই কেবল স্বার্থে।

দেবেন—তবে দেখ্‌ছি এ বিয়েতে তোর নিতান্তই অমত। তা' হোক নূতন সম্বন্ধ ছাড়তে আমি কোনমতেই রাজি নই। রমণী বলেছে পাত্র খুব উপযুক্ত।

যতীন—তবেইত, সেইত আপনার সর্ব্বনাশ করবার জন্য আপনার সঙ্গে মিশেছে। আপনি ত তাকে চিনেও চেনেন না। উমাকান্ত খুড়ার খতের মোকদ্দমায় সে কি করেছিল মনে আছে? তেমনি করে ভদ্রসমাজে আপনাকে হাস্যাপদ করবে।

পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ যাবত কথা কাটাকাটি চলিল। অবশেষে পিতা বলিলেন—"আমার ইচ্ছে আমি একাজ করবোই করবো। তুই আমাকে উপদেশ ও বাধা দেবার কে? না হবে কেন, আজ কাল্‌কের ছেলেত?—হায় আমাদের সেই অতীত জীবন! তখন পিতার কথা রাজ-বিধানের চেয়েও বেশী ছিল। আমি ইচ্ছে কল্লে তোকেও আমার বাড়ী থেকে বে'র করে দিতে পারি।"

যতীন্দ্রমোহন মৌনাবলম্বন করিল।

অতঃপর গৃহিণী আসরে নামিলেন। তিনিও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় দেখাইয়া বলিলেন—"আমার একটি মাত্র মেয়ে, আমি কখনও তাকে ভিন্ন দেশে লক্ষ সমুদ্র কোটি নদীর পারে বিয়ে দিতে পারব না।"

দেবেন্দ্রনাথ চটিয়া একেবারে লাল, বলিলেন—তুমিও দেখছি ছেলের ধারা ধরেছ। আমিও এ বিষয়ে কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করবো না। আমার যা খুসী তাই করব।

যতীন্দ্রমোহন, গৃহিণী, এমন কি আত্মীয় স্বজনের সকলেরই অমতে দেবেন্দ্রনাথ মনোমোহনের সহিত সরোজিনীর বিবাহের ঠিক করিলেন। শুভদিন (!) ও নির্দ্ধারিত হইল।

৫

অদ্য মনোমোহনের সহিত সরোজিনীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন; হঠাৎ যতীন্দ্রমোহন তথায় প্রবেশ করিল। বলিল—"আপনি আজ যে অধর্ম্মাচরণ কল্লেন, ইহাতে কখনও আপনার মঙ্গল হবে না। অত্রপ্রাতেই দেখেন না কেন, এ বিবাহে আত্মীয় স্বজন সকলেই নারাজ; তারপর, এক প্রকার বিনা কারণেই ভদ্রলোকেরা সকলে আপনার বাড়ীর নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিলেন; করুণা বাবুর স্কুলের ছেলেদের নিমন্ত্রণ করে নিজেই উহা ফিরিয়ে আন্‌তে হলো। গত কাল বাড়ীর সম্মুখের পৈতৃক বাজারখানা নীলরতন কুণ্ডু উঠিয়ে নিলে। * * * * এসব কি শুভ লক্ষণ?"

দেবেন্দ্রনাথ সরোষে উত্তর করিলেন—তুই বড় বাড় বেড়েছিস, এত বাড়ত ভাল নয়। দেখ্‌, তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। তোর ও মুখ আর আমি দেখ্‌তে চাইনে।

"যাব বই কি?" অশ্রুপূর্ণ লোচনে যতীন্দ্র উত্তর করিল "যাব বই কি?"

সকালে উঠিয়া আর কেহই যতীন্দ্রমোহনকে দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে দেখে নাই।

দু' তিন দিন পূর্ব্বে ঋণের দায়ে সূর্য্যকান্তের বাড়ীটা নিলামে উঠিয়াছিল। আর, বিবাহের দিন সেত সব দিক্‌ অন্ধকার দেখিল। তাহার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল তাহা কল্পনাতীত। সে হয়ত ভাবিল ঃ—

"আর আমি কেন তবে থাকি-রে এখানে, কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?" ইহা ভাবিতেই তাহার ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৬

সপ্তাহ মধ্যেই রমণীমোহনের কনিষ্ঠ সহোদর নগেন্দ্রনাথেরও বিবাহ হইয়া গেল। অধিকদিন যাইতে না যাইতেই গুমর ফাঁক হইতে চলিল। দু'দিনের ব্যবহারেই গিল্টিটা উঠিয়া গেল। সকলেই জানিল দেবেন্দ্রনাথ রায়ের জামাতা এন্‌ট্রান্স পাশ মাত্র বিশেষতঃ পড়াটাও বন্ধ করিয়া নামকাটা সিপাহির মত সে টো টো কোম্পানীর ম্যানেজারি পদে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কোথায় তাহার পিতা, কোথায় বা তাঁহার কোম্পানীর কাগজ ও মহাজনী।

অনেক দিন হয় তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। যে সুরেন্দ্রবাবু বিবাহনাট্যে মনোমোহনের পিতার পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার সহিত মনোমোহনের পিতার মিত্রতা ছিল। ইনি খুব বড়লোক ছিলেন। মৃত্যু কালে সুরেন্দ্রনাথ বন্ধু সুরেন্দ্রকুমারের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া যান।

এন্ট্রাস পাশ করিয়া মনোমোহনের ভাবটা বড় খারাপ হইয়া উঠিয়া ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সুনাম গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কাজেই কেহ তাহাকে মেয়ে দিতে রাজি হইল না। এমন সময় নগেন্দ্রনাথের জন্য সুরেন্দ্রকুমারের দুহিতার বিবাহের প্রস্তাব হইল। সুরেন্দ্রকুমার সুবিধা পাইলেন; তিনি বলিলেন যে মনোমোহনের বিবাহের একটী সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে কখনই তিনি নগেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিবেন না।

কাজেই মনোমোহনের বিবাহে রমণীমোহন রায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

এইরূপে মনোমোহনের একটা কুলকিনারা করিয়া, সুরেন্দ্রকুমার মুমূর্যু বন্ধুর সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন। রমণীমোহন 'কাকাবাবুর' মাথায়ই কাঁঠাল রাখিয়া স্বীয় স্বার্থোদ্ধার করিল এবং পিতার অপমানের প্রতিশোধের চূড়ান্ত করিল।

রমণীমোহন পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। এইবার দেবেন্দ্রের কিঞ্চিৎ চক্ষু ফুটিল।

৭

ক'নে লইয়া বরযাত্রীরা ষ্টিমার যোগে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিল। পথে এক স্থানে সন্ধ্যা হওয়ায় তথায় নোঙ্গর করিয়া তাঁহারা গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। সকালে সরোজিনীকে তাহার কেবিনে দেখা গেল না।

একবৃদ্ধা সরোজিনীরই নিকটে শয়ন করিয়াছিল। সে বলিল।—''আমার বোধ হইল যেন খুব ভারি একটা বস্তু দুপুর রাত্রে আমাদের নৌকা হইতে জলে পতিত হইল। আমি মনে করিলাম, হয়ত জোয়ারের ঢেউ আসিয়া জোরে নৌকার সহিত ধাক্কা লাগিয়াছে বলিয়া এরূপ শব্দ হইয়াছে।'

সরোজিনীর অলঙ্কারের বাক্স খুলিতেই উহাতে সর্ব্বোপরি একটুকরা কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে লাল পেন্সিলে লেখা রহিয়াছে—

''জগদীশ,

জীবনে এক ভিন্ন দুই আমার অভিপ্রেত নহে। তবে আর এজীবনে প্রয়োজন কি? তোমার দাসী তোমারই চরণে আসিতেছে। শ্রীচরণে স্থান দিও।

ইতি— সরোজিনী।''

ঘটনাটা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

অতুল নামে সূর্য্যকান্তের এক বন্ধু ছিল। সূর্য্যের অদৃশ্য হওয়ার পর তাহার বৃদ্ধা মাতাকে অতুল নিজের বাড়ীতে আনিল। কয়েক মাস অতীত হইলেই অতুল ডাকে একখানা পত্র পাইল। উহাতে লেখা রহিয়াছে ঃ—

''গয়াধাম।''
১২ ই জুন, ১৮৯৮।

প্রিয়সুহৃদ অতুল,

আমি কোথায় আছি হয়ত ইহার পূর্ব্বে জানিতে না। মনকে বুঝাইবার জন্যই পরীক্ষাটা দিয়াছিলাম। ফলত তদ্রূপ। আমি কষ্টে আছি বলিয়া হয়ত তোমরা অনেকেই দুঃখ করিতেছ; আমি কিন্তু ভাই খুব সুখেই আছি। দিবারাত্রি ভগবানের নাম করি। পৃথিবীতে এর বাড়া সুখকর আর কি আছে?

সরোজিনী আমাকে ভালবাসিত ইহা আমি বেশ জানিতাম। সুতরাং সেখানে থাকিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত বিবেচনা করি নাই বলিয়াই দেশত্যাগী হইয়াছি। তবে, মা এখনও জীবিত আছেন তাই স্বদেশের কথা সর্ব্বদা মনে পড়ে। কিন্তু সেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী

জন্মভূমিকে জীবনে আর দেখিব কিনা সন্দেহ।

সরোজিনী যেন আমাকে ভুলিয়া যায়, আমি ভগবানের নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করি। আমাকে ভুলিলে হয়ত সে সুখী হইতে পারিবে।

মাকে তোমার কাছেই রাখিও। তাঁহার সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে লেখা বাহুল্য। কষ্টের হ্রাস হইবে; অন্যপক্ষে আমিও 'নব-উদাসীন'। অল্পদিন মধ্যেই প্রয়াগ, মথুরা, সোমনাথ ইত্যাদি স্থান পরিদর্শনে বাহির হইব। এইরূপ করিয়াই জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইব ইচ্ছা করিয়াছি। সুতরাং আমার নিকট হইতে আর কোন চিঠি পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে, বোধ হয় এই চির বিদায়।

তোমার স্নেহের
সূর্য্যকান্ত।"

হায়, হতভাগার অদৃশ্য হওয়ার মাসাধিক পরেই যে তাহার স্নেহময়ী জননীর সকল জ্বালার অবসান হইয়াছে এবং বঙ্গোপসাগরের শান্তিদায়িনী ক্রোড়ে যে দুঃখ জর্জরিতা সরোজিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহা হতভাগা এ পর্য্যন্তও অবগত নহে।

শেষকালে দেবেন্দ্রনাথের দুঃখ দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিত হইত।

'নবনুর'—১৩১২

পলায়ন

নিরুপমা দাসী

১

আমাদের পরিণয়ের পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সময় যেন সমুদ্রের স্রোতের মত অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে চলিতেছে। আমাদের প্রথম মিলন,— সে তো সেদিনের কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে এতগুলা দিন যে কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার নিকট হইতে ভালবাসা—অপরিসীম ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। আর আমি? উন্মেষিত যৌবনা, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে তাঁহার জন্য কতখানি আসন ছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তাঁহাকে পাইয়া অবধি অনাথিনী আমি শৈশবের অনাদর, উপেক্ষা, দুঃখ, কষ্ট সবই ভুলিয়া গিয়াছি। যে জীবনকে আগে দুঃখপূর্ণ ভাবিয়া অশ্রুজলে নয়ন সিক্ত করিয়াছি, আজ সেই জীবন মধুময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

তিনি যখন অধ্যয়নের জন্য প্রবাসে থাকিতেন, নিয়মিতরূপে একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। চিঠিগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও আমার তৃপ্তি হইত না। সেগুলি কত ভালবাসা কত অভিমান কত প্রেম কত উপদেশপূর্ণ। তাঁহার ভাবনা যখন বিরহক্লিষ্ট হৃদয়কে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিত, আমি আমার সেই প্রিয় সঙ্গীগুলিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতাম। এক স্নিগ্ধ হর্ষে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার এত সুখ বিধাতার সহিবে কেন? একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া আমাদের সুখের নির্মল আকাশ, অন্ধকার করিয়া দিল।

২

একদিন দিবাবসানে সমস্ত গৃহকর্মের পর পরিশ্রান্ত হইয়া, গা ধুইয়া কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য ছাদে উঠিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘরে হঠাৎ আমার নাম উচ্চারিত হওয়াতে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কান পাতিয়া শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখলে হয় না?"

শ্বশুর ঠাকুর বলিলেন, "আর কত দিন দেখবে? শুধু শুধু দেরী করা বইতো নয়। আমাদের একটি মাত্র ছেলে। বংশে একবিন্দু জল দেবার আর কেউ থাক্‌বে না।"

"তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় করো। আহা বৌমা আমার ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। সতীশের কি মত হবে?"

"তার আবার মতামত কি? আমি যতদিন বেঁচে, আমি যা বোলবো তাই হয়ে আসছে ও তাই হবে—" আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া, দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। অন্তরের রোদনধ্বনি যদি বাহির হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত, তবে সেইদিন প্রদোষে আমার করুণ চিৎকারে গগন ও পবন প্রতিধ্বনিত হইত।

সেই রাত্রে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি এখন মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে কর্বে?" তাঁহার চিরপ্রফুল্ল সুন্দর মুখখানি মেঘের মত অন্ধকার হইল, কিন্তু আমি তাহাতে গভীর প্রেমের চিহ্ন, স্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন "ছিঃ ও কথা বোল্‌তে নেই। আজ হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞেস কোরছো কেন রমা?" মুহূর্তের মধ্যে আমি সমস্ত বিস্মৃত হইলাম। প্রেমার্দ্র চক্ষু দিয়া দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অলক্ষিতে তাহা মুছিয়া ফেলিলাম। ছিঃ এই স্বামীকে অবিশ্বাস।

আমি সন্তানহীনা। কিন্তু সে জন্য আর সকলের এত মাথা ব্যথা কেন? বিবাহের পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদের মনে একদিনের জন্যও ত কোন অভাব বা অসুখের সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের জন্য পৃথিবীর লোকের এত ভাবনা কেন? কেন—আমি কি দোষ করিয়াছি? নিঃসন্তান হইয়াছি বলিয়া কি একটি অসহায় বালিকাকে তাহার জীবনের দেবতা, হৃদয়ের স্বামী, একমাত্র সাধনার ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিতে হইবে? এতদিন এই সব নীরবে সহ্য করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তব কি ছিল? কিন্তু যে বিপদ স্বপ্নের অগোচর—কল্পনারও বহির্ভূত ছিল; আজ তাহাই শুনিলাম। অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল। বক্ষের মধ্যে দারুণ ব্যথা অনুভব করিলাম। এতদিনের নিরবচ্ছিন্ন সুখের বুঝি এইখানেই অবসান।

এক অজানিত শঙ্কায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কি অপরাধ আমার?—কি অপরাধে ঈশ্বর আমাকে এত দুঃখিনী করিবেন! হে দয়াময যদি নাবীজন্ম দিয়া পাঠাইলে, তবে মাতৃপদ দিলেনা কেন? একটি প্রাণীর আবির্ভাবে যদি সংসারের এত নির্যাতন এত অশান্তি, সব ঘুচিয়া যায় তবে তাহাতে এত কুণ্ঠিত কেন প্রভু! সন্তানের মাতা হইতে দাও নাই বলিয়া কি জীবনের প্রারম্ভেই যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধূলৎবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে?

যখনই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতাম, স্বামীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি মনের মধ্যে উদিত হইয়া আমার সব কল্পিত ভয় বিদূরিত করিয়া সমস্ত হৃদয়খানিকে উদ্ভাসিত করিয়া দিত। তাঁহার অপরিমিত ভালবাসা, অতুলনীয় আদর, অযাচিত করুণা একে একে সমস্তই মনে হইত। লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিতাম। আমার হৃদয় আবার নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাঁহার দেবচরিত্রেব প্রতি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতাম। এত ভাগ্যবতী যে, সে আবার দুঃখিনী?

এই সকল নির্যাতনের মধ্যে স্বামীর চিঠিই আমার একমাত্র সম্বল ও সান্ত্বনাদাত্রী ছিল। তাঁহার উচ্ছ্বসিত আবেগপূর্ণ পত্র পড়িতে পড়িতে আমি আত্মবিস্মৃত হইতাম। আমার দুঃখ, কষ্ট, সব আনন্দে পরিণত হইত।

৩

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একদিন শুনিলাম আমাকে শীঘ্রই পিত্রালয়ে পাঠান হইবে। ইহার কারণ জানিতে আমার বেশী দেরী হইল না। একদিন লুকাইয়া শুনিলাম যে

শ্বশুর ঠাকুর গোপনে পুত্রের বিবাহ ঠিক করিয়াছেন, তাই আমাকে বিদায় দিবার আয়োজন। পরিণয়ের আর বেশী দেরী নাই; স্বামী গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিলেই হইবে।

আমি চক্ষের জল মুছিয়া নিত্য গৃহকর্ম অবসানের পর রাত্রে নিজ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, স্বামীর সমস্ত চিঠি পড়িতে বসিলাম। হাতবাক্স খুলিতেই তলার এক কোনে রক্ষিত দেলখোসের শিশিটি চক্ষে পড়িল, হাতে লইয়া দেখিলাম পাত্র সংলগ্ন কাগজে তাঁহার হস্তাক্ষরে লেখা 'শ্রীমতী রমা' প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ফুলশয্যার রাত্রিতে তিনি উহা অভাগিনীকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই মধুর রাত্রির ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে উদিত হইল। কথা বলাইবার জন্য সেই সাধা-সাধি— সেই আদর সেই স্নেহস্পর্শ, সব মনে পড়িল হৃদয়ের গুরুভার কমাইবার জন্য শূন্য মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিলাম। বহুযত্নে রক্ষিত ভাবাভিব্যঞ্জিকা তাঁহার সমস্ত চিঠিগুলি একে একে পড়িলাম। এতবার পড়িয়াছি কিন্তু তবু তেমনি নূতন, তেমনি উদ্দীপক। তাঁহার প্রদত্ত অ্যালবামখানি বাহির করিয়া, তাঁহার ছবি দেখিতে লাগিলাম—তাঁহাকে পাইয়া এখনও যে আমার তৃপ্তি হয় নাই। আজ আমাদের বিবাহিত জীবনের সমস্ত ঘটনাই একে একে স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। দুঃখের সময় অতীত সুখের স্মৃতি সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক। আমাদের মান, অভিমান, মন জানাজানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ, স্নেহালিঙ্গন সবই মনে পড়িল। একবার আমার খুব জ্বর হইয়াছিল আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছটফট করিতেছিলাম। তিনি আমার সমুদয় নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত রাত্রি আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শীতল হস্ত আমার উত্তপ্ত কপোলে বুলাইতে বুলাইতে কত আগ্রহের সহিত বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পীড়ার নিবৃত্তি পর্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক আমার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আর একবারের কথা আমার বেশ মনে আছে। রাত্রে শয়ন কক্ষে আসিয়া আমি প্রত্যহ বালা দুগাছি খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া দিতাম। একদিন হঠাৎ জাগিয়া দেখি জানালার মধ্যে দিয়া তরুণ অরুণের আলো প্রবেশ করিতেছে। বেলা হইয়াছে দেখিয়া জিভ কাটিয়া কেমন করিয়া বাহিরে যাইব ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ক্ষিপ্রহস্তে শিথিলবসন সংযত করিয়া বালা পরিতে উদ্যত হইলে, তিনি পরাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি যথেষ্ট আপত্তি করিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পারিবে কে? তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমিও তাঁহার কাছে সর্বদা হার মানিতেই ভালবাসি। তাড়াতাড়ি বালা পরাইয়া দিতে আমার হাতে একটু লাগিয়াছিল। তিনি তাহার জন্য কত অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। করুণার আবেগে কত আদর করিয়াছিলেন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "খুব ব্যথা লেগেছে কি?"

ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। অশ্রুজলে প্রত্যেক বারেই কাগজ ভিজিয়া গেল। চার পাঁচখানা কাগজ নষ্ট করিবার পর অনেক চেষ্টায় কম্পিত হস্তে লিখিলাম।

শ্রীচরণেষু,

কাল তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি। আজ আবার এ চিঠি দেখে বোধ হয় খুব

আশ্চর্য হবে। কিন্তু আজ সকাল বেলা থেকে, কি জানি কেন শুধু তোমার কথাই মনে হচ্ছে। তাই তোমাকে চিঠি না লিখে থাক্‌তে পারলাম না। তোমার জন্য আর কখনো আমার মন এত খারাপ হয়নি তোমাকে দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি। তুমি লিখেচ, যে গ্রীষ্মের ছুটির জন্য ল'ক্লাস বন্ধ হবার আর দশ বারোদিন বাকি আছে। একদিন আগে কি আস্‌তে পারো না? যদি পারো নিশ্চয় এস—এস। বাড়ীর সব ভাল। তোমার আশায় রহিলাম। যদি পার আসবার সময় একখানা প্রিয়ম্বদা দেবীর "রেণু" এনো। আমার প্রণাম নিও।

তোমার রমা।

অবশিষ্ট রাত্রিটুকু চিন্তায় কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে আমার অষ্টম বর্ষীয়া ছোট ননদকে ডাকিয়া বলিলাম্ "ছোট্ ঠাকুরঝি ভাই, আমার একটা কাজ কর্বে? আজ স্কুল যাবার সময় আমার একখানা চিঠি ডাক ঘরে ফেলে দেবে?"

"এই কাল্ তোমার চিঠি দিয়ে এসেছি। রোজই চিঠি!—এত চিঠিও তুমি লিখ্‌তে পার? আর আমি পার্বো না। ছেড়ে দাও, ঐ ' বেলা' ডাকছে" এই বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া আনিয়া চুম্বন করিয়া বলিলাম, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার যাবার সময় এই চিঠিখানা নিয়ে যেও। আজ বিকেলে কুন্তলীন দিয়ে বেশ করে তোমার চুল বেঁধে দেবো।" কুন্তলীনের লোভে বীণার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বীণার কচি মুখখানিতে একটা ম্লান সৌন্দর্য ছিল, যার কাছে তীব্র জ্যোতি হার মানিত। সে সৌন্দর্য এমনি চিত্তাকর্ষক যে, যে দেখিত সেই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। সে আনন্দে স্বীকৃতা হইয়া মাথা দোলাইয়া বলিল, "দেবে তো?" আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। "ওই বইটের ভেতর রেখে দাও, নিয়ে যাবো'খুনি" এই বলিয়া সে অন্তর্হিতা হইল।

চিঠিখানি পাঠাইয়া দিয়া আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। ছি! ছি! তিনি কি মনে করিবেন। হঠাৎ আমার প্রবল আবেগপূর্ণ পত্র পাইয়া এরূপ আকস্মিক ব্যবহারের কোন কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া, কি ভাবিবেন! ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া যা তা লিখিয়াছি। কিন্তু এখন ত আর ফিরাইবার উপায় নাই।

দুই তিন দিবস পরে, আমি গৃহ হইতে আনাজের ডালা হস্তে বাহির হইতেছি, এমন সময় বারান্দায় কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। শব্দটা যেন খুব পরিচিত। আমার শিরায় শিরায় একটা আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল এবং বক্ষে স্পন্দন অনুভব করিলাম। পরক্ষণেই একজন আসিয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরানীকে প্রণাম করিলেন। তিনি পুত্রকে অকস্মাৎ আসিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি, আনন্দিত হইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিরে সতু হঠাৎ চলে এলি যে? তোদের কলেজ বন্ধ হবার নাকি আট দশ দিন বাকী আছে?"

"আমাদের বাসার পাশে এক বাড়ীতে প্লেগ হয়েছিল। তাই পালিয়ে এলাম" এই বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন 'ব্যাপার কি'। আমি ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া গেলাম।

৪

রাত দুপুর বাজিয়া গিয়াছে। সকলেই ঘুমাইতেছে, জাগিয়া শুধু আমরা দুজন। স্বামী বলিলেন, "রমা তোমার খুব কষ্ট হবে। পার্বে তো? তোমার এই সুকুমার দেহ, এই বালিকা বয়স—"আমি মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম "যা-ও। কি যে বক্‌ছো।" "তবে চল" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। আমি সমস্ত গহনা খুলিয়া বাক্সের ভিতর পুরিয়া চাবিটা বালিসের নীচে রাখিয়া দিলাম। হাতে শুধু দুগাছি বালা রহিল। সঙ্গে পরনের দুএকখানা কাপড় ও আমার অতি প্রিয় চিঠিপত্র এবং দু'একটা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই লইলাম না। মনে মনে গুরুজনদের প্রণাম করিয়া ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাহির হইলাম। খিড়কির দুয়ার দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। প্রায় পনেরো মিনিট আমরা হাঁটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন "রমা তোমার কি চল্‌তে খুব কষ্ট হচ্ছে?" আমি হাসিয়া বলিলাম "না। ইঃ যেন আমি চল্‌তে শিখিনি। কি যে বল তুমি।"

নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দুজনে চলিতে লাগিলাম। আর একটু দূরে যাইয়াই দেখিলাম আমাদের জন্য একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। আমরা আরোহণ করিবামাত্র গাড়োয়ান অশ্ব ছুটাইয়া দিল। আমরা দুজনেই নীরব। গাড়ীতে উঠিয়াই আমার মন কেমন করিতে লাগিল। অনুতপ্ত চিত্তে ভাবিলাম এখন ফিরি। করিতেছি কি? পাগল হইয়াছি নাকি। আমার জন্য এত কাণ্ড— কি স্বার্থপর আমি। আমার সুখের জন্য স্বামী তাঁহার সব বিসর্জন দিতেছেন। এই কি আমার উচিত? এই কি পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম। চিন্তাস্রোতে তন্ময় হইয়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি তখনও এক চিত্তে ভাবিতেছি। একটু পরেই ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। আমাদের জন্য একখানা গাড়ী রিজার্ভ ছিল। তিনি আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন। কলের পুতুলের মত তাঁহার অনুগামিনী হইলাম। ট্রেন প্রায় ছাড়ে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। হঠাৎ দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তোমার সঙ্গে যাব না, আমায় নাবিয়ে দাও! চল বাড়ী ফিরি এখনও রাত আছে, কেউ জানতে পার্বে না।" স্বামী বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে আমার প্রতি চাহিলেন।

আমি নামিতে উদ্যত হইয়া আবার বলিলাম, "না—না আমি তোমার সঙ্গে যেতে পার্বো না। কেন তুমি অভাগিনীর জন্য তোমার জীবন যৌবন সব নষ্ট করে, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে? তুমি বড় না আমি বড়? আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না, আমি তাকে বোনের মত ভালবাসবো। তুমি আবার বিয়ে কর—"

"আমার এই দেবী থাক্‌তে" এই বলিয়া স্বামী আমার তৃষিত অধরে চুম্বন করিয়া, আমাকে জোর করিয়া বসাইলেন। "ছিঃ রমা, ছেলেমানুষী হচ্ছে। এই কি গোল করবার সময়।" বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। অভাগিনী আমার জন্য এত! পূর্ব জন্মে না জানি কত পুণ্য করিয়াছি তাই আমার এ সৌভাগ্য। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বললাম "কেন আমার জন্য এত করলে?"

তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "কেন?—ছিঃ রমা তুমি এত নিষ্ঠুর! তোমাকে মিনতি করি আমাকে ক্ষমা কর। আর আমাকে মুগ্ধ করো না। যেখানে সমাজের নির্যাতিন নাই, সেখানে যাই চল। আমরা কোথা যাচ্ছি জান? করাচি যাচ্ছি। সেখানে আমার একজন বন্ধু এক সাহেবের আফিসে কাজ করেন। তিনি লিখেছেন তাদের একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের দরকার। সাহেব আমাকে সে কাজ দিতে চেয়েছে। সমুদ্রের ধারে দুজনে কেমন থাক্‌বো, আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ করব।"

পঞ্জাব মেল বিদ্যুৎগতিতে ছুটিতেছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানিতে প্রবল প্রেমের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র আসিয়া পড়াতে তাহা আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে জগৎ বিস্মৃত হইতেছিলাম। আমার একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। সাধ পুরাইতে না পারিয়া লজ্জায় তাঁহার বুকে মুখ লুকাইলাম।

৫

সুখে দুঃখে আরও তিন চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের একটি ফুটফুটে খোকা উপহার দিয়াছেন এখন খোকাই আমাদের ঘর আলো করিয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্তী একখানি ছোটো বাংলোতে আমরা থাকি। এ স্থানটি বড় মনোরম। যে দিকে চাওয়া যায়, নীল সিন্ধু ও অনন্ত আকাশ। আমাদের উপরে শ্বশুর ঠাকুরের এখন আর ক্রোধ নাই। সে সমস্ত অনেক দিন মিটিয়া গিয়াছে। সন্তানের উপর রাগ করিয়া পিতা কতক্ষণ থাকিতে পারে। সূর্য ডুবিয়া আসিলে আমি, খোকা ও খোকার বাবা ক্লিফটন্ সি বিচে (Clifton sea beach) বেড়াইতে যাই। খোকা এখনও ভাল করিয়া কথা বলিতে শিখে নাই, তাহার সেই কচি মুখের আধ আধ কথা আমার প্রাণে অমিয় বর্ষণ করে। সে দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছে। যেন একটি স্বর্গের ফুল। মুখখানি ঠিক তার বাবার মত। কি আশ্চর্য সাদৃশ্য। আমরা বালুকার উপর বসিয়া সমুদ্রের নীল জলরাশির বিচিত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে গল্প করি। খোকা এক একদিন খেলিতে খেলিতে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। আমার আর সেলাই করা হয় না। ফ্রক রাখিয়া সুপ্ত শিশুর বিমল অধরে চুম্বন করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি।

'কুন্তলীন'—১৩১৩

আত্মোৎসর্গ

সুশীলা সেন

বিভার স্বামী বিলাতে সিবিল সার্বিস পাশ করিতে গিয়াছেন। বিভার সহিত যতীশের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স বার ছিল, এখন সে সতের বৎসরের হইয়াছে। এই বৎসরেই বিভার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। বিভার পিতা শিবচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন গভীর বিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার স্বভাব তেমনি শান্ত, সেবাপরায়ণ এবং নির্মুক্ত ছিল। কতকগুলি এম এ ক্লাসের ছাত্রকে তিনি সংস্কৃত পড়াইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। জামাতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বলিতেন, "আমাদের এই দেশের মাটী যেমন, একটুখানি আঁচড় কাটিলেই সোনা ফলে, আমাদের দেশের লোকের মনও তেমনি, এমন নম্রতা ও সহিষ্ণুতা তাহার ভিতর আছে যে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট ভাব এবং জ্ঞান তার ভিতরে অতি সহজেই ধরা পড়ে। বিদেশে গেলে, বিশেষতঃ বিলাতে গেলে, আমাদের ছেলেদের মনের সেই গুণটুকু নষ্ট হইয়া যায়, কেমন এক প্রকার হৃদয়হীন ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে।" দেশের উপরে শিবচন্দ্রের গভীর ভক্তি ছিল। অতিথি সৎকার, দরিদ্রসেবায় তিনি তাঁহার গৃহাশ্রম পবিত্র এবং আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের প্রেমময়ী গৃহিণী এ বিষয়ে তাঁহার যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন। প্রতিদিন পুণ্য প্রভাত সময়ে প্রাতঃস্নান করিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত শিবচন্দ্র যখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে দেবপাঠ করিতেন, তখন মনে হইত যেন আবার সেই সুদূর অতীতের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে—আর্য ঋষিগণের কণ্ঠ নিঃসৃত বেদমন্ত্রে যেদিন ভারতবর্ষের এই নিস্তব্ধ আকাশ প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্বশুরের অনিচ্ছা এবং নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যতীশকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। সে নিজেদের পুঁজিপাটা যাহা ছিল সব বিক্রয় করিয়া, ধার করিয়া বিলাতে চলিয়া গেল। তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতীশই তাহাদের একমাত্র সন্তান। তাঁহারা ভাবিলেন যাহাই হোক, যদি ছেলেটি মানুষ হইয়া আসে, তাহা হইলে সব দুঃখ সার্থক হইবে।

পিতৃগৃহের স্নেহছায়ে, শান্তি ও আনন্দে বিভার দিনগুলি কাটিয়া যাইত। বিভা তাহার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা; শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, বিভা সকলের ছোট। পিতা মাতা ও ভাইদের নয়নের আনন্দ সে ছিল। শিবচন্দ্র তাহাকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বিভাকে তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সেখানেও বিভা যত্ন ও আদর পাইত।

তখন কলিকাতায় খুব স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। শিবচন্দ্র নিজে চিরকালই "স্বদেশী" ছিলেন; আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতেই তিনি স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। বিভার দাদা মিটিং করিতে, বয়কট্ করিতে খুব মাতিয়া উঠিল। একদিন বিভার বড়দাদা

একখানি বঙ্গজননীর ছবি কিনিয়া আনিয়া, যে ঘরে বিভা ও তার মা শুইতেন সেই ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল। ছবিখানি অশিক্ষিত হস্তাঙ্কিত হইলেও বিভার মনকে বড়ই স্পর্শ করিল। অন্নপূর্ণারূপে জননী জন্মভূমি অন্ন-বস্ত্র-হস্তে সন্তানদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহার আপন সন্তানগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার সেই সস্নেহ দান উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুঃখিনী জননী বিমুখ সন্তানদিগের প্রতি সতৃষ্ণ স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন! বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ছবিটি দেখিত— অশ্রুজলে তাহার চোখ ভরিয়া উঠিত।

৩০শে আশ্বিনের পুণ্যদিন আসিল, বিভার মা ঠিক করিলেন সকলে মিলিয়া আজ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বাড়ীতে ফলাহার করিবেন। গঙ্গার ঘাটে সেদিন কি দৃশ্য! দলে দলে বালক, যুবক, বৃদ্ধ নগ্নপদে,—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান!

এই গান করিতে কবিতে চলিয়াছে। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পর পরস্পরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিতেছে। বিভার মনে হইল সেদিন, সেই শুভ্র উষার আলোকে, গঙ্গার ঘাটের উপর কিসের যেন একটি আবির্ভাব জলস্থলকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। নব সূর্যের কিরণরাশিব ভিতরে তাঁহারা যেন জননীর হাসি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মনের ভিতরে একটি অব্যক্ত মধুব ভাব লইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বিভার "স্বদেশী"র দিকে পক্ষপাত দেখিয়া দুই একটি সমবয়সী বালিকা তাহাকে বলিয়াছিল, ' বিভা, তুমি তো খুব স্বদেশীর ভক্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তোমার বর সাহেব সেজে বিলাতী বুট পরে এসে যখন দাঁড়াবেন, তখন তোমার এত ব্রত নিয়ম সব কোথায় থাকবে?" বিভা বলিত "হাজার সাহেব সাজলেও বাঙ্গালীর ছেলে চিরকাল বাঙ্গালীই থাকবে।" সখীরা হাসিয়া বলিত, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

আপাদমস্তক সাহেব সাজিয়া, সাহেবী কেতায় নির্দোষরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া, যতীশচন্দ্র সিবিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই বিভাকে লইয়া নিজের কর্মস্থানে চলিযা গেলেন। যাইবার সময়, বিলাতী দোকান হইতে অসংখ্য বিলাতী ব্যবহার্য দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। রাঁধিবার সরঞ্জাম পর্যন্ত খাস বিলাতী হইল। বিভা মৃদুস্বরে একবাব বলিল "এত বিলাতী জিনিস কেন কিনিতেছ, এসব জিনিসই ত দেশী পাওয়া যায়, আমার বাবা একটিও বিলাতী জিনিস কেনেন না।" যতীশচন্দ্র মুখ হইতে চুরুট না খুলিযাই অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "রামঃ, দেশী জিনিস আবাব মানুষে কেনে!" উত্তর শুনিযা বিভা চুপ করিযা গেল।

সিরাজপুরে আসিয়া, সাহেব মহলে এক প্রকাণ্ড বাংলা বাড়ীতে বিভা নির্বাসিত হইল। তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিল, যতীশ তাহা উড়াইযা দিল। পুত্রেব প্রত্যাবর্তনেব পর তাঁহারা নিজে আসিয়া একবার পুত্রকে দেখিযা আবার দেশে

ফিরিয়া গেলেন। সিবিলিয়ান পুত্রের নিকট হইতে মাসে মাসে কিছু টাকা এবার তাঁহারা বহুপুণ্যের ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন! বিভা বেশ বুঝিয়াছিল, তাঁহারাও এখানে টিকিতে পারিবেন না। এই মুর্গি, মাংস, অনাচার—তাহার ভিতরে তাঁহারা কি করিয়া থাকিবেন? তাহার নিজের সমস্ত অন্তরাত্মা এই অনাচার, বিলাসিতা, ধর্মহীনতায় বিমুখ হইয়া উঠিত, কিন্তু তবু সে কিছুই বলিতে পারিত না। যতীশ চিরকালই ক্ষমতাপ্রিয় ছিল, আজ কাল সিবিলিয়ান হইয়া সে আরও হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিভা স্বামীকে নীরবে ভয় করিয়া চলিত। তাহার মা তাহার সঙ্গে কিছু বাসন ও দেশী ব্যবহারের জিনিস দিয়াছিলেন, বিভা গোপনে সেইগুলি ব্যবহার করিত। একবার যতীশ বিভাকে দেশী মোটা ফিতায় চুল বাঁধিতে দেখিয়া, টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ও দোকান হইতে সিল্কের ফিতা আনাইয়া দিয়াছিল। বিভা সেইদিন হইতে ফিতা দিয়া চুল বাঁধা পরিত্যাগ করিল।

নির্জন মাঠের মাঝখানে, বাংলা বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে, কি জানি কেন, বিভার দিন আর কাটিত না। অথচ, কি যে তাহার অভাব, কি যে দুঃখ, তাহা সে বলিতে পারিত না। যতীশ স্থানীয় বাঙ্গালীদের সহিত কখনও মিশিত না। সেজন্য বিভারও প্রতিবেশীদিগের সহিত বিশেষ পরিচয় হয় নাই। সে রোজ সন্ধ্যার সময়, ফিটানে করিয়া যতীশের সঙ্গে হাওয়া খাইতে যাইত। আজ এখানে পার্টি কাল ওখানে পার্টি, পোষাক পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের অন্ত ছিল না। কিন্তু বিভার এসব ভাল লাগিত না। যতীশ যখন কাছারীতে চলিয়া যাইত সে আপনার শুইবার ঘরের জানালাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। সম্মুখে দিগন্ত বিলীন, তৃণহীন মাঠ পড়িয়া আছে। সেই জনশূন্য দ্বিপ্রহরে, মাঠের দিকে তাকাইয়া, বিভা তাহার আজন্ম পরিচিত স্নেহময় পিতৃগৃহের কথা মনে করিত। মায়ের অক্লান্ত সেবানিষ্ঠা তাহার মনে পড়িত। পিতার সেই পূজার ঘরটি সে নিজে স্বহস্তে মুছিয়া পরিষ্কার করিত। ঘরের দেওয়ালের সেই মাতৃভূমির ছবিখানির কথাও সে বার বার মনে করিত। সেই ছবির নিচে দাঁড়াইয়া, এক পুণ্য প্রভাতে সে সজল নয়নে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে জননীর দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু কোথায় আজ সে প্রতিজ্ঞা, প্রবল সভ্যতার স্রোতে তাহার স্বামী ভাসিয়া চলিয়াছে, কে তাহাকে জননীর দুঃখের কথা বলিয়া তাহার কাজে টানিয়া আনিবে? হায়, বিভার যদি সেইটুকু সাধ্য থাকিত!

পূজার সময় আসিয়াছে—বিভার মা প্রবাসী কন্যার জন্য পূজার কাপড় ও অন্যান্য উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় বিভা তাহার মাতৃদত্ত নূতন কাপড়খানি পরিয়াছিল। যতীশ গাড়ীতে উঠিয়াই বিভাকে বলিল, "এ কি কাপড় পরেছ? সিল্কের কাপড় পর নাই কেন? আবার কি একটা ছাই এসেন্স মেখেছ, দেখি?" বিভা কম্পিতকণ্ঠে বলিল "মা আমার জন্য এই কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছেন, কাপড়ের সঙ্গে এক শিশি দেলখোস দিয়াছিলেন, তাহাই একটু রুমালে মাখিয়াছি।" যতীশ বলিল "এ সমস্ত জঘন্য জিনিসগুলি তুমি কেন ব্যবহার কর, আমি বিলাতী ছাড়া অন্য কোন এসেন্স ছুঁই না" বিভা একবার তর্কের ছলে বলিল "আমার কিন্তু বিলাতী এসেন্সের গন্ধ ভাল লাগে না।" কিন্তু যতীশের সঙ্গে তর্ক করা সহজ নয়, সে চুপ করিয়া গেল।

আবার ৩০শে আশ্বিন ফিরিয়া আসিল। বিভা নিরাশহৃদয়ে ভাবিল, আজিকার দিনটা বৃথাই যাইবে, যতীশ এসব নিশ্চয়ই nonsence বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সকাল হইতে বিভা দেখিল এখানেও দলে দলে ছেলে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। কতকগুলি বালক বিভার বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিল, যতীশ তখন চা খাইয়া বাহিরে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে হইতে সকলের চেয়ে ছোট একটি বালক বাড়ীতে ঢুকিয়া, বিভাকে প্রণাম করিয়া বলিল "মা, আজ ৩০শে আশ্বিন, আজ আমাদের মায়ের অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে আজ চুল্লি জ্বালাইবেন না, আজ বাঙ্গালী মাত্রেই ফলাহার করিয়া থাকিবেন।" বিভার দুই চোখে জল আসিল, কি করিয়া ইহাদের জানাইবে, সেও ইহাদের মতই স্বদেশী, এখানে সে বিদেশীর মত আছে বটে, কিন্তু তার বাপের বাড়ীতে সে কত স্বদেশীর অনুরক্ত ছিল। কিছু না বলিয়া পাঁচটি টাকা লইয়া বিভা সেই বালকের হাতে দিয়া বলিল "তোমাদের এখানকার স্বদেশী সমিতিতে এই টাকা দিলাম কিন্তু আমার নাম তোমরা কাহাকেও জানাইও না, এই অনুরোধ।" সম্মত হইয়া বালকেরা ফিরিয়া গেল। বালকদের নিকট হইতে কিছু রাখী চাহিয়া বিভা কলিকাতায় দাদাদের পাঠাইয়া দিল। নিরানন্দ গৃহে ৩০শে আশ্বিনের পুণ্য দিন, আসিল, চলিয়া গেল।

রাত্রে সেদিন বাতাস বন্ধ হইয়া বড় গরম পড়িয়াছিল। তাহার উপরে পাখাটানা কুলিটা ক্রমাগত ঢুলিতেছে। নিদ্রার ব্যাঘাতে বার বার কুলিটাকে ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেছে। অবশেষে এক সময়ে থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া গিয়া প্রহারের চোটে কুলিটাকে বারান্দার উপর হইতে নিচে উঠানে ফেলিয়া দিল। পাথর দিয়া কপাল কাটিয়া যাওয়াতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আপনার মলিন বসনে রক্ত মুছিয়া লইয়া, নিরীহ কুলি আবার আসিয়া পাখা টানিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রহার বিভার আপনার অঙ্গে যেন বাজিল। বিনিদ্র নয়নে, নিস্তব্ধ হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অবশেষে যখন দেখিল যতীশ বেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে নিঃশব্দে উঠিয়া জানালার কাছে বসিল। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ, ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত হইয়াছে। দূরে দূরে দুই একটি গাছ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নৈশ বায়ু পাতার ভিতর দিয়া সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে ছেলেরা গান করিতেছিল। বিভা শুনিতে পাইল বালকের কণ্ঠে কে গাহিতেছে।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে, আকুল নয়ননীরে
কে বৃথা আশা ভরে, চাহিছ মুখ 'পরে
সে যে আমার জননীরে!

বিভার দুই চক্ষু দিয়া রুদ্ধ অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন ঐ জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠের মাঝখান দিয়া অপমানিতা, পরিত্যক্তা, জননী একাকিনী সন্তানদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন! যেন মনে হইল নৈশ বায়ু তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ, শুভ্র অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া দিতেছে! হায়, জননী যাইও না। অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করিয়া একবার ফিরিয়া এস!

সেই দিন হইতে বিভার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। পিতা তাহার অসুস্থতার

কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। এক বৎসর পরে বিভা বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সে বিভা আর নাই। মা তাহাকে বলিলেন ''বিভা, তুই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস।'' বিভা বলিল ''কি জানি মা, সিরাজপুরের জল হাওয়া বোধ হয় আমার সহ্য হ'ল না।'' বাড়ী আসিবার আনন্দে বিভা দুদিন স্ফূর্তিতে বেড়াইল, কিন্তু ক্রমে সে শয্যা লইল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন রোগ আরোগ্য হইবার নহে।

রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া বিভা কত কি যে ভাবিত তাহার শেষ নাই। দাদারা এক এক দিন আসিয়া তাহাকে এক একটি খবর দিয়া যাইত। কোন দিন আসিয়া বলিত, অমুকের বিনা দোষে জেল হইল। কোন দিন বলিত, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, কত লোক যে না খাইয়া মরিতেছে, তাহার হিসাব নাই। শুনিয়া বিভা শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। স্বদেশের দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় গলিয়া যাইত।

একদিন বিভা দেখিল, তাহার দাদারা তাড়াতাড়ি জল খাইয়া কোথায় যাইতেছে—উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ''দাদা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'' তাহারা উত্তর করিল ''কি হয়েছে শুনিস্‌নি? কাল সন্ধ্যায় গোলদিঘিতে পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের ভয়ানক মারামারি হয়ে গেছে। একটা বুড়ি সেই ভীড়ের মাঝখান দিয়া যাইতেছিল, পুলিশের অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, কাছে দুটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বুড়িকে বাঁচাইতে যায়। তাতে তাদের সঙ্গে সাহেবের মারামারি হয়। ছেলে দুটিকে হাজতে লইয়া গিয়াছে—আজ তাদের বিচার হবে।'' দুই তিন দিন যাতায়াত করিয়া একদিন ম্লান মুখে তাহার দাদারা ফিরিয়া আসিল। বিভা জিজ্ঞাসা করিল, ''কি দাদা, কি হইল?'' তাহারা বলিল, ''তাদের দু'জনেরই জেল হয়েছে, ১০০্ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে, তা না দিলে এক মাস করে জেল।'' বিভা জিজ্ঞাসা করিল ''দাদা তারা কি ১০০্ টাকা জোগাড় করতে পারবে না?'' তাহারা বলিল ''সম্ভব নয়, তাদের দুজনের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ।'' বিভার মেজদাদা বলিল ''বাবাকে বলিলে তিনি এখনই তার যা আছে সব দিয়া দিবেন, কিন্তু তার পরে তিনি বড় কষ্টে পড়িবেন, সেইজন্য তাঁকে বলি নাই। তিনি ত কখনও ধার করিবেন না।'' দাদারা আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিভা তাহাদের ডাকিল, বলিল ''দাদা, শোন, আমার একটি মুক্তার নেক্‌লেস্‌ আছে তার দাম প্রায় ২৫০্ টাকা। সেই নেক্‌লেস্‌টি বিক্রয় করে তুমি এদের খালাস করে আন।'' বোনের কথা শুনিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল—কিন্তু তাহারা বলিল ''না, বিভা, যতীশবাবু টের পাইলে তুই মুস্কিলে পড়িবি।'' বিভা বলিল, ''না, না, তিনি জানিবেন না।'' সজল নয়নে, রুগ্ন বিভা এত অনুরোধ করিতে লাগিল যে শুধু তাহাকে সুখী করিবার জন্যই দাদারা নেক্‌লেস্‌টি লইতে রাজি হইল।

অনেকদিন পরে সে রাত্রে বিভা ঘুমাইয়াছিল। কিন্তু তার পরদিন হইতে তাহার জীবনের আর কোন আশাই রহিল না। কাশিতে কাশিতে একবার কতকটা রক্ত উঠিল, তাহাতেই নাড়ী বসিয়া গেল। পিতা মাতা, ভায়েরা বিভার সেই শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। কি একটি অপার্থিব শান্তি তাহার মুখের উপরে বিরাজ করিতেছিল।

একবার তাহার মা শুনিতে পাইলেন অস্ফুটস্বরে সে কি বলিতেছে, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শুনিলেন ক্ষীণস্বরে বলিতেছে, ''আহা, আর মের' না মের' না, মরে যাবে।'' আর একবার ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলিল,—

''সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।''

সেইদিনই বিভার আত্মা, এই ভগ্ন-শরীর-পিঞ্জর ছাড়িয়া দিব্যধামে উড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি ছেলে গান করিতে করিতে বিভাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জেল-মুক্ত ছেলে দুটি বিভাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছিল। বিভার দাদা তাহাদের বিভাকে দেখিবার জন্য উপরে ডাকিয়া আনিল। অসীম শান্তির কোলে বিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাতৃরূপের অনন্ত অমর সৌন্দর্য তাহার সেই মৃতমুখও অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। স্তম্ভিত হৃদয়ে, ভক্তিপূর্ণ নয়নে তাহারা দেখিতে লাগিল; একবারও তাহাদের মনে হইল না যে তাহারা মৃতের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মনে হইল যেন এই দেবীমূর্তি বিধাতার হস্ত হইতে এখনই রচিত হইয়া আসিল, স্বর্গের নিঃশ্বাস পাইলে এখনই বুঝি জাগিয়া উঠিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বিভার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

মা গো যায় যেন জীবন চলে
জগত মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।

যতীশচন্দ্র খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ছুটির অভাবে তিনি বিভাকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। মনের শূন্যতা দূর করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি বিলাতফেরতের কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলেন।

'কুন্তলীন'—১৩১৪

হারানিধি

শ্রীমতি সরলা সুন্দরী মিত্র

গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইয়াছে। বাটী যাইবার জন্য পিতার জরুরী পত্র আসিয়াছে। কারণ আমার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। আমার যাইবার প্রতীক্ষা মাত্র; তাই আজ মেসের বন্ধু বান্ধবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বেলা সাত ঘটিকার সময় নৌকারোহণে বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরদিয়া জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে আমার নিবাস. এ অঞ্চলে তখনও রেল খুলে নাই। আমরা নৌকারোহণে যাতায়াত করিতাম। কিন্তু বিশেষ কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। প্রাতঃকালে যাত্রা করিলে, সন্ধ্যার সময় বাটী পৌঁছান যাইত। আমি মনের আনন্দে নদীর চারিধারের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কোথাও বা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ ধু ধু করিতেছে। রাখাল বালকেরা গরুগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। এবং মনের আনন্দে কেহ বা গীত গাহিতেছে কেহ বা মুড়ি খাইতেছে। কোথাও বা গ্রাম্য বধূরা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, বারিপূর্ণ কলসী কক্ষে থমকে থমকে হেলিতে দুলিতে গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে। দুর কাননের অন্তরাল হইতে শুধু একটি কোকিল এক এক বার কুহু ধ্বনিতে হৃদয়ে অমৃত বর্ষন করিতেছে। নানা বর্ণের পক্ষী সকল কলরব করিতে করিতে নদীর উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে।

মাঝিরা সব সারি গাহিয়া চলিয়াছে। এবং ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষেপনী চালনা করিতেছে, ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল; মার্ত্তণ্ডদেবের সে প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নৌকার ছত্রীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠে মনোনিবেশ করিলাম। পুস্তক পড়িতে পড়িতে কখন যে নিদ্রা দেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছি তাহা স্মরণ নাই, যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অপরাহ্ন পাঁচঘটিকা। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই যেন আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কতক্ষণে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, এবং প্রিয়তম সহোদরকে দেখিব যতই ভাবি, ততই যেন আনন্দে আমি অধীর হইয়া পড়ি কিন্তু আমার এ ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিল। সহসা পশ্চিমগগনে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘ ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রমশ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঘনঘোর আঁধারে সমস্ত জগৎ যেন কি বিকট ভাব ধারণ করিল। নদীর চঞ্চল লহরীমালা মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া গেল। বৃক্ষের পত্রই পর্যন্ত নড়িতেছে না। সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ। সহসা ভীষণ বেগে বায়ু প্রধাবিত হইল। প্রকাণ্ড গাছ পালা আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। মেঘের কোলে সৌদামিনী ঘন ঘন হাসিতে লাগিল, গভীর নিনাদে মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। নদীর তরঙ্গমালা রঙ্গে ভঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতি প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন জগৎসংহারে উদ্যত। তখন আমার প্রাণের ভাব কি প্রকার তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা কি আর পাঠক বর্গকে বলিয়া দিতে হইবে? ''আল্লার নাম নাও। আমার যতক্ষণ জান আছে, তোমার কোন ভয় নাই।'' আমি মাঝির আশ্বাস বাক্যে মনকে

প্রবোধ দিতে পারিলাম না, সেই একমাত্র বিপদে চিন্ময় চিদানন্দ শ্রী মধুসূদনের নাম আবেগ ভরে জপ করিতে লাগিলাম। এক একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমার তরঙ্গ খানি ডুবাইবার চেষ্টা করিল। সুনিপুণ মাঝির সুকৌশলে চালনায় ও একমাত্র দয়াময়ের কৃপায় সেই প্রলয়ে মধ্যে আমার নৌকাখানি ডুবু ডুবু হইয়াও ডুবিল না। কিন্তু সহসা আমি যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম আমাদের চারি পাঁচ হস্ত দূরে একখানি তরণী প্রবল ঝটিকাঘাতে মগ্ন প্রায়। কর্ণধার কোনমতে নৌকা সামলাইতে পারিতেছে না, আর রক্ষা নাই। গেল-গেল একটা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের সহিত তরী খানি অতল জলে নিমগ্ন হইল।

যখন আমার চক্ষের উপর এই ভয়াবহ দৃশ্য ঘটিল তখন আমি নীরব নিশ্চল— বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ক্ষণেকের নিমিত্ত আমার নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু চাহিলাম, সেই জলমগ্ন নৌকার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কেবল উত্তাল তরঙ্গ মালা উঠিয়া পড়িয়া উল্লম্ফন করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণে বিদ্যুৎ সাহায্যে দেখিলাম, আমার নৌকার অতি নিকটে কি যেন একটা পদার্থ ভাসিয়া উঠিল। তখন নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, ঝম্প প্রদানের উদযোগ করিলাম। কর্ণধার "কি কর বাবু? কি কর বাবু?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি তো কথা গ্রাহ্য না করিয়া নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া সেই পদার্থটি অতিকষ্টে ধরিয়া ফেলিলাম। দাড়ি মাঝিরা আমার এই কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধি না হইয়া বরং আমার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। অতি কষ্টে আমাকেও সেই পদার্থটিকে কৌশল পূর্বক নৌকার উপর তুলিয়া লইল। তখন ঝটিকার বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। আমি ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোক সাহায্যে দেখিলাম, যাহার উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়া ছিলাম, সে একটি দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। বালিকা অঘোর অচৈতন্য; কিন্তু অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে, শুশ্রূষা করিলে বাঁচিতে পারে এই আশায় আশান্বিত হইয়া, উদরস্থ জল যে কৌশলে বাহির করিতে হয় সে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলাম। অনেকটা জল বহির্গত হইয়া গেল। কৌশলপূর্বক তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া, একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিলাম, এবং বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সযত্নে স্বহস্তে মুছাইয়া দিলাম। আ মরি মরি। বালিকার কি নয়ন মুগ্ধ কর রূপ রাশি। যেন কতকগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের সমষ্টি, আকর্ণ বিস্ফারিত নয়ন দুটি নিমীলিত। মুখখানি যেন প্রভাত কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। পাঠকগণ, আমার প্রতি বোধ হয় বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত বলিতেছেন, এ লোকটা কে গো? বালিকাটি মরিতে বসিয়াছে, কোথায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, না লোকটা কিনা রূপ বর্ণনা করিতে বসিল। পাঠকবর্গ সত্যই আমার বড় অন্যায় হইয়াছে, আমার এই প্রগলভতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি তার রূপের কথা বলিব না।

তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বালিকাকে অল্প অল্প তাপ দিতে দিতে তাহার সেই হিমানীতুল্য শীতল গাত্র অল্প অল্প উষ্ণ হইল। এদিকে প্রকৃতির অপূর্ব পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির আর সে প্রলয়ংকরী মূর্ত্তি নাই। নীলাকাশে শশধর অসংখ্য তারকাহারে বিভূষিত হইয়া

মধুর হাসি হাসিয়া জল, স্থল কানন প্লাবিত করিতেছে। স্নিগ্ধ সমীরণ ফুল পরিমল বহিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। মধুর কুজনে বিহঙ্গকুল কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ফুলকুল হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গাত্রে সোহাগে ঢলিয়া পড়িতেছে, তরঙ্গিনী নক্ষত্র মালা বুকে ধরিয়া মৃদু মন্দ-বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি এখন শান্তিময়ী।

ক্রমে ক্রমে তরী আসিয়া গোপাল পুরের ঘাটে পৌঁছিল। বালিকার কিন্তু সেই একই ভাব—অঘোর অচৈতন্য। সে রাত্রে আর বাটী যাওয়া হইল না। মাঝিকে বিশেষ পুরস্কৃত করিব বলিয়া তাহার নৌকাতে সে রজনী সেই ঘাটে অবস্থান করিলাম। কেন জানি না এক বার নয়ন মুদিত না করিয়া; বালিকার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখ খানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। যে মুহূর্ত্তে সেই প্রথম দেখা— সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত হইতে তড়িৎশক্তি সহযোগে কি যেন কি একটা ভাব আমার হৃদয় কোমলকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এ জীবনে এভাবটি এই নূতন-কিন্তু এটা কি তা তখন বুঝিতে পারিলাম না।

রাত্রি প্রভাত হইল। গগনের পূর্ব্বদ্বার খুলিয়া নবোঢ়া বধূর ন্যায় ধীরে ধীরে হাস্যমুখী উষাসতী দেখা দিল। বিহঙ্গকুল মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়া দিননাথের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিতে লাগিল। প্রভাত সমীর নাচিয়া নাচিয়া নদী বক্ষে উর্ম্মি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কখন বা কুসুম বালার অধর চুমিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিতেছে। কখন বা নৌকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া সেই অচৈতন্য বালিকার গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত অলকারাশি লইয়া খেলা করিতেছে। সেই শীতল সমীরণ স্পর্শে বালিকা একবার নয়ন উন্মীলিত করিল কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই কোমল কমল আঁখি দুটি নিমীলিত হইল। আমার হৃদয়ে এবার আশার সঞ্চার হইল। তাহার সেই অনাঘ্রাত ফুল্লনলিনী তুল্য মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেক ক্ষণ পরে বালিকা আবার চাহিল। এবার তাহার দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হইল। বালিকা বিস্মিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া বীনাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "আমি কোথায়?" আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বালিলাম, "তুমি উত্তম স্থানে আছ কোন ভয় নাই।"

বালিকা কিছুক্ষণ যেন কি ভাবিল, পুনরায় মধুরস্বরে বলিল, "আমার মা আমার বাবা কোথায়?" বালিকার কথার ভাবে বুঝিলাম, সেই নৌকায় তাহার পিতামাতা ছিলেন। কিন্তু এখন আমি কি বলি, তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যদি তাহার পিতা মাতার কোন সন্ধান পাই নাই বলি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে সত্য কথাই বলিব স্থির করিলাম। আমি তাহাকে যে প্রকারে উদ্ধার করিয়াছি সংক্ষেপে বিবৃতি করিয়া বলিলাম, " তোমার পিতা মাতা বোধ হয় তোমার ন্যায় অপর কোন লোকের সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছেন।" বালিকা কিন্তু আর কোন কথা বলিল না। নীরবে তাহার দুইটি গোলাপী গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। আমি তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কাহার কন্যা বা কোথায় নিবাস এবং কোথায় বা যাইতেছিল, সাহস করিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম

না। বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। নবোদিত তরুণ অরুণ কিরণ, চঞ্চল নদীবক্ষে পড়িয়া যে শোভা বিস্তার করিতে ছিল বালিকা তাহাই নৌকার গবাক্ষপথে ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। অনেক পরে বলিলাম "তুমি আমার সহিত আমাদের বাটী চল, তাহার পর যথাসাধ্য তোমার পিতামাতার অনুসন্ধান করিব।" বালিকা আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব। একটা কিছু বলিয়া ত সম্বোধন করিতে হইবে।" বালিকা লজ্জাবনত মুখে বলিল, "উমা বলিয়া ডাকিবেন।" আমি তাহার সেই ব্রীড়াবিজড়িত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহার পর একখানি শিবিকা আনাইয়া উমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া, মাঝিকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম।

বহির্ব্বাটীতে তখন পিতা ছিলেন না, আমি শিবিকাসহ অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই মাতাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া স্নেহ মাখা মধুর স্বরে বলিলেন "বাবা অমিয়। এতক্ষণ পরে এলি? কাল তো আসিবার কথা ছিল। কিন্তু কাল যে দুর্যোগ গেছে, আমি পাগলের মত একবার ঘর, একবার বার করিতেছি। আমাতে আর আমি ছিলাম না। তা যা হোক, তোর কোন বিপদ হয় নাই ত? তো সঙ্গে আবার পাল্কী কেন?"

আমি তখন কল্যকার ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিলাম। মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এখন পাগল ছেলেত কখন দেখিনি, ভাগ্যে মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন তাই রক্ষে।" তাহার পর শিবিকার দ্বার খুলিয়া উমার হস্ত সযত্নে ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি ও পিতামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম।

উমার পিতা মাতার কোনই অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না, তাহার প্রধান কারণ উমাকে তাহার পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে এমন ব্যাকুল ভাবে রোদন করিত যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাই দায় হইত। নির্ব্বোধ বালিকা বুঝিত না যে, ইহাতে তাহারই অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের যতদূর সাধ্য অনুসন্ধানের ক্রটি করি নাই, কিন্তু উমার অদৃষ্ট ক্রমে সমস্তই নিষ্ফল হইল। আমার মাতা ঠাকুরাণী উমাকে যতদুর ভাল বাসিতে হয় বাসিতেন। নিজ কন্যার ন্যায় আদর, যত্ন, স্নেহ করিতেন। কিসে উমার ম্লানমুখে হাসি আনিবেন, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেন। আমি ইহা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতাম। আমি কিন্তু উমার একটী বিশেষ ভাব লক্ষ করিলাম। সে প্রথম প্রথম আমার নিকট যেমন অসঙ্কোচে আসিত, গল্প করিত, এখন আর সে ভাব নাই। আমাকে দেখিলে পলায়ন করে এবং তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সহজে উত্তর দেয় না। তাহার এ ভাবের কোন কারণ আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। সত্যি কথা বলিতে কি, আমি উমাকে ভালবাসিয়াছি। কিন্তু সে কি জাতি, কাহার কন্যা এ সব একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। প্রণয়ের রীতিই বুঝি এই যে পাত্রাপাত্র বাছিয়া লইবার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। এদিকে আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাহার কারণ আমি যে দিন কলিকাতা হইতে বাটী আসিতেছিলাম, সেই দিন যে প্রবল

ঝটিকা হয়,, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকার স্মরণ আছে।

সেই দিন সেই দুর্যোগে যে কত লোক অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কত লোক উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? সেই দিনের সেই দুর্যোগের মধ্যে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয় স্ত্রী কন্যা লইয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। সহসা ঝটিকাঘাতে নদীবক্ষে নৌকা মগ্ন হয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী কোন প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিন্তু কন্যাটিকে পাওয়া যায় নাই, তাই বালিতেছিলাম যে আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। কিন্তু ক্ষণপ্রভার ন্যায় আমার হৃদয়ে এক একবার আশায় বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিত। আমি ভাবিতাম যাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, সেই উমাই কি আমার জলমগ্না ভাবী পত্নী? এক দিবস আমার শয়ন কক্ষে বসিয়া এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তিষ্ক এতদূর বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইল যে, আমি আর কোনমতে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শীতল বায়ূস্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হইল এবং মনের অবসন্নতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল তখন একখানি পুস্তক লইবার মানসে আলমারি খুলিয়া যেমন পুস্তক লইতে গিয়াছি, নিকটেই কাঁচের একটী ফুলদানী ছিল, অসাবধানতা বশতঃ পড়িয়া গিয়া তাহা শতধা চূর্ণ হইল। পুষ্পাধার পতনের শব্দের সহিত উমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমাকে দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, ''উমা যাইও না একটা কথা শুন।''

উমা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি বলিলাম, ''আসিয়াই যে চলিয়া যাইতেছিলে? কোন দরকার আছে কি?''

উমা মৃদুস্বরে বলিল, ''আপনার ঘরে কিসের শব্দ হইল তাই দেখিবার জন্য মা পাঠাইয়াছেন।'' উমা আমার মাকে মা বলিত।

আমি বলিলাম, ''কিসের শব্দ হইল কারণ না জানিয়া আমাকে দেখিয়া চলিযা যাইতেছিলে, মাকে গিয়া কি বলিতে? আমাকে এত ভয় কিসের উমা?'' উমা নত মস্তকে নীরবে রহিল।

আমি বলিলাম ''ফুলদানীটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই শব্দ হইয়াছে। অমন সুন্দর দ্রব্যটী মিথ্যা নষ্ট হইল।'' উমা আবার প্রস্থানে উদ্যত হইল। আমি পুনরায় যাইতে নিষেধ করিলাম। অদ্য আমার মনের কথা উমাকে বলিব, এবং উমা আমাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলাম। ''দেখ উমা, আজ তোমাকে আমার হৃদয়ে একটা গূঢ় কথা জানাইব। আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিনা উমা, তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি সেই দিন হইতে জগৎসংসার ভুলিয়াছি। বেশী কথা বলিতে চাহিনা। শুধু এইমাত্র বলিতেছি, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি। বল উমা, তুমি আমাকে ভাল বাস? আমার ভালবাসার প্রতিদান পাইবার আশা করিতে পারি কি?'' উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নীরবের পর বলিল, ''আপনি একি কথা বলিতেছেন? আপনার বিবাহের সমস্ত স্থির আর আপনি কি অন্যায় কথা বলিতেছেন?'' আমি বলিলাম ''উমা! তুমি ত সব শুনিয়াছ, সে আপদ ত চুকে গেছে।''

উমা এবারে নতমুখ তুলিয়া ভ্রূকুটী পূর্ব্বক বিরক্তি স্বরে বলিল, "আপনি এমনি স্বার্থপর। আহা! জলমগ্নের সময় তাহার কতই কষ্ট হইয়াছিল, আপনি সে জন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন কিনা,"—আমি বাধা দিয়া বলিলাম "উমা! প্রকৃত বলিতেছি, উহা আমার মনের কথা নয়। সত্য সে হতভাগিনীর পরিণাম ভাবিয়া মনে কষ্ট হয় কিন্তু আমি কি করিব? সে অল্পায়ু লইয়া জগতে আসিয়াছিল তাহার জন্য আমি দোষী হইতে পারি না। যাক ও কথা। এখন আমার কথার উত্তর দাও, তোমার ঐ কথার উপর আমার ভবিষ্যৎ সুখ, আশা, ভরসা, সমস্তই নির্ভর করিতেছে। বল—একবার বল ভাল বাস কিনা?"

'বাসি' বলিয়া, উমা দ্রুত প্রস্থান করিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র "বাসি" শব্দটীর ভিতর কত মধুরতা অনুভব করিলাম, তাহা অন্যকে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

পর দিবস অপরাহ্ন সময়ে আমি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছি, ইতিমধ্যে বৌদিদি ঠাকুরানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া হসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর পো! একটা ভাল খবর এনেছি, কি বক্‌শিশ্ দেবে বল দেখি?" আমি বলিলাম, "কি খবর বৌদি?" বৌদিদি বলিলেন, "আগে বল কি দেবে?"

আমি—আগে খববটাই শুনি।

বৌদি—যদি ফাঁকি দাও?

আমি—হাসিয়া বলিলাম, তবে "আমি নাচার।"

বৌদি—তবে তুমি শুনবে না?

আমি—আপনি না বলিলে কেমন করিয়া শুনিব?

বৌদি—তবে আমার একটী গল্প শোন।

আমি—এখন কি গল্প শুনবার সময় বৌদি?

বৌদিদি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন। "কি কাজে ব্যস্ত আছ যে শুনবার সময় নাই?" বৌদিদি তখন মিষ্ট হাসিয়া গল্প আবম্ভ করিলেন, "গোপালপুর নিবাসী অমিয়কৃষ্ণ বসুর সহিত শ্রীপুব নিবাসী যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দাসীব শুভ পরিণয়ে কথা বার্ত্তা এক প্রকার স্থির হয়। পাত্র অমিয় কলিকাতায় মেসে থাকিয়া, কলেজে পড়াশুনা করিত, গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে, অমিয়কৃষ্ণের পিতা, অমিয়কে বিবাহের জন্য বাটী আসিতে পত্র লেখেন। অমিয় পত্র পাইয়া যথা সময়ে নৌকাযোগে বাটী আসিতে ছিল। পথিমধ্যে ভয়ানক দুর্যোগ—প্রবল ঝটিকাঘাতে অমিয় কৃষ্ণের নৌকা মগ্নপ্রায় হয়। কিন্তু ঈশ্বকৃপায় অমিয়কৃষ্ণের কোন বিপদ হয় নাই।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "এ আবার কি গল্প বৌদিদি?"

বৌদিদি বলিলেন, "যা বলি শুন বাধা দিওনা। এমনি দুর্যোগের মধ্যে অমিয় দেখিল তাহার নৌকার অতি নিকটেই একখানি আরোহী পূর্ণ নৌকা ডুবিয়া গেল। অমিয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক অনেক কষ্টে একটী বালিকাকে উদ্ধার করিল। সেই বালিকার নাম হেমলতা দাসী।"

আমি পুনরায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার গল্প ভুল হইতেছে। তাহার নাম হেমলতা নয় উমা," বৌদিদি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার গল্প আমি জানি না, আর তুমি জান? কি বলিতে ছিলাম, হ্যাঁ—সেই জলমগ্ন বালিকার নাম হেমলতা। হেমলতার মাতামহীও মরণাপন্ন পীড়া হওয়ায় তাঁহার একমাত্র কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রীকে দেখিতে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হেমলতার পিতা যোগেশ বাবু যথা সময়ে স্ত্রী, কন্যা, সমভিব্যহারে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন্ এবং শ্বশ্রূমাতার মৃত্যুর পর বাটী ফিরিবার পথে প্রবল ঝটিকা ঘাতে তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। যোগেশবাবু পত্নীর সহিত কোন প্রকাবে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু প্রিয়তমা কন্যার কোনই সন্ধান না পাইয়া নিতান্ত মর্ম্মাহিত হইয়া রহিলেন।"

"এদিকে অমিয় যে বালিকাকে উদ্ধাব করিল, সেই যোগেশ বাবুর একমাত্র দুহিতা হেমলতা, হেমলতা অমিয়কৃষ্ণের ভাবী-পত্নী।" আমি তখন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম, "বৌদি শীঘ্র গল্পটা শেষ করুন।" বৌদিদি একটু মুচকিয়া হাসিয়া আরম্ভ কবিলেন—"অমিয় অতি যত্নে হেমলতাকে বাটী লইয়া আসিল। কিন্তু অমিয় কিম্বা অমিয়র পিতামাতা কেহই হেমলতার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন না। তাহার কারণ সেই অল্প বুদ্ধি বালিকা হেমলতা অমিয় ও বাটীর অন্যান্য সকলেব নিকট উমা নামে পরিচিতা হইয়াছিল, তাহার পিতা মাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন হইলেই এতদুব ব্যকুল হইত যে, কেহই সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমিয়কৃষ্ণের গৃহে মনঃকষ্টের কালাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমে ও জানিল না যে, এই তাহার ভাবী শ্বশুরালয়।

উভয় পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে ছিল সত্য কিন্তু হেমলতাকে পাত্রের বাটীর কেহ কখন দেখে নাই, কাজেই তাহাকে কেহ চিনিল না। যোগেশ বাবু যখন কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন পাত্রের পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন, তখন অমিয় কৃষ্ণের বাটী সকলেই উমাকে হেমলতা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাবা জানিতেন উমা নামে যোগেশ বাবুর কোন কন্যা নাই। হেমলতাই তাঁহার একমাত্র সন্তান, আব উমা যদি যোগেশ বাবু কন্যা না হয় একে তিনি কন্যা হারা হইয়া মনের কষ্টে আছেন, তাহার উপর আবার যদি আশায় নিরাশ হন, তাহা হইলে বড়ই মর্ম্মাহত হইবেন, এই ভয়ে তাঁহাকেই সেই বালিকার প্রাপ্তি সংবাদ কেহই দিল না। ক্রমে ক্রমে অমিয় হেমলতাকে ভাল বাসিল।

চতুর অমিয় ভাবিত তাহার এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ জানে না, কিন্তু তাহার একজন শুভাকাঙ্খিনী আত্মীয়ার নিকট কিছুই অগোচর ছিল না। সেই আত্মীয়া দুটী হৃদয় একত্র করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং সে সর্ব্বদা উমাকে হেমলতা বলিযা সান্ত্বনা করিয়া, উমা ওরফে হেমলতার নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইল, তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। বাটীর সকলে এ শুভ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। যোগেশবাবুকে তাঁহার হারা নিধি কন্যার সংবাদ পাঠান হইল। সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসিলেন, কেবল

সেই হতাশ প্রেমিক অমিয়কৃষ্ণ এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র জানে না। তাই তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিনী বৌদিদি শুভ সংবাদ দিতে উপস্থিত—" এই বলিয়া বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কেমন ঠাকুর পো। গল্পটা ভাল কিনা? এখন কি বখশিশ দেবে?" আমি বলিলাম "কি দিব বৌদি। আমার কি আছে?" বৌদিদি বলিলেন "তা জানি, তোমরা ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চাও না। তা যাক আমি তোমায় কিছু পুবস্কৃত করিতেছি," বলিয়া বৌদিদি কক্ষের বাহিরে আসিয়া উমার হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আমার হস্তের উপর তাহার হস্ত দিয়া বলিলেন "এই নাও ঠাকুরপো। আমাদের হারানিধি হেমলতাকে তোমার করে সমর্পণ। স্নেহে যত্নে তোমার উমাকে চিরদিন আদরে রাখিও—" বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন। উমা ও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল। পাঠক পাঠিকাগণ, বৌদির গল্প হইতে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছেন পুনরূক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যোগেশবাবু যথা সময়ে তাঁহার কন্যাকে লইয়া গেলেন। এক অল্প দিবস পরেই অমিয় মহা ধূম ধামের সহিত হেমলতার পাণিগ্রহণ করিলাম। আজ ফুলশয্যা রাত্রি। জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদের ধবল কিরণ গবাক্ষ দিয়া হেমলতার বদনে পড়িয়াছে। নানাবিধ ফুল অলঙ্কারে তাহাকে যেন ফুলরাণী দেখাইতেছে। সুগন্ধি তৈলচর্চ্চিত চিকচিকুরের উপর আবার আতর গোলাপ মাখিয়াছে, ফুলের সৌরভ, আতরের গন্ধ আর হেমলতার সেই অনিন্দ্য সুন্দর সৌন্দর্য্য মণ্ডিত চারুমুখ, আমাকে যেন উদ্ভ্রান্ত কবিয়া তুলিল। অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, দুই হস্তে হেমলতার নত মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া ডাকিলাম, "হেমলতা।" হেমলতা একটু হাসিয়া বলিল, "হেমলতা কোথায়? সে ত জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তোমার আপদ গিযাছে। আমি উমা।" আমার পূর্বের কথা মনে পড়িল, বুঝিলাম হেমলতা সেই কথার প্রতিশোধ লইতেছে। আমি বলিলাম. "সে কাহার জন্য বলিয়া ছিলাম? বেইমান। এখন ও কথা বলিবেই তো।"

হেমলতা আবার হাসিয়া বলিল, "তুমি আমাকে হেমলতা না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিও। তোমার মুখে উমা নাম শুনিতে ভালবাসি।"

আমি বলিলাম "তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি উমা নামে কেন পরিচিতা হইয়া অনর্থক কষ্ট পাইলে?" "উমা আমার আর একটি নাম কিন্তু ও নাম আমার প্রচলিত নয়, কেন জানিনা ঐ নামে তখন পরিচিতা হইয়া ছিলাম," বলিয়া হেমলতা আবার বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিল।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'—১৩১৫

দিদিমা

শবৎকুমাবী চৌধুবানী

নামাবলীখানি গায়ে দিয়া আমার দিদিশাশুড়ী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন তখন বেলা ৮ টা। আমি পানের বাক্স লইয়া পান সাজিতাম। তিনি গঙ্গাজলের ঘটিটি ও নামাবলীখানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা বড় পিতলের ঢাকা খুলিয়া আমাদের খাবার দিতেন। তাঁহার আদেশে পান সাজা রাখিয়া আমাকেও জলযোগ করিতে হইত। ''আহা তাড়াতাড়ি করে আসছি, আহা তোদের কত ক্ষিদে পেয়েছে।'' খাবার দিয়া তসর কাপড় ছাড়িয়া তিনি বাজারের হিসাব পত্র লইতেন ও তাড়াতাড়ি ''ঝোলের আনাজ'' লইয়া রান্না ঘরের উঠোনে যেখানে ঝি মাছ কুটিতেছে সেখানে গিয়া, ''ও ঝি ঝোলের মাছটি আগে ধুয়ে দাও তো মা,'' বলিয়া ঝিকে তাড়া দিতেন।

গয়লা বৌ-এর কাছে দুধ মাপিয়া লইয়া তাহার ঘরের কুশল সংবাদ লওয়া হইলে বলিতেন, বাচ্ছাকাচ্ছার দুধটুকু ভাল দিস্ মা—একটু, সকাল করে আসিস গো।'' দুধের কড়া চড়াইয়া দিয়া ''মাছের ঝোল নামালে গা?'' বলিতে না বলিতে স্কুল আফিসের যাত্রীরা ''দিদিমা, মা, ভাত,'' বলিয়া কেহ গামছা লইয়া চৌবাচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন কেহ বা পিঁড়িতে বসিয়া দিদিমার কাছে তেল চাহিয়া লইয়া তেল মাখিতেন ও গল্প করিতেন। দিদিমা ''এই যে ভাত হয়েছে'' ''বামন মেয়ে ভাত বাড় মা''—''এই নাও দাদা তেল''— বলিয়া তেলের বাটী দিতেন, পরে খোরায় খোরায় দুধ জুড়াইযা আহারেব স্থলে লইয়া রাখিতেন। বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া একতলার দালানে আহারের ঠাঁই হইয়াছে—একে একে সকলে আহার করিতে আসিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আজকের খবর কি দিদিমা?'' কেহবা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ভাঁড়ারেব কিছু আনাতে হবে কি?'' দিদিমা হাসিমাখা মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া স্কুল আপিসেব তাড়নার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তভাবে হাসি গল্পের সহিত ''বাবুদের'' স্নানাহার সমাধা হইলে দিদিমা সকলের হাতে হাতে পান দিলে সকলে বাহির বাড়ী চলিয়া গেলেন। তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া দিদিমা অবশিষ্ট দুধ জ্বাল দিতে লাগিলেন। কাহারও ঘন কাহারও বক্কা বাটী বাটী রাখা হইল। দুধ জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে নিরামিষ রান্নাব বক্‌নোটী চড়াইয়া তরকারী কুটিয়া চাল ধুইয়া নিরামিষের সমস্ত যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক একদিন আমি 'তরকারি কুটিব' বলিয়া ধরিয়া বসিলে 'আচ্ছা তুমি এই আলু পটলগুলি ছাডাও' বলিয়া বঁটী ছাড়িয়া দিতেন। ইতিমধ্যে বাহির বাড়ি হইতে ভৃত্যেরা বারম্বার আসিতেছে ও ''বড় বাবুব জামাটা ছেঁড়া আর একটা দিন,— মেজবাবু ও কাপড় পরবেন না— ধোয়া বার করে দিন, — ছোট বাবুর এ চাপকানের বোতাম নেই সেবে দিতে হবে,—পান কই,—জল দিয়ে যান;'' এই প্রকার কত কি বাহানা লইয়া দিদিমাকে ব্যস্ত করিতেছে। দিদিমার বিরক্তি নাই. ধীরভাবে সকল ফরমাস সম্পন্ন করিতেছেন। তখন তিনি রন্ধনে নিযুক্ত এজন্য বাক্স, পেঁটরা, ধোয়া কাপড় চোপড় কিছুই স্পর্শ করিবেন না, চাবি দিয়া আমাদের বাহির করিয়া দিতে আদেশ

দিতেন। আমরা তাঁহার উপদেশ মত কাপড় চোপড় বাহির করিয়া দিতাম। ভৃত্যদের সম্মুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেরা বাড়ির ভিতর প্রায় আসিত না, যখন আসিত সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর ভাশুরের সম্মুখে কখনো কখনো যাইয়া জল কি পান দিয়া আসিতে হইত; কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা পাঠাইতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর বাড়ীতে আনাগোনা করিত দোতালায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকালে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম—রান্না ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি সুতরাং আমাদের গণ্ডী রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। তার বাহিরে যাইতে হইলে দাসী হাঁকিত "সরে যাও বৌঠাকরুণ যাচ্ছেন।" সময়ের কি বিচিত্র গতি আজ—আমাদেরই বাড়ী একটিও দাসী নাই ভৃত্যেরাই সকল কার্য্য নির্বাহ করে। যা হোক্ বাবুরা স্কুল আপিস চলিয়া গেলে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

বাহির বাড়ীতে ভৃত্যেরা "রাম রাজত্ব" করিত। দাসীরা কাজ সারিয়া তেল মাখিতে বসিত। যেমন যেমন আহার হইয়া যাইত—অমনি বাসন ধুইয়া ফেলিতে হইত। "এঁটো চণ্ডী" দেবতাটী বড়ই "বিঘ্নকারিণী"। বাড়ীতে যে, বেলা ২টা পর্যন্ত "শকড়ি" পড়িয়া থাকিবে তার যো নাই—তা হলে "এঁটো দেবী" ত্বরিত গতিতে গিয়া স্কুল আপিসের যাত্রীদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে—সুতরাং বাসন কোসন পরিষ্কার না করিলে দাস দাসী কেহই অবসর পাইত না। বাড়ীর মধ্যে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও দাসীরা বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে বাহির বাটীতে যাইত। সে সময়টা তাহারা নানা হাস্যালাপে বাড়ীটা মুখরিত করিয়া তুলিত।

ওদিকে যেমন ভৃত্যদের সমুখে আমাদের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না দাসীরাও তেমনি বাবুদের সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিত না; এক হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কাজ করিত। বাবুদের সন্নিকটে জল কি পানটি পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার তাহাদের অধিকার ছিল না, তাই দিদিমার অনুপস্থিতিতে আমরা বৌয়েরা বাবুদের সম্মুখে যাইতাম। সেখানে কোন ভৃত্য উপস্থিত থাকিলে সে অমনি সরিয়া যাইত। ভৃত্যের সমুখে আবশ্যক হইলেও কোন বৌ ঘোমটা দিয়াও স্বামীকে জল বা পান কিছুই দিত না। তিনি যে কোন প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তখন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়েরা সবে মাত্র বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ৮টার সময়—হয়ত দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসার পূর্ব্বেই ডাল, আলু ভাতে, ডিমসিদ্ধ, মাছভাজা, মাখন, কাঁচা দুধ ও মিষ্ট দিয়া আহার সমাধা করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া সদর দরজায় গাড়ীর অপেক্ষায় বই সেলেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারা ঘরের কোন কাজ করিতে অবসর পায় না।

দশটা সাড়ে দশটা বাজিলেই দিদিমা রান্নাঘরে আমাদের ভাত দেওয়াইতেন। রান্নাঘরটা খুব বড় ছিল; একদিকে আমিষ রান্না ও আর এক দিকে নিরামিষ রান্না হইত। এ সকল হইয়াও যথেষ্ট স্থান ছিল আমরা সেখানেই প্রায় আহার করিতাম। "আশ হেঁসেলে" প্রায় এইরূপ রান্না হইত। মুগ, খাঁড়ীমসুর—হয় পেঁয়াজ দিয়া না হয় টক দিয়া ও কখনো হাঁসের ডিম সিদ্ধ বা ভাজা বা ডাল্না, লাউ কাঁকড়া বা লাউচিংড়ি, আলু পটল ভাজা, মাছভাজা,

মাছের অম্বল, কখনো কখনো চিংড়ী মাছ দিয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি, কুমড়ো চিংড়ী এই সব অদল বদল করিয়া হইত। অড়হর, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল দিদিমা রাধিয়া খানিকটা 'ওবেলার জন্য' রাখিতেন; বাবুদের গরম করিয়া দেওয়া হইত।

দিদিমার রান্না খাবার জন্য বাড়ী সকলে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই প্রত্যহই দিদিমা কিছু কিছু ব্যাঞ্জন স্বতন্ত্র পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন। দিদিমাকে অনেক রাঁধিতে হইত— বাড়ীতে বিধবা ৩/৪ জন ছিলেন—দিদিমাই সকলের রাঁধিতেন—তাঁহারা যোগাড দিতেও বড় একটা অবসর পাইতেন না। তাঁহাদের আহ্নিক পূজা সারিতে ১১/১২ টা বাজিত। তাঁহারা নিজেদের ঘরের কাজকর্ম্ম, পুত্র পৌত্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন। আর সকল সময় তাঁহারা সবাই কলিকাতার "বাসায়" থাকিতেনও না। দুজন বা দুমাস আছেন—আবার দেশে গেলেন—সেখানে বা দুমাস রহিলেন অন্যেরা আসিলেন এইরূপ চলিত। বধূরা কখনো কখনো দেশে বা পিত্রালয়ে যাইত— কেবল "বাবুরা" পূজার সময় বা স্ত্রী দেশে থাকিলে কোন এক শনিবারে দেশে যাইতেন। বাবুদেব মা ছয়মাস দেশে থাকিলেও কেহ দেশে যাইতেন না—কিন্তু স্ত্রীটি ছয় দিনের জন্য গেলেও বাবুর অমনি মাছ ধরা বা আম খাওয়ার সখ্ পড়িয়া যাইত। শুনিয়া দিদিমা মুচকি মুচকি হাসিতেন—পাছে কেহ লজ্জা বোধ করেন তাই নিজে উপযাচক হইয়া বাড়ীর ছেলেদের দেশে পাঠাইতেন। অনেক সময় বধূরা পিত্রালয়ে থাকিলেও যদি শ্বশুর শাশুড়ী জামাতাকে লইতে লোক না পাঠাইতেন—তবে দিদিমা গঙ্গা স্নানেব ফেরত হয় ত কুটুম বাড়ী গিযা ইঙ্গিতে জামাই লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া আসিতেন। বলিতেন, "আহা এই ওদের আমোদ প্রমোদের সময়—এর পর যখন সংসার ঘাড়ে পড়বে তখন কি আর ধূলো খেলার অবসব পাবে।" কিন্তু শ্বশুর বাড়ী শনিবার গিয়া সোমবার ভোরেই ফিরিতে হইত— অথবা কখনো কখনো রবিবার সকালেই আসিবার আদেশ দেওয়া হইত— বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে— রবিবার থাকিতে দেওয়া হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার সময় এ বিষয়ে কর্ত্তা বড় অধিক কড়াক্কড় করিতেন—কিন্তু দিদিমা অত ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন "আহা বৌ এর মুখখানি মধ্যে মধ্যে না দেখলে ওদের পড়া শুনায় উৎসাহ হবে কেন।" দিদিমা যে ব্যবস্থা করিতেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, সকল কার্য্য তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ লইয়াই নিষ্পন্ন হইত। এমন কি প্রত্যেকে প্রত্যহ আপিস স্কুল যাত্রাব সময় "দিদিমা আসি— পিসিমা আসি, জেঠাইমা আসি," ইত্যাদি বলিয়া তবে যাইতেন। দিদিমা হাতের কায রাখিয়া প্রত্যেকের সমুখে আসিয়া "এস দাদা, এস বাবা" বলিয়া শুভ কামনা করিতেন।

দিদিমা রাঁধিতেন—আমরা ভাত খাইতাম। বাড়ীর অনেক বধূ তাহার শাশুড়ীর সহিত কথা কহিত না—কিন্তু দিদিমার সহিত কথা কহিত। দিদিমা বলিতেন আমার সহিত কথা কহিতে আছে। যদি কোন বধূর কাজে বা কথায় কোন ত্রুটি হইত—দিদিমা একটু অল্প হাসিয়া বলিতেন "ছিঃ ও কথা বল্‌তে নাই—অথবা এমন কাজ আর কোর না।" দিদিমার এই টুকু কথায় আমরা যেরূপ শাসিত হইতাম—অন্য গৃহিনীদের সারাদিন বকুনির ঝড় বহিলেও সেরূপ হইত না— বরং বকুনির চোটে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতাম।

বেচারা দিদিমা এমন অবস্থায় বড় বিপদে পড়িতেন। গৃহিনীকে বলিতেন "আহা, ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি, আহা আর করবে না।" বধূকে বলিতেন, "কাঁদতে নেই—আমরা না শেখালে তোমরা শিখবে কেন দিদি।" আমরা বলিতাম "আপনি বারণ করিলেই ত আমরা শুনি—তবে উনি অত বকেছেন কেন।" দিদিমা বুঝাতেন, "আহা ওর শোক তাপের শরীর" কখনো বলিতেন "আহা ও একটু রাগী মানুষ—সকলের কি স্বভাব সমান হয়—তা বলে বৌমানুষকে কাঁদতে নেই সব সইতে হয়।" আমাদের ভাত খাওয়ার সময় দিদিমা নানা প্রকার গল্প করিতেন, যাহার যে ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যে বধূ যে নিরামিষ তরকারী ভালবাসে তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই তরকারীটি রাঁধিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। "দিদি বসে খাও—এই ঝালের ঝোল হল' বলে"। প্রত্যেককে দিদিমা সমভাবে যত্ন করিতেন প্রত্যেককেই মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে "বামন মেয়ে" লোকজনদের ভাত দিত— সে আমাদের স্বজাতি, তাই দিদিমার হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইত। কিন্তু সিদ্ধ চাল খাইত বলিয়া সে তাহার ভাত নিজে স্বতন্ত্র রাঁধিত। দিদিমা ও অন্য গৃহিনীরা আতপ চাল খাইতেন—অন্য গৃহিনীরা রাত্রে লুচি ও আলুনি ভাজা খাইতেন, কিন্তু দিদিমা দুগ্ধ ফল ও সন্দেশ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ খাইতেন না। যদি কোনদিন লুচি খাইতে সাধ হইত তবে দুপুর বেলা ভাতের সহিত খাইতেন। দিদিমার আহারাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় ২। ৩ টা বাজিয়া যাইত। ইতিমধ্যে আমরা পুতুল খেলিয়াছি – কেহ বা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি—এবং যে কেহ একজন নজর রাখিয়াছি দিদিমা কখন আহারে বসেন। দিদিমার আহারের সময় প্রায় আমি চেলির বা গরদের সাড়ী পরিয়া দুধটুকু জলটুকু দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। সে সময়ে আমিই বাড়ির সর্ব কনিষ্ঠ বধূ। সুতরাং পাকাচুল তোলার ভার আমার ছিল। আহারান্তে দিদিমা যখন দোতলার দালানে আঁচল পাতিয়া একটু "গড়াইতেন", তখন পাকাচুল তুলিতাম। দিদিমা বলিতেন; আহা নাতবৌয়ের হাত যে—মাথায় হাত দিলেই ঘুম পায়। বলিতে না বলিতেই দিদিমা নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিতেন। নাতবৌএর হাতের গুণে যে এত শীঘ্র নিদ্রা কর্ষণ হইত তা ঠিক নয়। রাত্রি ১১/১২ টার সময় দিদিমা শয্যাগ্রহণ করিতেন; আর ২/৩ টায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক ঘুমের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর শয্যায় থাকিতেন না। তপ জপে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং নিদ্রার দোষ কি! আদেশ ছিল যে নিদ্রাকর্ষণ হইলেই যেন আমি উঠিয়া যাই। দিদিমা বলিতেন—"আহা ওরা ছেলে মানুষ খেলা করবে, ওরা কি চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকতে পারে।" এক ঘণ্টার মধ্যে দিদিমার নিদ্রাভঙ্গ হইত; দিদিমা একবাটী দুধ গরম করিয়া নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। পরে চুল বাঁধিয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল হইয়া গেলে নিজে কাপড় ছাড়িয়া মালা হাতে করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে আমার রামায়ণ বা মহাভারতের কোন স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইতে হইত। কখনও বা কোন প্রতিবাসীর বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ী কথকতা হইতেছে সন্ধান পাইলে তাঁহার দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। যে সময় দিদিমা চুলবাঁধা প্রভৃতির ভার অপর কোন

গৃহিনীর উপর দিয়া মালা হাতে করিয়া তিনটার পূর্ব্বেই "কথা" শুনিতে যাইতেন। সন্ধ্যার সময় দিদিমা সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়া লুচি রুটি করিতেন। রাঁধুনী তরকারী রাঁধিত। গৃহিনীরা নিজেরা ময়দা মাখিতেন। লুচি ভাজা ও রুটি সেঁকার ভার দিদিমাই গ্রহণ করিতেন;—দাস দাসী ব্যতীত রাত্রে প্রায় কেহই ভাত খাইত না।

সকলকে আহারাদি করাইয়া প্রাতঃকালের জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কিছু কিছু তরকারী কুটিয়া রাখিয়া নিজে যৎ-কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার পর দিদিমা যখন বিছানায় যাইতেন প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিত। আবার ৩টা বাজিলেই প্রায় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া যোড়হাত করিয়া ধ্যান করিতেন। ভোর ৪টার সময় হাত মুখ ধুইয়া গো-সেবা করিতেন। ৫টার সময় ঘটী, নামাবলী, তসর কাপড় ও পুষ্প পাত্র হাতে করিয়া "ওমা বামন মেয়ে ও দিদি নাতবৌ ওঠো দিদি— বৌমা ওঠো মা বেলা হয়েছে—আমি তবে এখন আসি," বলিয়া গঙ্গা স্নান করিতে বাহির হইতেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত— শুনিতাম বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে—

হরি কোথা হে—তুমি কোথা হে
ও বিপদের কাণ্ডারি—তুমি কোথা হে— ?

দিদিমা আমার শাশুঠাকুরাণীর মাতাও নহেন শাশুড়ীও নহেন—শাশুঠাকুরাণীর মাসী ছিলেন। দিদিমা বাল-বিধবা চিরদিন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার অল্প কিছু জমা ছিল—তাহার আয় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্রত-নিয়ম প্রভৃতির খরচ পত্র চলিত—হাতখরচের জন্য কখনো দিদিমাকে কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইত না। এমন তীর্থ ছিল না যাহা দিদিমা উদ্যাপন করেন নাই। আজিও সকলে একবাক্যে বলেন যে দিদিমার পুর্ণর্জ্জন্ম কখনই হইবে না।

আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তিনি ইহলোকের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া পরলোকের দিকে চাহিয়া আছেন—কিন্তু তা বলিয়া তিনি নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী অনেক গুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়া কায়ক্লেশে যখন সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—কন্যা ও পুত্রদের বিবাহ দিয়াছেন—মনে করিতেছেন এইবার আমি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিব—এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ডাক পড়িল তিনি চলিয়া গেলেন। পুত্রেরা একমাত্র মাতাকেই পিতা মাতা উভয়ই জানিতেন—বধূরা নিতান্ত বালিকা—অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় নাবিক হীন তরীর মত সকলে অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছেন—শুনিয়া করুণাময়ী দিদিমা আসিয়া তাঁহাদিগকে স্নেহবক্ষে তুলিয়া লইলেন। আমাদের শাশুড়ী ছিলেন না কিন্তু জাঠশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন আদর করিতেন—কিন্তু তবুও অভিভাবক হইলেন দিদিমা;—তাঁহাকে নহিলে চলিত না—দিদিমাও আনন্দের সহিত আত্মদান করিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ে তিনিই গৃহিনী ছিলেন—এখানেও তিনি গৃহিনী। ঘরে গাড়ী ছিল কিন্তু দিদিমা কোন দিন গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। আমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী প্রভৃতি বিশেষ পর্ব্বে অন্য গৃহিনীরা গঙ্গাস্নানে বা কালীঘাটে গাড়ীতে যাইতেন—কিন্তু দিদিমার সেই নিয়মিত

ব্যবস্থা। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কালীদর্শন করিতেই প্রত্যুষে উঠিয়া পদব্রজে কালীঘাটে যাইয়া আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া কালীদর্শন, সন্ধ্যা বন্দনা সমাপন করিয়া বেলা ১১টায় গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। বলিতেন "বর্যা বা শীতের দিনে আমি অনায়াসে পায়ে হেঁটে কালীঘাট থেকে আসতে পারি—কিন্তু অনেক বেলা হয়ে যাবে—অনেক খাবার করা আছে—ওরা কখন করবে, আহা পেরে উঠবে না—তাই তাড়াতাড়ি করে আস্‌ছি।" অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিধবারা কেহইত ভাত খান না, কাযেই ঐদিন বিস্তর রুটী লুচী তৈয়ারি হইত।

গৃহিনীরা কালিঘাটে গঙ্গাস্নানে সর্ব্বদা যাইতেন—আর কাঠের পুতুল, পুঁথির মালা পিতলের খেলনা, কাঠের খেলনা—সংসারের কাযের উপযোগী হাতা বেড়ি খুন্তি বেলন নোড়া বোক্‌নো হাঁড়ী চাটু কড়াই কত কি কিনিয়া আনিতেন— দেখিয়া দেখিয়া আমাদের কালীঘাট ও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইত—কিন্তু কিছুতেই বাবুদের মত হইত না। বাবুরা তখন সবে এম্ এ, বি এ পাশ করিয়াছেন। আমাদের বাহির হইবার হুকুম ছিল না। আবার সাবেক নিয়মে তখন কাশীপুর বরানগর যাইতেও পাল্কিতে অথবা নৌকায় যাইতে হইত— গাড়ী চড়িতে পাইতাম না। ভাড়াটে গাড়ী ত নয়ই—নিতান্ত কোনদিন পাল্কি-বিভ্রাট ঘটিলে ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া যাওয়া চলিত। এইরূপ পাল্কি-বিভ্রাট একদিন আমার অদৃষ্টে ঘটায় দিদিমা আমার উপর বিরক্ত হইয়া ছিলেন।

আমার পিতামহাশয় বিদেশে কায করিতেন—মাতাও পিতার নিকট বিদেশে, সুতরাং আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না। জ্যেঠা খুড়া যদি লইয়া যাইতেন—একবেলার জন্য পাঠান হইত। একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিদিমা বলিলেন—"নাতবৌ তোমাকে এতদিন বলি নাই দিদি,—আহা ছেলে মানুষ ভাবনা চিন্তা করবে—তোমার জাঠতুত ভাইটির বড় অসুখ—আহা বাঁচবার কিছু ছিল না—অনেক চিকিৎসায় হবির কৃপায় প্রাণ পেয়েছে তুমি একদিন যাও তাকে দেখে এস। আমি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফেরত তাকে দেখে আসি—এখন প্রাণের আশা হয়েছে তাই তোমায় বল্‌ছি। তাঁদের এখন তোমায় নিয়ে যাবার সময় নয়—তুমি আপনি যাও।

আমি তখন নিতান্ত বালিকা এগার বৎসর মাত্র বয়স—দিদিমা আমাকে তাই জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের ননদদিগকে কেহ আনিতে না গেলেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিজেরাই আমাদের এখানে অর্থাৎ পিত্রালয়ে আসিতেন। আমি ভাবিতাম আমি কবে অমনি ইচ্ছা করিলেই পিত্রালয়ে যাইতে পাইব। তাই আজ দিদিমা যেই বলিলেন "তুমি আপনি যাও"-- আমি ভাবিলাম আমি তবে একজন। ২/৪ দিন পরে দিদিমা একদিন বলিলেন যে "আজ তুমি ভাত খেয়ে যাও—অসুখের বাড়ী না খেয়ে গিয়ে ব্যস্ত কোরে কাজ নাই।" আর কোথায় আনন্দ রাখি—অসুখ দেখতে যাওয়ার ত ভারি ভয় ভাবনা—অকস্মাৎ যে গিয়ে পড়ে সকলকে বিস্মিত করে দিব এই আনন্দ! সমবয়স্কা এক ভাশুরঝি ও একটি ছোট ভাগিনেয়ী ধরিল আমরাও যাইব। সে ত আরও ভাল। নিজেরাই ঠিকঠাক হইলাম—দিদিমার অনুমতি নেওয়াও নেই কিছুই না। দিদিমা

বলিয়া দিয়াছিলেন পাল্কি ডাকাইয়া লইয়ো। পিত্রালয় হইতে লইতে আসিলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যদি কেহ আসিয়া বলিয়া যাইত "কাল দিন ভাল আছে অমুককে পাঠাইয়া দিতে হবে"—তবে অনেক সময় দিদিমা বলিতেন " তোমাদের আর কাকেও আসতে হবে না—আমি এখান থেকেই পাঠাইয়া দিব।" আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে "এত দিন রাখিয়ো।" তাই যে বধূ যখন যাইত, প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইত, যাবার সময় সকলকে প্রণামাদি করিয়া বিদায় লইয়া যাইত। আজ আমি যখন প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইতে পাঠাইলাম—তখন গৃহিনীরা সকলে আহারে বসিয়াছেন—আমি আনন্দে এমনি বিহ্বল যে তাঁহাদের আহার শেষ হওয়ার বিলম্ব সহে না;—সহিবেই বা কি করিয়া—২টা বাজে—কখন যাইব;—সন্ধ্যায় ফিরিতে হবে—কতটুকু সময় আর আছে? কাজেই খুব তাড়া দিয়া ঝিকে পাঠাইয়াছি। এখন ঝি মহাশয়া বাহিরে চাকরদের কিছু না বলিয়া নিজেই গজেন্দ্রগমনে গিয়া এক ভাডাটে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাত্রীদল প্রস্তুত একজন পিত্রালয়ের ঝি—একজন শ্বশুরালয়ের;—তারপর আমি ও ভাগিনেয়ী ও ভাশুরঝি চলিয়াছি;—রান্নঘরের দরজায় গিয়া "দিদিমা আমরা যাচ্ছি" বলিতেই দিদিমা উন্মুখ হইয়া বলিলেন "পাল্কি এসেছে?" আমি "পাল্কি নয় গাড়ী" বলিতে বলিতে অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়াইয়াছি;—দিদিমা আর কি করিবেন "ও মা ও ঝি সাবধানে নে যাস্ আর রাত করিসনে; বেলাবেলি এস মা"—এইরূপ বলিতে লাগিলেন—আমরা শুনিতে শুনিতে গেলাম। গাড়ীতে উঠিয়া বলিলাম "কই চাকর নিলিনে"—ঝিয়েরা বলিল আমরা দুজন আছি আর চাকর কেন। আমি বলিলাম "গাড়ী আনলি কেন?" ঝি বলিল "আড়ায় পাল্কী ছিল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই গাড়ী আনলুম— দেখ দেখি কেমন মজা— বেশ সবাই গাড়ীতে যাচ্ছি—পাল্কি হলে তোমরা ত সুখে যেতে আমাদের ভাত খেয়ে ছুটতে ছুটতে প্রাণ যেত।" তারপর বেশ সুখেই কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল! কোথায় বা বেলাবেলি আসা—যার নাম রাত নটা। সকলেই প্রফুল্ল মনে—আবার এক ভাড়া গাড়ী চলিয়া আসিয়া হাজির। ঝম্ ঝম্ মলের শব্দে হিহি রবে বাড়ী জাগাইয়া আমরা আসিলাম—আমি বধূ—দিদিমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দিদিমা তখন নাতিদের পরিবেশন করিতেছেন—রাত্রে দোতালার একটা ঘরে খাওয়া হইত— ঘর হইতে দিদিমা বাহিরে আসিলে প্রণাম করিলাম—তখন দিদিমাকে স্পর্শ করিব না—গাড়ীর কাপড়— পদধূলি লইলাম না। দিদিমা কিছু বলিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখি দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ঘর হইতে কর্ত্তা বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে গাড়ী চড়ে যাওয়া হয়েছিল।" কোথায় গেল সে আনন্দস্রোত— বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—ওদিকে অন্য গৃহিণীরা ঝিয়েদের উপর ঝঙ্কার দিতেছেন—গাড়ী চড়ে নিমন্ত্রণ খেতে গেছলি—কায কর্ম্ম সব পড়ে আছে—রঙ্গকরে সব এলেন!"

কর্ত্তা যাই বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে যাওয়া হয়েছিল," অমনি দিদিমা তটস্থ হইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি ও কথা পরে হবে"—দিদিমার সেই বিরক্তির ভাব দূরে গেল, মুখচ্ছবি করুণায় ভরিয়া উঠিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন "কনে বৌ না বলা না কওয়া গাড়ী ডাকিয়ে বেড়াতে যায় এ কি রকম।" দিদিমা চুপ করিয়া

রহিলেন—তখন কর্ত্তাতে ও অন্য গৃহিণীগণে ঝিয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঝি বলিল—"আড়াতে পাল্কি ছিল না—তাই গাড়ী এনেছি।" কর্ত্তা বলিলেন "তবে রাত্রে কেন গাড়ীতে আসা হল?" আর উত্তর নাই, "দরওয়ান বা চাকর নেওয়া হয়নি কেন?" উত্তর নাই—"এত রাত কেন" উত্তর নাই। "অসুখের বাড়ী তা ত বৌমা জানেন তিনি মেয়েদের কেন নিয়ে গেলেন, কার হুকুমে নিয়ে গেলেন—কাকে বলে নিয়ে গিয়েছেন। উনি যাচ্ছেন ওঁর বাপের বাড়ী এ বাড়ীর মেয়েরা কেন গেল।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় গিয়া শুইলাম—খাওয়ার দরকার ছিল না; পিত্রালয় হইতে খাইয়া আসিয়াছিলাম—নচেৎ সে রাত্রে আর খাওয়া হইত না। এই একটি দিন মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য দিদিমার মুখে আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ছিলাম।

দিদিমা সদাপ্রসন্ন, বর্ণ গৌর, পরিপাটি গঠন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথার চুলছাঁটা। আঁধা কাঁচা পাকা ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে দিদিমাকে অনেকটা পুরুষ মানুষের মত দেখাইত। অত্যন্ত বিরক্ত হইলে দিদিমা টেপা ঠোঁট আরও দৃঢ়ভাবে টিপিয়া থাকিতেন—পাছে কোন কঠিন কথা বাহির হইয়া পড়ে তাই যেন অত্যন্ত সাবধান হইতেন।

একদিন রাঁধুনির অসুখ। বাড়ীতে পরিবার সে সময় বেশি ছিল না।—আমিষ রান্না দিদিমাকে রাঁধিতে হইবে। দিদিমা সকল কার্য্য করিতেন—কিন্তু আমিষ রান্না রাঁধিতেন না—রাঁধুনির অসুখ হইলে বধূদের মধ্যে কেহ একজন মাছের ঝোল ভাত রাঁধিত। সেদিন আমি ছাড়া আর কোন বধূ ঘরে ছিল না—আমি ছেলে মানুষ দিদিমাই রাঁধিবেন। দিদিমা গঙ্গাস্নানের গিয়াছেন—ঠিক ফিরিয়া আসার সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রান্না ঘরে উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে। দাসীরা চাল ধুইয়া বাঁটনা বাটিয়া মাছ কুটিয়া থরে থরে সমস্ত গুছাইয়া ঘর বার করিতেছে কতক্ষণে দিদিমা আসেন—বড় বাবুর আবার সেদিন তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হবে।

আমার পান সাজা হইয়া গেল—তথাপি দিদিমা আসিলেন না দেখিয়া বুড়ো ঝি আসিয়া বলিল "বৌমা রান্না ঘরে চল আমি দেখিয়ে দেব এখন, তুমি ভাতের হাঁড়ীটা বসিয়ে ভাতটা চড়িয়ে দাও, ভাত হতে হতে মাঠাকরণ এসে পড়বেন।" আমি ভাতের হাড়ী নামাইতে গিয়া প্রথমেই একখানা সরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম্—ঝি বলিল—"তা যাক্ যে, তুমি হাঁড়ীটা বসিয়ে দাও, বড় বাবুর আজ বড় তাড়া।" ঝি অন্য কাযে গেল, আমি ভাতের হাঁড়ী চড়াইয়া হাঁড়ী পূরিয়া জল দিয়া সরা চাপা দিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। একটা বিড়ালের সাদা ধবধবে মোটা সোটা একটা বাচ্ছা হইয়াছিল— সেটাকে লইয়া খেলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল যে হাঁড়ীতে ত চাল দেওয়া হয় নাই অত-এব এইবার যাওয়া যাক্। পুরুষেরা অন্দর মহলে কেহ নাই, গৃহিনীরা দেশে গিয়াছেন একা দিদিমা আছেন—তাঁর অত আঁটা আঁটি ছিল না—আমি ঝমঝম দুড় দুড় করিতে করিতে বেরালছানা নাচাইতে নাচাইতে বলিতে বলিতে চলিয়াছি—"চল" তোমাকে ভাতে দিই গে যাই, চল তোমাকে ভাতে দিইগে যাই।" সিঁড়ি হইতে দালানে পড়িতেই দেখি ভাশুর মহাশয় ও দিদিমা। অমনি লজ্জাশীলা বধূ একহাত ঘোমটা টানিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিলাম। দিদিমা হাসিয়া বলিলেন "মরি মরি কি লজ্জা দেখ।" ভাশুর মহাশয় বলিলেন "দিদিমা

আজ নাকি বৌমা রাঁধ্‌ছেন" দিদিমা বলিলেন "হাঁ ঐ যে বেরালছানা ভাতে দিতে আসছে।" ভাশুর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "বুড়ো ঝি বল্লে—আমার তাড়াতাড়ি তাই সে বৌমাকে দিয়ে ভাত চড়িয়েছে। আমি ভাবিলাম— ছেলে মানুষ কি করেছে দেখে আসি।" দিদিমা বলিলেন—"তা হলেই আজ ভাত খেয়েছিলে আর কি, এক হাঁড়ী জল চড়িয়ে সরা ঢাকা দিয়ে উপরে বসে আছে। আমি এসে শুনি ভাত চড়ান হয়েছে, তা বলি, বেশ হয়েছে আর সব গুছিয়ে গাছিয়ে আমি—নাত বৌকে খাবার দিয়ে আসি-— তা ঝি বল্লে মা ভাত হয় ত হয়ে এসেছে দেখুন দেখি—ওমা সরা খুলে দেখি টগবগ করে জল ফুটছে যেখানকার চাল সেইখানে মজুত আছে। তখন হাঁড়ীর জল কতকটা ফেলে চাল দিই— দিয়ে এই উপরে যাচ্ছি। আহা কত খানি বেলা হয়েছে খাবার পায়নি—কত ক্ষিদে পেয়েছে। তা যাও দাদা স্নান করে এস' বেরাল ভাতে ভাত কখনো খাওনি—আজ ভাদ্র বৌ খাওয়াবে।" আমি ত রান্নাঘর থেকে সব শুনিতেছি—ভাশুর মহাশয় বাহিরে গেলে দিদিমাকে বলিলাম "জল না গরম হলে কি করে চাল দিব তাই জল গরম করতে দিয়ে গিয়েছিলাম।" দিদিমা মুচকি হাসিয়া বলিলেন "এক হাঁড়ী জল দিয়েছ চাল ধরত কোথায়— আজ যে পুড়ে খুন হও নাই এই রক্ষে।" তারপর আমাকে খাবার দিয়া অবসর মত আস্তে আস্তে বলিলেন "শ্বশুর ভাশুরের কারো সামনে পড়লে ঘোমটা দিয়ে ঘাড়টী হেঁট করে আস্তে আস্তে চলে যেতে হয়—যেন মলের শব্দটি না হয়—অমন করে ছুটে যেতে নেই। তোমার শ্বশুর বাড়ীর বড় আঁটাআঁটি— তোমার দাদাশ্বশুর গোষ্ঠীপতি ছিলেন—শ্বশুর শ্বাশুড়ী ত চিন্‌লে না দিদি কত বড় ঘরের বৌ তুমি কিছুই জান না! সেদিন যে বকুনি খেলে তা ঐ ভাড়াটে গাড়ী চড়েছিলে বলে। এ বাড়ীর বৌরা কখনো গাড়ী চড়ে নাই, তোমার শ্বশুর এমনি রাসভারী ছিল—আর এমন নিয়ম ছিল যে ৫ বছরের মেয়েটি পর্য্যন্ত বাহির বাড়ীতে যেতে পেত না।—এখন এই দেখ ১০/১১ বছরের মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে। তবু তোমরা বৌ মানুষ তোমাদের সাবধান করে দিই। আর খেলা ধূলা যা করবে ঘরে কোরো—ছাতে উঠোনা জানালা খুলে রেখ না—পাড়া প্রতিবাসী না দেখ্‌তে পায়।" দিদিমা কখনো ভর্ৎসনা করিতেন না। মিষ্ট ভাষায় হাসি মুখে এমন করিয়া বলিতেন যে কষ্ট হইত না, কিন্তু শিক্ষা হইত। দিদিমার দুই চারি দিনের কথা তাই আমার বিশেষ করিয়া মনে আছে। আর একদিন দেশ হইতে ধোপা আসিয়াছে যখন, তখন হেঁসেল উঠিয়াছে, রাঁধুনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—দিদিমা সবে একটু ঘুমাইয়াছেন—বুড়ো ঝি বলিল "বৌমা হাঁড়িতে ভাত তরকারি সব আছে এস ধোপাকে চারটি বেড়ে দিবে"—কাজ করিতে বলিলে আমার মহা উৎসাহ—অমনি চলিলাম—গিয়াই যেমন সরাখানা ধরিয়া টানা—অমনি খানিকটা ঝোল গায়ে ফেলা। বেশ মনে আছে সেদিন একখানি নূতন ধোয়া লাল ভোমরাপেড়ে শাদা খড়কে ডুরে পরিয়াছিলাম তাই গায়ে কাপড়ে ঝোলের প্রবাহ বহিয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম—আধ ঘণ্টা মাত্র পরিয়াই কাপড়খানা ধোপাকে ধুইতে দিতে হইবে কম দুঃখ। ধোপাকে ত ভাত দিলাম—এমন সময় দিদিমা আসিয়া আমার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্। মুচকি হাসিয়া বুড়ো ঝিকে বলিলেন—"আমার ডাক্‌তে হয় মা—ওকি কিছু পারে, দেখ দেখি এই গা ধুয়ে এসেছে আবার গা ধুতে চল্লো—অসুখ না হলে হয়।"

বুড়ো ঝি বলিলো, "তা মা বৌঝি এসব না করলে কি হয়।" দিদিমা বলিলেন "বয়স হইলেই সব শিখ্‌বে, নাতবৌ আমার আদরের মেয়ে কিনা তাই একটু চঞ্চল---জল গড়াতে গেলে ঘর ময় জল ঢালে, বেগুন কুটতে হাতে ফালা দেয়,— ও সব সেরে যাবে---বয়স হলেই ঘরকন্না ঘাড়ে পড়লেই সব শুধরে যাবে। নাতবৌ এর সকল কাজে মন আছে, সময়ে সব শিখ্‌বে।" আমার মনে আছে এই দিন হইতে আমি শিখিলাম যে আমি সকল কার্য্যে অপারক কেন,— কেন আমাকে কোন কাজ দিয়া দিদিমা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না—আমি ভারী চঞ্চল; —আমি সাবধান হইতে শিক্ষালাভ করিলাম। আমি যেরূপ অভিমানী ছিলাম তাহাতে দিদিমা যদি এই ভাবে আমাকে শিক্ষা না দিয়া তিরস্কার করিতেন; তা হইলে উল্টাফল হইত। আমি বোধ হয় তিরস্কৃত হইয়া প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করিতাম—নিজের দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম না।

তখন দিবসে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বড় লজ্জার বিষয় ছিল। দিদিমা কিন্তু আমাদের এই নিলজ্জতায় বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। ছুটীর দিনে "নাতিরা" ঘরে থাকিলে, নানা অছিলায় নাতবৌদের ঘরে পাঠাইতেন। "যাও জল দিয়ে এস"— 'পান দিয়ে এস', 'ঘর গুছিয়ে এস'।" প্রথম প্রথম আমি এক হাত ঘোমটা দিয়া ঘরে 'প্রবেশ ও প্রস্থান' করিতাম—ক্রমে ক্রমে বেশ অভ্যাস হইয়া গেল—পান জল দিতে গিয়া ঘণ্টা খানেক কাটিত ঘর গুছাইতে সারা দুপুর লাগিত। পরে জানিতে পারিয়া ছিলাম অন্য গৃহিনীরা এজন্য দিদিমাকে তিরস্কার করিতেন—আমার সহজ বালিকাভাব দেখে ত তাঁরা "অবাক" হইতেনই। কেননা তাঁহাদের নিকট উহাই "বেহায়াপনা"। দিদিমা বলিতেন "আহা ওরা দুটীতে হাসে খেলে আমি দেখে বড় তৃপ্ত হই।" অনেক সময় দিদিমা নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেন ও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেন—আমি অমনি এক হাত ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। দিদিমা ও নাতিতে হাসিতেন ও বলিতেন "ওঃ! কি লজ্জাঃ" অনেক সময় দরজা খোলা আছে—আমার মাথায় কাপড়ও নাই স্বামীঘরে আছেন—দিদিমা দুধের বাটী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলেই ইঙ্গিতে ডাকিবেন;—স্বামী দিদিমাকে দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন,—আমি বক্তৃতা করিয়াই যাইতেছি, অকস্মাৎ দিদিমার দিকে দৃষ্টি পড়িল—সর্ব্বনাশ একি! দিদিমার মুখে হাসি, মাথা নাড়িয়া ডাকিলেন। একদিন---বলিলাম "দিদিমা এ রকম করলে হবে না—আপনি কেন সাড়া দিয়ে আসেন না।" দিদিমা বলিলেন "তোমরা হাস কথা কও আমি যে বড় দেখ্‌তে ভালবাসি। আহা ছোট নাতি, আমার বোনঝির কোলের ছেলে;—মা-হারা হয়ে পর্য্যন্ত বাছা আমার হাসেনি, কথা কয়নি। তোমার সঙ্গে হাসে কথা কয় দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।" কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন হইল যে আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই বাড়ীর কেহ না কেহ "আড়ি পাতিতেন"—এবং আমার ছেলেমানষী সরলতার শতধারে আলোচনা করিতেন। একদিন গম্ভীর মুখে দিদিমা বলিলেন, "নাতবৌ যখন ঘরে যাবে দরজা বন্ধ করে দিও"—বলিয়া আমার ঘরের সমস্ত জানালা দরজার ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দিন দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়াছিলাম। বিরক্ত হইলে দিদিমার মুখের প্রসন্ন ভাবটুকু চলিয়া যাইত। তাহা ব্যতীত কথায় বা ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। দিদিমা কখনো কাহারও

ঘরে ''আড়ি পাতিতেন'' না। নিঃশব্দে আমার ঘরে যে আসিতেন—কেবল এক নজরে দেখিতেন আমরা আনন্দে আছি কিনা। অন্য কেহ আড়ি পাতিলে তাঁহার ভাল লাগিত না।

এখন আমি বেশ বুঝিতে পারি যে যদিও দিদিমা সকলকেই সমভাবে দেখিতেন—তবুও যে কারণেই হোক্ আমার প্রতি যেন ঈষৎ পক্ষপাতী ছিলেন। আমি ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয় আমাকে বেশি আদর দিতেন।

আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম—এজন্য সাধারণ ভাবে প্রতিপালিত হই নাই। অনেক বয়স পর্য্যন্ত প্রচুর দুধের বরাদ্দ ছিল। ''শ্বশুর বাড়ী যাইয়া মেয়ে আমার দুধ পাবে না;''— মাতা ঠাকুরাণী এই চিন্তায় কাতর হইয়াছেন শুনিয়া দিদিমা বলিয়া পাঠাইলেন; ''মাকে বলো যে, সে ভাবনা যেন না করেন।''

দিদিমা নিঃশব্দে নিয়মিত সময়ে ঠিক আমার মাতার মত দুধের বাটীটা আনিয়া আমার মুখে ধরিতেন। এবং সমস্ত নিঃশেষ করাইয়া তবে ছাড়িতেন। তিনি বুঝিয়া লইয়া ছিলেন, তা না হইলে বিরালবাচ্ছা অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। জলপানি পয়সা আমার হাতে প্রচুর থাকিত, কোন ফেরিওয়ালা হাঁকিলেই সমবয়স্কা ভাশুরঝি ভাগ্নীরা তাহাকে ডাকিত; আমি পয়সা দিতাম। বাড়ীর মহিলারা বিশেষ প্রাচীনারা নিন্দা করিতেন—দিদিমা বলিতেন ''আমার নাত বৌ যে ''দো-চোখের'' ব্রত করিয়াছে, তাই যা দেখে তাই কেনে;'' বলিয়া একটু হাসিতেন। এই সকল সরল বালিকা সুলভ ব্যবহারে দিদিমা কখনই বাধা দিতেন না।

মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনাকে দিদিমা অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সদাসর্ব্বদা সকলের নিকট বলিতেন ''নাতবৌ আমার মিথ্যা কথা কাকে বলে তা জানে না,—নাতবৌ-এর আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই।'' পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতা মাতা বিদেশে থাকিতেন এবং আমি একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমি একা একা মানুষ হইয়াছিলাম—সংসারের কোন সংবাদ রাখিতাম না। নিজের পুতুল, ঘুড়ি, ফুলপাতা লইয়া একা একা খেলা করিতাম। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এগার বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া বৎসরেক কাল ভাল রহিলাম—এই নিতান্ত বালিকা বয়সে যদি দিদিমার যত্ন না পাইতাম—অন্য অন্য বালিকা বধূদের মত শ্বশুরবাড়ীর কঠোরতার মধ্যে পড়িতে হইত,—তবে আমার জীবন বোধ হয় আর এক ধারায় প্রবাহিত হইত। সত্যপ্রিয়তা সরলতা চঞ্চলতা মুখরতা আমার স্বভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িত। দিদিমা গুণের প্রশ্রয় ও দোষের সংশোধন করিতেন। কিন্তু কখনই তিরস্কার করিতেন না। তাই দিদিমার কথায় বিশেষ ফল হইত।

এগার বৎসরের বালিকার পক্ষে একাদিক্রমে বৎসরেক কাল শ্বশুরালয়ে কালযাপন করা কতখানি কষ্টকর তাহা বোধ হয় প্রত্যেক মহিলাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে বাস ছিল বলিয়া বেড়াইবার খুব সুবিধা ছিল। প্রতিদিন সকাল বিকাল মাঠে ও বাগানে বেড়াইতাম, মিউজিয়াম চিড়িয়াখানা সার্কাস দেখা সদা সর্ব্বদাই ঘটিত। বিবাহের পর একেবারে সে সব বন্ধ। দশ বৎসরের বালিকাকে একেবারে অবগুণ্ঠিতা বধূ হইতে হইল। এই পরিবর্ত্তনে পিত্রালয়েরই বিষম কষ্ট হইত— তারপর সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে বাস। একদিন বিকাল বেলা অকস্মাৎ তিন চারজন দাসী সন্দেশ

ফুলকপি বাঁধাকপি কমলালেবু বাদাম পেস্তা আঙ্গুর প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—আমার মা আসিয়াছেন,—কাল প্রাতে পাল্কি আসিবে আমি পিত্রালয়ে যাইব;—সে কি আনন্দ! ঝিয়েদের ধরিয়া বসিলাম যে,— কেন এখনি নিয়ে যাবিনে— কেন কালকের কথা বল্লি;—মায়ের উপর খুব রাগ করিলাম,—কাঁদিয়া দিদিমাকে বলিলাম আমাকে এখনি পাঠাইয়া দিন। দিদিমা বুকে টানিয়া লইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—আহা যাবে বইকি—আজ অবেলাদিন ভাল নয়—পুরুষেরা কেউ বাড়ী নেই একবার তাদের বলি;—কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব—কেঁদো না দিদি চুপ কর। একটা রাত বইত— নয়—আর কি এই ত চল্লে—আবার কতদিনে আসিবে।" আমি শান্ত হইলে মুচকি হাসিয়া বলিলেন' "আমার নাতিকে যে ফেলে যাবে— তোমার মন কেমন করবে না?" আমি হাসিতে লাগিলাম—ভাবটি এই যে,—এ কথার কোনই মূল্য নাই। পরদিন তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে চাহি—দিদিমার নাতি তাহাতে বাধা দিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় দেখিলাম তাঁহার চোখে জল পড়িতেছে—মনে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

পাল্কি আসিয়াছে, আমি "জল খাবার" খাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছি—দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিলেই পাল্কিতে উঠিব। নিয়মিত যে সময়ে তিনি আসেন তাহার অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—আমার আর বিলম্ব সহে না—বলিতে লাগিলাম "দিদিমা ত এখনও আসিলেন না—আমি তবে যাই। একটা ভাগিনেয়ী যাইয়া বাহির বাটিতে প্রচার করিল—ছোট মামিমা এখনি চলে যেতে চাচ্ছে—ঝি-মা (দিদিমা) এখন কত বেলায় আসবেন কে জানে। শুনিয়া ভাশুর মশায় বাড়ীর মধ্যে আসিয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"ছোট বৌমা কি বলছেন—দিদিমা না এলে যাওয়া হবে না—এ বেলা পাল্কি ফিরিয়া যাক্।" সর্ব্বনাশ, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।— সেই মুহূর্ত্তে মূর্ত্তিময়ী করুণা স্বরূপ দিদিমা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "আমি তাড়াতাড়ি করে আসছি, বেলা হয়ে গেলে নাত-বৌ আমার ব্যস্ত হয়ে পড়বে— তোরা ওকে আজ কি বলে বক্‌লি—আহা কতদিন মাকে দেখেনি—ব্যস্ত হবে না—আহা কাঁদছে। দেখ দেখি আজ কিনা কাঁদালি।" ভাশুর মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "কেন বৌমা কাঁদছেন কেন—আমি বেশিত কিছু বলি নাই"—বলিতে বলিতে তিনি সরিয়া পড়িলেন। দিদিমা আমাকে শান্ত করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া দিতে দিতে—বলিলেন "আমার নাতি একলা রইল—শীঘ্র করে এস,—এই তোমার ঘর বাড়ী। জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে জন্ম জন্ম এই ঘর কর।" দিদিমার চোখে জল পড়িতেছিল।

হর্ষবিষাদ পূর্ণ হৃদয়ে চোখে জল ঠোঁটে হাসি লইয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই মা বলিলেন "তুই কেঁদেছিস্ তোর বুঝি আসতে ইচ্ছা ছিল না।" অবরুদ্ধ স্রোত যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হয়—আমি মায়ের কোলে বসিয়া তেমনি করিয়া খুব কাঁদিলাম, মা কেবল বলিতেছেন—"আরে একি কাঁদিস কেন?" বলতে পারি না কেন কাঁদিতেছি বা কাহার জন্য কাঁদিতেছি—অশ্রুস্রোত কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছি না যে।

'ভাবতী'—১৩১৬

অসমাপ্ত কাব্য

অমলা দাসগুপ্তা

অরবিন্দনাথ যখন প্রথম জ্যোতিপ্রকাশ মিত্রের নিকট মাসিক পাওনা টাকা বেতনে কর্ম্ম সহচরের পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন কে জানিত যে এক দিন সেই আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সৌম্যের সম্বন্ধ জন্মিবে। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন চল্লিশের ঘর অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে প্রতিষ্ঠিত তখন অরবিন্দ পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবক। তাঁহাদিগের এই অসমবয়সের বন্ধুত্ব একটু অস্বাভাবিক বলিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্রূপ করিত, তার পর পাঁচ ছয়বৎসর একত্র বসবাস করিয়া একদিন যখন অরবিন্দ সহসা বন্ধুর আশ্রয় ত্যাগ করিল, তখন পরোক্ষে অনেকে অনেক কথা কহিল কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশ বাবু জানিতেন, তাঁহাদিগের ভাবের অভাবে সে বিঘ্ন ঘটে নাই।

জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র প্রভূত ধনশালী পিতার একমাত্র সন্তান, পিতা বর্তমানেই এল, এ পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ শেষ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জননীকে লইয়া তিনি কলিকাতার অনতিদূরে পদ্মাতীরস্থ বাগান বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। পিতৃত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর বহু সম্পত্তি পাইয়াও তাঁহার চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ জ্যোতিপ্রকাশের অন্তরে অসাধারণ জ্ঞানের পিপাসা এবং উচ্চ আদর্শ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সাহিত্য চর্চ্চায় কাটাইতেন।

শোনা যায় বাল্যকাল হইতেই জ্যোতিপ্রকাশের একটু ভাবাধিক্য ছিল। যৌবনারম্ভ হইতে অনেকের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইয়া, বহুবার ভগ্ন হৃদয়ের দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে যখন তিনি বুঝিলেন যে ভাবের আধিক্য কিছু নয় তখন অধিক বয়সে জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রেম ছাড়াই দ্বাদশবর্ষীয় রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, এবং দেখিলেন হৃদয় জিনিষটা এতই প্রকাণ্ড যে বহুবার ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীর জন্যও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। তার পর জননীর মৃত্যুর পর এক সময় দেখিলেন ষোড়শবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"বৎ তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতিপ্রকাশের কি ইংরাজি কি বাংলা সব কাব্য ইতিহাস ও নাটকে সমান রুচি ও অধিকার ছিল। এক সময় তাঁহার এক খেয়াল চাপিল—মনে মনে ভাবিলেন এদেশের রঙ্গমঞ্চে যে সকল কুরুচিপূর্ণ হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় হয়, সেগুলির একেবারে লোপ হওয়া আবশ্যক, তৎপরিবর্ত্তে ভাল ভাল দিয়ে কাব্য নাটকাদি লিখিলে ওই সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাইতে পারিলে দেশের একটা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন শুনিলেন অরবিন্দ ভাল ভাল মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন এবং সাহিত্য জগতে তাঁহার খ্যাতিও আছে তখন মনে করিলেন ঠিক এই লোকটিকেই যেন এতদিন ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেইদিন হইতে অরবিন্দ কে সঙ্গী করিয়া লইলেন, বয়সের

পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ—বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল তাহাকে মোহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর বাগান বাড়িটী দ্বিতল, উপরে গৃহিণী রাজলক্ষ্মীব মহল, নীচে বাবুর বৈঠকখানা। পশ্চাতে নির্ম্মল ও স্বচ্ছসলিল পূর্ণ দীর্ঘ সরোবর, পর পারে আমবাগানের ভিতর অববিন্দনাথেব জন্য একখানি সুন্দর বাঙ্গলো প্রস্তুত হইয়াছে, সেইখানে জ্যোতিপ্রকাশ সন্ধ্যার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অরবিন্দনাথের সংসর্গে সাহিত্য চর্চ্চায় কাটাইয়া থাকেন। এপারে বাঁধানো ঘাটের উপর রাজলক্ষ্মীর শয়নকক্ষসংলগ্ন খোলা ছাদ, সন্ধ্যার পব তিনি প্রত্যহ সেই খোলা ছাদেই ঘুরিয়া বেড়ান।

প্রায় আট বৎসর যাবৎ রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছে, সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং স্বামীই তাহাব সংসারে একমাত্র বন্ধন, নিঃসন্তান বমণীর যত আশা ভরসা একমাত্র স্বামীতেই নিহিত ছিল। অরবিন্দ তাঁহাদিগেব পরিবারভুক্ত হইবার পর এক সময রাজলক্ষ্মীর মনে হইল স্বামীর সে মন আর নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাবণে অকারণে বাব বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আর আসেন না, নিঃসঙ্গ দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিবে সে চিন্তায় আর চঞ্চল হন না, তেমন আদব তেমন সোহাগ করিবার অবসরই পান না। রাজলক্ষ্মীর মনে একটা মহা দৈন্যের সৃজন হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পাইলেন যে ব্যক্তি আমতলার ঘরে থাকে, তাকে লইযাই বাবু ব্যস্ত, কিন্তু সে কে? সকলে জানে বাবুর এক বন্ধু সেখানে থাকে, রাজলক্ষ্মীর সে কথা বিশ্বাস হইল না ভাবিলেন বন্ধুর সঙ্গে আরও কে হয়ত গোপনে আছে, তাঁহার মনে রাগ ও হিংসার সহিত মহা ঔৎসুক্যের উদয় হইল, সেই মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল যেমন করিয়া হউক যে স্বামীর মন হরণ করিযাছে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। মন খুলিয়া কথা কহিবার একমাত্র লোক নিত্যদাসী, তাহারই শরণাপন্ন হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবামাত্র সে কল্পিত কালামুখীর উদ্দেশ্যে যথোচিত গালিবর্ষণ করিতে কসুর করিল না, এবং তাহাকে সত্বর উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাজলক্ষ্মীকে বিস্তর সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান করিল।

রাজলক্ষ্মীর মন যখন ঈর্ষা ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল সেই সময় একদিন শুনিলেন স্বামী কলিকাতায় যাইতেছেন। স্বামী চলিয়া গেলে নিত্যের সহিত পরামর্শ হইল যে গভীর রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে গোপনে যাইয়া দেখিতে হইবে আমতলার বাঙ্গলোতে কে কে থাকে। বাবুর অনুপস্থিতিতে সকলেই সকাল সকাল ছুটী পাইয়াছে, গৃহিণীও সেদিন সন্ধ্যা না হইতেই আহার শেষ করিলেন—সকলেই আপন আপন কাজ সমাপন করিয়া আহার গ্রহণ করিলে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত, আকাশে খণ্ড চন্দ্রের সামান্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আলোকে নিত্যদাসীর পশ্চাতে রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি চলিলেন।

তখন সবে ফাল্গুন মাসের প্রখর বসন্ত আরম্ভে মৃদু মন্দ হাওয়ায় আম্র মুকুলের গন্ধে বাগান ভরিয়া গিয়াছে, অদূরে পুষ্করিণী। নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে মুক্ত বাতায়ণ পার্শ্বে বসিয়া একাকী অরবিন্দনাথ, আর কেহ কোথাও নাই। সম্মুখে টেবিলে কেরোসিনের ল্যাম্প

জলিতেছে—লিখিবার সরঞ্জাম খাতা পেনসিল পড়িয়া রহিয়াছে,—লিখিতে লিখিতে কি জানি কি বাধা পাইয়া পাপিয়ার করুণ সুরের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর বেদনা অনুভব করিয়া মন যেন অদৃশ্য কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতে গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিলেন, তাহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল, রাজলক্ষ্মী সেই প্রথম দিন ভাবিলেন পুরুষ মানুষ এমন সুন্দর হয়।

সেবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রাজলক্ষ্মী একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমতলার বাঙ্গলোতে কে থাকে সে কে এবং কি করে? জ্যোতিপ্রকাশ সেদিন অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি তাহার রচনার অদ্ভুত ক্ষমতা, কি করিয়া তাহাকে পাওয়া গেল এবং তাহাকে পাইয়া কত বড় একটা অভাব পূর্ণ হইয়াছে, অরবিন্দ কাব্যের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাহার মনে কি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজলক্ষ্মী চক্ষু কর্ণ বিস্তার করিয়া একাগ্র মনে শুনিলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহার অন্তরে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সংযোজিত হইল। চিত্রকর যেমন একটী রেখায় মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিলে ক্রমে মনের মতন চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি নানা বিচিত্র বর্ণে স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলে, সর্ব্বশেষে চোখের ভাবটী দিয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, রাজলক্ষ্মী সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আপন মনে একটী আদর্শ গড়িয়া অরবিন্দকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। স্বামীর নিকট শুনিলেন এক অপূর্ব্ব কাব্য রচিত হইতেছে, প্রস্তাব জ্যোতি প্রকাশের অরবিন্দ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, শীঘ্রই কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অভিনয় হইবে। তৎপূর্ব্বেই সে কাব্য কিরূপ রচনা হইয়াছে শুনিবার ইচ্ছা রাজলক্ষ্মীর খুবই প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিয়া শোনা যায়! রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন তাও কি সম্ভব! কিন্তু অতি সহজেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল। অনেক ইতস্ততঃ করিবার পর স্বামীকে বলিবা মাত্র তিনি অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "সে আর একটা বেশী কথা কি? আজই অরবিন্দকে ডেকে আনব, সে বড় সুন্দর পড়তে পারে, পড়ে শোনাবে।" লজ্জা ও ভয়ে রাজলক্ষ্মীর মন কাঁপিয়া উঠিল। জ্যোতিপ্রকাশ আরও বলিলেন "অরবিন্দ-আমার বিশেষ বন্ধু, তাতে ছোট ভাই এর মত, তার কাছে যাবে তাতে আপত্তিই বা কি, লজ্জাই বা কেন?" কিন্তু কি একটা ভাব যেন রাজলক্ষ্মীর মনে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল যেন কাজটা ভাল হইবে না তথাপি কাজটা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর যখন জ্যোতিপ্রকাশ স্বয়ং অরবিন্দকে লইয়া আসিলেন, প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মী পলায়ন করিলেন কিন্তু স্বামী হাত ধরিয়া সম্মুখে লইয়া আসার পর সঙ্কোচের ভাবটা কতক দূর হইল। অরবিন্দনাথ অনেক দিন ধরিয়া রাজলক্ষ্মীর কথা শুনিয়া আসিতেছেন, সে দিন দেখিলেন তাহার স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের সহিত বিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষু দুটীতে ও ঈষৎ খর্ব্ব নাসিকাতে বড়ই মানাইয়াছে, কপালে সিঁদুরের বিন্দু ও প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ কঙ্কণ, দুইহাতে

গৃহলক্ষ্মীর পূর্ণ চিহ্ন বিদ্যমান, তাঁহার পদাঘাতে অশোক ফুল না ফুটিলেও চলনের ভিতর কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে, বর্ণনা করা যায় না। রাজলক্ষ্মী যেন আপন গৌরবে উন্নত অথচ নম্র। জ্যোতিপ্রকাশ বাবু যখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন ''ইনিই আমার গৃহলক্ষ্মী, নাম রাজলক্ষ্মী'' তখন অরবিন্দনাথের মস্তক ভক্তিভারে নত হইল।

দেখিতে দেখিতেএক মাস অন্তে বাসন্তী পূজা সমাগমে পৃথিবীময় আনন্দের হিল্লোল বহিল। রাজলক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলেন। বাড়ীতে পূজা, তিন দিন ধরিয়া সমারোহ ব্যাপার চলিল, আত্মীয় কুটুম্বের যাতায়াতে, সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতে, সকলের সহিত যথাযোগ্য শিষ্টালাপ করিতে, রাজলক্ষ্মীর বিন্দুমাত্র অবসর নাই তথাপি তাহার মন বাগান বাড়ির সেই ছোটখাটো সংসারটীর জন্য উতলা হইয়া উঠিল। পূজা শেষ হইতে না হইতে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

তখন ভরপূর বসন্ত, বাগানটী ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর রাজলক্ষ্মীর মন যেন নূতন হইয়া উঠিল। তাঁহার জীবনে আর কখনও বসন্ত আসিয়াছিল কি না স্মরণ নাই এবার যেন নবীন বসন্তে গাছপালা ফুল ফল সব জীবন্ত হইয়া উঠিযাছে, সেই সুখ সম্পদ বেষ্টিত সংসার হইতে তাঁহার মন যেন ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ঘর সংসারের কাজ আর ভাল লাগে না, মূর্খ ননদের সংসর্গ যেন অসহ্য, তখন লেখা পড়ায় মন বসিল, নূতন কাব্য নূতন নাটক পড়িবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিল, স্বামীর অনুমতি ক্রমে অরবিন্দের নিকট হইতে নিত্য নূতন কাব্য ও কবিতার খাতা আসিতে লাগিল। কখনও কখনও অরবিন্দ স্বয়ং আসিয়া কবিতা পাঠ করিতেন, রাজলক্ষ্মীর লজ্জা সঙ্কোচ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

যে দিন জ্যোতিপ্রকাশ এবং অরবিন্দলিখিত নূতন কাব্যের প্রথম অভিনয় হইল, কলিকাতা সহরময় তাহার প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল, বন্ধু বান্ধবগণ উভয়কে অভিবাদন করিয়া পরম আনন্দে ফুলের মালা পরাইয়া দিল; জ্যোতি প্রকাশ বাড়িতে পৌঁছিয়া রাজলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে ছুটিলেন, গলার মালা খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বিজয় উল্লাসে উল্লসিত চিত্তে দুই বন্ধু একত্র ফিরিয়া আসার পর যখন অরবিন্দ তাঁহার নিভৃত গৃহকোণে বসিয়া কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইলেন রাজলক্ষ্মী হাসি মুখে অগ্রসর হইয়া জ্যোতি প্রকাশের গলায় বিজয় মাল্য পরাইতেছেন তখন সেই শূন্য ঘরের অসীম নির্জ্জনতা তাঁহাকে সবলে চাপিয়া ধরিল, সেই মুহূর্ত্তে অরবিন্দ অনুভব করিলেন যে সংসারে তাঁহার কোনও বন্ধন নাই, তিনি একেবারে একা। এমন সময় নিত্যদাসী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল এক খানা চিঠি ও একটী কাগজের মোড়ক হাতে দিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে চিঠি খুলিয়া অরবিন্দ পড়িলেন,—

বিজয়মাল্য তোমারই প্রাপ্য। মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত না করিলে তাহার কোনও মূল্য নাই।

পত্রে সম্বোধন নাই, স্বাক্ষর নাই, অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, পাতার মোড়কটী খুলিয়া মালাছড়া গলায় পরিয়া আবার কি মনে করিয়া খুলিয়া

সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন অরবিন্দ বুঝিলেন সে দিন তাঁহারই জয়।

যতই সময় কাটিতে লাগিল, অরবিন্দের প্রেম প্রীতি ভক্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই রাজলক্ষ্মীর উপর প্রসারিত হইল। সময়ে সময়ে স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাজলক্ষ্মী আপন ইচ্ছা ও অবসর মত অরবিন্দকে তলব করিতেন। তারপর এক সময় রাজলক্ষ্মী ভাব যোগাইতে থাকিলেন আর অরবিন্দ সে ভাব লইয়া রাশি রাশি কবিতায় আমতলার বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিলেন।

ইতি মধ্যে বিশেষ কার্য উপলক্ষে জ্যোতিপ্রকাশের কলিকাতা যাওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জ্যোতিপ্রকাশ উপরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া চলিলেন, রাজলক্ষ্মী ছাদে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাড়ীর বাহির হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যার স্নানান্তে বেশভূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এ দিকে অরবিন্দ সারা দীর্ঘ দিন ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়াছেন, আজ তাঁহার পক্ষে একটী বিশেষ দিন কারণ রাজলক্ষ্মী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিতেছেন। অরবিন্দ সযত্নে ঘর খানি পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রাজলক্ষ্মী গোলাপফুল ভাল বাসেন তাই রাশীকৃত গোলাপ আনিয়া নিজের হাতে যথা স্থানে রাখিয়াছেন, পথের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন কখন সেই সুন্দর চরণস্পর্শে শুষ্ক পত্র মর্ম্মরিয়া উঠিবে, কখন তাঁহার কুটীর দ্বারে উজ্জ্বল আনন্দ প্রতিমা ফুটিয়া উঠিবে, অরবিন্দ আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, উঠিয়া চঞ্চল পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা যেন কাহার পদশব্দ কর্ণে পহুঁছিল, ত্রস্তপদে দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সমুখে চৌকাঠের পরপারে দাঁড়াইয়া জ্যোতি প্রকাশ।

পথে চলিতে চলিতে বিষধর সর্প দেখিয়া মানুষ যেমন অজ্ঞাতসারে সরিয়া দাঁড়ায় অরবিন্দ সেইরূপ আপনার অজ্ঞাতসারে চমকিয়া পিছু হটিলেন, বিদ্যুতের শিখা আপাদ-মস্তক বহিয়া তাঁহাকে যেন মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেল; আপন অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কহিলেন "আপনি তবে যান্‌নি?" জ্যোতিপ্রকাশ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না বেরুতে দেরী হয়ে গেল তাই আজ যাওয়া হলো না।" অরবিন্দ কহিলেন "ঘরে এসে বস্‌বেন না? "জ্যোতিপ্রকাশ পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন, "ঘরে আসব?—ভাবছি অসময়ে এসে তোমার উপর উৎপাত করলুম নাতো? বাঃ! আজ তোমার ঘরের চেহারা যে বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি—মনে হয় যেন কারু আশায় ঘর সাজিয়ে বসে আছ।" অরবিন্দ হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া কহিলেন, "যে নূতন নাটকের প্রস্তাব ছিল সেইটা এখন আরম্ভ করা যাক।"

জ্যোতি। আজ একটী বেশী নূতন ধরণের গল্প আমার মাথায় এসেছে—গল্পটী যে খুব সুখপ্রদ তা নয়, তবে সরস বটে তার অভিনয় বোধ হয় বেশ হবে, সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি।

অরবিন্দ। তা'হলে আগেকার প্রস্তাবটা আপাততঃ স্থগিত থাকবে?

জ্যোতি। হাঁ, হাঁ, আগে এই নূতন গল্পটা দুজনে মিলে ঠিক করে নেওয়া যাক। গল্পটা বেশ নতূন রকমের, তার প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা। শেষটা যে কি রকম হওয়া উচিত

বুঝতে পারছি না, তাই তোমার সাহায্য চাই, বুঝলে?

অরবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জ্যোতি। ভাবটা বলি শোনো। এবার আর মিলন নয়, মিলন দেখে সবাই হায়রাণ হয়ে গেছে, এবার বিচ্ছেদ দেখাতে হবে।

অরবিন্দ। কি রকম বুঝতে পারছি না—তারপর?

জ্যোতি। এই মনে কর নায়িকাব স্বামীর বন্ধু ঘটনাক্রমে নায়িকার প্রণয়ী হ'য়ে পড়ে বুঝলে? সে অবস্থায় স্বামীর কি কবা কর্ত্তব্য? ক্ষমা করলে সে কাব্য হাস্যোদ্দীপক হয়ে পড়ে। আর প্রতিহিংসা নিলে সেটাকে বিয়োগান্ত করতে হয়। আমার কিন্তু সেই পছন্দ। আমার মতে স্বামীর বন্ধুটীকে হত্যা করা উচিত, অবশ্য কৌশলে। মনে কর স্বামীটার যেন খুব কঠিন মন। সহসা যখন দেখতে পেলে তার পরম বন্ধু বিশ্বাস ঘাতক হয়েছে তখন সে, যেন ক্ষমা করলেও করতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের বিচাব দেখাতে হবে তো? যে পাবণ্ড বন্ধুর আচ্ছাদনের ভিতরে থেকে গোপনে কাল সর্পের মত দংশন করতে পারে তার শাস্তি নিতান্তই আবশ্যক। স্বামী যেন, মনে কর, স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে, তাকে হত্যা করতে কিছুতেই পারে না, অথচ প্রণয়ীটিকে হত্যা করলে তাবও যথেষ্ট শাস্তি হবে জানে। কিন্তু কি উপায়ে হত্যা করা যায়; তুমি কি বল?

এতক্ষণ অরবিন্দ ইচ্ছা সত্ত্বেও সাহস করিয়া চোখ ফিরাইতে পাবেন নাই স্থির দৃষ্টিতে জ্যোতিপ্রকাশকেই দেখিতে ছিলেন—তাঁহার চোখে ও মুখের ভাবে সত্য কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা। অরবিন্দ দেখিলেন তাঁহাব স্বাভাবিক উজ্জল মুখশ্রী যেন বিমর্ষভাবাপন্ন, কথা কহিতে কহিতে সেই উদার নয়ন মাঝে মাঝে যেন হিংস্রভাব ধারণ করিতেছে। অববিন্দ বিশ্বাসঘাতকতা কবেন নাই, তথাপি ভয় হইল, অবিবেচনায় অযথা রাজলক্ষ্মীকে সন্দেহ লিপ্ত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। রাজলক্ষ্মীর অদ্যকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া থাকিলে জ্যোতিপ্রকাশ বাবু বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনা করিয়া কঠিন শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হইবেন বিচিত্র কি? অরবিন্দ কত কথাই ভাবিলেন একবার হাসিতে চেষ্টা কবিলেন কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশের কঠিন অটল দৃষ্টিতে সে হাসি মিলাইয়া গেল, তখন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "এই আপনার গল্প? নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু হত্যাটা কিরকম্"? তাঁহাকে ভ্রুকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "ওবিষয়ে আর কোনও দ্বিধা করবার দরকার নেই, হত্যা চাই।"

অ। বিয়োগান্ত করলে লোকে পছন্দ কববে কিনা তাই ভাব্ছি।

সেবার জ্যোতিপ্রকাশ হো হো শব্দে অট্টহাসি হাসিলেন। অরবিন্দনাথেব সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "কারু পছন্দ হোলো কিনা তাতো আমি জানতে চাইনে। আমি প্রতিহিংসা দেখাতে চাই, এমন ভীষণ হবে যে সে দৃশ্য দর্শকদের মনে লেগে থাকবে। কিন্তু এদৃশ্য কি করে অভিনয় কবা যায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

অ। মৃত্যুতে শেষ করবেন একেবারেই কি স্থির করেছেন?

জ্যোতি। নিশ্চয়! তুমি এখনও সংসারে অনভিজ্ঞ, জীবনেব বিকৃত দিক্‌টার স্বাদ এখনও

পাওনি কেবল কবিতা কল্পনার ভিতর দিয়েই যাচ্ছ, তাই মৃত্যুটাতে এত ভয়। সবই যখন মিথ্যা, সংসারই যখন অনিত্য তখন মৃত্যুতে আর ভয় কি? তা ছাড়া মাঝে মাঝে বদলও একটু আধটু দরকার। কবিতা, কল্পনা প্রেম ও মিলন আর চিরকাল কাহার ভাল লাগে? শোনো অরবিন্দ, আমার মনের ভাব স্পষ্ট করেই বলছি তোমার মতটাও সরল মনে বল।

অ। আপনার যা ভাল মনে হয় তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই।

জ্যো। আচ্ছা তার পর শোন, স্বামীর চরিত্র যেন খুবই সরল অথচ দৃঢ় তাই বন্ধুর উপর অসাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আমার গল্প—না, এখন আমাদের উভয়ের বলা যেতে পারে—এ গল্পের মর্ম্ম এই, যে বন্ধুকে অকপট মনে বিশ্বাস করা হয়েছিল সে অবিশ্বাসী হ'ল, এখন প্রতিশোধ নেওয়া যায় কি উপায়ে এবং তারপর কি হবে সেটা তুমি ভেবে ঠিক করে নাও।

অরবিন্দ বজ্রাহতের ন্যায় জ্যোতিপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দারুণ সংশয় তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পীড়ন করিতে লাগিল, না জানি জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর মনে কি আছে। কেহ কিছু বলিয়াছে কি? বলিবারই বা কি আছে; অরবিন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন "যদি আপনার বন্ধুকে হত্যা"। — জ্যোতিপ্রকাশ তাঁহার কথা সংশোধন করিয়া কহিলেন "হ্যাঁ কাব্যে যে বন্ধুকে শাস্তি দিতে হবে তার কি?"

অ। তাকে যদি নির্দ্দোষী প্রমাণ করা যায়। বন্ধুর বাড়িতে সর্ব্বদা যাতায়াতে তার স্ত্রীর কুহকে পড়ে সামান্য ভুল হতেও পারে তো? মনে করুন স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স খুবই কম সে অবস্থায়—। জ্যোতিপ্রকাশ তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "থাম থাম স্ত্রীর বয়স কম আমি বলেছি কি?"

অ। আজ্ঞে না, কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে!

জ্যো। আচ্ছা, তারপর কি বল্লে! স্ত্রীর কুহক! আমি তো স্ত্রীটীকে আদপেই চপল কুহকিনী মনে করছি না? আমি ধরে নিচ্ছি একটী ধী শান্ত বুদ্ধিমতী স্ত্রী যে স্বামী ছাড়া কিছু জানত না—যতদিন না সেই পাষণ্ড বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু তাকে অন্য পথ দেখিয়ে ছিল—এই তো আমার ধারণা, তানা হলে তো সব মাটী, গল্প জমবে কেন?

অ। আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন স্ত্রীর কোনও দোষ নেই? অরবিন্দ আরও কি কহিতে যাইতে ছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "রোসো—বিশ্বাসের কথা তুলছো কেন? আমার ধারণা তাই। মনে কর সেই বিশ্বাস ঘাতককে যদি তার ঘরে হত্যা করে ফেলে রাখা যায়! শুনতে কি রকম লাগছে? দেখতে অবিশ্যি খুবই শোকাবহ হবে।"

অ। নতুন কিছুই নয়, তবে একটা পশুর মত কাজ হবে।

জ্যো। তা যাই হোক, এমন দৃশ্য হবে কিনা যাতে দর্শক কুল, ভয়ে বিস্ময়ে থরহরি কেঁপে উঠবে। সকলে বুঝবে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি করে দিতে হয়। আচ্ছা বন্দুকের গুলি কি রকম? সেটা কি সুবিধে হবে মনে কর? অরবিন্দকে নিরুত্তর দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ আবার কহিলেন "তোমার এখানে বন্দুক আছে?"

অ। এখানে? না, না, এখানে বন্দুক নেই। বন্দুক দিয়ে কি করবেন?

জ্যো। একবার অস্ত্রটা দেখতাম, থাক্ তোমার ঘরে বন্দুক নেই যখন তখন তো চুকেই গেল।

অরবিন্দনাথের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত, সেদিকে জ্যোতিপ্রকাশের লক্ষ্য নাই। তাঁহার কাব্য লিখিত হত্যার উপযোগী অস্ত্র অন্বেষণেই যেন তিনি চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার আনন্দ ধ্বনি শুনিয়া অরবিন্দ সচকিত হইয়া উঠিলেন, সম্মুখে তাকের উপর হইতে চামড়ার খাপে মোড়া একখানা ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া জ্যোতিপ্রকাশ কহিলেন "বাহবা; বাহবা! এরকম অস্ত্র হলে মন্দ হয় না তো?"খাপ হইতে খুলিয়া অস্ত্রখানা ভাল করিয়া দেখিলেন প্রদীপের আলোকে ছোরাখানা চক্‌মক্ করিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানা সংগ্রহ করলে কোত্থেকে হে? এতে আবার কি লেখা আছে দেখছি?" অরবিন্দ কহিলেন "ওখানা নেপালি খুকরি, নেপালি ভাষায় একটা কথা লেখা আছে, তার মানে "শোনিত পিয়াসী"। জ্যোতিপ্রকাশ মহা উৎসাহে কহিলেন, "বা! বেশ, 'শোণিত পিয়াসী' কাব্যের নামও বেশ চলতে পারে, কি বল?" এবার জ্যোতিপ্রকাশ যেন মন খুলিয়া হাসিলেন। অরবিন্দ তখন সাহস পাইয়া কহিলেন "আপনি কি সত্যি মনে করেন মৃত্যুতে শেষ হলে কাব্য ভাল হবে? আমি অবিশ্যি ঐ কথা বলতে চাইনে যে বন্ধু যদি সত্যি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে থাকে তো তাকে ক্ষমা করা হোক, কিন্তু মনে করুন হঠাৎ স্বামী বুঝতে পারলে যে তাঁর সন্দেহ মিথ্যা তাকে যতটা দোষী মনে করে ছিলেন ততটা দোষী সে নয়, তখন মিলনের আনন্দে শেষ করা যেতে পারে।"

জ্যো। তুমি দেখছি মিলনের জন্য ভারি ব্যস্ত। আমার মিলনে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, আমি চাই বিরহ শুধু তা নয়—ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা। সেক্ষপীয়রের "ওথেলো" নাটকের শেষ যেমন, তেমনি ভীষণ হত্যার দৃশ্যে সমস্ত কলিকাতা সহর কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

"কলিকাতা সহর কণ্টকিত" কথাটা অরবিন্দের ভাল লাগিল না। দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন সমস্ত দৈনিক পত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা " জ্যোতিপ্রকাশ মিত্রের বাগান বাড়িতে ভীষণ হত্যা"—কি জীবন্ত অভিনয়!

জ্যোতিপ্রকাশ আবার কহিলেন "মনে কর একদিন রাত্রি প্রভাতে সকলে দেখলে প্রণয়ীর মৃত দেহ পড়ে আছে, তার বুকে এই রকম এক খানা ছোরা বসান। প্রণয়িণী অবিশ্যি সত্য ঘটনা কি তা বুঝবে, কিন্তু অন্য সকলে অনুমান করবে আত্মহত্যা। কি বল?"

অ। মন্দনয়, কিন্তু সত্য কথা কতদিন গোপন থাকা সম্ভব?

জ্যো। তার জন্য ভাবনা কি? কোনও রকমে মিটিয়ে দেওয়া যাবে। শাস্তিটাই দেখান উদ্দেশ্য, সেই খানে শেষ করলেই হোলো। কিন্তু তুমি কোন্‌টা পছন্দ কর?

অ। আমি? আমি পছন্দ?

জ্যো। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার মতে কোন রকমে শেষ হলে ভাল হয়?

ভয়ে অরবিন্দনাথের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে, তাহার বাক্য সরিতেছে না অনেক কষ্টে কহিলেন, "এখনও ভাল করে বুঝতে পারছিনা, একটু ভেবে কাল আপনাকে বলব।" তখন তাঁহার চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে মস্তক টেবিলের উপর ঢলিয়া পড়িল,

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জ্যোতিপ্রকাশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "একি।" তখনও ছোরা খানা তাঁহার হাতেই আছে অরবিন্দের অর্দ্ধ অচেতন কর্ণে সে স্বর দ্বিগুণিত হইয়া প্রকাশ করিল, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া উন্মুক্ত ছোরা হস্তে জ্যোতিপ্রকাশকে সম্মুখে দেখিয়া ভাবিলেন এইবার শেষ মুহূর্ত্তের নিমিত্ত যেন বুঝিলেন মৃত্যুটা কি। সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিয়া ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ তখন বিবর্ণ হইয়াছে, কপাল ও হস্ত পদদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতিপ্রকাশ সেই সময় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন "তোমার আজ কি হয়েছে বলত? স্ত্রীলোকের মত মুচ্ছো যাচ্ছ কেন?" সেই সময় অরবিন্দের সংজ্ঞা আসিল তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "কদিন থেকে ভাল ঘুম হচ্ছে না শরীরটা খুবই দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

জ্যোতি। তুমি বোধ হয় মস্তিষ্কের উপর বেশী অত্যাচার কর যেটা উচিত নয়। যাক এসে তোমাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম কিছু মনে করোনা। আমি না এলে তোমার সময়টা বোধ হয় অনেক ভাল কাটত। কাব্যটা গড়ে তোলা শক্ত হবে, তবু তুমিও ভেবে দেখ আমিও ভাবি কি করে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায়। তোমার অবস্থা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে অভিনয় করাতে পারলে লোকের মনে খুব ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হবে।

জ্যোতিপ্রকাশ চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ছোরাখানা রাখিয়া কহিলেন "বাঃ এখানা নিয়ে যাচ্ছিলাম, আপাততঃ আমার দরকার নেই"। সেই অবসরে এক গোছা গোলাপ ফুলদানী হইতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন "আমার গৃহিনী গোলাপ বড় ভাল বাসেন—তাঁকে দেওয়া যাবে, কি বলহে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?" অরবিন্দ নিরুত্তরে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন—ঘরের বাহিরে যাইয়া জ্যোতিপ্রকাশ বাবু কহিলেন "বেড়ে রাতটা হয়েছে, প্রিয়জনের সহবাসে কাটাবার মত বটে, কিন্তু বিরহীর পক্ষে ভয়ানক, তুমি আবার রাত জেগে হা হুতাশ কোরো না যেন, একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়, আজ আর কাব্যের কথা ভেব না, কাল তোমার শরীর ভাল থাকলে আবার আলোচনা করা যাবে।"

অরবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন; পর মুহূর্ত্তে জ্যোতিপ্রকাশ বাবু অদৃশ্য হইলে ঘরে ফিরিয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার বক্ষস্থিত রক্তপিণ্ডের চঞ্চলতা বাহিরে প্রকাশ পাইল, সমস্ত রক্তপিণ্ডটা কে যেন সবটা চাপিয়া ধরিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতেছে, সেই সঙ্গে রক্তরাশি শিরায় শিরায় বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল ঠিক নাই। এক সময় অগাধ জলের নীচে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে যেমন মানুষ নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে তেমনি একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অরবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কি মনে করিয়া কহিলেন, "উঃ কি দারুণ সংশয়, এখন মনে হচ্ছে আগা গোড়াই আমি ভুল বুঝেছি তিনি কোনও সন্দেহ করেন নি, কিন্তু ভগবান! কি পরীক্ষায় ফেলেছিলে, ভালই করেছ।"

পরদিন প্রভাতে একখানি পত্র লিখিয়া অরবিন্দ জন্মের মত জ্যোতিপ্রকাশ বাবুর বাগান বাড়ি ত্যাগ করিলেন; রাজলক্ষ্মীকে লিখিলেন।

"মোহ অন্ধ, তাই কোনও বিচার করি নাই। ভাবিয়া দেখিলাম আর এখানে থাকা শ্রেয় নয় তাহাতে সকলেরই অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম।"

জ্যোতিপ্রকাশ বাবুও ঠিক সময় পত্র পাইলেন অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"গত কল্য শরীর অসুস্থ বোধ করায় ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই বায়ু পরিবর্ত্তন ইচ্ছায় দূরদেশে যাইব সংকল্প করিয়াছি। আর নূতন কাব্যে যোগ দিতে পারিলাম না। ভুল ভ্রান্তি মার্জ্জনা করিয়া প্রসন্ন মনে বিদায় দিবেন।"

ছয় বৎসরের প্রিয় সহচরকে বিদায় দিয়া জ্যোতিপ্রকাশের অন্তরে যে বেদনা লাগিয়া ছিল তাহা তাহার অন্তরই জানিল বাহিরে কখনও প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু কাব্য আলোচনা চিরদিনের মত শেষ হইল। সেদিন আহার করিতে করিতে রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন "অরবিন্দ আজ কোথা গেল"। রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, "জানিনা সে বল্লে তার শরীর ভাল বোধ করছে না, তাই হাওয়া বদলাতে গেল। কিছু দিন থেকে তাকে অন্যমনস্ক দেখছিলাম বটে"। রাজলক্ষ্মী এবার একটু হাসিয়া কহিলেন "হয়ত ভদ্রলোক কাউকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে গেল।"

জ্যোতিপ্রকাশের আহার সমাপ্ত হইল—হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন "বিয়ে করতে! বিয়ে জিনিষটা মন্দ নয় যদি বাগাতে পারা যায়। যতদিন বিশ্বাস থাকে ততদিন শান্তি—তার পর অবিশ্বাস সন্দেহ এলেই সব মাটী। যার শান্তি—তার পক্ষে বেশ, তবে সকলের অদৃষ্ট সমান নয় কারণ তোমার মতন লক্ষ্মী সকল ঘরে নেই তো?" জ্যোতিপ্রকাশ রাজলক্ষ্মীর লজ্জাবনত আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

'ভারতী'—১৩১৭

আংটি

অনুরূপাদেবী

স্বাস্থ্যলাভের আশায় আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখান হইতে এক অ-স্বস্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সাগর কূলের বালুকার মধ্য হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করা একটা সখের কাজ জুটিয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন যেমন ছড়ি দিয়া বালুকার স্তর লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া থাকি, সেদিন ও সেই রকম করিতে করিতে একটা হীরার আংটি কুড়াইয়া পাইলাম। আংটিটা গিনি সোনা বা তাহার কিছু কম দরের সোনায় প্রস্তুত। সচরাচর বাজারে এ রকম সোনার আংটি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না, ফরমাইস দিয়া গড়াইতে হয়। আংটিটীর মাঝখানে একখানি বড় কমলহীরা। বালুকা লাগিয়াছিল। ভাল করিয়া ধুইতেই হীরা খানা মেঘমুক্ত নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেশ দামী হীরা ওজনে একরতির উপর হইবে। কাটাটার মধ্যেও বেশ একটু নিপুণতার চিহ্ন ছিল। এবং এইটুকুই এই কুড়ানো জহরটির বিশেষত্ব। ভাল করিয়া লক্ষ করিলে হীরাখানাকে ছোট একটি ফুলের মতন দেখাইত।

বাড়ী আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। আংটির বর্ণনাটা দিলাম না, শুধু এইটুকু মাত্র লিখিলাম " .... সমুদ্রতটে একটি আংটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। আংটির বিবরণ সহ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র।"

প্রথম সপ্তাহে আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল না। কোন লোকই আংটির দাবী করিতে আসিল না। কেই পত্র লিখিল না। মুস্কিলে পড়া গেল। পরের জিনিস, ফেলিয়া দেওয়া উচিৎ নয়। কাছে রাখা আরো অনুচিত। তবে কি কোন দাতব্য কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দিব? হ্যাঁ, এই পরামর্শই ঠিক সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া আংটিটা মুড়িয়া শীল করিয়া একাই সৎকর্ম্ম ভাণ্ডারেই পাঠাইয়া দিই। অভাবগ্রস্ত গণের ও কিছু উপকার হইবে এবং আমি ও পরের বোঝা ঘাড় হইতে ফেলিয়া নিশ্চিত হইতে পারিব।

আংটিটি ছোট একটি টিনের কৌটায় পুরিয়া কোথায় পাঠাইব ভাবিতে গিয়াই সর্ব্বপ্রথমে রামকৃষ্ণ- সেবাশ্রমের কথা মনে হইল। লিখিতেছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুই খানি পোস্ট কার্ড দিয়া গেল। হাতের কাজটুকু শুভ কর্ম বলিয়া প্রথমে তাহা করিলাম। শীল করা হইয়া গেলে বাতিটা নিবাইয়া দিয়া একখানা কার্ড তুলিয়া পাঠ করিলাম তাহাতে এই রূপ লেখা। "মহাশয় অতি সজ্জন। একালে এরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রায় চক্ষে পড়ে না। দুই মাস গত হইল আমার অঙ্গুরীয়টি স্নানের সময় ... ... সমুদ্র জলে পতিত হয়। ইহা সেই অঙ্গুরীয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক-নিম্ন ঠিকানায় মদীয় ভবনে উহা প্রেরণ পূর্বক চিরবাধিত করুন।"

স্বাক্ষর ছিল চারুচন্দ্র কর্মকার। দ্বিতীয় পত্র ও প্রায় এই প্রকার। বেশির ভাগ তাহাতে

এইটুকু ছিল ''আমার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতি এই অঙ্গুরীয় আমার জীবন সদৃশ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছিলাম। ভবদীয় কৃপায় ইহা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইব।

ইতি।

শ্রী বিহারী চরণ সরকার।

সমস্ত সঙ্কল্পই বদলাইয়া ফেলিতে হইল এবং সেই সঙ্গে নূতন একটা সমস্যা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইল। আংটির প্রার্থী দুই জনের একজন ও আংটির বর্ণনা পত্রে দেন নাই। অথচ বিজ্ঞাপনে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়াই লেখা হইয়াছিল। এ আবেদন বিশ্বাস যোগ্য নয়। প্যাক করা কৌটা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দুইখানা পোঃ কার্ড লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাকে পাঠাইতে দিলাম। কি বকম অঙ্গুরীয় খোয়া গিয়াছে তাহা জানাইবার অনুরোধ করিলাম। সে হপ্তার বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের খোয়া যাওয়া আংটির সবিশেষ বিবরণ সহ পত্র লিখিতে অনুরোধ করা হইল।

চারু কর্মকার বা বিহারী সরকারের পত্রোত্তর আসিল না কিন্তু প্রতিদিনই আমার নিকটে দুইখানি চারিখানি করিয়া অঙ্গুরীয়ের জন্য আবেদন সহ নানা দেশ হইতে পত্র ও কার্ড আসিতে লাগিল। কোন কোন পত্রে তাহাও থাকিত না। কিন্তু কোন বর্ণনার সহিত আমার বিজ্ঞাপন দেওয়া আংটির পুরা মিল হইল না। যদিও অধিকাংশ লোকে তাঁহাদের অঙ্গুলী বিচ্যুত হীরকাঙ্গুরীয় যথাসাধ্য মূল্যবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিতেন, তথাপি কিছু না কিছু প্রভেদ থাকিয়া যাইত। আর যাঁহারা লিখিতেন—আমার অঙ্গুরীয়টিতে খুব বড় একখানা পোকরাজ দেওয়া আছে কিম্বা পান্না বা চুনিরও কোন উল্লেখ থাকিত তাহার তো আর কথাই নাই, সেইখানেই চুকিয়া যাইত।

এমনি করিয়া পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, ঝুড়ি করিয়া জমা করিলে প্রায় এক ঝুড়ি চিঠি এই হীরার আংটিটার দাবী করিয়া আসিল। কিন্তু এমন একখানাও চিঠি পাইলাম না যাহাতে আমার ঘাড়ের এই বোঝাটাকে সেইখানে নিক্ষেপ করিতে পারি। শুধু এই দেখিয়া অবাক হইলাম যে বাঙ্গালা দেশের কত লোকই সমুদ্র ভ্রমণে গিয়া রত্নাকর গর্ভে রত্ন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম প্যাক করা কৌটাটিকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। একি এক গ্রহ জুটিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া দিল। তাহাতে একটি খৃষ্টানি নাম দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজেই উঠিয়া গেলাম। বাহিরে একটা যুবক দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইনি আংটীর প্রার্থী। ইনি গত বৎসব সমুদ্রতীরে একটি আংটি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। সেই জন্য আমার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবধি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে হয়তো এটি তাঁহারই সেই অঙ্গুরীয়। কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি এপর্য্যন্ত ইহার জন্য দাবী করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু আমার এই শেষ বিজ্ঞাপন—আংটির দাবি অনেকেই করিতেছেন কিন্তু তাহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াতে কোন দাবি গ্রাহ্য করিতে পারি নাই, পরের জিনিস লইবার জন্য যাঁহারা নিজের বলিয়া অনায়াসে হাত

পাতিতে পারেন, তাঁহাদিগকে ধিক্— পড়িয়া তিনি আজ এখানে আসিয়াছেন; স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন জিনিসটি তাঁহার কিনা, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার আংটির সোনাটা কি রকম ছিল বলুন দেখি?"

লোকটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমাকে আংটি দেখাইতে কুণ্ঠিত বুঝিয়া তাঁহার ঠোঁটের পাশে একটু খানি করুনার মৃদুহাসি প্রকাশ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "গিনিসোনা, মশাই, আংটিটা সাহেব দিগের ওখান থেকে গড়িয়েছিলুম কিনা, তাই সোনাটা ভাল দেয়া হয়েছিল।

মনে একটু আশা হইল, তবু আর একটু পরীক্ষার দরকার হইল, "আর হীরা খান?" "কমল হীরে, চমৎকার হীরে, মশাই, ফাইন কাট হীরে।—হীরে খানার আবার একটা ইতিহাস আছে। আমার মা একজন ইউরোপিয়ান লেডি ছিলেন। এ তাঁরি আংটির হীবে। মার স্মৃতি চিহ্ন। পুরান আংটি টি ভেঙ্গে যাওয়াতে এই আংটিটি নতুন গড়িযেছিলুম। তাইতেই তো এই বিপত্তিটী ঘটলো। আংটিটা একটু বড় হয়েছিল হঠাৎ খুলে জলে পড়ে যায়।"

আমার আর দ্বিধা রহিল না, আংটিটি দেখিলে বোঝা যায় তাহা তেমন পুরাতন হয় নাই। নতুনই বটে। তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বাহির হইতে ভিতরে আংটি আনিতে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আনা ঘটিল না, গৃহিনী বাক্স ও ট্রাঙ্কের চাবি আঁচলে বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি যে এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিয়া আসেন এমন কোন সম্ভাবনা কোন দিনকার দৃষ্টান্ত দ্বারা খুজিয়া পাওয়া যায় নাই, উত্ত্যক্ত চিত্তে ফিবিয়া আসিয়া ব্যাপার জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। উৎসুক যুবক মনমরা ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন। বলিয়া গেলেন পরদিন আসিয়া আংটি লইয়া যাইবেন।

পরদিন প্রত্যুষে লোকালি ডাকেই একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই—

"সবিনয় নিবেদন

এই সপ্তাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে হইল বিজ্ঞাপন দাতা তাঁহার কুড়ানো আংটিটির অনেক গুলি প্রার্থী লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অনিচ্ছার সহিত কর্ত্তব্য বোধে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কি রকম আপনার এ আংটি? গিনি সোনার এলবার্ট প্যাটার্নের একটা হীরার আংটি হইবে কি? হীরাখানা এক রতির উপর ওজনে এবং তাহাকে ঘুরাইয়া দেখিলে যেন একটি ছোট গোলাপফুলের মত দেখায়? ভিতরের পিঠে ১০২৫ এই নম্বর লেখা আছে। যদি তাই হয় তবে সে আংটিটা আমি যে অমূল্য রত্ন রত্নাকরগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি উহা তাহার অঙ্গুরী, শেষ পর্যন্ত তার অঙ্গুলীতে এমনি একটি আংটি ছিল। বেশ মনে আছে।

আপনি দেখিতেছি ভদ্রলোক, আপনার মত লোককে অনুরোধ করিতে সংকোচ নাই। যদি আংটিটি এই রূপ হয়, তবে তাহা "রামকৃষ্ণ মিশনের বেনারস সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন। আমার নিকট আর তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহা যাহার স্মৃতি চিহ্ন,

সহস্র হীরকের চেয়ে ও তাহার স্মৃতি আমার এই চির অন্ধকার চিত্তকে আলোকিত করিয়া আছে। ক্ষুদ্র হীরা সেখানে কি করিবে?

আর্শীবাদ করিবেন পরলোকে আবার তাহাকে দেখিতে পাই, জগতের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। পত্রে স্বাক্ষর ছিল না বা ঠিকানা দেওয়া ছিল না। বেশ মনে পড়ে আংটিটির নম্বর ১০২৫ই বটে। গৃহিণীকে বেড়াইতে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। পরদিন খৃষ্টান যুবকটি আসিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল শীলমোহর ভাঙ্গিতে হইল না, ঠিকানা কাটিতে হইল না। অতি সহজেই আমার ঘাড়ের সেই ক্ষুদ্রাকারের বৃহৎ বোঝাটি সুচারু রূপে নামিয়া গেল।

সেই হপ্তার কাগজে বাহির হইল ''আপনার আদেশ মত আংটি সেবাশ্রমে প্রেরিত হইল। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।''

'বামাবোধিনী পত্রিকা'— ১৩১৮

রহস্যের জাল

ইন্দিরাদেবী

দশটা বাজিতে কুড়ি মিনিট বিলম্ব আছে। আফিসের বাবুরা ছাতা হাতে দলে দলে ট্রাম গাড়ীর জন্য ফুটপাথের উপর অপেক্ষা করিতেছিলেন রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী, গরুরগাড়ী মটর গাড়ী ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

"ঝাঁকা মুটেরা" মোট লইয়া হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতেছে। খাবার ওয়ালা "বাগবাজারের রসগোল্লা," "ক্ষিরের পান্তুয়া" এবং লিচুওয়ালা "চাই ভাল ভাল মজাফর পুরের লিচু" হাঁকিয়া চলিতেছে। "দিনবার্ত্তা" নামক দৈনিকের সবএডিটর সতীশচন্দ্র রায় আপনার কার্য্যস্থল কলুটোলাষ্ট্রীটের অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতেছিল। সহসা অপর এক বিপরীত পথগামী পথিকের সহিত ধাক্কা খাইয়া তাহার চলন্ত গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। অসতর্ক পথিককে দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে সে সহসা বিস্ময়সূচক স্বরে বলিয়া উঠিল "একি কাকা যে? আপনি ফিরিলেন কবে? ভাল আছেন ত? খবর কি?"

কাকা আপনার অসংযত চলনের কৈফিয়ৎ দিবার পরিবর্ত্তে ভ্রাতুষ্পুত্রের কণ্ঠস্বরে অত্যধিক খুসী হইয়া সবুজ চশমার ভিতর হইতে স্নেহপূর্ণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর একে একে সতীশের প্রশ্নের উত্তর দিলেন "এই আজ সকালেই "জাভা" থেকে ফিরেছি। এখনও বাড়ী যাইনি। শরীর বড় মন্দ নেই, কিন্তু ঘুরে ঘুরে ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কি করা যায় বল দেখি? এক পেয়ালা "চা" না পেলে ত আর বাঁচি না।"

কাকা রামতনু বাবুর বয়স পঞ্চান্নের কাছাকাছি। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের বহর একটু বেশী। মাথার চুলে এবং শ্মশ্রু গুম্ফের অধিকাংশেই পাক ধরিয়াছে। চোখে কাঁচকড়ার সবুজ রংয়ের গোলাকার চশমা, মাথায় একটা বাদামী সিল্কের প্রকাণ্ড পাগড়ী। হাতে একটী সবুজ ও নীলের ডোরাকাটা জাপানী ছাতা। এহেন বিচিত্র বেশধারী কাকাকে লইয়া সতীশ নিকটবর্ত্তী একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল। রামতনু বাবু এক পেয়ালা "চা" নিঃশেষ করিয়া আর এক পেয়ালার ফরমাস দিলেন। এবং শূন্য পেয়ালায় চামচ বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিলেন। "তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি, বল।" তাঁহার মিষ্টগলায় মৃদু মৃদু গানটীতে মধু বর্ষিত হইতেছিল। দোকানের বিক্রেতা ও খরিদ্দারদের অনেক গুলি কৌতূহলী চক্ষু তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সতীশ ঘড়ী খুলিয়া বলিল "এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। আপনার জাভার গল্প বলুন, এবার সেখান থেকে কি কি অপূর্ব আশ্চর্য্য জানোয়ার সংগ্রহ করে আনলেন।"

রামতনু বাবু হাসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার যা এনেছি তা একেবারে নূতন, একে বারে অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য্য জীব যে এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর কোলে বাস করে তা কারু অনুভব করাও সম্ভব নয়। এটী আমার সব চেয়ে বড় আবিষ্কার। কর্ম্মের

জীবনে এত বড় সাফল্য লাভ আমার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটেনি। এ দেখে জগতের লোক একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

খুড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কারের ইতিহাস শোনা সতীশের জীবনে ইহাই প্রথম নয়। সুতরাং তাহার তাক লাগিয়া যাইবার মত বিশেষ কিছু কৌতূহল দেখা গেল না। অত্যন্ত সহজ সুরেই সে জিজ্ঞাসা করিল "এবারকার আবিষ্কৃত বস্তুটা কি?"

রামতনু বাবু একবার সন্দিগ্ধদৃষ্টিপাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কোন কৌতূহলী চক্ষু তাঁহাদের দিকে দেখিতেছে কিনা। তাহার পর আশ্বস্ত হইয়া আপনার প্রকাণ্ড জাপানী কিথোনার পকেট হইতে একটা লাল মখমলের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সটির চারিধারে মখমল আঁটা কেবল উপরের ডালাখানি কাচের। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বাক্সের ডালাটি সন্তর্পণে মুছিয়া ফুৎকারে কল্পিত ধূলিকনা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধ বাক্সটি টেবিলের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "দেখ।" বাক্সেব ভিতর খানিকটা বাদামী রংয়ের ঝকঝকে রেশমি কাপড় দেখা যাইতেছিল। সরু সুতার সূক্ষ্ম বুনানি। অনেকটা নেট বা লেশের মত দেখিতে তবু একটু যেন কেমন অদ্ভুত বকমেব। সতীশ নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিল। সহসা দেখা গেল বাদামেব মত রং অনেকটা সেই রকমেরই গঠন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট কোন জীব কাপড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শিহরিয়া উঠিয়া সতীশ বলিল "একি মাকড়সা নয়?"

বাক্সটী সযত্নে পকেটে রাখিয়া দিয়া বামতনু বাবু বলিলেন ঠিক! কিন্তু তবু এতে বৈচিত্র্য আছে। এমন রঙেরও জিনিষ আর দেখেচ কি?

"না তা দেখিনি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দেশে বর্ণের উজ্জ্বলতা আর সভ্যদেশের শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতায এমন কি আশ্চর্য্যের বিযয আছে?" সতীশের কণ্ঠস্বরে পরিহাসের আভাস প্রকাশ পাইতেছিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "না শুধু চেহারার সমালোচনা করো না। এদের ক্ষমতাব কথা যখন শুনবে তখন আব ঠাট্টা করতে পারবে না। বাপু হে, এ বড় যে সে জানোয়ার নয়। ঘরের কড়িকাঠ বা দেওয়ালেব গায়ে যে "কালো জাতি' কে দেখে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আতঙ্কে অস্থির হন এরা তাদের মত নিরীহ স্থানুপ্রকৃতিব নয়।

এদের বর্ণের যেমন বিদ্যুতের মত উজ্জ্বলতা, গতিও তেমন দ্রুত। এই দেখ এখানে চোখের পলক ফেলবার আগে দেখবে তোমার দৃষ্টির বাইরে এক মাইল দূরে চলে গেছে। এত ক্ষিপ্র— যে জাল তৈরি হতে দেখবে কিন্তু কাবিগরকে দেখতে পাবে না।" একটুখানি রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার আশা আছে একদিন এরা জাপানের রেশমের কলের অন্ন মারবে।"

সতীশ বলিল "এদের নাম কি? মাকড়শাই ত বলে?"

"হ্যাঁ সেখানে এদের 'জাভা স্পাইডাব বলে। এখানে অবশ্য অন্য নাম হবে। আবিষ্কারকের নামে নাম রাখাই ত তোমাদের আধুনিক ফ্যাসন? বোধ হয় 'রাম মাকড়সা" তনু "মাকড়শা' বা 'বসু' মাকড়শা' এমন কিছু দাঁড়াবে আর কি?"

সতীশকে নীরব দেখিয়া সে যে তাঁহার এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনে আর সংশয়মাত্র ছিল না।

রামতনু বাবু লোকটি একটু খেয়ালী। অল্প বয়সে পিতামাতার মৃত্যু হয়। যৌবনের প্রথম প্রভাতে পরম প্রণয়িনী পত্নীর অকাল মৃত্যু সংসারের উপর একটা প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিল। রামতনু বাবুর পিতা রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দিগিরি করিয়া পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অন্নচিন্তাও তাঁহার ছিল না। এই বন্ধনহীন সংসারবিরাগ ধনী ব্যক্তির অবশ্য আত্মীয়ের অভাব হয় নাই। নানাজাতীয় পক্ষীসমাকুল বটবৃক্ষের মত তাঁহার বৃহৎ ভবন দূর সম্পর্কীয়া মাসী, পিসী, মামী, খুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়া ও তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গে সর্ব্বাদা কলকলায়মান থাকিত।

তাঁহার নিজের দুইটি সখ ছিল দেশ ভ্রমণ এবং জীবতত্ত্বানুসন্ধান। এই দুই কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি কতকটা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে এসব লোকের সম্মানসূচক উপাধি "মাথা পাগলা" ছাড়া অন্য কিছু বড় ঘটে না। রামতনু বাবুকে ও লোকে "পাগল" বলিত। লোকের দোষ দেওয়া যায় না। পাগল ভিন্ন আপনার স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া ঘরের পয়সা ব্যয়ে ফড়িং প্রজাপতি পতঙ্গের পশ্চাতে কে ঘুরিয়া বেড়ায়? দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপানের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া রামতনু বাবু আরো দুই তিনবার অপূর্ব প্রজাপতি, অদ্ভুত পতঙ্গ এবং অদৃষ্টপূর্ব্বক সরিসৃপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছিলেন।

একটুখানি গর্ব্বিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন "আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েই মনে কচ্চি একটা প্রবন্ধ লিখব। "এসিয়াটিক সোসাইটিতে সেটা পড়তে হবে। যেদিন পড়বে সেদিন তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে পার তাহলে তোমার "দিন-বার্ত্তার" সংবাদ স্তম্ভে এই অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবের ইতিহাস তুমি প্রথম প্রকাশ করতে পারবে।"

সতীশ একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। কলিকাতার লোকে যে একটা মাকড়সার তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিবে এমন হাস্যকর ব্যাপার বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। রামতনু বাবু বলিলেন "আশ্চর্য্য এই—এদের ছাল এত কঠিন যে কুড়ালের ঘা দিলেও ভাঙ্গে না। কুড়াল মারবার অপেক্ষাও তারা রাখে না। কুড়াল উঁচু করে তুলে মারবার পূর্ব্বেই তারা মাইল খানেক দূরে চলে যায়।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল "এরা খায় কি?"

"মাছি মৌমাছি পাখী যা কিছু পায়। এদের জাল এত শক্ত যে এরা অনায়াসে পাখী পর্য্যন্ত জালে ধরিতে পারে। এদের জালের ফাঁদে যে হতভাগা পাখী পড়বে দুমিনিটের মধ্যে তার পক্ষী জীবনের চিহ্নস্বরূপ হাড় কখানি আর পালকগুলি জালে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। শুনেছি দু-পাঁচ কুড়ি ক্ষুধার্ত্ত মাকড়শা একটা মানুষকে পর্য্যন্ত নাকি মেরে ফেলতে পারে।"

সতীশের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, "কি ভয়ানক জানোয়ার।"

খুড়া হাসিয়া বলিলেন "ভয়ানক? হ্যাঁ ভয়ানক হত বটে যদি এরা অবাধে জন্মাতে

পেত। এক একটা মাকড়সা মাসে ত্রিশ হাজার ডিম পাড়ে। আর ডিমগুলো ফুটতে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। এই ত্রিশ হাজার জীবের যদি প্রত্যেক ত্রিশ হাজার করে ডিম হয় তাহলে ভাব দেখি কি ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।''

''জাভা তাহলে মাকড়শায় ভরে যায়নি কেন? তাদের ত ঐরকম হারে বাচ্চা হয়।''

''মাছিতে'' সংসার উৎসন্ন যায় নি কেন? তারাও ত ঐ রকম হারে বাড়ে?

''তার কারণ কতক জীবজন্তুতে খেয়ে ফেলে, কতক মানুষে মারে—শীতের সময় অধিকাংশই মরে যায়। এই সব অনেক কারণ আছে।'' ''আপনি যে বল্লেন এরা এত শক্ত যে, কুড়ালে ভাঙ্গা যায় না, এত দ্রুতগামী যে ধরা যায় না তবে এদের মারে কে?''

খুড়া হাসিয়া উত্তর দিলেন ''তাহলে খবরের কাগজ-ওয়ালাদের বুদ্ধি আছে। আমি ভাবতাম তাদের মাথাগুলা কেবল দেহের শোভা বর্দ্ধনের জন্যে, সেখানে মস্তিষ্ক ঘৃতের কোন বালাই নেই। বাপু হে, যে গড়তে জানে সে ভাঙ্গতে ও পারে। 'জাভা' যাতে মাকড়শার উৎপাতে উৎসন্ন না যায় তার উপায় সেই সৃষ্টি কর্ত্তাই করে দিয়েছেন। সেখানে ''হাতুড়ী পাখী'' বলে ''চড়াই পাখীর'' মত এক রকম পাখী দেখা যায়, তাদের প্রধান খাদ্যই হচ্চে এই মাকড়শা গুলো। বহু শতাব্দীর অভ্যাসে আর লীলাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অলঙ্ঘ নিয়মাদেশে তারা অতি সহজেই এই দ্রতগামী জীবকে ধরে ফেলতে পারে। তাদের ডানাগুলি এত শক্ত আর এমন ধারাল যে এদের সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শ স্বরূপ কঠিন জালগুলিকে অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এ পাখীগুলো ''জাভাতে'' খুব বেশী। আমি আসবার সময় দুটি পাখী এনেছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যাভাবে পাখী দুটি রাস্তাতেই মরে গেল। অবশ্য তাদের ছালগুলো আমি রেখে দিয়েছি। সময় মত তোমায় দেখাব এখন। ঠোঁটের আর পেশীর কি রকম জোর ছিল তা দেখলেই বুঝতে পারবে।''

সেই অদৃষ্ট—পূর্ব্ব আশ্চর্য্য পক্ষীর দেহাবশিষ্ট দেখিবার জন্য সতীশের মনে যে কৌতূহল জন্মিয়াছিল এমন নয়। সে সাধারণ জিজ্ঞাসার ভাবে বলিল ''আসবার সময় পাখীদুটোকে কি খেতে দিতেন? মাকড়শা অবশ্য নয়?''

''না—তা নয়! আমি তাদের মাংসের টুকরো খেতে দিতাম। প্রথম প্রথম আপত্তি জানিয়ে তারা পেছন ফিরে বসে থাকত, খাবার ছুঁত না, কিন্তু বাপুহে! পেটের জ্বালা কি জান—বড় জ্বালা। শেষাশেষি হাজত ঘরের ভদ্র কয়েদীদের মত মাথাটী নিচু করে চোখের জল চোখে মেরে ভাল মানুষের বাছারা টুপ টাপ করে মাংসই খেয়ে নিত। খেলে কি হবে পেটে বোধ হয় সহ্য হোল না। এমন অদৃষ্ট জাহাজে একটা পশুডাক্তার পর্য্যন্ত ছিল না—আহা বিঘোরে বেচারারা মারা গেল। এই পাঁচটা মাকড়শার যখন হাজার হাজার বাচ্ছা জন্মাবে তখন কি আর খাবার ভাবনা থাকত। এখন এদের বাচ্চা হলে আত্মরক্ষার জন্য আমায় নিজে হাতে মারতে হবে। ওদের যে বাক্সর বাইরে বার করব তার আর যোটি রইল না।''

সতীশ ঘড়ী বাহির করিয়া সময় দেখিয়া বলিল ''বারটা বাজে, ওঃ আমার এক ঘণ্টা

দেরি হয়ে গেছে। আচ্ছা আজ তাহলে আমি যাই। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার এই ভয়ংকর জানোয়ারগুলো যেন পালাতে না পারে।''

ট্রামগাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে বসিয়া চুরুটের পুঞ্জিভূত ধূম উদ্গীরণ করিয়া দিয়া সতীশ ভাবিতে ছিল ''খুড়ার অর্দ্ধবিকৃত মস্তিষ্ক এবার সম্পূর্ণরূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ দেখাইয়া মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করা সমীচীন।''

রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিনবার্ত্তার সহকারী সম্পাদকের নিদ্রাতুর দৃষ্টি ঘন ঘন ঘড়ীর কাঁটার প্রতি পতিত হইতেছিল এবং তাহাব শ্রান্তচিত্ত ঘটিকা যন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সন্দিহান হইযা উঠিতেছিল তবুও কার্য্যের বিরাম ছিল না। টেবিলেব উপরে প্রসারিত কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রুফ দেখিয়া কাটকুট চলিতেছিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া সম্পাদকের আহ্বান বার্ত্তা জানাইয়া গেল। সম্পাদকের ডাকিবার সহজ অর্থ আরও কিছু কার্য্যভার চাপাইয়া দেওযা। সতীশ অপ্রসন্ন চিত্তে গম্ভীরমুখে সম্পাদকের গৃহে প্রবেশ করিল। বিনা ভূমিকায় সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন ''জীবতত্ত্ববিদ্ রামতনু বসুকে তুমি জানতে কি?''

''হ্যাঁ তিনি আমার কাকা হন।''

সত্যি, তা হলেত তোমার জন্যে ভারি একটা দুঃখের সংবাদ অপেক্ষা কচ্চে। আজ সন্ধ্যে সাতটার সময় তোমার কাকা হাইকোর্টের ধারে ট্রামে কাটা পড়ে মারা গেছেন। প্রথমে কেহই তাঁকে চিনতে পারেনি, কাজেই খবর আসতে এত দেরি হয়ে গেল।''

সতীশ কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল ''কি সর্ব্বনাশ! আজ সকালেই যে তিনি 'জাভা' থেকে ফিরে এসেছেন। বেল্লা বারটার সময় আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসে কথা কয়ে এসেছি। কি সব নূতন জন্তু জানোযার জাভা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন সে সম্বন্ধে কত গল্প বলেছেন।''

সম্পাদক দুঃখ সূচক মাথা নাড়িয়া বলিলেন ''সত্যি' সংসারে এই টুকুই সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে মানুষ যে জিনিষটাকে একেবারে অসম্ভব মনে করে সেইটেই সবচেয়ে সম্ভব হয়।''

আকস্মিক বেদনার প্রথম আঘাতটা সহ্য হইয়া গেলে সতীশের মনে পড়িল অপুত্রক রামতনু বাবুর শেষ কার্য্যের যথাবিহিত কর্ত্তব্য করিবার জন্য নিকট আত্মীয় সে ভিন্ন আর কেহই নাই। সে সম্পাদককে আপনার ইচ্ছা জানাইলে তিনি বলিলেন ''নিশ্চয়ই, তুমি এখুনি যাবে সেকি কথা? এত তোমার অবশ্য করণীয় কার্য। আর দেখ! তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমি লিখে দিয়েছি এতক্ষণ বোধ হয় ছাপা হয়ে গেল। তাইত আগে যদি জানতেম তিনি তোমার এমন আত্মীয় তাহলে তাঁর একটু জীবনী দিয়ে দিলেই হত, আচ্ছা তুমি চলে যাও আর দেরী করো না।''

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া সতীশ একেবারে ''মর্গে'' গিয়া উপনীত হইল।

জমাদারকে নিজের পরিচয় দিলে সে মৃতদেহ দেখিতে দিতে কোন আপত্তি করিল না।

কাকার শোচনীয় পরিণাম দর্শনে সতীশের চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই অকস্মাৎ প্রাপ্ত বেদনার আঘাতে তাহাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। অনেক কষ্টে সে আত্ম সম্বরণ করিল।

জমাদার কহিল "বাবু! এই বুড়ো ভদ্দর লোকটার জামার পকেটে এই দেখুন একটা কাঁচের বাক্স ছিল। বাক্সটি ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে, এতে কেবল এই এক টুকরো কাপড় ছিল।" সতীশ ভাঙ্গা বাক্সটা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল। সেই বাদামী রংয়ের জালটুকু তখনও বাক্সের ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু যাহার অসীম যত্নে ও বিপুল অর্থব্যয়ে সেটুকু জাহাজে চড়িয়া সুদূর জাভা হইতে এই ভারতের বক্ষে আনীত হইয়াছিল সে আজ আর এ মর জগতে নাই।

মৃতদেহের সৎকার করিয়া সতীশের বাটী ফিরিতে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের আলোক রশ্মি গবাক্ষের ছিদ্র পথ দিয়া ক্ষীণ ভাবে কক্ষে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শয্যা গ্রহণ করিলেও সতীশের নিদ্রা আসিল না। একটা অভূতপূর্ব্ব চিন্তা ক্রমাগতই তাহার মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় অফিসের কাজকর্ম্ম কতকটা সারিয়া সতীশচন্দ্র টেলিফোনে তাহার "ব্রীফহীন" ব্যারিষ্টার বন্ধু রজনীনাথকে নিমন্ত্রণ জানাইল। যথা সময়ে সতীশের বাসায় ব্যারিষ্টার সাহেবের শুভাগমন হইল। সতীশের "সিগারকেস" হইতে একটা সিগার লইয়া পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া সিগারটী ধরাইয়া ব্যারিষ্টার নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে এত জোর তলব কেন? কেসটেশ কিছু আছে নাকি?"

"হ্যাঁ খুব মস্ত একটা কাজ আছে।"

"খোস খবরের ঝুটোও ভাল কত টাকার কাজ শুনি?"

"তা অনেক— কিন্তু গোড়ায় যদি ঘরথেকে কিছু মূলধন বার করতে পার।" রজনীনাথের হাস্যোজ্জ্বল মুখে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারের মতই একটা অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, মাটিতে মৃদু মৃদু জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে সে উত্তর দিল "সতীশ তুমি ত আমার অবস্থা সবই জান। ঐ মৃজাপুরের বাড়ীখানার ভাড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় আয় নেই। আর এও জান কতগুলি লোকের জীবন সেই ভাড়ার টাকা কটিতে নির্ভর কচ্চে।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু তোমার বাড়ীখানা যদি বেচে ফেল বিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তা থেকে দশ হাজার টাকার সুদে একটু কষ্ট করে সংসার চালাও আর বাকি দশ হাজার টাকায় আমরা একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখি এস।"

চমকিত হইয়া রজনীনাথ বলিয়া উঠিল "কি সর্ব্বনাশ? জুয়া খেলা? সতীশ তুমি বাড়ী ঘর বেচে ডার্ব্বির টিকিট কিনতে চাইচ নাকি?"

"না হে না! এ তার চেয়েও অনিশ্চিত। সেত কেউ না কেউ পাবে, এটা ঠিক শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ আর কি। আগে সবটা শোন তারপর যত ইচ্ছে শিউরোও।"

তাহার মাথার ভিতর যে নূতন খেয়ালটা গজাইয়া ছিল তাহা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া সতীশ বলিল আমাদের এ থেকে হয় রাজা নয় ফকীর হতে হবে। লোকে বলে 'তনুকাকা' পাগল ছিলেন। কিন্তু জীবতত্ত্ব আবিষ্কারে তাঁর কখনও কোন পাগলামী কেউ দেখেনি। নিজের স্বার্থ বুঝতেন না তাই লোকে তাঁকে পাগল বলত। আমার বিশ্বাস আমরা যদি এই পরামর্শ মত চলি তাহলে আমাদের ঠকতে হবে না।"

ব্যারিষ্টার শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তা যদি সত্যি হয়, আঃ চারুকে বিয়ে করবার কোন বাধাই থাকবে না।"

উচ্চ হাসির সহিত বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া সতীশ বলিল "এক যাত্রায় পৃথক ফল ত আর হতে পারে না। সুনীতির অহঙ্কারে ঠাকুরদ্দারিও আমার হাতে নাতনি সম্প্রদানের তাহলে আপত্তি থাকবে না। আর নিজের একখানা কাগজ করে চিরকালের সাধটা মিটিয়ে নিই।"

পূর্ব্ব বর্ধিত ঘটনার এক মাস পরে আষাঢ় মাসের শেষে একদিন একখানা সংবাদ পত্রে একটী নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইল। "ইডেন উদ্যানের উত্তর পশ্চিম কোনে একটি মাকড়সার জালের মত জাল দেখা গিয়াছে। জালটী দেখিতে অনেকটা মাকড়সার জালের মত। কিন্তু তাহার সুতা এত মজবুত, বুনানি এমত যে একটা পাখী পড়িয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই।"

খবরটা এত তুচ্ছ যে সতীশ ভিন্ন আর কেহই বোধ হয় সেটা লক্ষ করে নাই।

সতীশ উদ্যানাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ পাইল যে ঘটনাটী সত্য এবং জালটী এত শক্ত যে ছড়ির আঘাতে ও ছিঁড়িয়া যায় নাই,—আরো আশ্চর্য্য এই যে, যে জাল বুনিতেছে তাহার দর্শন আজ পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল "জালটা কোনও প্রাণী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখান হয়েছিল?"

সাহেব হাসিয়া উত্তর দিলেন "নিশ্চয় বাবু! আমি প্রোফেসর জ্যাকসনকে দেখিয়েছিলাম।"

"কি বল্লেন তিনি?"

"কিছুই না। তিনি বল্লেন, জাল যে বুনছে সে জানোয়ারটাকে ধরে দিলে আমি ভাল রকম বখশীষ করবো। তাকে ধরা ত পরের কথা এ পর্য্যন্ত কেহই চোখে দেখেনি।"

"জালে একটা পাখী পড়েছিল না?"

"হ্যাঁ পাখীটার আওয়াজ শুনেই ত আমি প্রথমে জালটা দেখতে যাই। কিন্তু আমি যখন গিয়ে পৌঁছেছিলুম তখন জালের উপর কতকগুলো পালক আর হাড় কখানি ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পেলুম না।"

প্রায় পনেরদিন পরে "ইডেনউদ্যানে রহস্যের জাল" শীর্ষক সংবাদ পত্রের স্তম্ভগুলো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাস্তাঘাটে বেকার উকীলদের বার লাইব্রেরী ঘরে সৌখীন বাবুদের বৈঠকখানায়, নিষ্কর্ম্মা যুবকদের তাসের আড্ডায়, সখের থিয়েটার পার্টিতে হাটে বাজারে

সর্ব্বত্রই এই এক কথার আন্দোলন চলিতেছিল।

সতীশ বন্ধুকে জরুরী টেলিগ্রাম করিয়া দিল "অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।" শ্রাবণ ভাদ্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে ইডেন উদ্যানের ভৌতিক ব্যাপার লইয়া হুলস্থুল চলিতেছিল। বাগানের এতটুকু স্থানও আর শূন্য ছিল না। প্রতি রজনীতে জালের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়া যাইত। প্রভাতে নব নিযুক্ত ঝাড়ুদারেরা লাঠি ও ঝাঁটা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিত। একরাত্রে ইডেনউদ্যান হইতে গঙ্গার ধারের পশ্চিম দিকের রাস্তাটি একেবারে বস্ত্রাবাসের মত জালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। কেল্লা হইতে একজন অশ্বারোহী সৈনিক সেই পথে যাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনে ফিরিয়া গেল। ভীত অশ্ব কোনমতেই অগ্রসর হইল না।

জালে দেশ ভরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিপুণ অশরীরী শিল্পী এই রহস্যের জালে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এজাল যেন ইন্দ্রজালের মতই লোক চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া সংখ্যার পর সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছে। নির্ম্মাতাদের চোখে দেখা যায় না, তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ শুধু সেই রেশম নিন্দিত অতি সুন্দর লেশের মত বাদামী রংয়ের জাল। বাগানের বা ময়দানের পাখীগুলির আর সাড়া পাওয়া যায় না। গভীব নিস্তব্ধতা চারিদিকে কেমন একটা বিষাদের ছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কাগজ ওয়ালারা বড় বড় অক্ষবে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, "বাগানে আগুন লাগান হউক, নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নানা রকম ঔষধের পিচকারী দেওয়া হউক ইত্যাদি।" প্রায় সকল রকমই করা হইল, কিন্তু একটা অ্যাসিডের শিশি ভাঙ্গিয়া একটী বালকের মৃত্যু ঘটিল। জাল নষ্ট করার যে বড় বেশী প্রয়োজন ছিল তাহা নয়। জাল নির্ম্মাতাদের ধ্বংস করাই এখন প্রধান আবশ্যক।

বরষার গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন ফুরাইল। গৃহাগত প্রবাসী পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ বর্ষণের মত দারুণ গ্রীষ্মের পর ধরণীর তপ্তবক্ষের দীর্ঘকালের তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া শুষ্কতোয়া শীর্ণ নদীগুলিকে কুলে কুলে ভরাইয়া বৎসরের মত সে নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। কৃষককুল আনন্দে গুণগুণ করিয়া গান গাহিয়া লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যাইতেছে; সুবর্ষণে ক্ষেত্র সরস। কেবল চিরপিপাসী চাতক উর্দ্ধমুখে "ফটিক জল" বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অপরিতৃপ্ত পিপাসা বুঝি সমস্ত বর্ষার জলও মিটাইতে পারে নাই। পূজার উৎসবে বঙ্গ মাতিয়া উঠিয়াছে।

সুরক্ষিত, সঙ্গীনহস্ত শান্ত্রী প্রহরীর নিদ্রাহীন চক্ষে ধূলা দিয়া মাকড়সার জাল বড়লাটভবনের উদ্যান মধ্যে দেখা দিল। গড়ের মাঠের বড় বড় গাছের মাথাগুলা বাদামী জালের সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকা পড়িয়া গেল। এই সময় "দিনবার্ত্তায়" একদিন একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। "যেদিন হইতে প্রথম ইডেন উদ্যানে মাকড়শার জাল দেখা গিয়াছিল সেইদিন

হইতে যদি হিসাব ধরা যায় তাহা হইলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে চারিমাসে কোটী কোটী রহস্যপূর্ণ জীবে মহানগরী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি।''

কথাটার যথার্থতায় অনেকেরই মনে বিভীষিকার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রে ঘুমাইয়া অনেকেই শত পদ অথবা সহস্র মস্তক বিশিষ্ট না জানি কিরূপ শরীর শিহরণকারী বিচিত্র জীবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

বড় বড় ''ষ্টীম রোলার'' গুলা অনবরত জাল পরিষ্কার করিতেছিল। একদিন একটা ''ষ্টীম রোলার'' যখন একদিকে জাল ছিন্ন করিয়া অপরদিকে কাজে যাইতেছিল তখন দেখা গেল যে তাহার পশ্চাতে আবার নূতন জাল প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছে। এই সময়ে চালক দেখিল যে মাকড়শাজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্রজীব বিদ্যুৎ গতিতে জালের টানা লইয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে দেখিতে দেখিতে রোলারটা একেবারে জালে ঢাকা পড়িয়া গেল। দূর হইতে দর্শকগণ অবাক হইযা দেখিতেছিল দ্রৌপদ্রীর বস্ত্র হরণের মত কোন সাদৃশ্য হস্ত অনবরত সূক্ষ্মবস্ত্রের স্তূপ যোগাইয়া দিতেছিল তাহার আর শেষ নাই। জালে জড়াইয়া ''রোলার'' তাহার চলৎশক্তি হারাইয়াছিল। চালক অতি কষ্টে বস্ত্রাবাস ভেদ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। বড়লাটের মন্ত্রীসভা মাকড়শার অত্যাচার নিবারণের তত্ত্ব নির্দ্দেশের জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করিলেন, কমিশনারদের মধ্যে একজন হেষ্টিংসে থাকিতেন। একদিন সকালবেল' জানালা খুলিতে গিয়া তিনি দেখেন জানালার আইভিগুলি আতঙ্ককর বাদামী জালের পর্দ্দায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

কাকার কথা যদি সত্য হয় তবেই দেশের মঙ্গল। নচেৎ পরিণাম যে কি ভয়ানক শোচনীয় হইয়া উঠিবে এই চিন্তায় সতীশচন্দ্রের নিজের আর্থিক ক্ষতিকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছিল। বড়লাট ও মন্ত্রীসভা এই মায়া রহস্য হইতে উদ্ধার লাভের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। দিনবার্ত্তার বিপুল ধনের অধিকারী উহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের ধনী সম্প্রদায় উহার সহিত আরো কয়েকটি শূন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তবুও সে জটিল সমস্যা জটিলই রহিয়া গেল। অসাধ্য পুরস্কার লাভের প্রার্থনায় কেইই অগ্রসর হইল না। মেঘনাদের মত অন্তরীক্ষে আত্মগোপন করিয়া অদৃশ্য শরক্ষেপে যে মায়াবী জীব ধরণী বক্ষে ভীতি ও তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহার কার্য্যের এতটুকুও শৈথিল্য দেখা গেল না।

যদি কেহ বেলুন আরোহণে উপর হইতে দেখিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে মহানগরী বক্ষস্থিত নন্দন কাননের দ্বিতীয় সংস্করণ ইডেন উদ্যান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষছায়া স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের মখমল মণ্ডিত বিস্তৃত ময়দান, বহুদূর পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্যাসালোকিত রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাবলীর উপর দিয়া শুধু সূক্ষ্ম জালের আস্তরণ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব লুপ্ত করিয়া দিয়া জালের উপর জাল যেন কোন যাদুকরের যষ্টি স্পর্শে আরব্য রজনীর নিদ্রাতুর রাজপুরীর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ময়দানের কঠিন বক্ষ আর শিশু কণ্ঠের মধুর কলহাস্যে কোমল পদস্পর্শে, সরস,

স্নিগ্ধ এবং মুখরিত হইয়া উঠে না। সে যেন পুরাণ বর্ণিত শাপগ্রস্তা ঋষি পত্নীর মত পরিত্যক্ত পাষাণ খণ্ডে পরিণত হইয়া গিয়াছে। জনহীন রাজপথ শত শত গ্যাসালোক বক্ষে ধরিয়া আর গঙ্গাগর্ভে প্রতিফলিত হয় না।

বাবু মহলে, সাহেব মহলে, উদ্যান ভ্রমণ, বায়ু সেবন ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে এই দারুণ বিভীষিকা জাগিয়া উঠিয়াছে, কে জানে কোনদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া সকালে উঠিয়া তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের নিরাপদ গৃহ কক্ষ ঐ দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে জড়াইয়া গিয়াছে। সকলেই সশঙ্কিত চিত্তে তাহারি জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা একদিন দিনবার্ত্তায় প্রকাশিত হইল "জালের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে মাভৈঃ।" ব্যারিষ্টারের জাহাজ ফিরিয়া আসিল, জাহাজ খানি কেবল হাজার হাজার পাখীর খাঁচাতেই পরিপূর্ণ। সতীশ ও ব্যারিষ্টার লাট সভায় সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য উপস্থিত হইল। সভাগণ তাহাদের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। "দিনবার্ত্তার" সম্পাদকের নিকট কয়মাস পূর্ব্ব হইতেই যে শীলকরা পুলিন্দাটা রাখা হইয়াছিল সেখানি খোলা হইলে সকলেই বিস্ময়েব সহিত পাঠ করিলেন সতীশের ভবিষ্যৎবাণী অনেকাংশে মিলিয়া গিয়াছে।

সতীশ বলিল, যতক্ষণ না দেশের অশান্তি বিদূরিত হয় আমি কোন পুরস্কারই গ্রহণ করিব না। সেই দিন ইডেনের উদ্যানের নিকটে এক বিরাট সভা করিয়া কমিশন ও দেশবাসী সর্ব সাধারণের সম্মুখে পিঞ্জরাবদ্ধ হাজার হাজার পাখীকে মুক্তি দেওয়া হইল। ছোট ছোট তেজস্বী বিদেশী পাখীগুলি মুক্তদ্বার পথে বাহির হইয়া উড়িয়া উড়িয়া নীল আকাশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একজন একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পাখীগুলি কি ঐ মাকড়শার আবাসস্থলটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে?"

সতীশ বলিল "কাকার অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই তাই থাকবে।" অনেকেই অর্থপূর্ণ চাহনীর সহিত মুখ টিপিয়া একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন।

শেষ খাঁচার পাখীগুলি যখন খোলা বাতাসে লঘুপক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল, তখন বিবর্ণ মুখে হতাশা জড়িত কণ্ঠে ব্যারিষ্টার বলিল, "সতীশ, আমাদের বিশ হাজার টাকার শেষ চিহ্নটুকু ও ঐ পাখীটির সঙ্গে উড়ে চলে গেছে। এখন যদি পাখীগুলি আমাদেব আশানুরূপ কাজ না করে তাহলে আমি আজ সংসারে অর্থ ও সম্মান সব হারিয়ে পথে দাঁড়ালাম।" উদ্বেলিত নিশ্বাসটা জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিয়া একটু খানি ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল "আমি ও তাই।"

সতীশ ও ব্যারিষ্টার উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত সময় যাপন করিতেছিল। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি পূর্ব্বের মতই বিনা বাধায় চলিয়া যায়। কোন নূতন আশা কোন নূতন সংবাদ কিছুই নাই। "দিনবার্ত্তা"র প্রতিদ্বন্দ্বী "সত্যবাদী"তে প্রফেসর জ্যাকসনের ইংরাজী হইতে অনুদিত অনেক প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল। সবগুলিই প্রায় বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় সতীশের পাগলামীর বিষয়ে ঠাট্টা করিয়া, দিনবার্ত্তাকে গালি দিয়া, দেশবাসীকে নির্ব্বোধ এবং হুজুগ প্রিয় প্রতিপন্ন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মুখ আবার বিপরীত দিকে ফিরিল। একদিন এক পক্ষীশিকারী একটী হাতুড়ী চড়াই শিকার করিয়াছিল। পাখীটার পেট চিরিতে দেখা গেল সদ্য ভক্ষিত মাকড়শার ন্যায় অদ্ভুত এক জাতীয় নূতন জীব তখন ও তাহার উদর গহ্বরে যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংবাদটি দেখিতে দেখিতে সংক্রামক রোগের মত সমস্ত সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। মন্ত্রীসভা তখনি "হাতুড়ীচড়াই" মারা আইন বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া নূতন আইন প্রচার করিলেন, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে পাখীগুলির কার্য্য খুব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। জালের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। কোথাও ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া আছে, কোথাও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে, কোথাও স্থানচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে। হেষ্টিংসে খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি হইতে বড়লাট সাহেবের বাটীর নিকট পর্য্যন্ত যে জটিল রহস্যজাল আপনার অসীম ক্ষমতার বিজয়নিশান উড়াইয়াছিল—দেখিতে দেখিতে যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়ামুষ্টির আঘাতে তাহা ভূলুণ্ঠিত হইয়া খসিয়া পড়িল। ছেঁড়া জালগুলা ময়লার গাড়ীবোঝাই করিয়া ধাপার মাঠে পুঁতিয়া ফেলা হইল। পলাতক বড়লোকেরা আবার কলিকাতায় আসিয়া প্রচার করিলেন, কলিকাতার জল বায়ু এবং কলের ধোঁয়া, গ্যাসের আলো তাঁহাদের শরীর ঠিক বরদাস্ত না করায়, তাঁহারা এইবার মধুপুর, দেওঘরে বায়ুপরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। যাঁহা দিগের হঠাৎ বহুদিনের বিস্তৃত প্রায় পল্লী-জননীর কথা অসময়ে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাঁহারাও চিরদিনের সংস্কার ও সুবিধা ছাড়িতে না পারিয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিলেন। দেশ নামক জঙ্গলে যদিও ব্যাঘ্র ভল্লুকের উৎপাত নাই সত্য, তবু অসহনীয় রক্তলোলুপ মশক এবং নধরকান্তি শোষক ম্যালেরিয়া উভয়ই বর্ত্তমান। অগত্যা বুদ্ধিমানের মত "যঃ পলয়তি সঃজীবতি" এই মহাবাক্যে অনুসরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পাপমুক্ত দিব্যাঙ্গনার মত ইডেন উদ্যান আবার নূতন শোভায় ফলে ফুলে পত্রবৈচিত্র্যে লোকচক্ষে পরম রমণীয় শোভনীয় হইয়া উঠিল। কণ্ঠিপরা, ঝুঁটিবাঁধা উড়িষ্যাবাসীর দল আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বাগানের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিল।

সতীশ ও ব্যারিষ্টারের নাম গৌরবের সহিত চারি দিকে উচ্চারিত হইতে লাগিল। ব্যারিষ্টারের কার্য্যের পক্ষে এটা বিশেষ শুভযোগ বলিতে হইবে। আজ কাল আর বার লাইব্রেরী ঘরের কড়ি গণনায় অঙ্ক বিদ্যার অনুশীলন করিয়া শুষ্কমুখে শ্লথগতিতে শূন্য পকেটে তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরিতে হয় না। এখন তাঁহার সময়ের অনেক মূল্য। চঞ্চলা রমা সতীশের প্রতিও কৃপাকটাক্ষপাতে কৃপণতা করেন নাই। পুরস্কারের অর্থত তাহারা পাইয়াছিল। তাহার পর স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর তাহাকে ডাকিয়া ডেপুটীর পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, সতীশ বিনীত ভাবে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিল। সে এখন দিন বার্ত্তার অর্দ্ধেক অংশীদার ও জগতের মধ্যে সুখী লোক, কারণ সে এখন সুন্দরী, শিক্ষিতা তাহার ঈপ্সিতা সুনীতিবালার স্বামী।

উপসংহারে সেই পাখীগুলির কথা কিছু বলা উচিত। জগতে যে সকল মহাপুরুষ পরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা শুধু অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিয়াই চলিয়া

যান। পাখীগুলি পক্ষীরাজ্যের মহাপুরুষ কি না বলা যায় না। তাহারা রাজধানীর বিভীষিকা নাশ করিয়াই ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। তাহাদের আবির্ভাব যেমন অতর্কিত, অন্তর্দ্ধানও তেমনি অপ্রত্যাশিত। কিন্তু রাজধানীর বক্ষে মুক্ত আকাশের তলে বাস করিয়াও তাহারা আহারাভাবে মৃত্যুকে বরণ করিল। এ কলঙ্ক কলিকাতাবাসীর চিরদিনের জন্য ঘুচিবে না।

অনেক কষ্টে একটী পক্ষীধৃত হইয়াছিল, সেটিকে যত্নের সহিত ''জুতে' রাখা হয়। পাঠিকারা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কলিকাতা ''জু'' বাগানে ''হাতুড়ী চড়াই''য়ের শূন্য খাঁচাটি পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ বিরাজিত থাকিয়া দর্শকদের চিত্ত সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞতা'য় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

'সুপ্রভাত'— ১৩১৯ সন্

জমীর মালিক

সরোজবাসিনী গুপ্ত

অগ্রহায়ণ মাস হিমার্দ্র শীতের প্রথম স্পর্শে ধরণী কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির বিশাল বক্ষে মুমূর্ষুর মৃত্যুর মত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরা উপশিরা কেমন এক জড়তাময় সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আজিকার প্রভাত জননীর সেই সুখচ্ছায়াতেই যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, এমাম মণ্ডলের ক্ষুদ্র কুটীরখানির ভাঙা মটকা দিয়া শীতের সূর্য্যালোক তার স্ত্রী সুন্দরী জেলেখার রোগ-পাণ্ডু যন্ত্রণা শীর্ণ মুখখানির উপর পড়িয়া ঝিল ঝিল করিতেছে। আলোক স্পর্শে এমামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া গাত্রের ছিন্নকন্থার প্রান্তখানি জেলেখার গায়ে চাপাইয়া দিয়া সে উঠিয়া পড়িল। প্রভাতের অমল সূর্য্যালোক জেলেখার বদনমণ্ডল কি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এমাম বুঝিল ইহা অপেক্ষা কঠিন শুভ্র পদার্থখণ্ড না হইলে এমন করিয়া জেলেখাকে সে আর একটী দিনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া মুখে চোখে জল দিয়া এমাম বাগানের দিকে চলিয়া গেল। জেলেখা তখন ও ঘুমাইতেছিল।

স্কন্দ ভূমির উপর গোটা কয়েক খেজুর গাছ এমামের হতাশ জীবনে মৃদু আশা ধারার ন্যায়, মাটীর ভাঁড়গুলায় কিঞ্চিৎ রস ঢালিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমাম ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলো ঢালিয়া লইয়া একটা উনান জ্বালিয়া গুড় চড়াইয়া দিল। আগের দিন সে একটা ভাঁড়ের প্রায় অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া গুড় তুলিয়াছে, অদ্য সেইটুকু পূর্ণ করিয়া দিলে তবে তার পূর্ব্বদিনের খরিদ্দার এখনি তার হাতে টাকা দুই দিয়া গুড় লইয়া যাইবে। তাহা হইতেই সে ডাক্তারের ভিজিট এবং ঔষধ ও পথ্য খরচ করিয়া জেলেখাকে বাঁচাইবার উপায় পাইবে।

এমাম নিষ্পাপ চরিত্রের আত্মনির্ভরযুক্ত বলিষ্ঠ যুবক। বৎসরের মধ্যে প্রায় একটা দিনও সে বিনা পরিশ্রমে কাটায় না এবং জেলেখাও বুদ্ধিমতী, স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে স্নেহময়ী গৃহিণী। তথাপি তাহাদের অর্থকষ্ট একদিনের জন্যও কমে নাই। লোকে বলিত— "এমামটা লক্ষীছাড়া চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই আছে কেবল এক সুন্দরী স্ত্রী," কিন্তু তাহারা জানিত না যে এই সুপ্রসন্না সুন্দরী স্ত্রীতেই তার জগতের তার জীবনের তার সংসারের আর সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিত।

এমামের গুড় তোলা হইয়া গেল, খরিদ্দার আসিয়া তার সম্মুখে টাকা দুইটি রাখিয়া তামাক খাইতে বসিয়াছে। এমাম সতৃষ্ণ নয়নে টাকা দুইটির পানে চাহিতে চাহিতে বাগানের কার্য্য শেষ করিয়া লইতেছে—তার অন্তরে আজ অসীম বল, জীবন সমুদ্রে তাহাকে এখনি সাঁতার দিতে হইবে।

সহসা তার জমিদার স্বয়ং আসিয়া তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এমাম ওই নূতন গুড়খানা খাজনার বাব্দ আমায় দে, আজ আমার মেয়ে বিয়ে।" ক্ষণিক এমামের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না কারণ সে অত্যন্ত গরীব বলিয়া তার জমিদার অনেকটা সুলভ করিয়া তার খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাহাকে ও তাঁর কাছে

যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও বাধ্য থাকিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে যখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইল আজ ওই টাকা দুইটীর উপর জেলেখার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, চিকিৎসা করাইতে আর একটা দিন ও নষ্ট করিলে জেলেখা বাঁচিবে না, তখন সে বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে অতি কাতর অনুনয়ে তাঁহাকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া বলিল। আজিকার গুড়খানি কিম্বা তার মূল্য জমীদারের কাছে ভিক্ষা স্বরূপ চাহিল।

"ওরে আমার মেয়ের বিয়েতে বড় খরচ হয়ে যাচ্ছে, তুই আর একখানা গুড় করে বেচে নে," জমিদার স্থির হাস্য ও দৃঢ়স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—তাঁর ইঙ্গিতে ভৃত্য ও তার পিছনে পিছনে গুড় লইয়া চলিয়া গেল। তামাক বন্ধ দিয়া খরিদ্দার ও সঙ্গে সঙ্গে টাকা দুইটি তুলিয়া লইয়া নীরব বিষণ্ণ মুখে প্রস্থান করিল। এমাম দুই হস্তে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল তার সর্ব্বাঙ্গে এমন এক অবসন্নতা আসিল যে,—বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, জেলেখার উপস্থিত অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিলেও সে নিজেকে এক আঙ্গুল সরাইয়া বাড়ীর দিকে যাইতে সাহস করিতে পারিল না। যখন পারিল তখন বেলা অপরাহ্ন এক ধরণী ভয়ানক নিরুদ্যম এবং কঠোর।

এমাম ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, জেলেখা তখনও ঘুমাইতেছে। কাছে আসিয়া দেখে জেলেখা ঘুমাইতেছে, বড় ঘুম গভীর ঘুম, চির অজাগ্রত ঘুম, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। উন্মত্তের মত জেলেখার মৃত অঙ্গের উপর আছড়াইয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাছেই শূন্য জল পাত্র পড়িয়াছিল, জেলেখার মৃত অসার হস্তখানি সেই দিকে প্রসারিত। তার চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইল। অনুশোচনায় সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ঔষধ পথ্য ত দূরের কথা তার শেষ তৃষ্ণ জিহ্বায় এক বিন্দু জল সে দিতে পারিল না। উঃ কি ভীষণ ভুল। হা খোদা। এমন ভীষণ ভুল করিয়া কি মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? জীবনের সমস্ত সঙ্গী হারাইয়া একমাত্র এই ভুলকে সঙ্গী করিয়া? অপরাহ্ন ধীরে ধীরে তমসাময়ী প্রদোষের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। তার প্রান্ত নিঃশ্বাসে এমামের বক্ষ পিঞ্জরে কিসের একটা দুরন্ত কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া ঝটপট করিতে লাগিল। সে উঠিয়া নীরবে মাতালের মত টলিতে টলিতে জমিদারের প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিল। একমাত্র কন্যার পুত্রতুল্য পাত্রে বিবাহ, জমিদার তাহারই তত্ত্বাবধানে ও সুব্যবস্থায় ব্যস্ত; এমন সময়ে এমাম আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, মলিন বস্ত্র পরিহিত রুক্ষ চুল শুষ্ক মুখ-সে মূর্ত্তি জমিদারের চোখে নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া তিনি বলেন—"কি এমাম কি চাও।" কম্পিত কণ্ঠে এমাম উত্তর করিল—"দু গণ্ডা পয়সা হুজুর। জমির মালেক। সকাল বেলা গুড়খানা দিয়েছি তার বহনি করিব।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জমিদার বলিলেন—"এই নাও।" এমাম পয়সা কটী কুড়াইয়া লইয়া একটা আফিমের দোকানে ঢুকিল। দোকানদার বলিল "আফিম কি করিবে? আমার স্ত্রী পেটে ব্যথা ধরেছে খেলে কমিবে"

তীব্রতায় এমামের চক্ষু রক্তবর্ণ।

অন্ধকার রাত্রের অদৃশ্য কল্পনায় এমামের বিষদগ্ধ অঙ্গ ভরিয়া জেলেখার হিমশীতল অঙ্গখানি অদ্ভুত বিহ্বলতা দিতে লাগিল। স্বীয় ক্ষুদ্র কুটীরে রজনীর স্নিগ্ধ তিমিরে পড়িয়া এমাম ছটফট করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আবার প্রভাতোদয় হইয়া গেল, আবার সেই ভাঙা মটকা দিয়া সূর্য্যের স্খলিত জ্যোতিঃ আসিয়া সৃষ্টির বিচিত্র রঙ্গ রূপের মিলন কুটীর খানি দৃশ্যময় করিয়া তুলিল। তালসাপ্লুত কণ্ঠে এমাম বলিয়া উঠিল ''খোদা খোদা, একি ভুল করাইলে প্রভু। কেন আমি পার্থিব শুভ্রতা দিয়া দারিদ্র মালিন্য দূর করিতে গিয়াছিলাম। প্রভু আমার তোমায় অপার্থিব ও জ্যোতিঃ দিয়া আজ আমার জীবনের সে মহা-কালিমা দূর করিয়া দাও।''

সহসা বাহিরে কিসের একটা গোলযোগ শ্রুত হইল, কি এক অজানা আকাঙ্খার কম্পিত চরণে আসিয়া এমাম ক্ষুদ্র দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। সম্মুখে পথ দিয়া জমিদারের নব বিবাহিতা কন্যা যথোপযুক্ত উৎসব সহকারে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। চতুর্দ্দোলাসীনা জমিদার কন্যার পার্শ্ববক্র চক্ষু এমামের গৃহের দিকে রক্ষিত। জমিদার ক ন্যা এমামকে চিনিত এবং এমামের দুরবস্থাপন্ন গৃহস্থালি সে বিশেষ একটা কৌতুক ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়াই দেখিত। তাই আজও তার বালিকাচিত্ত এই এক চঞ্চল সুখে মুগ্ধ হইতে ছিল। সাভরণা সুখপষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী জমীদার কন্যার মধ্যে এমাম দেখিতে পাইল যেন তার অঙ্গভেদ করিয়া বস্ত্রালংকার ভেদ করিয়া জেলেখার অস্থিমজ্জা রক্ত কান্তি কুটিয়া কুটিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এমামের চক্ষু জড়াইয়া আসিল, দূরে খর্জ্জুর কুঞ্জের মধ্যে হইতে প্রভাতের পাখিকূল স্বর্গের আবাহনের মত তাহার রুদ্ধপ্রায় শ্রবণযুগলে স্বপ্নের বীণা তারের মত আঘাত করিয়া গাহিয়া উঠিল। কি এক অনন্ত স্মৃতি দীপ্তিতে, সে ক্ষুদ্র দাওয়ার উপরে এমামের প্রেম-তৃষ্ণ জীবানুকূল বিষ বিজীর্ণ দেহখানি মৃত্যু সমুদ্রে ভাসমান হইল, আঁখি তারা দুটি চিরদিনের মত বুজিয়া গেল। মহেশ্বর গ্রামের ক্ষুদ্র অংশ ভিক্ষু এমাম আজ অনন্ত রাজ্যে আশ্রয় পাইল। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে স্থান পাইল। জননীর বুক ভরিয়া উঠিল।

'অর্চ্চনা'—১৩২০

পিঞ্জরের বাহিরে

সত্যবাণী গুপ্ত

ভাই ললিতা,

অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাই নি: আমিও তোমায় চিঠি লিখতে পারি নি। আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে; আমি অনেক রকম নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেই সমস্ত খবর তোমায় ছাড়া আর কাকেই বা বলি? তাই তোমায় সব কথা খুলে বলবার জন্যে মনটা আমার ব্যাকুল হয়েছে।

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মা, আর ছোট ভাই-বোন দুটির অভিভাবক আমিই। এখন বুঝতে পারছি মেয়েমানুষ বাস্তবিকই অবলা। কবিরা তাদের লতার সঙ্গে তুলনা করে—সদাই দুর্ব্বল, পর নির্ভর; একটু তাত্ লাগলেই আম্‌লে নেতিয়ে পড়ে, একটু আঁচ লাগলেই মুষড়ে যায়, একটু ধাক্কা খেলেই ধুলায় লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আমি তাদের নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করি—তটের বন্ধনেব মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তার গতি শোভন সুন্দর, ততক্ষণই প্রাণের ও প্রাচুর্য্যে, আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের হাস্যধারা; ততক্ষণই তার সম্মুখে অনন্তের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা; কিন্তু যেই সে কুল ছাড়িয়ে উপচে ছড়িয়ে পড়ে, অমনি সে নিজেকে ত হারায়ই, পরকেও ডোবায়,—চারিদিককার আনন্দ, সৌন্দর্য্য, প্রাণের খেলা নষ্ট ভ্রষ্ট করে ফেলে। এমনই অক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মেছি, বিশেযত এই বাংলা দেশে। আমাব মতন এমন একজন অক্ষমার ঘাড়ে একটি অসহায় সংসারের ভার ভগবান চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম কবতে হবে, পরের উপর নির্ভরের আশা ছেড়ে পরের ভর সইতে হবে!

অন্নের সন্ধানে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে। কিন্তু কোথায় অন্ন, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয়, আমি কি ছাই জানি? আমরা অন্নপূর্ণা ততক্ষণই যতক্ষণ পুরুষেরা অন্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখে। আমরা চিরকাল পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থাকি, যারা আমাদের পোষে তারা তাদের খেয়াল-মত যখন খুসি একটু ছাতু ছোলা দুধ জল দিয়ে যায়, আর আমরা দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে শিশ দিয়ে গান কবি আর গানের সমের সঙ্গে চুনকুড়ি দি। পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থেকে প্রাণটা যে হাঁপিয়ে না ওঠে এমন নয়; শিকের ফাঁকে ফাঁকে মুক্ত আকাশের নীল চোখের ইসারা আর তরুপল্লবের হাতছানি দেখে মনটা খুবই উড়ু উড়ু করে। কিন্তু কোনো দিন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও উড়তে সাহস হয় না, বুক দুরদুর করে, পাখা যেন অবশ হয়ে আসে। যিনি আমাদেব খাঁচার মালিক, তিনি যদি কোনো দিন দয়া করে' খাঁচার দরজা খুলে ধরে' উড়ে যেতে বলেন তখন মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। ভয় হয় অত বড় ফাঁকা জায়গায় আমি এতটুকু ভীরু প্রাণী কোথায় পাব একটু আশ্রয়, আর কোথায় পাব ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল। অপরিচয়ে সোজা পথটাকেও বাঁকা লাগে, নিরীহ জিনিসটাকে দেখেও ভয় লাগে, স্বাভাবিক ঘটনাকেও বিপদের সূচনা বলে আশঙ্কা হয়। তাই যদি কোনো দিন আমাদের মালিকের অভাব হয়

অমনি আমরা পিঁজ্‌রের ভিতর বসে বসে ঠায় শুকিয়ে মরি, বাইরে বেরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেও পারিনে।

আমি ভাই, অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি, বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়েই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় লেগেছিল ঐ পুরুষগুলোকে দেখে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের সঙ্গে ত আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। বাপ-খুড়োদের কোলেই আমরা জন্মাই, আর ভাই-ভাইপোদের আমরা কোলেই পাই; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের পাতাতে হয় না। পরিচয় পাতাতে হয় যে-একটি অচেনা লোকের সঙ্গে, তাকে দেখে প্রথম-প্রথম ভয় লাগলেও সে একলা বলে' সাহস থাকে। কিন্তু একেবারে পুরুষের হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাদের দশাটা হয় সিংহের খাঁচার মধ্যে রোমান্ গ্লাডিয়েটরের মতন— যত বড়ই বীর আর সাহসী হোক, মৃত্যু তার অনিবার্য্য, পরাভব তার জানা কথা। আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে যে সেকালের রাজকন্যারা কেমন করে' স্বয়ম্বর-সভায় নিজেদের বর বাছাই করতে যেত। ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত না? দাড়ি আর চৌগোঁপ্পা চুমরে চারিদিকে আমিষ-লোলুপ মার্জ্জারের মতন অতগুলো পুরুষ প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাছাই কর্‌ব কাকে? ভয়ে লজ্জায় সেদিকে তাকাতেই ত পারা যাবে না! অথচ তারা প্রত্যেকে লোলুপ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই আছে! আমার ত মনে করতেই গা শিউরে ওঠে! সত্যি ভাই, পুরুষগুলো কি বিচ্ছিরি করেই যে তাকায়!

আমি শেয়ালদা ষ্টেসনে টিকিট বিক্রী করবার একটা চাকরী পেয়েছি। সামান্য মাইনে। রোজ ত আর গাড়ী করে আপিসে যেতে পারিনে, কাজেই ট্রামে করে' আপিসে যেতে হয়। যেদিন ভাই প্রথম ট্রামে করে'আপিসে যাব বলে' বেরুলাম, সেদিন মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা অন্তর্য্যামীই জানেন। ফাঁসীকাঠে চড়বার সময় মানুষের মন বোধ হয় এমনি করে।—পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠোঁট শুকিয়ে উঠছিল, মুখ অকারণ লজ্জায় কেমন ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে পড়ছিল, বুক দুরদুর করছিল। আমি জোর করে'ত নিজেকে এক রকম টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম থামবার থামের কাছে ফুটপাথের ধারে রাস্তার দিকে মুখ করে' দাঁড়ালাম।

পথিক পুরুষদের মধ্যে অমনি একটা চঞ্চলতার ঢেউ জেগে উঠ্‌ল। ভাগ্যিস্ ভগবান মাথার পেছন দিকে চোখ দেননি। সামনে পেছনে পুরুষদের বাঁদরামি লক্ষ্য করতে হলে একেবারে ক্ষেপে উঠতে হ'ত। একদিকে যে অনেকখানি অদেখা থেকে যায় সেটা মস্ত বাঁচোয়া!

ট্রামে উঠেও কি ছাই নিস্তার অছে? আমি ট্রামের পাদানে উঠ্‌বামাত্রই ট্রামযাত্রী পুরুষগুলো অমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, আমি কোন্ কামরায় না-জানি ঢুকি।

পুরুষগুলো ভাই এমনই হাস্যকর জীব যে তাদের দেখে আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে; তার ওপর আবার ওরা নানান্ রকম ভঙ্গী করে লোক হাসায় যে কেন তা বলতে পারি নে।

প্রথম নজরেই তাদের বিকট মূর্ত্তির বিচিত্র রূপ ভারি কৌতুককর মনে হয়। কারো

মুখে গোঁপদাড়ির নিবিড় জঙ্গল, তার ভেতর চোখ দুটো বনবিড়ালের মতো ওত পেতে বসে থাকে। কারো দাড়ি কামানো, শুধু গোঁপ জোড়া একজোড়া ঝাঁটার মতো মুখের দরজার মোটা কপাট জোড়ার ওপর ঝোলানো রয়েছে, যেন কুনজর না লাগে। কেউ বা দাড়িগোঁপ সমস্ত চেঁছেছুলে নির্ম্মূল করে' আমাদের মুখের অনুকরণ করতে চায়—কিন্তু চাষাড়ে চেহারা শুধু দাড়িগোঁপ কামালেই বা মোলায়েম হবে কেন? কাউকে কাউকে মন্দ দেখায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই মাকুন্দ মতন বিশ্রী লাগে। কারুর বা দাড়িগোঁপ দুই ছাঁটিয়া মাফিকসই করিয়া রাখা—তাদের তত মন্দ লাগে না। পুরুষ বেচারারা দাড়িগোঁপগুলো নিয়ে যেন মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে, ঠিক করেই উঠতে পারছে না জঙ্গলমহাল রাখবে, ছাঁটবে, না কাটবে!

তারপরে মাথার টেড়িরই বা কত রকম রূপ। তোলা, লতানো, ঢেউখেলানো, কোঁকড়ানো; সিঁথি মাঝে, ডাহিন দিকে, বাঁ দিকে; কারুর সারা মাথায় টাক, সামনের দুটিখানি পাতলা চুলেই টাক ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় টেড়ির ক্ষীণ আভাস দেখা যায়; কাহারো মাথার সামনে টেড়ি, পশ্চাতে টিকি! এই দৃশ্যটি দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে অসভ্যগুলোর মধ্যে আমিও আর একটু হলে অসভ্য হয়ে পড়তুম।

পোষাকেরই বা কত রকম বিচিত্রতা। ওরা এখনো ঠিক করতেই পারেনি কেমন সজ্জা ওদের ঠিক মানায়। কারো পূরো দস্তুর সাহেবী সজ্জা—কিন্তু পাজামাটা হয়ত সরুঙ্গে, কোটটা ঢলঢলে, টাইটা বাঁকা, কলারটা শার্ট ছেড়ে ঠেলে উঠে পড়েছে, হ্যাটটা কতকেলে পুরোণো ময়লা—তবু সাহেব সাজতে হবে! কারো ধুতির ওপর চাপকান, তার ওপর চাদর, মাথায় কিছু নেই; কারো গায়ে কোট, কারো শার্ট, কারো পিরান। কারো জামা ঘামে তেলে একেবারে জরে উঠেছে, দুর্গন্ধে কাছের লোককে অতিষ্ঠ করে তুলছে, ছেড়ে ধুতে দেবার ভাড়া নেই; কারো জামার কাপড়ে পানের পিক ছিটিয়ে পড়েছে, কানে-গোঁজা দাঁতখোঁটা খড়কের মুখে চিবানো পানের কুঁচি আর ছোপ লেগে আছে। ওরই মধ্যে দুএকজনকে বেশ ভদ্রলোকের মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও দুটি শ্রেণী আছে—এক একেবারে ফুলবাবু, আতিশয্যে উগ্র; অপর শ্রেণী সাদাসিধে, বেশ শান্ত-দর্শন।

ট্রামে যখন উঠি তখন একটু সরে বসে আমায় একটু জায়গা দেওয়া যে দরকার, এ বোধটাও পুরুষ বর্ব্বরদের থাকে না, সবাই হাঁ করে' দৃষ্টি দিয়ে যেন আমার গিলতে থাকে; আমি যেন সদ্য চন্দ্রলোক থেকে নেমে এসেছি। ওদের চোদ্দ পুরুষে কখন যেন মেয়ের মুখ দেখেনি। পুরুষগুলোর তখনকার সেই গদগদ আত্মবিস্মৃত চঞ্চল ভাব দেখলে আমার সেকালের স্বয়ম্বরসভার একটি পরিষ্কার ছবি মনের সামনে ফুটে ওঠে। কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় একটুও যে অত্যুক্তি করেন নি, তা আমি এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি।

লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে জায়গা করে যদি বসা গেল, তবেই যে নিস্কৃতি পাওয়া গেল তা নয়; পরে যারা ট্রামে চড়তে আসে তাদের মধ্যেও নানা রকম মনস্তত্ত্বের খেলা

দেখতে পাওয়া যায়।— কেউবা যে কামরায় আমি থাকি ঠিক সেই ভরা কামরাতেই ভিড় বাড়াতে আসে, অন্য কামরা খালি থাক্‌লেও সেদিকে যেতে চায় না; কেউবা সামনের কামরায় উঠে এমন জায়গা বেছে নেয় যেন ঠিক আমার সামনাসামনি মুখোমুখী হয়ে বসতে পারে; কেউবা ঠিক পিছনের কামরায় উঠে ঠিক আমার পিঠের কাছে বসে' নানান ভঙ্গীতে হেলান দেবার দুশ্চেষ্টা করতে থাকে; কেউবা গাড়ীতে উঠেই এমন একটা অতিসম্ভ্রমের তটস্থ ভাব দেখিয়ে ছিট্‌কে তফাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে, যেন স্ত্রীজাতিটার প্রতি তাঁরা এমন অতিসম্ভ্রমশীল যে প্রায় উদাসীন বল্‌লেও হয়— যেন এক-একটি শ্রীচৈতন্যের অবতার! তাদের সেই অশোভন ব্যবহার দেখে আমার হাস্যসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অতি ব্যাপারটাই যে খারাপ! যারা অসম্ভ্রম প্রকাশ করে তারা যেমন পুরুষচরিত্রের বর্ব্বরতার একটা দিক্ অতিসম্ভ্রমশীলেরাও তেমনি ভণ্ডামির আর-একটা দিক প্রকাশ করে মাত্র! কদাচিৎ দু-একজনকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নারীকে দেখতে যে তাদের ভাল লাগে, নারীর সঙ্গ যে তাদের মধুময় লাগে, তা লুকোতেও চেষ্টা করে না, অথচ কদর্য্য অশোভন ভাবে প্রকাশও করে না,—তারা নারীকে ভালও বাসে, সম্ভ্রমও করে। এমন একটি পুরুষের কথা পরে বলব, সে লোকটিকে আমার লেগেছে ভাল। ভাল লেগেছে শুনে তুমি হাস্‌ছ বোধ হয়? কিন্তু ভাল-লাগা ভাল-বাসা নয়, এটা আমি আগে থাক্‌তেই তোমায় বলে রাখছি।

ট্রামে চড়বার সময় যেমন, নামবার বেলাও তেমনি আমাদের দেখে পুরুষদের অশেষ রকম লীলা-চতুরতা প্রকাশ পায়। কেউবা আমার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার পায়ের ওপর দিয়ে কোঁচার ফুলটি বুলিয়ে চরণ ধুলির নিছনি নিয়ে যায়।

আমি যখন নামি তখনও ওদের নানারকম লীলা লক্ষ্য করি। আমি নেমে গেলে সকল জানলা থেকেই মুখ ঝুঁকে পড়ে, দেখতে চায় আমি কোন্ পথে কোথায় যাই— আমার চারিদিকে যেন একটা মস্ত রহস্য জড়িয়ে আছে, সকলেরই চেষ্টা উঁকি মেরে সেই লুকানো কাহিনীটা জেনে নেবে।

পুরুষগুলো যে অমন তার জন্যে প্রকৃতিই দায়ী। প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিগুলোকে প্রকৃতিস্থ কর্‌তে পারেনি বলে' বেচারাদের ওপর করুণা হয়, রাগ করা চলে না। বিশেষ ত আমাদের দেশের পুরুষদের ওপর। বেচারীরা অপরের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মুখ ত কখনো দেখতে পায়ই না, নিজের স্ত্রীরও যে খুব বেশী পায় তাও ত মনে হয় না। দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি লোলুপতা ত স্বাভাবিক!

পুরুষ যে নারীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী ও মনোযোগী এতে নারীরা মুখে পুরুষের ওপর যতই চটুন, মনে কিন্তু বেশ সন্তুষ্টই হন; কারণ তাঁরা যে বন্দিতা, আরাধিতা, এ কথা জান্‌লে খুসি হওয়া স্বাভাবিক। আমি যে খুসি হই তা আমি স্পষ্টই স্বীকার করছি। পুরুষেরা যে আমাদের অতটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম দেখায় তার আর-একটা কারণ আমার মনে হয় যে, তারা প্রবল; আমরা দুর্ব্বল, তারা আশ্রয় আমরা আশ্রিতা; সংসারের সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করে' আপোষ মীমাংসা করে' চলতে হয় বলে' তাদের একটা সহ্যগুণ আর

ভদ্রতা চরিত্রগত হয়ে গেছে বলেও কতকটা। এটা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি যখন আর-একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু সে যদি পুরুষ হত তা হলে আমাকে দেখতে পেয়েই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। পুরুষের এই ভদ্রতা যে শুধু আমাদেরই বেলায়, তা নয়; সে স্বজাতির প্রতিও যথেষ্ট খাতির দেখিয়ে চলে। যেখানে অনেক অপরিচিত মেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে গা ঠেকলে কি কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষা থাকে না; যার ত্রুটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা ঘটেছে সেও ক্ষমা কর্‌তে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে কোন্দল বাধিয়ে কলরব করতে লেগে যায়। কিন্তু ট্রামে আকসারই দেখি, একজন পুরুষ হয়ত অপরের পা মাড়িয়ে ফেললে, কিংবা অপরের গায়ে টলে পড়ল, তাতে সে ব্যক্তি শুধু একটি নীরব নমস্কার করলেই সকল গোল মিটে যায়। এক বাড়ীতে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক থাকলে ঝগড়াব চোটে চালে কাগ চিল বসতে পারে না; কিন্তু এক মেস নিঃসম্পর্ক পুরুষ দিব্য বনিবনাও করে' মানিয়ে সাম্‌লে থাকে দেখা যায়। এত যে তারা ভাল মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে ভাব কবে থাকে, মাঝখানে একটি মেয়েলোক এসে পড়লে আর তখন ভাব থাকে না—ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারে না। বাস্তবিক মন আর ঘর ভাঙাতে স্ত্রীলোক যত পটু, পুরুষ তেমন নয়। সে বিষয়ে রমণীর কুখ্যাতি একেবারে জগৎ-জোড়া! মেয়েরা স্বজাতিকে সুনজরে ত দেখেই না, পুরুষকেও যে খুব খাতির করে' চলে তাও নয়। যতটুকু দয়া সে যেন অনুগ্রহ, ক্যাঙলাকে একটু তাচ্ছিল্যের দান! এতে আমাদের কিন্তু ভাল আছে—পুরুষগুলো আমাদের কাছে চিরকালই ভিখারীর মতন অবনত হয়েই পড়ে থাকে— কিন্তু গৌরব নেই।

তারা অতৃপ্ত বলেই আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, তাদের জীবনের সম্বল; আমাদের একটু দেখতে পাওয়া, একটু মিষ্টি কথা শোনা, তাদের পরম লাভ বলে মনে হয়। দুজন আলাপী পুরুষ এক সঙ্গে মিলেছে কি অমনি আমাদেরই কথা। মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকটা অংশ যে গোপন রাখা দরকার, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুও ঐ গোঁয়ারগোবিন্দগুলোর ঘটে নেই। রবিবাবু যে তাঁর স্বজাতির জবানীতে স্বীকার করেছেন যে—

"আমরা মুর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!"

সেটা কবির অত্যুক্তি একটুও নয়, একেবারে খাঁটি স্বরূপোক্তি। ওদের ব্যবহার দেখে লজ্জা যেন লজ্জা পেয়ে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু আমি লজ্জায় মারা যাই। ওরা যদি কোথাও বেশ সহজ হতে পেরেছে! ওরা রেল-ষ্টেসনে টিকিট নেবার ঘুল ঘুলগুলি দিয়ে এমন হাঁ করে' তাকিয়ে থাকে যে, ট্রেন ছেড়ে যাবে, কি কেউ পকেট কাটবে, তার খেয়ালই থাকে না। অনেক বাবুকে দেখি আমার হাত থেকে টিকিট কিনে নোট-ভাঙানি টাকা পয়সা ফেরত নিতে ভুলে যান। মুর্খগুলো জানে না যে ওতে ও দের আমরা ঘৃণাই করি।

পুরুষদের আর একটি ভারি মজা দেখি যে তারা আমাদের কোনো একটু তুচ্ছ কাজ করে' দিতে পেলে যেন বর্ত্তে যায়। আমার সঙ্গে যদি কোনো দিন কিছু জিনিসপত্তর থাকে,

তা হলে আমি নামবার সময় অন্তত চতুর্ভুজ উদ্যত হয়ে ওঠে; তার মধ্যে যে ভাগ্যবান্ আমার সেবা করবার অধিকার পায় তার তখনকার কৃতার্থ মুখের ভাব, আর অন্য সকলের তার দিকে সপ্রশংস অথচ ঈর্ষা-আকুল চাওয়া বাস্তবিক দেখবার জিনিস।

এমনি করে' একটি লোক তার সহযাত্রীদের ভারি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

এই ঈর্ষাটা পুরুষচরিত্রের ভারি একটা চিরন্তন দিক। পশুজগৎ থেকে আরম্ভ করে' মনুষ্যজগৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে রমণীর করুণা যে পায় তার সঙ্গে, ব্যর্থ যারা তার সকলে এক্কাট্ঠা হয়ে লাগে কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দগুলো বোঝে না যে একজন ছাড়া আর সকলের নিরাশ ত হতেই হবে; যে ভালবাসা পেয়েছে সে না পেয়ে আর একজন পেলেও সেই একজনেরই লাভ। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অজ বেচারাকে ইন্দুমতীর ভাল লেগেছিল বলে' সমস্ত রাজাগুলো একেবারে ক্ষেপে মারমুখো হয়ে উঠল! কেন রে বাপু? বেচারার অপরাধ? সে যদি শ্রীকৃষ্ণের মতন রুক্মিণী-হরণ বা অর্জ্জুনের মতন সুভদ্রা-হরণ করত তাহলে না হয় ওরা বলতে পারত যে অজ অন্যায় করেছে, ইন্দুমতীকে পছন্দ করার সুযোগ দিলে না, হয়ত তার শ্রীহস্তের বরমাল্য তাদের কারো গলায় পড়তে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী ত তাদেব সে ক্ষোভটুকু করবারও অবসর রাখেনি।

আহাম্মকেরা এইটুকুও বুঝতে পারে না যে যাকে তারা প্রার্থিত রমণীর সম্ভাব্য ভালবাসা থেকে দূরে রাখতে চায়, তাকে নির্য্যাতিত দেখে সেই রমণীর অসম্ভব ভালবাসাও করুণায় যে সম্ভব হয়ে আসে। তাকে দূর করতে গিয়েই তাকে আরো নিকট করে' তোলে!

এমনি করেই ওরা ভাই, দশচক্রে আমায় একজনের অনুরক্ত কবে তুলছে। এই অনুরাগটা বিপন্ন আশ্রিতের প্রতি করুণা ছাড়া আর কিছু নয়; ভালবাসা মনে কর্‌লে ভুল কর্‌বে।

এ আমার ট্রামের সহযাত্রী। প্রায় রোজই ট্রামে দেখা হয়। হঠাৎ একদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটে গিয়েছিল। একদিন আমার আপিস যেতে বড় বেলা হয়েছিল। যখন ট্রাম ধরতে গেলাম তখন আপিসে যাবার ঠিক মুখোমুখী সময়। ট্রামগুলো একেবারে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলো পাদানের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। অমন গাছে ঝোলা অভ্যাস ত আমাদের নেই; পুরুষগুলো পূর্ব্বপুরুষের যে নিকট জ্ঞাতি গোঁপদাড়ি তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ; আমরা বিবর্ত্তনে এগিয়ে এসেছি বলে, আমরা অমন গেছো কসরৎ পারিও না, পারলেও লজ্জা নামক মনুষ্য ধর্ম্মটা আমাদের পূরা মাত্রাতেই আছে। অনেক ক্ষণ অপেক্ষার পর একখানা ট্রামে কেউ ঝুলছে না দেখে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। একটিও জায়গা খালি নেই। মনে করলাম, পুরুষগুলো রমণীর সেবা করবাব কাঙাল, এখনি কেউ-না-কেউ উঠে আমায় জায়গা করে' দেবে। কিন্তু একটাও একটু নড়ল না!

কেউ উঠল না দেখে যখন আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে কি করব ঠিক করতে পারছিনে, তখন দু কামরা দূর থেকে একটি তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে— আপনি এইখানে আসুন, আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি।

তার কথায় আমার যে কি আরাম হল তা আর বলতে পারিনে। আমি যেন এক খাঁচা বুনো ভালুকের কবল থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গেলাম!

ট্রামের ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম থামিয়ে সে আমকে নিজের জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে গাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ তখন একগাড়ী লোকের ওপর জয়ের আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে! আর বাকি লোকগুলোও তার দিকে এমন করে' তাকাতে লাগল যেন বলতে চাচ্ছে—এঃ! বড্ড জিতে গেল!—এ জিত ত তারাও জিততে পারত। কিন্তু যারা থাকে সুযোগের টিকি ধরবার জন্যে, তাদের সুযোগ ফস্কেই যায়; যে বুদ্ধিমান, সে সুযোগের সামনের ঝুঁটি ধরেই সুযোগকে কাবু করে' ফেলে! এ দেশটা কেবলই পেছু ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকির মমতা করেই গেল!

এখন আমি ট্রামে ওঠবার সময় একবার সব কামরায় উঁকি মেরে দেখি সে আছে কি না। যদি তাকে দেখতে পাই তা হলে সে যে কামরায় থাকে সেই কামরায় গিয়ে উঠি, আর কেউ জায়গা না দিলেও সে আমায় জায়গা ছেড়ে দেবে, মাত্র এই আশায়। আমি যে রোজ তারই কামরা বেছে উঠি, এটা সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে; আমি ওঠবামাত্রই সে একমুখ হাসি নিয়ে ধী ও শ্রীর জ্যোতিতে ভরা চোখ দুটি আরতির যুগল প্রদীপের মত আমার দিকে একবার তুলে ধরে, পরক্ষণেই নিজের হাতের বইখানির ওপর নামিয়ে রাখে। এইখানে আসল পুরুষের পরিচয় পেয়ে আমিও আমার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা সাজিয়ে ধরি।

ওদের একটি দল আছে ভারি মজার। ওরা জগৎসংসারের কাউকে রেয়াৎ করে' ছেড়ে কথা কয় না—সকলেরই নিরিখ কষতে ব্যস্ত। এরা বোধ হয় সাহিত্যিক, কারণ সাহিত্যের আলোচনাই বেশি শুনি। এদের একজন নাকি কবি। তাঁর দুনিয়ার দুচার জন লোক ছাড়া আর কারো লেখা বড় একটা ভালো লাগে না— সে এমনি খুঁৎখুঁতে আর একগুঁয়ে যে, যা গোঁ ধরে তা ওর বন্ধুরা শত যুক্তি তর্কেও টলাতে পারে না। এরা দেখি সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু এই কবিটির মত ভারি অদ্ভুত ধরণের; উনি বলেন বাইরে বেরুবে শুধু সুন্দরী তন্বীরা; মোটা, কালো, কুৎসিত যারা তাদের অবরোধে বন্ধ থাকাই উচিত। এ কথা শুনে আমার মিল্টনের কোমাসের যুক্তি মনে পড়ল —Beauty is Nature's brag, প্রকৃতির গর্ব্বের ধন সৌন্দর্য্য, যাদের তা আছে তারা লুকিয়ে থাক্‌বে না; ঘোমটায় মুখ ঢাকবে যারা কুৎসিত। কিন্তু যিনি একথা বলেন, তিনি যে খুব সুপুরুষ তা ত মনে হয় না। মানলাম না হয় উনি কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি শুধু চোখেই ধরবার জিনিষ? রমণী কি শুধু ফুলের মতই রমণীয়, না হলে সুন্দর বলে স্বীকৃত হবে না? ইংরেজীতে একটা কথা আছে—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। রূপসী না হলেও ত সুন্দরী হতে বাধে না। যাদের রং বা চেহারা দৈবগতিকে নয়নরঞ্জন হয়নি তাদের কি পৃথিবীটা দেখে জানবার শিখবার আনন্দ পাবার দরকার নেই? জগতের সংস্পর্শে সংঘর্ষে না এলে তারা মানুষ হবে কেমন করে'— দেহ ও মনের স্বাস্থ্য বল সঞ্চয় করবে কোথা থেকে? আমার মনের প্রশ্নটাই যেন কেড়ে নিয়ে তার এক বন্ধু বল্লে—"তবে তোমার আমারও বাইরে বেরুনো উচিত নয়; তুমি যেমন মেয়েদের বলছ, মেয়েরাও ত তেমনি

বলতে পারে— হোঁদলকুৎকুতে রকমের পুরুষদের মুখদর্শন আমরা করব না।" কবির যুক্তি—"তা কেন? আমরা চিরকাল বাইরে আছি, বাইরেই থাকব, বিশেষত আমাদের যখন জীবিকা অর্জ্জন কর্‌তে হয়।" আহা কি আহ্লাদে যুক্তি! যদি রোজগারের কথাই বলেন, তা হলে আমাদের দেশের কত মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের মেয়ে উপবাসে থাকে, তাদের কি বাঁচবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে না? তারা বাইরে বেরুতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে বেরোয় না বলে', বর্ব্বর পুরুষগুলোর চোখে নারী জাতির স্বাধীনতা সয়ে যায়নি বলে'! পুরুষদের ভাল লাগে না বলে তারা খাঁচায় বন্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় একেবারেই বেরোয়! পথে বাড়ীর মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের পুরুষপুঙ্গবদের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে'অবলাকে পথে বসান, তখন মাথাটা খুব উঁচু করেই চলতে পারেন বোধ হয়! বেহায়াদের এই সব কথা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলতে একটু লজ্জাও করে না।

এই নিয়ে ওদের প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যায়। আমার বন্ধুটি—বন্ধু বলছি শুধু নাম জানিনে বলে, এটা লোকটাকে বোঝাবার জন্যে একটা সংজ্ঞা যা চিহ্ন মাত্র, অন্য কিছু ভেবো না যেন। বন্ধুটি একেবারে জ্বলে ক্ষেপে উঠে খুব জোর দিয়ে বলে—"মেয়েরা যদি বাইরে না বেরোয় ত মরুভূমিতে আর কতকাল চরা যাবে?" সে যে আমাকে শুনিয়েই কথাটা বলে তা আমি খুব বুঝি। আমি যেন তার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। বন্ধুর কথা শুনে তার বন্ধু একটি তরুণ সুকুমার যুবক এক দিন বলে উঠল—"আমাদের লোককে বলবার কোনো অধিকার নেই। আমরা নিজেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে কিছু কি করছি?" আমার বন্ধু অমনি বলে উঠল—"আরে এখন কর্‌ব কি? আগে স্ত্রী হোক তারপর ত স্বাধীনতা দেবো! বিয়ে হোক আগে তখন দেখবে আমাদের দৃষ্টান্তে ২৫ বছরের মধ্যে পথঘাট সুন্দরীতে ছেয়ে যাবে!" বোঝা গেল বন্ধুর বিয়ে হয়নি। সুন্দর যুবাটি বলে উঠল—"আরে পঁচিশ বছর পরে যখন চোখে ছানি পড়ে যাবে তখন সুন্দরীতে পথ ছাইলেই বা আমাদের কি!" তখন ব্যাপারটাকে চটপট আগিয়ে আন্‌বার পরামর্শ চলতে লাগল। সেই সুন্দর যুবাটি বল্লে—"এস, এক কাজ করা যাক। রবিবাবুর "আমরা ও তোমরা" গানটা গেয়ে নগরসঙ্কীর্ত্তনে বেরিয়ে পড়া যাক্! সুন্দরীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্ত্তনাদ করে' বলা যাক্—

'তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!'

মেয়েদের একবার বিদ্রোহী করে' তুলতে পারলে একদিনে সব অবরোধ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যাবে!" বন্ধু বল্লে—"বিদ্রোহ করবে মেয়েরা? পুরুষদেরই বড় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আবার মেয়েদের!"

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ছোট করে' দেখার ভাবটা আমার ভালো লাগল না। এর জন্যে আমরাই অনেকখানি দায়ী। আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে কি চেষ্টা করেছি? যা আমাদের হক্ , তা আমরা দাবী করে আদায় করতে কি জানি? আমরা অবলা, পিঁজরের পাখী!

আমাদের পরে যে-সমস্ত মেয়ে অবরোধের বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন হবে, তাদের অবস্থাটা আমরা অনেক সহজ ও নিষ্কণ্টক করে' দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কণ্টকবেধের বেদনা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে দারুণ লজ্জার লালিমায় ফুটে ফুটে উঠছে! অগ্রদূতের ভাগ্যই এই রকম, দুঃখ করা বৃথা!

আজ তবে আসি ভাই, পত্র বিরাট ও ডাকের সময় নিকট হয়ে এল।

ইতি— তোমার স্নেহাসক্ত লাবণ্য।

২

ভাই লাবণ্য,

তোর মজার চিঠি পড়ে' আমি এমন হেসেছি যে তোর পিতৃবিয়োগের দুঃখটা অনুভব করবার অবসরই পাইনি। তুই পুরুষদের যে চিত্র এঁকেছিস সেটা এমন মজার হয়েছে যে পুরুষগুলোকে না পড়াতে পার্‌লে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে কর্‌ছি চিঠিখানা নকল করে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেবো— তোর বন্ধুর সাহিত্যিক দল দুনিয়ার লোকের নিরিখ পরখ করে' ফেরেন, তাঁদের নিজেদেরও নিরিখটার পরখ হয়ে যাওয়া ভাল।

তুই অবলা মানুষ, পুরুষের ভিড়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া কি তোকে সাজে? এক কাজ কর না, তোর বন্ধুর শরণাপন্ন হ না। তোরও ভাল লেগেছে তাকে, তারও ভাল লেগেছে তোকে, তোদের বিয়েও এক একটা করতে হবে, তবে না হয় শুভ কার্য্যটা তোরা দুজনেই সেরে নিলি। একটু সাহস করে' আলাপটা করে ফ্যাল্। বলে' দিচ্ছি দেখে নিস, তোর বন্ধু মোটেই গররাজি হবে না। কথায় বলে না যে, 'ক্যাঙলা ভাত খাবি?' ক্যাঙলা বলে 'পাতা পাতব কোথায়?' তোর বন্ধুতো পাতা পাতবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে, তুই একবার, ভাত খাবে কি না, জিজ্ঞাসা করলেই হয়। এই পত্রের উত্তরে সুখবর শোনবার প্রত্যাশয় রইলুম। ইতি— তোর ললিতা।

৩

ভাই ললিতা,

তোর উপদেশ পাবার আগেই আমার বন্ধুর সঙ্গে একদিন দৈবগতিকে আলাপ হয়ে গেছে। কি ভাই বেহায়া লোক, ছি!

একদিন আমি টিকিট-ঘরে বসে আমার সহকর্ম্মী আর-একজন মেয়ের সঙ্গে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটি টাকা দুই আঙুলে ধরে' কে একজন বলে উঠল—"আমায় একখানা দমদমার টিকিট দিন ত।" সেই স্বর শুনে চমকে উঠে যেমন সেই দিকে তাকিয়েছি অমনি দেখি ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে সে-ই উঁকি মেরে হাসছে। আমাকে ফিরতে দেখেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে'অন্য দশজন লোকের সামনেই জিজ্ঞাসা করে' বসল—"আপনি কি এখানে কাজ করেন?" দেখেছ কি রকম দুষ্টবুদ্ধি! কেবল ইচ্ছে করে' আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলা। দেখছ ত আমি টিকিট-ঘরে রয়েছি, সেখানে কাজ করতে না ত কি নেমন্তন্ন খেতে গেছি? এ যেন সেই রকম কাষ্ঠ লৌকিকতা—তেলমেখে

ঘাটে আছে দেখেও লোকে জিজ্ঞাসা করবে, নাইতে এসেছ? কিংবা বাজারে মাছ তরকারী কিনছে দেখেও জিজ্ঞাসা করবে, বাজার করতে এসেছ? যদি কিছু সন্দেহ থাকে, হয় চশমা নেও গিয়ে, নয় বুদ্ধি বাড়াবার জন্যে কবিরাজের ব্রাহ্মী ঘৃত খাও গিয়ে, অমন বোকার মতন প্রশ্ন করে' লোক হাসিয়ো না। ও যখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে ''আপনি এখানে কাজ করেন?'' তখন সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার মাথাটা যেন কাটা গেল। আমি এই সামান্য কাজ করি, এ ত নিত্য হাজারো পুরুষ দেখে যাচ্ছে, কিন্তু ও দেখলে বলে' আমার অমন লজ্জা হল কেন কি জানি। আমি যে লেখাপড়া জানি, গাইতে বাজাতেও পারি, জগৎব্যাপারের হালনাগাদ খোঁজ রাখি, তাকে এ কথা জানাবার অবসর ঘটল না; অবসর ঘটল কিনা তার দেখে যাবার, যে আমি ষ্টেসনে যত রাজ্যের র‍্যাজলা লোককে টিকিট বেচি! আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখ লাল করে' শুধু বলতে পারলাম ''হ্যাঁ।'' এই আমাদের প্রথম কথা কওয়া।

এর পর থেকে ভাই, ওর প্রায়ই দমদমায় যাওয়া দরকার হয়ে উঠল। দমদমায় যাওয়া ত নয়, দমবাজি। টিকিট নিতে এসে কত যে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে তার আর ঠিক্-ঠিকানা নেই। নাইনটিন ডাউন প্যাসেঞ্জার কোন্ প্ল্যাটফরমে আসবে, সেভেন আপ ক'টার সময় ছাড়বে, ব্যারাকপুরের রিটার্ন টিকিটের দাম কত, উঈকএণ্ড টিকিটে মঙ্গলবারে ফেরা যায় কি না,—এমনি সব অকেজো প্রশ্ন, এমন গুছিয়ে প্রশ্নটি করে যে এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না, আমার বকিয়ে বকিয়ে মারে। কিন্তু কি যে বলছি তাই কি ছাই মন দিয়ে শোনে? হাঁ করে আমায় মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। লোকে যে লক্ষ্য করচে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কি বেহায়া লোক ভাই!

পূজোর ছুটি হয়ে গেছে। আপিস আদালত বন্ধ। কলকাতা ভোঁ-ভোঁ। সবাই ছুটি উপভোগ করছে, আমার কিন্তু নিত্য হাজরি দিতে যেতে হয়। সে লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয় না—ট্রামেও না, দমদমাও যায় না। আপিস না হয় বন্ধ, দমদমা ত বন্ধ নয়, মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে কে মানা করে? পুরুষ মানুষ কিনা বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এমন অরুচি হয়ে যায় যে ছুটি পেলেই ঘরের কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকে। আমরা হলে ছুটির দিনেই বেশি করে' বেড়াতে যেতুম।

সেদিন একে ছুটি, তায় রবিবার, তায় দুপুর বেলা। ট্রামে জনমানব নেই। কেবল এক কামরায় দেখি শ্যামসুন্দর বসে আছেন। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে ফেললে। আচ্ছা, হাসলে কি বলে' ভাই একজন অচেনা মেয়েকে দেখে?—ওর হাসি দেখে আমিও হাসি সামলাতে পারলুম না। ভারি বদ লোক ও, অমন করে পথে ঘাটে মেয়ে মানুষকে হাসানো কি উচিত? আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে সারা গাড়ীটা খালি থাকতেও উঠে পড়লুম ওরই কামরাটাতে। গাড়ীতে উঠে পড়ে আমার হুঁস হল। ভারি রাগ হল ঐ লোকটার ওপর। একবারটি আমায় বারণ করতে পারলে না! আমি না পারি তখন নাবতে, আর না পারি বসতে। কট্‌মট্ করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর ও কিনা দিব্যি বসে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এমন সময় ট্রামটা চলতে সুরু করলে, আমি হুমড়ি খেয়ে

একেবারে পড়ে গেলুম ঐ লোকটার গায়ে! ও অমনি খপ করে আমায় ধরে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি ওর সামনেই বসে পড়লুম। ও কিন্তু তখনো আমার হাত ছাড়েনি— হাত ধরেই জিজ্ঞাসা করলে "আপনার লাগেনি ত?" আমার রাগে গা জ্বলে গেল— আমার লাগুক না-লাগুক তোর অত মাথাব্যথা কেন? আমি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লুম "আপনার গায়ে পড়ে গেছি, মাপ করবেন।" বেহায়াটা বল্লে কিনা আমার মুখের ওপর "এ সৌভাগ্যের জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

রাগের চোটে আমি একেবারে ভুলেই গেলুম যে আমার একখানা হাত বর্ব্বরটার দু-হাতের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওর কি আমায় মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? ও আমায় বলতে লাগল " দেখুন, আপনিও আমাকে অনেক দিন থেকে দেখেছেন, আমিও দেখছি, অথচ দুজনের পরিচয় না হওয়াটা কি ভাল? আমি আপনার পরিচয় সংগ্রহ করেছি—আপনার নাম লাবণ্য, নামটি আপনার রূপের উপযুক্ত বটে, রাসমণি হলে মোটেই মানাত না। আপনাদের হরিশ পরামাণিকের গলিতে বাড়ী পর্য্যন্ত আমি দেখে এসেছি; লজঞ্চুষ দিয়ে আপনার বোন পুষি আর ভাই নরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েও ফেলেছি। এখন আমার পরিচয়টা আপনার জানা দরকার।" ওর পরিচয় জানবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম, বকে মরছে বকুক, আমি ত আর শুনতে চাইনে। আমি শুনি আর না-শুনি সে সটান বলেই গেল—"আমার নাম দীনেশ, বাড়ী কাঁসারীপাড়ায়; শালবনি টি ষ্টেটের কলকাতার আপিসের ম্যানেজারের কাজ করি, মাইনে পাই মোটে আড়াইশ টাকা। বাড়ীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই; চাকর বামুনেব অনুগ্রহে নির্ভর কবে কোনো রকমে বেঁচে আছি। আমি খুঁজছিলুম যদি তেমন একজন মনের মতন লোক পাই যে আমার এই অগোছালো জীবনটার একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিতে পারে। মাপ করবেন আমার ধৃষ্টতা, আপনাকে বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি, আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে দয়া করে আমার একটা উপায় করলে আমি বেঁচে যাই। কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল—আমি কি ওর কাছে চাকরীর উমেদারী করতে গিছলুম যে ও আমায় চাকরী দিতে চায়! আমি মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলুম, হাঁ না কিছুই বলতে পারলুম না।

লোকটা ভাই ভয়ানক নাছোড়বান্দা রকমে ধরে বসেছে, যে তার একটা বিলি ব্যবস্থা আমায় করে' দিতেই হবে। মাও তারি পক্ষে। পুষি আর নরুরও খুব তাগাদা দেখছি— নিশ্চয় লজঞ্চুষের ঘুষের খাতিরে। আমি ভাই একেবারে নাচার হয়ে পড়েছি। আমার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে মনেও ভেবো না। পাঁচজনের অনুরোধে মানুষ এমন বিপদেও পড়ে!

পোষা পাখী উড়ে গেলে খাঁচা দেখালেই আবার ফিরে এসে খাঁচায় ঢোকে। সে বুঝতেই পারে না খাঁচার বাইরে স্বাধীনতার আনন্দই ভাল, না খাঁচার মধ্যে নিশ্চিন্ত দানাপানির ব্যবস্থাটাই আরামের। পিঞ্জরে-ভাঙা পাখীর গতি কি, বল ত ভাই!—ইতি—তোমার লাবণ্য।

'প্রবাসী'— অগ্রহায়ণ, ১৩২১

প্রতীক্ষা

পুরবালা রায়

ছোটদি।

আজ তোমার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুসী হয়েছি, ছমাস হলো আমরা এখানে এসেছি, এতদিন পরে যে আমাদের খবর দেবার অবসর তোমার হয়েছে, তবু ভাল, এখানে এসে আমি ভালই আছি। আর জ্বর হয়নি, এ জায়গাটি কেমন জানবার জন্য নিশ্চয় তোমার খুব আগ্রহ হয়েছে? জায়গাটি আমার কিন্তু বেশ লাগছে, ছায়াশীতল শ্যামশোভাময় পল্লীগ্রাম যাকে বলে, এটা তাই সহরের গোলমালের মধ্যে বসে এখানকার শান্ত সৌন্দর্য্য বোঝবার শক্তি তোমার হবে কি? আমাদের বাসাটি গ্রামের এক প্রান্তে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাঝারী ধরনের বাড়ীটি। সম্মুখে রাস্তা। তার পরেই খরস্রোতা শ্যামতটিনী সুন্দরী নদী। আর তিন পাশে মাঠ বা শস্যক্ষেত্র। বাহিরের ঘরের বারান্দায় দাঁড়ালে নদীর সুশীতল মুক্ত হাওয়ায় শস্য ক্ষেত্রের শ্যামশোভায় মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ওখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে কেমন ভুগছিলুম তা তো জানই এখানকার ডাক্তারবাবু সকল ওষুধপত্র বন্ধ করে সকালে বিকালে নদীর ধারে বেড়ানোর ব্যবস্থা দিয়েছেন, আপিসে বাবার বেশী কাজের ভিড় না থাকলে তিনি সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যান। বেশী কাজ থাকলে নিজেই বাড়ীর সামনে নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। তার ছায়ায় বসে ও বেশ হাওয়া খাওয়া হয়।

এখানে একটি মেয়ে সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কথা তোমায় বলতে চাই। তোমার বোধ হয় মন্দ লাগবে না। নদী তীরে যে প্রকাণ্ড বটগাছের কথা বলেছি সেই গাছটা আমাদের বাসা বাড়ীর কাছে। ঠিক সম্মুখে নয় বাঁধারে একটু সরে। গাছের বাঁ পাশেই পল্লীনারীদের স্নানের ঘাট সকালে বিকালে দ্বিপ্রহরে কৃষক বধূরা এই ঘাটে বাসন মাজা কাপড় কাচা জল নেওয়া স্নান করার ছলে শতবার আসে, বসে গল্প গুজব করে। আমি বেড়ানোর ছলে তাদের নিপুন হস্তের কাজ দেখি, সংসারের ছোট খাটো নানা কথা শুনি। সকাল বেলা গাছতলায় পাতালতা নিয়ে ধুলোর ভাত রেঁধে উলঙ্গ অর্দ্ধউলঙ্গ কৃষক শিশুদের খেলতে দেখি। কোন দিন জনশূণ্য থাকে। বিকালে আর সবই ঠিক সকালের মত। কেবল গাছতলায় একটি মেয়েকে নির্নিমেষ চক্ষে একাগ্রচিত্তে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকতে দেখি। ঘাটের রমণী গণের কথোপকথন, ক্রীড়ারত শিশুদের আনন্দ কোলাহল কিছুই যেন তার কানে বা মনে প্রবেশ করে না। কোন দিকেই লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেন ধ্যানরতা পাযান মূর্ত্তি সংসারে সহস্র কোলাহল তাকে এতটুকু বিচলিত করতে সমর্থ নয়। তার মুখখানিতে কি যেন দারুণ উৎকণ্ঠা ফুটে থাকে। আর ও আশ্চর্য্য এই যে এ মেয়েটির কাছে কোন রমণী কিম্বা বালক বালিকাকে যেতে বা তার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করতে ও দেখি না।

তারা আসে যায় বসে কথা বলে, ওর দিকে লক্ষ্য করে না, বোধ হয় তার এমন বসে থাকা সকলের কাছে অতি পুরাতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যহ একই স্থানে এক ভাবে এক

সময়ে মেয়েটিকে বসে থাকতে দেখে আমার কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠতে লাগল। বেশ লক্ষ্য করে দেখলেম সে বেলা সাড়ে চারটায় পাঁচটায় এসে এখানে বসে, সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলে উঠে চলে যায়। তার বেশ ভূষা দেখে মুসলমানের মেয়ে বলেই মনে হয়। (পরে জেনেছি সত্যিই সে মুসলমানী) বয়েস বোধ হয় পঁয়ত্রিশের নীচে হবে না। (তোমার মত আমার বর্ণনা শক্তি নেই, সব কথা সংক্ষেপেই লিখবো তুমি ভেবে চিন্তে বুঝে নিও, কেমন?) নিখুঁৎ সুন্দরী যাকে বলে মেয়েটি তাই। এমন সুন্দরী যে কৃষক মুসলমানের গৃহে আছে বা থাকতে পারে সে বিশ্বাস ইতি পূর্ব্বে আমার ছিল না। বেশ ভূষা অতি সামান্য। পরণে এই দেশের তাঁতে তৈরী অত্যন্ত মোটা (ক্যাম্বিস বল্লেই হয়) সরু লালপেড়ে শাড়ী। নীচে হাতে রুলীরমত লাল দুগাছি চুড়ী, আর কোন গহনা নেই। কিন্তু এতেই তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে গহনা পরার প্রয়োজন মনেও হয় না। দাদা যে বলে "যাকে ভগবান সৌন্দর্য্য সম্পদ দিয়েছেন তাকে গহনা পরালে সৌন্দর্য্যের হানি করা বা অপমান করা হয়," কথাটা তখন হেসে উড়িয়ে দিলেও আজ কিন্তু ঠিক বলে মনে হচ্ছে। ওকে দেখে আমার ও মনে হয় গহনা পরলে ওকে বুঝি এত সুন্দর লাগতো না। এমনি রমণীয় কমনীয় রূপখানি তার অমনটি সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। আরও আশ্চর্য্য, সেই সুন্দর মুখখানি কি এক অপূর্ব মহিমা মণ্ডিত সে মুখের দিকে চাইলেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে বুক ভরে ওঠে, মাথা খানি নত হয়ে আসে। সে মুখে যুবকের কামনার কিছু নেই, সে যেন মূর্ত্তিমতী শিশুর সান্ত্বনা, প্রত্যহ নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকে, সে কি ব্যাকুল দৃষ্টি! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যার পথ চেয়ে থাকে, সে যেন আসবেই। কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছে, কৈ কেউ তো আসে না। তবু সে হতাশ নিরুদ্যম নয়। প্রত্যহ নিত্য নূতন আশা আগ্রহ বল সঞ্চয় করে ঐ জায়গায় এসে বসে বিফল প্রতীক্ষা করে।

একদিন বেলা ৩টা ৩।।০টা থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রথমে টিপ টিপ। ক্রমে বেগেই বর্ষণ হতে লাগলো। এমন দিনে বেড়াতে বেরুনো অসম্ভব। অগত্যা বই খাতা নিয়ে বিছানায় শুয়ে বসে নাড়া চাড়া করে সময়টা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু অমন জড়ের মত শুয়ে বসে কতক্ষণ থাকা যায়। বিরক্ত লাগতেই উঠে পড়লেম। কেমন খেয়াল হলো বাহিরের ঘরের জানলা দিয়ে নদীর অবস্থা দেখতে গেলেম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাবা আপিসে ছিলেন। কাজেই বাহিরের ঘর জনশূন্য বন্ধ ছিল। তখন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেশ বাতাস ও দিচ্ছিল। জানালা খুলে দেখছি, নদীব বুকে তখন একখানিও নৌকা নেই, এ দুর্য্যোগে কে নৌকা ছাড়বে?

হঠাৎ তার কথা মনে হলো, আজ নিশ্চয় সে আসেনি। সে যার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকে, সে কখনই এমন দুর্য্যোগে নৌকা ছাড়বে না, তবে আজ আর কিসের প্রতীক্ষা? অনুমান কতখানি ঠিক হলো দেখার জন্য সেই পাশের জানলাটা খুলে দেখলেম, সে ঠিক সেই জায়গায় তেম্নি নীরব নির্ম্মল নিষ্কম্প বসে আছে, তেম্নি মুখের ভাব। বৃষ্টিতে ভিজে জল গড়িয়ে পড়ছে, তার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন কোন জ্ঞান নেই, প্রাণ নেই, সে যেন ভাস্কর খোদিত পাষাণ মূর্ত্তি। আমি অবাক, এ কিসের কার প্রতীক্ষা? এমন তো

কোন গল্পে ও পড়িনি, যেমন করে হোক ব্যাপারটা জানতেই হবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জানালায় দাঁড়িয়ে রইলুম সে ওঠিক এক ভাবেই বসে রইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে (বুঝি হতাশার ভারে পীড়িত হৃদয়ে) ধীরে ধীরে চলে গেল। আমি জানলা বন্ধ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। প্রত্যহই ফিরে যাবার সময় তার মুখ দেখে (যদি ও সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না) মনে হতো নিরাশকাতর হৃদয়ের বেদনা যে অসহ হয়ে উঠেছে। সে যেন কোন মতে পারছে না। এখনি বুঝি হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দেহ খানি শতধা হয়ে ভেঙে চুরে খসে পড়বে। জানি না এত অসহ কি সে ব্যথা। পরদিন যখন সে নিয়মিত সময়ে এসে বসলো, তখন মুখ দেখে মনে হলো সে যেন নতুন আশা আগ্রহ ধৈর্য্য সংগ্রহ করে এনেছে। এমন অক্ষয় ভাণ্ডার সে কোথায় পেয়েছে ? এ সকলেরি সীমা আছে ধৈর্য্যের কি নাই? এমন অসীম ধৈর্য্য কি মানুষে সম্ভবে? তারপর আর ও কতদিন ওর চেয়ে ও বেশী ঝড় জলে ভিজে ভিজে তাকে অম্নি বসে থাকতে দেখেছি। সে দেহ একবারও শীতে কাঁপেনি। বাতাসে এতটুকুও টলেনি। নীরব নিথর বসে থাকা এতটুকু অধৈর্য্যের লক্ষণ তাতে দেখিনি। একেই কি বলে যোগ? সাধনা? সেকালের মুনি ঋষিরা বুঝি এম্নি করে তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেতেন। যে তপস্যার ফলে বা বলে ভগবান বাঁধা দেখা দেন। তেম্নি তপস্যার বলে একটা ছার মানুষকে বেঁধে আনতে পারে না কেন? এ সাধনার সিদ্ধি কত দূরে?

তার সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ আমার যত বাড়তে লাগলো সুযোগ ও তত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে লাগলো, তার যোগ ভঙ্গ করে আলাপ করবার সাহস আমার হচ্ছিল না। তার সম্বন্ধে সকল কথা হয় তো চেষ্টা করলে অন্যান্য প্রতিবেশিনীর মুখে শুনতে পেতুম। কিন্তু কেন জানিনে সে প্রবৃত্তি আমার মোটে হলোনা। যেন ওর কথা ওর ব্যথা ওর মুখেই শোভা পায়।

একদিন সুযোগ মিললো। বাবার আপিসে তখন থেকে কাজের ভিড় বেশী পড়ায় আর আমার ও সব চেনা শোনা হয়েছে দেখে বাবা আর সঙ্গে যান না, আমি একাই বাড়ীর সামনে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। সেদিন সকাল বেলা ঘাটের ওপরে বেড়াতে যেতে তাকে ঘাটে খান কত বাসন মাজতে দেখলাম। আমি এম্নি একটা অবসরের প্রতীক্ষা করছিলেম। বাঞ্ছিত প্রথম সুযোগ মূর্খের মত নষ্ট হতে দিলেম না। "নদীতে কোন সময় কেমন জল থাকে, বর্ষার কতদূর পর্যন্ত আসে," এই কথার সূত্র ধরেই প্রথম আলাপ সুরু করা গেল। তারপর নানা কথা হলো। সে আমার আমি তার মোটামুটি পরিচয় পেলেম। এরপর প্রত্যহ ঘাটে দেখা হয়, গল্প গুজব চলে। ক্রমে আমি তার বাড়ী যেতে আরম্ভ করলেম। কৃষক মুসলমানের বাড়ী বলে ঘেন্না করতে পারবে না। তা হলে তোমার ভুল হবে, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী ও নয়। বাড়ীতে ছোট বড় চারখানা ঘর। শোবার ঘর রান্নাঘর ঢেঁকিঘর, গোশালা মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চাল। এ দেশের মাটির দেওয়াল ভারী সুন্দর ইঁটের গাঁথুণীর চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, নিদেন আমার তাই মনে হয়। উঠানটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোময়লিপ্ত কোথাও একটুকু জঞ্জাল

নেই। গোশালায় একটি হৃষ্টপুষ্ট সবৎসা গাভী, বাড়ীর চারিপাশে কঞ্চির বেড়া দেওয়া। স্থানে স্থানে ছোট বড় মাচার লাউ, কুমড়ো সিমের গাছ। কোথাও গোটাকতক লঙ্কা, বেগুনের গাছ। বাড়ীর ঘরগুলি থেকে আরম্ভ করে গাভী, গাছ, খুঁটিনাটী সমস্ত জিনিসই দেখলেই বোঝা যায় স্বামিনী তার সমস্ত সেবা, যত্ন, স্নেহ মুক্ত হস্তে এদের উপর ব্যয় করছে। কোন খানে এতটুকু ত্রুটি লক্ষ হয় না। মেয়েটির নাম 'ফুলজান।' স্বভাব সুন্দরী ফুলজানের বাড়ীটি তারই বাসযোগ্য। তার বাপের এক পতিপুত্রহীনা অনাথা চাচী (খুড়িমা) এখন তার অভিভাবিকা। ফুলজান প্রাণপণে বুড়ীটির সেবা যত্ন করে, বুড়ী ও তার সমস্ত স্নেহ টুকু দিয়ে তাকে আপন শোক সন্তপ্ত বক্ষের মধ্যে ঢেকে রেখেছে, আশে পাশে আর ও জ্ঞাতি কুটুম্বের বাড়ী আছে। স্বভাবের গুণে সকলেই ফুলজানকে স্নেহ করে তত্ত্ব নেয়, অভাব আব্দার পূরণ করে। তাছাড়া পাড়ার ছেলে মেয়েগুলি ফুলজানের স্নেহ যত্নে বাঁধা। তারা নির্ভয়ে তার বাড়ীতে সব সময় আনন্দে খেলাধূলা করে। অনেক রাত্রেও তার শূন্য বক্ষ পূর্ণ করে শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। পাড়ার সকলেই ফুলজানের সরল নিষ্কলুষ স্বভাবে মুগ্ধ, দুঃখে দুঃখিত। তার উপর শ্রদ্ধা নির্ভর ও অনেকখানি করে। ছেলেদের মা-বাপ নিজেদের ছেলে মেয়ে তাব হাতে সঁপে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে থাকে। সন্তানহীনা ফুলজান তার স্নেহ শ্রবণ হৃদয়ের গুণে পরের ছেলে গুলিকে নিতান্ত আপনার করে বেশ শান্তিতেই থাকে। এই দেবতার মত পবিত্র শিশুদের ফুলের মত সুন্দর মুখগুলি বুঝি তাকে নিত্য নূতন জীবন দান করে। নতুবা তার বেঁচে থাকা বুঝি অসম্ভব হতো। খতিয়ে দেখতে গেলে এ জগতে তার আপনার বলবার কিছু নেই। যার কিছু নেই, সমস্ত দুনিয়াই তার। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, সেবা, যত্ন সবই তার হৃদয়ে নারী হৃদয়ের মতই আছে, কিন্তু দিবে কাকে? সাধারণের মত তার ভাগ্য নয়। পিতামাতা ভাই ভগ্নী ছেলে মেয়ে কিছুই নেই। তবে সে কি নিয়ে বেঁচে থাকে? কাকে দেবে সব? ভগবান তাকে পথ বা পাত্র দেখিয়ে দিয়েছেন আর দুঃখ নেই। সুগৃহিণী ফুলজান সকলকে মুক্ত হস্তে অথচ সমভাগে তার অসীম স্নেহ দান করে। অবুঝ অজ্ঞান পাওনাদারগুলি ও সুদ সমেত বুঝে নেয়। মায় গাভীটি পর্য্যন্ত। শিশুগুলির মাঝে তাকে স্নেহ ক্ষমাশীলা জননীর মতই দেখা যায়। তার সঙ্গে আমার খুব বেশী দিনের আলাপ নয়। তবু যেন মনে হয় সে আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচিতা। সে ও আমাকে চিরদিনের বন্ধুর মত ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। আমার কাছে কোন কথা সে "কিন্তু" রেখে বলে না। ক্রমে ফুলজান তার অতীত জীবনের কাহিনী বা নদীতীরে প্রত্যহ প্রতীক্ষার কারণ ধীরে ধীরে আমাকে সমস্তই বল্লে।

কাজের ভীড়ে অবসরের অভাবে বাবা আমার বেড়ানোর সময় সঙ্গে আসতে পারেন না। তাতে আমার সুবিধাই হয়েছে এখন কেবল ফুলজানের বাড়ীতে বসে তার সুখ দুঃখের কাহিনী শুনতে যাওয়াই আমার বেড়ানো। তার বাড়ী আমাদের বাড়ীর খুব কাছে। সেই বটগছের সোজা সুজি, এখন রোজ সকালে সে তার নিত্য কর্ম্মগুলি শেষ করে আমার যাওয়ার আশায় পথ চেয়ে থাকে। আমি কোন মতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। সকাল বেলাই আমাদের দেখা কথা হয়। বিকালে সে তার বটতলায় বসে আমি ও

আর বেড়াতে বেরুইনে। এতদিন বয়েস হলে ও ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বা প্রসাদে দেহটি তেমন বাড়তে পায়নি। এখন আর সেদিন নেই, ম্যালেরিয়া ছেড়ে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে দেহটি তার এতদিনের ক্রটি সংশোধন করতে আরম্ভ করেছে। কাজেই যখন তখন রাস্তায় বেড়ানো বা বেরুনো উচিত মনে হয় না। তবে এটা নির্জ্জন পল্লী বলেই যা। ভদ্রলোকের চেয়ে চাষালোক মন্দ কিসে ভাই? ভদ্র পল্লী হলে এত বড় মেয়েকে রাস্তায় বেড়াতে দেখলে কে ক্ষমা করতো? বরং পাঁচটা টিপ্পনী কাটবার এমন সুযোগটি কখনোই ছাড়তো না। কানাঘুষোর জ্বালায় আস্থির হয়ে উঠতে হতো। এরা গরীব নিরীহ চাষীলোক মুখ তুলে চাওয়ার সাহস করে না। তবু এরাই চাষা। যাক, তারপর যা বলছিলুম। ফুলজানের কাহিনীটি বলি।

ফুলজান বাপ-মায়ের শেষ বয়েসের নিতান্ত নিরাশার সময়ে ভগবানের অসম্ভব অনুগ্রহ বা দান একমাত্র মেয়ে। তার বাপের এই বাড়ী; জমি জমা যা আছে তাতে খাওয়া পরা নিশ্চিন্তে চলে ও হাতে দুদশ টাকা থাকে। বাপ মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা সুন্দরী ফুলজানের বাল্য জীবন যে আদর আনন্দের মধ্যেই কেটেছিল, তা বোধ হয় বলতে হবে না। বিবাহযোগ্য বয়েস হলেই তার বাপের মোহেই হোক কিম্বা বাপের জমি জমার লোভেই হোক, অনেক বর জুটলো। কিন্তু একটি বর ও পিতার মনোমত হলো না। তাদের দেশে বা সমাজে দশ থেকে জোর এগারো বৎসরের মধ্যেই নিন্দা হয়। ফুলজানের কিন্তু বর বাছাই করতে করতে সে বয়েস উত্তরে গেল। বাপের ইচ্ছা ছেলেটি নেহাৎ নিরক্ষর চাষ না জানা হয়। একটু আধটু লেখাপড়া জানে। চেহারাতে মেয়ের অযোগ্য না হয়; স্বভাবটি বেশ শান্ত শিষ্ট হয়, ঘরজামাই থাকে। এমনটি মিললো না, ঠক বাছতে গ্রাম উজাড় হলো। এদিকে মেয়ের বয়েস তের পেরিয়ে যায় দেখে অনেকে বন্ধু ভাবে তার বাপকে সৎপরামর্শ দিয়ে বলেছিল "ভাই আর কেন? যা হয় ওর মধ্যেই একটা দেখে শুনে দিয়ে ফেল। আর কি মেয়ে ঘরে রাখা ভাল দেখায়?" উত্তরে সে বলেছিল 'আমার জান কবুল, তবু আমার ফুলকে আমি যার তার হাতে দিতে পারবো না। ওর নসীবে সাদি লেখা থাকলে মনের মত বর মিলবেই।"

সেইবার বর্ষায় কোথা থেকে একখানা বিদেশী-ব্যাপারীর পাট-বোঝাই নৌকো এল, (অমন প্রতি বৎসর বর্ষাতেই এসে থাকে) তারা কয়েক দিন ঘাটে নৌকো বেঁধে পাট কিনতে লাগলো। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা উঠে সকলে দেখতে পেলে নৌকো ঘাটে নেই। বটগাছ তলায় ধুলোর উপর একটি সুন্দর ছেলে (উনিশ কুড়ি বৎসর বয়েস হবে) পড়ে আছে। ছেলেটি পীড়িত সংজ্ঞাহীন। ফুলজানের বাপ ছেলেটিকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে বাভী গেল। (ছেলেটিও মুসলমান।) অনেক চিকিৎসা শুশ্রূষার পর সে ভাল হয়ে উঠলো। তখন তার পরিচয় সবিশেষ পাওয়া গেল। তার নাম 'রহিম'। বাড়ী যশোর জেলার কোন গ্রামে। সংসারে এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাপমায়ের অনেক গুলি ছেলে মেয়ে মারা যাওয়ার পর শেষ সন্তান রহিম আল্লার দোয়ায় বেঁচে রইল। বাপ মা তাকে প্রাণে ধরে কষ্ট করে চাসের কাজে না দিয়ে গ্রাম্য স্কুলে দিয়েছিল। সংসারের অবস্থা

খুব ভাল না হলেও মন্দ ছিল না। যা জমি জমা ছিল, বাপ নিজে হাতে চাষ আবাদ করে তাই থেকে সংসার ও পুত্রের পাঠের ব্যয় স্বচ্ছন্দেই চালাত। যখন রহিমের বয়েস চৌদ্দ বৎসর তখন হঠাৎ বাপের দিন ফুরিয়ে গেল। বুড়ো মা প্রথমটা চক্ষে অন্ধকার দেখলেও পরে প্রতিবাসীদের পরামর্শ নিয়ে কোন মতে সকল কাজ চালাতে লাগল। পুরুষ মানুষের হাতে সংসারটি যেমন সুশৃঙ্খলায় চলছিল, মেয়ে মানুষের হাতে তেমন চল্লো না। রহিমের মাকে নেহাৎ সাদাসিধে মানুষ পেয়ে পাঁচজন ঠকিয়ে নিতে লাগল তবুও ধার কর্জ্জকরে বৃদ্ধা কয়েক বৎসর পুত্রের পাঠের খরচ যোগাচ্ছিল। তারপর দেনার দায়ে সমস্ত বিক্রি হয়ে গেলে স্কুল ছেড়ে রহিম চাকুরীর চেষ্টা করতে বাধ্য হল। ক্ষুদ্র গ্রামে চাকরীর সুবিধা না হওয়ায় অগত্যা ঐ বিদেশ গামী নৌকার ব্যাপারীর হিসাব পত্র রাখার কাজ নিয়ে ছিল। মা তার একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রকে বিদেশ পাঠাতে প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি। তারপর অন্নকষ্টে ও বটে পুত্রের অনেক বলা কওয়াতে ও বটে রাজী হতে হয়েছিল। আজ দেড় মাস রহিম নৌকায় এসেছে, এইবার ফিরে যাওয়ার কথা, এমন সময় তার কলেরা হওয়ায় তারা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে যশোর বহুদূর যাওয়া আসার তেমন সুবিধা জনক একটানা পথ নেই। নৌকোয় যাওয়া যায় কিন্তু অতদূরে কোন নৌকো যেতে রাজী হল না। অগত্যা সকলের আশ্বাস বাক্যে আগামী বর্ষায় স্বদেশের কোন নৌকো আসার আশায় রহিম এখানে রয়ে গেল।

রহিম চেষ্টা করে এক মহাজনের আড়তে দশ টাকা মাহিয়ানার একটা চাকরী পেলে। ফুলজানদের বাড়ীতেই রহিল, সকাল বেলা নেয়ে খেয়ে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসে ফুলজানের বাপ মাকে কোরান শরীফ পড়ে শোনায়। রান্না হলে খেয়ে বাইরের চালায় শুয়ে নিদ্রা যায়। এম্নি করে ছ মাস গেল। ক্রমে সে ফুলজানদের ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে মিলে তাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী নিতান্ত আপনার জন হয়ে পড়লো। তার সুমিষ্ট ব্যবহার শান্ত স্বভাবের গুনে ফুলজানের বাপ মা মুগ্ধ হয়ে তাকে সত্যিই আপনার করে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ফুলজানের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলে। উত্তরে রহিম বল্লে "আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনাদের ঋণ শোধ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আপনাদের কথার ওপর বলবার কিছু নাই। আপনাদের মতেই আমার মত। কেবল আমার মাকে একবার না দেখে কোনমতে স্থির হতে পারছিনে। বড় দুঃখী মা আমার, আমি ভিন্ন তার আর কেউ নেই তাকে দেখবার। আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন। আমি যেয়ে মাকে নিয়ে এসে বিয়ে করবো"। এরা বল্লে, "তা কেন? এখনো তোমার যাওয়ার দেরী আছে বিয়ে যখন করবেই তখন মেয়েকে আর বড় করে নিন্দের সৃষ্টি করা কেন? বিয়ে করেই মাকে আনতে যেও।" রহিম আর প্রতিবাদ করলে না বা করতে সাহস করলে না। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হয়ে গেল।

ফুলজানের বাপ মায়ের সুখের সীমা রইল না। তারা যা চায় তা পেলে, তারা রহিমকে আল্লার প্রেরিত দয়ার দান মনে করে সর্ব্বান্তঃ করণে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সেলাম জানালে। ফুলজান রহিম ও সুখী কারণ কেউকারও অযোগ্য নয়। এর অধিক কেউ আশাও করেনি।

স্বামীর স্ত্রীকে যতখানি স্নেহ, যত্ন আদর করা উচিত, রহিমের তাতে ত্রুটি ছিল না। ফুলজান ও তার সমস্ত মন, প্রাণ, পতি দেবতার পায়ে নিবেদন করে পূজো করত। স্বামী লেখাপড়া ভালোবাসে, তাই ফুলজান তার কাছে পড়ত। সংসারেব নানা কাজের মধ্যেও সে সযত্নে পড়া করত। রান্না চড়িয়ে ধান সিদ্ধ চড়িয়ে সেই হেঁসেলে বসেই পড়া মুখস্থ করত। তাই ফুলজান মোটামুটী লেখাপড়া জানে। স্বামী পছন্দ করত, তাই এখনো সে চর্চা ছাড়েনি, অবসর মত পড়াশুনা করে। যাকে সুখ বলে তার ত্রুটি না থাকলেও একটি দিনের জন্যও রহিম মন খুলে হাসত না, বা হৃদয়ে শান্তি পেতো না। এত সুখের মধ্যেও মায়ের মলিন মুখখানি সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জেগে তাকে বেদনা দিত। দুই তিন খানা চিঠি লিখেও কোন উত্তর এলনা। রহিম ও অন্তরে অন্তরে অধৈর্য্য হয়ে উঠতে লাগল। ফুলজান স্বামীর বেদনা বুঝে নানা আশা সান্ত্বনার কথা বলত। তারপর বর্ষা এল। কত দেশের কত নৌকো এল, গেল, রহিমের দেশের নৌকো একখানিও এল না। আশায় আশায় বর্ষা চলে গেল রহিমের যাওয়ার সুবিধা হলো না। প্রথমটা মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। শেষে ফুলজানের যত্নে সান্ত্বনায় অনেকটা সুস্থ হয়ে আগামী বর্ষার অপেক্ষায় আশায় বুক বেঁধে দিন গুনতে লাগল। ক্রমে এম্নি করে চার বৎসরের চারাটি বর্ষা এল গেল। রহিমের যাওয়া হোল না।

রহিম কারারুদ্ধের মত ছটফট করে চার বৎসর কাটিয়ে দিল দারুণ মানসিক কষ্টে। ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, অল্প অল্প জ্বর। আহারে অরুচি হয়ে শরীর শীর্ণ করে ফেল্লে। দিন দিন সে যেন নির্জ্জীব হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত লাগলো। সে আর লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলতো না, এক কোণে চুপ করে পড়ে থাকতেই চাইত। মাঝে মাঝে ফুলজানকে বলতো "ফুলজান, আমি বড় দুর্ভাগা, তাই তোমার মত স্ত্রী পেয়েও একদিনের জন্য সুখী হতে পারলাম না। তোমাকেও কেবল দুঃখই দিলেম। একবার মাকে দেখতে পেলেই আমি বাঁচি। আমার সব অসুখ ভাল হয়ে যায়। মাকে না দেখে, তোমায় ফেলে আমার মরণেও সুখ শান্তি মুক্তি নেই বুঝি; এ অসুখ আমার শরীরের নয়, মনের। আমি বেশ বুঝতে পারছি মাকে যে আমি কত আশা দিয়ে বুঝিয়ে রেখে এসেছি। এতদিন আমায় না দেখে সে কি বেঁচে আছে? কেমন করে আমার অন্ন জল রোচে? মা হয়তো না খেতে পেয়ে মরেছে, এমন বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।" সরলা পতিপ্রাণা ফুলজান ও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে। তার সকল বেদনা আপন হৃদয়ে অনুভব করে স্বামীর অশ্রু সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে নূতন আশা সান্ত্বনার কথা বলে বুঝাতে চেষ্টা করে, প্রাণপণে স্বামীর সেবা যত্ন করে। আবার বর্ষা এল এবার রহিমের গ্রামের না হয় ও দেশের একখানা নৌকা এল। মায়ের সংবাদ তারা দিতে পারলে না। কিন্তু রহিমকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলো। যাওয়ার জন্যে রুগ্ন রহিম ব্যাকুল, সে যেন আশার আনন্দে শরীরে নূতন বল পেলে। এখন আর এক মুহূর্ত্ত সে বিলম্ব করতে পারে না। তেমন কাহিল শরীর নিয়ে নিস্পরের সঙ্গে যেতে দিতে ফুলজানের বাপ মা কিছুতেই সম্মত হোল না। ফুলজান কিন্তু স্বামীর ব্যাথা বুঝে নীরবেই রইল। বাধা দিলে না। রহিম শ্বশুর, শাশুড়ী, পাড়া প্রতিবাসী সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন রাগে দুঃখে ফুলজানের

বাপ জ্ঞান হারাল, পাঁচজন প্রতিবাসী ও স্বজনকে ডেকে এনে রহিমের পথ আগলে বল্লে "যাবে যদি তবে আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে যাও। নইলে তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না।"

রহিম অবাক, কিছুক্ষণ পরে বল্লে "কেন? আমি তো একেবারে যাচ্ছিনে। মাকে নিয়ে এই মাসেই আবার ফিরে আসব।" ফুলজানের বাপ বল্লে "যদি পথে কিম্বা সেখানে যেয়েই তুমি মারা যাও, আমরা খবব পাবো কি করে যদি ইচ্ছে করেই না ফিরে এসো। বিদেশী লোককে বিশ্বাস কি? একবার বিশ্বাস করে ঠকেছি আর ঠকবোনা। চারি বৎসর এত যত্ন মমতা করেও যখন তোমার মন বাঁধতে পারিনি তখন আবার কিসের বিশ্বাস। রহিম বল্লে, "কি অপরাধে তাল্লাক দেবো। কেন? বিনা অপরাধে তাল্লাক দিলে খোদার কাছে ওনা হয়।" ফুলজানের বাপ বল্লে, "বেকুফ বাপের হতাভাগা মেয়ে বলে তাল্লাক দাও। কাঙালের ছেলের ঘোড়া চড়বার সখের মত আমি মূর্খ চাষা হয়েও বিদ্বান জামাই এর সখ করেছিলাম সেই অপরাধে তাল্লাক দাও। তাল্লাক তোমায় দিতেই হবে, নইলে কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।" কাতর স্বরে রহিম বল্লে "তবে তাকে একবার ডাক, শুনি সে কি বলে," ফুলজান বাইরে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। তাব কর্ত্তব্য সে স্থির করে রেখেছিল। সে এলে সবাই সয়ে গেল। রহিম তাব মুখপানে চেয়ে নিরাশ কাতর স্বরে "কি করি ফুল?" বলে আর কিছুই বললে না, তার অবসন্ন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পডলো, সে উপায়হীন বালকের মত কাঁদতে লাগলো। ফুলজান সযত্নে স্বামীর শীর্ণ দেহ আপনার বুকে তুলে নিয়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো তার ও চক্ষু শুষ্ক ছিল না, কিন্তু সে নিজের অধীরতা এতটুকু কাউকে জানতে দেয়নি। স্বামীর চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে "অত অস্থির হয়ো না, আমার কথা শোন ফারখৎ পত্রে সই করে দিয়ে তুমি চলে যাও। কিছু ভেবো না ভাবনার কিছু নেই এতে। মায়ের চেয়ে দুনিয়ায় কেউ বড় নয়। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, আমায় জান তুমি, তবে ভাব কেন? তুমি মাকে দেখে এসো। তোমার আসার আশাটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাই নিয়ে আমি জন্মজন্মান্তরে কাটিয়ে দিতে পারবো, তোমার ওপর আমার অসীম বিশ্বাস আছে, আসবেই তুমি আমার কাছে।' আমার ওপরেও যেন তুমি বিশ্বাস হারিও না, মায়ের কাছে যাও কোন বাধা গ্রাহ্য কোরো না। তাঁর ওপর কর্ত্তব্য সব চেয়ে বেশী। আমাকে সব চেয়ে বড় দেখলেই কখনই তোমার ওপর এমন ভক্তি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভালবাসা আসত না তোমার। যে স্ত্রীর জন্য মাকে ভুলে থাকতে পারে, সে কি মানুষ? যাও তুমি। যতটুকু জ্ঞান তুমি আমায় দিয়েছ, তাই নিয়ে তারই বলে বুক বেঁধে তোমার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকতে পারবো, তালাক নামার জন্য ভেবো না, আল্লার হুকুমে তোমার আমার যে সম্বন্ধ, তুচ্ছ তালাক নামার সাধ্য কি সে সম্বন্ধ মুছে ফেলে। এ বন্ধন জন্মজন্মান্তরের কার সাধ্য ছিঁড়ে ফেলবে? আমি তোমার স্ত্রী আশীর্বাদ কর আল্লার দোয়ায় যেন 'স্ত্রী' নামে কলঙ্ক না আনি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত সুখ দুঃখের যেন সমভাগিনী হতে পারি।" তারপর উঠে স্বামীকে সেলাম করে বল্লে "মনে রেখো জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্যন্ত তোমার আসার প্রতীক্ষা করবো। আসবে তুমি?"

দৃঢ়স্বরে রহিম বল্লে "নিশ্চয়। মরণ ভিন্ন আর কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আল্লা জানে, এখানে আমার প্রাণ ফেলে রেখে গেলেম। ফুলজান, তোমায় একবার না দেখে বেহেস্তে যেয়েও আমার সুখ হবে না।" স্বামীর কাছে বিদায় নিয়ে ফুলজান বেরিয়ে আসতে আবার সকলকে নিয়ে তার বাপ ঘরে গেল। এবার রহিম বিনা বাক্য ব্যয়ে ফারখৎ পত্রে সই করে দিয়ে চলে গেল।

নৌকা চলে গেলে ফুলজান বাড়ী ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় নিলে। তার তখন মনে হচ্ছিল আজ থেকে যেন তার সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ মুছে গেল। সকল বন্ধন যেন খসে পড়েছে। করণীয় আর যেন কিছু নেই, তাকে যেন আর কারুর প্রয়োজন নেই, সে যেন সংসারের আবর্জনা, তাই বিধাতার হস্ত চালিত অদৃষ্ট শতমুখী তাড়নায় সংসারের এক কোণে তাকে জড়ো করেছে। দুর্ব্বহ জীবন বহন করবার মত শক্তি ও প্রয়োজন নেই। দুনিয়ায় সে আজ বড় একা তার যেন সকল কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে। এখন কোন মতে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা। যেন সমস্ত দুনিয়া খুঁজে তার জন্য এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু আলো, কোন কিছু অবলম্বন মিলবে না, ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রার ঘোর এসে স্বপ্নের উজ্জ্বল চিত্র তার সম্মুখে ধরলে। সে দেখলে রহিম এসে স্নেহ কোমল স্বরে বলছে "ছিঃ ফুল আমায় এত বুঝিয়ে নিজে ভেঙ্গে পড়ছ কেন? কই তোমার সে ধৈর্য্য? এই বুঝি তোমার প্রতীক্ষা করা? আমি তোমার কাছে না এসে পারিনে সে বিশ্বাস এর মধ্যেই হারালে? যে কর্ত্তব্যর জন্য আমি তোমা হেন স্ত্রীকে ফেলে যাচ্ছি সে কর্ত্তব্যর দ্বার, চেয়ে দেখ তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত। বুড়ো বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিও না, দুনিয়ায় নিজের সুখটুকুই সবচেয়ে বড় নয়, কর্ত্তব্য সবচেয়ে বড়। নিজের আরাম পশুতেও খোঁজে বোঝে, আমরা ও যদি তাই চাই তবে আমরা তাদের চেয়ে বড় কিসে? মানুষ নামের যোগ্য কিসে? ওঠো মন বাঁধ। তোমার অসীম স্নেহ অক্লান্ত সেবা-যত্নকে একজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা খোদার অভিপ্রায় নয়। সমস্ত শিশু, পশু অনাথ আর্ত্তের জন্য তোমাকে উৎসর্গ কবে দাও শান্তি পাবে, আল্লার উপর বিশ্বাস রাখ, তার মেহেরবানীর সীমা নেই, মুর্খ আমরা অন্ধ আমরা দেখতে বুঝতে পারিনে চেষ্টা করিনে। আমি আসবোই ফিরে কোন কিছু ভেবো না আল্লার দোয়ায় সব হয়।" পরদিন থেকে ফুলজান সত্যই আশায় আশ্বাসে বুক বেঁধে এই স্বপ্নাদেশ কাঁটায়, কাঁটায় প্রতিপালন করে আসছে। সত্যই সে পিতা মাতা অতিথি প্রতিবাসী শিশু পশু রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে শান্তি পেয়েছে। রহিম চলে যাওয়ায় ফুলজানের বাপ মায়ের মনেও যথেষ্ট আঘাত লেগেছিল। তারা জামাইকে ছেলের মতই স্নেহের চোখে দেখেছিল। একবৎসর পরে ফুলজানের কথা অল্প কানাঘুষো হতেই সে দৃঢ়স্বরে মাকে বলেছিল "ফের ও কথা শুনলে নদীতে ডুবে মরবো।" বাপ মা মেয়ের মেজাজ বুঝে আর কোন কথা মুখে আনতে সাহস করেনি।

তারপর কতবৎসর চলে গিয়েছে। বাপ মা মৃত্যুর কোলে স্থান পেয়েছে রহিম বা তার কোন সংবাদ আসেনি। তবু ফুলজানের আশা বিশ্বাস অক্ষয় অটুট চিরনূতন। বিকালে নদীতীরে প্রতীক্ষা করাটা তার অভ্যাস বা রোগের মত দাঁড়িয়েছে। প্রত্যহ বিকালে

মন্ত্রচালিতের মত তাকে যেতেই হবে, না যেয়ে পারে না। রহিম কখনো ফিরবে কিনা ভগবান জানেন। ফুলজানের কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস সে ফিরে আসবেই। বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে দুঃখ চিন্তার অন্ধকার তার মনের কোণে ও দাঁড়াতে পারে না। সংসারে যে কাজ খোঁজে তার কাজের অভাব হয় না। ফুলজান সারাদিন নানা কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখে সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে লোকে যেমন চেষ্টা যত্ন করে আহ্নিক উপাসনা নমাজের জন্য একটু নির্দিষ্ট নিশ্চিন্ত অবসর সময় করে নেয়, ফুলজান তেম্নি এই প্রতীক্ষার সময় করে নিয়েছে। সমস্ত দিন রাত্রির বাকি সময়টা সে হাসিমুখে বিশ্বসংসারের কাজে ব্যয় করতে পারে, কেবল ঐটুকু নয় ঐটি তার নিজের কাজ। ও থেকে এক মুহূর্ত্ত সে কারুর জন্য ব্যয় করতে পারে না, আমি কিন্তু ভেবে অবাক, এই পনেরো যোল বৎসরেও (ঠিক জানিনে, জিজ্ঞাসা ও করিনি) ওর দমবন্ধ হয়ে আসেনি? আমার মনে হয় ফুলজানের তুলনা ফুলজান, এমন অসীম ধৈর্য্যের কথা কোথাও শুনিনি। সামান্য কৃষক কন্যা হলেও তার পতি ভক্তি অতুলনীয়। কি বল? আমার কিন্তু ওর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছা হয়। সত্যি করে বলোত, শিক্ষিতা ভদ্র মহিলার মধ্যে এই অশিক্ষিতা চাষার মেয়ের স্থান কোথায়? এমন ফুলজান কটা দেখেছ? জানিনা সাধ্বী ফুলজানের প্রতীক্ষার শেষ কতদূরে? এটা যদি প্রেতের রাজ্য না হয় যদি ন্যায়বান ভগবানের রাজ্য হয় তবে তার পুণ্যের পুরস্কার সে নিশ্চয় একদিন পাবে।

লিখতে লিখতে অনেক লিখে ফেলেছি, তোমার বিরক্ত লাগছে? মাফ করো ভাই। তারপর একটা নতুন খবর দিয়ে আজকের মতো ইতি করবো। আমরা এমাসেই বাড়ী যাবো, কেন তা বোধ হয় বলতে হবে না? আমার অবস্থাটা না বুঝেই তুমি বোধ হয় হেসে আকুল হবে। আমার কিন্তু ফুলজানের দশা দেখে সে অজানা পথের অচিন সাথীটির মন যুগিয়ে চলার কথা ভেবে বড্ড ভয় হচ্ছে। আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথা শুনে ফুলজানের চোখ দুটি জলে ভরে আসে। আমারও তাকে ছেড়ে যাবো ভাবতে কেমন কষ্ট বোধ হয়। তাকে কখনো ভুলতে পারব না।

বেশ গুছিয়ে লেখা আমার আসে না, বিদ্যাতো জানই। তবু গল্পটা কেমন লাগে লিখো। এ কাহিনীটি যে কল্পনা প্রসূত গল্প বা একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়, এ কথাটা যেন মনে থাকে। ইতি— তোমার স্নেহের উষা।

'প্রবাসী'—১৩২২

খান তিনেক চিঠি

সবোজকুমাবী দেবী

১

ভাই দিদি! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। তুমি যেদিন শ্বশুড়বাড়ী চলে গেলে, সে প্রায় বছর খানেক হতে চল্‌ল। এর মধ্যে মাসীমার কাছে তোমার খবর মাঝে মাঝে পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার কোন খবর তোমায় দিতে পারিনি। এ কমাসে আমার উপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গেছে, কত যে সহ্য করতে হয়েছে, সে আর কত বলব! একটু নিশ্চিন্ত হয়েই তোমাকে সাধ্যমত সে সব বিষয়ে শোনাতে বসেছি। কারণ আমার এ দুঃখের কাহিনী তুমি ছাড়া জগতে কে শোনবার লোক আছে?

তুমি ত দেখেই গিয়েছিলে এদিকে মার শরীর দিন দিন কি রকম ভেঙ্গে পড়ছিল। রোজ রাত্রে তাঁর জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তিনি ত কারো কথা শোনবার লোক ছিলেন না। তারই ওপর সকালে স্নানও চলত ভাত ত খেতেনই। আমি যখন বড় পীড়াপীড়ি করতাম, তখন বলতেন, 'আমার ও বাতিকের জ্বর, ওতে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করলে চলে না।' আমি কি এত জানি, তাই বুঝতাম। কিন্তু বেশী দিন এভাবে গেল না। দু তিন মাসের মধ্যেই মা শয্যাগত হয়ে পড়লেন, হাত, পা মুখ ফুলে উঠ্‌ল।

গ্রামে আমাদের ডাক্তার কবিরাজেরও যেমন দুর্দ্দশা, আর আমাদের অবস্থাও তেমনি; কাজেই বুঝতেই পারছ, যে মার চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন হ'ল। দিনদিন তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। আমি ত চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর মার মাথার কাছে বসে আছি, এমন সময় তিনি বল্লেন, "আমার ত দিন ফুরিয়ে এল, তা সেজন্যে আমার দুঃখ নেই, এখন তোমাব একটা হিল্লে করে দিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

এ কথাশুনে আমি কেঁদে ফেললুম, বল্লুম, "মা! তুমি এসব কথা বল না। তুমি গেলে আমার গতি কি হবে? আমি কোথায় দাঁড়াব তাহলে?"

মা বল্লেন, "সেইত আমার ভাবনা মা! এতদিন আমি ছিলাম, একরকম করে চলে যাচ্ছিল, এখন তোমায় কার হাতে দিয়ে যাব, এই ভেবে-ভেবেই মরতে বসেও আমার স্বস্তি নেই। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে হারুর মাকে ডেকে সে দিন জামাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলুম। আজ সে ফিরে এসেছে। বিকেলে যখন তুমি ঘাটে গিয়েছিলে, তখন সে এসে আমায় বলে গেল, জামাই বলেছেন, দু-একদিনের মধ্যেই এখানে আসবেন। এতদিনের পর আমার এ অসময়ে তাঁর দয়া হয়েছে। এলে, তাঁর হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মার কথা শুনে আমার মনে তখন অন্য ভাবনার উদয় হ'ল। স্বামী? আমার স্বামী আসবেন? জ্ঞান হয়ে মার কাছে এইটুকু শুনেছিলাম যে সাতবছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। মা দরিদ্র কুলীন, জামাতার মর্য্যদা রক্ষা করা তাঁর সামর্থে কুলায়না—কাজেই

তিনি বিয়ের পরে আর এ মুখো হন নি। সে কথা আমার বিন্দুমাত্রও মনে নেই। এতদিন মনে করবার জন্য কোন আগ্রহও হয়নি। কিন্তু আজ মার কথা শুনে স্বামী যে কেমন—তাঁর চেহারাটি কি রকম—এসব মনে করতে অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু বিশেষ কিছু মনে হল না। আর, সাতবছর বয়সে যাকে বিয়ে করে রেখে গেছেন, আজ তার আঠার বছর বয়স হল, এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও যিনি বিবাহিতা স্ত্রীর একটা কোনও খোঁজ পর্য্যন্ত নেননি, তাঁর উপরে বিশেষ শ্রদ্ধা হল, তাও নয়। তবু আমি মার কথার কোন উত্তর দিলুম না।

তারপরে তিন-চারদিন কেটে গেল। একদিন আমি ঘরের সব কাজ কর্ম্ম সেরে বিকেলে ঘাটে জল আনতে গিয়েছি, মা তখন একলা শুয়েছিলেন, ফিরে এসে দরজার কাছ থেকে শুনলুম, ঘরের ভিতরে পুরুষের ভারী গলায় কে কথা কইচে, আমি চমকে উঠলুম। তবে কি যাঁর আসার কথা ছিল, তিনিই এসেছেন? আমি তখনি ঘরে না ঢুকে দরজার আড়াল থেকে ঘরের ভিতর চেয়ে দেখি মার বিছানার পাশে একজন পুরুষ বসে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়, যেন আরও বেশী বয়স হয়েছে। বার্দ্ধক্যের ভারে শরীর যেন নুয়ে পড়েছে। তিনি সুশ্রী কি কুৎসিত সেটা দেখবার আর ইচ্ছা হল না। আমার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপছিল, কেবলি মনে হচ্ছিল ইনিই কি আমার স্বামী?

বেশীক্ষণ সন্দেহে থাকতে হল না। ঘরে ঢুকতেই মা বল্লেন, "অমিয়া! এদিকে এস! ইনি তোমার স্বামী! প্রণাম কর!"

আমি নিঃশব্দে মার আজ্ঞা পালন করলুম। মা তখন আমার হাত ধরে তাঁর জামাইয়ে হাতে দিলেন, "ওকে একটু যত্ন কর। এতদিন যে দেখনি, খোঁজ করনি, তাতে কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু আজ তুমি ছাড়া সংসারে আর ওর কেউ নেই।"

মার জামাই যে একথার উত্তরে বিড়বিড় করে কি বল্‌লেন আমি তা কিছু বুঝতে পারলুম না! বুঝতে ইচ্ছাও ছিল না। মা আমাকে বললেন, "যাও! মুখ হাত ধোবার জল দাও। দিয়ে ওঁর জল খাবারের যোগাড় কর!" আমি হাঁপ ছেড়ে তখনি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

আমি নিঃশব্দে সংসারের কাজ আর মার সেবা করি আর অবসর পেলে নিজের বইগুলি পড়ে সময় কাটাই। স্বামী আমার সঙ্গে পরিচয় করবার কোন চেষ্টা করেন না। বরং তাঁর মার সঙ্গে যে সব কথা হত তা শুনে আমার সন্দেহ হত যে তিনি, আমার জন্য যত আসুন আর নাই আসুন, মার কোথায় কি সম্পত্তি আছে, কি করে আমাদের দিন চলে, এই সব জানবার জন্যই তাঁর বেশী আগ্রহ। আমার উপরে যে তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না, তা বলতে পারি না। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আমার চালচলন, আমার প্রত্যেক কাজকর্ম্ম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে দেখছেন!

একদিন আমি আড়াল থেকে শুনি, তিনি মাকে বলছেন, "আমাদের গৃহস্থঘরের মেয়েরা রাঁধবে, বাড়বে, কাজকর্ম্ম করবে, সংসার দেখবে। এই ত আমরা জানি, আপনার

মেয়ের ত দেখি সবই উলটো? চব্বিশ ঘণ্টাই ফিটফাট! মাথার চুলটি এদিক হতে ওদিক যায় না, সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন, কাপড় সেমিজ ভিন্ন পরা হয়না! এর উপর ত রাতদিন বই হাতে করে বসে থাকে দেখতে পাই! আমাদের গরীবের ঘরে এমন নভেল-পড়া বিবি নিয়ে কি কবে চল্‌বে?''

মা একথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ''বাছা! তুমি আমার মেয়ের পরিচয় জান না তাই একথা বল্লে। আমার নিজের মেয়ে বলে বলছিনা—কিন্তু এমন শান্ত মেয়ে তুমি আর সহজ দেখতে পাবে না। আগে তাকে নিয়ে ঘর কর তারপরে আমার কথা বুঝতে পার্ব্বে। এই ত তুমি এখানে কদিন এসেছ—ঘরসংসারগৃহস্থালীর কাজ কে করছে, কে এ সংসার চালাচ্ছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ, রাতদিন রান্নবান্না, বাসন মাজা, ঝাঁটপাট, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, কাপড়কাচা, এতসব কাজ করেও যদি সে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে তাহলে সেটা তার গুণের পরিচয় না হয়ে দোষ হয়ে দাঁড়ায়? আর পড়া-শোনার কথা যদি বল, ও ছেলেবেলা থেকে আমাদের পড়সী অনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে মানুষ হয়েছে। তিনি নিজে শিক্ষিত লোক— মেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে বড় ভাল বাসেন। তিনি তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে বরাবর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁর যত্নে ও চেষ্টায় ও এখন বেশ ভালরকম বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখেছে। তাঁর স্ত্রীর কাছে নানারকম শিল্পকাজ সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। অমার কাছে মানুষ হলে কি আর এমন হতে পারত? অন্যে যখন দয়াকরে ভালবেসে তাকে শেখাতে চাইলেন, আমি তাতে বাধা দিইনি। কারণ ওগুলো যে দোষের কাজ তা আমার ধারণা ছিল না।''

মার কথা শুনে তাঁর জামাই আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমার এ রকম লেখা পড়ার কথাশুনে তিনি যে বিষমবিরক্ত হয়েছেন তা বেশ বুঝতে পারলুম। ভয়ে ও নিরাশায় আমার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। এই স্বামী। এই লোকের অধীনে আমায় চিরকাল কাটাতে হবে। আমার ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকার, আজ তা কতকটা বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠলুম।

তাঁর আসবার প্রায় হপ্তাখানেক পরে একদিন মার অবস্থা খারাপ বোধ হতে লাগল। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে লাগল। অসংলগ্ন কথাও দু একটা বলতে লাগলে। আমি ত ভয়ে আকুল হয়ে সারা রাত তাঁকে নিয়ে জেগে বসে রইলাম। তাঁর জামাই নিজের বিছানায় বসে বসে আফিঙ্গের নেশায় ঝিমুতে লাগলেন।

সকাল বেলা পাড়ার লোকে খবর পেয়ে এসে তাঁকে ধরাধরি করে তুলসীতলায় নিয়ে গেল। বেলা দশটার সময় সব শেষ হল। সংসারে আমি অনাথা।

যেদিন মার চতুর্থী হয়ে গেল সেদিন আমার স্বামী বল্‌লেন, ''আমি কাজ কর্ম্মের ক্ষতি করে আর এখানে বসে থাকতে পারি না। কাল সকালে বাড়ী যেতে হবে। সব ঠিক ঠাক করেনাও।''

গ্রাম ছেড়ে আসতে আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হচ্ছিল। ছোটবেলাকার সুখদুঃখের স্মৃতি, মার কত কথা মনে হয়ে আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল, তা বলতে পারিনা। কিন্তু আমি

মনের দুঃখ মনেই চেপে মুখটি বুঁজে তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামে গেলুম।

আমাকে বাড়ী এনে স্বামী বল্‌লেন, "আমি এখানকার জমিদার সরকারের আট টাকা মাইনের মুহুরীগিরি করি। আমার স্ত্রী যে চব্বিশ ঘণ্টা জ্যাকেট সেমিজ পরে বই হাতে করে বসে থাকবে, সে আমি সইতে পারব না। তোমার মার কাছে যা করেছ সে সব ভুলেযাও। এই আমাব ঘরকন্না দেখে নাও—কাজকর্ম্ম কর, খাওদাও থাক, আমার মত গরীব লোকের ঘরে এর চেয়ে বেশী আর কিছু হতে পারবে না।"

এ কথার কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করলাম না। সেই থেকে স্বামীর ঘর করছি। তুমি এ কথা জেনে বোধ হয় খুব সুখী হবে। এতক্ষণ নিজের কথাই সাতকাহণ করলুম। এইবার একটু তোমার খবর নেওয়াযাক্। তুমি কেমন আছ? তোমার খোকা কেমন? তাকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। উকীলবাবু কেমন আছেন? তাঁর কাজকর্ম্ম কেমন চলছে লিখো। তোমার চিঠি পেলে আর যা লেখবার আছে, লিখবো। আজ তবে আসি।

ইতি—

তোমার স্নেহের অমিয়া

২

ভাই দিদি! তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে সুখী হলুম। আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু আমার আর থাকাথাকি কি ভাই? দিন কাটাতে হয়, কোন মতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। সুখ দুঃখের কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরোনা। তবে আমাদের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে কিসে কি হল, তা তোমায় লিখছি।

তোমায় আগে লিখেছিলেম, যে আমি শ্বশুরবাড়ী এসে স্বামীর ঘরকন্না করছি। তাঁর মনে বোধ হয় ভাবনা ছিল যে, এই লেখাপড়া-জানা নভেল পড়া স্ত্রী নিয়ে তাঁর ঘরকন্না কি করে চলবে। কিন্তু যখন দেখলেন আমি গাঁয়ের আর-আর মেয়েদেরই মত দিবারাত্রি সংসারের কাজেই মন ঢেলে দিয়েছি, পড়াশুনার ধার দিয়েও যাইনা. বিশেষ কারও সঙ্গে মিশিও না, তখন তিনি আমার উপর কতটা তুষ্ট হয়েছেন বলে বোধ হল। মিথ্যা বলব না—আমার সঙ্গে তিনি কোন কঠোর ব্যবহার করেননি। তবে, তিনি কেবল আমার সেবা টুকু গ্রহন কবেই, সন্তুষ্ট ছিলেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যটুকু শেষ করেই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে প্রথম প্রথম মেশবার চেষ্টা করেছিলাম. কিন্তু কেন জানিনা আমার সঙ্গে কেউ ভাল করে মিশল না। আমি কাছে গেলে ভাল করে কথা কয়না, অথচ আমাকে দেখলে এ ওর গা টেপাটেপি করে আর চাপা হাসির ঘটা পড়ে যায়, তাও বুঝতে পারি। একদিন এইসব ব্যাপার দেখে আমি কিছু না বলে চলে আসছি, শুনলুম একজন আমাকে শুনিয়ে বলছে, দেখেছিস্ কিরকম জাঁক। আমরা যেন ওর সমযুগ্যিই নই। কথা না কয়ে চলে যাওয়া হল। কিসের যে এত গরব তাও ত জানি নে।"

আর একজন বল্লে, "রূপের! রূপের! এ আর বুঝতে পারিস নে। রূপের দেমাকে মটমট্ কচ্ছেন। তবু যদি আট টাকা মাইনের মুহুরীর বাঁদী না হতেন।"

এই সমালোচনা শোনবার পর থেকে আমি আর কারও কাছে যাইনা। আপনার মনে কাজ কর্ম্ম করি, আর ঘরে পড়ে থাকি। যা হোক্ একরকম নির্ব্বিবাদে দিন কাটছিল।

একদিন হঠাৎ স্বামী রক্ত আমাশয় রোগে পড়লেন। একে তাঁর জরাজীর্ণ শরীর, তার উপর আফিঙ্গ খেতেন, রোগটি বেশ চেপে ধরল। প্রথম দুতিন দিন সামান্য টোটকা ওষুধ খেলেন। তাতে কিছুই হল না, দিন দিন বড়কাতর হয়ে পড়লেন। চারদিনের দিন সকাল বেলা জমিদারবাড়ী থেকে একজন পাইক এল। স্বামী তিন-চারদিন কাজে যাননি কেন, তাই জানবার জন্য দেওয়ানজী তাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পাইককে ডেকে নিজের অবস্থা সব বললে, তার পর বলে দিলেন। "একবার ছোটবাবুকে আমার অসুখের কথা জানিয়ে বলবি যে তিনিত কত গরীব দুঃখীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করে প্রাণ দিয়েছেন, যদি আমার ওপর দয়া করে একবার আমায় দেখে যান, তবেই যদ্দি এ যাত্রা বাঁচি, নয়ত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করাবার শক্তিও আমার নেই, আর আমায় বাঁচতেও হবে না"। এই কথা বারবার বলে তাকে কিছু পয়সা জল খেতে দিয়ে বিদায় করলেন। সেত চলে গেল। স্বামী আমাকে তখন বল্লেন, "আমাদের জমীদারের বড় ছেলে শরৎবাবু কলকাতা থেকে চারটে পাশ দিয়ে এসেছেন। গরীব দুঃখী প্রজারা অনেক সময় রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় বা হাতুড়ে কবিরাজের হাতে পড়ে বিঘোরে মরে। সেই জন্য তিনি ডাক্তারী পড়েছেন। দরকার হলে রোগীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন, অসমর্থ রোগীর ওষুধ পথ্যের খরচ সব নিজেই দেন। এছাড়া গ্রামের উন্নতির জন্য যে কত চেষ্টা করেছেন সে আর কি বলব! যাতে গ্রামে ম্যালেরিয়া না হতে পায় সে জন্য চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যবস্থা, যত সব পাঁক পড়া মহাপুকুর ঝালিয়ে পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত, ছেলেদের পড়বার জন্য গ্রামে স্কুল, এ সব করেছেন। তাঁর চেষ্টায় গ্রামে একটা লাইব্রেরী আর একটা দাতব্য ঔষধালয় হয়েছে। এই বার শুনছি মেয়েদের জন্য তিনি একটা স্কুল করবার চেষ্টা কচ্ছেন। তাঁর গুণের কথা আর কত বলব? যদি একবার আমার অসুখের কথা তাঁর কাণে ওঠেত দেখবে তখনি নিজে এসে উপস্থিত হবেন।"

আমি নীরবে সব শুনলাম। যদিও জমীদার-পুত্রকে চিনিনা, জানিনা তবু তাঁর গুণের খবর শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুকটি ভরে গেল।

তার পরদিন সকালে আমি যখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছি তখন বাইরে থেকে আমার স্বামীকে কে একজন ডাকলে। তার পরেই দেখি এক যুবাপুরুষ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি ত তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে থতমত খেয়ে সরে দাঁড়ালাম। তিনিও আমায় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। আগের দিনের পাইক এসে আমার স্বামীকে বল্‌লে্ ছোটবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামীত উঠতে পারেন না-সশব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন তাঁকে ঘরের ভিতর নিঁয়ে এস। পাইক চলে গেল। স্বামী আমায় বললেন, শীঘ্র একখানা ভাল আসন দাও। আসনের মধ্যে ত ঘরে দুখানা পিড়া—কাজেই আমি আমার নিজের হাতে বোনা একখানা আসন বের করে জলচৌকির উপর পেতে দিয়ে সরে দাঁড়ালেম। শরৎবাবু ঘরে এসে আমার স্বামীকে বললেন, "আমি জানতাম ঘরে আপনি

একলাই থাকেন। তাই একেবারে এসে ঘরে ঢুকে ছিলাম।'' বলে আরও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে?'' স্বামী সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে আমার এখানে আসবার সব কথা বললেন। শরৎবাবু আর একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তারপর তিনি রোগীকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করলেন। যা যা জানবার ছিল জিজ্ঞাসা করে দেখে শুনে শেষে বল্লেন, ''আপনার রোগ সারতে কিছু সময় লাগবে, কারণ এখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আমি রোজ সকালে এসে আপনাকে দেখে যাব। আর ঔষধপথ্য যা দরকার, এই পাইক সব দিয়ে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।

শরৎবাবু চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রায় দুই হপ্তা পরে আমার স্বামী দুটি অন্নপথ্য পেলেন। কিন্তু তিনি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, আবার যে আগের মত খেটে খেতে পারবেন সে আশা আর করতে পারলেন না। তাঁর কোন বিষয় সম্পত্তি ছিল না। সামান্য যা উপার্জন ছিল, তাইতে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলত, সঞ্চিতও কিছু ছিল না। অন্নচিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

আমি কোনদিন তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলিনি। তাঁকে কাতর দেখে একটা কথা আমার মনে আসত, কিন্তু আমি নিজ হতে মুখ ফুটে কিছু বললাম না। শরৎবাবু এখন আর রোজ আসেন না। দু-চার দিন অন্তর এসে খোঁজ খবর নিয়ে যান। ক্রমেই অভাব আমাদের সংসারে বেড়ে উঠতে লাগল।

একদিন সব কাজকর্ম্ম সেরে আমি চুপ করে বসে আছি, এমন সময় আমার স্বামী বললেন, ''দিন চলবার ত আর কোন উপায় দেখছি না। শেষটা কি এই বুড়োবয়সে অনাহারে মরতে হবে নাকি, কিছুত বুঝতে পারছি না। শরীরও ত একেবারে অশক্ত হয়ে পড়ল। আমিত মনে মনে ভাবছি এবার যেদিন শরৎবাবু আসবেন তাঁকে একবার অবস্থাটা খুলে বলব, যাতে আমাদের কিছু উপায় হয়। কি বল?''

আমি কিছু উত্তর দিলুম না; কিন্তু ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতে হবে, একথা মনে হবামাত্র ঘৃণায় সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

স্বামী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বললেন, ''কই তুমি যে কিছু বল্লে না''?

তখন আমি বল্লাম, ''তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমি আর তাতে কি বলব বল? তবে, যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলি, যে নিজের পরিশ্রমে যদি একবেলা দুমুঠো শাকান্ন খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, সেও ভাল, তবু পরের গলগ্রহ হয়ে ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকা আমি ঘৃণা করি। অমি গরীবের মেয়ে, তবু এটুকু আত্মসম্মান আমার আছে।

স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, ''সে কথা সত্য বটে, কিন্তু পরিশ্রম করবার শক্তি কৈ? যতদিন তা ছিল, ততদিন কি একথা বলেছি?

আমি বল্লাম, ''তোমার নেই আমার ত আছে?''

তিনি একথায় বিস্মিত হয়ে বল্লেন, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দ্বারা কি কাজ হবে?''

আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লাম, ''স্ত্রীলোক বলে কি আমি কিছুই করতে পারি না? কিছু না পারি-যদি, ত লোকের বাড়ী রেঁধেও ত নিজের পেট চালাতে পারি। যা

মাইনে পাই তাতে তোমার খরচ চলতে পারে? ভিক্ষার চেয়ে সে কি ভাল নয়? কিন্তু তাও করতে হবে না। তুমি না সেদিন বলেছিলে যে গ্রামে মেয়েদের স্কুল হচ্ছে? তোমার যদি মত হয়, আমি সেই স্কুলের কাজ নিয়ে মেয়েদের পড়াতে পারি, সেলাই শিখাতে পারি।''

তিনি অনেকক্ষণ কি ভাবলেন। বোধ হয় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর চিরদিনের যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা ছিল, দারুণ অভাব ও অন্নচিন্তায় পড়ে ক্রমে সেটা অন্তর্হিত হয়ে আসছিল। বহুক্ষণ পরে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "আমি এতদিন তোমায় চিনতে পারি নি। যাক্ শরৎবাবু এলে আমি তোমার কথা তাঁকে বলব''।

দুএকদিনের মধ্যেই শরৎবাবু এলেন। স্বামীর শারীরিক কুশলতাদি জানবার পর তিনি বসলে, স্বামী তাঁকে আমাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জানালেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে বললেন, ''এ কথা আপনি এতদিন ত আমাকে কিছুই বলেন নি। আপনি আমাদের এতদিন পুরাণ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, আপনি যদি এখন অশক্ত হন, ত আপনার সব ভার আমাদেরই—''

স্বামী বল্লেন, ''আপনার অসীম দয়া! কিন্তু এ ব্যবস্থায় আমার স্ত্রী সম্মত নয়। সে বলে আমার খাটবার ক্ষমতা থাকতে এ-ভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা বড় ঘৃণা ও লজ্জার কথা''

আমি ঘরেই ছিলাম। দেখলাম এ কথাশুনে তাঁর চোখে বিস্ময় ও আনন্দের আভাফুটে উঠল। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তাহলে ওর কি ইচ্ছা আমাকে খুলে বলুন। উনি তবে কি করতে চান? কি ভাবে আমার সাহায্য পেতে চান তা শুনি?''

স্বামী তখন আমার কথা সব তাঁকে খুলে বল্লেন। শরৎবাবু একথা শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে শেষে বল্লেন, ''দেখুন। আজ আপনার কথা শুনে আমি যে কি পর্য্যাপ্ত সুখী হয়েছি, তা আর কি বলব? আমি অনেকদিন থেকে মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল খুলতে চেষ্টা করছি। ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক গ্রামের অনেকেই মেয়ে পাঠাতে রাজী হয়েছেন। স্কুল বাড়ীও ঠিক করে রেখেছি। কেবল উপযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রী এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি বলে স্কুল খুলতে পাচ্ছি না। কলকাতা থেকে আনতে গেলে টাকা অনেক বেশী পড়ে। স্কুলের এই প্রথম অবস্থায় সেটা সুবিধাজনক নয়। উনি যদি এ ভার নেন তাহলে যে শুধু আপনার সুবিধা তা নয়, আমারও যে কি উপকার করা হয় সে আর মুখে কি বলব? তা হলে আজ আমি আসি। শীঘ্রই সব ঠিক করে আপনাকে জানাব।''

তিনি উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন, ''যেদিন আপনাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিনই আমার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, আপনার স্থান সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। আজ আপনার পবিচয় ভাল করে পেয়ে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল। বেশী আর কি বলব; যদি আপনার আদর্শে আমাদের এই গ্রামে মেয়েরা উন্নত হতে পারে, তবেই বুঝব আমার এতদিনের সব পরিশ্রম সফল হয়েছে''।

আমি শুধু নীরবে নমস্কার করলাম। প্রতি-নমস্কার করে তিনি প্রফুল্লচিত্তে চলে গেলেন।

এখন আমরা স্কুল বাড়ীতে থাকি। স্কুলের ঝি আমার সব কাজকর্ম্ম করে দেয়। এখনও বেশী মেয়ে জড় হয়নি। ছোট বড় সবশুদ্ধ পনেরটি। এদের পড়িয়ে, সেলাই শিখিয়ে, আমার বেশ একরকমের দিন কাটছে। আমাদের সব অভাব দুর হয়েছে। তবে, স্বামীর শরীর দিন দিন বড় অপটু হয়ে পড়ছে।

তোমাদের সবখবর দিও। খোকা কেমন আছে? সে এখন কথা বলতে পারে কি? আমার ভালবাসা জানাবে ও স্নেহের চুম্বন খোকাবাবুকে দেবে! আজ এই পর্য্যন্ত—

ইতি —

তোমার স্নেহের বোন অমিয়া।

৩

ভাই দিদি! এবার তোমার চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরী হয়ে গেল। হয়ত তুমি মনে মনে এজন্য রাগ করেছ, কিন্তু কেন যে তিনচারমাস তোমার খবর নিতে পারি নি, তা জানলে আর তুমি আমাব দোয দেবেনা।

প্রথমেই একটা খবর দিচ্ছি, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীর মোটেই ভাল ছিল না, বয়সও হয়েছিল, বিশেষ সেই রক্ত আমাশয়ের পর থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, তার উপর জ্বর হল, সে ধাক্কা আর সামলাতে পারলেন না। মার মৃত্যুর পর এতদিন তিনিই আমার অভিভাবক ছিলেন। আজ তিনিও চলে গেলেন। সংসারে আজ আমি একেবারে একলা।

আমি এখনও আগের মত স্কুলে কাজ করি, মেয়েদের নিয়ে কোনমতে দিন কাটাই। মেয়েরা সকলে আমাকে খুব ভালবাসে। যদি এইরকমেই এখানে আমাব সারাজীবনটা কেটে যেত, তাহলে তার চেয়ে প্রার্থনীয় আমার আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার অদৃষ্টের লিখন অন্যরূপ – কাজেই তা হল না। আমাব এখানকার বাস উঠতে বসেছে। শরৎবাবু মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে আসতেন, আমি পড়ান ছাড়া স্কুলের আয়ব্যায় হিসাবপত্র রাখতাম, কাজেই স্কুল সংক্রান্ত কাজে দরকার হলেই তিনি আমার কাছে আসতেন, হিসাবপত্র দেখতেন। এতে অবশ্য দুযনীয় কিছুই ছিলনা, কিন্তু তা হলে কি হবে—এই উপলক্ষ্য করেই আমার কলঙ্ককাহিনী গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রামের লোকে- -বিশেষ মেয়েরা কোন দিনই আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, তবে এতদিন কেউ কোন কথা বলতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুব পর আমার নামের সঙ্গে শরৎবাবুর নাম যোগ করে চারিদিকে একটা বিবাট আন্দোলনের সৃষ্টি হল। পল্লী নারীরা ঘাটে যাবার পথে দলে দলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে কত ঠাট্টা-টিট্‌কারী আরম্ভ করলে, সে আর তোমায় লিখে কি জানাব?

কেউ বলে, ''প্রথম থেকেই আমি জানি যে ও ছুঁড়ী কম নয়। লেখাপড়াশিখে ফাজিল হয়ে কার মাথা খাবে, ওসব চরিত্তিরের লোকের রাতদিনের সেই চেষ্টা। কেন, একথা আমি কি আগেই তোদের বলি-নি?''

অন্যেবললে, "ওই জন্যই ত ওর সঙ্গে মিশলুম না! ওসব রীতের লোকের সঙ্গে কি আমাদের পোষায়? গেরস্তর মেয়ে ঘর সংসারের কাজ করবে, রাঁধবে-বাড়বে—সবাইকার সেবাযত্ন করবে—এই ত জানি; —ওমা! এ-তা - না, - দিনরাত পটের বিবির মত সেজে কেতাব নিয়ে বসে আছেন! আর, এই সব কাণ্ড! আজকাল কি গাঁয়ে আর আগের মত শাসন আছে? এখন সব নিজে নিজেই কত্তা! কেউ কারো শাসন মানে না। আগে পাড়া ঘরে এমন হলে মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিত না।"

আর একজন বল্লে, "তা ধরেছে বেশ মাতব্বর লোককে! কবে বিয়ে হয় দেখ না!"

পিছন থেকে অন্য একজন ফোঁস করে উঠল—"আরে রেখে দে তোর বিয়ে! বিয়ে হলে বাপের তেজ্যপুত্তুর হতে হবে সে খবর রাখিস কিছু? তবে হ্যাঁ, নিকে হতে পারে বটে।"

এই রকম সমস্ত দিন ধরে যে কত কুৎসিত কল্পনা জল্পনা চলতে লাগল সে আর কি বলব? আমি ত একেবারে ঘৃণায় লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলুম,—এরা বলে কি? আমিত কখনো স্বপ্নেও এরকম অসম্ভব আশা মনে আনিনি! আমার দোষ কি? সংসারে আমার মত একটা অসহায়া নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক—একপাশে পড়ে দুমুঠো অন্ন করে খাচ্ছে, তাতে কেন এরা এমন করে বাদ সাধে? আমিত মনে জ্ঞানে কখন কারুর কোন ক্ষতি করিনি? আর এসব কথা যদি তাঁর কানে উঠে থাকে? একথা মনে আসামাত্র লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ছি! ছি! আমি তাহলে কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব?

ক্রমেই দেখলুম, স্কুলে মেয়ের সংখ্যা কমতে লাগল। সব-চেয়ে বড় মেয়ে দুটীই প্রথমে স্কুল ছেড়ে দিলে। তাদের না দেখে অন্য মেয়েদের কাছে খোঁজ করলুম—শুনলুম আর তারা স্কুলে আসবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় একটি মেয়ে বল্লে, "সে কথা আমি আপনার কাছে বলতে পার্ব্ব না।" আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

একে একে সব মেয়েদের আসাবন্ধ হতে লাগল। স্কুলের ঝি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাধ্য-সাধনা করেও কারুকে আনতে পারলে না। সকলের বাড়ী থেকে বলে পাঠালে, জমীদার বাবুর ভয়েও কেউ আমার মত মন্দ স্ত্রীলোকের কাছে নিজের মেয়ে ছেড়ে দিতে পারে না। তিনি বড়লোক, যা করেন তাই শোভা পায়, তা-বলে সকলের ঘরে তো তা চলে না।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আমার যে তখন মনের কি অবস্থা তা তোমায় আর কি জানাব? নিজের লজ্জা ও অপমানের ত কথাই নেই, তার উপর কাজটি যদি যায়, তবে আমি কোথায় দাঁড়াব? সব-চেয়ে এই ভাবনাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় একলাটি বসে নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবছি, হঠাৎ শরৎবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি এমন সময়ে কখন আসতেন না—আমি মনে করলুম, তবে বুঝি বিশেষ কোন কাজ আছে। তাঁকে বসতে বলে নীরবে তার কথা শোনবার অপেক্ষা করতে লাগলুম। আজ আর তাঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারলুম না।

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, "এ সময়ে এসেত আপনার কোন কাজের ক্ষতি করলুম না?"

আমি বললুম, "আজ তিনচার দিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে— মেয়েরা কেউ আসেনা। আমার হাতে কোন কাজ কৰ্ম্মই নেই।"

তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে! একথাত আমি জানতুম না!" খানিক নিস্তব্ধ থেকে তিনি বললেন—"এইসব লোকেদের উন্নতির জন্যেই আমি এতদিন নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলাম! যাক সে কথা—আমি আপনাকে যা বলতে এসেছি, আপনি তা শুনে আমার প্রতি হয়ত অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আজ আর সে কথা প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই! গ্রামে আমাদের দুজনের নামে যে নিন্দা ও অপবাদ চলছে আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনাকে এ মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবার জন্য আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করতে আমি এসেছি। এখন, এ বিষয়ে আপনার কি মত— কোন রকম লজ্জা না করে আমাকে বলুন।"

তিনি থামলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলুম ধীরে ধীরে সেইখানে বসে পড়লুম। আমার সৰ্ব্বশরীর কাঁপছিল। একটি কথা আমার মুখ থেকে বেরুল না।

তিনি বলতে লাগলেন, "শুধু যে এই কুৎসা রটেছে বলে আমি একথা বলছি তা মনে করবেন না। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছি সেইদিনই আমার মন আপনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন আমি সে কথা প্রকাশ-করি-নি। বাড়ীতে এতদিন মা ও বাবা বিয়ে করবার জন্যে আমাকে জ্বালাতন করেছেন। আমি সে সব কথা উড়িয়ে কাটিয়ে দিই। মনে ছিল যাঁকে ভালবাসি, যদি কখন তাঁকে পাই, তবে বিবাহ্ হবে, নয়ত চিরকাল এইরকমই যাবে। আমি যা বলতে এসেছিলাম, তা বলা হল, এখন আপনার উত্তরের উপর আমার জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করছে।"

আমি আজ যে কথা শুনলাম—সে আমার আশার অতীত। আমার মত নগণ্যা হতভাগিনীকে তিনি ভালবেসেছেন! একথা যখন শুনলুম—তখনি যেন আমার চিত্তের সকল ক্ষোভ সকল অপমানের জ্বালা একমুহূর্ত্তে জুড়িয়ে গেল। মনে হল আমি এতদিন যে কষ্ট যে লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, আজ এই তার চরম পুরস্কার। কেমন যেন পুলকময় অবসাদে আমার সৰ্ব্বশরীর অবশ হয়ে আসছিল। আমি তাঁর কথার উত্তর দেব কি, বাক্যে মনে তখন একেবারে নীরব-নিস্পন্দ হয়ে গেলুম।

শরৎবাবু আবার বল্লেন, শিশুকালে আপনার যে বিবাহ্ হয়েছিল, সে গণ্য নয়। আর তাও যদি ধরা যায়, তবে? বিধবা-বিবাহ ত অশাস্ত্রীয় নয। সেত আজকাল কতজায়গার্য় হয়েছে! আপনি শিক্ষিতা, আপনার মনে যে এ বিষয়ে কোন কুসংস্কার আছে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না!"

. আমি তখন চমকে উঠলুম! বিবাহ! না-না-একখনো হতে পরে না। বিস্তর আয়াসে মনের আবেগ দমন করে আমি বল্লুম, "আপনি আমাব অসময়ের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক, আমি যেখানেই থাকি, আপনার দয়া কখনো ভুলতে পাৰ্ব্ব না! কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিতান্ত অযোগ্যা, আপনি প্রভু— আমি আশ্রিতা মাত্র, আপনার সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধ হতে পারে না, আমায় ক্ষমা করুন।"

শরৎবাবু বল্লেন, ''এই কি আপনার মনের আসল কথা? না। এত সহজে আমি আপনার আশা ছাড়তে পারবো না। আপনি যে সব কথা বল্লেন সে সবই নিরর্থক। আপনি আমার যোগ্য কিনা সে বিচারও আমি করেছি। এখন আমাকে আপনি যোগ্য বিবেচনা করেন কিনা সেই কথা বলুন!''

তাঁর এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। তাঁর প্রতি আমার মনের যে ভাব তা আমি জীবনে কারো কাছে প্রকাশ করতে পার্ব্ব না। কিন্তু তা-বলে তাঁর প্রস্তাবেও আমি কিছুতে রাজী হতে পারি না।

আমাকে নীরব দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন, ''আমি এখনি আপনার শেষ উত্তর চাইনা। আপনি এ বিষয়ে ভাল করে ভেবে দেখবেন। আমি দুই-চারদিনের মধ্যে আবার আসব; কিন্তু আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, শুধু আপনি আমাকে ভালবেসে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এইটুকু ভেবে দেখবেন। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সামাজিক অসমাঞ্জস্য আছে, কিম্বা এ বিবাহ হলে সমাজে কি রকম বিপ্লব বাধতে পারে সে সব ভাববার কোন দরকার নেই। আজকার মত আমি আসি।''

তিনি চলে গেলেন। আমি বিছানায় পড়ে পড়ে অনেক ভেবে নিজেব কর্ত্তব্য স্থির করতে লাগলুম। সন্ধ্যার সময স্কুলের চাকরী গেলে কোথায় দাঁড়াব, কি করে দিনপাত হবে, এই সব ভাবনায় ব্যাকুল হয়েছিলুম। এখন দেখছি মুখেব একটি কথায় এক মুহুর্ত্তে আমার সব দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচে যায়। শুধু কি তাই? যে সৌভাগ্য আমি কখনো মনে মনে কল্পনাও আনতে সাহস করিনি আজ ৩া অযাচিতভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে, দারুণ পিপাসায় যার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তার সামনে সুবাসিত সুশীতল পানীয় ধবলে তার যে অবস্থা হয়, আমারও তখন সেই দশা। এ লোভ কি সহজে সামলান যায়? আমি এখন কি করব? তবে কি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেব? কিন্তু আমি বিধবা, আমাকে গ্রহণ করলে তাঁকে অনেক অপযশ অনেক গ্লানি সহ্য করতে হবে। তিনি অবশ্য সবরকম ত্যাগস্বীকারেই প্রস্তুত আছেন, তাঁকে এসব কিছু টলাতে পারবে না, কিন্তু আমি কেমন করে জেনে শুনে তাঁর এ অধঃপতনের কারণ হব। না! না! আমাদের বিবাহ হতে পারে না! বিবাহের দরকারই বা কি? আমি আমার প্রেমের পুবস্কার পেয়েছি, তাতেই এখন আমার বুক ভরে রয়েছে— আর আমি লোকের নিন্দা, অপমান, কলঙ্ক কিছুবই ভয় রাখিনা! এবার তিনি এলে তাঁকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো। যদি তাতেও তিনি না বোঝেন, তখন আর উপায় স্থির করা যাবে।

তার পরদিন স্কুলের ঝি ঘাট থেকে নেমে এসে বল্লে, ''মা! একটা কথা শুনে এলুম। শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর বাপের নাকি খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, 'তুমি যদি একাজ কর তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই,—আমার বিষয়ের উপর ও তোমার কোন দাবী থাকবে না।' জমীদার গিন্নী তো আমায় ডেকে দশ কথা শুনিয়ে দিলেন। সবাই তোমাকেই যাচ্ছেতাই গালাগালি কচ্ছে। তা মা! আমিত সব দেখছি, তুমি ত কোন কথাই বলনি, শরৎবাবু বিদ্বান লোক, তিনি কেন এমন অন্যায় কাজ করতে গেলেন?''

আমি তার কথার উত্তর দিলুম না। দেখলুম, গ্রামের পুরুষগুলি সুদ্ধ এই আন্দোলনে প্রবল উৎসাহে যোগ দিয়েছে। স্কুলবাড়ীর কাছে গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা কুচরিত্রের লোক, যতসব বখাটে ছোড়া একটা আড্ডায় বসে সন্ধেটা গানবাজনা করে আর লোকের ঘরের নিন্দাকুৎসা করে কাটায়। এমন সব সঙ্কীর্ণ চরিত্রের লোক এ গ্রামের! যখন আমি আশ্রয়হীন হয়ে পথে দাঁড়িয়েছিলুম, একমুঠো অন্নেব সংস্থান ছিল না, তখন একটা মুখের কথা বলে খোঁজ নেবার লোক ছিল না, কিন্তু আজ আমার এই আশ্রয়টুকু ঘোচাবাব জন্য এরা সকলে পড়ে মহা উৎসাহে লেগে গেছে। আমি ঘব থেকে শুনছি, সত্য মিথ্যা নানা অলঙ্কার দিয়ে এখানেও আমার চরিত্রের বর্ণনা চলেছে।

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে জর্জ্জরিত হয়ে কোনমতে সে রাত ও তার পরদিনও কাটল। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছিলাম। তাই এদিন আমার মন কতকটা স্থির হয়েছিল।

বৈকালে আমি ঘরের জানালার ধারে একলা বসে ছিলাম। এ দুদিন স্কুল বসে নি। আমার কোন কাজ ছিল না। আমি বসে বসে নিজের অদৃষ্টের বিষয ভাবছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একখানা টেলিগ্রাম হাতে করে শবৎবাবু এসে ঘবে ঢুকলেন। তাঁব মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই চিরহাস্যময় প্রফুল্ল মুখ আজ কি গম্ভীর, —কি বিষাদময়! কিছুক্ষণ আমরা কেহই কোন কথা বললাম না।

তাবপরে তিনি বল্লেন, "কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু বিশেষ দরকারে পড়ে জরুবী টেলিগ্রাম করেছেন। আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি, তাই এ কথা আপনাকে বলতে এলাম। ফিবতে বোধহয় চার পাঁচদিন দেরী হবে।"

আমি চুপ কবেই থাকলাম। তিনিও খানিক থেকে বল্লেন, "আমি যা বলে গিয়েছিলাম আজ কি তার উত্তব পাব?

আমি আজ সব সঙ্কোচ ত্যগ করে বেশ সহজভাবেই বল্লাম, "আমার ওপব আপনার অসীম দয়া! কিন্তু বার বার আমাকে আপনার অবাধ্য হতে হচ্ছে, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন। আমি যেমন আছি এমনি থাকতে পেলেই সুখী হব। এর চেয়ে বেশী উচ্চআশা আমার নেই। আমি বিধবা, সমাজে নিন্দিতা, আমাকে বিবাহ কবলে আপনার যশমান ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব ধূলিসাৎ হবে, সমাজে আপনাকে অশেষ লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হতে হবে! আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার এ অধঃপতনের কারণ হতে পার্ব্বনা। আর আমার বলার কিছু নেই! এ প্রসঙ্গ এখানে শেষ হলেই আমি সুখী হব!"

শরৎ বাবু বল্লেন, "আপনি যা বল্লেন এতে আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ হল, কিন্তু আমি একথা শুনতে আসি নি। আমার প্রশ্নের উত্তর কি, সেইটা জানতে এসেছি। আপনি শুধু বলুন, আমাকে ভালবেসে গ্রহণ করতে পারবেন কি?

আমি, এ দুদিন অনেক চেষ্টায় মন সংযত করেছিলাম, কিন্তু আর সহ্য করতে পারলাম না। এ কথার উত্তর যা, মুখে বলে আমি কি করে তা জানাব? তাঁর সম্মান রক্ষা করে পাশে দাঁড়াবার মত অদৃষ্ট ত আমার নয়। অশ্রু এসে আমার দৃষ্টি রোধ করল! হৃদয়ের

রুদ্ধ যাতনা ও অপমান পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশিতে পরিণত হয়ে আমার সব চেষ্টা সব সংযম মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে মনে ছিল না, সহসা তিনি উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার একখানি হাত ধরে বললেন, "আমি বুঝেছি, তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ নয়,— তোমার ঐ নীরব রোদনেই তোমার মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তবে বল! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করবে?

তাঁর সেই আবেগ কম্পিত মৃদুস্বরে কি অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল, সে শুধু আমি নিজের অন্তরেই অনুভব করলুম, মুখে তা প্রকাশ করা যায় না। আমি মুগ্ধ হয়ে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমাদের চারিচক্ষের মিলন হল! তাঁর সে দৃষ্টিতে কি প্রেম! কি করুণা! আমার হাত তখনও তাঁর হাতের মধ্যে থ্‌রথর্‌ করে কাঁপছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি সব ভুললাম। আমার সব প্রতিজ্ঞা সব সঙ্কল্প বুঝি বা ভেসে যায়।

তিনি আবার বল্লেন, আমি তোমার মনের ভাব বুঝেছি, তোমার আপত্তির কারণও সব বুঝেছি। এখন আমি যা স্থির করেছি তা শোন। আমারই দোষে চারিদিকে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে, সেই দেশব্যাপী অখ্যাতি ও কুৎসার স্রোতে তোমাকে ভাসিয়ে আমি যে সরে দাঁড়াব, তেমন কাপুরুষ আমি নই! বাবার সঙ্গেও আমার এ কথা হয়েছে। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলে দিয়েছি। তিনি আমায় বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। তাতেইবা ক্ষতি কি? তাঁর বিষয়ের ওপর আমার কোন আসক্তি নেই। আমার নিজের উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালন করার ক্ষমতা আছে। তার পর লোকনিন্দা? সে ত আমি গ্রাহ্যই করি না। তাহলে আমাদের মিলনে আর কি বাধা আছে? জরুরী দরকার বলেই আমাকে যেতে হচ্ছে নয়ত এসময়ে আমি যেতাম না। তোমার কাছে আমার মিনতি—আমার জন্য অনেক সহ্য করেছ আর দুচার দিন সহ্য কর। আমার তার চেয়ে বেশী দিন দেরী হবে না।"

তিনি চলে গেলেন। আমি বিবশপ্রাণে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লাম। আড্ডা ঘরের ছোঁড়ারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল—হারমোনিয়ামের সুর দিয়ে গান ধরলে—

"দুজনে দেখা হল মধুযামিনীরে!
কেহ কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে।"

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, এখানে থাকলে আমি নিজের সকল্প বজায় রাখতে পারব না। আমি যে কত দুর্ব্বল, আজ নিজেই তা টের পেয়েছি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে আমি কোন মতেই সম্মত হতেও পারি না। আমি কে? সামান্য পথের ধূলা মাত্র। বায়ু তাড়িত তৃণের মত সংসারে আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর, আমারই জন্য তাঁর মত মহৎ লোকের এত অধঃপতন! আজ যদি আমি তাঁর চক্ষের সামনে থেকে সরে যাই, অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁর কিছু কষ্ট হতে পারে। কিন্তু কালে যখন তাঁর এ মোহ কেটে যাবে, তখন তিনি আবার সুখী হতে পারবেন। তাঁর যশ, মান, সুখ, সৌভাগ্য সবই বজায় থাকবে। তবে আমি কেন তাঁর জীবন পথে দুষ্টগ্রহের মত দাঁড়াব? না। আমি এখানে

থাকব না। কাল তিনি গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবেন, এটা আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা। আমিও কাল সময় বুঝে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।

তারপরে মনে হল, কিন্তু যাব— যে— তা, কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তেও ত কোন আত্মীয় বন্ধুকে মনে করতে পারলাম না। তখন ভাবলুম, সেসব ভেবে ফল কি? যেদিকে দুচোখ যায় এখন ত বেরিয়ে পড়ি, তারপর যেখানেই হোক্ আশ্রয় একটা জুটবেই। এই সংসারে এত লোকের ঠাঁই আছে, আর আমার কি হবে না?

এই কথাই ঠিক! কর্ত্তব্য স্থির হলে আমি উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আড্ডাঘর থেকে তখনো গানের সুর বায়ুস্রোতে ভেসে আসছিল। তারা তখনো গাইছিল—

আর তো হলনা দেখা—জগতে দোঁহে একা।
চিরদিন ছাড়াছাড়ি— যমুনাতীরে মধুযামিনীরে।

আমি খানিক জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের গান শুনলাম। তারপর তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। ওনার নামেও একখানা চিঠি লিখে রেখে যখন সময় বুঝব, তখনি বেরিয়ে পড়ব। তুমি হয়ত এই চিঠি পেয়ে আমার অবস্থাতে কত কষ্ট পাবে। তাই লিখছি, আমার কথা মনে করে বৃথা কষ্ট পেও না। আমি মনস্থির করেছি। আর আমার কষ্টবোধ নেই। জানি, 'ফুটেছি মরুর মাঝে, দুদিন পরে যাব ঝরে!'' এ ছাড়া আমার জীবনের পরিণতি আর কি হতে পারে? তা যদি না হবে, তাহলে কি মা আমায় সাত বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে এমনি করে আমার সারাজীবনটা নষ্ট করে দিতেন; থাক্, গত কথা ভেবে লাভ কি?

তাহলে আজকের মত আসি। যেখানেই থাকি তোমাকে কখন ভুলব না। কোন জায়গায় একটু স্থিতি হয়ে বসেই আবার চিঠি লিখব। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ।

ইতি—
তোমার স্নেহের বোন অমিয়া।

'ভাবতী'—১৩২৩

পেঁপে ভূত

শ্রীহেমনলিনী দেবী

১

প্রধানতঃ কর্ম্মোপলক্ষে, দ্বিতীয়তঃ ম্যালেরিয়ার দায়ে অমর বাবু সপরিবারে বারমাস পশ্চিম দেশেই থাকেন। কখনও কদাচিৎ গ্রীষ্মের অবসরে ছেলে বউর সঙ্গে গৃহিণী দেশে আসেন বটে, কিন্তু তাহার কোন স্থিরতা নাই: তাঁহাদের সদলবলে গৃহে ফিরিবার সময় সেই দুর্গাপূজায়—আশ্বিন মাসে।

এবার পূজা নিকট দেখিয়া আসিবার আয়োজন হইতেছিল, হঠাৎ কর্ত্তার অসুখের জন্য তাঁহারা স্বামী স্ত্রী এখনই আসিতে পারিলেন না। ভাগিনেয়ের সহিত বধূ কন্যা প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দিয়া কর্ত্তা বাটীর চিরস্থায়ী অভিভাবিকা জেঠাইমাকে প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদঞ্চ বিশেষ জানাইয়াছেন যে "শ্রী শ্রী শারদীয়া পূজার সমস্ত আয়োজন আপনি স্থির রাখিবেন, আমি সপ্তমীর দিন গিয়া মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব. শরীর অসুস্থ বিধায় এখন যাইতে পারিলাম না।"—ইত্যাদি। কোন্ কোন্ কুটুম্বকে জামাতাকে নিমন্ত্রণ-পত্র বা আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইবে, তাহারও বিস্তারিত উল্লেখ ছিল।

অমর বাবুর পিতা পিতামহ সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন, কৃতীপুরুষ তিনি স্বয়ং। জমিদারী ও বাগান-পুষ্করিণী ঠাকুরদালান-সমন্বিত প্রকাণ্ড বাটীর মালিক তিনিই। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার মুখাপেক্ষী—তাহাদের মধ্যে কাহারও চাকরি করিয়া দিয়াছেন, কেহবা তাঁহার সাহায্যে পড়িতেছে।

গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দূরে ষ্টেশন। যথাদিনে দুইখানি পাল্কী ও তিনখানি গরুর গাড়ী ষ্টেশনে পাঠাইয়া জেঠাইমা আগন্তুকবর্গের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।—"ছেলেপুলে নিয়ে বড় নাৎবৌ থাকবেন—ওপাশের হলঘরটায় তাঁর বিছানা দে। টুনী চারু বীণা—ওরা এখন মাঝের ঘরেই থাকুক, জামাইরা এলে দেখা যাবে তখন।"—ইত্যাদি স্থানের বন্দোবস্তের সঙ্গে রান্নাঘরে যাতায়াতেরও বিরাম ছিল না। অমর বাবু বলিয়া থাকেন "জেঠাইমা আমার লক্ষ্মী, তাঁর জন্যেই দেশে আসার ইচ্ছে করে, ওঁর কিছু হলে বাড়ী ঢোকা দায় হবে।"

সূর্য্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে, গ্রামের লোকের আনন্দ ও কৌতুক বাড়াইয়া, এক পাল চাষার ছেলেমেয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পাল্কীর সারি আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। হাঁটু অবধি পোষাকে বুট পায়ে ছোট ছেলেরা ও ঘুমুর দেওয়া মলের রুণুঝুণু শব্দ করিতে করিতে মেয়েরা আগে নামিয়া পড়িল। সকলেরই মুখ শুষ্ক। মাতার ক্রোড়ে কচি ছেলে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

গৃহিণী ব্যতিব্যস্তভাবে সকলকে আনিয়া নীচের তলার ঠাণ্ডাঘরে বসাইলেন। তরুণী বালিকাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"নে, ও সব সাজগোজ এখন খুলে

ফ্যাল। জামার উপর জামা চাপিয়ে, এই গুমটে গাড়ী করে আসা—কি ঢংই শিখেছিস তোরা!''

বলা বাহুল্য এই পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা, আধুনিক নবীন সভ্যতার কোন চিহ্নকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ''মেয়েমানুষের আবার গায়ে জামা—দুদিন বাদে পাগড়ী পরে তোরাই আফিস যাস!''—প্রভৃতি বলিয়া ঐ অকারণ বাহুল্যটির উদ্দেশে প্রথম প্রথম অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, বরং সাজসজ্জার রূপান্তর ও মাত্রা বাড়িয়াই চলিল দেখিয়া এখন আর কিছু বলেন না। তবু আজ. পথ চলিবার সময় গৃহস্থের মেয়ের নিমন্ত্রণ বাড়ী যাইবার মত অমন বিচিত্র বেশভূষা, তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না।

তরুণী সম্প্রদায়ের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি মৃদুহাসি ও গোপন ইসারা চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব সংবরণ করিয়া একজন বলিল—''সত্যি ঠাকুমা, বড্ড গরম! আমরা গা ধুয়ে ফেলি— কেমন?''

''গা ধুবি বৈ কি! রেলে এসেছিস্, কোথায় কি ছোঁয়া গেছে; কিন্তু এখুনি না, খানিকক্ষণ বস—ঠাণ্ডা হয়ে জিরিয়ে তবে যাস্।''—তিনি বাহিরে যাইতে যাইতে কথা কয়টি বলিতে ছিলেন, ডাক দিয়া অপরা বলিল, ''ঘাটে যাব কিন্তু, শুনচ ঠাকুমা?''

ঠাকুমা সে কথা শুনিতে পাইলেন কি না বুঝা গেল না। সম্মুখে বড়বধূর দাসীর নিকট শিশুর দুধ খাইবার অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্র দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন। একটা ছেলে মানুষ করিতে, প্রকাণ্ড বাক্সভরা এতগুলো আকা চুলা বোতল কাচ নল ছিপি—আরও কত কি সাতকাণ্ড রামায়ণের যে কি প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ধারণায় আসিতেছিল না। শুধু মাতৃদুগ্ধে স্বচ্ছন্দে যাহার দেহ পুষ্টি হয় তাহার জন্য এত ধুমধাম, বাবা!

ঘরে বধূ ও কন্যারা হাসিয়া আকুল হইতেছিল। বীণা বলিল,—''ঠাকুমা আমার জন্মেছেন এই নলগাঁয়ে, মরবেনও এখানে, বেচারী কিছু জানলেন না।''

কিশোরী মেজবধূ সহরের মেয়ে। এত দিনে এই প্রথম সে নলগ্রামে আসিয়াছে। সে কৌতুকপ্রফুল্ল মুখে প্রত্যেক জানালা দুয়ারে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। পাশে রাস্তার ওপারে গাছের ছায়াঘেরা ক্ষুদ্র গ্রামখানি, পশ্চাতে উচ্ছে ঝিঙ্গের সবুজ ক্ষেতের মধ্য দিয়া সরু পথ-রেখাটি অদূরে নদীর চরে গিয়া মিশিয়াছে, তাহারই সম্মুখে অল্প পরিসর জলধারার পশ্চাতে নারিকেল গাছের মাথার উপর দিয়া সূর্য্যাস্ত দৃশ্যটি তাহার বেশ লাগিতেছিল। পথ বহিয়া দুই একটি মেয়ে কলসী লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের দেখিয়াই ভদ্রগৃহের বধূ বলিয়া বোধ হয়। বেহারের কড়া অবরোধের পর এ দৃশ্যটি তাহার বড় মিষ্ট লাগিল। সে আসিয়া বীণার কাণে কাণে বলিল—'' কৈ, ঘাটে যাবে ত চলনা ঠাকুরঝি।''

বীণা বলিল—''থাম, একবার ঠাকুমার মুখ থেকে কথাটা বের করে নিই, তবে ত। এই কদিনই যা ঘাটে যাওয়া। মা এলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি ত জ্বরের ভয়েই সারা হবেন।''

বড় বউ বলিল—'' সে ভয়টা মিথ্যে নয়! এমন দেশ, দুদিন থাকলেই জ্বর ধরে

যায়! তোরা ঘাটে যাবার ঝোঁক ধরেছিস কেন, শেষটা কিছু হলে, এক বোতল সোডা পর্য্যন্ত সঙ্গে নেই।''

''আঃ একদিনে আর কিছু হয় না, বারণ করোনা বৌদি।''—

মুখের কথা মুখে লইয়া বীণা বাহির হইয়া গেল; এবং ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার হইতে ডাকিল—''এস এস মেজ বৌদি, শীগ্‌গির এস। ঠাকুমা বল্লেন, গিয়েই ফিরে আসতে হবে। তোমার কাপড় গামছা সব নাও,— চলে এস।''

২

পথে বাহির হইয়া মেজ বউ বলিল—''আমরা সেই নদী যাব ত?''

উত্তরে টুনী হাসিয়া বলিল—''নদী? দূর! নদীতে বুঝি এখন জল থাকে? চল না, আমাদের পুকুর দেখবি এখন, আমরা কত সাঁতার দিই, সে কেমন মজা।''

বীণা বলিল—''নদীতে পুরুষ-টুরুষ যায় কি না, তাই বাবা আমাদের যেতে দেন না। পুকুরও খুব ভাল, অনেক জল। তার চারিদিকে বাগান, পাঁচিল ঘেরা, কেউ দেখতে পায় না কিছু না, সে বেশ।''

বধূ উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল—'' তোমরা সবাই সাঁতার জান ভাই?''

''হুঁ—খুব।''

''তবে আমিও আজ সাঁতার শিখে নেব।''

মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—''তা বৈ কি, একদিনেই ত সাঁতার শেখা যায়!''

''না হয় দু'তিন দিনে হবে, তোমরা আমায় শিখিয়ে দিও।''

''উহুঁ উহুঁ— সে খুব কঠিন। ঢের দিন লাগে শিখতে।''—বলিয়া তাহারা জলে নামা ও সাঁতার শিক্ষার দুরূহ নিয়ম ও বিপদের এমন সব বিবরণ দিতে লাগিল, যাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বালিকা বধূর মুখজ্যোতি হ্রাস হইয়া, তাহার মন হইতে সাঁতারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু জলে নামিয়া কাহারও আনন্দ কম দেখা গেল না! শরতের নির্ম্মল জলভরা পুকুরে মেয়েরা ভাসিয়া দূরে দূরে ফিরিতেছিল; আর বধূটিও সিঁড়ির চাতালে দাঁড়াইয়া, হাতে পায়ে জল খেলার উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

তীরে দাঁড়াইয়া দাসী বারবার ডাকিতেছে, মেয়েদের মনে ঠাকুরমার ভয়ও যথেষ্ট, তবু কেহ উঠিতে চায় না। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, দূরের গাছপালা অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বালিকারা জলক্রীড়ার আনন্দে সব ভুলিয়া ছিল—হঠাৎ কাহার বাড়ীর সান্ধ্য শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সকলে চমকিয়া তাড়াতাড়ি জল ছাড়িয়া উঠিল।

মাথা গা মোছা বা কাপড় ছাড়া, যতদূর সম্ভব ব্যস্ততার সঙ্গেই শেষ হইতেছিল;— এমন সময় টুনু বলিল—''ও বড়দ্দি দ্যাখ, ও আবার কেমন পেঁপে তা দ্যাখ।''

বীণা চাহিয়া দেখিল, পুকুর পাড়ে একটি চারাগাছে সত্যই দুইটি প্রকাণ্ড পেঁপে ধরিয়াছে।

টুনীর আশ্চর্য্য হইবারও কারণ ছিল বটে, ফল দুইটি অসম্ভব বড়। নিঃশেষিত প্রায় দিবালোকের অন্তিম ঔজ্জল্যটুকু তাহার গায়ে লাগিয়া পরিপুষ্ট শ্যামবর্ণের চাকচিক্য বাড়াইয়াছে। কচি কচি পাতার মধ্যে মাত্র দুইটি ফল। বীণা বলিল—"এখন থাক, মা এলে পেড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাব।"

বারম্বার সেই আশ্চর্য্য ফল দুইটির পানে চাহিতে চাহিতে সকলে ফিরিয়া চলিল। আমগাছের ঘন ছায়ায় পথ অন্ধকার, অনতিদূরে কলার ঝোপে শুক্‌না পাতা বাতাসে খড় খড় করিতেছে। দূরে দূরে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে গাছ পাতা বাতাস ইত্যাদির মিশ্রিত ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সঙ্গের দাসীটা একটু ভীতভাবে বলিয়া উঠিল—"অত করে ডাকলাম, তা কেউ উঠলে না, এখন এই ভর সাঁজে দ্যাখ ত কি কাণ্ড!"

তাহার স্বরে ভয়ের আভাস পাইয়া টুনী বলিল— "কি কাণ্ড আন্না পিসি?"

"কিছু না—এগিয়ে চল।"

মেজ বৌ ছুটিয়া গিয়া বীণার আঁচল ধরিল। টুনী চারুও ঘেঁসিয়া আসিল। তখন বিদ্রূপহাস্যে বীণা বলিল—" তোরা কি পাগল নাকি? পাতার শব্দ, শুনতে পাচ্ছিস নে? কোন ভয় নেই—ও সব মিথ্যে কথা।"

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। পুরুষকণ্ঠে কে ডাকিল—"আন্না, তোরা কি করছিস? শীগ্‌গির আয়, কর্ত্তামা বক্‌ছেন যে!"

তখন ভূতের ভয় ভুলিয়া. বকুনির ভয়ে সকলে শুষ্কমুখে অগ্রসর হইল।

৩

ঠাকুমার নিষেধে আর তাহাদের ঘাটে যাওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে মাতাও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এবার আর কর্ত্তার আসা ঘটিল না; শরীর দুর্ব্বল আছে বলিয়া তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। গৃহিণী শীঘ্র আসিলেন, কিন্তু ছেলের দল এখনও জুটিতে পারে নাই।

জননী আসার প্রথম আনন্দটুকু মিটিলে ক্ষুণ্ণভাবে বীণা বলিল—"বাবা ত এলেন না মা, তবে কি হবে?"

মা বলিলেন—"কিসের কি হবে রে? সে আবার কি কথা?"

"কেন, লাইব্রেরী ঘরের চাবি! আমি যে সঙ্গে এক খানিও বই আনিনি। এ ক'দিন এমন বিরক্ত লাগছে! মনে করেছিলাম, বাবা এলে বই বের করে নেব, তা এখন কি হবে মা?"

বীণার চোখ দুটি প্রায় ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন—"ব্যস্ত হতে হবে না মা, সে ভাবনা তোমার চেয়ে তাঁরই বেশী। এই চাবি দিয়েছেন—নাও। আসবার সময় নিজে এসে বল্লেন, বীণার হাতে দিও, আর যেন কেউ সে ঘর না হাঁট্‌কায়, তাও বলে দিও তাকে।"

আদরের শিষ্যা এই কন্যাটির পাঠ্যাসক্তির কথা পিতা মাতা ভাল করিয়াই জানিতেন। অমর বাবুর সজ্জিত পাঠগৃহে তাঁহার পুত্রদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না; কিন্তু বীণার নিকট

তাহার দ্বার অবারিত। চাবিটি হাতে পাইয়া হর্ষবিহ্বল বীণা মৃদুস্বরে বলিল—"না মা-- না, এ চাবির কথা আমি কাউকে জানতে দেব না, জান্‌লেই মেজ্‌দা কেড়ে নেবে। আমি একা গিয়ে লুকিয়ে বই বাহির করে আনব-- কেমন?"

- অন্যমনস্ক ভাবে মা বলিলেন--"হ্যাঁ, কিন্তু একদিন ঘরটা পরিষ্কার করাতে হবে।"

কাহাকেও বলিব না বলিয়াও বীণা এই আনন্দ সংবাদটি তাহার প্রিয়সখী মেজ বৌদিকে না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। মেজ্‌দার আসিতে এখনও বিলম্ব আছে, ইত্যবসরে তাহারা দুই জনে এ কয়দিনে যা করিবে, যে যে ভাল বই বাহির করিয়া আনিবে, সব ঠিক্ ঠাক্ হইয়া গেল। লাইব্রেরী ঘর প্রায় সদরের সংলগ্ন, বউ মানুষের সেখানে যাওয়া কঠিন। বীণা বলিল—"আমি চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে এসে, দুজনে পড়ব।"

এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে মেজ বউ বলিল—"আচ্ছা ভাই, বই টই পড়লে ঠাকু মা রাগ করবেন না ত?"

বীণা এবার হাসিয়া ফেলিল। মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি থামাইবার চেষ্টার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"রাগ করেন না? খুব করেন! সে যা মজা করে বলেন— শুনলে রাগও হয় আবার হাসিও পায়। যাক্ গে, তার জন্যে আমি ভয় করি নে, আমার সম্বন্ধে তিনি অনেক দিনই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শুনিস্ নি কি, আমায় কিছু বলতে হলে আগে বলে নেন—"বাবা! তোমায় কিছু বলা দায়! তুমি বাপের আদুরে মেয়ে— তোমার কথাই আলাদা।' আমি তাঁকে কিছু বলিনে, তবু তিনি—তা হোক্‌গে তুই রাত্তিরে পড়িস।"

সকালটুকু অপেক্ষায় কাটাইয়া, বেলা দ্বিপ্রহরের পর মুড়ি মুড়কীর পাট গুছাইয়া ভাণ্ডারে চাবি দিয়া ঠাকুমা যখন পূজার আসনে গিয়া বসিলেন, তখন বীণা উপরের বারান্দা ঘুরিয়া গলির পথে আসিয়া লাইব্রেরীর দরজা খুলিল।

বহুদিনের রুদ্ধ ঘর। মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চে ধুলা জমিয়া আছে। দুয়ার খুলিতেই ঠাণ্ডা-হাওয়ার সঙ্গে একটা ভাপ্‌সা গন্ধ আসিয়া বীণার মুখে লাগিল। চারিদিকের জানালা কপাট বন্ধ, আলমারীর পাশে, কোণে কোণে, যেন আঁধার জমিয়া আছে। বীণা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই নিজেকে সাম্‌লাইয়া, আঁচল ও চাবি গুছাইয়া ঘরের মধ্যে আসিল। মধ্যে বড় টেবিলটায় লিখিবার সমস্ত সরঞ্জাম রাখা আছে, কেবল কলমদানে দোয়াত দুইটায় কালি শুকাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বদ্ধ কাচের আল্‌মারীতে ও খোলা সেল্‌ফে রাশিকৃত বাঁধানো বই।

বই দেখিয়া প্রথমে বীণার মুখ উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে পুস্তকগুলির মধ্যে নাটক নভেলের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। কোথায় কি আছে বীণা তাহা জানিত, টেবিল চেয়ারগুলি এড়াইয়া সে বাঁধানো মাসিক পত্রের আলমারীর দিকে চলিল।

কিন্তু ও আবার কি? কোণের হোয়াট্‌নটের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীচের থাকটিতে দুইটি পেঁপে। দেখিয়া তাহার মনে হইল, এ সেই পুকুর ঘাটের পেঁপে দুটি নয় ত? তেমনি বৃহৎ আকার—তেমনি পরিপুষ্ট পক্কপ্রায় গঠন। তেমন পেঁপে-- কৈ—সে তো আর কোথাও দেখে নাই!

পর মুহূর্ত্তেই বীণার মনে হইল—বাঃ মজা মন্দ নয়, পেঁপে এ ঘরে আসিল কোন পথে— কেই বা আনিল? — তখন সে দুয়ার জানালা গুলির কাছে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল যে কোথাও খোলা বা আসিবার পথ আছে কি না।

না, কোথাও না। পূর্ব্ব দিকে সদরের কপাট দুইটির খিল বাহির হইতে বন্ধ। উত্তর ও দক্ষিণের জানালায় রীতিমত শার্সি ও কপাট, তাহাও আবার দোতালার শূন্যে খুলিয়াছে। পশ্চিমে একটা দুয়ার রুদ্ধ, দ্বিতীয়টায় দামী তালা লাগানো থাকে— যাহা আজ সে খুলিয়াছে। এখানে পেঁপে আনিল কে? আর এ ঘরে রাখিবারই বা প্রয়োজন কি?

ভাবিয়া বীণা কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তবু কি মনে হইল, পেঁপে দুটি লইয়া সে একটা উঁচু আলমারীর মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি যা পাইল, কয়খানি বই টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু অত ত্বরার মধ্যেও, চাবি ঠিক লাগিল কি না দেখিবার জন্য দুই তিনবার তালা টানিতে ভুলিল না।

৪

নীচে আসিয়া বীণা শুনিল, আজ সন্ধ্যার সময় চারুর বর আসিবে, এখনি টেলিগ্রাফ্ আসিয়াছে। চারু সেখানে নাই, কিন্তু টুনী ও মেজবধূ মিলিয়া অদ্য রাত্রিতেই যে তাহাদের শয়নগৃহে আড়ি পাতিতে হইবে, এই পরামর্শে ব্যস্ত হইল। এতক্ষণ তাহারা বীণার অপেক্ষায় ছিল, সে আসিতেই যাহা যাহা কথা হইয়াছে সহর্ষে তাহার বিবরণ দিতে লাগিল।

পূজার সময় প্রতিবৎসর এখানে তাহারা সব ক'টি ভগিনী ভাজ এমন কি খুড়্তুতো ইত্যাদি সম্পর্কের অনেক বৌ ঝি আসিয়া একত্র হইলেই, ধুম পড়িয়া যায় এই আড়ি পাতার। প্রত্যেকেই নিজের নিজের লজ্জায় সন্ত্রস্ত, বিরক্ত, কেহ বা রাগিয়াও যায়, — কিন্তু অন্যের বেলায় সেই ঘরের অন্ধিসন্ধী গলি ঘুঁজি বাহির করিয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইতে একটুকুও কুণ্ঠিত হয় না।

বীণা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও অপেক্ষাকৃত শান্ত স্থির, তাহার পরামর্শে গুরুত্ব ও বিবেচনা থাকিত, দুষ্টামি করিয়া হঠাৎ ধরা পড়া বা গালি খাওয়ার পথে সে নাই। তাই অন্যারা বড়দি'র মত না লইয়া কিছু করিত না।

অনেকগুলি বহি পাওয়ার তৃপ্তি, তাহার পর আবার বহুদিন পরে আড়ি পাতার-- বিশেষ নূতন স্বামীর সঙ্গে ছোট বোনটির মধুর কথাবার্ত্তার কল্পনা মাধুর্য্যে উত্তেজিত হইয়া বীণা পেঁপের কথা অন্যকে বলিতে ভুলিয়া গেল।

পরদিন আরও একজন আত্মীয়া সদলবলে উপস্থিত হইলেন। পূজার উৎসব ও আনন্দ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রতিমার সাজ শেষ হইয়া আসিল। পর দিনের ষষ্ঠীকল্পের আয়োজনে লোকজন ও গৃহিণীরা ব্যতিব্যস্ত। তরুণীবর্গ ছোটখাটো ফরমাসী কার্য ও সমবয়সীদের সহিত সারা বৎসরের সঞ্চিত বাক্যালাপে মত্ত ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় জলখাবারের থালা সাজাইতে গিয়া ফল কাটিতে কাটিতে, পেঁপের কথা হঠাৎ বীণার মনে পড়িল।

প্রথমে সে আপন মনে একটু হাসিল। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তখনও ভাল করিয়া আঁধার হয় নাই; কিন্তু চাকরেরা সাত আটটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া দালানে ধরিয়া দিয়া গিয়াছে। একটা হাতে লইয়া বীণা বলিল—" তোরা একটু দ্যাখ ভাই, আমি শিগগীর আস্‌ছি।"

" কোথায় যাচ্ছিস্?"

"কোথাও না, এই উপরে—এই এলাম, বলে, দ্যাখ্‌না।"—বলিতে বলিতে সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। খানিক পরেই শোনা গেল, উপর হইতে সে মেজবৌকে ডাকিতেছে। নবাগতাদের সম্মুখে মেজবধূ ঘোম্‌টা দিয়া ছিল, ডাক শুনিয়া সে বেশ উৎসুক ভাবে অথচ আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সিঁড়ি উঠিয়া গেল। দুয়ারেই বীণা দাঁড়াইয়া। মেজ বউ আসিতে সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"বৌদি ভাই, একটা কাণ্ড! শোন ভাই, মজা শোন সব।"

মজার নামে বধূও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন বীণা সেই লাইব্রেরী ঘরের পেঁপের কথা সমস্ত এক করিয়া বলিয়া ফেলিল—"তার পর আজকের কথা শোন। ব্যাপারটা যে কি, কে এমন করছে—আমি ত ভাই একটুও বুঝতে পারছি নে।"

মেজ বধূ বিস্মিতভাবে বলিল—"তার পর, কি হল আজকে?"

বীণা বলিল—"হ্যাঁ শোন, আজ আমি উপরে গিয়েই প্রথমে আল্‌মারীর মাথা দেখতে গেলাম। একটা চেয়ার টেনে এনে তার উপর চড়ে—দিব্যি ভাল করেই দেখলাম, পেঁপে দুটোর একটাও নেই।"

"সে কি— গেল কোথায়?"

"শোন্ না, শেষ পর্য্যন্ত আরও কি কাণ্ড। প্রথম দিন আমার ঠিক মনে হচ্ছিল—কোন মানুষে ফল ফেলে রেখেছে। কিন্তু আজ,—কি জানি ভাই সে কি ব্যাপার—আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্চে না। দোর জানালা বেশ ভাল করেই দেখেছি, দস্তুর মত বন্ধ আছে সব। তালার চাবিও দিনরাত আমার কাছে রয়েছে। এখন অন্য মানুষ সেখানে যাবে কি করে বল দেখি?"

"তাই ত!"

"শুধু কি তাই? এ যেন কেউ লুকোচুরি খেলা জুড়েছে। পেঁপে দেখতে পাইনি, কিন্তু ঘরখানায় যেন পাকা ফলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে আবার সে দুটো দেখতে পেলাম। কোথায় জানিস্? কোণে একটা ছোট মোড়া আছে—তারই মধ্যে! বড় সোফাটার আড়ালে সেটা দেখাই যাচ্ছিল না, হঠাৎ দেখে আমার কি মনে হল,—পা দিয়ে মোড়াটা উল্টে দেখি না—বাঃ তার মধ্যে পেঁপে মশাইরা বসে রয়েছেন!"

বীণা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু মেজ বউ কোন সাড়া দিল না দেখিয়া আবার বলিল—"দেখবি ভাই? এবার আমি আবার তাকে অন্য আলমারীর উপর লুকিয়ে রেখেছি। খবরের কাগজ মুড়ে ছেঁড়া বই চাপা দিয়ে এমন করে রেখে এসেছি!—এবার যদি হারায়—"

"কেন হারাবে না?"

বীণা বলিল—"না রে না, এবার আব কারু সহজে নজরে পড়বে না। তবে যদি—"

বালিকা বধূর মুখখানি যেন বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে একটু বিমর্ষ হাসি হাসিয়া বলিল—"তুমি যে কেন বুঝচ না ঠাকুরঝি, ওকি সত্যি সত্যি পেঁপে মনে করচ?"

তাহার ভঙ্গী দেখিয়া বীণা আরও হাসিয়া বলিল—"পেঁপে না ত কি ভূত?"

"তা আমি কি করে বলব! তুমিই বলছ যে জানালা দরজা দিয়ে কারু যাবার উপায় নেই, কিছু না—অথচ পেঁপে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এতে মানুষের মনে কি হয়?"

কয়েক মুহূর্ত্ত অবনত মুখে থাকিয়া তার পর মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—"ভূত টুত নয় নিশ্চয়, কিন্তু এর মধ্যে যে কি কথা আছে, তা বের করতেই হবে।"

তাহার কথা শুনিয়া মেজ বউ ভীতভাবে বলিল—"কখ্খনো না ঠাকুরঝি—তুমি আর ও ঘরে যেওনা ভাই। তাব চেয়ে বরং মাকে বল গিয়ে।"

বীণা হাসিয়া বলিল—"তা বৈকি, মাকে বল্লেই ঠাকুমার কাণে যাবে, তিনি তখন পেঁপে দুটি ফেলিয়ে দেবেন। না—থাক্, কাল মেজ্দা অনু সবাই এলে, দেখিস্ মজা করব এখন।"

বউ কি বলিতে উদ্যত হইযাছিল, বাধা দিয়া বীণা বলিল—"লক্ষ্মী বৌদি, আজকের দিনটে তুই কাউকে কিছু বলিস্নে ভাই, আমি আর একটা দিন দেখি।"

বধূ অবাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। বীণার মুখখানি ভয়মাখা অথচ হাস্যোদ্ভাসিত। খানিক পরে একটা উচ্ছ্বসিত হাসিব সহিত সে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা মজা—পেঁপে-ভূত!"

৫

সেদিন ষষ্ঠী পূজা। —সকাল হইতে দুয়ারে সানাই বাজিতেছে। বৃদ্ধা গৃহিণী আলু থালু বসনে বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বীণার মাতার স্বাস্থ্য ভাল নয়, বিশেষ গতরাত্রিতে তাঁহার খুব মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গিয়াছে। স্নানান্তে কন্যা ও নাতি নাতিনীদের লইয়া তিনি চা খাইতে বসিয়াছেন।

কেটলী পেয়ালার সেই সুবিস্তৃত ব্যাপারটি বারম্বার কর্ম্মরতা বৃদ্ধার চক্ষে পড়িতেছিল, কিন্তু তিনি যেন চাহিয়াও চাহিতেছিলেন না। বধূর মাথা ধরা কিরূপ ক্লেশকর তাহা তিনি দেখিয়াছেন; চা খাইলে সে কষ্ট কিছু উপশম হইবে, ইহা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে ছিলেন। কিন্তু মুহুর্মুহু তাঁহাব মনে হইতেছিল, কি ব্যাদরা অভ্যাস বাবু! মেয়ে মানুষের তুচ্ছ শরীরের জন্যে এতখানি যত্ন ও সাবধানতার যে কি প্রয়োজন, তাঁহার বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তা ছাড়া আজ দুর্গাষষ্ঠী— ছেলের মায়েরা ভোরে উঠিয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছে; শঙ্কিত চিত্তে মা ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তিনি মাথা ঠুকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছিলেন—হেই মা ওদের সবারি হয়ে আমি আজ উপোস দিচ্ছি, তুমি সব রক্ষা কর।

ভোর রাত্রিতে কলিকাতার ট্রেণ ষ্টেশনে আসে, বেলা নয়টা দশটায় ছেলেদের আসিবার কথা। নিজের সব শেষ হইলে বীণার জননী দালানে তোলা উনান জ্বালাইয়া

নানাবিধ জলখাবার তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। এবার বৃদ্ধার মুখ প্রফুল্ল হইল; বধূর রন্ধনতৎপরতা ও খাদ্য সামগ্রীর বিচিত্র স্বাদের কথা তাঁহার ভালই জানা ছিল। নিকটে আসিয়া বলিলেন –"বৌমা, মাছ তরকারী গুলোও দেখিয়ে দিতে পারবে কি? এখানে এনে দিতে বলব?"

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন--"না জেঠাইমা, বড় বৌমাকে নিয়ে আমিই রান্নাঘরে যাব এখন। মাছটা আমায় রাঁধতেই হবে যে।"

গৃহিণী অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন-—"আহা তা হবে না, বাছারা নিত্যিদিন যা রান্না খাচ্চে! এখন ভালয় ভালয় সব এসে পড়লে বাঁচি। তারা না এলে যেন পূজো পূজো লাগছে না কিছুতেই।"

বেলা অনেকখানি হইয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বন্ধু বান্ধব সঙ্গে কলিকাতার ছেলের দল ও কর্ম্মস্থলের বাবুরা আসিয়া জুটিয়াছেন। অল্পবয়সী বালকেরা এতক্ষণ সে স্থানটিতে উড্ডীয়মান মধুমক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় মুখরিত চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছিল;— জলযোগ সারিয়া সম্প্রতি তাহারা স্নানে গিয়াছে।

এই সঙ্গে কলিকাতার পূজার বাজারও আসিয়া ছিল। পূজা ও সংসারের সামগ্রী আলাদা আলাদা করিয়া সরকার তাহা জেঠাইমাকে বুঝাইয়া দিতেছিল। রান্নাঘরের দালানটির অর্দ্ধেকখানি সে সকল জিনিয়ে পূর্ণ। বধূ ও কন্যাদের উপর রন্ধনের ভার দিয়া বীণার মাতাও সেখানে উপস্থিত। ছোট ছেলে মেয়েরা ঝাঁক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অনেকে নিজ নিজ জামাকাপড় কেমন হইল তাহা আগে দেখিবার জন্য আব্দার করিতেছে। যাহারা আরও অল্পবয়স্ক, ফলমূলের ঝাঁকার উপর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি; কিন্তু গৃহিণী সতর্কভাবে সেদিকে পাহারা দিতেছেন, পূজা না হইলে কাহারও সে সবে হাত দিবার উপায় নাই।

এমন সময় উঠানে একটা কোলাহল শোনা গেল। বাবুর কনিষ্ঠপুত্র অনু ওরফে অন্নদা উচ্চকণ্ঠে কাহাকে বলিতেছে-—"বাঃ তা কেন হবে? এ আমি পেয়েছি, আমি কেটে খাব;— তার পর যাকে খুসি তাকে দেব। তোর হল কেমন করে?"

উত্তরে তাহার মামাতো ছোট ভাইটি তাহার স্বভাবসিদ্ধ ঘোলা ঘোলা স্বরে গোলমাল করিয়া কি বলিতেছে। অর্থাৎ বেশ একটু কলহের উপক্রম। তাহাদের জননী জিনিষ গুছাইতে গুছাইতে, দৃষ্টি না তুলিয়াই স্থির স্বরে বলিলেন-- "এদের সব সময়ই সমান! কি হল রে অনু, ঝগড়া আরম্ভ করেছিস কেন?"

"এই দ্যাখনা মা, আমার পেঁপে— মোনা বলছ যে—"

বাধা দিয়া মোনাও তীব্রস্বরে বলিল—"না পিসীমা, ও পেঁপে আমিই জল থেকে তুলেছি।"

অনু বলিল—"বটে! তুলে বুঝি তুই রাজা হয়ে গেছিস, না? আমি যে প্রথমে দেখলুম, তোকে ডেকে নিয়ে গেলুম, সে সব বুঝি কথাই নয়?"

এমন সময় রান্নাঘর হইতে দ্রুতপদে বীণা বাহিরে আসিল। উদ্বিগ্নভাবে তাহাদের প্রতি চাহিয়া বলিল—"আবার জলের মধ্যে পেঁপে? কৈ দেখি।"

অনুর আর্দ্র বস্ত্র ও তাহার হাতের দুইটি সদ্যোধৌত পরিপক্ক ফলের দিকে চাহিয়াই সে তাড়াতাড়ি ডাকিল —"টুনী, একটু আমার সঙ্গে আয় ত ভাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"নাও, মেয়ে আবার ঘোড়ার মত ছুটলেন কোথায়?"

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বিদ্রোহী বালক দুইটিও ভগিনীর আকস্মিক চঞ্চলতায় বিস্মিতভাবে চুপ করিয়াই ছিল। আবার উপরে পদশব্দ উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে বীণা ডাকিয়া বলিল—"অনু—ওরে অনু—থাম—ও আমার পেঁপে, ঐখানে রাখ,—আমার পেঁপে।"

তাহার কণ্ঠস্বর শ্বাসরুদ্ধ। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নামিয়া আসিল। পশ্চাতে টুনু—তাহারও মুখ বিস্ময়বিমূঢ়। সকলের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্যভাবে জননী বলিলেন—"কথাটা কি রে? অত হাঁপাচ্ছিস কেন? স্থির হ। পেঁপে দুটো বুঝি তোদের?"

তখন অনু চেঁচাইয়া উঠিল—"বাঃ বড়দি, এ যে আমি জল থেকে কুড়িয়ে আন্‌লাম, জিজ্ঞেস্ কর ত মোনাকে; কোণের ঘাটে পাঁকে পড়ে ছিল, আমরা তা তুলে নিয়ে এলাম, এ তোমাদের পেঁপে হল কেমন করে শুনি?"

বীণার মুখ ক্রমশই বিবর্ণ হইতেছিল। ভ্রাতার কথা শেষ হইলে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল—"কারু নয়, অনু, তুই এক্ষুণি ফেলে দে। ও পেঁপে টেপে কিছু নয়,—ও ভূত—পেঁপে-ভুত ওদুটো!"

"কি?"

বীণা মাতার নিকট আসিয়া বলিল—"সত্যি মা, নিশ্চয় ভূত। কাল মেজবৌদি বল্লে—আমার তখন বিশ্বাস হয় নি। আজ দেখ ও দুটো তালাবন্ধ ঘর থেকে উড়ে গিয়ে পুকুরের জলে পড়েছে।"

তাহার পর সে প্রথম হইতে সমস্ত বিবরণ বলিয়া গেল—মায় প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা পেঁপে দেখিয়া ফিরিতে ফিরিতে ঘাটের পথে আন্না পিসীর ভয় পাওয়া পর্য্যন্ত। ঘরে মেজবধূও তাহার বড়দিদির নিকট সালঙ্কারে পেঁপে ভূতের অদ্ভুত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল।

অনু দুয়ারে দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষের কথা শুনিতে শুনিতে ভীতিসমাচ্ছন্নমুখে হাতের ফল দুটি নামাইয়া দিল। ঠাকুমার ভ্রূ কুঞ্চিত, মাতার নয়নে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রচুর হাসির আভাসও দেখা দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। দাসী চাকরগণ সকলেই সেখানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দুই একটি প্রতিবেশিনীও উপস্থিত। বীণা প্রথমে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পেঁপে-ভূতের বিচিত্র কাহিনী সকলকেই শোনাইতেছিল, ক্রমে তাহার উৎসাহ কমিয়া আসিল। বকিয়া বকিয়া বিরক্তভাবে সে সেখান হইতে উঠিয়া ঘরে পলাইল।

যথাসময়ে পুরুষেরা আহার করিতে ভিতরে আসিলেন। বড় বারান্দায় আহারের স্থান, সারি সারি আসন পাতিয়া, পাশে এক একগ্লাস জল ও কলাপাতার টুকরায় লবণ ও নেবু দেওয়া আছে। তাঁহারা আসিয়া কেহ বা আসনে বসিলেন, কেহবা পূর্ব্বারব্ধ গল্পের

সূত্র ধরিয়া অন্যের সহিত কথা ও তর্কে অন্যমনা হইয়া দাঁড়াইয়াই থাকিলেন। বড় ছেলে প্রমদাচরণ সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল—"কৈরে অনু, তোদের সে পেঁপে ভুত কৈ?"

অনু উত্তর দিল—"এই যে বড়দা, রান্নাঘরে—"

"নিয়ে আয় এখানে।"

অনু একবার মাতার প্রতি চাহিয়া ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"হুঁঃ—ভূত না ঢেঁকী!"—বলিয়াই ফল দুইটি লইয়া দাদার সম্মুখে আসিল।

প্রমদা হাসিয়া বলিল—"চমৎকার, খাসা পেঁপে ত। মা, এদিকে এস, এ দুটো কেটে দাও দেখি, আমি খাব।"

মাতা অদূরে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"থাক না বাবা, যাই হোক খেয়ে কাজ কি?"

"না মা তা হবে না, ও ভূত দুটির উদ্ধার আমায় করতেই হবে। আহা বেচারা এক জায়গায় টিকতে পাচ্ছেনা, দেখি এখন আমার পেটে যদি টিকে যায়? এস—"

"পাগল ছেলে তোর যা খুসী কর—আমি কাটতে পারব না।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাতা ঘরে আসিলেন। প্রমদা বলিল— 'ও তুমি কাটবে না? আচ্ছা!"—বলিয়া পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া সে স্বয়ং কাটিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া তিনি আবার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"মাগো মা, তোদের অসাধ্যি কায নেই! দে ছেড়ে দে—আমিই ঠিক করে দিচ্ছি।"

সকলে আহার করিতেছে। মাতা একখানি বৃহৎ থালায় পরিপূর্ণ সুবর্ণসুন্দর সুগন্ধ কাটা ফলগুলি আনিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"এই নে, দুটো পেঁপে কেটে একটা গ্রামের লোক খাওয়ান যায়। সাধে কি ছুঁড়িরা চেঁচাচ্ছে!"

বাঁ হাতে প্রমদা খানকয়েক তুলিয়া লইয়া বলিল—"সব চেঁচামেচি এবার চুপ হয়ে যাবে মা, নাও ওদের দাও।"

দেখিতে দেখিতে পেঁপে-ভূতের যথারীতি শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোক্তারা সমস্বরে প্রশংসা করিতেছিল। প্রমদা বলিল—"মা, দেখেচ—ব্রাহ্মণেরা যে রকম খুসী হয়েছে, বেচারা পেঁপের শাপোদ্ধার হয়ে গেল।"

মা বলিলেন—"তা ত হল, এখন তোমরা ভাল থাকলে বাঁচি।"

"খুব ভাল থাকবো মা, খুব ভাল থাকবো।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রমদাচরণ বিশ্রামার্থ ঘরে ঢুকিল। অন্যান্য সকলে কেহ বাহিরে কেহ ঘরে আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল।

মা বলিতেছিলেন—"বিনু কোথা, তার পেঁপের কি করব এখন?"

পূজা শেষে ঠাকুরমাও তখন আসিয়াছেন। পেঁপের পরিণাম দেখিয়া ভয়ে ও বিরক্তিতে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। বধুর কথা শেষ হইলে বলিলেন—"হ্যাঁ, বাকি থাকে কেন, তোমার গর্ভের যে যেখানে আছে, সবকে ডেকে ঐ ভুতুড়ে পেঁপে খাওয়াও এখন। সব

মেমসায়েবী কাণ্ড! তোমরা মা বাপেরা যেখানে ভাল মন্দ বোঝনা, আমার সেখানে কথা কওয়াই অন্যায়। যা খুসী করগে বাপু।"

শাশুড়ীর কথায় বিপন্নভাবে হাসিয়া বধু বলিলেন—"আমি কি কর্ব্ব জেঠাইমা, ছেলের কথা শুন্‌লে না? ওরা অমনি—"

জেঠাইমা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কি বলিতে ছিলেন, হঠাৎ সিঁড়িতে পদধ্বনি ও বীণার হাস্য কলরব শোনা গেল। সে বলিতেছে—"ও মা, মা হয়েছে! এবার সব ভুল ভেঙ্গে গেছে, পেঁপে-ভূতের মজা সব টের পেয়েছি।"—বলিতে বলিতে সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল ও অত্যন্ত হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া ঠাকুরমা বলিলেন—" দেখিস হেসে গলে গেলি যে!"

মাতা বলিলেন—"তা জানি, বোঝাই যাচ্ছিল যে এর মধ্যে কিছু কথা আছেই। তার পর, ব্যাপার কি বল দেখি?"

আনন্দ ও উদ্দীপনায় বীণার মুখে হাসি উছলিয়া পড়িতেছিল। কোনমতে হাস্যরোধ করিয়া সে বলিল—' মাণিককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর মা, সে বাইরে আছে। তাকে ডাক, তোমার পায়ে পড়ি মা--তাকে ডেকে শোন সব কথা।"

"মান্‌কে? সে কি জানে এর?"

"তাকে ডাকাও না ঠাকুমা। কত মজার কথা--না না — বেচারাকে বোকোনা কিন্তু। সে তার"—বলিতে বলিতে বীণা আবার একটু হাসিয়া থামিয়া গেল।

উৎসুকভাবে তাহার মাতা বলিলেন—"কি হয়েছে কি তুই বলনা এখন। মাণিক কি করেছে?"

বীণা বলিল—"মাণিক? তারই ত পেঁপে। গাছ থেকে পেড়ে সে লুকিয়ে পাক্‌তে দিয়েছিল। এখন খাওয়া হয়ে গেল দেখে আমায় বলছিল 'না হয় দুটুক্‌রো আমায় দাও দিদিমণি।"

মাতা বলিলেন—"সত্যি? আহা দিয়ে আয়গে বীণা। সে খাবে বলে আশা করে—"

উচ্ছ্বসিত ভাবে বীণা বলিল, —"সে কি নিজে খাবার জন্য রেখেছিল নাকি? সেই ত কথা—ডাক না— শোন না মা।"

"ডাকছি, কিন্তু তুই বল দেখি কথাটা কি?"

"তার বৌয়ের জন্যে গো বৌয়ের জন্যে! তার বৌ নাকি পোয়াতী, পেঁপে খেতে চেয়েছিল, তাই মাণিক ঐ সাতকাণ্ড করে, পেঁপে লাইব্রেরী ঘরে লুকিয়ে পাকতে দিয়েছিল।"

মা বলিলেন—"তা তা বুঝলাম। কিন্তু ঢুকলো কি করে লাইব্রেরী ঘরে?"

বীণা বলিল—"লাইব্রেরী ঘরের ওপাশের জানালাটা প্রায় বারান্দার ধারে কি না, মাণিক বারান্দার রেলিং টপ্‌কে, কার্ণিশে পা দিয়ে এসে জানালা খুলে, সে ঘরে ঢুকতো। আমার কাছে যে চাবি আছে, আমি যে ওঘর খুলি, মাঝে মাঝে ঢুকি— সে কথা ত ও জান্‌ত না। ঠাঁই বদলে পেঁপে দুটো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে, ওরও মনে ভয় হয়েছিল যে ও দুটো পেঁপে নয়, বোধ হয় ভূত। আজ ভোরে আলমারির মাথা থেকে নিয়ে

মাণিকই ও দুটোকে জলে ফেলে দিয়েছিল। এখন আমাদের সব কথা শুনে, আসল কথা বুঝতে পেরেছে। পেঁপের কোনও দোষ নেই জেনে হায় হায় কবছে। তাকে ডাকাও না ঠাকুমা, সব কথা তার মুখেই শোন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মাণিক আসিয়া নতমুখে ইঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভয় বা লজ্জায় সেই তরুণবয়স্ক ক্ষীণকায় ভৃত্যটির মুখ বিবর্ণ, শুষ্ক। একবার ব্যথিত অনুযোগের দৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিয়া, ম্লানমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীণা তাহার ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। স্নিগ্ধস্বরে মাতা বলিলেন—"দুখানা পেঁপে নিবি নাকি রে মাণিক?"

মাণিক কোন কথা না বলিয়া মুখ হেঁট করিয়া থাকিল।

বীণা বলিল—"ও সব ক'খানাই দাও মা, সব ক'খানাই দাও, রেখে কি হবে?"

একখানা রেকাবে পেঁপেগুলি ও খানিকটা চিনি মাণিকের নিকট রাখিয়া বীণার জননী বলিলেন—" তোর বউ খেতে চেয়েছে? আগে তাই বলতে হয় হতভাগা! কচি মেয়ে, প্রথম অরুচি,—আহা বেচারীর সাধ হয়েছে, যা এক্ষুণি দিগে যা। কিন্তু লাইব্রেরী ঘরে তুই ঢুকতিস কি করে বল দেখি?"

মাণিক প্রথমে কিছুই বলে না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল—"কার্ণিশের উপর দিয়ে যেতাম মাঠাক্‌রুণ।"

"পড়ে যেতিস যদি! হ্যাঁরে, তোর কি প্রাণের ভয় নেই?"

পেঁপের রেকাবী হাতে করিয়া মাণিক চলিয়া গেলে, এই ব্যাপার লইয়া রমণীমহলে খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। ঠাকুরমা বলিলেন—"চাষা আর কাকে বলে! হতভাগা কি চোরের মত কাণ্ড কারখানা করেছে দেখ দেখি! যদি একবার পা ফস্কাতো, তা হলেই ত প্রাণটা গিয়েছিল!"

বীণা বলিল—"ঠাকুমা, —ভালবাসা কি প্রাণের ভয় করে?"

বীণার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর বৌটা দেখ্‌তে কেমন?"

ঠাকুরমা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন—"রূপের ধুচুনী!"

বীণা বলিল—"রূপেতে কি করে ঠাকুমা, যার সঙ্গে যার মজে মন!"

ঠাকুরমা বলিলেন—"তাই বটে! ঐটুকু ছোঁড়া, এরই মধ্যে বউয়ের জন্যে দরদ দেখ একবার! ঘোর কলি ঘোর কলি!"

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩২৪

সিঁথির সিঁদুর

শ্রীশান্তা দেবী

২রা আষাঢ়। আজ কতদিন পরে যে আবার লিখতে বসেছি তার ঠিক নেই। রাজ্যের গোলমালে আমাদের সমস্ত জগৎটাই যেন ওলোট্-পালট্ হয়ে গিয়েছে। কোথায় ছিলাম, কোথায় চলেছি, কি ছিলাম, কি হলাম, সব যেন ভূতুড়ে কাণ্ড। তবু এতদিন পরে আমার পুরানো খাতাখানি ফিরে পেয়ে মনে হচ্ছে, যেন অনেকালের পুরোনো সাথীটিকে ফিরে পেয়েছি। মন ভরে সব প্রাণের কথা তার কানে ঢেলে দেব। সে-কথা কেবল আমি বলব আর শুধু আমার বন্ধু শুন্‌বে। আমাদের এই দুজনার মধ্যে আর অন্য তৃতীয় জন কেউ নেই। এই যেন আমার সখা, এ ত আমার বাণী কানে করে শোনে না, এযে বুকে করে রাখে, তাই সে বাণী তার বুকেই জেগে থাকে, আর কারু কানে কানে জগৎ ঘুরে খেলো হয়ে আসে না। তার গায়ে আমি যে রং ধরিয়ে দি, তার প্রাণে আমি যে সুর জাগিয়ে দি, সেই তাকে ঘিরে রাখে; হাটে পথে ঘুরে সে কালী মেখে আসে না।

বন্ধু আমার, তোমায় পেয়ে মনে হচ্ছে, মা যেন তার হারানো কোলের ছেলেটিকে বুকে ফিরে পেয়েছে। নববধূর প্রবাসী স্বামী যেন নিশীথ রাত্রে শুধু তার জন্য অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। সত্যি, কত কি যে মনে হচ্ছে, তা আমি বলে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু আর একটা কথা যে মনে হচ্ছে, সেটা না বলে পার্‌ছি না। এত দিন শুধু তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নেই, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি যে একজন এল বলে, তুমি নিশ্চয় তাকে দেখে রাগ করবে না, কারণ সে ত তোমার দোসর হবে না। তুমি আমার যেমন বন্ধু, তেম্‌নি থাক্‌বে; শুধু সে আর একজন বাড়বে। এতদিন ধরে আমারি মনের কথা তোমার কাছে অঞ্জলি অঞ্জলি করে ঢেলে দিয়ে গিয়েছি, এর পর থেকে কিন্তু আমারই এক হাত হতে তুমি দুই প্রাণের যুগলাঞ্জলি পাবে।

উনি ত এলেন বলে। আমি কারুর কাছে কোনোদিন উনি বলিনি, কিন্তু কথাটা যে আমার কেবলি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, মুখে বল্‌তে যখন বাধে তখন কলমের মুখে তোমার কাছেই বলে যাচ্ছি। আনন্দ হচ্ছে কি না কেউ যদি আজ আমায় জিজ্ঞেস করে, তার উত্তরে যে আমি কি বল্‌ব তা আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন কিসে যে ভরে উঠেছে, সেকি সাগরের জল, না স্বর্গের সুধা, তা আমি জানি না। দুঃখ আমার বানের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, না সুখের অতল-তলে আমি তলিয়ে যাব, তা ত বল্‌তে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে ধূপারতির মাঝখানে সন্ধ্যায় মন্দিরে যেমন দেবতার বিগ্রহ আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া দেখা যায়, তেমনি যেন আমার সমস্ত সুখকল্পনার ছায়া-লোকের মাঝখানে কার মুখজ্যোতি ধীরে-ধীরে ফুটে উঠ্‌বে। এই যে জগতে আমি খাই-দাই, ঘুরি-ফিরি, সে জগৎটা যে ঠিক তেমনি মাটির ধরণীর মত থাক্‌বে, এটা মান্‌তে আমার ইচ্ছে করছে না। জানি পৃথিবীটা আমার জন্যে এক নিমেষে বদলে যাবে না, কিন্তু আমার

মনোলোকে যে নূতন জগতের সৃষ্টি হবে তার আশাতেই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠ্ছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ছায়া-লোকের কল্পনা হয়ত ছায়ার মতই মিলিয়ে যাবে।

ছোড়দিদি হঠাৎ এত ডাকাডাকি জুড়ে দিল কেন যে? যাই, আজ আর কিছু হল না।

১৭ই আষাঢ়। এই ক' দিনে আমার কি যে হল? ভেবেছিলাম, তেমন নয়, আর যাই হোক্। অবিশ্যি অমন আকাশ কুসুম ভাবাটাও আমার ঠিক হয় নি। আমি যদি নূতন বউ বলে লজ্জা কর্তে পারি, আমার খাতার ঝুড়ি ঝুড়ি কথা যদি মুখে একটাও ফুটে না বেরোয়, তবে তাঁরই বা এই কদিনের পরিচয়ে সমস্ত অন্তর আমার সাম্‌নে বিকশিত হয়ে দেখা দেবে কেন? পুরুষমানুষেরও ত লজ্জার আড়াল দূর কর্তে সময় লাগ্‌তে পারে? কিন্তু এ কথা স্বীকার করে নিয়েও আমার মন মান্‌ছে না। মনে হচ্ছে আমাদের মাঝখানের এই যে সূক্ষ্ম পর্‌দাটুকু এটা প্রথম প্রণয়ের সে পল্‌কা আড়াল নয়; একটি তুচ্ছ ঘায়ে ছিঁড়ে পড়ে যাবার জিনিস বলে একে বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার ত বিশ্বাস ছিল, সকালবেলায় প্রথম আলো যে কুয়াসার ক্ষণিক আবরণ সৃষ্টি করে, এ যেন ঠিক তারই মতন, দুজনেরই মাঝখানের এই লজ্জাভীতির কুয়াসা দুজনকে আরো মধুর রহস্যে ভরে তোলে, উজ্জ্বল দিনের আলোর মত দুটি জীবন যখন দুজনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাদের সব বোঝাপড়া হিসেবনিকেশ যখন খোলসা হয়ে যায়, তখনকার চেয়ে এই আধেক দেখা অল্প চেনারই মাধুরী বেশী, আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সে বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, আমি যেন সব রহস্য এক নিমেষে ভেদ করে সব জেনে শুনে নিতে পার্‌লেই বাঁচি। কারণ আমার ভয় আছে যে আমাদের এ আড়াল চিরকালের জন্য গাঁথা শক্ত পাথরের দেয়াল। নয়ত এ বিচ্ছেদের অনন্ত জলসাগর আমি সাঁতার দিয়ে পার হতে পার্‌ব না।

উনি ত রোজই সন্ধ্যায় ঘরে আসেন, রোজই হেসে কথা কন, তবু কেন যে আমার এ ভয় জানি না! মনে হয় ওঁর যা কিছু সম্পদ্—যাতে আমারই দাবী সব চেয়ে বেশী, তা যেন উনি সারাদিন ধরে পথে পথে কাকে বিলিয়ে দিয়ে আমার জন্যে শুধু সেই পরিশ্রমের শ্রান্তিটুকু নিয়ে এসেছেন; তাই ওঁর কথা হাসি, সবই ফাঁকা ঠেকে। সেই বিপুল অবসাদের বোঝা দুজনেরই চোখের আড়ালে যেন উনি আমার ঘাড়ে নামিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু তার বদলে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে উনি কোনো উৎসাহের নির্ঝরের আশা রাখেন না, আমিও তাই কিছুই দিতে পারি না। সত্যি, আমার মধ্যে কি যে আছে, আমি যে কি দিতে পারি না-পারি, তা জান্‌বার ইচ্ছা ওঁর এক বিন্দুও আছে বলে মনে হয় না। একটা নূতন মানুষের জীবনের মত এমন যে একটা রহস্য, তার ভিতরের খোঁজ নেবার জন্যে ওঁর এতটুকু কৌতূহল নেই। টাকা পয়সা রোজ্‌গার করে এনে, লোকে যেমন সযত্নে তুলে রেখে তার পর তাকে নাড়েও না, চাড়েও না, কেবল দর্‌কার-মত বের করে সংসারেরের কাজ চালায়, আমিও কি ঠিক তেম্‌নি কিছু হবার জন্যে সেজেগুজে এ সংসারে বড় বউয়ের স্থান দখল করে বস্‌তে এখানে এসেছি? হয়ত তা নয়, হয়ত সবই আমার মিথ্যা ভয় আর কল্পনা; কিন্তু এটা ঠিক যে আমার নূতন জীবনটা_

আমি যা মনে করে মনটাকে তার মত করে সাজাচ্ছিলাম, এটা তা নয়, সংসারও অমন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় না। মাটির স্পর্শ ভুলে যাবার মত দিন বোধ হয় লোকে কেবল আশাই করে, তাকে পায় না।

১৮ই আষাঢ়। কাল কত যে পাগলের মত লিখেছি, তার ঠিক নেই। আমার ভুল বোধ হয় ভাঙ্‌ল। আজ সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাবার আগে হঠাৎ উনি ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। কই, আগে ত আর কোনো দিন এমন সময় উনি এদিক মাড়ান না। ভাব্‌লাম, আজ বোধ হয় এদিকে কেউ লোকজন ছিল না, তাই একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস কর্‌বার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম বটে, তবু যেন ভরসা হচ্ছিল না। দেখ্‌লাম ওঁর মুখখানা যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। বাবা, পুরুষমানুষের আবার এত লজ্জা! ওঁর অত লজ্জা দেখ্‌লে আমার ত চোখ মাটি ছেড়ে উঠ্‌তে চায় না। আমার শরীরটা যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিল, বুকটা শব্দ করে করে লাফিয়ে উঠ্‌ছিল। একটা সাহেব-বাড়ীর গয়নার বাক্‌স আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বল্‌লেন, "তোমার জন্যে।" উত্তরে কি বলা উচিত ছিল? উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ান উচিত ছিল নাকি? আমি কিন্তু কিচ্ছু করি নি। কেন জানি না, আমার ও-সব আসে না। লজ্জায় মুখই তুল্‌তে পার্‌ছিলাম না। কিন্তু আনন্দে মুখ ফেটে যেন রক্ত পড়্‌তে চাইছিল। চোখ তুলে দেখ্‌লাম উনি ঘর থেকে চলে গেছেন। কি জ্বালা, কথা বলি নি ত হয়েছে কি? না হয় দয়া করে আর দুমিনিট দাঁড়াতেনই। বাক্স খুলে দেখ্‌লাম মুক্তো-বসান নেক্‌লেস। মনটা যেন ভর্‌ছিল না, যদি একছড়া ফুলের মালা হত, কি ওঁর হাতের একটা লেখা হত, তা হলে বোধ হয় আরো খুসী হতাম। ওঁর লেখা উনি খগেন-হীরেনকে রাজ্যি খুঁজে ডেকে এনে শোনাতে পারেন, কিন্তু আমায় একবার দেখ্‌তেও দেন না। যাক্, বড়-মানুষের ছেলে উনি যদি আমি খুশী হব মনে করে গয়না দিয়েছেন তবে সেই আমার অক্ষয় সম্পদ। একদিন বুঝ্‌বেন এর চেয়ে ওঁর দুমিনিটের আসাটার উপরেই আমার বেশী টান।

২০শে আষাঢ়। রাত্রে সেদিন গয়নাটা পরে ও ঘরে যাই নি। কিন্তু উনি ত কিচ্ছু বল্‌লেন না। আমি পরেছি কি না, সেটা আমার মনে ধরেছে কি না-ধরেছে, তার বিষয়ে একটা কথাও ত কইলেন না। যেন সে কথা ভুলেই গিয়েছেন। তবে সেটা দিলেন কি কর্‌তে, বাক্সে তুলে রাখ্‌তে নাকি? থাক্ বাক্সেই তোলা থাক, আমিও না বল্‌লে পর্‌ছি না, কোনো কথাও ওর বিষয়ে কইছি না। অদ্ভুত মানুষ! কে যে চেয়েছিল তার ঠিক নেই! সত্যি ওঁর যেন কুল পাবার জো নেই; উনি কি নিয়ে যে থাকেন, আর কি যে মাথা-মুণ্ডু ভাবেন, তা উনিই জানেন। আমার ওসব রকম দেখ্‌লে কান্না আসে। যাক্‌কে ছাই, আর লিখ্‌তেও ইচ্ছে কর্‌ছে না। আমার কি যে হবে!

৩০শে আষাঢ়। কি বিষ্টিই আজ নেমেছে! সকাল থেকে সেই যে ঝম্ ঝম্ করে জল ঝর্‌ছে তার ত বিরাম নেই। রাস্তার ধারে জান্‌লায় বসে দেখছিলাম ফুটপাথের উপর একহাঁটু জল উঠেছে। মানুষের দুটো মাত্র হাত, বর্ষার দিনে তাই দিয়ে জুতো ছাতা কোঁচা

বই খাতা সাম্‌লে ছেলেগুলো কি করে যে চলে তার ঠিক নেই। কাঁসারিদের ছেলেগুলো বেশ জলের মধ্যে লাফালাফি নাচানাচি জুড়ে দিয়েছে। পায়ে হেঁটে যারা যাচ্ছে তারা ত তবু ভাল, কিন্তু চারটে-চাকা ডোবা মড়াঞ্চে-ঘোড়ায় টানা, ছ্যাক্‌ড়াগাড়ীতে যারা টাকা নষ্ট করে যাচ্ছে, তাদের বোধ হয় হাতের মুঠোয় প্রাণটি। কখন্ ঘোড়া হুম্‌ড়ি খায়, কখন্ ড্রেনে ধসে পড়ে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পাথরে-বাঁধা রাস্তার উপরে দুপাশের বাড়ীর সীমানার মাঝখানে বৃষ্টি দেখে আমাদের সেই সাঁচ্চা মাটির দেশের বৃষ্টি মনে পড়্‌ছে। আজও হয়ত সেখানে চিরদিনের মত আকাশগঙ্গার বাঁধনহারা শতধারা মাঠে পথে অবিশ্রাম ঝরে পড়্‌ছে। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে মাঠের উপর বৃষ্টি যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, জল মাটিতে পড়েও পড়ে না, ছুট্‌বার দিকেই তার রোখ বেশী। তার বালকের মত ছন্দহীন উদ্দাম নৃত্য আজ আমাদের মনকে সেইখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠের উপর জলধারা সহস্রগতিতে উধাও হয়ে গলাগলি করে ছুটেছে। সেই তিনটে দুষ্টু ছেলে একটা বাঁশের ছাতার তলায় তেম্‌নি করে মাথা গুঁজে ইস্কুল থেকে ফিরছে। চাষী, পথিক শূন্য হাতখানা দিয়ে মাথা আড়াল করে গায়ে গাম্‌ছা জড়িয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ছুটেছে। আমাদের রান্নাঘরের খড়ের ছাঁচার জল ঝিল্‌মিলে পর্‌দার মত ঝুলে পড়েছে। কাকী-মা নিশ্চয় কোণের হাঁড়িগুলো এতক্ষণে মাঝখানে এনে জমা কর্‌ছেন।

এঁর না শুন্‌ছিলাম আজ বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় জল দেখতে বেরোবার কথা? গিয়েছেন কিনা কে জানে? থাক্ সে কথায় আমার কাজ কি? কিন্তু যত ভাবি ও-সব কথা আর ভাব্‌ব না, আমার সকল দুঃখের ভাগী খাতাটিকেও শোনাব না, তত কি ছাই ওই-সবই মনে আসে?

সেই যে মুক্তোর নেক্‌লেস্‌টা সেদিন এনেছিলেন, ২২শে এদের বাড়ী বিয়েতে যাবার সময় পরিনি বলে শাশুড়ী বললেন, "বৌমা, অমন সাহেববাড়ীর গয়নাখানাও তোমাদের আজকালকার নজরে ফেল্‌না হ'ল। পরের বাড়ী যাচ্ছ, গলায় দাওনি যে?" আমি ত অবাক! উনি আমায় একলা ঘরে দিয়ে গেলেন, মা জান্‌লেন কি করে? তবু বললুম, "পর্‌ছি।" মা বল্‌লেন "তাই পর। বলে বলে তবে গয়নাটা ঠিক সময় আনালুম। আমি বলি বুঝি ছেলে এখনো দেয়ই নি। বলি বৌমার বাপের বাড়ীর তেমন ত কিছু নেই, তা বলে বড়ঘরের বৌ এখনো দুখান পর্‌বে না? লোকে আমায় বল্‌বে কি?" হায় রে কপাল! এই আমার প্রথম উপহার! যাক্, মিথ্যের মোহটুকু যাওয়াই ভাল। ইচ্ছে অবিশ্যি করে আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে, কিন্তু তাতে আমার লাভটা কি?

আমি আমার এয়োতির চিহ্ন শাখাসিঁদুরের চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছিলাম, আমার স্বামীর উপর দাবী, বিবাহ-মন্ত্রের চেয়েও যে বেশী নিশ্চয় করে দিয়েছিল মনে করেছিলাম, সে যে আজ জমাট-অশ্রুর মালা হয়ে আমার কণ্ঠরোধ কর্‌বে তাকি সেদিন ভেবেছিলাম! উনি আমায় ঠিক উপহারই দিয়েছিলেন, কঠিন সোনার উপর বসান মুক্তার হার। আমার চোখের জলের ধারা পদ্মপাতার জলের মত গড়িয়ে যাবে না বুঝেছি; সে কঠিন মুক্তা

হয়ে আমারই বুকে চিরদিন দুল্‌বে। আমি তৃষিত, তাই মরীচিকার পিছনেই ছুটে খুসী হয়ে উঠেছিলাম।

সেদিন মনে করেছিলাম লজ্জায় ওঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। এখন বুঝ্‌লাম, তা নয়। নিজের হাতে পরের সওদা পৌঁছে দিতে আস্‌তে হয়েছিল বলেই মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। মায়েরই বা এ সাধ কেন? ছেলে যদি বৌকে চায় না জানেন, তবু তাকে ফর্‌মাসী সোহাগ পাঠাবার কি দর্‌কার? ইচ্ছে করে বলি—আমি কিচ্ছু চাই না; তোমাদের শান্তি নিয়ে তোমরা থাক, আমিও যেমন ছিলাম আবার তেম্‌নি করে খড়ের ঘরে বর্ষাসন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বেলে নিশ্চিন্তে দিন কাটাই। কিন্তু সে কথা যে বল্‌তে পারব না, মুখও ফুটবে না, মনও জানে কথাটা মিথ্যা। আমি যদি এ সংসারে আমার পাওনাটাই না পেলাম, তবে আমার মনে তার লোভটা অমন করে জাগিয়ে তুল্‌তে কে বলেছিল? মাটির ঘরের দেয়ালের আড়ালে কাঁথায় শুয়ে যে আরামে রাত কাটাত, পুকুরের ঘাটে হেসে খেলে যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ পেয়েছে মনে কর্‌ত, অত আলো জ্বেলে, অত রঙের বাহার দিয়ে, কাজে কথায় অত মাধুরী ঢেলে, তার সুপ্ত মনের কোণের ও গোপন কক্ষটি খুলে না দিলে কি চল্‌ত না। জগতে যা পেয়েছিলাম, তার বেশী যে কিছু চাইবার কি পাবার আছে, তা ত জান্‌তাম না; এই আমাদের পুরোনো পৃথিবীতেই যে একটা স্বপ্নলোক সকলের বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাকে তাকে যে ওই সোনার কাঠির স্পর্শে সত্য করে তোলা যায়, সে কথা ত যেচেই আমায় তোমরা বলেছিলে। তবে এখন আমি কেমন করে ফির্‌ব? জানি ফির্‌তে আমায় কেউ বল্‌বে না, কিন্তু যা নিয়ে তৃপ্ত হয়ে থাক্‌তে হবে মনে হচ্ছে, শুধু তাতে আমার সাধ মিট্‌বে না। আমার যা পাওনা তাই আমার মন চাইছে; সোনাদানা দিয়ে আমার পাওনার মূল্য চুকিয়ে দিলে ত হবে না; আমি দাম চাই না; খাঁটি জিনিস চাই।

দিদির কথা মনে হচ্ছে; দিদি স্বামীর শুধু ছবিটাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ধূপধুনোয় পূজো করে সুখ পেত বল্‌ত; কিন্তু আমার স্বামী যে মানুষ, সে ত শুধু ছবি নয়। ছবিকে ছবির মধ্যেই সবটা পাওয়া যায়।

মানুষ যে, তাকে ছবির মত করে নিতে মন চাইবে কেন? তারও সবটাই আমার মন চায়।

৩রা শ্রাবণ। ও বাড়ীর বড়দিদি বলে "বৌ তুই অমন হাবা কেন? সাজসাজ্জা মানঅভিমান না করলে কি পুরুষমানুষের মন পাওয়া যায়? দেখ্‌ ত ঠাকুরপো বাইরে বাইরে ঘোরে, আর তুই রূপের ডালি নিয়ে হাবা-বোবার মত মুখ বুজে ঘরের কোণে বসে থাকিস্‌।" আমার কিন্তু অন্যরকম ধারণা ছিল। যে আমাকে ঘরে এনেছে সেই ত আমার মনের সন্ধানে ফির্‌বে ভেবেছিলাম। নয়ত গন্ধ যেমন হাওয়ায় ভেসে এসে মৌমাছিকে ফুলের খবর দিয়ে যায়, তেম্‌নি আমাদের দুজনার অজ্ঞাতে আমাদের মনের সৌরভ দুজনার কাছে পৌঁছবে ভেবেছিলাম। দেখ্‌ছি কোনোটাই ঠিক নয়। তাই মনে হল, হয়ত বড় দিদির কথাটাই ঠিক হবে। আমি ত কোনোদিন ওঁর কাছে নিজে হতে কিছু

বল্‌তে যাই নি; তাই বুঝি উনি অমন উদাস। কিন্তু কি কর্‌ব ছাই, তাও ত জানি না। বড়দি বলে মন জোগাতে। হায় রে কপাল! এত লাঞ্ছনাও ছিল কপালে! বড়দিদি ছাড়ে না। আজ তিনদিন ধবে আমায় নিত্য নূতন সাজে সাজাচ্ছে। আমি যেন কলের পুতুল হয়েছি, যা করে তাই করি। কিন্তু এই যে এতদিন ধরে আমি কিছুই করিনি, আর কদিন ধরে গায়ে গয়নাকাপড়ের দোকান সাজাচ্ছি, তা কৈ উনি ত এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন বলে মনে হয় না। বড়দি আমায় নিজেই সাজায়, নিজেই আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে মূর্চ্ছা যায়। সাজানোর সময় তার যাত্রার সুরের গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। কিন্তু যার জন্যে এত করা তিনি ভয়ে আঁৎকেও ওঠেন না, আনন্দে শিউরেও ওঠেন না। মনে হয় আমাব সঙ্গে যে উনি কথা বলেন, তা যেন আমার দিকে না তাকিয়েই। আমি যে ছায়া কি কায়া তাও হয়ত ওঁর ঠিক নেই। ঘরের একটা জিনিস এদিক থেকে ওদিক করলে উনি খোঁজ নেন, অথচ মানুষের দিকে ওঁর চোখ পড়ে না। বড়দি বলে উনি একবার আধ-পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যি কিনা কে জানে?

৬ই শ্রাবণ। দিদির সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে সংসার ছেড়ে দিয়েছি। তবু ত উনি আমার এ উদাসিনী মূর্তির কোন খোঁজ করেন না। আমি ঠাকুরঝির ঘরে আড্ডা করছি উনি যেন তাতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। দেখি ঝি একে একে আমার সব জিনিসপত্তর এই ঘরেই এনে তুল্‌ছে। এ কাজ যে সে নিজে করে নি, উনিই যে তা করিয়েছেন, তা কি আর আমার বুঝ্‌তে বাকি আছে।

আচ্ছা, আমায় ওঁর এত কিসের ভয়? কেনই বা আমায় এত এড়িয়ে চলেন? এক সুতোতে চিরদিনের জন্য গেঁথে দেওয়া হয়েছে বলেই কি সে বাঁধনে ওঁর এত অতৃপ্তি? আচ্ছা সে কথা আমায় বল্‌লেই ত হত! যাকে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দেবার কথা, তাকে একটি কথা বল্‌তেও ওঁর ভরসা হয় না। উনি যদি আজ বল্‌তেন 'তোমার দাবী-দাওয়া ছেড়ে দাও, আমায় মুক্তি দাও, তবে আমি আবার সেই আমাদের মাঠের পারের আনন্দময়ী সাগরিকা হতে পার্‌তাম না জানি; কিন্তু আমি মুক্তি না পেলেও মুক্তি দিতাম। অতীত যে শিকল কাটা পাখীর মত উড়ে গেছে, তাকে আর ফিরোতে পাবি এমন সাধ্য আমার নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি সরে যেতে জানি।

১০ই শ্রাবণ। ঠাকুরঝি আমার রকম-সকম দেখে দুই তিন-এম্‌নি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল যে কোনো উচ্চবাচ্যই করেনি। তারপর যখন চেষ্টা করেও এ অদ্ভুত সমস্যার কোনো কারণ খুঁজে পেলে না, তখন সে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে আরম্ভ করে দিলে। সারারাত আমি বিছানায় জেগে পড়ে থাকি,—রাত্রের অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, পথের লোকের পায়ের শব্দ যত মিলিয়ে আসে বড় রাস্তার আলোর উপর চঞ্চল ছায়ার নাচন থেমে গিয়ে আলো যত নিঃঝুম হয়ে পড়ে, আমার মন যেন ততই সজাগ হয়ে ওঠে; কর্ম্মমুখর দিনের চঞ্চলতা যাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল শ্রান্ত ধরণীর অলস নিশ্বাস যেন তাকে জাগিয়ে তোলে। সারাদিন চোখের সাম্‌নে, মনের অলিতে গলিতে নানা লোকজন আর নানা ঘটনার ছবি একটির পর একটি করে মালার মত গড়ে উঠ্‌তে থাকে, মনে হয়

হয়ত বা এই মালার গ্রন্থিতে আমরা দুটিও কখন্ বাঁধা পড়ে যাব, সেতুর মত এ আমাদের একজনকে আর-একজনের কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু দিনের ছবি যখন সব মুছে যায়, শূন্যতা যখন আশার সেতু ভেঙে ফেলে, তখন বিছানায় পড়ে-পড়ে আমার দৃষ্টির বাধা ঘুচে যায়, দেখি আমাদের মাঝখানের সেই অনন্ত বিরহ সাগর যেন যুগে যুগান্তরে ক্রমে ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে, একটি একটি জলের ঢেউ এসে আশার ছবিগুলি সব ধুয়ে-মুছে সেই অতল বিচ্ছেদের সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেদিন কাকীমাকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার এক্লার কান্না শোন্বার লোক ত এখানে কেউ নেই তাই সকল কথা আমার সেই স্নেহময়ী কাকীমাকেই লিখেছিলাম। আমি অনেক দুঃখেই লিখেছিলাম "মা-বাপের কাজ ছেলে-মেয়ে৭ সংসার পাতিয়ে দেওয়া; সে ভার তাদের উপর ভগবান দিয়েছেন, তাই তারা সেইটুকু করেই খালাস। কিন্তু কাকে যে কার সঙ্গে গেঁথে দেয়, তার খবর যারা গাঁথে তারাও রাখে না, যাদের গাঁথে তারাও রাখে না। আশাপথ সবাই চেয়ে থাকে, ভাগ্যদেবী যাকে জোড়া মিলিয়ে দেন, সেই পায়। কাজেই আমার ভাগ্যের দোষ আর-কারুর ঘাড়ে আমি চাপাতে পারব না।" কাকীমা চিঠির উত্তর দিয়েছেন, লিখেছেন, "মা, সাগরিকা, অনেক দুঃখের সঙ্গে তোকে আমার কোলে পেয়েছিলাম। তাই তুই আমার সুখ, তুই আমার দুঃখ। যেদিন তোর মুখখানা আমার সমস্ত দুঃখস্মৃতি জাগিয়ে আমার কোলে এসে পড়্‌ল, সেদিন তোর মুখের মায়াতেই সে স্মৃতিকে ঠেলে ফেলে দিতে হয়েছিল; কিন্তু সে একেবারে ফেলা ত যায়নি, কারণ একটি কণার মত যে ছোট্ট মেয়েটি সেদিন আমার উপর পূর্ণবিশ্বাস করে এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়েছিল, আমার অতীতের সুখ দুঃখ সবের স্মৃতিই সেই কণাটুকুতে ছিল। দুঃখের কথা জাগাতেও তুই ছিলি, সুখের কথা জাগাতেও তুই। আমাদের অতবড় সংসারের চিহ্ন ত কেবল তুই, আর সেদিনকার সেই যে প্রলয় অভিশাপ তাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গেল, তার ভস্মশেষও ত তুই। বিধাতার অভিশাপ যেদিন সকলকে গ্রাস কর্‌লে সেদিন সে তোকে ছুঁলে না. কবলে পেয়েও ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তাই ভেবেছিলাম, ভগবান তোর কপালে সুখ লিখেছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার দুরদৃষ্টের কথা চিরকাল স্মরণ করিয়ে রাখ্‌বার জন্যে নিষ্ঠুর বিধাতা আমার হাতেগড়া কুসুমকলিটিকে এমনি করে তিলে-তিলে দগ্ধ কর্‌বেন। তাই হোক্, আমার বুকের আগুন আমিই বুকে পুষে রাখ্‌ব। তুই আমার কাছে ফিরে আয়।"

কাকীমার চিঠি পড়ে আজ আমার ছেলেবেলার সেইসব কথা যেন চোখের উপর ভেসে উঠছে। কাকীমার আদর, তাঁর যত্ন যে বাপ-মা-ভাইবোনকে ভুলিয়ে রেখেছিল, আজ যেন তারা সবাই আমায় একসঙ্গে তাদের সেই শীতল শয্যায় ডাক দিচ্ছে। ইচ্ছা কর্‌ছে ছুটে যাই সেইখানে যেখানে এক নিমেষ সেদিন অনন্ত হয়ে উঠেছিল, যেখানে প্রাণ সেদিন আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, কিন্তু আজ যেখানে আমার সমস্ত আনন্দ ফুটে উঠেছে।

১৫ই শ্রাবণ। সেই আমাদের মাঠের পারের দেশে আবার চলেছি। কাকীমা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। যাচ্ছি বটে, কিন্তু যেদিন ছেড়ে এসেছিলাম, সেদিন যে ঘর যে

আনন্দ পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে আজ আর তা পাব না। সেখানে যে সাগরিকার ঘরদোর, যে সাগরিকার কাকীমার কোল, যে সাগরিকার মুখের হাসি চোখের জল সেখানের অত রূপ সৃষ্টি করেছিল, সে সাগরিকাই যে আর নেই। বিদায়ের দিনের সেই হাসিকান্নার স্পর্শে যে তার নূতন জন্ম হয়েছে। বিগত জন্মের আনন্দখানি আর তাকে তেমন আনন্দ দেবে কি করে?

এমন সময় হঠাৎ নিতে আসাতে মা বিরক্তও হয়েছিলেন, বিস্মিতও হয়েছিলেন; তিনি পাঠাতে বিশেষ রাজি ছিলেন না। কিন্তু উনি আমার কোনো কথায় কথা না কইলেও, মায়ের কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন, ''তোমাদের এ ভারি অন্যায়! এত সহজে পরের ঘর আপনার কর্‌তে কেউ কখনো পারে? যাদের মেয়ে তাদেরও মানুষের প্রাণ! তাদের কথাও রাখা উচিত।'' উনি আবার প্রাণের কথা বলেন! হায়রে আমার কপাল! যাক্‌, যাওয়াই ঠিক হল। আমার যাওয়াই ত উনি চান। আমিও আর এখানে থাক্‌তে চাই না। দেখি ছেলেখেলার মধ্যে গিয়ে আবার ধরা দিতে পারি কি না।

আজ যেন উনি কেমন সহজ হয়ে উঠেছেন। সারাদিনই বাড়ীতে রয়েছেন; জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিচ্ছেন; আমায় দেখে কনে বৌটির মত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন না। আমি যাব বলেই বুঝি ওঁর এত স্ফূর্ত্তি।

১৬ই শ্রাবণ। কি যেন একটা কি আমার মনে-মনে বলে যাচ্ছে, এই শেষ। মনে হচ্ছে, আর এখানে ফির্‌ব না, আর এ-ঘর দেখ্‌ব না, যার জোরে এখানের একজন হয়েছিলাম তার সঙ্গেও এই শেষ দেখা। তাই ভাব্‌ছি, যা শেষ হবেই তার একটু পরিচয় আমি রাখ্‌ব। জীবনে যা ঘটেছিল, তার স্মৃতি ত মুছ্‌লেও মুছ্‌বে না, তবে কেন তার নিদর্শন রাখ্‌তে এত ভয়?

কাল রাত্রে আমি ঠাকুরঝির ঘরে যাইনি। উনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন উঠে আমার ঘরের চারিদিক ঘুরে-ঘুরে দেখ্‌ছিলাম। জ্যোৎস্নার আলো জান্‌লার ভিতর দিয়ে ঘরে এসে পড়্‌ছিল। আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া সব দেখা যাচ্ছিল। হোক না আনাদরের স্থান। তবু শেষ দেখা ভাল করে দেখে নিতে সাধ হয়। ওঁর দেরাজের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম উপরেই একখানা মোটা খাতা ওঁরই নাম লেখা। উনি কবিতা লেখেন, জানি। এমন কি ওর উপর আমার লোভও খুব প্রবল। তাই খাতাখানা দেখেই চুরি করতে সখ হল। চুরিতে পাপ হয় লোকে বলে। কিন্তু যার সর্ব্বস্ব আমার পাবার কথা তার এক-খানামাত্র খাতা চুরি কর্‌লে আমার পাপ হতেই পারে না। ওঁর অন্তরের কোনো সম্পদ উনি আমায় স্বহস্তে তুলে দেন নি; কেন দেন নি, তাও বলেন নি। আজ যাবার দিনে তারই একটু খানি যদি এই কাগজ খানায় করে নিয়ে যেতে পারি, তাতে ওঁর ক্ষতি কিছুই হবে না; আমি হয়ত এমন কিছু পাব যা আমার চিরদিনের মৌন মুখের সম্বল হবে। সম্বল না হয় ঐ দুটো কথাও ত ওতে পাব। যে রহস্যের সঙ্গে আমার ভাগ্য এমন করে জড়িত তার একটুখানি আবরণও ত এতে ঘুচ্‌তে পারে।

খাতাখানা আঁচলে জড়িয়ে রাত কাটিয়েছি। আজ স্বামীর দান কিছু পাই নি বলে শূন্য

হাতে ফিরব না। নিজের হাতে নিজের ঘরের যেটুকু চুরি করে রেখেছি তাই নিয়ে যাব। ভোরবেলা স্নান করে আস্‌তেই উনি বললেন, "তোমার যতদিন থাক্‌তে ইচ্ছে হবে থেকো, কেউ বাধা দেবে না।" আমি ঘাড় নেড়ে প্রণাম করে চলে এলাম্‌। ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে একবার চেয়েছিলাম উনি কিন্তু আমার মুখে চোখ পড়্‌তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

২২শে শ্রাবণ। যে আমার মনের একটি কথা কথাও শোনেনি, যার হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনের একটি দরজাও আমার জন্যে খোলে নি, তারি অন্তরে চোরের মত সিঁদ দিয়ে ঢুক্‌তে লজ্জা কর্‌ছিল; কিন্তু একবারটি চোখ বুলিয়ে আমার ন্যায্য পাওনাটুকু শুধু দেখে নিতে এতই কি দোষ? খাতা খানা দেখ্‌লাম, কবিতার রাশি, হা হুতাশের ছড়াছড়ি, কিন্তু সে যে কার উদ্দেশ্যে তার খেই ও লিখনের মধ্যে কোথাও পেলাম না। নিজের গায়ে সে-সব আদর সোহাগ আক্ষেপ ক্রন্দন মানিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই খাপ খেল না। আমি হাঁ করে বসে রইলাম। এরকম কাণ্ড আমার জীবনে ত কখনও ঘটে নি, এর অর্থ খুঁজে বের করা আমার পক্ষে দুষ্কর। আমার চোখ দিয়ে জল ঠেলে উঠছিল, মনে হচ্ছিল, বুঝেছি, এ সব তাঁর মানসীর বন্দনা। সে মানস মূর্ত্তির কাছেও আমি পৌঁছতে পারি না, তাই বুঝি এত! কিন্তু নাই বা পৌঁছলেম, আমি ত সাধ করে সে ঠাঁই জুড়ে বস্‌তে যাই নি। এমনি তুচ্ছ জেনেই না নিলেও জাল করে ত আমি কিছুই দাবী করি নি।

ঘরে বসে ছেলেমানুষের মত ক্রমাগত চোখ মুছছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে অচেনা স্বামীর উপর অভিমানে গুম্‌রোচ্ছিলাম। কাকীমা ডাক দিলেন, "ওরে সাগর, তোর মান বেড়েছে রে। তোর শাশুড়ি যে তোকে এরি মধ্যে নিতে পাঠিয়েছে। আর দুঃখী মায়ের ঘরে দুঃখের অন্ন খেয়ে দিন কাটাতে হবে না।" চুরি করা খাতাখানা খুলে যা দেখেছিলাম, তা আমার মনে যে কিসের ঢেউ তুলেছিল এখন তা ভাল করে বল্‌তে পারব না। কিন্তু আর যাই হোক্‌ সেটা নিছক বিস্ময় নয়। শ্বশুর বাড়ীতে অল্পে অল্পে যে ও বিষের টিকে হয়ে গিয়েছিল। আমি পরিষ্কার না জান্‌লেও আমার অন্তরের অন্তর জেনেছিল, যে আমি যা চাই তা আমি পাবার আশা রাখি না। তাই মনের চোখে ধুলো দিয়ে যেখানে তৃষ্ণার জল চাইতে গিয়েছিলাম, সেখানে শূন্য পাত্র দেখে বুক ফেটে মরি নি।

কিন্তু আবার সেই ঘরে আমার ডাক কেন? এটা ত মনের অজ্ঞাতে স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি। যে আশা ছেড়ে দিয়েছি, এ ডাকে তা জেগে উঠে আনন্দ ত দিচ্ছে না ভয় বিস্ময় যেন বুকে চেপে বস্‌ছে। আবার আমার কি পরীক্ষা সুরু হবে? আশার সোনার স্বপ্ন ত টুটে গিয়েছে, এবার কি বেদনার অগ্নিপরীক্ষা?

২৫শে শ্রাবণ। গাড়ীতে উঠ্‌বার আগে কাকীমা আশীর্ব্বাদ করে সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আঁচলে সিঁদুরের কৌটা বেঁধে দিয়েছিলেন। এখনও তাঁর সেই আশীর্ব্বাদ কানে বাজ্‌ছে, "মা আমার, জন্ম জন্ম স্বামী সোহাগিনী হও, তোমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক্‌।"

আর একবার এই আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছিলাম, তখনকার কথা আজ আর বলে লাভ কি?

খিড়কির দরজা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌তেই মা, ও-বাড়ীর বড় ঠাকুরঝি, আর অন্যান্য অনেক মেয়েরা এসে দাঁড়ালেন। আমি মাথা না তুলেই একে একে সবাইকে প্রণাম করতে লাগ্‌লাম। বড়দিদিকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি বললেন, ''কি গো, বৈরাগিনী, পায়ে ধরে না সাধ্‌লে মন বুঝি ওঠে না? আপনার ঘর ছেড়ে গিয়ে কিসের তপস্যা হচ্ছিল? মেয়েমানুষের অত গরব কিসের? ঠুন্‌কো কাচের মান, এক ঘাও যে সইবে না।'' বড়দিদির মুখে এমন কথা কোনো দিনই ত শুনিনি। তবু মুখ না তুলে সবাইকে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌লাম। এক গা গয়না পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার আল্‌তা-পরা পায়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, মা ভারী গলায় বলে উঠ্‌লেন, ''থাক্ থাক্ আর পেন্নামে কাজ নেই।'' আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। শাশুড়ী আমার প্রশ্ন বুঝে বললেন, ''ও সম্পর্কে তোমার ছোট হয়।'' বড়দিদি আমায় এক'টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, ''ও তোমার যম হয়।''বড়দিদির আর তর সয় না। মুখ হাত পা দুয়ে একটু জল খেতে না খেতে একবাক্স গয়না কাপড় দিয়ে সেই পুরানো খেলা সুরু করে দিলে। আমার তখন কিচ্ছু যদি ভাল লাগ্‌ছিল। আমি ভাব্‌ছিলাম সেই গয়নাপরা মেয়েটির কথা। তার পরিচয় যা পেলাম, তা ত চমৎকার! দিদিকে ভাল করে জিজ্ঞেস কর্‌তে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু জান্‌বার জন্যে মন ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেই মেয়েটি ঘরের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে গেল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে একবাব তাকিয়ে নিল। ঘর পার হয়ে চলে যেতেই বড়দিদি চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন, ''আহা, আর দেখ্‌তে হবে না! ওঁর মত শাঁকচুন্নি মূর্ত্তি কিনা? পায়ের নখের ডগার যুগ্যি নয়, তাব আবার এত জাঁক। দেখ্‌ব আজ সাগরের কাছে কে দাঁড়ায়?'' দিদির হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটে ঠাকুরঝির ঘরে চলে গেলাম। দেখ্‌লাম আশা ছাড়্‌লেও মান ছাড়্‌তে পারি নি। এর আগে মর্‌লাম না কেন? এ ত অগ্নিপরীক্ষা নয়, এ যে রক্তলোহিত লোহা দিয়ে দাগা! বড়দিদি বিরক্ত গলায় ঝঙ্কার দিতে লাগ্‌লেন, ''ওলো নেকি! আর নেকামো করে জ্বালাস্ নে। এক তিলের মুরোদ নেই, অত ফর্‌ফরানি কেন?''

ঠাকুরঝির বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদ্‌ছিলাম; হঠাৎ ঠাকুরঝি ঘরে এসে আমায টেনে তুল্‌লে। আমি এক পা নড়ি না দেখে বল্‌লে, ''ছি বউ, অমন কি কর্‌তে আছে? বড় ঘরে অমন কত হয়। পুরুষমানুষের সব সাজে। মেয়েমানুষের অত জেদ শোভা পায় না। এস উঠে এস। হেলায় লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লে আর ফির্‌বে না।'' লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে যে জ্বলে মর্‌ছিলাম।

সারারাত মেঝেয় পড়ে ছিলাম। চোখের জল ঝরে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম এল না। ভাব্‌ছিলাম আমার এ আদরের মানে কি? লোকদেখানো যে ঠাঁই ছিল, সেও যদি রইল না, তবে কিসের জন্যে আবার এ টানাটানি?

ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বড়দিদি এসে ঠাস্ ঠাস্ করে গালে চড় দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। "আর ঘুমোতে হবে না। চোরে যে সিঁদ দিয়ে সব নিয়ে গেল।" আমি বল্লাম, "যাক্ না ভাই, চোর কিসের? সেই ত মালিক।" বড়দিদি চটে গেল, "আহা আমার মালিক রে! সাত কালের ঝাঁটাখাকী বাঁদী! তুই লক্ষ্মীছাড়ীই ত গণ্ডগোল বাধালি। ঘর ছেড়ে যেতে কে বলেছিল? তাই না চেপে এসে বসেছে।" গয়না বাজিয়ে সে এসে দরজায় দাঁড়াল। আমি এর আগে তার মুখখানা ভাল করে দেখি নি একবার ভাল করে দেখে নিলাম। আজও সে কথা না কয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমি বড়দিদিকে বল্লাম, "হ্যা ভাই, ওর লোহা সিঁদুর নেই কেন?" দিদি বল্লেন, "ইস্ লোহা সিঁদুর পর্‌বে? তুই ঘরণী গৃহিণী; তোর লোহা জন্ম জন্ম তোর থাক। ওর আবার কিসের লোহা সিঁদুর? ও সে সব অনেক কাল খেয়ে রেখেছে। তাই•না এমন সর্ব্বনাশী।" আমি "আস্‌ছি" বলে উঠে গেলাম। তখনও কাকীমার ঝি বাড়ী ফেরে নি। তাকে গিয়ে বল্লাম "একখানা গাড়ী ডাক্।"

কাকীমার বাঁধা সিঁদুরের কৌটাটা তখনও আঁচলেই ছিল। জান্‌তাম উনি ঘরেই আছেন। হঠাৎ সেই ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি যেন চম্‌কে ধড়মড়িয়ে উঠ্‌লেন। আমার গলা কেঁপে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না, কোনো রকমে বল্লাম "একটা কথা আছে।" উনি পাশের দিকে চাইলেন। দেখ্‌লাম মেঝেতে একখানা রেকাবী হাতে করে সে বসে আছে। আমি "থাক্" বলে হাত থেকে আমার বিয়ের লোহাটা ওঁর হাতে দিলাম, আঁচল থেকে সিঁদুর-কৌটা খুলে দিতে গেলাম, হাত কেঁপে ঘরে কাপড়ে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ে গেল। উনি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ঝি গাড়ী এনেছিল, বেরিয়ে গিয়েই উঠে পড়্‌লাম। শাশুড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ আমার এমন কাণ্ড দেখে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে রইলেন। একবার শুনলাম "হৃদয় হৃদয়" বলে ডাক দিচ্ছেন।

খালি হাতে শূন্য সিঁথি নিয়ে কাকীমার দরজায় যখন পৌঁছলাম, তখন কাকীমা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লেন "ওরে এমন সর্ব্বনাশ কবে হল রে?"

আমি কাকীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বল্লাম, "অনেক দিনই হয়েছে কাকীমা, আমি জান্‌তাম না।"

১লা ভাদ্র। কাল সকালবেলা রান্নাঘরের জান্‌লায় বসে ছিলাম। আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এজন্মে এমন ভাবে কেন করতে হল তাই ভাব্‌ছিলাম, এমন সময় ডাক-হরকরা চিঠি দিয়ে গেল। ঠাকুরঝির চিঠি। আমায় যে কেন চিঠি লিখেছে ভেবে না পেয়ে কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে খুলে দেখ্‌লাম—

"বৌ, তোমায় আর কি বল্‌ব জানি না, তাই বৌ বলেই লিখ্‌ছি। কিন্তু তুমি আমাদেরও ডাকের মান রাখনি। ছি, ছি, তুমি এয়োস্ত্রী মেয়ে স্বামীর এমন অকল্যাণ করে গেলে কি করে? মা তোমার কাণ্ড শুনে তোমার নাম মুখে কর্‌তে সবাইকে মানা করে দিয়েছেন। কিন্তু অনাদরে এ বাড়ীতে দিন কাটিয়েছ বলে আমার তোমার উপর কেমন

একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তাই এ চিঠি লিখছি। এই কি তোমার উচিত কাজ হল? অত বড় ঘরের বৌ হয়ে জ্বলজ্যান্ত স্বামীটাকে ফেলে শুধুহাত করে যে ইষ্টিশানে গিয়ে উঠলে, সেটা কি কারুর দেখ্‌তে শুন্‌তে বাকি আছে? যতই কেন অধম হোক, তোমারই স্বামী তোমারই শ্বশুরের বংশ, পর নয়। তাদের মাথা এমন করে হেঁট করতে তোমার কি এতটুকু লজ্জা হল না? ও আপদ অনেক কালই ছিল; সে গ্রহ শান্তি করে সতীলক্ষ্মীর মত ঘর আলো করে থাক্‌বে বলেই না তোমায় ঘরে আনা। সেই তুমি কি না একবারটি স্বামীর মঙ্গল চিন্তা না করে অতবড় মানী ঘরের মুখে কালী দিয়ে ঢাক বাজিয়ে ঢি ঢি পিটিয়ে গেলে? তুমি যদি আজ ঘর জুড়ে লোকের চোখের উপর থাক্‌তে, তবে কি আজ ও কালীর আঁচড় কারুর চোখে পড়্‌ত না আমাদের মাথা এমন হেঁট হত? হয়ত সতীর পুণ্যে একদিন সব বালাই দূর হয়েও যেতে পারত। যাক ও সব কথা আর বলে কি হবে? কেবল এইটুকু জেনো যে যার কলঙ্ক এমন স্বচ্ছন্দে রটিয়ে তেজ দেখালে, যার অপমানের কথা একবার ভাব্‌লে না, যার মুখের দিকে একবার তাকালে না, সে তোমারই স্বামী, তোমারই সর্ব্বস্ব। তার অপযশে তোমারই সবচেয়ে বড় অপযশ। সতী মেয়ে স্বামীর এমন অপমান করে না।"

ভাব ছিলাম ঠাকুরঝিকে লিখি—"আমার স্বামী কোথায় যে তার মান রাখ্‌ব? থাক্‌লে যে তুষের আগুনে পুড়োলেও তার মানের গায়ে ছুঁচ ফোটাতে দিতাম না।"

'প্রবাসী'—১৩২৫

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রী সরসীবালা বসু

ভোরের আলো সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুকতারার উজ্জ্বল আঁখি তখনও নীলাকাশে পরিস্ফুট, মধ্যগগনে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকণা নিষ্প্রভপ্রায়, শীতল বাতাস ফোটা বেল ও মল্লিকা গন্ধে ভরপুর হইয়া বহিতেছে। গ্রামবাসিগণ গ্রীষ্মের রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া, এখন ভোরের দিকে সকলেই প্রায় সুখনিদ্রায় অভিভূত। অদূরে গঙ্গাবক্ষে সাড়ে চারিটার স্টীমের ভোঁ ভোঁ শব্দে নিদ্রিত পাখী কূলকে সচকিত ও প্রত্যুষের শান্তভাবকে উদ্বিগ্ন করিয়া জলে তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়া সদর্পে চলিয়া গেল।

অদূরে খড়ো ঘরের ছোট্ট জানালার ধারে পিয়ারী এই ভোরেই জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছে, চক্ষে কেমন উদ্বিগ্ন ভাব, যেন কার আশাপথ চাহিযাই সে সাবা রাত্রির জাগরণ ক্লেশ স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে, প্রভাতেব এ পবিত্র শান্ত ভাব স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে। প্রভাতেব এ পবিত্র শান্তভাব তাহার হৃদয়কে মোটেই স্পর্শ করে নাই। ক্লান্ত দৃষ্টিতে গঙ্গাব পানে চাহিযা সে বুঝি তাহ'ব অতীত কাহিনী ভাবিতেছিল।

বিশ্বের পরিত্যক্তা সে, তাহাকে স্নেহ যত্ন করিতে আপনার বলিতে পৃথিবীতে কেহই নাই। তাহার জন্য, তাহার তরুণ হৃদয়ে ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও সে তো কোন দিন আশা বা কল্পনা করে নাই যে একদিন তার এই পরিত্যক্ত লাঞ্ছিত জীবনে একজন নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া সযত্নে নিজের অন্তরের স্নেহ ভালোবাসা দিয়া বরণ করিয়া লইবে, তাই যদিই সে লইল, তবে তার সে চিরবন্ধু চির আপনার হইল না কেন? মনের মধ্যে যদিও পিয়ারী—তাহাকে অসঙ্কোচে শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে জীবন দেবতা রূপেই অধিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, পরিপূর্ণ নির্ভরতার সহিত তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বাহিরে তো তাহার কোন প্রমাণ নাই। সমাজের চক্ষে মানুষের কূট নীতির তর্কে সেই একান্ত আপনার জনকে তো আপন বলিয়া স্বীকার করিবার তার কোন অধিকারই নাই। তার সুখের সময় অবসর কালে সঙ্গিনী হইবার সুযোগ মিলিলেও দুঃখ কষ্টের দিনে বিপদের সময়ে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখ বিপদের অংশ গ্রহণ করিবার ন্যায্য দাবী পিয়ারী কিছুতেই করিতে পারে না, তাই হতভাগিনী—ম্লানমুখে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া এখন ভাবিতেছে, এমন লোকের সহিত এ জীবনে দেখা না হইলেই বুঝি ভাল ছিল। পিয়ারী যে কবে মাতৃহীন হইয়াছিল, সে কথা তাহার মোটেই স্মরণ নাই পিতার একান্ত প্রাণ ঢালা স্নেহ মমতায় সে কোনদিনই মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। পিতা মহাদেও সুদূর ছাপরা জেলা হইতে পেটের দায়ে, স্ত্রী কন্যা লইয়া বাঙ্গলা দেশের এই পল্লীগ্রামের চটকলে রোজগার করিতে আসিয়াছিল, ক্রমে এইখানেই মাটীর ঘর করিয়া বেশ স্থায়ী ভাবেই বসিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেড় বছরের পিয়ারীকে কোলে পিঠে করিয়াই সে চটকলে কাজ করিতে

যাইত, ঘরে নিজের হাতে ভাত রাঁধিয়া বাসন মাজিয়া, পিয়ারীকে যথাসময়ে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিত। এজন্য তাহার কোন অসুবিধা হইত না।

এমনি করিয়া মেয়েটাকে মানুষ করিতে করিতে সে দশ বছরে পদার্পণ করিল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অনেকেই মহাদেওকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য বিস্তর পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের জাতের সে দেশে ছিল না। সুতরাং আবার খরচপত্র করিয় ছাপরা গিয়া 'কণিয়া'র খোঁজ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তাহার নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু এখন পিয়ারীকে দশ বছরেরটি হইতে দেখিয়া, এখন একবার দেশে গিয়া তাহার জন্য একটি 'দুলাহা'র খোঁজ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিল। সুতরাং অবিলম্বে দুই মাসের ছুটি লইয়া পিয়ারীর সাদী দিবার জন্য সে দেশে গেল, পিযারী কিন্তু ছোট বেলা হইতে বাঙ্গালা দেশে লালিত পালিত হইয়াছে, বাঙ্গালা বুলিই তাহার ভাষা, বাঙ্গালা চালচলনেই সে অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই নিজেদের দেশ তাহার নিকট বিদেশের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার উপর তাহার বাঙ্গালী বিবির মতন চালচলন দেখিয়া যখন বর্ষীয়সী আত্মীয়গণ অবাক হইয়া নাকে মুখে হাত দিয়া বলিতে লাগিল—"আগে মাইয়া ঈতো পুরা বাঙালীন বন্ গইল, কৈসে দুলহাকা ঘরমে বৈঠী।" তাহা শুনিয়া শুনিয়া পিয়ারীর পিত্তশুদ্ধ যেন জ্বলিয়া উঠিল, আত্মীয় স্বজনের আদর মমতা উপেক্ষা করিয়া তাহার মন সেই বাঙ্গলা দেশের গঙ্গার ধারে খোড়ো বাড়ীটির উদ্দেশে ছুটিতে চাহিত, কিন্তু তাহার ইচ্ছামত তো কার্য্য হইবে না। তাহার বাড়ী ফিরিবার একান্ত তাগাদায় মহাদেও তাহাকে বারবার বুঝাইতে লাগিল এই তাহার আসল দেশ, এইখানে বিয়া সাদী করিয়া তাহাকে জন্ম কাটাইতে হইবে। অতঃপর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া পনের বছর বয়সের দেওকী লালের সঙ্গে স্নেহের পিয়ারীর সাদী দিয়া মহাদেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবে মেয়েটা জন্মের মত পর হইয়া গেল, এই ভাবিয়া বেচারীর বুকের ভিতর আকু পাকু করিলে এই মনে করিয়া সে আবার সান্ত্বনা পাইল, এখন তো পাঁচ বছর মেয়ে তাহারই কাছে থাকিবে, তার পর 'গওনা' হইলে তবে তো সে শ্বশুর বাড়ী আসিবে। মহাদেওর বুড়ী চাচি ও আয়ী কিন্তু তাহাকে সুপরামর্শ দিল যে মেয়েকে আর সে বাঙ্গালা দেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এখন সে কিছুদিন দেশে তাহাদের নিকট থাকিয়া নিজেদের আচার ব্যবহার আদব কায়দা শিখুক। নহিলে পুরা বাঙালীন বনিয়া গিয়া এর পরে কেমন করিয়া সে আপন আদমীর ঘর করিতে পারিবে? এখানে সে ঘরের বিটিয়া, আদর যত্নেই থাকিবে, মহাদেও তাহার খরচা হিসাবে পাঁচ সাতটাকা মাসে মাসে পাঠাইলেই হইবে।

এই পরামর্শ মহাদেওর কাছে মন্দ না ঠেকিলেও পিয়ারী কিছুতেই বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী হইল না। অগত্যা মহাদেও মেয়েকে লইয়া আবার নিজের কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। পিয়ারী ও পরমাত্মীয়গণের আদর যত্ন ও সৎপরামর্শের হাত এড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মহাদেও এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া ছিল, কন্যার বিবাহে সে সব পুঁজি

পাটাই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন গওনার সময় আবার ঐ প্রকার ভারী খরচ পত্র আছে, সেজন্য বেশ হিসাবী হইয়া আবার কিছু কিছু করিয়া জমাইয়া রাখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সাধের পিয়ারীর গওনা আর হইল না। বিবাহের তিন বৎসর পরে সে দেশ হইতে খবর পাইল, যে দেওকীলাল হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছে।

পিয়ারীর বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর, সে কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারিল না—সুতরাং অনর্থক কাঁদিয়া কাটিয়া মন খারাপ করিল না, যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত তেমনি বেড়াইতে লাগিল। মহাদেও কিন্তু বড় ভাবনায় পড়িল। এই বিদেশ বিভুঁয়ে যুবতী কন্যা লইয়া সে কেমন করিয়া একা থাকিবে। এতদিন না হয় পিয়ারী ছোটটি ছিল, তাই থাকিতে পারিয়াছিল তারপর সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, মেয়ের গওনা হইয়া গেলে হয় মেয়েকে দেশে পাঠাইয়া দিবে, না হয় তো দেওকীলালকে নিজের কাছে আনিয়া চটের কলে কাযে লাগাইয়া দিবে। রামজী কিন্তু সে সাধে বাদ সাধিয়া বসিলেন। এখন মানুষের শরীর গতিকের কথা তো বলা যায় না, যদি তার হঠাৎ কিছু একটা ভালমন্দ ঘটিয়া যায়, পিয়ারী তখন কার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইবে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেও স্থির করিল, বছর ঘুরিয়া গেলে আর একবার সে দেশে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আর একটি দুলাহার সহিত, 'সগাহী' লাগাইয়া একে বারে ঘর বসাইয়া দিয়া আসিবে না হয়, মেয়ে জামাইকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া জামাইকে এখানকার চটকলে কাযে লাগাইয়া দিবে।

কিন্তু মহাদেওর সে সাধও রামজী পূর্ণ করিলেন না। বৎসরান্তে যখন সে দেশে যাই যাই করিয়া সব গোছ গাছ করিতে ছিল। সেই সময় হঠাৎ তাহার পরপার হইতে ডাক আসিল, সুতরাং কায অসমাপ্ত রাখিয়াই তাহাকে চলিযা যাইতে হইল। অভাগী পিয়ারী একেবারে আকুল পাথারে ভাসিল।

কিছুদিন পরে শোকের উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে সে ভাবিয়া দেখিল, এখন যা হইবার তা তো হইয়াই গেল, তাহাকে যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তখন গ্রাসাচ্ছাদনের তো একটা উপায় করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু সে প্রাণ ধরিয়া কাহারও দুয়ারে খাটিয়া খাইতে পারিবে না। পাড়ার রিমি মা, রামুর মাসী তাহার ভালর জন্য উপযাচিকা হইয়া কাণে কাণে কি সব যুক্তি দিল কিন্তু হতভাগী পিয়ারী সে সব পরামর্শ শুনিল না সুতরাং খোট্টা ছুঁড়ীর দেমাক দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখছ, ছুঁড়ীর তেজ, ভাঙে তো মচকায় না, আচ্ছা দেখা যাক এ গুমোর কদ্দিন থাকে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ভাল পরামোর্শ যখন কানে নিলে না তখন কপালের ভোগ আছেই"—ইত্যাদি।

পিয়ারী সে সকল কথা কানে না তুলিয়া, পাড়ার যে সকল ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীতে তার যাতায়াত ছিল, বড়ি পাড়িয়া পাড়িয়া সেই সব বাড়ীতে বিক্রয় ও জাঁতায় আটা পিষিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের যোগান দিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইল।

বাদলার দিনে খোলা বারান্দায় বসিয়া সকাল বেলা জাঁতার গম পিষিতে পিষিতে পিয়ারী ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে গান ধরিয়া ছিল—

"বাদর ঘেরি আই বাহ না সুঝাই
কেইসে যাওব সখি কানাইয়া লাগে,
এ-এ-শ্যামলিয়া।"

সম্মুখে জাহ্নবী— বক্ষে দ্রুত পবন সঞ্চালনে, ঢেউ গুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া তীরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতে ছিল, সহসা মুষল ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। একখানি — নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিবা মাত্র একজন আরোহী ছাতা মুড়িয়া দিয়া ব্যস্ত ভাবে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল।

সকালে সাতটার ভোঁ এই মাত্র বাজিয়া গিয়াছে। সে লোকটিকে চট কলে গিয়া হাজিরা দিতে হইবে। পিয়ারী আজ একমাস হইতে তাহাকে নিজের দুয়ার দিয়া দুই বেলা চট কলের দিকে যাইতে ও ফিরিতে দেখে। লোকটি ও কি জানি কেন পথ চলিতে চলিতে যখন পিয়ারীর দুয়ারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার দ্রুত গতি কিছু মন্থর হইয়া পড়ে—সম্ভবত পিয়ারী বারান্দায় বসিয়া জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যে গান করে সে গান তাহার মনকে আকৃষ্ট করে, কারণ পিয়ারীর গলা বেশ মিষ্ট। পিয়ারী কিন্তু এ গ্রামের কাহাকে দেখিয়া কুণ্ঠা বোধ করে না, করিলেও এই লোকটির সহিত চারি চোখের চাওয়া চাওয়ি হইলেই কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ে, তাহার সুর ভুল হইয়া যায়।

আজ যখন পথিক ছাতা মুড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসব হইয়া আসিতে লাগিল, তখন হাওয়ার বেগে ও বৃষ্টির ঝাপটে লোকটির বিব্রত অবস্থা দেখিয়া পিয়ারীর সাধের গান থামিয়া গেল। আহা বেচারী তো মহা বিপদেই পড়িয়াছে। চট কল এখন ও অনেক দূরে, এই ঝড় বৃষ্টিতে এতখানি পথ সে কেমন করিয়া যাইতে পারিবে। লোকটি কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বোধ নয়। সে দ্রুত গতিতে পিয়ারীর বোয়াকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া এক লাফে রোয়াকের উপর আশ্রয় লইল। খুঁটির উপরে ভিজা ছাতাটি টাঙ্গাইয়া দিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখে হাত মুছিতে লাগিল। পিয়ারী জাঁতা ঘুরান বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া কহিল, "আটা পেষা বন্ধ করলে কেন? তবে আমি চলে যাব কি।" এ ঝড় বৃষ্টির সময়ে শিয়াল কুকুরকে লোকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। তা একটা মানুষকে পিয়ারী কোন মুখে চলিয়া যাইতে বলিবে? তার কি চক্ষুলজ্জা নাই? সে কহিল—"এখন, বড্ড জলের ছাট আসছে একটু পরে ভাঙবো" এই বলিয়া সে ঘর হইতে একখানি ছোট চৌকি আনিয়া পথিককে এক কোণে বসিতে দিল।

এক একজন মনুষের সহিত যে কি এক দিনক্ষণে আলাপ হইয়া যায়। যাহাতে তাহার সহিত হৃদয়ে এমন যোগ ঘটে যে অল্প দিনের মধ্যেই সেই অপরিচিত পথের পথিকও পরমাত্মীয়ের স্থান জুড়িয়া বসে। পিয়ারী ও পথিকের জীবনে বুঝি আজ এই ঝড় বৃষ্টির সূত্র ধরিয়া সেই অপূর্ব্ব ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল, যেহেতু এই দিনকার আলাপের সূত্র ধরিয়া ঐ দুটী নরনারীর ভাগ্য যে কেমন করিয়া দিনের পর দিন এক সঙ্গে জড়াইয়া

গেল, তাহা নিজেই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শুধু যখন তাহাদের হুঁস হইল তখন উভয়েই এইটুকু মাত্র বুঝিল যে. এখন উভয়েই উভয়কেই ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না।

পিয়ারী ভোর হইতে কেদারের আশাপথ চাহিয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে জানালায় বসিয়া আছে। ও-পারের বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা পীড়িত, সেজন্য কেদার আজ কয়দিন হইতে রাত্রে আর পিয়ারীর ঘরে থাকিতে পারে না। সকালে আসিয়া পিয়ারীকে একবার দেখা দিয়া দু একটা কথা বলিয়া চটকলে চলিয়া যায়। সেখানে মোটে দুঘণ্টা কায করিয়াই রুগ্ন পিতার সেবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যায়। পিয়ারী কিন্তু সমস্ত রাত্রি আনচান করিতে থাকে, ঘুম তাহার চোখে মোটেই আসিতে চাহে না। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে জানালার ধারে বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া কেদারের-আগমন প্রতীক্ষা করে যদিও সে জানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কখনই নৌকা আসিয়া কূলে ভিড়িবে না। কেদার আসিয়া এক নিঃশ্বাসে যখন তাহার পীড়িত পিতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া ব্যস্ত ভাবে কাযে চলিয়া যায়, পিয়ারীর বুক ফাটিয়া যেন একটা বিরাট হাহাকার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। দুনিয়ার অপমান মাথায় লইয়া সকলের ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া, সে যাহাকে জীবন দেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পিতার এই কঠিন পীড়ার সময়ে এতটুকু সাহায্য করিবার অধিকার তাহার নাই। কেদারের চোখ মুখ দেখিয়া স্পষ্টই সে বুঝিতে পারে রোগীর পিছনে তাহাকে কি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কেদারের মা নাই, বাড়ীতে অন্য কোন এমন লোক নাই যে এক ঘটী জল ঢালিয়া বা রোগীকে এতটুকু সাগু বার্লি তৈয়ার করিয়া দিয়া উপকার করে, পিয়ারীর অধিকার থাকিলে সে যে বুক দিয়া আজ রোগীর সকল সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিত। বড় ক্ষোভে বড় দুঃখে পিয়ারীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিয়া সে কত কি ভাবিত। গত রাত্রে সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কি একটা স্থির করিয়া. কেদারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। কেদার নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পিয়ারীর গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। কয়দিন হইতে দুশ্চিন্তা অনিদ্রা ও নিয়মিত আহার না করিয়া পিয়ারীর শরীর যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়াছিল। কেদারকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাহার গা মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দরজা খুলিতে গেল। কেদার বাড়ী ঢুকিয়াই পিয়ারীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়াই যেন চমকিয়া উঠিল। কহিল, "একি পিয়ারী— তোমার মুখ এত শুকনো কেন? রাত্রে ঘুমোওনি বুঝি?" হায় হায়. পিয়ারী আজ কয় রাত্রিই যে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, সে খবর কি কেদার রাখিয়াছে? এখন কেদারের এই সস্নেহ প্রশ্নে পিয়ারীর চোখে জল আসিল। মুখ ফিরাইয়া সে কহিল "তুমি বড় নিষ্ঠুর," কেদার সাদরে পিয়ারীর হাত ধরিয়া কহিল, "পিয়ারী, তুমি আমার উপর রাগ করছ? কিন্তু পিয়ারী, বাবার যে বড় অসুখ, এ যাত্রা বাঁচেন কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে আমি ছাড়া তাঁকে দেখবার আর কেউ নেই,

এ অবস্থায় তাঁকে ফেলে তো আমি তোমার কাছে আসতে পারিনে, তুমি তো সবই বুঝতে পারছ পিয়ারী।"

কেদারের কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া পিয়ারী কহিল, "তোমায় কি আমি ঐ রোগী ফেলে আসতে বলতে পারি? আমার কি এমনই "পাথরের কলিজা? তবে বলছিলাম কি, একলাটি পুরুষ মানুষ রোগীর সেবা কর, তোমার ও ত কত কষ্ট হয়, তাঁর তেমন সুবিধে হয় না, তার চাইতে দিন কতকের জন্যে যদি আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে।"

পিয়ারী আর বেশী বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা জড়িত হইয়া গেল। কেদার ও পিয়ারীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান সে, গ্রামে তাহাদের বংশমর্য্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তিও বড় কম নহে। তাহার পিয়ারী সংক্রান্ত ঘটনা গ্রামের মধ্যে অল্প বিস্তর জানাজানি হইলেও পুরুষ ব্যাটাছেলের এ রকম বয়স দোষের কথা বড় কেউ গ্রাহ্য করে নাই। তা বলিয়া ইহাকে একবারে ঘরে লইয়া গিয়া সকলের কাছে নিজেদের মাথা হেঁট করিতে পারে কি? অসম্ভব লোকে তাহা হইলে এখন তাহার গায়ে ধুলা দিবে। বাবা যদিও সব কথাই জানেন তাহা হইলে এতোটা বাড়াবাড়ি সহ্য করিবেন কেন?

কেদার আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা কি কোরে হয়?" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, পিয়ারী যদি যায় তাহা হইলে সত্যই সব দিকে সুবিধা হয়।

সে একা রুগ্ন পিতার সেবা তো পারিয়াই উঠিতেছে না, তাহার উপর রাত্রি জাগিয়া তাহার নিজের শরীর বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পিয়ারী কেদারের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "ঝিও তোমাদের একটা দরকার হয়ত। তা না হয় আমি ঝিয়ের মতন খেটে খুটে তোমাদের বাপ বেটার সেবা শুশ্রূষা কোরে দিলামই।"

কেদার কহিল "আচ্ছা পিয়ারী, বাবাকে আমি জিজ্ঞাস করবো। তাঁকে না বোলে তো তোমায় নিয়ে যেতে পারি না, তিনি যদি রাজি হন তা হোলে আজই আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

সেদিন কেদার আর কাজেও গেল না, কারণ পিতার অসুখ বড় বাড়িয়াছিল। পাছে পিয়ারী ভাবে, সেই জন্য তাহাকে একবার খবরটা দিতে আসিয়াছিল মাত্র।

কেদারের পিতা গৃহিণীহীন হইয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায় নিজে খাটিয়া খুটিয়া বাড়ীর সমস্ত দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। দুটি গাই ছিল, উহাদিগের নিয়মিত দেখাশোনা করিতেন। একমাত্র পুত্র কেদার অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়াও পুনরায় আর বিবাহ করিতে রাজী না হওয়ায় বৃদ্ধের বড় দুঃখ ছিল। এ বয়সে নাতি নাতিনীর মুখ দেখিবার বড় আশা ছিল। ছেলে সে সাধ পূর্ণ হইতে দিল না। উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে বচসাই বা আর কত করিবেন। পরের হাতের রান্না খাইতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় বৃদ্ধ নিজের হাতে রান্না করিয়া পিতাপুত্রে উভয়ে আহার করিতেন। বহুদিনের পুরাতন দাসী মাধী ঘরের অন্য সব কায কর্ম সারিয়া রান্নার সব যোগাড় করিয়া দিত। বৃদ্ধের অসুখের দিন কয়েক পরে মাধীও

পীড়িত হইয়া পড়ায় কেদারের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। বাড়ী ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝিও আর পাওয়া যায় নাই। পাড়ার একটা গোয়ালাদের ছোঁড়াকে ধরিয়া আনিয়া নগদ পয়সা দিয়া কোন রকমে বাসন মাজা ও ঝাঁটপাটের কাজগুলা করাইয়া লইতেছিল। কাল হইতে পিয়ারী আসিয়া এক বেলাতেই ঘর বাড়ীর আবর্জনা দূর করিয়া, রোগীর ঘর ধুইয়া মুছিয়া, ধূনা জ্বালাইয়া, সমস্ত দুর্গন্ধ দূর করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে ছড়ান ময়লা ন্যাকড়া ও কাপড়গুলা সাবানে কাচিয়া ধবধবে করিয়াছে। বাসনগুলা ও ঘড়া ঘটি মাজিয়া ঝকঝকে করিয়া পীড়ির উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। যথাসময়ে বৃদ্ধের জন্য সাগু ও দুধ প্রস্তুত করিয়া, কেদারের দুটী ভাত তরকারী রাঁধিবার সব গুছাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পিয়ারীকে গৃহে আনিবার মত দিয়াছিলেন; না হইলে ছেলেটাও খাটিয়া সারা হয়, অথচ তাহারও রোগশয্যায় অসুবিধার অন্ত নাই। মাধী এ সময় রোগে পড়ায় সংসার একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে, —ঝি হিসাবে পিয়ারী না হয় আসিলই বা। এখন কিন্তু পিয়ারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা ও কর্মপটুতায় যথেষ্ট প্রীত হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া ফেলিলেন. "তাই বুঝি আর জন্মে আমার কেউ ছিলি গো। নইলে এই সময়ে এমন সেবা করতে এলি কেন? রোগীর এই বাক্যই পিয়ারীর পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। সে অম্লান মুখে বৃদ্ধের মলমূত্র পর্য্যন্ত নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি খাটিয়া খুটিয়া, রাত্রে কেদারকে ঘুমাইতে বলিয়া, রোগীর মাথার কাছে পাখা হাতে ঠায় জাগিয়া রহিল। ভোরের দিকে কেদারের ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "বড় ঘুমিয়ে ছিলাম পিয়ারী, করাতই জেগেছি কিনা, শরীর যেন অবসন্ন হয়ে ছিল। তুমি একলাটি সমস্ত রাত জেগে আছ। এখন তবে একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি বাবার কাছে বসি।"

পিয়ারী বিনা বাক্যেব্যয়ে, ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িল, সেও আজ কয়দিন ধরিয়া অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছে। উষার আলো ঘরের মধ্যে উকি দিতেই পুনরায় ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

এইরূপে কয়দিনই কাটিল বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল, পাড়ার রামগতি চাটুর্য্যে চিন্তামণি ঘটক, হরিশরণ বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি মাতব্বর লোকেরা নিত্য নিয়মিত বৃদ্ধকে চোখের দেখা দেখিতে আসিতে কখনই অবহেলা করিতেন না। হিন্দুস্তানী ছুড়িটার দিকে চাহিয়া তাঁহাদের পবিত্র ব্রাহ্মণ শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও মেয়েটার কাযকর্ম যে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চটপটে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না! কিন্তু কেদারের ভবিষ্যতের অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াই কেদারের অনুপস্থিতিতে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে যখন সকলে তীব্র আলোচনা করিতেছিলেন। তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, কিন্তু দাদা কোন চুলোয় কেউ না থাকলেও এই মেয়েটার জন্যেই শেষ সময়ে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হবে না। যে সেবাটা করছে নিজের মেয়ে আর গর্ভধারিণী

মা না হোলে এমন বুঝি কেউ করতে পারে না।' সে কথা অস্বীকার করিয়া কিছু বলিবার মত তখন আর কেহ দেখিতে না পাইলেও বৃদ্ধের যা হয় একটা কিছু ভালমন্দ হইয়া গেলে পর সমাজের পবিত্রতা ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেদারকে যে শাসন ও সংযত করিতে হইবে, এ যুক্তি সকলেরই মস্তিষ্কে স্থান পাইল।

অনেক সেবা যত্ন ও চিকিৎসা পত্র করিয়াও বৃদ্ধকে এ যাত্রা আর বাঁচান গেল না, আজ বেলা দশটার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেদারকে কিছুক্ষণ একান্তে কাঁদিবার অবসর দিয়া পাড়ার মাতব্বরগণ একটু নিরিবিলিতে একজোটে কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর, কেদারের নিকট আসিয়া তাহাকে সংসারের অনিত্যতা এবং সংসারে যে বাপ মা কাহারও চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না সুতরাং বুদ্ধিমানেব শোক করা অনুচিত ইত্যাদি পরামর্শ দ্বারা তাহার সদ্য পিতৃশোকের যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—" দেখ বাপ্ একটা কথা এ সময় বোলে রাখছি। হরিহর লোকটা বড় সাধু ছিল। তার ছেলে হয়ে তুমি কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছ, তা হরিহরের মৃতদেহটার সদগতি না করলে আমাদের অধর্ম্ম হবে। সে জন্যে তার সৎকারটা আমরা করতে যাব। কিন্তু তুমি যে অন্যায় করেছ তার একটা প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত আমরা তোমার পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধ শান্তি উপলক্ষে তোমার বাড়ীতে জলস্পর্শ করতে পারব না—এ কথা বাবাজী, তোমায় আমরা আগে থাকতেই বলে রাখছি। তুমি বুঝে শুনে চোলো।"

কেদারের তখন বোঝাশোনার মত্ অবস্থা ছিল না। যাহা হউক, ভদ্র সন্তানগণ যথারীতি শবদেহ শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সৎকার শেষে কেদারকে কহিলেন "গোটা পাঁচেক টাকা দাও। মৃতদেহ দাহ কোরে মিষ্টি মুখ করতে হয়, তা তোমার বাড়ী অগ্নি স্পর্শ করে ঘটক মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে জলযোগটা সেরে নেওয়া যাবে এখন।

কেদার বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পাঁচটি টাকা দিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। তাহার আপনার বলিতে জগৎসংসারে আজ আর কেহ রহিল না। শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া সে আজ বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিয়ারী ম্লান মুখে সজল নয়নে এক পাশে বসিয়া রহিল।

দিন কিছু মানুষের সুখ দুঃখের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। দিন কাটিতে লাগিল. সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে অথচ পিতার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য কেদার কোন উচ্চ বাচ্য করিল না দেখিয়া পাড়ার হিতৈষী বৃদ্ধগণের শিখা ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল— কোন জাতের একটা মেয়েকে বাড়ীতে রাখিয়া ছোঁড়াটার বুদ্ধি লোপ হইতে বসিয়াছে আর কি। সেই চিন্তায় তাঁহারা কেদারকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন "বলি বাবাজী, পিতার সদগতির জন্য পিণ্ডদান হিন্দুসন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং শ্রাদ্ধ শান্তি না করলে তোমার ও অশৌচান্ত হবে না, তা তুমি কি স্থির করেছ?

কেদারের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া হুঁকার টান দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু কেদার চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

ঘটক মহাশয়ের ধৈর্য্যচুতি হইল। তিনি কহিলেন "ভাবছ কি কেদার। এখনো কি

ভাববার আর সময় আছে? একটা কিছু এতদিনে ভেবে ঠিক করনি? আশ্চর্য্য কলি কাল।

কেদার কহিল, "দেখুন আপনারা তো বলেছেন আমার বাড়ীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে জলস্পর্শ করবেন না, সেই জন্যে আমিও চুপচাপ আছি। ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনই একটা বিরাট ব্যাপার, তাই যখন হবে না, তখন আর উদ্যোগ কিসের করব? গঙ্গাগর্ভে বসে পিণ্ডদান করে অশৌচান্ত হব এই ঠিক করেছি।

ক্রোধে ক্ষোভে ব্রাহ্মণগণের মাথার রক্ত অত্যুষ্ণ হইয়া উঠিল। চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন, "বলি কেদার এই কি সন্তানের উপযুক্ত কায হবে? শাস্ত্রে আছে পিতাধর্ম, পিতাস্বর্গ—তাই পিতার আত্মা যাতে শান্তি পায় তাব চেষ্টা না করে, উদাস ভাবে বলছ নমোনম কোরে গঙ্গাগর্ভে পিণ্ডদান কববো? ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে তাঁর প্রেতাত্মা কি তৃপ্তি লাভ করতে পারবে? কখখনো নয়।"

কেদাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তা হলে কি করব, আপনারাই বলে দিন।"

এইবার সকলেই খুসী হইয়া উঠিলেন। কেদারের এতক্ষণে সুবুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া অনেকেই উহাকে একসঙ্গে সদযুক্তি দিতে গেলেন। সকলকে থামাইয়া ঘটক মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইযা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, " দেখ কেদার, বয়স দোষে তুমি যা করছ, অমন অনেকেই করে থাকে। এমন কি এর চাইতে কেলেঙ্কারী কত জনে কত ঘরে করেছে— সে সব এই ষাট সত্তর বছর বয়সে অনেক দেখেছি। তা সময়ে সবাই আবার সামলে যায়, তোমরা ভাল ঘবের ছেলে এক সময়ে তোমার ঠাকুর্দ্দা এই গ্রামে কত ক্রিয়াকর্ম্ম করেছেন, আমার সবই হাটহদ্দ জানা আছে। তাঁদের বংশধর হয়ে তুমি যে চিরটাকাল এমন বোম্বেটে হয়ে বেড়াবে, সে তো আমরা বেঁচে থাকতে দেখতে পারি না। বংশের মধ্যে তুমি একটি সন্তান। সুতরাং আবার বিয়ে থা কোরে সংসারী না হলে বংশ লোপ হবে, সেও একটা মহাপাপ। পিতৃঋন হতে মুক্ত হওয়া সকল হিন্দু সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। তা দেখ কেদার ঐ নষ্ট ছুঁড়ীটাকে বিদেয় করে দিয়ে, একটা সামান্য রকম প্রাযশ্চিত্ত করে ফেল। ব্যস সব ল্যাটা চুকে যাক, আর তখন কারও কিছু বলবার থাকবে না। তখন তুমি স্বচ্ছন্দে পাঁচশো ব্রাহ্মণের আহারের যোগাড় কর না কেন, কোন ভাবনা নাই।

কেদার কোন কথার উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন, "বাবাজী ঘটক মশাই যা বল্লেন তা অতি উত্তম প্রস্তাব। এর উপব আর কথা চলে না। প্রায়শ্চিত্ত যদি না কর তাতে ও কোন ক্ষতি নেই, যেহেতু শাস্ত্রে আছে পুরুষ পরশ পাথর। তবে কিনা ঐ উপসর্গটা যে তোমার ঘাড়ে চেপে থাকবে সে কিছুতেই হবে না। ওটাকে বিদেয় করে দাও। কোন চিন্তা নেই বাবাজী, আমরা তোমার জন্য চাঁদ পানা বউ খুঁজে আনবো। ও পথের আপদ ঘর থেকে তাড়ানই মঙ্গল।

কেদারকে নিরুত্তর দেখিয়া " মৌনং সম্মতি লক্ষণং," বুঝিয়া খুসী হইয়া ঘটক মহাশয় কহিলেন, "তা কেদার এখন ঘরে যাও একটু ভেবে চিন্তে দেখগে ছুঁড়ীকে না হয়

পাঁচ টাকা নগদ ধরে দিও। ওদের ভাবনা কি, আর একজনার ঘাড়ে স্বচ্ছন্দে গিয়ে চেপে বসবে। যা হোক তোমার স্কন্ধ থেকে নামলে যে বাঁচা যায়।

কেদারের দুই পায়ের উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুজলে ভসিতে ভাসিতে পিয়ারী কহিতেছিল, " তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একেবারে তাড়িও না। তুমি বিয়ে করে বৌ আনো আমি তার দাসী হয়ে থাকব কিন্তু আমায় পথে বের কোরে দিও না।"

অভাগিনীর কণ্ঠস্বরে নিতান্ত অসহায় কাতরভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল। কেদার মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন তাহাকে তাহার হিতৈষিগণের সদযুক্তির কথাগুলো প্রকাশ করিয়া বলিল। তখন পিয়ারী দুনিয়া অন্ধকার দেখিল— কেননা সে বেশ জানে তাহাকে অসহায় দেখিয়াও তাহার স্বভাবের গাম্ভীর্য্যের জোরে যাহারা এতদিন তাহাকে কুপথে আনিবার প্রলোভন দেখাইতে সাহস করে নাই আজ তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়া তাহাকে নানা রূপে উৎপীড়িত করিবেই করিবে। তাহা ছাড়া সে পাঁচজন ভদ্রলোকের দুয়ারে যে ডাল, বড়ি, আটা বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত, তাহা ও আর সে পারিবে না। কারণ কেদারের সহিত পরিচয় হওয়া পর্য্যন্ত সে লোকালয়ে কুলটা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহার সে নিঃসঙ্গ জীবন যখন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন সে তাহার সঙ্গীহীন ভাব বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু আজ সে কল্পনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের অবলম্বন হীন লক্ষশূন্য যে নিঃসঙ্গ জীবনের ছবিখানি দেখিতে পাইল, উহা কি ভয়ানক। না, না এমন জীবন সে কখনই বহন করিতে পারিবে না, তাই সে আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় নিরাশ লইয়া কেদারের পা-দুখানি নয়ন জলে সিক্ত করিয়া, করুণ স্বরে মিনতি করিল।" আমায় তাড়িয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পথে বার করে দিও না।"

এখন ও তাহার নিতান্ত তরুণ বয়স, সংসারের ভ্রকুটি কুটিল কটাক্ষের তীব্র আঘাত সহিয়া কঠিন হইবার ক্ষমতা আজও তাহার হয় নাই। সুতরাং উহার কল্পনা মাত্রই তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর যে তাহার কোথাও কেহ নাই, কাহার কাছে সে আশ্রয় লইবে?

পিয়ারীর ভয়চকিত মুখখানি ও তাহার মর্মস্পর্শী করুণ মিনতি কেদারের কর্ত্তব্য পরায়ণ চিত্তকে বিকল করিয়া তুলিল।

কিন্তু মৃত পিতার প্রেতাত্মার সদগতি বিধান আবশ্যক, পিয়ারীকে বিদায় না করিলেই বা তাহার বাড়ীতে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ পাত পাড়িতে আসিবেন কেন? অথচ তাঁহারা এই ছুঁড়ীটার সম্বন্ধে যাহাই বলুন, সে ত পিয়ারীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানির প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও সরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। সে তার অনাঘ্রাত জীবন কুসুম যে শুধু তাহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া কলাঙ্কিনী নাম গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা তা তাহার অন্তর্য্যামী ভাল রকমই জানেন। সুতরাং তাহাকে আজ নিষ্ঠুরের মত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে তাহার মন সরিতেছে কৈ? পিতৃপুরুষ ইহাতে যদি অশান্তি ভোগ করেন তাহা হইলে অবশ্য সেই—দোষী, সেই দোষী।

কিন্তু আগে হইতে যে অপরাধের বোঝা সে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, আজ এই নিরাশ্রয়া নারীকে বিশ্বের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেই কি তাহার সে ভার নামিয়া যাইবে? সে যুক্তিতে মন সায় দিতেছে না তো। সে রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়া, প্রাতে কেদার পিয়ারিকে কহিল, "পিয়ারী দুদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে?"

পিয়ারী অবাক হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, " কেন পারবো না?"

"তা হলে আমাদের এই গুদাম ঘরে তোমার দুদিন বন্ধ থাকতে হবে। টু শব্দটি করতে পাবে না। দুদিন পরে আমি তোমার সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করবই। তবে, তোমাকে তাড়িয়ে দেব না এটা নিশ্চয়।"

পিয়ারী প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু কেদার যখন নিশ্চয় করিয়া বলিতেছে তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নিজের কথা রাখিবে সুতরাং পিয়ারী স্বচ্ছন্দে দুদিনের জন্য গুদাম ঘরে বন্দী থাকিতে রাজী হইল। কেদারের আশ্রয়ে থাঁকিবার জন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সে আনন্দের সহিত সহ্য করিতে পারে। সুতরাং দুইদিন বন্দী হইয়া থাকা ত কোন সামান্য কথা। কেদারের পিতা বেশ হিসাবী লোক ছিলেন সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত অর্থে কেদার প্রচুর উদ্যোগ আয়োজন করিয়া গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরিপাটীরূপে ভোজন করাইল। হরিসংগীতে বৃষোৎসর্গ, ষোড়শদান কিছুই বাকী রইল না। যিনি যাহা পরামর্শ দিলেন, সে নির্ব্বিচারে তাহাই গ্রহণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিল। কাঙালী বিদায় ও বেশ ঘটা করিয়া হইয়া গেল। পাড়ার সকলে প্রচুর পরিমাণে লুচি মন্ডা ক্ষীর দই খাইয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া, ভোজনান্তে চাদরের খুটে একটী বৃহৎ পোটলা বাঁধিয়া কেদারের পিতার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। চাটুয্যে ও ঘটক মহাশয় কয়দিন ধরিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া সমস্ত দেখাশুনা করিয়া সকল কাযকর্ম্ম বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাইয়া, সকলের নিকট অজস্র সাধুবাদ লাভ করিলেন।

কায শেষ হইয়া গেল। কেদারকে সকলেই শতমুখে বাপের সুপুত্র বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কাঙালী ভোজনের পরদিন ভোরের সময় ঘটক মহাশয় যখন চৌধুরীদের বাগানে নামাবলী গায়ে দিয়ে শত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পূজার ফুল সংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময় দুইটা মুটের মাথায় বাসন বিছানা বোঝাই করিয়া কেদারকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি কেদার কোথা যাচ্ছ, হঠাৎ একি?"

. কেদার তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিলেন "আজ্ঞে গ্রামে ত বাস করবার মুখ রাখিনি, কাযেই গ্রাম ছেড়ে চল্লাম।"

অদূরে পিয়ারীকে দেখিয়া ঘটক মহাশয় উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—ছুঁড়ীকে যে বিদেয় করে দিয়েছিলে তা কোত্থেকে আবার এসে জুটলো?"

কেদার কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে বিদেয় কত্তে পারিনি, অসহায় স্ত্রীলোক ওকে

কোথায় তাড়াই বলুন, তাতে আবার যে কান্নাকাটী করতে লাগলো, কাযেই গুদাম ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছিলুম।

ঘটক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি পাপিষ্ঠ নরাধম, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিশেষণে কেদারকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত দিবার উপক্রমেই কেদার সবিনয়ে কহিল, "আপনারা ব্রাহ্মণ, কলির সাক্ষাৎ দেবতা। আপনাদের বাক্য মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের অজস্র আর্শীবাদ আমার বাপের আত্মা এখন স্বর্গ লোকে উঠে গেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে আত্মাকে আর মিছে কষ্ট দিয়ে নামিয়ে আনবেন না। পিয়ারীকে নিয়ে এখন কলকাতার দিকে চল্লাম। বাড়ীতে দুটো গরু রইল, সবে বিইয়েছে, আপনি দুধ খাবেন। আর বাগানে অনেক জিনিষ ফলেছে। আপনার জিন্মাতেই রইল।"—বলিয়া কেদার ঠন করিয়া চাবিটা ঘটক মহাশয়ের পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিল। ঘটক মহাশয় উদ্যত রসনাকে সংযত করিয়া কহিলেন—"তা ওপারে গিয়ে এখন কি করবে?"

কেদার কহিল, "কি আর করব। দেখি যদি ওদের জাতে কেউ স্যাঙা কি কণ্ঠি বদল কিছু কোরে ন্যায়। বোষ্টমই হতে হবে দেখছি, ওকে ছাড়তে তো আর পারছি না।"

ঘটক মহাশয় পিয়ারীর উদ্দেশে কতকগুলো কটুক্তি করিয়া উহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে রৌরব নরকে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, "বামুনের ছেলে হয়ে বোষ্টম হবে, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও কেদার। যাচ্ছ এখন যাও। ও পেত্নী বেশীদিন ঘাড়ে চেপে থাকবে না। ঘাঁৎ বুঝে একদিন পালাবেই। ও সব ডাইনীদের ছল চাতুরী দেখতে দেখতে আমাদের হাড় পেকে গেল। তা খুব সাবধানে থেক, তোমায় ভালমানুষটি পেয়ে মায়াকান্না কেঁদে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে, ওরা যাদু জানে। এখন কাঁচা বয়স কাঁচা বুদ্ধি, তাতেই কিছু বুঝতে পারছনা. এরপর বুড়োর এই সব কথা কত মিষ্টি লাগবে।

মুটে ডাকিল, "বাবু শীগগীর এস গাড়ীর ঘণ্টা হোয়ে গেল যে।"

কেদার ঘটক মহাশয়কে আবার, নত হইয়া প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া মুটের সঙ্গ লইল। ঘটক মহাশয় মাটি হইতে চাবিটী কুড়াইয়া সাজিতে রাখিতে রাখিতে ঘোর কলির অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন— ছোঁড়া কি না অবশেষে এমন বহিয়া গেল যে বলে কি মেয়েটার সঙ্গে কণ্ঠী বদল করিবে। জাত মান কিছুরই আর মহাত্ম্য রহিল না। খ্রীষ্টানী হাওয়ায় দেশকাল উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩২৬

বারুণী

শ্রীগিরিবালা দেবী

পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বারুণীকে যেদিন তাহার ধনী কাকাদের আশ্রয় হইতে, ৫০ টাকা বেতনের প্রকাশ মজুমদার নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিল, সেদিন স্বপ্নেও তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কয়েক বৎসর পরে সেই মামাত বোনের বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে হইবে। তখন তাহার ও পত্নী শৈলবালার মনের মধ্যে একটা দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বারুণীর সকরুণ জীবন কাহিনী শুনিয়া, তাহার সুদীর্ঘ পল্লব-বিশিষ্ট কালো নয়নের বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া কোনও শিক্ষিত উদার হৃদয় যুবক আদরের সহিত বিনাপণে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাইবে। কিন্তু বারুণীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের কল্পিত-মায়ালোক এখনও সুদূরে। দিশাহারা প্রকাশ ভগিনীদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় পাড়ার বয়োবৃদ্ধ নীলুখুড়ো, হরিদা, চৌধুরী মশায় প্রভৃতি সকলের নিকটে একটা সদ্যুক্তি ও পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া তাঁহাদের রায় প্রকাশ করিলেন— একখানা গাড়ী ডেকে গয়ার পাপ গয়াতে রেখে এস, মেয়ের খুড়োরা আছে, চাই বিয়ে দিক্, নয় আইবুড়ো রাখুক— তোমার দায় কি বাপু?"

পাড়ার এতগুলি হিতৈষী বৃদ্ধের এ পরামর্শে গয়ার পাপ গয়ায় পাঠাইবার প্রকাশের কোন লক্ষণই দেখা গেল না,—বরং পাত্রানুসন্ধানে তাহার আরও চেষ্টা ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই চলিল। যেখানে—মণি-কাঞ্চন একত্র সমাবেশ হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই, সেখানে বরের পিতাদের (কোন কোন স্থানে স্বয়ং বরের) মেয়ে দেখিবার আগ্রহ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

প্রকাশের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কয়েকটি বরের পিতা, এবং দুই একটী বরও স্বয়ং, তাঁহাদের বলির পশু মনোনীত করিতে আসিলেন বটে; কিন্তু দীনু ময়রার রসগোল্লা ও ভীম নাগের সন্দেশের প্রশংসা ছাড়া প্রকাশ তাঁহাদের মুখে একটি ভরসার কথাও শুনিতে পাইল না। লোকটার বিস্ময়াবহ ধৈর্য্য, কিছুতেই সে নিরুদ্যম না হইয়া সকাল সন্ধ্যায় নাছোড়বান্দার মত ভদ্রলোকদের দরজায় দরজায় ধন্না দিতে লাগিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিরক্তির সহিত কোন কোন ভদ্রলোক অন্দর মহল হইতে চাকরের দ্বারায় বলিয়া পাঠাইলেন—"বাবু বাড়ী নেই, দেখা হবে না।" কেহ আবার বেশী অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন—"মেয়েটি আর একটু ফর্সা হলেই আমাদের আপত্তির কারণ থাক্‌ত না। ছেলে বন্ধুদের কাছে বলেছে, দুধে আলতা রং না হলে বিয়েই করবে না" ইত্যাদি। কোন বিবাহার্থী যুবক চশমার মধ্য হইতে প্রকাশের বেদনাতুর চিন্তান্বিত মুখের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"টাকার কথা কি বল্‌ছেন মশায়? মেয়ে-পছন্দ হ'লে কি আবার টাকায় আট্‌কে থাকে? আপনাদের মেয়েটি অপছন্দ নয়—তবে কি না —এই

কি বলে —মুখটা ঠিক ডিম্বাকৃতি নয়। "আর ঐ কি বলে, চোখ দুটো বেশ পটল চেরা নয়। নইলে —তা যাক্। চেষ্টা করুন, বর পাবেন বৈকি?"

ফল কথা, অর্থহীনার জন্য কে গঙ্গাসাগরে দুই পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে যে বিনা কপর্দ্দকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে? ভারী দায় পড়েছে না? যে কুমারীর পিতার কিংবা অভিভাবকদের মেয়ের তুল্য ওজনের টাকা দিবার ক্ষমতা নাই, তা'দের আবার মেয়ে বিয়ে দিবার সখ্ কেন বাপু? বর কি খোলাম-কুচি, যে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে?

২

পাত্রের দল বারুণীর অনাদৃত রূপের দিকে ফিরিয়া না চাহিলেও, যৌবন তাহাকে উপেক্ষা করিল না। জগতে একমাত্র আশ্রয়স্থল ভ্রাতা প্রকাশের ও ভ্রাতৃজায়া মমতাময়ী সখী শৈলবালার চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডলের কালো ছায়া, দেখিয়া বয়স বারুণীকে এতটুকুও করুণা করিল না। বর্ষাচন্দ্রিকা-স্নাত নদীর সলিলোচ্ছ্বাসের মত রূপ যৌবন কুসুমপেলব কিশোরীর সুকুমার অঙ্গে, রক্তিম কপোলে লাবণ্যবিভা বিচ্ছুরিত করিয়া আপনার জয় পতাকা উড়াইয়া দিল। এ অযাচিত রূপ যৌবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গের জন্য বারুণী নিজেকে যেন আরও বিপন্ন বলিয়া অনুভব করিল। যে দুঃখিনী, পিতৃমাতৃহীনা, তাহার শরীরে এ নবসৌন্দর্য্যের সমারোহ কেন? আর পোড়া বয়স—সেও কি অনাথাকে উপহাস করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষকে অতীতের কুক্ষিতে বিসর্জ্জিত করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিল। বারুণী এ জগতের সকৌতুক দৃষ্টি হইতে প্রাণপণে আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। প্রতিবেশিনীদের অনুসন্ধিৎসু নয়ন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতপ্ত নিভৃত ছাদে আলোচনার বৈঠকে, সরোবরে বিকশিত পদ্মের সুষমা স্মরণ করাইয়া দিত। চিলে কুঠারীর ছায়ায় দাঁড়াইয়া দত্তদের বিন্দু, অপর ছাদে দণ্ডায়মানা নীরদাকে ডাকিয়া কহিল—"শুনেছিস ভাই, মজুমদারদের তেপেয়ে মেয়েটা আজও বিকোয় নি।" নীরদা সখীর কথার সোৎসাহে উত্তর করিল, "আহা এখনই কি হয়েছে! সবে তিন কুড়ি পার! কালে কালে কতই হবে—পুলিপিঠেরও ন্যাজ গজাবে।" চাটুর্য্যেদের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই, সুতরাং বাতায়নে দাঁড়াইয়াই মেয়েদিগকে রসালাপে যোগ দিতে হয়। চাটুয্যে গৃহিণী বাতায়ন সম্মুখ হইতে মুখ বাড়াইয়া বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "বিয়ে দেবে কে? মামার খেতে বিয়েলো গাই, সেই সম্বন্ধে মামাত ভাই। চেষ্টা কল্লে আবার মেয়ে বিকোয় না, আসলে—।" কথাটা শেষ না করিয়া তিনি সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া একটু নিগূঢ়-রসপূর্ণ হাসি হাসিলেন।

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা শৈলবালার কাণে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। সে প্রকাশকে ধরিয়া বসিল—"যেমন করেই হোক্ ঠাকুরঝিকে বৈশাখ মাসের ভিতরেই বিয়ে দিতে হবে। আমার গায়ের গয়নাগুলি দিচ্চি। আর, ওর কাকাদের কাছে গিয়ে কিছু টাকার যোগাড় কর। ওর বাপেরও তো কিছু ছিল—ন্যায়তঃ ওই তার অধিকারিণী, সে কথাটা তুলতেও ভুলে যেও না।"

স্ত্রীর মন্ত্রণায় প্রকাশ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "সেখানে গিয়ে কোন ফল হবে না শৈল, তাঁরা তো আগেই বলে দিয়েছেন, "কুটুম্বিতা দেখিয়ে যেমন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমনি বিয়ে দেবার মজা বুঝুক্।' তবুও একবার যাব ভাবছি; দায় যখন আমার, তখন মান মর্য্যাদার দিকে অত চাইলে চলবে কেন? একটি পাত্রের খবর পেয়ে আজ সেখান থেকেও ঘুরে এলাম।"

শৈল আবেগ ভরা কণ্ঠে কহিল, "পাত্রের নাম কি? কোথায় থাকে? কি করে?"

স্ত্রীর চঞ্চলতা দেখিয়া প্রকাশ সহাস্য মুখে কহিতে লাগিল, "রক্ষা কর শৈল তুমি যতগুলি প্রশ্ন করেছ তার উত্তর আগে দিয়ে নিই, তারপর অন্য প্রশ্ন হবে। নাম হচ্চে মনোহর সান্নাল, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে মেসে থেকে সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। ঘরে খাবার সংস্থান আছে। নিজের অভিভাবক নিজেই, মেয়ে পছন্দ হলে টাকা নেবে না। কিন্তু—"

প্রকাশ থামিল, শৈল উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "কিন্তু বলেই থামলে যে? তবে বুঝি ছেলের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়?"

"না গো তা নয়, আমি তাদের মেসে সে খবরও নিয়েছি,—স্বভাব চরিত্রের কোন দোষ নেই, তবু তোমার পছন্দ হবে না।"

এবার শৈল রাগতস্বরে মুখখানি ঘুরাইয়া কহিল, "ছেলে ভাল, লেখা পড়া জানে, তবে আমার পছন্দ হবে না কেন, আমার পছন্দ কি এতই অদ্ভুত? আমি কি বলেছি যে কাবুলের আমীর-পুত্র না হলে তোমার বোনকে বিয়ে দিয়ো না?"

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া প্রকাশের হাস্যস্রোত বাধা মানিল না, সে হাস্য ধ্বনিতে গৃহখানি শব্দময় করিয়া কহিল, "রাগ কর কেন শৈল? তোমার পছন্দ যে খুব উঁচুদরের তাই জেনেই তো এ ছেলেটির কথা বলতে একটু ইতস্ততঃ করছি। ছেলেটির অন্য কোন দোষ নেই, তবে চেহারাটা মোটেই ভাল নয়, গায়ের রংটা বড় কালো, দাঁতগুলো উঁচু।"

শৈল ক্ষণকাল ম্লান মুখের চিন্তার পর বলিল, "চেহারা ভাল নয় তাতে আর দোষ কি? চেহারা তো ফরমাজে তৈরি হয় না, ওখানে ভগবানের হাত। লেখাপড়া জানে, স্বভাব চরিত্র ভাল, ব্যাটাছেলের এর বেশী আর গৌরবের জিনিস কি আছে? পুরুষ মানুষের আবার রূপ, মুক্তোর আবার বাঁকা সোজা!"

শৈলর মুখে পুরুষ মানুষের রূপের অপ্রয়োজনীয়তার কথা শুনিয়া প্রকাশ কিছু আশ্বস্ত হইল। অনাথা বোনটীকে যেখানে সেখানে ভাসাইয়া দিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না, যেখানে মেয়েটি সুখে শান্তিতে থাকিবে, তাহার শক্তির বহির্ভূত হইলেও সেইখানেই বারুণীকে বিবাহ দিবার চেষ্টা সে করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রাণসমা সোদর প্রতিমা ননদের সুখের জন্য শৈলর ব্যগ্রতা তাহার অপেক্ষাও অনেক বেশী। সহজে কাহাকেও তাহার পছন্দ হইত না, আজ রূপহীন ছেলেটির প্রতি শৈলর এ করুণার অজস্র ধারা বর্ষণ দেখিয়া প্রকাশ মনে মনে খুব আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। বিলম্বে বরের ও

শৈলের মতের পরিবর্তন ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া প্রকাশ অবিলম্বে মেয়ে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

৩

দ্বিপ্রহর বেলা। আহারাদির পর হইতেই শৈল বারুণীকে লইয়া সাজাইতে বসিয়াছে। আজ অপরাহ্নে বর মনোহর বাবু তাঁহর ভাবী প্রেয়সীকে মনোনীত করিতে আসিবেন, বি-এ পড়া রূপপিপাসু নব্য যুবকের প্রথম দৃষ্টিপাতেই বারুণী যাহাতে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে, এমনি করিয়াই শৈল আজ ননদকে সাজাইতেছিল, ফিরোজা রঙ্গের শাড়ী খানি পরাইয়া বারুণীর সাবান ঘষা রাশীকৃত কেশগুচ্ছ সুবিন্যস্ত করিয়া একটি লাল ফিতার ফাঁদে বাঁধিয়া শৈল খয়ের ঘষিতে বসিল। নিজের বাছা বাছা গহনা কখানিতে ননদের গা সাজাইয়া, খয়ের টিপ পরাইয়া, মুগ্ধ নয়নে বারুণীর সলজ্জ সুন্দর মুখখানি এদিক ওদিক ঘুরাইয়া শৈল রঙ্গভরে মৃদুকণ্ঠে বলিল,

"কণক পঙ্কজ বনে প্রবাল আসনে
বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা; পশিল সেস্থলে—

ভ্রাতৃবধূর দিক্ হইতে মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বারুণী কহিল, "আজ তোমার কি হয়েছে বউদিদি' এত মেঘনাদবধ আবৃত্তি কেন?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পরিপাটী কেশভুষায় বিভূষিত হইয়া আতর গোলাপের স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস আমোদিত করিয়া মনোহর বাবু প্রকাশের ভবনে শুভাগমন করিলেন। অন্তরাল হইতে বরের অষ্টাবক্র-সন্নিভ অবয়ব দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই শৈলর আনন্দ উৎসাহের সুশোভন সুদীপ্ত প্রদীপ একটি ফুৎকারেই যেন নিবিয়া গেল। এই বর? ইহারই সহিত আমার সোণার প্রতিমার সম্মিলন হইবে? এ যে বানরের গলায় মুক্তার মালা!—তাহার একবারও মনে উদয় হইল না, এও যদি উপেক্ষাভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? এ কালো কুৎসিত হইলেও বর তো বটে; শুধ বর নয়, আবার বি-এ পড়া! এ কি শৈলবালার অবজ্ঞার পাত্র? শৈল বিষণ্ণ চিত্তে বাল্যকালের পঠিত গ্রন্থপাঠের একটি কবিতা মনে মনে পাঠ করিয়া নিজের মনকে শাসিত করিতে লাগিল—"রূপেতে কি হয় বাপু গুণ যদি থাকে।" তাহার অবাধ্য উৎক্ষিপ্ত মন এ শাসন বাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রশান্ত হইল না।

মনোহর বাবু বারুণীর চলন-পদ্ধতি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি বহুক্ষণ নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গম্ভীর স্বরে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"মেয়ে সুন্দরী বটে, কিন্তু তেমন কিছু নয়। আর একটা দোষ দেখ্‌তে পাচ্চি, সজীবতা ও উজ্জ্বলতার বড় অভাব—কেমন যেন নির্জ্জীব ভাব।"

প্রকাশের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা মেয়ের শরীরে সজীব-ভাব-হীনতার উপলক্ষে কিছু টাকা চাহিবার অছিলা। শৈলর গহনাই যে তাহাদের সম্বল, তাহারা অধিক

পাইবে কোথায়? এক বারুণীর কাকাদের নিকটে সাহায্য ভিক্ষা ব্যাতীত অন্য কোন উপায়ের কথা প্রকাশ ও শৈলর স্মরণ হইল না। তাহাদের আশা ছিল, শৈলর গহনা কয়েক খানার বিনিময় বারুণীর উদ্ধার হইবে। আজ মনোহর বাবুর কথার ইঙ্গিতে তাহাদের মুখ দুইটি বিষাদের কালো ছায়ায় আবৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে, বড় গোপনে বড় বেদনায় দগ্ধ হইতে লাগিল,—সে হৃদয় বারুণীর।

৪

বারুণীর বিবাহ-সূত্রে তাহার কাকাদের নিকটে অর্থের সাহায্যপ্রার্থী হইতে গিয়া প্রকাশ অপমানিত ও মর্ম্মাহিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই ঘটনায় শৈলর হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শেল বিঁধিল। তাহার স্বামী দরিদ্র বটে, কিন্তু হতমান হইবার উপযুক্ত নহেন। করুণার বশে পরের মেয়েকে নিজের গৃহে স্থান দেওয়ার কি এই পুরস্কার? নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিকাইয়া একটি মানুষকে সুখী করিবার কি এই পুরস্কার? শৈলর যত রাগ যত বিদ্বেষ, সবই মনোহর বাবুর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতে লাগিল। নিজের যাহার ভূতের মতন চেহারা, সে আবার অন্যের অতুল্য রূপের খুঁত ধরিয়া টাকার দাবী করে কেন? সহস্র মুদ্রার আভরণ সহ অনিন্দ্য সুন্দরী এমন কুমারীকে গৃহে লইলে যে পাষণ্ড নানারূপ অছিলার উত্থাপন করিতে পারে, তাহার অপমান না হইয়া, হইল কি না আমার দেবচরিত্র স্বামীর অপমান! সুতীব্র বেদনার দুর্ব্বিষহ জ্বালায় সমস্ত রাত্রি শৈল এপাশ ওপাশ করিয়াও নিদ্রাদেবীর দর্শন পাইল না। প্রকাশ স্ত্রীকে চিনিত, তাই এত দুঃখে কষ্টেও না হাসিয়া থাকিতে পরিল না।

পরদিন বেলা সাড়ে ন'টার সময় আহারাদি করিয়া প্রকাশ যখন আফিসে চলিয়া গেল, তখন শৈলর সমস্ত কর্ত্তব্যই স্থির হইয়া গিয়াছে। সঙ্কল্পের একটা দৃঢ় ছায়া তাঁহার তরুণ মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে।

শৈল ধীর মন্থর গতিতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অষ্টম বর্ষীয় পুত্র বিকাশচন্দ্র ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্লেটের উপর বইগুলি গুছাইতেছে। শৈল স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বিকু, একটা কাজ পারবি?"

বিকাশ প্রফুল্ল মুখে মার দিকে চাহিয়া সোৎসাহে কহিল, "কাজ আবার পারব না মা? এখন তো আমি বড় হয়েচি। এই তো সেদিন বাবা তোমার চকলেট রঙের সেলাইয়ের জন্যে সুতোর কাঠিম পেলেন না, আমি এনে দিলাম।"

পুত্রের মুখে তাহার বয়সের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া মায়ের বদনে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। শৈল বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বিকু এখন খুব বড় হয়েচে, সব কাজ পারে। তুই মনোহর বাবুদের মেস চিনিস? একটা জিনিস দিলে মনোহর বাবুকে দিয়ে আসতে পারবি?"

"খুব পারব মা, সে মেস তো আমাদের ইস্কুলের সামনে, আর বাবার সঙ্গে আমি যে সেদিন মনোহর বাবুর ঘর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। আমি আবার পারব না!"

শৈল কহিল, "আজ শনিবার দুটোর সময় কিষণ যখন তোকে আনতে যাবে, তখন তার হাতে একটা জিনিস পাঠিয়ে দেব, তুই কিষণকে নিচে রেখে, উপরে গিয়ে মনোহর বাবুকে সেই জিনিসটা দিয়ে চলে আসবি, বুঝেছিস?"

বিকাশ সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

৫

ছুটির পর কিষণ ভৃত্য প্রদত্ত কাগজে জড়ান, লাল ফিতায় বাঁধা পুস্তকাকৃতি একটি দ্রব্য হাতে লইয়া কৌতূহলী বিকাশ কাগজের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রীটি দেখিবার অদম্য বাসনা হৃদয়ে লুকাইয়া মনোহর বাবুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে গিয়া দেখিল, আজ সেখানে মনোহর বাবুর পরিবর্ত্তে অন্য একটি কুড়ি একুশ বছরের সুন্দর সুশ্রী গৌববর্ণ যুবক চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়িতেছে। যুবকটি পূর্ব্ববঙ্গের কোন জমীদারের ছেলে, নাম অনিলচন্দ্র রায়, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। অপরিচিত সুন্দর বালকটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা? তুমি কোন বাড়ী থেকে এসেচ?"

বালক দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমার নাম শ্রী বিকাশচন্দ্র মজুমদার, বাবার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার। আমি মনোহর বাবুর কাছে এসেছি।"

বিকাশের কথায় অনিলের মনে পড়িল, প্রকাশ মজুমদারের বোনের সহিত মনোহর বাবুর বিবাহের কথা চলিতেছে; দুপুর বেলা এতটুকু ছেলে কোন্ উদ্দেশ্যে মনোহর বাবুর নিকটে আসিয়াছে, তথ্যটি জানিবার জন্য অনিল উৎসুক হইয়া উঠিল। বিকাশকে সাদরে নিজের কোলের কাছে বসাইয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করি, "তোমার পিসিমা মনোহর বাবুকে পছন্দ করেছেন খোকা?"

খোকা সম্বোধনে ছোট হইবার আশঙ্কায় বিকাশ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "আমায় খোকা বলচেন কেন? আমার নাম যে বিকাশ।"

"হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছিল। তোমার নাম খোকা নয়, বিকাশ। আচ্ছা, বিকাশ বাবু—

অনিলের কথায় বাধা দিয়া বিকাশ উত্তর করিল, "আপনি যে বারবার ভুল করছেন। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট, তবে বিকাশ বাবু বলচেন কেন?'

বালকের সরল কথায় প্রীত হইয়া অনিল কহিল, "এবার আর ভুল করব না। তুমি মনোহর বাবুর কাছে কেন এসেছ?"

বিকাশ হাতের প্যাকেটটী দেখাইয়া বলিল, "এইটে মনোহর বাবুকে দিতে এসেছি।" অনিল মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল, সেই অরক্ষণীয়া মেয়েটিরই এ কায। বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া দুপুর বেলা একটি ছোট ছেলের হাতে তাহার ভাবী স্বামীকে কি উপহার পাঠাইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে কি দ্রব্য, বিকাশকে প্রশ্ন করিয়া না জানিতে পারিয়া অনিল ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা

বিকাশ, মনোহর বাবু কি তোমার পিসিমাকে খুব পছন্দ করেছেন? আর. তোমার পিসিমা মনোহর বাবুকে দেখে কি বলেছেন?"

"পিসিমা আবার কি বলবেন? হ্যাঁ, বলেছিলেন একদিন, সেই যে সন্ধ্যাবেলা খুব বৃষ্টি হয়েছিল, তখন পিসিমা মাকে বলেছিলেন, কেউ যদি আমায় লাউ কুমড়োর মত নেড়ে চেড়ে না দেখে বিনি পয়সায় ঘরে নিতে পারে , সে কানা খোঁড়া কুৎসিত হলেও আমি দেবতা বলে তাকে পুজো করব। দেখুন, আমার পিসিমা খুব সুন্দর, ঠিক আপনার মতন, তবু মনোহর বাবু বলেছেন চেহারায় জীবন নাই।"

বিকাশের গম্ভীর কণ্ঠের বিজ্ঞের মত কথা শুনিয়া এবার অনিল হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না, হো হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"অনিল বাবু, আজ আপনার ঘরে হাসির বান ডেকেছে নাকি? কাকে নিয়ে এত হাসি হচ্চে?"—বলিতে বলিতে মনোহর বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া, বিকাশকে দেখিয়া বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিকাশ প্যাকেটটী মনোহর বাবুর হাতে দিয়া বলিল, এইটে আপনাকে দিতে এসেছি।"

"এতে কি আছে?"

বিকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বেই হাস্যছলে কৌতুকভরা কণ্ঠে অনিল বলিল, "খুলে ফেলুন মনোহর বাবু, ওতে কি আছে তা এ ছেলেটি বলতে পারবে না। নিশ্চয়ই কোন ভাল জিনিস আছে,—আপনার ভাবী পত্নী উপহার পাঠিয়েছেন।"

মনোহর বাবুর মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়টি সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া গেল। তাঁহার ভাবী পত্নী তাঁহাকে পছন্দ করিয়া প্রণয়োপহার পাঠাইয়াছে। কি পাঠাইতে পারে? বোধ হয় কোন বই-টই, অথবা কবিতার খাতা, না হয় একখানা ফটোগ্রাফ। গর্ব্বমিশ্রিত হাসিতে অধর রঞ্জিত করিয়া স্পন্দিত হৃদয়ে মনোহর বাবু প্যাকেটটী খুলিতে লাগিলেন।

কাগজের পর কাগজ খুলিতে খুলিতে যে জিনিসটি আত্ম প্রকাশ করিল তাহা মনোহর বাবুর পক্ষে সন্তোষ জনক হইল না। সে একখানি চারি পার্শ্বের ফ্রেমে কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর দর্পণ। তাহাতে প্রথমেই নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়িল।

লজ্জায় অপমানে মনোহর বাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া তিনি আর্সি খানাকে সশব্দে মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। সানের উপর পড়িয়া নিমেষের মধ্যেই তাহা ঝন্ ঝন্ করিয়া শত খণ্ডে চূর্ণিত হইয়া গেল।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, অনেক ছাত্রই কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আয়না ভাঙ্গার শব্দে তাহারা মনোহর বাবুর ঘরের সম্মুখে সমবেত হইল। অনিলের ইঙ্গিতে তাহাদের প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সব গুলি যুবকের মুখেই হাসির ছোঁয়াছ লাগিয়া গেল। কেহ কেহ হাসিতে হাসিতে মেঝেয় শুইয়া পড়িল। অনিল টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে হাতের পার্শ্বে এক দোয়াত কালি ঢালিয়া আর একটা নব পর্য্যায়ের সৃষ্টি করিল।

এত গুলি লোকের হাসি কৌতুকের মধ্যে মনোহর বাবু রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "কি! আমায় অপমান? এর শোধ নেব তবে আমার নাম মনোহর! এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমায় আয়না পাঠিয়ে দেওয়া! বেহায়া নির্লজ্জ! এরা ঘরে না থেকে—"

এবার অনিল কথা কহিল। ধীর সংযত কণ্ঠে কহিল, "মনোহর বাবু, এত রাগ করচেন কেন? এর ভিতর তো রাগের কিছু নেই, বরং লজ্জার কথা আছে। আমরা আজকাল কুমারী মেয়েদের দেখবার সময় কত জুলুম করি, তাদেরও তো ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে? এই মেয়েটি আপনাকে যে আয়না পাঠিয়েছে, এতে তার বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের যেমন পছন্দ বলে একটা জিনিস আছে, তাদের কি তা নেই? আমাদের নিজেদের চেহারা যাই হোক্ না, আমরা তাদের চেহারায় খুঁত ধরতে চাই, কাযেই তাদের অসহ্য হয়ে ওঠে।"

চেহারার আভাসেই মনোহর বাবু পুনরায় আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওদের আবার চেহারা! যাদের কুলটার মত ব্যবহার—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিল সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল, "চুপ করুন মনোহর বাবু! একটা ভদ্র ঘরের মেয়েদের এ রকম ইতর ভাষায় অপমান করবার কোন অধিকার আপনার নেই।"

"ন, আমার অধিকার নেই? তোমার বুঝি আছে? তোমার সঙ্গে কত দিনের আলাপ অনিল বাবু?"

অনিল তীব্রস্বরে বলিল, "আপনি আর একটিও অসম্মানজনক কথা মুখে আনবেন না মনোহর বাবু। আমি স্বয়ং গিয়ে উপযাচক হয়ে প্রকাশ বাবুর কাছে সেই মেয়েটির হস্ত প্রার্থনা করব। তাঁরা যদি সম্মত হন, তবে আমিই প্রকাশ বাবুর বোনকে বিয়ে করব।"

৬

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। তখনও বিকাশকে ফিরিতে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা জননী মনে মনে নানা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ক্ষণিক রাগের বশে স্বামীর অজ্ঞাতসারে অপরিচিত অনাত্মীয় যুবকের নিকটে দর্পণ পাঠান যে কতদূর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া শৈলর হৃদয়ে অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা অনুভূত হইতেছিল। তাহার সদা প্রফুল্ল মুখখানি মলিনতার ছায়ায় ম্লান হইয়া উঠিল।

প্রকাশ আফিস হইতে আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগ করিতে বসিয়া ডাকিল, "ও বারী, বিকু কোথায়?"

ভিতরের সব ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বারুণী তাহার বধূঠাকুরাণীর কার্য্য-কলাপ অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই দাদার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে সলজ্জ মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল। শৈল কম্পিত হৃদয়ে ছলছল নয়নে নতমুখে

অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আজ আমি বড় একটা অন্যায় কায করেছি, তোমায় না বলে বিকুকে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

প্রকাশ স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ওঃ বুঝেছি, তাকে বুঝি বায়স্কোপে পাঠিয়েছ?"

"না গো বায়স্কোপ নয়।"

শৈল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বিষাদময় মুখের দিকে চাহিয়া প্রকাশ যেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রাঙ্গণ হইতে বিকাশের আনন্দ পূরিত কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল।

পুত্রকে দেখিয়া শৈলর মুখে আনন্দপ্রভা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আগে খেতে চল্ বিকু, খাবার খেয়ে কথা বলবি।"

"আমি খেয়ে এসেছি—বাবা আসুন।"বলিয়া আনন্দের আবেগে প্রায় লাফাইতে লাফাইতে বিকাশ পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরের দিকে লইয়া চলিল।

প্রকাশ বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল, একটি সুশ্রী যুবক চেয়ারে বসিয়া আছে। প্রকাশকে দেখিয়া যুবক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আমার নাম শ্রী অনিলচন্দ্র রায়। আমি আপনার কাছেই এসেছি।"

"হ্যাঁ, আপনাকে সেদিন, মনোহর বাবুদের মেসে দেখেছি।—আপনার পরিচয় ও সেখানে শুনেছি।"— বলিয়া প্রকাশ অনিলকে বসিতে বলিয়া নিজেও উপবেশন করিল।

কিৎক্ষণ কাটিয়া গেল। অনিল কথা কহে না দেখিয়া প্রকাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার কাছে কি আপনার কোন দরকার আছে?"

অনিল সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে একটু দরকারেই এসেছিলাম। আপনার একটি বিবাহযোগ্যা বোন আছেন। যদি আমায় অনুপযুক্ত"—অনিল আর কিছু বলিতে পারিল না।

প্রকাশ আনন্দ বিহ্বলকণ্ঠে কহিল, "আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করব অনিল বাবু! ভগবান আপনাকে সুখী করুন, কিন্তু আমি বড় গরীব, টাকা পয়সা নেই।"

"আপনার টাকা পয়সা নেই বলেই এসেছি, প্রকাশ বাবু।"

"আপনার খুব উঁচু মন, তাই ওকথা বলচেন। কিন্তু আপনার বাবা কি এতে সম্মত হবেন? আমি আমার দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্যে আপনার পিতামাতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে চাই নে।"

অনিল ধীরে ধীরে কহিল, "সে চিন্তা আপনার করতে হবে না। আপনি আমার বাবা মাকে যখন দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন তাঁরা এজগতের মানুষ নন। আমার মন খুব উঁচু বল্লেন, তাঁদের তুলনায় আমি অতি নীচমনা। তাঁদের আদর্শ আমি অনুকরণ করবার চেষ্টাই করি, পেরে উঠিনে। আমার এ কার্যে তাঁরা অসন্তুষ্ট না হয়ে সন্তুষ্টই হবেন।"

সুখের আবেশে কৃতজ্ঞতার বশে প্রকাশের চক্ষে জল আসিল। সে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল, "তুমি দেবতা! তোমায় কি বলব ভাই, চিরজীবী হও আশীর্ব্বাদ করি। তা হলে বারুণীকে নিয়ে আসি?"

অনিলের বড় সাধ হইতেছিল, একবার দেখিয়া যায়। যে মেয়েটির এত সাহস, এত নির্ভীকতা, যে অপমানকারীকে অপমান ফিরাইয়া দিতে জানে, না জানি তাহার মুখখানি কত সুন্দর! হঠাৎ অনিলের মনে পড়িল বিকাশের কথা—"পিসিমা বলেছিলেন বাগানের লাউ কুমড়োর মতন করে না দেখে কেউ যদি বিনি পয়সায় আমায় ঘরে নিয়ে যায়," ইত্যাদি।

অনিল প্রলোভন জয় করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "না প্রকাশ বাবু, আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।"

বৈশাখের শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী। বিবাহভবন রাশি রাশি পুষ্প সৌরভে আমোদিত। দক্ষিণা বাতাস উন্মাদ আবেশে আকুল। সানাইয়ে সাহানা রাগিণীর মধুর আলাপনের মধ্যে শুভদৃষ্টির সময় পুরমহিলাগণ কর্ত্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া, ফুটন্ত ফুলের মত বারুণী তাহার নয়ন দুইটি উন্মীলিত করিয়া দেখিল, চন্দন-চর্চ্চিত সরস সুন্দর একটি তরুণ দেবতা উৎসুক নয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। চারি চক্ষের সম্মিলন হইল। প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গেই কিশোরী তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অনিলের পায়ে অর্পণ করিয়া, হর্ষোচ্ছ্বাসে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"—১৩২৭

অনাদৃতা

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী

মালতীর পাল্কী যখন প্রকাণ্ড লাল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন হেমন্তের বেলা অবসান প্রায়।

"পাল্কী করে এলে না কি?" বলিতে বলিতে গৃহিণী উমা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। মালতী পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বড় জাকে প্রণাম করিল। পাল্কীর খোলা দরজায় একখানি বালক মুখ দেখা গেল। মালতী সেদিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আয়, নেমে আয়।"

উমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন, "কে গা"?

"আমার ভাই, বড়দি।"

"ভাইটিকে সঙ্গে করে এনেছ বুঝি? বাপ রে—সৎভাই এর অত দরদ?" অতি ক্রোধে উমা আর বেশী কহিতে পারিলেন না দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মেজবধূ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বড় জা চলিয়া যাইতেই সে ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইল, কহিল, "মুখখানি তোর মতই ছোট বৌ, তবে কালো দেখছি, তোর সৎমা কালো ছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, আচ্ছা কি করি বলত মেজদি।"

"কিসের কি? ও বড়দির এক কথা। চল, ঘরে চল।"

মালতী বিষণ্ণচিত্তে দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল, মেজবৌ তাহাকে বসিতে দিল না; কহিল "সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শীগগীর মুখ হাত ধুয়ে আয়। তুই আসতে অত দেরী করলি কেন? শ্যামবাজার তো দশদিনের পথ নয়; উনি মারা যেতেই এলে পারতিস।"

"রইলাম এই দুটো দিন, বাপের বাড়ী যাওয়া তো এই শেষ হল। এতদিন বাপ ছিলেন না,—তাও ছোটমা মার মতই ভালবাসতেন, জুড়োবার স্থান একটা ছিল।"

"সে তো সত্যি কথাই; এদিকে ঠাকুর পো তো রেগে বসে আছে।"

"কেন, রাগ কিসের?"

"এতদিন গিয়ে বসে রইলি; যাকগে তোর ভাইটির নাম কি?"

"বিজয় কুমার"

"এসো বিজয়, আমার সঙ্গে এসো।" বলিয়া মেজবধূ বালককে টানিয়া লইল। মালতীর দুই ভাশুর; দুই জনেই উকীল। মালতীর স্বামী সত্যেন্দ্র মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। তাহারা ধনী বটে কিন্তু বাড়ীতে লোকের সংখ্যা অল্প। কারণ গৃহিনী উমা নিরাশ্রয় আত্মীয়বর্গ দ্বারা গৃহ পূর্ণ করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। সুতরাং অনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে আনিয়া মালতী যে অপরাধ করিল তাহা উমার কাছে একান্ত অমার্জ্জনীয় বলিয়া বোধ হইল। সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "আবার এ আপদ জুটিয়ে

আনলে কেন?'' প্রায় পনেরো দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ! এমন নীরস সম্ভাসনের জন্য মালতী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে নীরবে নত মুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র টেবিলের উপর ছড়ানো জিনিস পত্র গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া কহিতে লাগিল, ''নিজে তো এক পয়সা আজও উপার্জন করতে পারিনি; এর মধ্যে তোমাকে বিবাহ করেছি এই ত বিষম সমস্যা, তার উপরে শালার অন্নবস্ত্রের ভারটাও যদি দাদার উপরে চাপাতে হয় তবে আর লজ্জার সীমা থাকে না। ওকে এনে কিন্তু ভাল করলে না।

''কোথায় রেখে আসতাম?''

''কেন, তোমার কাকারা আছেন ত,''

''তাঁরা রাখতে চাইলেন না যে।''

''আমরাই বুঝি রাখতে বাধ্য? কোন আইনে শুনি?''

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল ''কি?''

''কি আর? নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দিতে আমরা পারব না? আমরা তো অক্ষম নই।''

''ভয়ানক দয়াবতী হয়ে উঠেছ যে! পরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে সবাই দয়ার প্রচার করতে পারে, কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায়;—থাক গে। কোথায় সে বিজয়কুমার?''

'' সে পিসিমার ঘরে কম্বলে শুয়েছে।''

সত্যেন্দ্র শয্যায় শুইয়া পড়িয়া গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে লইতে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, ''দরিদ্রের ঘরে বিয়ে করা এক মহা পাপ।''

অন্ধকারে মালতী হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, কোন কথা কহিল না।

পরদিন সকালে মালতী ভাঁড়ার ঘরে তরকারী কুটিতে ছিল। সদ্যস্নাতা বড়বধূ পিঠের উপর দীর্ঘ সিক্ত কেশগুলি ছড়াইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মালতী চোখ তুলিতেই তিনি কহিলেন, ''কি গো ভাইকে তো আদর করে নিয়ে এলে; মায়ের শ্রাদ্ধ পিণ্ডির খরচটা কে দেবে শুনি?'' মালতী নিরুত্তর, উমা তীব্র হাস্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন ''ঠাকুরপো চার বছর ধরেই ফেল হচ্চে; তা না হলে হয়তো সৎ শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের খরচটা দিত। কিন্তু টাকাটা দিতে যে কাকে হবে, সে আমি জানি; রোজগার করা এমনি পাপ বটে!''

মালতী নতমস্তকে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, মেজ বধূ চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের থালা আনিয়া বড়জার সম্মুখে নামাইয়া রাখিল। উমা সেদিকে চাহিয়া কহিলেন, ''আধঘণ্টা হোল প্রায় স্নান করেছি, এত তাড়াতাড়ি চাটা করে নিয়ে এলে মেজবৌ?'' মেজবধূর নাম লক্ষ্মী। সে স্বভাবেও লক্ষ্মী বটে; তবু উমার কাছে তাহাকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু লক্ষ্মী বড় লোকের কন্যা। মা বাপের বড় আদরের। সে অনেক সময় বাপের বাড়ীতে থাকিত বলিয়া, উমা তাহার উপরে ইচ্ছামত অধিকার খাটাইতে পারিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার মেজ দেবর শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার

একেবারেই বনিবনাও হইত না। সে ভয়ে তিনি লক্ষ্মীকে একটু এড়াইয়া চলিতেন। দরিদ্র-কন্যা মৌন-স্বভাবা মালতী তাঁহার সমস্ত ক্রোধের উপলক্ষ হইয়া বিরাজ করিত। সত্যেন্দ্র মালতীর লাঞ্ছনা চোখে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিবার চেষ্টা মাত্র করিত না এই জন্য সত্যেন্দ্রের উপরে উমার এক ধরনের স্নেহ ছিল, সে অবশ্য স্বার্থপরের স্নেহ।

চা আনিতে দেরী হওয়াতে উমা যখন বিদ্রূপ করিলেন, লক্ষ্মী কোন উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। উমা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচটা কে দেবে, তাই জানতে এসেছিলুম।"

লক্ষ্মী কহিল, "সংসার থেকে—"

সংসারের টাকাটা আসে কোঁত্থেকে শুনি।" এমন সময় শচীন্দ্রের পদশব্দ শোনা গেল, লক্ষ্মী ঘোমটা টানিয়া দিল। এবং মালতী মোটা থামের আড়ালে সরিয়া পড়িল। শচীন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "সংসারের টাকাটা আসে ব্যাঙ্ক থেকে। টাকা তুলে আনতে হয় তো বলো, এনে দেব। কার শ্রাদ্ধ?"

উমা মুখ কালো করিয়া কহিলেন "তোমার দাদার টাকাটা আর সংসার খরচে .দেওয়া হয় না বুঝি।"

"হ্যাঁ ডাক্তারের লম্বা-লম্বা বিল, সাহেব বাড়ীর, কাপড়ের ফর্দ্দ আর রতন স্যাকরার খাঁই মিটিয়ে যা বাকী থেকে যায় তার থেকে কিছু কেড়ে কুড়ে দাদা সংসারে দেন তা জানি। কিন্তু বাজে খরচ দিতে তাঁকে তো কেউ বলছে না। শ্রাদ্ধে যা খরচ হবে তা আমি ব্যাঙ্ক থেকে এনে দেব এখন," বলিয়া শচীন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। উমার বাক্য স্রোতের জ্বালায় সেদিন সকলের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। যদিও সেদিন রবিবার ছিল গৃহকর্ত্তা উপেন্দ্র অন্তঃপুরে বড় দর্শন দিলেন না। বড় বধূর রুগ্ন ছেলে মেয়েগুলোই মায়ের হাতে কয়েকবার প্রহার লাভ করিল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। উমা মালতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাড়ীশুদ্ধ লোকের খাওয়া শেষ হোল; বামুনদিদি এখন তোমার জন্য হাঁড়ী কোলে করে বসে থাকবে না কি? এক বাড়ীতে অমন রকম রকম মেজাজ নিয়ে চলবে না।

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "কাজ তো হয়ে গেছে বড়দি। বিজুকে খাইয়ে আসছি। বামুনদিদি, আমার ভাত একপাশে ঢাকা দিয়ে হেঁসেল তুলুক না।" বলিয়াই সে বিজয়ের আহারের আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। উমা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

মালতী বিজয়কে খাওয়াইয়া নীচের কলঘরে হাতপা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় উপর হইতে বড় বধূর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল "ছোট বৌ!" মালতী প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল। উমা রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, "ছোট ঠাকুরপোর জলখাবারটা পিসিমার ঘরে আছে, বোন উপরে নিয়ে এসো শিগগীর।" মালতী তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিল। পরনের কাপড় খানা প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। নীচেই তাহার একখানা শাড়ী রৌদ্রে শুকাইতেছিল; সে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া

পিসিমার ঘরে আসিয়া জলখাবার গোছাইতে বসিল। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে মিনিট পনরো সময় লাগিয়াছিল। খাবারের থালা খানা হাতে লইয়া উপরের সিঁড়িতে অৰ্দ্ধেক উঠিয়াই সে স্বামীর উগ্রকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। মালতী থামিয়া পড়িল; শুনিল, সত্যেন্দ্র কহিল, কেন কিসের কাজ?

উমা উত্তর দিলেন "কাজত কত সেই থেকে ভাইকে খাওয়া নিয়ে সাধ্য সাধনা চলছে।"

"তবে থাক, আমার দরকার নাই" বলিয়া সত্যেন্দ্র বাহিরে আসিল, এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মালতি দুই চক্ষুর ব্যাকুল অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া স্বামীর চোখের দিকে চাহিল; সত্যেন্দ্র তাহার কোন মর্যাদা রক্ষা করিল না। বড় বধূ কক্ষ মধ্য হইতেই ডাকিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো আ ঠাকুরপো, খেয়ে গেলে না? আহা খেয়েই যাও রাগ করে একদিন না খেয়ে কি হবে বল ত?

সেদিন আর মালতীর খাওয়া হইল না। তাহার ত্রুটি বশতঃ স্বামীর আহার হয় নাই, এই আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া সে আর আহারে বসিতে পারিল না। লক্ষ্মী একবার অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, মালতী কহিল, "না মেজদি আমার পেট ব্যথা করছে," "ওগো সব বুঝি। গেরস্তের ঘরে অত রাজকন্যার মত অভিমানী হলে চলে না।"

এই ঘটনার তিন চারদিন পরে একদিন সকাল বেলা মালতী বিষণ্নমুখে উমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উমা তাহাকে দেখিয়া কোন কথা কহিলেন না। অগত্যা মালতী মৃদুস্বরে ডাকিল "বড়দি।"

উমা কহিলেন কেন?

"কাল রাত্রে বিজুর বড় জ্বর হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, পিসিমা বলছিলেন—"

"তা আমি কি করব?"

"একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"ভাল জ্বালা হল দেখছি। বাড়ীর সবাই মিলে যত হাড় হাবাতে জুটিয়ে আনুক, আর আমি মরি জ্বালাতন হয়ে।"

"আমি এমন হলে পারব না বলছি।" মালতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন, "যাও না একটা বন্দোবস্ত যা হয় করগে; সবাই আমার ঘাড়ে চাপালে তো ভারি বিপদ দেখছি। কেন ছোটঠাকুর পো কৈ? সে পারবে না কুটুম্বকে একটু অসুদ দিতে? তবে ডাক্তারী বিদ্যে শেখা কি করতে।

মালতী স্বামীর কক্ষে আসিয়া দেখিল, সত্যেন্দ্র স্নানান্তে পরিপাটী বেশ পরিয়া আয়নার সম্মুখে চুল আঁচড়াইতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল।

মালতী আস্তে আস্তে কহিল "একটা কথা শোন।" সত্যেন্দ্র চিরুনী খানা রাখিয়া ভিজা তোয়ালে লইয়া হাত দুখানি মুছিতে মুছিতে কহিল, "কি কথা।"

"বিজুর বড় জ্বর হয়েছে, কাল রাত্রে।"

" তারপর?"

তুমি একবার দেখবে চল।

সত্যেন্দ্র বিব্রত হইয়া পড়িল। চোখে চশমা পরিতে পরিতে কহিল "আমি? আমি তো এখন কলেজ যাচ্ছি। দশটা বাজে প্রায় আমার আর সময় নেই। হারানবাবুকে ডাকাও না।

হারানবাবু ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসক। মালতী কহিল "ডাকান তো আমার ইচ্ছায় হবে না।"

" তা হলে আমি আর কি করব?"

" তুমি কাউকে বল না ডেকে আনতে।"

তা কি করে হয়? বাড়ীর সবাই ভাববে বিজয়ের জন্য আমার আর ভাবনার অন্ত নেই, আমি অত আহলাদেপনা দেখাতে পারব না। বড় বৌই বা কি ভাববেন?"

"বড়বৌকে বলগে।" বলিয়া সত্যেন্দ্র দ্রুত বাহিব হইয়া গেল।

লক্ষ্মী আসিয়া কহিল "ছোট বৌ, আজ আর স্নান করবি না নাকি। কত বেলা হয়েছে দেখ দেখি।" মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "এই যাই; বিজুকে নিয়ে যে বড় ভাবনায় পড়লাম মেজদি।" লক্ষ্মী কহিল, "ভাবনা কিসের? তোর ভাসুরকে বলেছি; হারান বাবুকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন।

মালতী ছলছল কৃতজ্ঞতা ভরা দুই নেত্রে লক্ষ্মীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল, "আমি তো মেজদি, তোমাকে কোন কথা বলিনি।" লক্ষ্মী সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল, সে কহিল "ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন যে ভাই না বল্লে ও সব আপনি দেখতে পাই।"

একদাগ ঔষধ পেটে পড়তেই বিজয়ের জ্বর সারিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে সে শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। মালতী লক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, "ভাগ্যে মেজদি এখানে ছিলে," লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "থাকছিনা আর বেশী দিন" মালতী শঙ্কিত হইয়া বলিল "কেন ভাই?"

"মা পত্র দিয়েছেন, দাদা নিতে আসবেন আমাকে।"

"মাগো, আমি একা কি করে থাকব মেজদি।" মালতীর ব্যকুলতাকে লক্ষ্মী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এই বাড়ীতে সে ছাড়া মালতী যে কত অসহায় কত বিপন্ন সে তাহা জানিত। যদিও সে বড় মধুর বাক্যবাণ হইতে মালতীকে বাঁচাইতে পারিত না। তথাপি সেই মালতীর একমাত্র সান্ত্বনা স্থল। স্বামীর কাছে তো সে বালিকা বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত না। তাই লক্ষ্মী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "অঘ্রানের তো শেষ এসে পড়ল। এই পৌষ মাসটা শুধু থাকব। বেশী দিন নয়।" মালতী ব্যগ্র হইয়া কহিল "দেরী কোর না ভাই, মাঘ মাস পড়তেই চলে এসো নিশ্চয়। আমি থাকতে পারব না।"

"শীগ্রীরই আসব। এই কয়টা দিন থাকিস সয়ে রয়ে। তবু তো বিজু এবার একটি সঙ্গী আছে।"

মালতী ম্লানমুখে কহিল, "ওকে এনে তো আমি বড়দির চক্ষুশূল হয়েছি।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "কবেই বা তুমি বড়দির চোখের মণি ছিলে।"

"না ভাই, তামাসা নয়; সত্যি বল না, বিজুকে নিয়ে কি করব? এমন জানলে— অর্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া মালতী থামিয়া গেল। বড় বধূ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা ভিজিটের টাকাটা কে দিলে শুনি?" মালতী বা লক্ষ্মী কেহই উত্তর দিলে না। গৃহিণী সকল সন্ধান না লইয়া আসেন নাই। দুজনেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার কাংস্য কণ্ঠ সজোরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তাহলে মেজ ঠাকুরপো আজকাল টাকা পয়সা ঘরে আনছে বুঝি? আমি সে খবর পাব কি করে? তাকে বলো মেজবৌ দুটো একটা টাকা পায়তো যেন ভূতের কাজে না দিয়ে সংসারেই দেয়। এতবড় সংসারটা অমনি চলে না। বাপের বাড়ী যাচ্ছো পরামর্শটা দিয়ে যেয়ো। আজকাল ছেলেরা বাপের কথা না শুনুক, বৌ এর কথা শোনে।"

উমার উচ্চ কণ্ঠের কথা পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবিষ্ট শচীন্দ্রের কর্ণে স্পষ্টই প্রবেশ করিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন "ভিজিটের টাকা নিয়ে যা বলবার তা আমাকেই বল না, ওদের কেন বৃথা কথা শোনাচ্চ।

উমা অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন "তোমাকে ত আমি কিছু বলছি না।"

"এই যে একরাশ কথা বল্লে, সে—কাকে? বাবা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন বলেই তো আর ভিজিটের টাকা দুটো ও সেখান থেকে তুলে আনতে পারি না। আর তোমার কাছে চাইতে যাওয়া মানে আবার একরাশ কথা শোনা তার চেয়ে নিজেই দিলাম, আপদ চুকে গেল। "তা দাও গে না; তোমার টাকা যেমন ইচ্ছে খরচ করবে আমার তাতে কি? কিন্তু বলি ঠাকুরপো তুমি কি সর্বক্ষণই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক না কি?"

"যদি থাকি ত তোমার স্বভাবের গুণেই," বলিয়া শচীন্দ্র আপনার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। উমার সকল বিরক্তি ও ক্রোধের বর্ষণস্থল হইয়া, মালতী ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কাজ কর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত। নিজেকে কোন কথা ভাবিবার অবসর দিত না। তবুও কোন কোন দিন তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত। সংসারে তুচ্ছ খুঁটি-নাটি ব্যাপারে মন কিছুতেই বাঁধা পড়িতে চাহিত না। তাহার বাল্যের সুখ কল্পনাগুলি পুরাতন সঙ্গীর মত যেন প্রাণের ভিতর ফিরিয়া আসিত। তাহাদের ব্যাকুল বাসনাকে মালতী কোন মতেই থামাইয়া দিতে পারিত না। একদিন বিকাল বেলা, সমস্ত কাজের শেষে কাপড়খানি কাচিয়া চুল বাঁধিয়া মালতী দ্বিতলের শয়ন কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌষের অপরাহ্ণ তখন জ্যোতিঃহারা সূর্যের রক্ত আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে একটু খানি খোলা জমি; সেই স্থানে কয়েকটা নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ গৃহ-স্বামীর যত্নে বাড়িয়া ক্রমে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, শীতের বাতাসে বৃক্ষ গুলির সুচিক্কণ পত্ররাশি কম্পিত হইতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মালতী আপনার জীবনের ব্যর্থতার বিষয় ভাবিতে ছিল। তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়? বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চারি

বৎসর কেবল বড়বধূব বাক্য-জ্বালা সহিয়াই কাটিল। সংসারে কোন বিষয়ে তাহার তিলমাত্র অধিকার জন্মে নাই। কিন্তু গৃহের দাসীত্ব করিতে তাহাকে প্রয়োজন।

স্বামী প্রেম বলিয়া সে যাহাকে জানে, তাহাও আজ পর্যন্ত একদিনের জন্য তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কখনও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। সেই তো তাহার সকল ব্যাথার মূল। সেই একটি স্থানে যদি স্নেহ ও সান্ত্বনার প্রাচুর্য্য থাকিত, তবে বড়বধূর সমস্ত অত্যাচার মালতী সহাস্য মুখে সহিতে পারিত। কিন্তু তাহারই বিশেষ অভাব ছিল। মালতী আপন চিন্তায় ডুবিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার কর্ণে তীক্ষ্ণ আহ্বান আসিয়া বাজিল ''ছোট বৌ।'' ''যাচ্ছি বড়দি''। বলিয়া মালতী ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল বড় জা দাঁড়াইয়া আছেন,— তাঁহার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা; আর সম্মুখে অপরাধীর মত নত মস্তকে দণ্ডায়মান বিজয় কুমার। মালতীকে দেখিয়া বড়বধূ কহিলেন, ''হ্যাঁ গো, একি ছোটলোকের কাণ্ড বল দেখি? চারটে পয়সা চুরি করে খেলে?''

''কি হয়েছে বড়দি?''

''কখনো কিছু করতে বলি না। চারবেলা তো গোগ্রাসে ভাতের পিণ্ডি গিলচে। আজ কি কুবুদ্ধি হোল আমার, তোমার গুণধর ভাইকে চার আনার রসগোল্লা আনতে দিয়েছিলাম; তার থেকে ছোঁড়া চার পয়সা চুরী করেছে।''

''কে বিজু?''

''সে নয় তো আর কে? যেমন শিক্ষে! দুলি আর মানি বড় কাঁদছিল; তাই ভাবলাম এখুনি আনিয়ে দিই; তা খুব শাস্তি হল আমার।''

''হয় তো ঠকে এসেছে বড়দি।''

''মিছে কথা বাড়িয়ো না ছোট বৌ,—ঠকবার ছেলে তোমার ভাইটি নয়। বাজার করবার অভ্যাসটা তো আর নূতন নয়। নবাবেব ছেলে তো নয়, যে, জন্মে দোকান বাজার চোখে দেখেনি।'' উমা নীচে গিয়া, একজন ভৃত্যকে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন, সে জানিয়া আসিয়া কহিল, দোকানী চার আনার খাবার দিয়াছে। বিজয় কুমার যে চুরী করিয়া খাইয়াছে আজ তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। মালতী বিজয়কে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল। ''কেন চুরি করে খেলি হতভাগা?''

বিজয় চোখ মুছিতে লাগিল।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চাপা কণ্ঠে কহিল ''আমার ভাই হয়ে চুরি করে খেলি? রসগোল্লা খাবার জন্য প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল,—আমাকে বলিসনি কেন? আজ রাত্রে আর খেতে পাবি না, যা আমার কাছ থেকে সরে যা।'' বলিয়া তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। মালতী দুঃখে কাঁদিতেই লাগিল।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভাইটিকে সে বড় ভাল বাসিত; তাই তাহাকে প্রহার করিয়া. সে নিজেই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্র তাহার অশ্রু চিহ্নিত মুখ দেখিতে পাইল। সে বুঝিল,

একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাছে স্ত্রীর বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, বড়বধু বা বাড়ীর অন্য লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে সে মালতীকে কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না। নীরবে জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দিন রাত্রে বিজয় কুমার না খাইয়াই শুইয়া রহিল। গৃহিনী দেখিয়াও কথা কহিলেন না। কিন্তু মালতীও যখন খাইবে না বলিল, তখন তিনি রাগিয়া উঠিলেন কহিলেন, ''ভাই বোনে যুক্তি করে উপোসী রইলে না কি? এ সেই চুরির শোধ হচ্ছে বুঝি? তা মন্দ নয়। কিন্তু বলি ছোট বৌ, অত রাগই বা কিসের? রাত পোহালেই যখন পিণ্ডি গিলতে হবে, তখন আবার মান অভিমান কেন?'' মালতী কোন উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র টেবিলের নিকটে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। স্ত্রীকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল ''খেয়েছ?''

''না''

''যাওনা, খেয়ে এসো; রাত হয়েছে ত।''

''আজ খাব না।''

সত্যেন্দ্র অনুমান করিল, সেই বিকালে অশ্রুবর্ষণের সহিত এই উপবাসের কোন সম্বন্ধ আছে। সে নিরুত্তরে ধূমপান করিতে লাগিল, মালতী টেবিলের অপর প্রান্তে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার অভুক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া, সত্যেন্দ্রের মায়া হইতে লাগিল, মৃদু স্বরে কহিল, ''খাবে না কেন?''

''ক্ষিদে নেই''—বলিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

আবার অশ্রুবর্ষণের উপক্রম দেখিয়া সত্যেন্দ্র আসন্ন আরাম ভঙ্গের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, ''আজ সারাদিন খেটেছি বড় ঘুম পেয়েছে শুইগে। তুমি শোবে না?''

''যাচ্চি।''

সত্যেন্দ্র শয্যায় প্রবেশ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুখ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল। মালতী আলো নিবাইয়া অন্ধকারে বসিয়া রহিল। মনের বেদনা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না।

দিন পাঁচ ছয় পরে উমার লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজার আয়োজন করিতে করিতে তিনি একবার ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। সহসা ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল, দেখিলেন বিজয় কুমার পূজার ঘর হইতে পশ্চাতের দ্বারপথে পলায়ন করিতেছে। উমা করস্থিত ফুলের সাজি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ কণ্ঠে ডাকিলেন ''বিজয়''। কেহই উত্তর দিল না। আজ দুই দিন হল মালতীর জ্বর হইয়াছে, সে ঘরে শুইয়াছিল উমা দ্রুত চরণে মালতীর কক্ষ দ্বারে আসিয়া কহিলেন, ''ওগো শুনচো?''

মালতী ক্লান্ত স্বরে কহিল, ''কি হয়েছে?''

''হয়েছে আমার মাথা, পুজর সাজানো নৈবেদ্য হতে কি যেন চুরি করে নিয়ে পালাল।''

মালতী ভীত হইয়া কহিল, ''কে?''

"তোমার বাপের গুণবান বংশধর, আবার কে? মুখ পোড়া বাঁদরের ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি পড়েছে, এবার আর রক্ষে নেই কেমন মা বাপের ছেলে গা এই বয়সে চুরিবিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছে।"

"মা বাপের কথা কি বলচ বড়দি।"

"বলছি ভাল বাপ মায়ের ছেলে চোর হয় না।"

মালতী বিবর্ণ মুখে উমার দিকে চাহিয়া রহিল।

" তোমার বাপ তো মিছে কথা বলতে আর ঠকাতে কম করেন নি, —তাঁর ছেলেই তো বিজয় কুমার, সে আর ভাল হবে কি করে?" "ছেলে মানুষ জন্মে শিক্ষা পায়নি, তাই একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তাই বলে একশোবার আমার বাপকে গাল দিচ্ছ কেন বড়দি?"

"ওমা গো, মুখ তো খুব বেড়েছে ছোট বৌ। চোরের হয়ে আবার আমাব সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে এলে? একই শিক্ষে কিনা, আচ্ছা আজ আমিও দেখছি।"

অল্পক্ষণ পরেই গৃহিণীর আশ্রিত সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস বেত্র হস্তে বিজয়কে শাসন করিতে আসিল, বিজয় আর্তনাদ কবিয়া উঠিল, এবং মালতী আপন কক্ষে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সেই ক্ষনেই গৃহ-প্রত্যাগত সত্যেন্দ্র অসুস্থ পত্নীকে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "অমন করে বসে আছ যে?"

মালতী ব্যগ্রস্বরে কহিল, "তুমি একবার বাইরে গিয়ে দেখ। বড় দিদি তার ভাইপোকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়াচ্ছেন। তুমি বাধা দাও গে তোমার পায়ে পড়ি।"

"আমি—?"

পারবে না? এতটা অন্যায় সহ্য হবে তোমার? হরিকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়ানো—সে তো শুধু আমাকে' নয় আমার মা বাপকে শুদ্ধ অপমান করা হবে, এ অপমান থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও।"

সত্যেন্দ্র তাহার চিরমৌনী পত্নীকে এত কথা কহিতে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল "বিজু কি অন্যায় করেছে, সে অনুসন্ধান না নিয়ে—"

মালতী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিদাস বেত উঠাইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে মালতী আসিয়া দুই হাতে ভ্রাতাকে সরাইয়া দিল। ক্রোধে বিস্ময়ে আত্মহারা উমা কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "ছোটবৌ ওকি হচ্ছে"? "নিয়ে যাচ্চি একে। যথেষ্ট কথা শুনিয়ে ও তৃপ্তি হোল না বড়দি। তাই যাকে তাকে নিয়ে এলে মার খাওয়াতে?

মালতীর মুখে এই কথা? উমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না তীক্ষ্ণ, কটু কণ্ঠে সমস্ত গায়ের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া কহিলেন "আমার ভাইপো বুঝি মানুষ নয় ছোটবৌ?"

"মানুষ হলে ও বিজুকে মারবার তার কি অধিকার?" বলিয়া মালতী ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল। উমা সমস্ত মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। সেদিন আহার কালে উপেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলে উমা সকালের ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এত অপমান আমি সইব না, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

উপেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা দুই জা-এ যখন একসঙ্গে ঘর করতে পার না তখন কাজে কাজেই তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বৌমার তো একটা বাপের বাড়ী ও নেই যে, সেখানে ছুটে গিয়ে রাগ দেখাবেন।"

আবার দিন কাটিতে লাগিল, মালতী এখন ও অসুস্থ একদিন সে লক্ষ্মীর একখানি বিস্তারিত পত্র পাইল, পত্রে প্রথমঅংশ এই রূপ—

"স্নেহের মালতী তোমার ভাসুরের পত্রে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে লিখিয়াছেন অথচ কেন তাহা খুলিয়া লিখেন নাই। তোমার জ্বর ছাড়াও আর কিছু কাণ্ড ঘটেছে নিশ্চয়। কি হইয়াছে? দুটো দিন সহিয়া থাক বোন, পৌষ মাসটা শেষ হইলেই আমি আসিব। আমাদের দেশের বৌগুলির কি দশা ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। আমার মাসতুত ভাই অমলকে জানত? অমল গতবার বি-এ ফেল করিয়াছিল; এবার তো পরীক্ষাই দিল না। নন-কো-অপারেশন করিতেছে। কিন্তু তাহার চোটটা ইংরাজকে বিন্দু মাত্র ও স্পর্শ করিতে পারে নাই; অন্য দিকে সর্ব্বতো ভাবে নিরপরাধ বধূ ও তাহার পিতৃ পরিবারের যন্ত্রণার বিষয় হইয়াছে। অমল পরীক্ষা দেয় নাই; রোজগার করে না, এ সকলই বধূর দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমার মাসীমারা ছেলের রূপগুণ ও বংশ মর্যাদার জোরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলেন। সে শিক্ষার মর্য্যাদাটা তাঁহারা খুব দিতেন, উপযুক্ত শিক্ষা যে মানুষের মনে অধিকতর আত্মবোধ ও সম্মান জ্ঞান জাগাইয়া দেয় এই সহজ কথাটি যাহারা না বুঝে, তাহাদের লইয়া বড় বিপদ। মাসীমার বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশেই। দিবারাত্র তাহাদের বাড়ী অশান্তি কলহ লাগিয়াই আছে। সমস্ত বিষয়ে বাক্যহীন বউটাকে উপলক্ষ দাঁড় করানো হয়। অমল 'নন্‌-কো-অপারেশন' করিতেছে। কিন্তু সে খুব সুবোধ ছেলে, পিতৃ-মাতৃভক্ত; বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মত পৌরুষ তাহার একবিন্দু নাই। দেখিয়া শুনিয়া দুঃখও হয় আবার হাসিও পায়। যে ছেলে আপনার সহধর্ম্মিনীকে অযথা অপমানের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। সে আবার একটা বিশাল দেশকে উদ্ধার করিবার কল্পনা স্বপ্নেও করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ছেলেরা বিবাহ করে কেন বল দেখি? ঝি বা রাঁধুনী তো টাকা দিলেই পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের দেশের কলেজে পাশকরা ছেলেগুলো পবিত্র বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে কেন, তাহা আমি বুঝতে পারি না।"

এই রকম তীব্র বিদ্বেষে চিঠিখানি আগাগোড়া পূর্ণ। মালতী মনে মনে কহিল, "দেবতার মত স্বামী পেয়েছ— মেজদি তাই অত কথা বলতে পেরেছ; আমি আজ কালের ছেলেদের দোষ দিই কি করে? আমার স্বামী ও তো এ সম্প্রদায়ের বাহিরে নন।" মালতীর জ্বর সারিয়া সারিতেছিল না। কিন্তু মাঘমাসটা পড়িতেই লক্ষ্মীর আসা সম্বন্ধে তাহার মনে যে একটু আশা জাগিল, সেই আশার জোরে সে একটু সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। সেদিন সকাল বেলা মালতী রোগশয্যা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার শরীর মন এখন বড় দুর্বল। থামের গায়ে অলস দেহভার স্থাপন করিয়া সে শীত প্রভাতের উষ্ণ মধুর রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছিল। এমন সময়ে নীচে প্রাঙ্গণে বিজয় কুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া,

সে রেলিং এর ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বিজয় উমার কনিষ্ঠ পুত্র রণুকে ক্রোড়ে লইয়া বাজার কবিয়া ফিরিতেছে। তাহার দুই হাত নানা আকারের কাগজের ও শালপাতার মোড়কে পরিপূর্ণ। মালতীর অজ্ঞাতে বিজয়কে আজকাল এই সব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বুঝিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে মালতী বিচলিতা হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, বিজয় প্রাঙ্গণের কলতলায় বাসন পরিষ্কার করিতে করিতে বামুনদিদির সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। সে উঠিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, সেদিন দুপুরবেলা সে দাসীকে দিয়া বিজয়কে আপনার কক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। দাসী আসিয়া কহিল, ''বিজয়ের ভারি জ্বর হয়েছে যে! সে মাথা তুলতেই পারচে না।'' মালতী কহিল ''কোথায় সে?'' দাসী কক্ষ নির্দেশ করিয় চলিয়া গেল। মালতী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল; কম্পিত পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র অন্ধকার, অপরিষ্কৃত কক্ষ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়েই পাশের ঘর হইতে বড় জার কর্কশ কণ্ঠস্বর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। উমা নবাগতা ভ্রাতৃজায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছিলেন, ''জ্বালিয়ে খাচ্চে আমাকে। আবার না কি জ্বর হয়েছে শুনছি।''

''কে ছেলেটা?''

''কে জানে কোথাকার কে? পথ থেকে ধরে এনে ঘরে ঢুকানো— তোমার নন্দাই খুব পারেন। কিন্তু তার যত ভাল তো সামলাইতে হয় এই আমাকে, কি বল ভাই?''

''সত্যি, তো! মা বাপ ছেলেটার নেই?''

''হরি বোল! মা বাপের যদি ঠিক থাকবে, তবে আর পরের ঘরে পড়ে আছে? ওদের আবার ঘর 'পর' আছে?''

মালতীর দুই কর্ণে কে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। সে আর ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র আসিয়া পত্নীকে এই অবস্থায় দেখিল। বিস্মিত হইয়া কহিল ''কাঁদচ যে অত?''

মালতী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ''কখনো কিছু চাইনি—আজ জোড় হাত করে বলছি তোমায়, এর একটা প্রতিকার কর তুমি। আমি আমার পিতৃ অপমান আর সইতে পারি না যে। আমি তোমদের বৌ, এই অধিকারে আমার বাপকে শুদ্ধু গিন্নীর গাল খেতে হচ্চে। কিন্তু বৌএর কোন অধিকার আমায় দিয়েছ বল দেখি? তিলে তিলে শুধু আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ না?''

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—''কি করচ? কেউ শোনে যদি'' ''এখনো সেই ভয় তোমার? কেউ শোনে যদি, তোমার একটু নিন্দে হবে—এই ত? সেইটুকু সইবার মত তেজ তোমার নেই? তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার সকল দুঃখে পাথর চাপা দিয়ে রাখব, আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, এমন পাষান তুমি—মাগো।''

''কেন ঠাকুরপোকে অত কথা শোনাচ্চ ছোটবৌ? তোমার মরা বাপের বড় ভাগ্যি যে আমার বাড়ীতে তোমায় ঠাঁই দিয়েছি। কিসের জোরে অত কথা শোনাও, আজ বাড়ী ছেড়ে যাও না, আজই নতুন বৌ বরণ করে আনি।'' উমা যেন দ্বারের সন্নিকট হইতে

অশনি সম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন। মালতী দুই চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আরো সহ্য করতে বল আমায়? আমাকে কি তোমরা মানুষ মনে করনা। আমি"—বলিতে বলিতে তাহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া তরল অগ্নিস্রোতের মত অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র বিব্রত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, এমন কাণ্ড সে কল্পনা ও করে নাই, মালতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল "তুমি যাও, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। দেবতার আসনে যাকে বসিয়েছিলুম, তাকে এত ভীরু, কাপুরুষ দেখলে সহ্য হয় না—তুমি যাও।" সত্যেন্দ্র বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। মালতী উপাধানে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাতে অবসন্ন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মালতী দেখিল, লক্ষ্মী তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে। মালতী সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল "ফিরে এলে ভাই। আর যেয়োনা মেজদি।" লক্ষ্মী স্নিগ্ধ স্বরে প্রাণের মায়া ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই আমি আর তোমাকে ফেলে যাব না।" মালতী একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিজু কেমন আছে মেজদি জান?"

"তার জ্বর কমেছে?" তার জন্য এখন ভেবো না, তুমি ঘুমাও। মালতী চোখ বুঝিয়া আবার ঘুমাইতে চাহিল কিন্তু একটু পরেই চমকিয়া চোখ খুলিল। লক্ষ্মী তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কহিল, "কি ছোট বৌ, কষ্ট হচ্চে?" "না।" বলিয়া মালতী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, মিনিট দশ পরে সে সহসা ভয়ানক চমকাইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। লক্ষ্মী বাহু দ্বারা তাহার কম্পিত দেহ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ওকি, কোথায় যাও বোন? ঠাকুরপোকে ডাকব কি?" "না—না" বলিতে বলিতে মালতী সবেগে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

"ছোট বৌ।"

"মেজদি"

"কেন অমন করচিস ভাই?"

"আমি এখানে থাকতে পারচি না; চারিদিকে যেন আগুন লেগে গেছে।" বলিয়া মালতী নিঝুম হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী পাখার বাতাস করিতে করিতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

সাতদিন পরে মালতীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীর একান্ত স্নেহ যত্নে একটু একটু করিয়া সে সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল। একদিন বিকালবেলা বারান্দায় বসিয়া কোলেব উপর কাগজ রাখিয়া সে কি লিখিতেছিল; এমন সময় লক্ষ্মী ওদিকে তাহার ঘর হইতে ডাকিল

"ছোট বৌ।"

"কেন মেজদি?"

"আর হিমে বাইরে বসে থেকো না,—ঘরে যাও।"

"এইটুকু লিখে যাচ্চি"—

"অত আজ আর নাই লিখলে বোন মাথা ধরবে যে।"

"না কিছু হবে না।" বলিয়া মালতী দিনান্তের শেষ আভার ন্যায় একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র যখন শয়নগৃহে আসিল, মালতী উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশভার স্বামীর পদতল প্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া রহিল। সত্যেন্দ্র তীব্র জ্বালা মিশ্রিত সুরে কহিল "আজ আবার ভক্তি উছলে উঠল যে?" মালতী কোন উত্তর দিল না। সত্যেন্দ্র কহিল " সেদিন তো ভীরু কাপুরুষ বলে খুব একচোট বকে নিয়েছে,—আজ আবার কাপুরুষের পায়ের উপর এসে পড়লে? দরকার নেই,— দরকার নেই, আমাকে আবার অত ভক্তি দেখানো কেন?"

মালতী উত্তর না দিয়া পা ছাড়িয়া দিল, সত্যেন্দ্র শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া লেপটা টানিয়া লইল। এবং তাহার ঘুম আসিতে ও দেরী হইল না। মালতী ঠাণ্ডা মেঝের উপরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘর অন্ধকার,— সেই অন্ধকারে বসিয়া সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তারপর সে উঠিল। আস্তে আস্তে পালঙ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মুক্ত বাতায়ন পথে শীত রজনীর কুয়াসাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না সত্যেন্দ্রের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী দৃষ্টি নত করিয়া সেই তৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় এই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পায় নাই। কতদিন এই সুপ্ত সৌন্দর্য্য তাহার তরুণ মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিবাহিত জীবনে যখন দুঃখ প্রবেশ করে নাই, তখন তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত আশা, এই একটি ব্যক্তিকে ঘিরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইত। আজ সেদিন কোথায় গেল? মালতীর মনে হইল তাহার দুর্বল বক্ষ যেন কেহ কঠিন লৌহযন্ত্রে দলিত, পেষিত করিয়া দিতেছে। সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না। একবার হাত দিয়া নিদ্রিত স্বামীকে স্পর্শ করিল, তারপর ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

তখন প্রভাতের রৌদ্র উজ্জ্বল হয় নাই, সত্যেন্দ্র লক্ষীর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল। "মেজ বৌ," "ঠাকুরপো নাকি ?" মেজ বৌ ব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"দরজাটা খোল শীগ্‌গীর—।"

লক্ষ্মী দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতেই সত্যেন্দ্র ভীতি বিবর্ণ মুখে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে মেজ বৌ— তোমাদের ছোট বৌকে ঘরে খুঁজে পাচ্ছি না। বাড়ীর কোথাও সে নেই।"

লক্ষ্মী রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া পাংশুমুখে চাহিয়া রহিল। শচীন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিলেন, তোমরা সব পাগল হয়েছে নাকি? স্নানের "ঘরে টরে"—

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল "না কোথাও নেই; সব জায়গা খোঁজ করেছি। দেউড়ীর দরজা খোলা ছিল, ভগবানসিং নিজে বল্লে—"

লক্ষ্মী কোন মতেই কহিল, "শ্যামবাজারে চলে যায়নিত' ? শচীন্দ্র কহিলেন "এ-রকম ভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কি? আচ্ছা দেখছি"—বলিয়া তিনি ত্বরিত পদে নীচে

নামিয়া গেলেন। যদি মালতী ঘরেই বসিয়া থাকে এই আশায় মুগ্ধ হইয়া সত্যেন্দ্র আবার তাহার শূন্য শয়ন কক্ষের দিকে ফিরিয়া গেল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল, বিছানায় পায়ের দিকে একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি পত্রখানা তুলিয়া লইল। খামের উপর মালতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে সত্যেন্দ্রনাথের নাম লেখা আছে সুতরাং কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া ফেলিল। এবং বিছানার উপরে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

"শ্রীচরণেষু—আমি তোমাদের কাহাকেও না জানাইয়া আজ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা আমার সন্ধান করিলেও আমাকে পাইবে না। যদি পার তবে বিজুকে একটু আশ্রয় দিও। অথবা তাহাকে পথের কুকুরের মত রাস্তায় তাড়াইয়া দিলে ও কোন ক্ষতি নাই। কারণ আমি যে দেশে চলিলাম সেখানে কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে দেশ বহু দূরে।

"ভাবিয়াছিলাম, চুপ করিয়া সহিয়া থাকিব। কিন্তু কিছুতেই সহিতে পারলাম না। তাই অনেক ভাবিয়া দেখিলাম। কেরাসিন-নায়িকার দলবৃদ্ধি করা অপেক্ষা আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমার কাছে ভাল মনে হইল। আমি সেই পথেই যাত্রা করিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ঠিক স্থানে পৌঁছে দেন। "তুমি ভ্রমেও ভাবিও না যে, বড়দিদির লাঞ্ছনা অসহ্য হওয়াতে আমি এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বড়দিদির অপরিসীম অত্যাচার আমি সহাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতাম যদি তুমি আমার মান অপমান, সুখ-দুঃখের প্রকৃত সাথী হইতে। তুমি তো এক দিনের জন্য তাহা হও নাই। তুমি সর্বদাই সকলের কাছে আপনার মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকিতে। কিন্তু একথা কখনও ভাবিয়াছ কি যে আমার ও আত্মমর্যাদার জ্ঞান আছে; এবং আমি আকাশ হইতে মাটিতে খসিয়া পড়ি নাই। মা বাপের কোলেই আমি জন্মিয়াছিলাম। এবং তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি অপেক্ষা এক তিল কম নহে? যাঁহাদের কন্যাকে পত্নী পদ দিয়াছ, সেই আমার স্বর্গস্থ পিতা মাতার অপমান যখন তোমার পুরুষের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন আমিই বা তোমার পরিবারের কথা ভাবিব কেন? আমার গৃহত্যাগে তোমাদের পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে, এই কথা ভাবিতে আজ আমার ক্রুর আনন্দ হইতেছে। নিজের জীবন বলি দিয়া আমি সকল অপমান অবহেলার চুড়ান্ত করিয়া যাইব। আমার দিক হইতে তোমাদের সমস্ত সুখ সম্মান, সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই অথচ আমার দিকটা তোমরা একেবারেই ভাবিবে না,—এ কথাটা আমি সহ্য করিতে পারি না। মানুষ মাটি বা পাথর নয় যে প্রয়োজন মত তোমরা তাহা হইতে কিছু কাটিয়া লইবে কিন্তু তাহাকে কিছুই ফিরাইয়া দিবে না। নারী দেহেও যে প্রাণ আছে তাহা তোমরা ভুলিয়াছ, নিজে নারী হইয়া আমি তো তাহা ভুলিতে পারি না।

"হিন্দু রমণী মুখ ফুটিয়া কখন স্বামীকে ভালবাসা জানায় না। স্বামী যদি নিজের সহৃদয়তা দ্বারা স্ত্রীর ভালবাসা না বুঝেন তবে স্ত্রীর সাধ্য নাই সে অনির্ব্বচনীয় ভাব তাঁহাকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দিবে। আমি তোমাকে ভালবাসি তা এখন ও যে সে ভালবাসার একবিন্দু হ্রাস হইয়াছে এমন নহে তবু আজ শেষ বিদায় ক্ষণে "বাসি" বলিয়া কোন লাভ

নাই, তাই বলিতেছি ''বাসিতাম''। প্রতিদানহীন প্রচণ্ড প্রেম দিবারাত্রি আগুনের মত আমার মনের মধ্যে জ্বলিত, সে অসহ্য দহনে আমার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য কর্ত্তব্য বুদ্ধি সব জ্বলিয়া গিয়াছে। আজ আমি আপনার বশে নাই। একদিন ছিল, যখন দেবতার আসনে তোমাকে বসাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। আজ দেখিলাম তুমি সংসারের অপর সাধারণ দশজনের মতই; সমস্ত মলিনতা পঙ্কিলতার বীজ তোমার মধ্যে সুপ্ত আছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার দেবতার এই মলিন মূর্ত্তি চোখে দেখিয়া, আমার আর সংসার বাসের প্রবৃত্তি নাই। তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না-- তোমার সঙ্গে মিলিয়া তোমার সংসার করিব কি করিয়া? তোমার সহিত পাছে কপটতা করিতে হয় সেই ভয়ে তোমার জীবনের পথ হইতেই সরিয়া যাইতেছি। ভুমি আবার বিবাহ করিবে নিশ্চয়। কিন্তু চিরবিদায়ের দিনে তোমাকে অনুরোধ কবিতেছি আর কাহাকেও এমন দুঃখ দিও না। আর উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিও তাহা হইলে বড়দিদির বাক্যবাণ সহিতে হইবে না। আমাকে বিবাহ করিয়া অনেক সময় বড়দিদির নিকটে অন্যায় কথা শুনিযাছ-- সে সকল হইতে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। তুমি না কি দেশোদ্ধারের সংকল্প করিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি কি করিবে সে কথায় আমার আব প্রযোজন নাই। তবে সংসারে আমাব ন্যায় হতভাগিনীর সংখ্যা বিরল নহে। তাহাদের জন্য বলিতেছি—অত বড় দেশোদ্ধারের কথা না ভাবিয়া, সেই অভাগিনীদের তাহাদের অন্ধকার জীবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হয়। যদি নিজের হৃদয় দিয়া কখনও নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা কর তবে দেখিবে, এই চিরলাঞ্ছিত নারী জাতি মনের মধ্যে কত গভীর গোপন দুঃখ বহন করিয়া হাসিমুখে সুব্যবস্থায় তোমাদের সংসার পরিচালনা করে, ঈশ্বর চরণে আমার প্রার্থনা তিনি যেন একদিন তোমার অন্ধ চোখ খুলিয়া দেন।

''এখন তবে বিদায়। বৃথা আমার অনুসন্ধান করিও না। আমি বহু বহু—দূর তীর্থে যাত্রা করিলাম।

ইতি—মালতী।''

বিস্ময় বিমূঢ় সত্যেন্দ্রের হাত হইতে পত্রখানা কাড়িয়া লইয়া মেজবৌ এক নিঃশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া ফেলিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া একটি ক্ষুব্ধ আহ্বান কম্পিত অধরে ফুটিয়া বাহির হইল।

শচীন্দ্র বিজয়কুমারকে একটা অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

গৃহত্যাগিনী মালতীর নাম সে গৃহে আর উচ্চারিত হইল না। উমা তাঁহার অবিবাহিতা, বয়স্থা পিতৃব্য কন্যার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

পর বৎসর লক্ষ্মী শচীন্দ্রের সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে এক বিপুল আশা বক্ষে লইয়া অসংখ্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু কাহারও সন্ধান মিলে নাই। অগত্যা কল্পনাতীত, মর্ম্মান্তিক কথাই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইল। মালতীর নাম সে আর মুখে লইল না;—শুধু একখানি পবিত্র সুন্দর মুখ চিরদিনের মত তাহার হৃদয়ে আঁকা হইয়া রহিল।

'ভারতবর্ষ'—১৩২৮ সন

জামাইবাবু

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া

ঝম্ ঝম্! গাঢ় আঁধারভরা রাত্রি। দ্বিপ্রহর বোধ হয় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আট-নম্বরের ডাউন এক্সপ্রেসখানা ঝাঁ ঝাঁ শব্দে আসিয়া আলোকোজ্জ্বল দানাপুর ষ্টেশনে ঢুকিল। গাড়ীর একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে একটি তরুণী মুখ বাড়াইল। নিদ্রাবেশ জড়িত চক্ষু মুছিয়া, ষ্টেশনের নাম পরিচয়টা জানিবার জন্যই বোধ হয়, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। সহসা একটা দমকা ঝাঁকুনি দিয়া, ক্রমশঃ মন্থর গতিশীল গাড়ীখানি একটা আলোক-স্তম্ভের গায়ে লেখা ষ্টেশনের নামটা পড়িল। নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার পাশে বসিয়া পড়িল। অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সেই বিপুল জনাকীর্ণ কোলাহল-মুখর ষ্টেশনের শোভা দেখিতে লাগিল।

সামনে দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, পান সিগ্রেট্, বাবু,—পান সিগ্রেট্।"

দায়ে পড়িয়া তরুণী উদাস ভাবে সরিয়া বসিল। লোকটা অদৃশ্য হইতেই আবার স্বস্থানে আসিয়া, প্লাটফরমে লোকজনের ছুটাছুটি দেখিতে লাগিল।

অদূরে পুলের নীচে চশমা চোখে সৌখীন ধরণের সজ্জা পরিহিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, এক হাতে কোঁচা, এক হাতে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ধরিয়া তিনি চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে ছিলেন। সহসা তরুণীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার কতক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, হঠাৎ দ্রুতপদে সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার দিকে ঝুঁকিয়া যেন অতি কষ্টেই খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমাদেরই মহালক্ষ্মী যে!"

তরুণী অন্যদিকে চাহিয়া ছিল—হঠাৎ এই আকস্মিক সম্ভাষণে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া রহিল,—সম্ভবত চিনিতে পারিল না। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে প্রছন্ন শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ও বাবা! অবস্থা শোচনীয়! আজকাল কাউকে চিনতে টিনতে পার না দেখছি!"

পরিচিত মুখ এবং ততোধিক পরিচিত সেই শ্লেষই বটে!— মুহূর্ত্তে তরুণী সসৌজন্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নমস্কার করিল। সবিনয়ে বলিল, "জামাইবাবু! আসুন, আসুন,—অনেক দিনের পর দেখা। গাড়ীতে আসবেন না কি?"

"তবু ভাল! দয়া করে চিনতে পেরেছ, এই ঢের! যা গরবী চাল সুরু করেছ—আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।" অপ্রস্তুত এবং কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াই তরুণী বলিল, "মাপ করুন, সত্যিই চিনতে পারিনি। আমার ভয়ানক মন্দ অভ্যাস— চেনা লোকদের মুখ ভুলে যাই। গরীবের ত্রুটি ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করে, তা'পর, কোথা যাচ্ছেন?"

"আসানসোল। তোমরা?"

"হুগলী।"

"একলা?"

"উহু,"—এলাহ্বাদ বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে আছেন। ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছি, উনি অসুস্থ।"

গাড়ীর ভিতর উঁকি দিয়া, নিদ্রিতা ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তবে ত এ কামরায় ওঠা হয় না। তাতে আবার থার্ড ক্লাস।"

আপনার ইণ্টারের টিকিট বুঝি? আচ্ছা, তা হলে আসুন। আসানসোলে আবার তা হলে—"

"ঐ যা! হুইসেল দিচ্ছে যে! ধর ধর ব্যাগটা! পরের ষ্টেশন নামব না-হয়।"—জানালার ভিতর দিয়া ব্যাগটা পার করিয়া, ভদ্রলোক একটানে দুয়ার খুলিয়া উঠিলেন, পর মুহূর্ত্তে গাড়ী "চলি চলি পা পা" সুরু করিল। ছোট কামরা দুখানি মাত্র বেঞ্চি। একটিতে রুগ্না ঘুমাইতেছিল, অন্যটি জিনিস পত্র, মোট পুঁটলিতে পূর্ণ। তরুণী তাড়াতাড়ি জিনিস সরাইয়া লইল। ভদ্রলোকটি ব্যাগটি পাশে রাখিয়া বসিলেন। বিনা ভূমিকায় শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তারপর নিরলা দেবি! তুমি না কি কোন স্কুলের মাষ্টারনি হয়েছে? খুব না কি সুখ সম্পদ ভোগ করছ?"

তরুণী জিনিস পত্র গুছাইতে গুছাইতে উদাসভাবে বলিল "তা হবে।" "হবে কি রকম? শুনলুম ভাগ্নের ভাত তোমার পছন্দ হয়নি, তাই মাষ্টারী করে, কুলোজ্জ্বল করতে গেছ! বলিহারি বাবা, যা হোক।"

গম্ভীর হইয়া তরুণী বলিল "কি করব? অন্ন বস্ত্রের সমস্যা তো মেটাতে হবে?"

"কেন? ভাগ্নের সংসারে থাকলেই তো হোত।"

"ছিলুম তো অনেকদিন। ঝি-গিরি, রাঁধুনীগিরি, সবই তো করেছি! কিন্তু বড়লোক আত্মীয় তারা,—গরীবের ভার নিয়ে কত আর জ্বালাতন হবেন? তাই নিজের ভার নিজেই বইবার চেষ্টা দেখছি।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিশেষ বিজ্ঞভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "দ্যাখো, আর যা কর তা কর— মেয়ে মানুষ হয়ে কখন ও ঐ কাজটি কোর না। শক্ত শাসনে না থাকলে মেয়ে মানুষ কখনও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। স্বাধীন হলে মেয়েমানুষ উচ্ছন্নে যায়।"

নিরলা ধীরভাবে বলিল, "উচ্ছন্ন যাবার পথে স্বাধীনতা চাইলে শুধু মেয়েমানুষ কেন জামাইবাবু, পুরুষ মানুষরাও উচ্ছন্ন যায়। আপনারা আশীর্বাদ করুন সে রকম দুর্ম্মতি ঘটবার আগেই যেন ভগবান আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও একটা স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মেয়েমানুষের আছে।"

"আচ্ছা-হা, স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মানুষের আছে বটে,—কিন্তু 'মেয়েমানুষ' যে আলাদা জাত গো।"

নিরলা বলিল, "অর্থাৎ? তারা মনুষ্যত্ব—বর্জ্জিত?"

জামাইবাবু উষ্ণ হইয়া বলিলেন "দ্যাখো, আমাদের শাস্ত্র বলেছে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম অর্হতি!—"

নিরলা অধিকতর ধীর ভাবে বলিল, ''মনুসংহিতাখানা জামাইবাবুর সমস্ত পড়া আছে কি? ''শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনাশ্যতাশু তৎকুলম্'' এ কথাও মনু বলে গেছেন,— দেখেছেন কি?''

উত্তেজিত হইয়া জামাইবাবু বলিলেন, ''মনুসংহিতা ফংহিতা বুঝি না বাপু,—শাস্ত্র ঐ কথা বলে গেছে তাই জানি। সীতাদেবি লক্ষণের নিষেধ এড়িয়ে স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই রাবণ তাকে হরণ করতে পেরেছিল, শুনেছ?''

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, ''শুনিনি—এই শুনলুম। এমন ভাবে কুর্তকের জের টানলে, আমায় যোড়হাত করে বলতে হবে,—''পরাভব মানিলাম মূর্খের নিকটে!—' কিছু মনে করবেন না। শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারা যে ভাবে নজীর উদ্ধার করেন, — সে ভাবগুলো যেন একটু ' কেমন কেমন' লাগে। আমি ও শাস্ত্রের ক খ গুলোর একটু খবর রাখি। রাগ করবেন না তাতে।—''

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে জামাইবাবু বলিলেন, ''করব্ বৈকি! মেয়েমানুষ শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি বোঝে যে শাস্ত্রের খবর রাখবে? দু কলম লেখাপড়াই না হয় শিখেছ,—তাই বলে শাস্ত্রের খবর তুমি রাখবে? বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমাদের।— মেয়েমানুষের এত 'বাড়' হওয়া ভাল নয়।''

''তা হতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার বিদ্বেষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবার কোন কারণ নেই। কেন না, জ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি স্বয়ং মেয়েমানুষ। আর সুলতা যোগিনী যিনি যোগ শক্তি বলে জনক রাজা-হেন মহাযোগীকে ও একদা বিস্মিত, চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন, তিনি ও মেয়েমানুষ। গার্গী, লোপামুদ্রাও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান চর্চ্চা করে গিয়েছিলেন। তাতে ঋষিরা কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কিনা জানি নে,—তবে জ্ঞান চর্চা অপরাধের জন্য তাঁদের যে ফাঁসির হুকুম হয়নি সেটা বোধ হয় সত্যি। আর লীলা, খনা প্রভৃতি মেয়েরাও জ্যোতিষ শাস্ত্র নাড়াচাড়া করে গেছেন,—শুনে থাকবেন বোধ হয় লীলার অদৃষ্ট ভাল। ভাস্করাচার্য্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন, সত্যিকার পণ্ডিত-ই তিনি, তাই লীলার হিংসে করে,—নিজের পাণ্ডিত্য প্রতাপ জাহিরে চেষ্টা করেছিলেন বলে, শোনা যায় না। কিন্তু খনা বেচারার বরাৎ জোর এম্নি চমৎকার ছিল যে, খনার জ্ঞান চর্চা অপরাধের জন্য তাঁর জ্যোতিষ জ্ঞানাভিমানী শ্বশুর হিংসায় অন্ধ হয়ে- না - না মাপ করুন জামাই বাবু, এত বড় শক্ত সত্যকে সহ্য করা আপনাদের কোমল ধাতে সইবে না হয় ত। বরাহ ঠাকুর হিংসায় অন্ধ হয়ে নয় আহ্লাদে গদ গদ হয়েই ও পরম স্নেহভরে পুত্রবধূর জিভটি কেটে ফেলেন, ঠিকই করেছিলেন। পুত্রবধূর সাধন শক্তি যদি শ্বশুরের পাণ্ডিত্য গৌরবকে ছাড়িয়ে উঠত, তা হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলুন দেখি, এই জগৎটার! দুনিয়া শুদ্ধ মানুষের জাত ধর্ম্ম তা হলে রসাতলেই যেত আর কি। খনা যদি জগতে আরো জ্ঞান প্রচারের সুযোগ পেত, তা হলে শুধু বিদ্যাভিমানী বরাহের কেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্ঞানের আয়রণ চেষ্ট গুলো পর্যন্ত নীলেমে চড়িয়ে দিয়ে ছাড়ত। কেন না, আপনাদের মতে জ্ঞান রাজ্যের জমিদারীখানা এতই ছোট যে দৈবাৎ কোন মেয়ে ওর দুপয়সার এক

পয়সা শরিকদার হলেই,—পুরুষদের ষোল ইজ্জৎ নষ্ট হয়ে যায়। হায়রে ভগবানের জ্ঞান রাজ্য, আর হায়রে সে রাজ্যের জরিপি মাপের চৌহদ্দি।—"

জামাইবাবু এ সব কথার অর্থ কি বুঝিলেন বলা যায় না। তবে তাঁর মুখ ভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল,—যা বুঝিলেন তার ভাষাগত সংজ্ঞার নাম সমস্তই অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য।

খানিক ভাবিয়া চিন্তিয়া—বলিবার মত কথা কিছু খুঁজিয়া লইয়াই বোধ হয়,—তিনি হঠাৎ বলিলেন, "মেয়েদের গুণের বড়াই সবই জানা আছে। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাবার জন্য মেনকা—"

বাধা দিয়া নিরলা বলিল, "তাতে মেনকার কোন স্বার্থই ছিল না জামাই বাবু,—ছিল স্বার্থপ'র ইন্দ্রের নীচ ঈর্ষা। ইন্দ্র যত ডিগ্রী সাধনের জোরে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিল, বিশ্বামিত্রের সাধনার ডিগ্রী তার ওপরে যাচ্ছে দেখে না,— ইন্দ্র মেনকার ওপর হুকুমজারী করে বসেন? মেনকা পরাধীনা তার স্বাধীনতা থাকলে সে কি করত বলা যায় না, এ ক্ষেত্রে কিন্তু পরাধীন ভাবেই সে আসরে নেমেছিল। তাব পর পবন দেবতার বজ্জাতির কথা মনে করুন। কিন্তু আপনাদের বিচার এম্নি চমৎকার যে কেলেঙ্কারীটা আসলে করলেন যাঁবা তাদের নাম ধামাচাপা পড়ল কেননা তাঁরা পুরুষ। কিন্তু তাঁদের হুকুম তামিল করে,—তাঁদের স্বার্থের জন্য যে আত্মবলি দিয়ে মরল তার অখ্যাতি জগৎ জুড়ে রহিল, কেন না— সে মেয়ে মানুষ! রাবণের রাক্ষুসে বজ্জাতির কথাটাও তেমন তীব্র ভাবে আলোচিত হয়না, যেমন সীতার—ধর্ম্মের খাতিরে গণ্ডির বাহিরে পা বাড়ানোব কথাটার ছল খোঁজা হয়। উঠুন বড়দি—ওষুধ খান।" হঠাৎ প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীকে জাগাইয়া তরুণী ঔষধ খাওয়াইতে ব্যস্ত হইল। জামাইবাবুর কোন মন্তব্য শুনিবার অপেক্ষা করিল না।

জামাইবাবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দুজনে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা হইল। ঔষধ খাইয়া প্রৌঢ়া গায়ে ঢাকা দিয়া জড়সড় হইয়া শুইলেন। তরুণী হাই তুলিয়া বলিল, "জামাইবাবু, বাঙ্কে উঠে ঘুমের চেষ্টা দেখুন না।"—

মস্ত জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ় হতাশ ভাবে বলিলেন "আর ঘুম। আজ একমাস ঘুম কাকে বলে জানি না। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি মারা গেছে। আহা, মেয়ে গুলো যদি যেত, তার বদলে।"

"সে কি! আপনার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও মারা গেছেন। মোটে চার বছর করেছেন নয়? আহা কি হয়েছিল।" "বহুদিন থেকে ভুগছিল। দ্বিতীয় মেয়েটা হবার পর থেকেই সুতিকা ধরছিল,—তার ওপরেই ছোট মেয়েটা হল।" তরুণী বাধা দিয়া বলিল "তার ওপরই।"

প্রৌঢ় উগ্র বিরক্তি ভাবেই বলিলেন, "হাঁ-হাঁ ভগবানের দেওয়া। মানুষের ত হাত নয়। না হলে বারণ করতুম। ওই মুখপোড়া মেয়ে তিনটির জন্যই সে অসময়ে মারা গেল। তরুণী অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "বটে। তার পর,— ছোট মেয়েটি কত বড়?"

"তা মাস ছয়েক এর হবে। সেও আজ মরে কাল মরে, পুঁয়ে পাওয়া চেহারা। মরে ত আপদ যায়, তা মরছে না ত।"

"অন্যায়!—আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধাও বটে, তাকে মানুষ করছে কে?" তাচ্ছিল্যভরে প্রৌঢ় বিরক্ত স্বরে বলিলেন "কে আর করবে? ওর বোনগুলোই করছে।"

"তারা ও ত বাচ্ছা! কচি বোনটাকে সামলাতে পারে?"

"না পারলে চলবে কেন?" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন। যেন তরুণীর প্রশ্নটা ভয়ানক নীতি বিগর্হিত, ভীষণ অমঙ্গল দুষ্টা সুতরাং তার উত্তরটা কঠিন শাস্তিযুক্ত না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে। অতএব রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তোমরা কেউ এসে মানুষ করবে কি? তার দিকে কেউ এগোয় না। একটা বিধবা শালী ছিল, —তাকে বললুম? সে বললে চরকা কেটে দিন গুজরান করছি—ছেলে মানুষ করতে পারব না।" একটু থামিয়া অধিকতর উত্তেজিত ভাবে তিনি তীব্র শ্লেষভরে পুনশ্চ বলিলেন, "সব আপ্ত সয়ালীর দল! বুঝেছ মেয়েগুলো সব আপ্ত সয়ালী। ওদের জুতোর তলায় পিষে রাখাই ঠিক,—না হলেই ওরা উচ্ছন্নে যায়।"

দুই

তরুণী স্তব্ধ।

জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রৌঢ় সশব্দে "হ্যাক থুঃ" করিয়া থুতু ফেলিলেন। মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো! দুচক্ষে দেখতে পারি না, এ সব ফ্যাশান। লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ দেখলে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল অর্থাৎ—"আমায় দেখে আপনার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।—আর সেই রাগের ঝালটা এম্নিভাবেই নানা ছুতোয় বর্ষণ করছেন। বুঝতে পারছি সব জামাইবাবু। এ সবের জবাব স্পষ্ট করে সত্যি কথায় বলতে হলে,—সকলের আগে বলতে হয়,— হেথা দুষ্টু সরস্বতী, খানিকক্ষণের জন্য দয়া করে কাঁধে ভর দাও। যেন মিথ্যা আর ভণ্ডামির অত্যাচারকে একহাত ঠুকতে পারি, যা, এইটুকু কর।"—

প্রৌঢ়ের দু চক্ষু কপালে উঠিল। হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "নিরু! তোমায় হতে দেখেছি আমি জানো? গুরুজনদের সঙ্গে কি রকম করে কথা কইতে হয় সেটা শিক্ষা কোরো। গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বল।"

তরুণী স্মিতমুখে, বিনীত ভাবে বলিল, "দেখুন জামাইবাবু, রাগ করবেন না। সত্যের খাতিরে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি—কথাটা মনে রাখবেন। গুরুজনরা যদি নিজেদের গুরুত্ব-সম্মানটা বাঁচিয়ে চলতে না জানেন, তা হলে কোন লঘুজনের ঠাকুর্দ্দারি ও সাধ্যি নেই,—তাঁর সম্মান বাঁচিয়ে রাখে। অনেকক্ষণ থেকেই বসে বসে অনেক রকম ডেঁপোমি করছেন, চুপচাপ বসে বসে শুনছি সবই—"

"কি! ডেঁপোমি করছি?—"

"তবে কি বলব? ভণ্ডামি, না ন্যাকামি? কোন বিশেষ্যটা শুনলে আপনি খুসী হবেন বলুন, তাই বলছি। কিন্তু মাপ করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। ঝগড়া বা রাগারাগির চেষ্টা ছেড়ে দেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে যদি সত্য আলোচনায়

একটু এগিয়ে আসেন—তাহলে বড় বাধিত হই। আপনি শিক্ষিত লোক—আপনার শিক্ষার সম্মানটা একেবারে ভুলে গেছেন। এ কথাটা মনে করতে পারি না। পারি কি?"

জামাইবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "অত ভনিতার দরকার কি? মেয়েদের বেশী জ্যাঠামো আমি বরদাস্ত করতে পারি না জানো? ও সব আস্পর্দ্ধা দেখে আমার ইচ্ছা করে, পা থেকে জুতো খুলে পটাং পটাং বসিয়ে দিই!—"

"বাহবা! বাহবা! এমন না হলে ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রীর বাহার খোলে। বা জামাইবাবু! দিন আপনার পা দুখানা এগিয়ে-পেন্নাম করে একটু পায়ের ধুলো নিই।"—তরুণী সত্য-সত্যই গল-বস্ত্রে হেঁট হইয়া ভদ্রলোকটির পায়ের কাছে টিপ করিয়া মাথা ঠুকিল; সবিদ্রূপ হাস্যে বলিল, "নিন, জুতা খুলুন, পায়ের ধুলো নিই।"

অটল গাম্ভীর্য্যে উত্তর হইল, "তোমার ভক্তি থাকে নিজ হাতে জুতা খুলে পার ধূলো নাও।

"তা হলে ভক্তির মাত্রা হ্রাস করে হাত গুটোতে হচ্ছে!"—শ্লেষ ভরে প্রশ্ন হইল, "কেন? গুরুজনদের পায়ে হাত দিলে তোমার জাত যাবে?"

"আজ্ঞে না। আপনি আমার পূজনীয় গুরুজন সেটা সত্যি! তা বলে আপনার জুতোটাও যে আমার পূজনীয় গুরুজন একথা মনে করা যায় না। বিশেষ, আপনার ঐ জুতোর তলায় কুটে রোগীর রক্ত পুঁজ-মিশানো ধুলো থেকে সুরু করে রাজ্যের সমস্ত নোংরামির বিষ জমা হয়ে রয়েছে। আপনার ওপর ভক্তি দেখাতে গিয়ে—ও বিষকে দুহাতে তুলে ভক্তি ভরে মাথায় স্থাপন করলে আমার কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ ঘটাই বেশী সম্ভব। আপনাকে তাতে সম্মানের নামে অপমান করাই হয়। নয় কি?"

কদর্য্য মুখ-ভঙ্গী করিয়া দাঁত খিঁচাইয়া মান্যবর জামাই বাবু ভেঙচাইয়া বলিলেন, "নয় কি? অ-হ্-হ্! কি কথাই বললেন। আমার অপমান! আমার অপমান কিসে হবে শুনি? আমি পুরুষ মানুষ! আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে ....।"

অতি অশ্লীল ইতর ভাষায় তিনি এমন কদর্য্য উক্তি উচ্চারণ করিলেন, যা ভদ্র-সমাজে অকথ্য! তরুণীর আপাদ মস্তকে উগ্র-বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা বহিয়া গেল। রুগ্না, নিদ্রাচ্ছন্না শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ তীরবেগে উঠিয়া বসিলেন! তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "শিক্ষিত ভদ্রলোক না কি আপনি? কেমনই যে আপনার শিক্ষা, কেমনই যে আপনার ভদ্রতা,—বুঝতে পারছি নে! নেমে যান গাড়ী থেকে, নামুন এখুনি!—ইতর সমাজে গিয়ে আপনার ইতরামো প্রকাশ করুণ গে, যথেষ্ট আদর লাভ কববেন।"

উঞ্ছ-প্রবৃত্তি শৃগালের অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বচাতুর্য্য-আস্ফালন যেন অকস্মাৎ-কোন তেজস্বিনী সিংহিনীর দৃপ্ত হুঙ্কারে-স্তব্ধ হইল! মাথা হেঁট করিয়া জামাই বাবু হঠাৎ নিস্পন্দ হইলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তরুণী বলিল "জামাইবাবু, গুরুজন আপনি সত্যিই। কিন্তু আপনার এই নীচতা আমাকে কতটা আঘাত দিলে, বলতে পারছি নে। ছিঃ এত জঘন্য ইতর অন্তঃকরণ আপনার। ইতর কাপুরুষদর্পের নাম আপনাদের কাছে "পৌরুষ'? আপনার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল না নিজেকে এতটা অপমান করতে?"

জড়িত স্বরে, তোৎলাইয়া তোৎলাইয়া জামাইবাবু বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে বলিলেন "কথাটা .... কথাটা .... ঠাট্টা মাত্র। ঠাট্টা .... সিন্‌সিয়ারলি বলছি .... কিছু মনে করবেন না। মাপ করুন আমায়"— একটু থামিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নিরুর বড় বোন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী—"

বাধা দিয়া নিরলা—অর্থাৎ তরুণী—বলিল, "তার জন্য আমার মাথাটা আপনি এমন করে কিনে রাখেন নি, যাতে আমার চোদ্দ পুরুয উদ্ধার করবার মত 'বোল' ঝাড়তে পারেন। অপ্রিয় সত্যকে চেপে যাওয়াই মঙ্গল। দুঃখময় অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আত্মীয়তা সম্পর্কের দম্ভটা যখন বড় দম্ভভাবেই উচ্চারণ করলেন,—তখন বড় দুঃখেই স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি জামাই বাবু,—সম্পর্কটা মনে আছে, আর সে সম্পর্ক-দম্ভের শাস্তি লাঞ্ছনাটা চিরদিন খুব ভাল করেই মনে থাকবে।"

যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইয়া পরমনিরীহ ভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "কেন? কিসের শাস্তি লাঞ্ছনা?"

ম্লান বেদনার হাসি হাসিয়া তরুণী বলিল, "আর সে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? আপনার অনুগ্রহে আমার বাপ মার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারটা বহুদিনই হয়ে গেছে। বাপ মাও আজ স্বর্গে। দিদিও আপনার পাশব নির্যাতনের অনুগ্রহে অকালে দেহরক্ষা করে বেঁচেছে।—কার জন্যে বলব, আর—"

চোখ লাল করিয়া জামাইবাবু ধমকাইয়া বলিলেন, "কি? পাশব নির্য্যাতন? জানো, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটায় পশুভাবের কথা আসতেই পারে না।—হিন্দুর ঘরে সেটা পবিত্র দেবভাব পূর্ণ!"

বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন "শুধু পবিত্র নয়, অতি পবিত্র, সুন্দর—আদর্শ, স্বর্গীয় গৌরব পূর্ণ—মহা পবিত্রদেবভাব, একটু অনাধিকার চর্চা করতে বাধ্য হচ্ছি। ক্ষমা করবেন আমায়। আপনাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যা নির্লজ্জ ভণ্ডামি শুরু করেছেন, অত নির্লজ্জতা সহ্য করা সম্ভব নয়। পবিত্র দেবভাবের নামে মস্ত জাঁক জমকের বক্তৃতা তো দিলেন।—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত পবিত্রতা জ্ঞানই যদি মনে আছে, এত দেব ভাবই যদি হিন্দুর ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে,—তা হলে কার্য্য ক্ষেত্রে তিন-তিন দফায় আপনি স্বয়ং কসাইয়ের ব্যবসা করলেন কেন?"

ব্যথিত স্বরে নিরলা বলিল, "কসাইয়ের ব্যবসা এর চাইতে ঢের ভাল বড়দি— ঢের ভাল। কসাইয়েরা দাম দিয়ে জানোয়ার কিনে এনে জবাই করে। কিন্তু এই যে বাংলার হতভাগা মেয়ে জবাই করবার ব্যবসা।—যে ব্যবসা বাংলার বাবার দল ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করে চালাচ্ছেন,—এ নৃশংস ব্যবসার তুলনা কোথাও নাই। বাংলার বাবাদের বুক হাতুড়ীর ঠোক্করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে,—প্রতিদিন হাজার হাতুড়ীর ঘা সে বুকে বাজছে,—কিন্তু এমন অগাধ আলস্যপরায়ণ, উদার ধর্ম্মশীল "বাবার দল" আর কোন দেশে নাই। ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্মের অত্যাচার আর কোনখানে এমন অবাধে চলে নি। যেমন বাংলার বাবারা চালিয়েছেন। না জামাইবাবু আপনাকে আমি কিছু দোষ দিচ্ছিনে— কিসের দোষ আপনার?

লাথির উপর লাথি, ঝাঁটার ওপর ঝাঁটা, জুতোর ওপব জুতো বর্ষণে, করায়ত্ত অসহায় দুর্ব্বল নারীর ওপর নৃশংস শাসন ক্ষমতা প্রচারের নাম যদি দেবত্ব মহিমা হয়, তবে একবার কেন, এক লাখবার আপনি, দেবতা— আপনাদের এ দেবত্ব, এ হেন স্বর্গীয় দেবভাব .....'' নিদারুণ যন্ত্রণা নিষ্পেষণে নিরলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ঠোঁটে তার অসাধরণ সংযমশীল পরিহাসের হাসি এখনও জাগিতেছিল—কিন্তু চোখ দিয়া উচ্ছল উচ্ছ্বাসে সহসা দরদর জলস্রোত বহিয়া সে হাসির উপর ঢেউ খেলিয়া গেল।

চট করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জল মুছিয়া সে আবার সোজা হইয়া বসিল। অনুত্তেজিত ধীর কণ্ঠে বলিল, ''জামাইবাবু, বুঝি সব জানি সব- কিন্তু আছি বোকা হয়ে! জানি নে কি জামাইবাবু, যেখানে আপনার মত মহৎ, উন্নত রুচি-সম্পন্ন, মহাপৌরুষমন্ত্র, বীরের দল দাঁড়িয়ে আছেন—সেখানে আপনাদেব মা বোন স্ত্রী কন্যার সম্বন্ধে—সমস্ত ন্যায় জুতার তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে সত্যি সত্যিই কুলটাদের মূল্য আছে , কুলবালার মূল্য নাই, ভদ্র, মহৎ, স্বাধীন, উদার, পূজার্হ দেবতা আপনারা। আপনাদেব ঘরে পবিত্র দেবভাব সেই লাথি-ঝাঁটা-জুতোর সম্বন্ধটার মধ্যে পশুভাবের গন্ধ আছে বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে-রাগে আপনাদের চোখ লাল হয়ে উঠবে বৈকি? কিন্তু যখন আমার বড় বোন ঐ পবিত্র দেবভাবের মাহাত্ম্যে সিফিলসের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ল। পবিত্র দেব-ভাবের মহত্ত্ব হানির অজুহাতে যখন তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করার মত যন্ত্রণায় মাসের পর মাস ধরে দু দুটি বছর ভুগিয়ে মাবা হোল তখন? না দেবতা আপনি সত্যিই। এই তো নির্জলা দেবত্বের আদর্শ। পৃথিবীর কোন দেশ এ আদর্শের জুড়িদার আদর্শ দিতে পাববে না।—তার পর,— আরও একটু বলছি, অতিশয় ক্লেশের সঙ্গেই বলছি, —আমার দিদি আপনাকে জ্যান্ত দেবতা বলেই মনে করতেন, সেটা সত্যি। আপনাদের ভণ্ডামির সম্মোহন মন্ত্রে তিনি এমন নিখুঁত দীক্ষালাভ করেছিলেন, যে আপনার সমস্ত পশুত্ব অন্যায় তাঁর চোখে ন্যায় ছিল। এমন ন্যায় যে আপনি আপনাব ভাজ ভাইপো— সেই নাবালক আর বিধবাদের গ্রাসাছাদনের উপায়টুকু জাল জোচ্চুরির সাহায্যে ঠকিয়ে নিলেন। দিদি আমার সেটাও দেবত্ব বলে অকপট চিত্তে মেনে নিলেন। এবং সেই সূত্রে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে আপনার পক্ষ সমর্থন করে এলেন, আদর্শ সহধর্ম্মিণী তিনি সন্দেহ নেই। তা পর সে সম্পত্তি আপনি যখন বদমাইসিতে ফুঁকে দিলেন, তখন দিদি সেটাও দেবলীলা মেনে নিলেন; এবং পাতিব্রত্যের মহিমা প্রচাব করবার জন্য, না-না ভুল হোল আপনার ঐ দেবভাবের মহিমা বলেই আপনার কুৎসিত ব্যাধির অংশ ভাগিনী হোলেন, পুরুষ আপনি স্বাধীন! পয়সার থলি আপনার নিজের হাতে! তাতে আপনি স্বযং দেবতা, আপনি নিজের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী? না, -- সে স্ত্রীলোক পরাধীনা; তার অর্থ-সঙ্গতিহীনা, আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশী। তার ওপর দেবতার সহধর্ম্মিনী ''দাসী'' সে। সুতরাং তার চিকিৎসার কথাটা কেউ মুখে আনলেও না। সে যখন বিছানায় পড়ে শুষছে, তখন অন্য স্ত্রী সংগ্রহের সশব্দ আয়োজন উৎসব শুরু হয়ে গেল। সে শুনতে পেয়ে গভীর বেদনা ভরে কাঁদলে! মুর্খ সে। বুঝলে না, দেবভাবের চরমোৎকর্ষ ফলই

ফলছে। এ মধুরোজ্জ্বল দেবত্ব, এ মহামহিম দেবভাব,—এই পশুভাবপূর্ণ প্রকাণ্ড পৃথিবীটার আর কোথাও নাই, যা আছে শুধু আপনাদের ঘরেই। ঠিক কথা।"

ঝাঁ ঝাঁ শব্দে গোটাকতক ষ্টেশন পার হইয়া, গাড়ী সেই সময় আর একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। অপ্রসন্ন মুখে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে জামাইবাবু মরিয়া রকমের এক লাফ দিলেন দুয়ার ঠেলিয়া দ্রত নামিয়া পড়িলেন। কোন সৌজন্যের খাতিরে বিদায় সম্ভাষণ সূচক একটা শব্দও উচ্চারণ করিলেন না।

তিন

জামাইবাবু প্লাটফরমে পা দেওয়া মাত্র সহসা পিছন হইতে আর এক প্রৌঢ় আসিয়া তাঁর কাঁধ ধরিলেন সহাস্যে বলিলেন, "কিহে অনিল বাবু যে! দাঁত বাঁধিয়ে চুলে কলপ লাগিয়ে, দানাপুর যাওয়া হয়েছিল চতুর্থ পক্ষ ঠিক হোল দাদা? কবে বিয়ের দিন?

তীরবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরায় ভিতর একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, জামাইবাবু প্রায় তার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখানো অমৃত!—সাত ঝ্যাঁটা মেরো এই লেখাপড়া জানা মেয়ে মানুষের মুখে।" ঈষৎ হাসিয়া অমৃত বাবু বলিলেন, "তার চাইতে এক ঘুসিতে তোমার বাঁধানো দাঁতগুলোর বংশ ধ্বংস করেই ফেলি না! ইউনিভার্সিটির আহাম্মক্, বিয়ের বাজারে মোটা ঘুস খাবার জন্যে বি-এ, পাশ করে কি সেই আদিম বর্ব্বরতা— তোমার মধুর জানোয়ারত্বটা এক ইঞ্চিও ছাড়তে পারনি দাদা, লজ্জা করে না তোমার?"

তৃতীয় শ্রেণীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দুহাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া, হাসিমুখে তরুণী বলিল "নাতির গলার আওয়াজ যে! কি বলছেন বাবাজি? ওঁর লজ্জা করে কিনা জানতে চাইছেন? না, না, না! লজ্জা কিসের? নির্লজ্জ ইতর বর্ব্বরতা প্রকাশের নামই যে এদেশের বাজারে "পৌরুষ প্রকাশ।"

গর্জ্জিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "কি! নিরু! —তুমি আমার সাক্ষাতে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করছ? এই তোমার শিক্ষা? দাঁড়াও তোমার আত্মীয়দের কাছে তোমার বিদ্যের পরিচয় জানাচ্ছি। এই সব খ্যামটাউলীপনা করবার জন্য তোমাদের শিক্ষে চাই, স্বাধীনতা চাই, কেমন?"

প্রৌঢ় অমৃত বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন দিদিমা, ভদ্রলোকটি আপনার কোন আত্মীয় হন কি?"

তরুণী হাসিমুখে বলিল "নিশ্চয়! আত্মীয় না হলে এমন জেল কিপারের শাসন গৌরব কেউ দেখাতে পারে কি? উনি আমার বড় ভগিনীপতি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় বড় বোনটি আজ দশবছর হল দেহত্যাগ করে, ওর হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।"

"তা হলে একটু কুকুর শাসন করব না কি?"

হঠাৎ ট্রেন ছাড়িল। অমৃত বাবু, জামাইবাবুর মতামতের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর উঠিলেন।

তরুণী জিনিসপত্র সরাইয়া তাঁহাদের স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—অমৃতবাবু বাধা দিলেন। নিজ হাতেই জিনিস পত্র সরাইয়া জামাই বাবুকে পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই যে বড় দিদিমাও রয়েছেন। নমস্কার আজ মার চিঠিতে আপনার অসুখের খবর পেলুম। এখন একটু ভাল আছেন তো।"

সংক্ষেপেই উভয়পক্ষে কুশল বিনিময় হইল। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী স্মিতমুখে বলিলেন, "মাঝ রাস্তায় হঠাৎ আপনার দেখা পাব, জানতুম না। কোথা যাচ্ছেন?"

অমৃত বাবু বলিলেন "কলকাতা। পর্শু নাগাদ এলাহবাদে ফিরব। আমার মা কেমন গিন্নিপনা করছে বলুন দেখি।"

হাসিয়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "খুব। এই সব মোটঘাট বাঁধা ছাঁদা থেকে সুরু করে গাড়ী ডাকিয়ে আমাদের বিদেয় করা পর্যন্ত, সব কর্ত্তৃত্বই তার হাতে। আপনার ম্যানেজার মশাইকে সঙ্গে দিলেন, তিনি টিকিট করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।"

নিরলা স্নেহময় স্বরে বলিল, "সার্থক মা পেয়েছেন আপনি! শিক্ষিত পিতা ঢের আছেন; কিন্তু মেয়েকে এমন শিক্ষায় গড়ে তুলতে মনোযোগ খরচ করবেন,—এমন সা-খরচে পিতা এ দেশে খুব কম। আপনার মত একটি পিতার মুখ দেখতে পেলেও আনন্দ গৌরবে আমাদের বুক দশহাত হয়ে ওঠে বাবা।

আর্দ্রকণ্ঠে অমৃতবাবু বলিলেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন মা—আমার 'মা' টাকে আমি যেন জগতের মা হবার যোগ্যতায় গড়ে রেখে যেতে পারি। এই অধঃপতিত দেশে মাতৃশক্তির যে লাঞ্ছনা ঘটছে তার বিরুদ্ধে আমার মা-টাকে যেন মূর্ত্ত তিরস্কারের মতই উদ্যত বজ্রের মতোই —উগ্র কঠিন হয়ে দাঁড়াতে দেখি। লক্ষ্মী ছাড়া দেশ। লক্ষ্মী—শক্তিকে নির্য্যাতন করে তুমি লক্ষ্মী শ্রী লাভ করবে? ভগবানের বিচার এতই বেহিসেবী ভেবেছ?"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হাঁ—এদেশ তাই ভেবে রেখেছ। এদের বিচারে তাই ভগবান শুধু বেহিসেবী নন তিনি রীতিমতই ভণ্ড, জোচ্চর, প্রতারক। এদের সুখ সম্পদ ভোগের অধিকারটা ভগবান শুধু জোচ্চুরি করে কেড়ে নিয়েছেন, তা নয় তিনি নেহাৎ শয়তানী করেই এদের শক্তিগুলো চুরি করে নিয়েছেন! নইলে—শক্তি থাকলে এরা, মানুষ গুলোর—অর্থাৎ 'মানুষ' বলতে যাদের বোঝায়—তাদের মাথা হাতে কাটত।"

তরুণী হাসিল বেদনা ভরে, বলিল "বড় দুঃখ হয় বাস্তবিকই এ দেশের মানুষের মন বুদ্ধি হৃদয়কে বিচার করতে গেলে, বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখেই আমাদের প্রাণটা পিষে যায়। ছিঃ এদের বিচার বুদ্ধি এত জঘন্য নীচ হয়ে পড়েছে। এত ইতরতা মানুষের। "সত্যঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ" শুনেছি বাবাজী;—কিন্তু কুপৌরুষ দম্ভ বলে, কদর্য্য মিথ্যাকে এমন নির্লজ্জ ইতরামোর সঙ্গে প্রচার করাও যে "সনাতন ধর্ম্ম,' তা জানতুম না।"

জামাইবাবু এতক্ষণ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতে ছিলেন। এবার হঠাৎ হাত পা ছুড়িয়া মহাক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "দ্যাখো নিরো! পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করবার জন্য যে তোমরা লেখাপড়া শিখেছ। তাও জানতুম না। কি খেয়াতিই

রাখ্‌লে তোমরা লেখাপড়া শিখে। ঐ এক জন। বুড়ী ....'' প্রৌঢ়ার উদ্দেশ্য তিনি কি বলিতে উদ্যত হইলেন মুহূর্ত্তে অমৃত বাবু উঠিয়া বিনাবাক্যে জামাইবাবু গলাটি টিপিয়া ধরিলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, ''জিভ সামালো! নইলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। কাপুরুষ, পশু, তোমার গুণের কাহিনী—আমি কি কিছু জানি নে? পীরের কাছে মামদো বাজী করতে এসেছ?''

জামাইবাবু গাঁক গাঁক শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—''ছাড় ছাড়?— তোমার পায়ে পড়ি গো।''

''এইবার পায়ে পড়ি! পথে এস।'' অমৃতবাবু গলা ছাড়িয়া দিলেন। উগ্রকণ্ঠে বলিলেন ''লম্পট ব্যাভিচারীর দল, ব্যাভিচারের দাস খতে নাম লিখিয়ে—মনুষ্যত্বকে দেউলে করে বসে আছ,—ছাগল ভেড়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছ,—আবার বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা সাজবার সখ। জানো না, তোমাদের ঘাড় ভাঙবার সিংহগুলো এখনো মরেনি সবাই? তোমাদের মূর্খতার অত্যাচার চুপ করে সয়ে যাই বলে বড়ই বাড় বাড়ন্ত হয়েছে, নয়?''

ফোঁশ ফোঁশ করিয়া হাঁপাইতে- হাঁপাইতে জামাই বাবু সক্রোধে বলিলেন, ''তোমায় আমি কিছু বলিনি, —তুমি কেন অপমান করলে? আমি মানহানির দাবীতে নালিশ করব।''

''এই মুহূর্তে করগে। এই নাও, আমি খরচ দিচ্চি,'' পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া জামাইবাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া, অমৃত বাবু বলিলেন, ''যাও মামলা রুজু করগে, আর যা খরচ লাগে জানিও, পরে দেব। আপাততঃ তিন শত্রু দিয়ে রাখলুম।''

চার

তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

মিনিট কতক সব চুপ চাপ।

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন ''বড় দুঃখিত হচ্ছি—'' বাধা দিয়া অমৃত বাবু ধীর ভাবে বলিলেন, ''কিসের দুঃখ? মানুষকে সম্মান করার নামে, মানুষের ইৎরামো ব্যাধিকে আমি পূজা করি নি বলে? ভুল আপনাদের। মারাত্মক ভুল এই—মানুষকে খাতির করার নামে মানুষের মনুষ্যত্ব-গ্লানিকে খাতির করা।''

''কে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝেছে বলুন? মাঝ খান থেকে এই কথাটা দাঁড়াবে, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বের মাঝে একটা অপ্রিয় বিচ্ছেদ।''

হাসিয়া অমৃতবাবু বলিলেন ''এই কৃষ্ণের জীবটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে,—চিরকাল থাকবেও—আমি এটুকু অন্তত মনে জানি। কিন্তু ওঁর অন্যায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোন কালেই ছিল না। কোন কালেই থাকবে না। সেই অন্যায়টার আমি গলা টিপে ধরেছি মাত্র, বন্ধুকে কিন্তু আমি চিরদিন যেমন ভালবেসেছি—এখনো তেমনি ভালবাসছি।

উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া জামাই বাবু বলিলেন, ''যাও যাও, ঢের হয়েছে তোমাব ভালবাসাও আমার দরকার নেই। তোমার বন্ধুত্বেও আমার কাজ নেই। অসময়ে তুমি একদিন আমার ঢের উপকার করেছিলে, আজ তার শোধ নিলে। যাও আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব দেনা পাওনা চুকল।

হাসিমুখে অমৃতবাবু বলিলেন, "মনে কোরনা সেটি। তোমার প্রকৃতির ব্যাধি,—তোমার অন্যায়, তোমার নীচতা তোমার জঘন্য ঈর্ষাকে তুমি যতক্ষণ না ছাড়ছ ততক্ষণ আমার পাওনা শোধ হবার নয়। ভূতের ওঝারা রোগীকে পিটিয়ে ভূত তাড়ায়, জানো বোধ হয়? —বন্ধু তুমি! ভূতের হাতে তুমি মরবে, এটা সহ্য করা যায় না। বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য বন্ধুর ঘাড়ের ভূতকে আমি—"

অমৃত বাবু হাসিমুখে থামিলেন। নিরলা সহাস্যে বলিল "কথাটা শেষ করেই ফেলুন না।"

"ও-কথা—শুধু কথায়' শেষ করলে ত হবে না দিদিমা, —ওর জন্য কাজ চাই যথেষ্ট, আপনারা যা দিদিমার দল, —আপনাদের এই কুসন্তান কুপৌত্র কুদৌহিত্র গুলোকে সায়েস্তা করবার কাজে লাগুন দেখি।— দেশটার একটা মহৎ উপকার হয় তা' হলে।"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হয়েছে তা' হলেই! মা সরস্বতীর মন্দিরের ধুলো মাথায় তুলে নিলে, যে দেশের মেয়েদের জাতধর্ম্ম রসাতলে যায়, ইতরামি আর মূর্খতার পূজায় আত্মনিবেদন না করলে যে দেশের মেয়েরা 'দেবী' হতে পারে না— সেই দেশের মেয়ে হয়ে আমরা ওসব কাজ করব। ব্যবস্থা খুব ভাল বটে, কিন্তু অবস্থা আমাদের কি হয়ে রয়েছে, চেয়ে দেখছেন কি? ঐ যে এক ভগবানের জীব আপনার পাশে বসে রয়েছেন,—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, নারীর বিশেষত্ব কি?—ক্ষমা করবেন আমায়—" তিনি মুদ্রিত চক্ষে নতশিরে নমস্কার করিয়া বলিলেন "তিক্ত কঠোর সত্য আমি প্রকাশ করছি, মার্জ্জনা করবেন আপনাদের এই দুর্ভাগা মায়ের অপরাধ!—নারী আজ ওঁদের বিচারে কি হয়ে দাঁড়িয়েছে জানেন? শুধু দেহেন্দ্রিয় মাত্র। এই ইতর দেহেন্দ্রিয়গত সংজ্ঞা ছাড়া নারীর আর কোন অস্তিত্ব, কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন মৌলিকতা নাই। শরীর, মনঃ শক্তি ওদের বিচারে মনুষ্যত্বহীন, নারীর বুদ্ধিমত্তা ওঁদের কাছে ধোবার বোঝা বহনকারী গাধা মাত্র, নারীর আত্মাকে জুতোর চাপে পিষে গুঁড়ো করাই ওঁদের কাছে মহা পৌরুষের পরিচয়।

কারণ কি জানেন? ওঁরা অন্নবস্ত্রের মূল্যে নারীর হৃদয়ে মন বুদ্ধি আত্মার সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্বাধীনতা কিনে নিয়েছেন, শুধু অন্নবস্ত্রের ঋণে এ-দেশের নারী শক্তি 'দেউলে' হয়ে গেছে—এই তাদের প্রকৃত অবস্থা"

অমৃতবাবু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বলেছেন। এক বর্ণও অত্যুক্তি নয়। এই অন্নবস্ত্রের ঋণকে যে নারী এড়িয়ে চলেছেন, তিনি সমাজের বিচারে সমাজচ্যুতা। কেন না যাকে হাতা মারবার বা ভাতে মারবার না থাকে তার ওপর অবাধ অত্যাচারটা চলে না, চলে শুধু কুৎসিত দুর্ব্বাক্যের অত্যাচার। কিন্তু এই প্রতারক, ভণ্ড নীচ, ক্রূরচেতা কাপুরুষদের বিধান শিরোধার্য্য করে চলবার দিন আর আপনাদের নাই মা। এ সমাজের কাছে সম্মান চাইবেন না। এ সমাজে কুক্কুরী শূকরীদের সম্মান আছে কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের জন্য এখানে আছে শুধু অবজ্ঞা। ঘৃণা, কুৎসা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন; আপনাদের অবস্থার পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করুন, ডাকুন আজ বজ্র নির্ঘোষে রুদ্র আহ্বানে নিজের অন্তরাত্মাকে,—আর দেশের অত্যাচার নিপীড়িত, নির্জ্জীব নারী

শক্তিকে বলুন—ওরে চিরলাঞ্ছিত, চিরপ্রতারিতের দল, তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষের কথাকে ভয় কবে মাথা নোয়াস নে। কথার অত্যাচারকে যতই ভয় করবি অত্যাচার ততই বেড়ে উঠবে; কেন না, এ দেশ শুধু কথার দেশ, এদেশ কাজ করতে জানে না। কিছু বুঝতে চায় না, শুধু নির্ভাবনায়- যা খুসী তাই কথা কইতে জানে। একথা গ্রাহ্য করবার নয়। তোরা ভয়কে আজ জয় করে নেবার জন্য প্রস্তুত হ, বিবেকের হাতে আত্মসমর্পণ করে, আজ তোরা মনুষ্যত্বের গ্লানিকর সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রুদ্রশক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়া, ভগবানের জাগ্রত রূপের পূজায় আজ তোরা আত্মোৎসর্গ কর।"

গাড়ী আর এক ষ্টেশনে ঢুকিল বাহিরে কুলির দল চীৎকার করিল, "আসানসোল, আসানসোল।

সকলে চমকিয়া উঠিল। কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই বাহিরে রাত্রির আঁধার কখন ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়াছে,—অজ্ঞাতেই কখন ভোরের আলো বাহিরের উদার, উন্মুক্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিযাছে। গাড়ীর বাতির আলো ম্লান করিয়া, দিনেব আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনজন বাহিরের আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিলেন। গাড়ীর গতি ধীরে থামিয়া গেল।

হঠাৎ সশব্দে গাড়ীর দুয়ার বন্ধ হইল। তিনজন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন জামাই বাবু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধান করিয়াছেন, খোলা দুয়ারটা একজন টিকিট কালেক্টর বন্ধ করিয়া দিতেছে।

অমৃতবাবু হাসিমুখে বলিলেন "ঐ যাঃ। চতুর্থ পক্ষেব নিমন্ত্রণটা চাওয়া হোল না যে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন "ও সব অভিশপ্ত নিমন্ত্রণের লোভ ছেড়ে দেন বাবা, ওগুলো ভদ্রলোকর ধাতে সহ্য হবে না।"

'ভাবতবর্ষ'—১৩২৯ পৌষ সংখ্যা

আত্মদান

শ্রীসুরুচিবালা রায়

'যমুনা—'

'বলুন—'

'বলছি কিন্তু তুমি একটু দাঁড়াও, অমন ছুটে ছুটে চলে গেলে কি কথা বলা হয়?

'আচ্ছা একটু বসুন—আমি বাবাকে ওষুদ খাইয়ে এখুনি আবার আসছি'।

কৃষ্ণপক্ষের কালো রাতটি। অদূরে রাস্তায় লাইট পোষ্ট হইতে মৃদু আলো আসিয়া, বারান্দা খানিকে একেবারে অন্ধকার হইতে দেয় নাই। বারান্দার ঠিক নীচেই রাস্তার ধারে লালফুলে ভরা সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছটি।

রাস্তাটি ছোট। মাঝে মাঝে দুই একটি কুলপীবরফওয়ালা, দুই চারিটা ছ্যাকড়া গাড়ী ও কদাচিৎ দুই এক জন লোক চলাফেরা করিতেছিল।

কিন্তু এ সব কোন কিছুরই দিকে শৈলেনের লক্ষ্য ছিল না, সে একাকী গম্ভীর ভাবে, কতকটা বিরক্ত চিত্তে বারাণ্ডায় পদচারণা করিতে করিতে যমুনার অপেক্ষা করিতে ছিল;—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যমুনা মেয়েটি। সে এই যে প্রত্যহ বিকালটী হইতেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, সভাসমিতি, ক্লাব এবং যেখানকার যত কিছু আনন্দ সকলই পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বাড়ীটায় আসিয়া বসিয়া থাকে, সে কি কেবলমাত্র এই রোগজীর্ণ নিতান্তই অক্ষম, অশক্ত এই দুটি বুড়ো-বুড়ির জন্য! যাহার জন্য এ ত্যাগ, সে কি কিছুই বোঝেনা? এই যে বছর দুই হইতে এই পরিবারের সঙ্গে ইহাব আলাপ ক্রমে ক্রমে এমন জমিয়া উঠিয়াছে, এমন করিয়া দিনে দিনে, ইহাদিগকে সে নানাভাবে কত আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছে, সে যে কেন, এবং কাহার জন্য, সে কথা ত কাহারও অজ্ঞাত নাই, কিন্তু যাহার জন্য এত সেই কেবল কিছু বোঝে না! আশ্চর্য্য ইহার ব্যবহার,—হাসিয়া কথা কয়, গল্প করে, পরদিন আসিতে অনুরোধও করে, কিন্তু তথাপি, —তথাপি—একি দুর্ব্বোধ্য এই মেয়েটির অন্তর! আশ্চর্য্য!—

এই যে— এসেছ যমুনা? এত দেরী করলে। বাবাকে ওষুদ খাওয়াতে কি এত দেরীই হয়। কেন তুমি মিথ্যে এমন ছল করে খালি খালি পালিয়ে বেড়াও যমুনা? শৈলেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে দুই হাতে যমুনার দুটি হাত চাপিয়া ধরিল।

'ছাড়ুন ছিঃ—ওকি,—'

তুমি আগে বল, কেন এত দেরী কর।'

'ছিঃ শৈলেন বাবু বাবার কাজ আগে, না আমার গল্প আগে;

আচ্ছাবেশ, কিন্তু কই, তুমি আমার সে কথার উত্তর দিলেনা।'

যমুনা মুখখানি নত করিয়া, একটু হাসিয়া, একটু দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'সে ত হবার নয়, আমি ত আর একদিনই বলেছি, কেন সে কথা ফের তুলছেন?'

শৈলেন উত্তেজিত হইয়া বলিল,—'কিন্তু কেন নয়? কেন আমি কিসে তোমার

অযোগ্য বল? না যমুনা, অমন করলে চলবেনা, আজ তোমায় বলতেই হবে সব।

যা কিছুতেই হবার নয়, কেন সে কথা নিয়ে আলোচনা? ও কথা থাক্, অন্য কথা কিছু কি নেই?'

'না, আমি আজ তোমার শেষ কথা শুনে যাব? বল, আমি কিসে তোমার অযোগ্য? ধন দৌলত, শিক্ষারূপ- যা কিছু বল,— তোমার যা আছে, আমার কি তা নেই? সমাজে তোমায় যেমন সহস্র লোক কামনা করছে,—আমাকে কি কোন কন্যার পিতা আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করছে না?—তবে কিসের জন্য আমায় তুমি বার বার এমন করে অপমান কর্‌বে?

যমুনা একটু হাসিয়া বলিল, 'সবই সত্যি, কিন্তু তবু হবার নয়, আজ দুবছর আপনাকে চিনি, আপনি মুখে অনেকবারই বলেছেন,—এবং সত্যি বোধ হয়, একটু আমায় ভালও বাসেন।—আমি আপনার এ ভালবাসার জন্য সব দিতে পারতাম, সে ইচ্ছা আমার মনেই কি একটুও ছিল না? সব দিতে পারতাম শৈলেন বাবু, কিন্তু তবু হবার নয়।'

শৈলেন হাসিয়া বলিল, 'একই কথা?'—

যমুনা দৃঢ়স্বরে বলিল,—'হ্যাঁ।'

তোমার এ কথা বলা শোভা পায় না যমুনা। কতটুকু মেয়ে তুমি, পণপ্রথাব তুমি কি বোঝ?'

যমুনা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ঠাট্টা নয়, আমার বাবা পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে পড়ে আছেন বলে, আজ তাঁর কিছু বলবার আর শক্তি নেই বলে কি তাঁর ভাববারও একটা ক্ষমতা নেই। তাঁর সামনেই আমায় পণ দিয়ে বিয়ে দেবার কথা হচ্ছে। মা কন্যাদায়েব জ্বালায় তা সইতে পারেন, কিন্তু আমার তো তা সইবেনা।'

যমুনা অতি মৃদু স্বরে, অতি সাধারণ ভাবে কথাগুলি বলিয়া গেল, কিন্তু তথাপি সেই স্বল্পালোকেই তাহার উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া, শৈলেনের বহুক্ষণ আর কোন কিছু কহিবার সাহস হইল না। মিনিট কয়েক নীরবেই কাটিযা গেলে যমুনা আবার একটু হাসিয়া বলিল, ''আরও একটা কারণ আছে শৈলেন বাবু —বাগ করবেন না, কিন্তু আপনি জানেন আমরা বাঙালী।''

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া শৈলেন বলিয়া উঠিল, 'বেশ আর আমরাই বা কোথাকার ইংরেজ?'

যমুনা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, ইংরেজ নাই বা হলেন, সাহেব তো! বাবারে, আপনার নেমন্তন্ন থাক্‌লে, আমরা, বিশেষতঃ মা ত ভয়েই মরেন, পাছে বা ক্লথটা টেবিলে পড়তে একটু বেঁকেই বুঝি গেল। কাঁটা চামচে কোনটা এগিযে দিতে কোন্‌টা বা দিই, তার পর সেদিন তো বাড়ীতে আর শাক, ভাত, ডাল, ঝোল হবার যো নেই, চপ্‌ কাটলেট, পুডিং করতেই সব ব্যস্ত; মারই একটু বেশী ভয, মেয়ের বিয়ে দেবেন কিনা! পাছে বা কোন কিছুতে একটু ভুল হলে আপনার বাগ হয়।'

শৈলেন আহত হইয়া বলিল, 'যমুনা তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু যদি বুঝতে—'

যমুনা বলিল, 'না দেখুন, এই দুই বছর ধরে কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারলুম না, এই কাঁটা চাম্‌চে না ধরলে কেনই বা খাওয়া হয় না? আর দেখুন, ওতে খেলে সত্যি পেট ভরে তো?'

শৈলেন করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'দয়া কর যমুনা, আর মোটে কুড়ি মিনিট সময়; মিছে সময়টা নষ্ট করে দিয়ো না, একটু গম্ভীর হয়ে, একটু ভেবে, সত্যি কথাটি একবার বল, তোমার ও রকম হাসি, ওরকম ঠাট্টাতে আমি ভয় পাই!"

যমুনা বলিল, ' বেশ সে কথাও ত বলেছি, পুরুষের খেয়ালে পড়ে পণে আমি বিকোব না।'

শৈলেন খানিকক্ষণ নীরবে ভাবিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ' বেশ বাবার মত ফেরাবার চেষ্টা আমি করবো, কিন্তু যদি না-ই পারি যমুনা, এত নিষ্ঠুর হয়োনা, একটু দয়া করো।

যমুনার পরিহাস-তরল কণ্ঠ শৈলেনের কাতরতায় কোমল হইয়া আসিল, সে একটু সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'সত্যি, আমি বোধ হয় আপনার সঙ্গে একটু বেশী ফাজলামোই করি কিন্তু, আপনি তাই বলে কিছু মনে করবেন না।' শৈলেন আনন্দে একবারে গলিয়া গিয়া দুই হাতে যমুনার হাতদুটি আবার চাপিয়া ধরিল, তার পর অতি মৃদুস্বরে ধরা-ধরা গলায় বলিল, 'সেই সে দিনের কথা মনে পড়ে তোমার যমুনা? কি সুন্দর দেখেছিলাম নীল বারাণসীখানি পরা, কোঁকড়া চুলের ফ্রেমে আঁটা গোলাপী মুখখানি কি সুন্দর, হাতে একটি এসরাজ, কি সুন্দর যমুনা, কি সুন্দর তুমি! সে মূর্ত্তি তোমার আমি একদিনও ত ভুলিনি, এত সুন্দর তুমি যমুনা, এত সুন্দর!'

সেদিন শৈলেন চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ ধরিয়া যমুনার কাণে তাহার উচ্ছ্বসিত তরল স্বর বাহিতে লাগিল। খালি কি সুন্দর, কি সুন্দর!' বাস্তবিক সে কি এমনই সুন্দর? তাহার রূপ আছে সে তাহা জানে, কিন্তু সে রূপ কি সত্যি পুরুষকে কেবল পাগল করিয়া তোলে! যমুনা ধীরে উঠিয়া তাহার ছোট্ট ঘরখানিতে ঢুকিয়া দরজার পরদা টানিয়া দিল, তার পর আলো পাশে রাখিয়া আরসির সুমুখে যাইয়া দাঁড়াইল। তাইত, এত রূপ? আজ প্রথম যমুনার নিজের এই অনায়াসলব্ধ, তাহার চির-আদরের এই দেহভরা রূপের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল। ওগো পুরুষ, তুমি কি খালি এই রূপখানিই দেখিলে? ইহার অন্তরালে একটি বুভুক্ষু হৃদয় যে তাহার প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেটা কি কিছুই হইল না? আমার প্রাণের কথার চেয়ে, আমার দেহটাই কি এতবড় হইয়া গেল? আমার ইচ্ছা, আমার বাসনা বলিয়া কি কিছু একটা নাই? খালি রূপ, রূপই কি আমার সব? ওগো, ভাল ত আমিও বাসি, কিন্তু সে ত তোমার ঐ মূর্ত্তিকে নয়, আমি যে ভালবাসি তোমাকে!—

যমুনার দুই চক্ষু বহিয়া বেদনার উষ্ণবারি ঝরিতে লাগিল। হায় এত রূপ—এত রূপ সে কি করিবে? যে রূপ তাহাকে, তাহার মনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এক মূহূর্ত্তে কি সে রূপকে সে কালি করিয়া দিতে পারে না? হায় রে ভাগ্য!

২

বিকাল বেলা বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণের পর বাড়ী ফিরিয়াই যমুনা চঞ্চল হইয়া মাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'শৈলেনবাবু এসেছিলেন মা?'

মা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ '।

'এসেই চলে গেলেন?'

'ছিল ত খানিকক্ষণ; তুই বাড়ী নেই, কি করবে বসে থেকে?'

যমুনা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'মা কেন খামকা বাজে কথা বলছো? আমি আজ বাড়ী থাকবোনা বলেই ত তিনি এসেছিলেন, সে কথা কি আমি বুঝি না? তোমরা চুপি চুপি আমায় গোপন ক'রে, পণ দিয়েই আমার বিয়ে দেবার পরামর্শ করেছ। ছিঃ মা তোমার লজ্জা নেই?'

মা রাগ করিয়া বলিলেন, 'আমার কথার উপর তুই কথা বলতে আসিস নে যমুনা। কে বল্‌লে তোকে, পণ দেওয়া হচ্ছে? তোকে অর্দ্ধেকটা সম্পত্তি লিখে দিলেই শৈলেনের বাবা এ বিয়ে দিতে সম্মত আছেন।'

'আশ্চর্য্য কথা মা, আমরা বোন হলুম তিনটি, আর সম্পত্তি অর্দ্ধেকটা আমাব? কেন আমি কি বাবার ছেলে?'

'খালি ছেলেই কি বাপের সম্পত্তি পায়? মেয়ে কিছু নয়?'

'কেন মেয়ে কিছু হবে না? কিন্তু আমরা তিনটি বোনই ত মা, বাবার তিন মেয়ে; ওদের চেয়ে আমার অধিকার কেন বেশী হবে?'

'সে নিয়ে ওরা ঝগড়া করতে ত আসছে না! নিজেরা পছন্দ ক'বে, ইচ্ছে করে ওদের বিয়ে দিয়েছি, কোনদিন কোন কথাটি ওরা তাই নিয়ে কয় নি। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হয়েছ, নিজের ভাল তুমি নিজেই আমাদের চেয়ে বেশী বোঝ— বেশ যা ভাল বোঝ তাই করগে, আমি আর কিছু জানিনে।' মা গম্ভীব ভাবে নিজের কাজে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া কন্যার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বসিলেন।

যমুনা ম্লান মুখে হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু সত্যি আমি ভেবে পাইনে মা, শৈলেন বাবুর কি আমার এই টুকুন সম্পত্তিটা দেখেই এত লোভ যে, তাই নিয়ে চুপি চুপি আবার তোমায় ভোলাতে এসেছিলেন?'

'খামকা তুই মানুষকে ও দোষ দিসনে যমুনা। দায় শৈলেনের নয়, এ দায়, এ মহাদায় আমারি। আমিই মরতে ওকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলুম যদি এতেও বা বিয়েটা হয়ে যায়। তোর মত মেয়ে শৈলেনের ঢের জুটবে যমুনা, কিন্তু শৈলেনের মত এমনটি আমি আর কোথাও পাব না।'

যমুনা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ চাকরের হাতে শৈলেনকে এই মর্ম্মে একখানা কড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিল,—

'অন্ধ পিতৃভক্ত মনে করে, আপনার উপর এতদিন আমার অন্ততঃ করুণা টুকুও ছিল, কিন্তু আজ যা দেখলুম, এতদিন তা ত জানতুমনা, যে আপনি কপট, ছল! পুরুষ

মানুষ নিজের মনের উপর যার এতটুকু অধিকার নেই, এতটুকু আত্ম শ্রদ্ধা যার মনে নেই, আমরা কি করে তবে, তার উপর নির্ভর করতে পারি? আমার দিক দিয়ে, শুধু এইটুকু বলা বোধ হয় আমার অন্যায় হবে না যে, প্রতিদিনকার এই সব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থেকে চিরদিনের জন্য আপনাব কাছে আমি বিদায় চাই।'

৩

ছয় সাতমাস পরের কথা, পিতার মৃত্যুর পর, কলিকাতার সে প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া দিয়া, যমুনারা এখন কাশীতে। কন্যার প্রতি দারুণ একটা অভিমান বশতঃ মাতা সাংসারিক সকল বিষয়েই অত্যন্ত উদাসীন, কর্ম্মচারীদের অমনোযোগিতায় জমিদারীর দুই একটা মহাল নিলামে উঠিয়া গেল। প্রজার সঙ্গে কর্ম্মচাবীদের ছোট বড় মোকদ্দমা নিয়ত লাগিয়াই আছে। জমিদার গৃহিণী, স্বামীর অসুস্থতার জন্য যিনি পূর্বে জমিদারীর সমস্ত কাজ সর্ব্বদা স্বহস্তে করিতেন। এখন আর কোনও কথাতেই কথা কহেন না। কন্যাব সহিতও বিশেষ কোন কথা প্রায়ই তাঁহার হয়না। যে 'পণ প্রথা, পণপ্রথা' করিয়া এই অভাগা মেয়েটা, এতগুলি ভাল ভাল সম্বন্ধ আপনার জোরে ফিরাইয়া দিল, ইহাতে সংসারে কেবলমাত্র ইহাবই ক্ষতি ছাড়া আর কাহার কি হইল? হিন্দুর ঘরে যা কোন দিন, কোন কিছুতেই হওয়া সম্ভব পর নয়, এই একটা নিতান্ত তুচ্ছ মেয়ের বিবাহ না করাতেই কি তাহা সম্ভব হইল? এই যে শৈলেনের পিতা যমুনার জন্য পাঁচ হাজার টাকা হাঁকিয়াছিলেন, যমুনার সঙ্গে তাঁহার পুত্রের বিবাহ না হওয়াতেই কি তাঁহার কিছু ক্ষতি হইল? এইত মাসখানেকও হয় নাই, যমুনাদের প্রতিবেশী সুরেশবাবু সাত হাজার টাকা আর তাঁহার সুন্দরী কন্যা অণিমাকে ত শৈলেনেরই হস্তে সমর্পণ করিলেন! এ সব ভাবিতে গেলে মাতার চক্ষে জল আসিত। তার পর সোনাপুকুরের অনিল ঘোষ, বেশী কিছু নয়, মাত্র তিনটি হাজার! কিন্তু হায়রে দুরদৃষ্ট! যমুনার মা মেয়েদের শিক্ষার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেন. লেখাপড়া শিখিলেই কি মেয়েগুলি এমন নির্লজ্জ বেহায়া হইয়া পড়ে? এই তিন হাজার, পাঁচ হাজার, কিম্বা দশ হাজার দিতেও ত তাঁহার এতটুকু ক্ষতি হইত না। আর দিনের পর দিন যে, হিন্দুর সংসারে এই মেয়ের বিবাহেই পিতারা ভিটেমাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া পথে আসিযা দাঁড়াইতেছে, তারাও তা ঘরে আইবুড়ো মেয়ে ধরিয়া রাখেনা। তাঁহাদের তুলনায়ও যমুনাব মাতা আপনাকে দুঃখী মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যার যে কি হইবে সে কথা তিনি কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই বারাণসী পুণ্যভূমি, হিন্দুর কাশী, এখানে আসিয়াও তাঁহার যত কিছু দান ধ্যান, তাঁহার পূজা উপাসনা, কন্যার ভাবনার নীচেই পড়িয়া রহিল।

যমুনাও মাতার এ ভাবনা কিছু বুঝিতে পারিত না, তাহা নহে, কিন্তু বাস্তবিক সংসারের উপর অভিমান, তাহারও আসিয়াছিল। তাহার এত শিক্ষা, এমন জ্ঞান, তাহার মন, তাহার হৃদয়—পুরুষমানুষ কি এ সব কিছু চাহেনা? তাহার কি একমাত্র প্রয়োজন বধূর রূপ এবং তাহার পিতৃরক্ত শোষণকারী অর্থ? ছিঃ—

৪

যমুনার আর খাটুনীর বিরাম নাই। পীড়িতা মাতার রোগশয্যা হইতে সে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠিয়া যাইতে পারে না, মাতারও যত কিছু অভিমান এবং বিরক্তি সকলই কন্যার এই সেবাকুশলতায় আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ মনে হয়, ভাগ্যে যমুনার বিবাহ হয় নাই। নতুবা এ মৃত্যুশয্যায় তাঁহার ঠোঁটে একফোঁটা জল দেবার ত আর কেউ ছিল না! অন্যদুই মেয়ে কই শ্বশুর বাড়ীর দৃঢ় কঠিন পরিখা ভেদ করিয়া তাহারা ত আজ মায়ের মৃত্যু শয্যায় আসিয়া একটীবারও দাঁড়াইতে পারিল না! কিন্তু তথাপি, তথাপি তাহার এ চোখ দুটি যখন মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে বন্ধ হইয়া আসিবে, তখন এ প্রকাণ্ড শূন্য পুরীতে অভাগিনীর কি হইবে? দুর্ব্বল মস্তিষ্কে মাতার যখন আর ভাবিবার ক্ষমতা থাকেনা। তখনই করযোড়ে তাঁহার এ ভাবনা বিশ্বেশ্বরের পায়ে নিবেদন করিয়া দেন।

মাতার রোগ শয্যায় যমুনা আর একজনের সহায়তা পাইতে ছিল, সে তাহারই মাতুলালয়ে আশ্রিত একটী দীনহীন কাঙ্গাল যুবক। সংসারের অনেক বেদনা সহ্য কবিয়া তরুণ যুবক সুধীর উদাস প্রাণে কাশীতে আসিয়া সেবাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। যমুনার মাকে সুধীর পিসীমা বলিয়া ডাকিত। কাশীতে আসিয়া প্রথম যখন যমুনার সঙ্গে সুধীরের পরিচয় হয়, তখনকার একদিনের ঘটনা সর্ব্বদা মনে হইত। মাতা ও কন্যা সন্ধ্যার সময় সে দিন সুধীরের সঙ্গে গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা একস্থানে গোলমাল দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে একটু পিছনে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। জনতার ভিতর হইতে একটা করুণ ক্রন্দন অস্পষ্ট ভাবে বাহির হইয়া আসিতেছিল। ব্যাপাব দেখিয়া সুধীর তাহার পাঞ্জাবীর হস্ত গুটাইয়া, তাহার দৃঢ় কঠিন হস্তে নিমেষে জনতাকে দুপাশে সরাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। একটি ষোল-সতের বছরের তরুণী প্রভুগৃহের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কবিতে না পারায় পালাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু রাস্তায় প্রভুর দারোয়ানদের দৃষ্টিপথে পড়ায় তাহার ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনা চলিতেছিল। তরুণীর ক্রন্দনে মানুষের প্রাণ হইলে এই রাস্তার জনতা উন্মত্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু কাশীতে এমনিতর সহস্র অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া ইহাদেরও মন বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, তাই, সেখানে দাঁড়াইয়া, কেবলমাত্র আমোদ উপভোগ করা ছাড়া আর ইহাদের কোন কাজ ছিল না। সুধীর তাহার বজ্রমুষ্টিতে দ্বারোয়ানকে দূরে সবাইয়া দিয়া অতি সহজে সেই মূর্চ্ছিতা বালিকাটিকে কোলে তুলিয়া জনতার ভিতর রাস্তা করিয়া নিমেষে আসিয়া তাহাদেব গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই কৃতজ্ঞ বালিকা লছমণিয়া সেই হইতে যমুনাবই গৃহে তাহারই সঙ্গিনী হইয়া রহিল।

সুধীরের সেদিনের সে দৃপ্তমূর্ত্তি যমুনাব চোখেব উপব নিয়ত ভাসিত। এমনই বলদৃপ্ত উন্নতদেহ, তেজোময় প্রাণ,—এইত পুরুষ।

মাস দুই অনেক কষ্ট পাইয়া অবশেষে কাশীতেই যমুনার মাতা তাঁহার রোগক্লান্ত চক্ষুদুটী মুদিলেন। কিন্তু মাতার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এমনই একটা ঘটনা ঘটিল যে, তাহার স্বরূপ বুঝিয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইতে যমুনার অনেক দিন লাগিল।

সে দিন শুক্লপক্ষের সুন্দর একটি রাত, গৃহের ভিতর অসহ্য গরম, বারান্ডায় একখানি শয্যা পাতিয়া সুধীর রোগিণীকে ধীরে ধীরে সেখানে আনিয়া শয়ন করাইল। ইদানীং যমুনা আর তেমন করিয়া কোন কাজে মন দিতে পারিত না। দিনের পর দিন মাতার অবস্থা এবং তাহার পর তাহার নিজের কি হইবে, সে কথা সে আর ভাবিতে পারিত না। এমন নিঃসঙ্গ, ভীষণ জীবন সে কোন দিন কামনা করে নাই।— সে নারী,—নারী প্রাণেই আপনাকে পুরুষের সঙ্গিনীরূপে কল্পনা করিত। এবং আকাঙ্ক্ষাও করিয়াছিল, কিন্তু পুরুষ তাহার ক্ষুদ্র মন দিয়া তাহাকে একটী ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র মনে করিল। যমুনা আপনাকে সে বিলাসের মাঝে বিসর্জ্জন দিতে পারিল না।—পারিলনা বটে,—কিন্তু এই নিঃসঙ্গ জীবনের দারুণ বোঝা সে কোথায় যাইয়া ফেলিবে! হায় ভগবান, তাহার নারীত্বের গর্ব্ব— কি এত দিনে চূর্ণ হইয়া যাইবে?

গভীর রাত্রিতে যমুনার মা সহসা জাগিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'সুধীর, ছেলেবেলা থেকে, তোকে আমি জানি,— আমার যমুনার আদর যদি কোথাও হয়, তবে সে তোর কাছেই হবে। — তুই দীন দরিদ্র। দুঃখী অনাথ,— কিন্তু আমার যমুনার যোগ্য সংসারে একমাত্র তুই-ই।— তুই সন্ন্যাসী, ভিখারী তা হোক, আমার এই পাগলী মেয়েটার ভার তোকেই নিতে হবে।— এ আমার অনুরোধ, আমার আশীর্ব্বাদ।'

রাত্রিশেষে রোগিনী যখন ক্লান্ত হইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, সুধীর তখন অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং ছাতের একপ্রান্তে, যেখানে সারাটি রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া যমুনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে যাইয়া আস্তে আস্তে বসিল এবং সাবধানে অত্যন্ত স্নেহে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'যমুনা',—

যমুনা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছিলে যমুনা? পিসিমার কথায় কি?'—

যমুনা নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সুধীর আবার বলিল, —' তোমায় একটুও সে জন্যে ভাব্‌তে হবে না। একটীবার শুধু মুখ ফুটে বল পিসিমার কথা তোমার ভাল লাগেনি? বেশ ত ভাবনা কিসের, আমি আজই আমার চেয়ে যোগ্য একজনকে এনে পিসিমাকে দেখাব। তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাল্‌কের শুভলগ্নেই তোমার বিয়ে দিয়ে যাবেন।'

যমুনার নত মুখখানি হইতে অতি অস্পষ্ট একটিমাত্র কথা বাহির হইল—'না।'—

'না?—তবে কি বিয়েই কর্‌বে না?'

যমুনার নতমস্তক একেবারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস কর্‌বেন না।'

সুধীর এবার একটু বিচলিত হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'কিন্তু যমুনা, তুমি কি জান না? আমার ত কিছুই নাই, না একখানি ঘর, না একটী—'

যমুনা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল না থাক্ তাতে কি যায় আসে! আমি যাব,— যাব আপনার কাছে।'

'কিন্তু ভেব বল যমুনা—আমাকে ভালবাসতে পারবে ত?—'

যমুনা বাধা দিল। মাথা তুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল্—'পারব—পারব্। না, জানি না, চেষ্টা কর্‌ব।'

সঙ্গে সঙ্গে সুধীর যমুনার হাত দুখানি তুলিয়া তাহার বুকের কাছে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু যমুনা তুমি কি সুখী হবে?—

যমুনা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া লইল। কিন্তু চোখের জল সে বাধা মানিলনা। যমুনা স্থির নেত্রে উর্দ্ধেমুখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—পারব, সুখী হব। মা, মা, — জীবন ভরে মাকে কিছু দিই নি—মার ইচ্ছা—সব পারব।' যুক্তধারায় চোখের জল যমুনার মুখ বাহিয়া গলার কাছে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'কিন্তু একটী কথা আছে আমার। আপনাকে শুন্‌তে হবে। যদি কোনও দিন আমার ব্যাবহারে কিছু ক্রুটী দেখেন,—হবে না তা জানি, তবু বলে রাখি, আমাব মনের কোণে এখনও একটা স্মৃতি আছে। শৈলেন বাবুর কথা আপনি জানেন ত? আমি এখনও তাঁকে একেবারে ভুলিনি। আপনিত আমায় তার জন্য ক্ষমা করবেন?'

সুধীর আবেগে যমুনাব হাত দুটি জোরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আমার গভীর ভালবাসায় আমি তোমার মনের সবটুকু গ্লানি মুছে ফেলে দেব। তোমাব গরীব স্বামীর ঘরে আব ত কিছু থাকবেনা যমুনা— কেবল তার প্রাণভরা ভালবাসা—আর তা নিত্য নূতন হয়ে দেখা দেবে তোমার ভালবাসায়— তোমাব আত্মদানে। কিন্তু এ আমার জুলুম বলে মনে হচ্ছেনা তো যমুনা?

যমুনা তেমনি পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল—'না'।

'কল্লোল'—১৩৩০

কল্যাণী

ঊর্মিলা দেবী

১

পৌষের প্রভাত। বেলা প্রায় ৭টা বাজিতে চলিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যদেব এখনও আকাশ-প্রান্তে উঁকি দেন নাই। উঠানে দাঁড়াইয়া ঠিকা ঝি বলিল, উনোন ধ'রে গেছে গো, বউদি—আজ কি আর নীচে নামবে না?

একটি একুশ বাইশ বছরের সুশ্রী মেয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল,—আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ছেলেটা রাত্রে একটুও ঘুমতে দেয়নি। বামুনদি' এখনও আসেন নি ঝি?

ঝঙ্কার দিয়া ঝি বলিয়া উঠিল,—সে আবার এত সকালে কবে এসে থাকে গো? বাজারের পয়সা-টয়সা দেবে ত দাও আমার ত আবার আরও দু'ঘর যেতে হবে, দেরী করলে চলবে কেন?

ঝিকে বাজারের পয়সা গণিয়া দিয়া বউটি বলিল,—আজ আর বেশী কিছু আনতে হবে না ঝি. তরকারী পাতি ত অনেক আছে। তুমি শুধু আধসের রুইমাছ আর একসের আলু নিয়ে এস।

ঝি চলিয়া গেলে, সে উনানে চায়ের জন্য জলের কেটলী চড়াইয়া দিয়া, গামছা ও তেলের বাটি লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান সারিয়া আসিয়া সে দেখিল বামুনদি আসিয়া জলের কেটলী নামাইয়া রাখিয়া হালুয়া চড়াইয়াছে। মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া, একখানা থালার উপর চায়ের কাপ ও হালুয়ার রেকাবী বসাইয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে সিঁড়ি হইতে ডাক দিয়া বলিয়া গেল—তুমি ততক্ষণ দুধটা জাল দাও বামুনদি। আমি এসে তোমায় ভাঁড়ার বের করে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর স্বামীর উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইয়া সে যখন নীচে নামিল, তখন ক্ষুদ্র উঠানটুকু রোদে ভরিয়া উঠিয়াছে। নিকটের বাজার হইতে ঝি-ও ফিরিয়াছে। বাজার বুঝিয়া ও পয়সা হিসাব করিয়া লইয়া ঝিকে বিদায় দিয়া, সে তখন বামুনদিকে ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিল, তাহার পর তরকারীর ডালা ও বঁটি, আনিয়া রান্নাঘরের রকে সে কুটনা কুটিতে বসিবে, এমন সময়ে বামুনদি'র চীৎকার তাহার কাণে গেল, ও বৌদি, গেল, গেল, ধর-ধর। সে ফিরিয়া দেখিল, তাহার দুই বৎসর-বয়স্ক শিশুপুত্রটি টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।—ও দুষ্টু। তুমি এরই মধ্যে উঠে এলে? বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। মার কোলে চড়িয়াই ছেলে মা, দুদু কাব—মা, দুদু কাব—বলিয়া কান্না জুড়িল।

মা ধমকাইয়া বলিল, মা, দুদু খাব না! বুড় ছেলে হয়েছেন, এখনও মা, দুদু খাব! এই খানে ব'সে এই সন্দেশটা ততক্ষণ খা—আমি দুধ জুড়িয়ে আনছি। ছেলে কিন্তু সন্দেশের লোভে ভুলিল না। সন্দেশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সে মায়ের কাপড় টানিয়া, হাত-পা ছুড়িয়া

চীৎকার আরম্ভ করিল—তন্দে কাব না, মা, দুদু কাব, পূজার ঘর হইতে গৃহিণীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আসিল, ও রাধে, ছেলে কাঁদাচ্ছিস কেন? তখন মা উপায়ান্তর না দেখিয়া ছেলে শান্ত করিবার জন্য রকের উপর বসিল। বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, এমন ছেলেও দেখিনি বাপু, যা ধরবে, তাই করবে। তাহার পর স্বামীর উপরও রাগ হইল। খবরের কাগজে এতই কি মধু আছে যে, ছেলেটা উঠিয়া একা একা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, তা ভ্রূক্ষেপও নাই; যদি পড়িয়া মাথা গুড়া হইয়া যাইত! তাহার মনে হইতে লাগিল, এমন মানুষও সে আর দেখে নাই, এমন ছেলেও সে আর দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উপরের বারান্দায় পড়িল। দেখিল, স্বামী সেখানে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছেন। রাগে রাধার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল, কি হাসিই শিখেছিলে, রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

হাসিতে হাসিতে স্বামী বলিলেন, কেমন জব্দ! আব ছেলে শাসন করতে যাবে? নিজেকে কে শাসন করে, তার ঠিক নেই, উনি আবার যান ছেলে শাসন করতে।

স্ত্রীও হটিবার পাত্রী নয়। সে প্রত্যুত্তরে বলিল, তোমার ছেলে আর কত ভাল হবে।

বটে—বটে, একেবারে বাপ তুলে গাল। আচ্ছা এর শোধ পাবে। মেয়েটি এদিক ওদিক চাহিয়া স্বামীকে একটি ছোট্ট কীল দেখাইল।

বামুনদি ঘরে বসিয়া, শ্বশ্রূমাতাও অনতিদূরে। একজন উপরের বারান্দায়, একজন নীচের বারান্দায়— কাজেই উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিয়া স্বামী আপাততঃ বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

ছেলে শান্ত হইল। ছোট পিঁড়ির উপর তাহাকে বসাইয়া, তাহাব হাতে সন্দেশটি তুলিয়া দিয়া, মা কুটনা কুটিতে বসিল।

যে সন্দেশটি অনতিকাল পূর্বেই খোকা ঘোব বিতৃষ্ণাভরে ছুড়িয়া ফেলিযা দিযাছিল, এখন আবাব সেই সন্দেশটিই সে পরম আদরে খাইতে লাগিল।

এমন সময়ে বৌদি বলিয়া ডাক দিয়া একটি আঠাব উনিশ বছরের সুদর্শন যুবক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিযা বৌদি বলিল, এই যে, এস ভাই! তোমাব গাঁয়ের কায শেষ হল? কবে এলে?

খোকাকে কোলে তুলিযা লইয়া সে বলিল, কাল এসেছি। আজ একটা সুখবর আছে বৌদি।

আলু কুটিতে কুটিতে নতমুখী বৌদি বলিল, কি সুখবব ঠাকুবপো?

গান্ধীজী যে কলকাতায় এসেছেন!

সোৎসাহে মাথা তুলিয়া বৌদি বলিল, এ্যাঁ সত্যি বলছ?

সত্যি নয়ত কি বৌদি? এ সব কথা নিয়ে কি তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা কবতে পারি?

তা আমায় একবার দেব-দর্শন করাবে না ভাই?

সে কথাই ত তোমায় বলতে এসেছি। আজ বিকেলে একটা মেয়েদেব সভা আছে, মহাত্মাজী বক্তৃতা দেবেন। তুমি কি যাবে?

যাব না আবার--- নিশ্চয় যাব!

দাদা অনুমতি দেবেন ত?

সে ভার আমার! তুমি কিন্তু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা ঠিক দু'টোর সময়ে প্রস্তুত থেক। আমি একেবারে গাড়ী নিয়ে এসে তোমায় নিয়ে যাব, দেরী করো না কিন্তু!

হাসিতে হাসিতে বৌদি বলিল, তোমার কোন ভাবনা নেই। দেব-দর্শনের আগ্রহ তোমার চেয়ে আমার কিছু কম নেই!

২

গৃহকর্ত্তা রাজশেখর বসু হাইকোর্টের উকীল। দীর্ঘ প্রশান্ত চেহারা, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সর্ব্বদাই হাসি-খুসী এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধু মহলে কৌতুকপ্রিয়তার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ওকালতী ব্যবসায়ে খুব পসার করিতে না পারিলেও, ক্ষুদ্র সংসারটি এক রকম চলিয়া যাইত। শ্বশুরের বসত-বাটিখানি উত্তরাধিকার সূত্রে শ্বশুরের কন্যা লাভ করিয়াছিল, তাই বাড়ীভাড়াও লাগিত না। শ্বশুরের অনেকগুলি সন্তান মরিয়া হাজিয়া শেষ বয়সের সন্তান রাধারাণী কোন রকমে টিকিয়া গেল। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল বলিয়া, বিবাহ দিয়া তাহাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইতে তাঁহার মন উঠিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র যুবক রাজশেখরের সন্ধান মিলিল। রাজশেখর তখন এম, এ পাশ করিয়া 'ল' কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সহায়-সম্বল না থাকায় 'টিউসনি' করিয়া নিজের পড়ার খরচ চালাইতেছিলেন রাধারাণীর পিতা তাঁহাকেই জামাতা মনোনীত করিলেন।

রাধারাণী শিশুকালে কিছু কৃশ ও দুর্ব্বল ছিল,—কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া গেল। সে সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল মুখশ্রী, এবং সর্ব্বোপরি তাহার নিটোল গড়নটুকু তাহাকে এক অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছিল। তাহাকে রাজশেখরের খুবই পছন্দ হইল।

শ্বশুরেব কাল হইয়াছে—শাশুড়ী এখনও বর্ত্তমান। তিনি জামাতার সংসার ভুক্তা। প্রাচীনা হইয়াছেন, সন্ধ্যাপূজা এবং শিশু দৌহিত্রটিকে লইয়াই সময় কাটাইয়া দেন। সংসারের গৃহিণী এখন রাধারাণী। রাজশেখর যে বৎসর বি এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ভর্ত্তি হইলেন, সে বৎসরেই প্রাচীনা গৃহিণীর ভার কন্যা-জামাতার হস্তে তুলিয়া দিয়া, বৃদ্ধ কলিদাস ঘোষ জীবলীলা সংবরণ করিলেন। এই কয় বৎসরেই জামাতার স্বভাবের পবিচয় পাইয়া, তিনি কন্যা ও পত্নী উভয়ের জন্যই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন।

বস্তুতই রাজশেখরের সংসারটি সুখে শান্তিতে পূর্ণ ছিল। স্বামী-স্ত্রীর পবিপূর্ণ প্রেম সংসারটিকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিল। তাহার উপব আজ দুই বৎসর হইল, শিশুপুত্রটি আসিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন টি কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছিল। শ্বশ্রূমাতার স্নেহে রাজশেখরের মাতার অভাব পূর্ণ হইয়াছিল, – আর ভ্রাতৃস্নেহের সাধ মিটাইযাছিলেন,

এই দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-পুত্র বিশ্বেশ্বরকে দিয়া। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাকে আপন ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। সেও দাদা ও বৌদি উভয়ের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের মত আব্দার করিত। সম্প্রতি নন্-কো-অপারেশনের হিড়িকে বিশ্বেশ্বর কলেজ ছাড়িয়া কংগ্রেসের কাজে লাগিয়া ছিল। রাজশেখর এ জন্য একটু ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন। তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন নাই। রাজশেখরের মতে এটা একটা নূতন পাগলামী মাত্র। তিনি বলিলেন, দুদিনেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

রাত্রিতে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী বলিলেন, কি গো! সভা কেমন হ'ল?

ওঃ সে ভারী চমৎকার হ'ল—অনেক মেয়ে এসেছিল। গান্ধীজী কি সুন্দর বক্তৃতা করলেন।

তুমি তাঁর কথা কি ক'রে বুঝলে? তিনিত বাঙ্গালা জানেন না।

হিন্দীতে বললেন, সে বেশ সোজা হিন্দী—খুব বোঝা যায়। উঃ তার কথা শুনে চোখের জল রাখা যায় না। বাস্তবিক আমরা যে কত বড় পরাধীন জাত, তা এমন ভাবে আগে কখনও বুঝিনি।

এখন বুঝেই বা কি করছ?

তাত ঠিকই— মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কি-ই বা আব করতে পারি। তবে গান্ধীজী কিন্তু বলেছেন, আমরাও ইচ্ছে করলে অনেক কাজ করতে পারি।

কি কাজ শুনি?

এই অসহযোগ আন্দোলনের একটা বড় অঙ্গ ত চরকাকাটা আর বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করে খদ্দর করা। তা' আমরাও সে কাজ খুব করতে পারি। নিজেও করতে পারি, আর যাতে সব মেয়েরাই এ কাজ করে, তাব চেষ্টা করতে পারি।

ওরে বাপরে! গান্ধীজী আমার সেরেছেন দেখছি। তোমার মাথাটি একেবারেই বিগড়েছে। ওগো, অত কিন্তু আমার সইবে না। বাড়ীর গিন্নীরা যদি এখন ঘরকন্না ছেড়ে বাইরে নাচতে যান তবেই আমদের সংসারগুলি গেছে আর কি!

কেন? ঘরকন্নাই বা ছাড়তে যাব কেন, আর বাইরেই বা নাচতে যাব কেন? ঘরে বসেই ত এ সব কাজ করা যায়। আর দেখ, আর একটা কথা, বিলাতী কাপড় ত আর পরা চলে না!

কেন চলে না? এত কাল চল্‌ল আর আজই একেবারে অচল হয়ে গেল?

এত কাল অন্যায় করেছি বলে কি চিরকালই অন্যায় করতে হবে?

এতকাল অন্যায় করেছি কে বল্লে?

গান্ধীজী বলেছেন, দেশের অন্য নেতারাও বলছেন।

শুধু বললেই ত আর হয়না—একটা কাজ কেন করব, সেটা ত বুঝতে হবে ভাল ক'রে? না বুঝে হুজুগের ওপর কোন কাজ করার পক্ষপাতী আমি নই।

রাধারাণী নিরুপায় হইয়া বলিল, — তবে তুমি যাও না, তা'র সঙ্গে একবার দেখা করে এস না। তিনি তোমায় সবই বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

রাধারাণী নিজে কথাটা যেমন ভাবে বুঝিয়াছিল, তেমন ভাবে সে বুঝাইতে পারিতেছিল না—কি করিবে সে?

স্বামী কিন্তু তাহার প্রস্তাবে মোটেই রাজী হইলেন না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—ও বাবা, তবেই গেছি। তাঁর কাছে গেলেই নাকি লোকে পাগল ব'নে যায়। তা'র পর শেষে খদ্দরত ধরাবেনই, ওকালতীটুকুও না ছাড়ালে বাঁচি। না বাপু, অমন কথা আমায় ব'ল না। তুমি যেরকম ক্ষেপেছ, এখন আমি এদিকে একটু রাশ টেনে না রাখলে পথে বসতে হবে।

রাধারাণী ক্ষুব্ধ হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজশেখর আদর করিয়া তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, —রাণি। মনে দুঃখ করছ কেন? তুমি ছেলেমানুষ, তাই সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠ। আমার ত সব দিক ভাবতে হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনটি একটি নূতন হুজুগমাত্র, এর কথাগুলি শুনতে বেশ, কিন্তু কাজে লাগানো একেবারেই অসম্ভব। গান্ধীজীকে মানুষ হিসাবে আমি কিছু কম ভক্তি করি, তা মনে করো না। কিন্তু তবু, আপাততঃ তাঁর কথাগুলি পাগলামী ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারিনে। ও খদ্দর-টদ্দর কিছুই চলবে না, দু'দিন সবাই একটু নাচবে, তার পর দেখবে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি হুজুগের স্রোতে ভেসে যেতে চাই না। কারণ, এর পর বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাস্যাস্পদ আমাকেই হতে হবে। তুমি মনটাকে শান্ত করতে চেষ্টা কর।

রাধাবাণী আর কিছু বলিল না। জীবনে এই প্রথম স্বামীর কথায় তাহার মন শান্ত হইল না। কোথায় যেন একটা কি কাঁটার মত খচখচ করিতে লাগিল।

৩

রাধে!

যাই মা।

আজ বামুনদি' অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত, রাধারাণীই আজ রাঁধিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, আগুনের তাতে তাহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়াছিল। সে আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে মায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল;—আমায় ডাকছিলে, মা?

হ্যাঁ মা, এই দেখচো, ঝোলের ত এই আলু কুটেছি পটলও কি দেব?

না মা, ঝোলে ত পটল তিনি ভালবাসেন না—পটল ভাজতে দাও।

আচ্ছা—বলিয়া তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ও কিরে, তোর মুখ অমন শুকনো কেন? চোখ ফুলেছে, কেঁদেছিস না কি? কি হয়েছে? জামাই কিছু বলেছেন নাকি?

লজ্জায় নতমুখী হইয়া কন্যা বলিল—কি যে তুমি বল, মা, কখনও কি আমাকে কিছু বলতে শুনেছ?

আমি ত সেই কথাই ভাবছিলুম, এ-ও কি সম্ভব হল? আজ ৭/৮ বছর বিয়ে হয়েছে,

কখনও ত একটা উঁচু কথা কইতে শুনি নি। বাবা আমার আশুতোষের মত সদাই ভোলানাথ। তাই তো সকলকে বলি, রাধে আমার অনেক তপস্যা ক'রেই এমন স্বামী পেয়েছিল। তা' তোর কি হয়েছে; শরীর ভাল নেই নাকি?

কিছুই ত হয়নি, মা, অমনি ক' দিন থেকে মনটা ভাল নেই।

কেন, মনের আবার তোর কি হল? তুই-ই কিছু ঝগড়া-টগড়া করিস নিত? দেখিস বাছা, আদর পেয়ে যেন মাথায় চ'ড়ে বসিসনে। ভুলে যাসনে, স্বামীই মেয়েমানুষের দেবতা, তার মনে কষ্ট দিতে নেই।

একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া রাধারাণী সরিয়া আসিল। উনানে ভাত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, সে উনান গোড়ায় চুপটি করিয়া বসিল। মায়ের কথাগুলি তাহার মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। বাস্তবিকই অনেক তপস্যা করিয়া সে অমন স্বামী পাইয়াছিল। স্বামী যে তাহাকে কতখানি ভালবাসেন, তাহার প্রমাণ সে জীবনে অনেক পাইয়াছে। সে ত তাঁহার স্নেহে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিন সন্দেহ করে নাই। স্বামীও ত তাহার সমস্ত বুকখানা জুড়িয়াই বসিয়াছিলেন। প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ত স্বামীকে সে নিঃশেষেই ঢালিয়া দিয়াছিল। তবু কিছু দিন হইতে তাহার মনে একটা অশান্তির কাঁটা দিন-রাতেই বিঁধিতেছিল কেন? সেই যে প্রায় ৪ মাস হইল, সভায় বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ত আজ তেমনই জাগ্রত আছে। স্বামীর নিকট সে সে বিষয়ে কোন সহানুভূতি পায় নাই বটে, কিন্তু তবুও ত সে মন হইতে তাহা দূর করিতে পারে নাই! এমনটা যে তাহার জীবনে কখনও সম্ভব হইবে, তাহা সে কোনও দিন কল্পনাও করিতে পাবে নাই। স্বামীকে বেষ্টন না করিযা যে কোনও ভাব পৃথগ্‌ভাবে তাহার প্রাণে আসিতে পারে, ইহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই। সেই দিন হইতে তাহার প্রাণের মধ্যে যে একটা গোটা মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ত সে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। স্বামী ত তাহাকে আমলেই আনিতেছেন না। সে দু'এক দিন কথা পাড়িতে গিয়া দেখিয়াছে, হয় তিনি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেন, নয়ত আদর করিয়া চুমা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেন। সেই জন্য দারুণ অভিমানে সে ত চুপ করিয়াই গিয়াছিল। কেন? চিবদিনই কি তিনি তাহার সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার করিবেন? তাহার কি বয়স হয় নাই? সে কি শুধু স্বামীর খেলার পুতুল হইয়াই থাকিবে? তাহাই কি নারীজীবনের সার্থকতা? আদর্শ দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আজকাল তাহার মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। পূর্ব্বের মত তাহার অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে কোলে করিয়া গণিকালয়ে পৌঁছাইয়া দেওয়ার যে গল্প চলিত আছে, তাহা লইয়া তাহাদের স্বামি-স্ত্রীতে এক দিন তর্ক হইয়াছিল, স্বামী বলিয়াছিলেন,—এমন স্ত্রীকে আমি ত্যাগী বলে ভক্তি করতে পারি কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী বলে তাকে পূজা করতে পারি না। স্বামীকে পাপের পথ থেকে রক্ষা করাই স্ত্রী ধর্ম্ম, তাকে সে পথে অগ্রসর ক' রে দেওযা তার ধর্ম্ম নয়। সে স্ত্রী কল্যাণী নয়— তাকে সহধর্ম্মিণী বলতে আমি নারাজ।

রাধারাণী কিন্তু তাহার তীব্র প্রতিবাদ তখন করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, স্ত্রীর আবার

পৃথক সত্তা কি? তার নিজের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি কি? যে স্ত্রী পতিব্রতা, তাহার স্বামীকে বিচার করিবার অধিকারই বা কোথায়? স্বামীর সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তিই তাহার নিজের। ভাল হৌক, মন্দ হৌক, স্বামীর ইচ্ছা পালন করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম। অবশ্য সেই কুষ্ঠ রোগগ্রস্তের মত তাহার স্বামী যদি আজ অন্যে আসক্ত হন, তবে সে যে প্রাণে অশেষ ক্লেশ অনুভব করিবে না, এ কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিতে পারে না। কিন্তু আদর্শ যাহা, তাহা আদর্শই থাকিবে। উচ্চ আদর্শ ধরিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে, তাহা হইলেই যে সে আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইবে, তাহা নহে, আজ কয়দিন হইতেই তাহার মনে হইতেছিল, তাহার স্বামীই ঠিক বলিয়াছিলেন। স্বামীর মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়া পরম সুখ, কিন্তু তাহাই জীবনের চরম সার্থকতা নহে। মানুষের কোন অবস্থাতেই ভাল-মন্দ জ্ঞান হারান ঠিক নয়। স্বামী স্ত্রীলোকের ইহপরকালের দেবতা, তাহার সর্ব্বস্ব, সেই জন্যই সেই স্বামীকে জগতের সম্মুখে আদর্শ মানবরূপে দাঁড় করাইবার পথে সহায়তা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম। স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে ফুটাইয়া তুলিবে, ইহাই দাম্পত্যজীবনের আদর্শ। স্বামী ত আজ তাহার অন্তরের কথা বুঝিতেছেন না, কিন্তু তাহার অন্তরের মানুষটা যে বাহিরে আসিবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিতেছে, তাহাকেই বা সে ঠেকাইবে কি করিয়া? একটা পথ ত তাহাকে করিতেই হইবে। সে মনে মনে একটা একটা মতলব আঁটিছিল, সে জন্য বিশ্বেশ্বরকে তাহার প্রয়োজন, কিন্তু মাস খানেক হইল সেও আবার গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। কবে যে আসিবে, কে জানে, সেই যে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন,—আমাদের পরপদানতা, শৃঙ্খলিতা দেশমাতা তাঁর ত্রিশ কোটি সন্তানের কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাহিতেছেন, তোমরা কি এখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? এস, আমরা সকলে মিলিয়া মায়ের পায়ের শিকল খুলিয়া দেই। এ কাযে আমি যেমন আমার ভাইদের ডাকিয়াছি, আমার বোনদেরও তেমনি ডাকিতেছি। এস, সকলে আমার সাহায্য করিবে এস—সেই কথাগুলি তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে কাটিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তবু সে কোন উপায় করিতে পারে নাই। এ মনস্তাপ সে আর কিছুতেই সহিতে পারিতেছিল না।

সহসা তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছিল— বৌদি!

সে এক রকম ছুটিয়াই বাহিরে আসিল। স্মিতহাস্যে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া বলিল,— ঠাকুরপো, এলে ভাই? আঃ বাঁচালে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

৪

মাস চারেক পরের কথা, বেলা প্রায় ৯ টা বাজিয়াছে। রাধারাণী সব কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, আঁশ-রান্নার সব যোগাড় করিয়া দিয়া, ভাঁড়ার-ঘরের ছোট উনানটিতে মা'র জন্য রান্না চড়াইয়াছিল। মা বিধবা মানুষ, তাহার খাওয়ার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, একটু ভাতে-পোড়া, একটা তরকারী ও একটু দুধ হইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু এই নিরামিষ রান্নাও রাধারাণীর প্রত্যহই অত্যন্ত পরিপাটী করিয়া রাঁধিতে হয়। রাজশেখর বাবু আমিষাশী হইলেও, দু'একখানা নিরামিষ রান্না না হইলে তাঁহার খাওয়াই হয় না। সকালে অবশ্য তাড়াতাড়ি

চারটি ঝোলভাত খাইয়া কাছারী যান,—কিন্তু রাত্রের খাওয়াটি তাঁহার একটু বিশেষ রকম হওয়াই চাই। নিরামিষ ঘরের ডাল, তরকারী ও আমিষ ঘরের নানা রকম ব্যঞ্জনাদি দিয়া তিনি রাত্রিতে বেশ আড়ম্বর করিয়া, দীর্ঘকাল বসিয়া গল্প করিতে করিতে আহার করেন। তাই দুপুরে মার উনানে রাধারাণী ভাল করিয়া রান্না করিয়া স্বামীর জন্য সব পৃথক করিয়া তুলিয়া রাখে। মা পূজা সারিয়া জপে বসিয়াছিলেন, খোকা তাঁহার কাছে বসিয়া কাঠের খেলনা লইয়া খেলিতেছিল। তিনি জপ করিতে করিতে নাতির তদারক করিতেছিলেন।

রাধারাণী ডালের জল চড়াইয়া দিয়া, হেঁট হইয়া ডাল ধুইতেছিল। বিশ্বেশ্বর আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইল, —তাহার বগলচাপা একটা কাগজের মোড়ক। রাধারাণী মুখ তুলিয়া দেখিল, তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, —কবে এলে, ঠাকুরপো, এর মধ্যে হয়ে গেল?

বিশ্বেশ্বর মোড়কটি তাহার হাতে দিয়া বলিল,—এই ত ট্রেণ থেকে নামছি, বৌদি, এখন বাড়ীও যাইনি।

রাধারাণী মোড়কটি তাকের উপর রাখিতেছে দেখিয়া, বিশ্বেশ্বর অবাক্ হইয়া বলিল,—ও কি? ওখানে রাখছ যে খুলে দেখবে না?

একটু হাসিয়া রাধারাণী বলিল,—এখানে ত খোলা হবে না— কে কোথা দিয়ে এসে দেখে ফেলবে। তোমায় আগে একটু চা খাইয়ে নিয়ে, তবে উপরে গিয়ে খুলব।

আমি ত চা আর খাইনে বৌদি। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাধারাণী বলিল,—চা খাও না? সে কি ঠাকুরপো, তুমি যে সেই যা'কে 'চাখোর' বলে তাই ছিলে।

সেই জন্যইত ছেড়েছি, বৌদি! তা' ছাড়া যে সব অজ পাড়াগাঁয়ে আমাদেব কাজ করতে যেতে হয়, সে সব যায়গায় চা কেন, দু'বেলা পেট ভ'রে ভাতও জোটে না। তাই ত বদ-অভ্যাসটা ত্যাগ করেছি।

একেবারে ব্রত নাকি? স্পর্শ কর না?

না-না—আমি আবার একটা কি মানুষ যে ব্রত-ট্রত করব। তবে না পেলে কষ্ট না হয়, আর কাজের ক্ষতি না হয়, সে জন্য নিয়মিত খাইনে।

তবে আজ একটু খাও, রেলে রাত জেগে এসেছ, শরীরটা একটু ভাল হবে। তুমি হাত পা ধুয়ে নাও গে, আমি এক্ষুনি তোমার খাবার ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর কলতলায় হাত-পা ধুইতে গেলে রাধারাণী রান্নাঘরে আসিযা বামুনদি'কে জিজ্ঞাসা করিল— তোমার এখন কি হচ্ছে, বামুনদি, ঠাকুরপোর জন্য একটু চা'র জল ক'রে দিতে পারবে কি?

আমি ভাত চড়িয়েছি, বৌদি, এই ভাত আর ভাজা ক'খান হ'লেই আমার হয়ে যায়।

ওঃ, তুমি ভাত চড়িয়েছ? তবে ত আর হাড়ী নামানো চলবে না। আচ্ছা, আমি মা'র উনানেই ক'রে দিচ্ছি।

হাঁড়ীতে জল টগবগ করিয় ফুটিতেছিল, তাহা নামাইয়া রাখিয়া রাধারাণী জলের কেটলীটা বসাইয়া দিয়া, ময়দা পাড়িয়া মাখিতে বসিল।

বিশ্বেশ্বর আসিয়া দেখিয়া বলিল,—ও কি করছ, বৌদি, এই সাত-সকালে এত কেন।

কিছুই না ভাই, এই তোমায় চা-টা ক'রে দিয়েই দুখানা গরম লুচি ভেজে দিচ্ছি। আহা! কত ঘোরাঘুরি ক'রে এসে, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোমাদেরই জীবন সার্থক ভাই। আমরা বৃথাই জন্মেছিলুম, দেশের জন্য কিছুই করতে পারলুম না।

জল ফুটিয়া উঠিল। রাধারাণী চা তৈয়ারী করিয়া, আসন পাতিয়া বিশ্বেশ্বরকে বসাইয়া দিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে লুচি কয়খানা ভাজিয়া তুলিয়া, সকালবেলাটার পটল ভাজা ও সন্দেশের কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়া তাহাকে খাইতে দিল। এমন সময়ে কাকার সাড়া পাইয়া খোকা উপরের বারান্দা হইতে ডাকিল,—কাকু! বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া উপরে গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া আসিল। তাহাকে পাশে বসাইয়া চা খাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে খোকাবাবুও ভাগ পাইত লাগিলেন। রাধারাণী উনানে ডাল চড়াইয়া দিয়া সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞসা করিল,—কখানা হল?

এক জোড়া শাড়ী, এক জোড়া ধুতি ও খোকার জামার কিছু কাপড় হয়েছে। আনন্দে রাধারাণীর চোখে জল আসিল। তাহা মার্জ্জনা করিয়া সে কহিল,—আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে, ঠাকুরপো।

কেন হবে না, বৌদি, প্রাণ ঢেলে কাজ করলে সে কাজ সফল হয়-ই। তোমার এদিক কার খবর সব ভাল ত? পাড়াব গুপ্তবৈঠক কেমন চলছে?

বেশ ভালই চলছে। আরও ৩/৪ জন মেয়ে পেয়েছি আমরা। এ পাড়ায় সব শুদ্ধ একুশ জন মেয়ে হ'ল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করেছে, বিলাতী কাপড় আর বাড়ীতে আনতে দেবে না—নিয়মিত চরকা কাটবে আর খদ্দর প্রচার করবে।

সবইত পারবে, কিন্তু খদ্দর প্রচার তোমরা কি ক'রে করবে, তা'ত আমি ভেবে পাইনে। তোমরা যে ঘরের বারই হও না।

তাতে কি? গঙ্গার ঘাট, নেমন্তন্ন-বাড়ী, আর রেলগাড়ী এ ক'টা যায়গাই ত মেয়েদের প্রচারের মস্ত যায়গা। সত্যি সত্যি চাইলে, কাজের সুযোগের অভাব কিছু নেই, ভাই!

বিশ্বেশ্বর বলিয়া উঠিল,—বাঃ, বাঃ বৌদি! তুমিত বেশ বুদ্ধি বার করেছ। এ ত আমারও মাথায় আসেনি।

দায়ে ঠেকলে অনেক বুদ্ধিই মাথায় খেলে—আমি যে ভাই, "ঠেকে গেছি-প্রেমের দায়ে", বলিয়া রাধারাণী হাসিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। তাহার পর বলিল,—আচ্ছা, তোমরা এটা এখনও গোপন রেখেছ কি করে? বাড়ীর কর্ত্তারা কি কেউ জানেন না?

শুধু প্রভাদির স্বামী জানেন, তিনি যে এক জন মস্ত অসহযোগী। তাঁর বাড়ীতেই ত আমাদের চরকার স্কুল বসে। অবিশ্যি প্রত্যেকের বাড়ীতেই একটা ক'রে চরকা আছে কিন্তু সে ত সব সময়ে চালাবার সুবিধা হয় না। এই আমারই ত দেখনা, পাছে তোমার দাদা টের পান ব'লে রাত তিনটে থেকে ৬ টা পর্য্যন্ত ছাদের কুঠরীতে বসে চরকা কাটি। অবিশ্যি

প্রভাদি'র বাড়ীতে ত নিতিই দুপুরে চরকা কাটার বৈঠক বসে। শনি-রবি বারত আবার আমার যাওয়া হয় না, তোমার দাদা বাড়ী থাকেন।

তা' দাদাকে তুমি এত ভয় পাও কেন? তোমায় ত তিনি কিছু বলেন না।'

বড্ডই ঠাট্টা করেন যে। তাঁর বিশ্বাস, আমি এখনও সেই কচিখুকীটিই আছি, কিছুই বুঝি নে। কালও ত ঠাট্টা করে বলছিলেন, কিগো; তোমার মাথা থেকে চরকা আর খদ্দর গেছে ত? ও সব নাকি বক্তৃতাতেই বেশ শোনায়, কাজে নাকি করা অসম্ভব। কেউ নাকি মাসেও একখানা কাপড়ের সুতো কাটতে পারে না। তাইত আমরা সকলেই ঠিক করেছি, কিছু কাপড় সঞ্চয় ক'রে নিয়ে তবে সব কথা ফাঁস করব।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বেশ্বর বলিল, আচ্ছা, বৌদি, তুমি যে বড় বলতে, স্বামীব কাছে কোন কথা লুকুতে নেই, তবে কি ব'লে মনকে এখন প্রবোধ দিচ্ছ?

স্নিগ্ধ হাসিতে রাধারাণীর মুখখানা ভরিয়া গেল। সে বলিল, সে এক কাহিনী ঠাকুরপো, এ ভাবনা কি কম ভেবেছি? ভেবে ভেবে ত মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। জীবনের দুটো মাসও ত ঐ ক'রেই নষ্টও করেছি। কিন্তু তার পর যে কোথা দিয়ে, কেমন ক'রে হঠাৎ সব পরিস্কার হয়ে গেল, তা নিজেই জানি নে, তোমায় আর কি বলব? প্রাণের দেবতা প্রাণে ব'সে পথ দেখিয়ে দিলেন, আর ত আমার ভাবনা কিছু নেই।

বিশ্বেশ্বর মৃদুস্বরে বলিল, আর তুমিত অন্যায় কাজ কিছু করচ না।

জোরের সহিত রাধারাণী বলিল, নয়-ইত! এতে ত তাঁর মঙ্গলই হবে। কথায় তিনি যখন বুঝবেন না তখন কাজ দিয়েই ত তাঁকে বোঝাতে হবে। আর কটা দিন গেলেই ত তাঁকে সব বলতে পারব।

তখন তুমি দাদাকে কি জব্দটাই না করবে।

জব্দ করাকরি কিছু বুঝিনে ভাই, জব্দ করতেও চাইনে। তবে তখন আমার একটা জোর হবে, আর আমাকে ঠেকিয়ে রাখা তাঁর সাধ্য হবে না। এইবার ওপরে চল ঠাকুরপো, আরও কিছু সূতো জমেছে, তোমায় দিয়ে দিই গে, কাপড় ক'খানাও তুলে রাখি।

ওপরে আসিয়া রাধারাণী মোড়কটি খুলিল। নিজের হাতে-কাটা সুতায় বোনা শুভ্রসুন্দর কাপড় ক'খানা তাহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব পুলকের সৃজন করিল। কাপড় দু'জোড়া সে মাথায় ঠেকাইয়া আলমারীতে তুলিল। একটি সূতার পুঁটলি আলমারী হইতে বাহির করিয়া বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল, এ দিয়ে মার জন্য এক জোড়া সাদা থান বুনিয়ে দিও, ভাই!

৫

সেদিন রবিবার। দুপুরে রাজশেখর আহারে বসিয়াছেন, রাধারাণী অদূরে বসিয়া তদারক করিতেছে। খাইতে খাইতে রাজশেখর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ নিরামিষ তরকারীগুলো কে রেঁধেছে?

শশব্যাস্তে রাধারাণী কহিল, কেন? ভাল হয় নি নাকি?

সে কথা পরে হবে, কে রেঁধেছে, তাই বল না। মার ত শুনলুম আজ একাদশী।

রাধারাণী বলিল, বামুনদি'র উনোনে আমি রেঁধেছি।

তাই বল। আমি ভাবছিলুম বামুনদি'র হাতের স্বাদ হঠাৎ এমন বদলে গেল কি করে? সবগুলোই খুব ভাল হয়েছে কিনা।

ঠোঁট ফুলাইয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি বড্ডই আমায় ক্ষেপাতে ভালবাস বাপু। এমনি ভড়কে গিয়েছিলুম ভাবলুম বুঝি অখাদ্য হয়েছে। তুমি বুঝি আর জানতে না? শুধু বামুনদির রান্না দিয়ে প্রাণ ধ'রে তোমায় কখনও আমি খেতে দিতে পারি? মার রান্না করতে হয়, নেহাৎই দুটো রান্না করে উঠতে পারিনে, তাই না বামনী রাখা, না হ'লে এই ২/৩ জন লোকের জন্য কেই বা লোক রাখত?

রাজশেখর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাধারাণীর মাতা এক বাটি দুধ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাধারাণী উঠিয়া দ্বারের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দুধের বাটি নামাইয়া রাখিয়া মাতা বলিলেন, রাধে, কলা আর বাতাসা নিয়ে আয়।

রাধারাণী সরিয়া গেল, তিনি অদূরে বসিয়া পড়িয়া স্বর যথাসম্ভব খাটো করিয়া কহিলেন, 'বাবা, রাধের জন্য দু'জোড়া কাপড় নিয়ে এস। আজ দু'মাস থেকে কাপড় সেলাই করে ক'রে পরছে। রোজই বলি জামাইকে বল্। তা শোনে না।

রাজশেখর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন? কাপড় নেই, তা আমায় বলেনি কেন?

কি জানি বাবা! আজকালকার মেয়েদের রকম সকম আমাদের বোঝা ভার। যতই বলি, কাপড় নেই, ব'লে দে আনতে, ততই বলে, না, মা, তোমার পায়ে পড়ি, মা, কিছু ব'ল না। আর আজকাল ত বাড়ীতে মনই টেকেনা, দুপুরটি হবে আর নাকে মুখে দু'টি গুঁজে পাড়া বেড়াতে বেরুবে। কি হয়েছে জানিনে, বাপু!

তা একটু বেড়াতে-টেরাতে যায়, সেত ভালই। লোক-জনের সঙ্গে মেলামেশা ত আমি ভালই মনে করি, কিন্তু কাপড়ের কথা আমায় লুকুবার কারণ ত কিছু বুঝতে পারলুম না।

রাধারাণী কলা আর বাতাসা লইয়া আসিতে আসিতে স্বামীর শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইল। ঘোর বিরক্তিতে তাহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মা এ কি করিলেন? ছি ছিঃ স্বামী হয়ত কি ভাবিতে কি ভাবিলেন। সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া পানের ডিবা লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

আহারান্তে রাজশেখর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাধারাণী জানালার নিকট বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ডাকিলেন, রাণি!

রাধারাণী মুখ ফিরাইল, তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র।

একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে রাজশেখর বলিলেন রাণু! তোমায় কি আমি পরণের কাপড় দিতে কুণ্ঠিত?

রাধারাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি? আমি কি তাই মনে করি?

তবে ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে পরছ, অথচ আমায় বলনি কেন?

রাধারাণী নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজশেখর বলিলেন, আমার কথার উত্তর দিবে না?

রাধারাণী মুখ তুলিল। স্বামীর মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, তোমায় কাপড়ের কথা বলিনি, বল্‌লেই তুমি বিলিতী কাপড় এনে দেবে তাই।

রাজশেখর হাসিয়া উঠিলেন। ওঃ, তোমার মাথার ভূতটা এখনও ছাড়েনি তোমায়? আচ্ছা, রাণু, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করছি, আজ যেন তোমায় আমি খদ্দর কিনে দিলুম, কিন্তু দু'দিন বাদে যখন আবার সেই বিলিতী কাপড় পরতে হবে, তখন লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

কেন বিলিতী কাপড় পরতে হবে? আর কারও কথা জানিনে, কিন্তু আমিত একবার খদ্দর ধরলে আর প্রাণ গেলেও বিলিতী কাপড় পরব না।'

খদ্দর পাবে কোথায় গো? বিলিতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খদ্দর কখনও পেরে উঠবে?

কিন্তু দেশের নেতারা ত প্রতিযোগিতার কথা বলছেন না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক পরিবারই যদি নিজের নিজের প্রয়োজন মত সূতো কেটে কাপড় তৈয়ারী ক'রে নেন, তবে আর বাজারে কাপড় কেনবার দরকারই হবে না, প্রতিযোগিতার কথাই উঠবে না।

আরে ক্ষেপেছ? সে কি কখনও সম্ভব? ঘরে ঘরে সকলে অন্নের সংস্থান করবে, সংসারের খাটুনী খাটবে, ছেলেপিলে মানুষ করবে, রোগ শোকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, না কাপড়ের সূতো কাটবে। গান্ধীজী হুকুম করলে অনেক কাজ হয় জানি, কিন্তু অসম্ভব কখনও সম্ভব হবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে ত আগে তাই হত। ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি, ঘরে ঘরে মেয়েরা যে সূতো কাটত, তাইতেই দেশের কাপড়ের অভাব মিটে যেত। শুধু তা নয়, উদ্‌বৃত্ত সূতো বিদেশে রপ্তানীও হ'ত।

ওরে বাসরে, রাণু। তুর্মি যে বেশ তার্কিক হয়ে উঠেছ দেখছি। ওগো, তর্কচূড়ামণি মহাশয়, সে কালের আর একালের মধ্যে যে অনেকখানি তফাৎ সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? সেকালে কি সংসারের ভাবনাচিন্তায় মানুষ গুলোকে এমন বিব্রত হ'তে হ'ত? টাকায় ১৫/১৬ সের চাল, আধ মণ দুধ, চার পাঁচ পয়সা ক'রে মাছের সের। অসুখ বিসুখের ধারও কেউ ধারত না। এখন কি ক'রে দু'বেলা পেট ভ'রে দুটি ভাত পাবে, কি করে ম্যালেরিয়া, কলেরার হাত থেকে ছেলেপিলে গুলিকে বাঁচাবে, সেই ভাবনায়ই অস্থির, তার উপর আবার চরকা কাটবে কখন?

একটু হাসিয়া রাধারাণী বলিল, সেই জন্যেই ত চরকাকাটা আরও দরকার। চাল, ডাল সব জিনিষেরই দর বেড়েছে, তার উপর চড়া দরের কাপড় কিনে পরা মানুষের ত এক রকম অসাধ্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। নিজে সূতো কেটে একজোড়া কাপড় তৈয়ারী করিয়ে নিতে খুব বেশী হলে ২ টাকা পড়ে। ২ টাকা জোড়ায় ত বাজারে কোন রকম কাপড়ই পাওয়া যায় না। আর এই কাপড়ের জন্য যে টাকাগুলি দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলি দেশে থাকলে অন্নকষ্টও আর একটু কমে যেতে পারে।

সবই তো বুঝলুম গিন্নী ঠাকুরণ। ও সব কথাই ত অনেকবার শুনেছি। কথায় আমায়

কেউ যে বোঝাতে পারবে, তা হবার নয়। কাজে কেউ দেখাতে পারত তবে বুঝতুম। কিন্তু আমিও তোমায় বলে দিচ্ছি তিন মাসেও একখানা কাপড়ের সূতো কেউ কখনও কাটতে পারে না।

রাধারাণীর মুখের উপর দিয়া একটা কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল সে আর কিছু না বলিয়া আহার করিতে নীচে নামিয়া গেল।

বৈকালে বাড়ী ফিরিবার পথে রাজশেখর দু'জোড়া মিলের কাপড় আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও। বিলিতী কাপড় না পরতে চাও, মিলের কাপড় করতে ত দোষ নেই।

র'ধারাণী নীরবে কাপড় দু'জোড়া আলমারীতে তুলিল। তাহার আকাঙ্ক্ষিত দিন ত সমাগত, তাহার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। তাহার আর তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

৬

সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সেই যে সরকার পক্ষ হইতে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-দলকে বে-আইনী বলিয়া ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে, সেই হইতে সহরে আগুন জ্বলি' ' উঠিয়াছে। ভারতবাসী আর এ অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে ; ইহা প্রমাণ করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা জাগিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে যুবকগণ আসিয়া সেবকদলে নাম লিখাইয়া খদ্দর বিক্রয় করিতে করিতে জেলে যাইতেছে। পুলিশের হস্তে নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কেহ কখনও দেখে নাই।

রাধারাণী সারাদিন ছট্‌ফট করিয়া বেড়ায় কখন্ সন্ধ্যা হইবে, কখন বিশ্বেশ্বর আসিবে। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যায় অবসর প্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর আসিয়া তাহাকে দিনের কাহিনী শুনায়। শুনিতে শুনিতে সে বিস্ময়ে বিহ্বল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। দেশবাসীর এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী শুনিয়া গর্ব্বে—আনন্দে তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা ঝরিতে থাকে। তাহারও দুঃখের রজনী প্রভাত প্রায়। তাহার আলমারীতে তাহাদের বৎসরের কাপড় প্রায় সঞ্চিত। আর এক জোড়া ধুতি তৈয়ারী হইলেই সে এক দিন স্বামীকে চমকিত করিয়া দিয়া ঈপ্সিত বর চাহিয়া লইবে। দুই-জোড়া মোটা কাপড় হইলেই তার ও তাহার মাতার বৎসর প্রায় চলিয়া যাইবে, কিন্তু স্বামীর পাঁচ যায়গায় যাইতে হয়, তাঁহার বেশী কাপড়ের প্রয়োজন। তাই সে একটু সময় নষ্ট করিয়াও অনেক যত্ন করিয়া, এক জোড়া ধুতির জন্য খুব মিহি সূতা কাটিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর বলিয়াছে আর ২/৩ দিনের মধ্যেই সেই কাপড় জোড়া তৈয়ারী হইয়া যাইবে। সেই অবধি সে দুই হাতে দিনগুলি ঠেলিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলা গা ধুইয়া আসিয়া সে বিশ্বেশ্বরের প্রতীক্ষায় ছাদে বেড়াইতেছিল। খোকা বেড়াইতে গিয়াছে, মাতা, আহ্নিকে বসিয়াছেন। রাজশেখর আজ কয়দিন হইল, আদালত হইতে একটা জরুরী কাজে এক বন্ধু উকীলের বাড়ী যান। তাঁহার ফিরিতে রাত্রি প্রায়

৯/৯।। টা হয়। রাধারাণী বেডাইতে বেড়াইতে গত ৮/৯ মাসের কথা ভাবিতেছিল। এই অল্পকালের মধ্যেই তাহার কতই না পবিবর্ত্তন হইয়াছিল। গতবৎসরকার বাধারাণী আর এই রাধারাণীতে কত প্রভেদ। এই এক বৎসরে সে যে কতখানি বড় হইয়া গিয়াছে, কত গাম্ভীর্য্য তাহার মধ্যে আসিয়াছে, কত শক্তিই তাহার ক্ষুদ্র মনখানিব মধ্যে সঞ্চয় হইয়াছে ভাবিতে সে অবাক হইয়া যায়। গত বৎসর এই দিনে যদি কথাটা তাহার কাছে কেহ পাড়িত তবে সে তাহাকে নিশ্চয়ই সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিত, কিন্তু আজ তাহার নিজেরই মনে হইতেছে, কেহ যদি আসিয়া তাহাকে বলে, তাহার স্বামী স্বেচ্ছাসেবকের দলে মিশিয়া কারাবরণ করিয়াছেন, তবে যে সে অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিবে, তাহা বোধ হয় না। অবশ্য স্বামী যত দিন কারারুদ্ধ থাকিবেন, ঐহিকের সকল সুখই তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যাইবে, সে গৃহে থাকিয়াও কারাক্লেশই বহন করিবে। কিন্তু এ কথাটাও ঠিক যে সেই সঙ্গে স্বামিগর্ব্ব তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা ছাপাইয়া—উপচাইযা পড়িবে, এ শক্তি তাহাব কোথা হইতে আসিল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া রাধারাণী সেই সর্ব্বশক্তির আধাব যিনি, তাঁহার উদ্দেশে যুক্ত কর মাথায় ঠেকাইল।

সিঁড়িতে পদ শব্দ হইল, এবং অনতিকালের মধ্যেই একটি মোড়ক হস্তে বিশ্বেশ্বব আসিয়া দাঁড়াইল। মোড়কটি রাধারাণীর হাতে দিয়া সে বলিল, এই নাও বউদি, এবাব আমার ছুটি।

অর্থাৎ?

সরকারী অতিথিশালার নেমন্তন্ন আর অগ্রাহ্য করতে পারিনে।

তার মানে কালই যাচ্ছ?

নাঃ, আর কি থাকা যায়? দেশের বড় বড় নেতারা অবধি চ'লে গেলেন, বাইবে মুখ দেখাতে এখন লজ্জা করে। নেহাৎ তোমার কাপড় জোড়ার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। আজ নাম লিখিয়ে এসেছি, কালই যাব।

যাও—ভাই যাও তোমরাই মায়েব সুসন্তান, মায়ের মুখ উজ্জ্বল তোমবাই করবে। আমরা কুসন্তান, আমাদের দ্বাবা কিছুই হল না।

ও কি কথা বলছ, বউদি, তুমি যে কাজ করছ, সে কি কম কাজ, ও কাজটা সঙ্গে সঙ্গে না চললেত সবই পণ্ড হবে। সকলেরই ত এক কাজ নিয়ে থাকলে চলবে না। যার যার কাজ ঠিক মত ক'রে গেলেই আমাদের আশা পূর্ণ হবে। কালই ত তুমি দাদাকে সব কথা বলতে পাবে। তার সাহায্য পেলে আর তোমার ভাবনা কি?

বিশ্বেশ্বর উঠিতেছিল, শশব্যস্তে রাধাবাণী বলিল,—ওকি, ঠাকুরপো, তা হবে না। আজ আমার কাছে তোমায় খেতে হবে। আজ নিজের হাতে রেঁধে তোমায় খাওয়াব।

হাসিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল, — কেন? জেলে যদি ম'রে টরে যাই, সে জন্য না কি?

ষাট ষাট, ও কথা কি বলছ? কত দিন আর তোমায় পাব না. কাছে ব'সে খাওয়াতে পারব না, তাই আজ তোমায় খাওয়াব।

তা বেশত, বৌদি, ভাল খেতে তোমার এই দেওরটির কোন দিন কোন আপত্তি

দেখেছ কি? বিশেষ করে ত মা-ও নেই যে, পথ চেয়ে ব'সে থাকবেন. তোমার কাছেই খেয়ে যাব।

তবে চল, আমি রান্না করব, তুমি আমাব কাছে ব'সে ব'সে গল্প করবে।

নীচে আসিয়া রাধারাণী বামুনদি'কে বিদায় করিয়া দিল। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় একখানা আসন বিশ্বেশ্বরের জন্য পাতিয়া দিয়া সে রাঁধিতে বসিল। রান্নার যোগাড় সবই ছিল, কাজেই রান্না দ্রুতই অগ্রসর হইতে লাগিল। গল্পও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল।

এক সময়ে রাধারাণী কি ভাবিয়া একটু হাসিল। বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা কবিল—হাসলে যে?

একটা কথা অনেক দিন পব মনে পড়ল। আমি মায়েব এক সন্তান জানই ত। আমার জন্মের আগে মার অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হয়, আমার পরে আর সন্তান হয়নি। ভাই বোন কেউ নেই বলে আমাব আজন্মই বড় দুঃখ ছিল। তার পর বিয়ের আগে যখন শুনলুম যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তারও কেউ নেই, তখন বড়ই কষ্ট হয়েছিল, তের বছর তখন বয়স। কিন্তু মনে আছে, বিয়ের আগে এক দিন ঠাকুর ঘরে গিয়ে মাথা কুটে কেঁদে ছিলুম।—হে ঠাকুব। কেন আমায় এমন করলে, আমার যে একটি ভাই বা বোনের বড় সাধ ছিল। আজ মনে হচ্ছে, ঠাকুর আমার সে কান্না শুনেছিলেন। তাই শিশির-ধোয়া তাজা ফুলটির মত এই ভাইটি আমি পেয়েছিলুম।

রাধারাণীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল,—সে অঞ্চলপ্রান্তে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কহিল,—ভাই, ভেব না, এ আমার দুঃখের অশ্রু। এযে আমার কত গর্ব্বেব—কত আনন্দের অশ্রু, তা' আমার অন্তরেব দেবতা জানেন।

রাত্রিতে রাজশেখব ও বিশ্বেশ্বর পাশাপাশি বসিয়া খাইলেন। রাজশেখরের নিকট বিশ্বেশ্বর কোন কথা ভাঙ্গিল না। আহারেব পর বিশ্বেশ্বর, বাজশেখর ও রাধারাণীর পদধূলি লইয়া, খোকাব ঘুমন্ত মুখে চুম্বন করিযা বিদায় লইল। রাজশেখর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিলেন। বিশ্বেশ্বর বলিল,—কাল এক যায়গায় যাব। বাধারাণীকে বিশ্বেশ্বর বলিল,—কাল অনেক কাজ আছে, কাল আর আসতে পারব না, বৌদি।

রাধারাণী নীরবে তাহার মাথায় হাত দিযা আশীর্ব্বাদ করিল। বৃথা বাক্য দ্বারা এই পবিত্র মুহূর্ত্তটি নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

পরদিন সারাদিন রাধারাণী নীববে গৃহকার্য্য সমাধা করিল। তাহার মনটা থাকিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বরের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু সংবাদ দিবে কে? তাই সে বার বার মনকে বুঝাইতে ছিল,—খবর আবার কি? বিকেল ৩টায় বেরুবে, ছটাব মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে, এ ত জানাই কথা, তবু মনের ব্যাকুলতা সে একেবারে দূর করিতে পারে নাই।

বৈকালে গা ধুইযা সে উপরে উঠিতেছিল, হঠাৎ স্বামীর সাড়া পাইল। সে আশ্চর্য্য হইয়া মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। তিনি ত এত শীঘ্র বাড়ী আসেন না। রাজশেখর

সিঁড়িতে উঠিলেন, তাঁহার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। রাধারাণী তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি, তুমি আজ অসময়ে বাড়ী এলে যে?

এই এলুম। শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ধড়া চূড়া ছাড়িলেন, রাধারাণী চিরদিনের প্রথামতই তাঁহার সাহায্য করিল। তিনি হাত মুখ ধুইতে গেলে, সে তাঁহার চা ও জল খাবার গুছাইয়া লইয়া আসিল। রাজশেখর আসিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পাশে ছোট টেবিলে খাবার দেওয়া ছিল, তিনি তাহা টানিয়া লইয়া নীরবেই আহার করিতে লাগিলেন। রাধারাণী তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়াছিল। সে আজ স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তরই আশ্চর্য্য হইতেছিল যে মানুষ বাড়ীতে পা দিবামাত্র তাঁহার হাস্যরোলে ও কথায় গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে, স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎমাত্র হাস্যকৌতুকে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলাই যাঁহার স্বভাব, আজ তাঁহার এ কি হইল? রাধারাণীরও কথা কহিবার মত মনের অবস্থা আজ ছিল না, তাই সেও নীরবেই বসিয়া রহিল। আহার শেষ করিয়া রাজশেখর ছোট তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাসিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। মনে হইল, তাহাকে একটা বড় আঘাত দিবার ভয়েই যেন অতি আস্তে বলিলেন, রাণু, বিশু আজ এসেছিল?

না।

সে যে এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।

কি কাণ্ড?

সে যে আজ জেলে গেল।

তা'ত আমি জানি।

অ্যাঁ—রাজশেখর খাড়া হইয়া বসিয়া বলিলেন, তুমি জানতে?

হ্যাঁ, কালই সে আমায় ব'লে গিয়েছিল।

রাজশেখর বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বরকে যে রাধারাণী আপন ছোট ভাইটির মতই ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন। সেই বিশু আজ জেলে গিয়াছে, আর রাধারাণী অম্লানবদনে বলিতেছে সে পূর্ব্বেই জানিত। জানিয়াও সে বিশুকে নিবারণ করে নাই? আর তিনি কি করিয়া রাধারাণীকে এই সংবাদ দিবেন—শুনিয়া সে যখন অস্থির হইয়া পড়িবে, তখন কি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, এই চিন্তাতেই এতক্ষণ ছিলেন! না, নারী-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। তিনি খানিকক্ষণ অভিভূতের ন্যায় রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর অস্ফুট স্বরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—আশ্চর্য্য!

উচ্ছ্বসিত হইয়া রাধারাণী বলিয়া উঠিল, ওগো, আশ্চর্য্য কিছুই নয়। তুমি কি ভাবছ, আমার দুঃখ কিছুই হচ্ছে না? কত দিন তা'র মুখখানা দেখব না, জেলে তা'কে কতই না কষ্ট পেতে হবে, এ সব ভেবে আমার বুক কি ভেঙ্গে যাচ্ছে না? কিন্তু আজ আমার সকল দুর্ব্বলতার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার ভ্রাতৃ-গর্ব্ব! ওগো, আজ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখেরও সীমা নেই!

তাহার পর রাধারাণী এক কাণ্ডই করিল। সে একেবারে কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া স্বামীর পায়ে

লুটাইয়া পড়িল। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ওগো আজও কি তুমি বধির হয়ে থাকবে, আজও কি আমার প্রাণের কথা বুঝবে না? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আমি যে আর পারছিনে!

পত্নীকে উঠাইয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাজশেখর বলিলেন, নাঃ, আজ আমি তোমার কোন কথা ঠেলব না, কি বলবে বল?

কাতর নয়ন স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া রাধারাণী বলিল, তবে আজ আমায় এই ভিক্ষে দাও যে, বিলিতী কাপড় আর বাড়ীতে আনবে না। নিজেও আজ থেকে খদ্দর পরবে, আমাদেরও পরতে দেবে।

পত্নীর মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাজশেখর বলিলেন, 'ভিক্ষে কেন, রাণু, আজ থেকে তোমার আদেশ বলেই এ আমি মেনে নেব। আজ যে দৃশ্য রাস্তায় দেখে এসেছি, নির্দ্দোষ বালকদের পুলিসের হাতে যে নিগ্রহ দেখে এসেছি, তাতে পাষাণও জেগে ওঠে। কিন্তু একটা যে কথা আছে রাণী, কেনা খদ্দর পরায় যে আমার বড্ড আপত্তি। মিলের কাপড় পরলে কি হয় না?

কেনা খদ্দর কেন পরব?—বলিয়া রাধারাণী স্বামীর হাত ধরিয়া আলমারীর নিকট লইয়া গেল। আলমাবী খুলিয়া দিলে, রাজশেখর দেখিলেন, একটি তাকে বোঝাই খদ্দরের ধুতি, শাড়ী ও ছোট জামা। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এর মধ্যে এত কাপড় কোথা থেকে যোগাড় করেছ?

সূতো কেটে কাপড় তৈয়ারী করিয়েছি।

এ্যাঁ তুমি বলতে চাও, এতগুলো কাপড়ের সূতো তুমি নিজে কেটেছ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। আমি সূতো কেটেছি, ঠাকুরপো কাপড় বুনিয়ে এনে দিয়েছে। এর পরও কি বলবে, কেউ ৩ মাসেও একখানা কাপড়ের সূতো কাটতে পারে না?

না—না, রাণু, তোমার কথার উপব আর কোন দিন কোন কথাই আমি কইব না। এত দিন তোমায় নিয়ে শুধু পুতুলখেলাই করেছি, ভোগের জিনিষ বলেই তোমায় অপমান করেছি। আজ বুঝতে পারছি, তুমি আমার গৃহের কল্যাণের প্রতিমা, আজ থেকে তোমার হাত ধরেই সংসারের পথে চলব, তুমিই আমায় পথ দেখিয়ে আমার গন্তব্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে।

সাফল্যের আনন্দে রাধারাণী মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

সচিত্র 'মাসিক বসুমতী'—১৩৩১

পূজার তত্ত্ব

শ্রীসীতা দেবী

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর বৃন্দাবন সবে আসিয়া আপনার সর্ব্বদুঃখহারী হুঁকাটিকে হাতে লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার ভাইঝি কাত্যায়নী আসিয়া ঝড়ের মতন তাহার পিঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কোনোমতে নিজেকে এবং হুঁকা-কলিকা সাম্‌লাইয়া বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে কাতু, কাঁদ্‌ছিস কেন?

কাতু ফোঁপাইতে-ফোঁপাইতে বলিল, "জেঠাইমা মেবেছে।"

বৃন্দাবন কিছু বলিবার আগেই তাহার স্ত্রী ঘব হইতে গর্জ্জন করিয়া বলিযা উঠিল, "না মারবে না, ওঁকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে। একটা জিনিষ ত কোনোদিন হাতে তুলে দিতে পারেনি এপর্য্যন্ত, আদবের ভাইঝি পাঠিয়েছেন, আমাব বাপের বাড়ীর দেওয়া জিনিষপত্র ভাঙ্‌তে।"

বৃন্দাবন একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "কি আবার ভাঙ্‌ল তোমার? এসে অবধি মেয়েকে কি যে বিষ নজরে দেখেছ! খিচিমিচির জ্বালায় আর বাড়ী ফির্‌তে ইচ্ছা হয় না। নিজের পেটে ত একটাও হয়নি, এটাকেই না হয একটু আদরযত্ন করো, তা তোমার কুষ্ঠীতে লেখেনি।"

"হ্যাঁ, আদর করবে, ঝাঁটা মারতে হয অমন মেয়ের মুখে। শ্বশুরবাড়ী যাবার বয়স হ'ল, এখনও মেয়ে যেন বাঁদরের মতন নেচে বেড়াচ্ছেন। এই দেখনা আমাব আরশীখানা কেমন কুচি-কুচি ক'রে ভেঙেছে।' বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা একখানা ভাঙা আরশী হাতে করিয়া বাহিব হইয়া আসিল।

কাতু ততক্ষণ জ্যাঠার পিঠেব আশ্রয় ত্যাগ কবিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল। তাহাব বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া বলিল, "ও বুঝি আমি ভেঙেছি, ও ত পুষি ভেঙেছে।

লবঙ্গ চটিয়া গিয়া চড়া-গলায় বলিল, "পুষিকে শিকল খুলে আমার ঘরে ঢ়ুকিয়েছিল কে?"

কাতু অম্লানবদনে বলিল, "আমি তোমাব ঘবে মা-দুর্গার ছবি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, পুষি আমাব কোল থেকে ঝাঁপিয়ে তোমার আরশীর উপর পড়্‌ল ত আমি কি কর্‌ব?"

"কি আর করবে, আদরেব জ্যাঠার কোলে উঠে নালিশ করো গিয়ে আমাব নামে," বলিয়া রাগে গর্‌-গর্‌ করিতে করিতে লবঙ্গ নিজের কাজে চলিয়া গেল। কাতু খেলার সাথীর সন্ধানে বাহিব হইল্‌, বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

বৃন্দাবনের ছোটো ভাই নিবারণ ও তাহার স্ত্রী বছর ছয় আগে কলেরায় প্রায একই দিনে দেহত্যাগ করে। তাহাদের চার-বছরের মেয়ে কাত্যায়নী জ্যাঠার কাছে তাহাব পর হইতে মানুষ হইতেছে। একটি বুড়ী ঝির সাহায্যে কিছু কাল কাজ চালানোর পব সেও যখন হঠাৎ ধরাধাম হইতে বিদায গ্রহণ করিল তখন পাড়া-প্রতিবাসীর পরামর্শে এবং

নিজেও উপাযান্তর না দেখিয়া, বৃন্দাবন পুনর্ব্বার বিবাহ কবিতে রাজি হইল। পাশের গাঁয়ের পরাণ মণ্ডলের মেয়ে বয়সেও বড় এবং দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয় বলিয়া শোনা গেল, সুতবাং দিন-ক্ষণ দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন গৃহে অধিষ্ঠিত করিল।

কিন্তু কাতুকে মানুষ কবিবার জন্য যাহাকে বিশেষ করিয়া আনা হইল, দেখা গেল, বিশেষ কবিয়া কাতুর প্রতিই তাহার বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একে ত বাপের বাড়ীতে কিছু আদরে পালিত বলিয়া লবঙ্গের মেজাজ একটু অসহিষ্ণু এবং আরামপ্রিয় ছিল, তাহার উপর যে দেওরঝিটির ভার তাহার হাতে দেওয়া হইল, সেটিও অতিমাত্রায় আদর পাইয়া একেবারে শাসনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। কাজেই জ্যাঠাই এবং দেওর-ঝির কলহ ও মারামারির চোটে শীঘ্রই বৃন্দাবনের বাড়ী মুখর হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-বেচারা হিতে বিপরীত দেখিয়া হুঁকার শরণ লইল, তাহাও যখন আর সান্ত্বনা দিতে অক্ষম হইল, তখন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল কাজে এবং অকাজে। নববিবাহিতা স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপের সুযোগমাত্র তাহার কপালে ঘটিয়া উঠিল না। একটা হাড়জ্বালানী পাজী মেয়ে তাহার ঘাড়ে তুলিয়া দেওযার জন্য পত্নীটিও তাহাব প্রতি খুব যে খুসী হইয়া বহিল, তাহাও নয়।

হুঁকায় কয়েকটান দিতে না দিতেই বাইরেব দরজায ধাক্কা দিয়া কে উঁচুগলায় হাঁক দিল, "বৃন্দাবন আছ হে?" বৃন্দাবন ত্রস্ত হইযা ফিস্-ফিস করিয়া ডাকিল, "কাতু, কাতু!" কাতু আসিযা চীৎকার করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ?"

"চুপ কব্, অত চেঁচাস্‌নে, বাইবে নবীন এসেছে, ব'লে আয় জ্যাঠামশায় বাড়ী নেই।"

কাতু বাহির হইয়া গেল, এবং উচ্চকণ্ঠে আগন্তুককে খবর দিল, "জ্যাঠামশাই বাড়ী নেই গো!"

নবীন আসিয়া ছিল সুদের টাকার খোঁজে, সুতরাং সহজে হাল না ছাড়িয়া সে বলিল, "বাড়ী নেই কি? আমি এই মাত্তর যে তাকে বাড়ী আসতে দেখ্‌লাম। কোথা গেল সে?"

অত-শত জানিনে বাপু, আমাকে বলতে বলেছে বাড়ী নেই, তাই বললাম," বলিয়া কাতু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, নবীন আরো কয়েকবার বৃন্দাবনের নাম ধরিয়া বৃথা হাঁক-ডাক করিয়া আপন-মনে গজ্‌গজ্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সে যে চলিয়া গিয়াছে এ বিষয়ে যখন আর কোনো সন্দেহ রহিল না, তখন বৃন্দাবন আস্তে আস্তে আসিয়া সদর দরজার কাছে দাঁড়াইল। লবঙ্গ চেঁচাইয়া উঠিল, "এখুনি বেরোও যে? গিলতে কুটতে হবে না, বেড়িয়ে বেড়ালেই চলবে?"

"আর গেলাকোটা। তোদের জ্বালায় ঘরেও আমার দুদণ্ড বসবার জো নেই। বাইরে গেলে নব্‌নে পথে ঘাটে অপমান করে, আর ঘরে এলে তোরা জ্বালাস, না মরলে, আমার হাড় জুড়বে না।"

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া লবঙ্গ একটু নরম হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলিল, তা হলে এখুনি বেরুচ্ছ কেন? নবীন খুড়ো এখনও হয়ত রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—

"না গিয়ে আর করি কি? মেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মস্ত হয়ে উঠ্‌ল, এর পর বিয়ের চেষ্টা না কর্‌লে শেষে কি একঘরে হয়ে থাকতে বলিস?"

লবঙ্গ বলিল "মিথ্যে না বাপু। দশ বছরের মেয়ে কে বল্‌বে! মাথা যেন তালগাছে গিয়ে ঠেকেছে। হবে না? যা আদরের ঘটা! মেয়েছেলেকে অমন গোগ্রাসে গিল্‌তে দিতে আছে? পেট কাঁদিয়ে খেতে দেবে, উঠতে-বসতে ঝাঁটা লাথি দেবে, তবে না সে-মেয়ে মেয়ের মতন থাক্‌বে? তা কোথা যাচ্ছ এখন?"

বৃন্দাবন বলিল "একটা সম্বন্ধের কথা কাল শুন্‌ছিলাম দিবাকরের কাছে। ছেলের বয়স বেশী, দ্বিতীয় সংসার কর্‌বে, তাই একটু কমে হ'তে পারে কি না তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

ভাঙা-ঘরের বেড়ার ফাঁকে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো যখন বাহিরের আঁধারের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ম্লানমুখে বৃন্দাবন ফিরিয়া আসিল। লবঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'ল গা?"

বৃন্দাবন হতাশ ভরা সুরে বলিল, "হবে আর কি, আমার মুণ্ড! ঐ ত ছেলের ছিরি, তাও সাত-আট শ' টাকার কমে হ'য়ে উঠ্‌বে না।"

লবঙ্গ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা অত টাকা কোথায় পাবে গো? শেষে কি ভাইঝির জন্যে লোকের ঘরে সিঁধ্ কাট্‌তে যাবে?"

বৃন্দাবন বলিল, "সে বল্‌লে ত আর কেউ শুন্‌বে না? শেষে কি বুড়ো বয়সে জাত খুইয়ে গো-ভাগাড়ে গিয়ে মর্‌ব? দেখি, এই বাড়ী আর বাগানখানা বন্ধক রেখে কি পাই। কাতুর মায়েরও দু-চারটে সোনা-রূপোর কুচি আছে, দুইয়ে মিলিয়ে কোনোরকমে যদি কাজ উদ্ধার হয়।"

লবঙ্গ বলিল "বাড়ী ঘর বাঁধা দিয়ে কি পথে দাঁড়াবে? ভাইঝি তোমার কি স্বগ্‌গে বাতি দেবে যে তা'র জন্যে সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছ?"

"ও-ছাড়া আমার আর আছেই বা কে? ওর একটা ভালো রকম হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার্‌লে আমার পথই বা কি আর ঘরই বা কি? ক'দিন আর আছি?"

লবঙ্গ একখানা পাখা হাতে করিয়া স্বামীর সেবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল, স্বামীর মুখে এ-হেন উদার মন্তব্য শুনিয়া "তবে আমায় হাড় জালাতে বিয়ে করেছিলে কেন? আমি পরের বাড়ী ভিখ্ মেঙে খাবো এর পর," বলিয়া পাখাখানা আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

যাহার জন্য এত ভাবনা সে কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্ত-মনে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁচা পেয়ারা চিবাইতেছিল। জ্যাঠাই-মার রাগ বা জ্যাঠার দুশ্চিন্তায় তাহাকে একেবারেই কাবু করিতে পারে নাই। কান্নার শব্দে বাহিরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠাইমা কাঁদ্‌ছে কেন?" বৃন্দাবনের মুখে কান্নার কারণ শুনিয়া সে বলিল "আমি বুড়োকে বিয়ে করব না, নিশি দাদা দেখ্‌তে বেশ ভালো তাকেই বিয়ে কর্‌ব। সে টাকা নেবে না বলেছে।"

এত দুঃখেও বৃন্দাবনের হাসি পাইল। সে কাতুকে কাছে টানিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল "কা'কে বলেছে রে, তোকে?"

"হ্যাঁ, কাল আমাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে 'তোর জ্যাঠা তোকে নাকি বুড়ো বরে বিয়ে দিচ্ছে?' আমি বল্‌লাম, 'কে জানে।' সে বল্‌লে 'বারণ কর্‌ না? আমি তোকে টাকা না নিয়েই বিয়ে কর্‌ব।' "

বৃন্দাবন বলিল "ছি মা! তুই এখন বড় হয়েছিস, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে কি এখন খেলা করে, গল্প করে! ওতে নিন্দে কর্‌বে যে লোকে? শ্বশুরবাড়ী যাবি দুদিন পরে, তা'রা শুন্‌লে মন্দ বল্‌বে।"

"বলুক গে, তাই ব'লে আমি খেল্‌ব না নাকি? আমি শ্বশুরবাড়ী চাই নে।"

কিন্তু কাতু না চাওয়া সত্ত্বেও তাহার একটি শ্বশুরবাড়ী জুটাইয়া দিবার চেষ্টায় বৃন্দাবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিল। অনেক বলা-কহা, অনুনয়-বিনয় করিয়া সেই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রটিকে সে জামাতৃত্ব স্বীকারে সম্মত করিয়া ফেলিল, কিন্তু টাকার সংখ্যা কমাইতে তাহাকে কোনো-প্রকারেই রাজি করিতে পারিল না। লবঙ্গ বলিল, "হ্যাঁ গা খুব ত পাকা কথা দিয়ে বস্‌ছ, কিন্তু এ ভাঙাবাড়ী বেচ্‌লেও ত আটশ' টাকা হবে না, কোথা থেকে দেবে?"

"বাড়ী কেন আমাকে বেচ্‌লেও হবে না।"

"তবে রাজি হ'লে কি ব'লে?"

"রাজি না হ'য়ে আর উপায় কি? কোনোরকমে হাতে পায়ে ধ'রে বিয়েটা দিয়ে দেবো, তা'র পর কাতুর কপাল! আমার নিজের অপমানের জন্য ভাবিনে, দু-ঘা জুতো মার্‌লেও স'য়ে যাবো।"

লবঙ্গ বলিল "ওমা; তা'র পর সভায় ব'সে, টাকা কম দে'খে যদি বিয়ে না করে. তখন যে-জাতের জন্যে অত, তাই ত খোয়াবে। তোমার ঘটে কি এক-ফোঁটা বুদ্ধি নেই?"

বৃন্দাবন বলিল, "তা কর্‌বে না। দিবাকরদের বাড়ী কাতুকে দে'খে তা'র ভারি পছন্দ হয়েছে। নিজের ভাইঝি, বল্‌তে নেই, কিন্তু দেশে অমন মেয়ে আর-একটি-খুঁজ্‌লেও পাবে না। নিতান্ত অদেষ্ট তাই দোজবরের হাতে দিচ্ছি, তা না হ'লে কাতু আমার রাজার ঘরে পড়্‌বার যুগ্যি।"

দেওর-ঝির রূপবর্ণনায় কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ না করিয়া লবঙ্গ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে-করিতে ঘরে চলিয়া গেল।

নিতান্ত না হইলে নয় এইরূপ দুচারখানা গহনা কাপড় প্রভৃতি কোনোপ্রকারে জোগাড় করিতে-করিতেই বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বৃন্দাবনের জীর্ণবাড়ী লোকজনের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কাতু এতদিন এ বিবাহে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। আজ কিন্তু তাহার একটু ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল। এই ছেঁড়া সামিয়ানা, এই লাল চেলীর শাড়ী, রূপার ও সোনার গহনা, শোলার মুকুট, সব-কিছু তাহারই জন্য আমদানি হইয়াছে মনে করিয়া সে একটু উৎসাহ অনুভব না করিয়া থাকিতেই পারিল না। সমবয়সী বাল্য-সঙ্গিনীদের সঙ্গে সমানে চীৎকার করিয়া ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে বিয়ের ক'নে, তাহাকে যে এমন করিতে নাই, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বর্ষীয়সীরা তাহাকে বিন্দুমাত্রও দমাইতে পারিলেন না।

চেলী-চন্দনে সুসজ্জিতা কাতুর কচি মুখের দিকে তাকাইয়া বৃন্দাবন কেবলই চোখ মুছিতে লাগিল। তাহার ঘর আঁধার করিয়া এই আনন্দবর্দ্ধিণী স্নেহের পুত্তলি ত চলিল, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টেই বা কি আছে তা কে জানে? প্রাণপণ-চেষ্টা করিয়াও সে চার-শতের বেশী টাকা জোগাড় করিতে পারে নাই। বর-পক্ষের হাতে নিজে সে সব-রকম লাঞ্ছনা সহিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু কাতুকে যদি তাহারা ইহার জন্য যন্ত্রণা দেয়? উপবাস-ক্লিষ্ট বৃন্দাবন চোখে অন্ধকার দেখিয়াই যেন বসিয়া পড়িল।

কিন্তু বসিয়া থাকিবারই বা তাহার অবসর কোথায়? বরযাত্রীগণের শুভাগমনের শব্দে উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটিতে হইল। ছেঁড়া সামিয়ানার তলায় পরম গম্ভীর-মুখে বর তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপবেশন করিলেন। কয়েকটা হুঁকা ঘন-ঘন এ হাত হইতে ও-হাতে ফিরিতে লাগিল, ফাটা চিম্‌নি-ওয়ালা কেরোসিনের বাতি-কয়েকটা প্রচুর ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে অন্ধকার-নাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনের মন আশঙ্কার কালিমায় ক্রমেই আগাগোড়া মসীলিপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পণের টাকা লইয়া ষোল-আনা গোলমাল। অনুনয়-বিনয়, হাতে-পায়ে ধরা কিছুতেই কিছু হইল না। বরপক্ষ সভা ছাড়িয়া যাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু এ-হেন সময়ে প্রৌঢ় বরটি হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়া এমন পাকা ঘুঁটি একেবারে কাঁচা করিয়া তুলিল। কাতুর গৌরীর মতন ফুট্‌ফুটে মুখখানি তাহার কঠোর মনে বেশ একটু দাগ কাটিয়া বসিযাছিল বোধ হয়। সে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল, আপনার মামা কাকা প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিবার কোনো লক্ষণই দেখাইল না।

বৃন্দাবন মনে-মনে ইষ্টদেবতার নাম জপিতে-জপিতে কোণে দাঁড়াইয়া বলির পাঁঠার মতন কাঁপিতেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত করিয়াছিল যে, সে চোখের সাম্‌নে কি যে হইতেছে, তাহাও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রতিবেশী যাদব যখন তাহাকে ঠেলা মারিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে নিতান্তই তাহার বাগ্মিতায় আজ শেষ রক্ষা হইয়াছে, তখনও সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাদব তাহাকে আর-এক ঠেলা মারিয়া বলিল, "কি হে, অমন ভেড়ার মতন তাকিয়ে রইলে যে? মেয়ে-সম্প্রদান কর্‌তে হবে না?"

বৃন্দাবন যন্ত্র-চালিতের মতন আগাইয়া আসিল। পুরোহিত তাহাকে মন্ত্র পড়াইলেন, সে যে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহা স্বয়ং ব্যাসদেবও বুঝিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, তাহাতে কাতুর বিবাহ আট্‌কাইল না।

খাইতে বসিয়া বরের মামা একটা বিকট হাসিতে সমস্ত মুখখানা ভরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হে বেয়াই খুব ঠাট্টাটা আজ ক'রে নিলে। এর পর ঠাট্টার পালা আমাদের সেটা মনে রেখো; মেয়ে ত আমাদের ঘরেই থাক্‌ল।"

বৃন্দাবন তাঁহার রসিকতায় হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি তাহার ঠোঁটের কাছে আসিতে-না আসিতেই মিলাইয়া গেল!

পরদিন ভোর হইতে না হইতে বরযাত্রীর দল বরক'নে লইয়া বিদায় হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক'নের মা নাই, কাজেই মেয়ে বিদায় হইবার সময় চেঁচাইয়া হাট বসানোর পালাটা লবঙ্গ কোনো-প্রকারে সংক্ষেপে সারিয়া লইল। ক'নের জিনিষপত্র গোছানো, তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া প্রভৃতির ভার লইল, পাড়া-প্রতিবেশিনীরা। কিন্তু সবাইকে অবাক্ করিল বৃন্দাবন। বর-ক'নে তাহাকে প্রণাম করিবামাত্র সে ভাইঝিকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে মানুষের মতন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আশীর্ব্বাদের ধানদূর্ব্বা তাহার হাত হইতে খসিয়া কোথায় যে পড়িল তাহার ঠিকানা নাই, কান্নার আবেগে সে নিজেই যেন ভাঙিয়া দুম্‌ড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশিনী ফিস্-ফিশ্ করিয়া বলিল, "এ বাপু আদিখ্যেতামো। নিজের মেয়েও না, ভাইয়ের মেয়ে, তা'র উপর শ্বশুরঘর কর্‌তে যাচ্ছে, আর কিছু মন্দ না, তা'তে লোকটা করে দেখ্ না।"

লবঙ্গ এতক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর কাণ্ড দেখিতেছিল, এতক্ষণে একজন মতে মত দিবার লোক পাইয়া বলিল, "যা বলেছ মাসী, ওর ধারাই অম্‌নি সৃষ্টি ছাড়া। এই ক' বছর বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে আমার হাড় ভাজাভাজা ক'রে তুলেছে।"

কাতু কাঁদিতে-কাঁদিতে বিদায় হইয়া গেল। তাহার পোষা বিড়ালছানা কাতরধ্বনি করিতে-করিতে এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পরিত্যক্ত ঘরের জান্‌লা ঝোড়ো-হাওয়ায় আছড়াইয়া-আছ্‌ড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। একটা নিদারুণ শূন্যতা বৃন্দাবনের বুকে যেন পাথরের মতন জাঁকিয়া বসিয়া রহিল, সে নির্জ্জীবের মতন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, লবঙ্গের তীব্র কণ্ঠের বকুনিও তাহাকে কিছুমাত্র সচেতন করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার আকাশটা কাল-বৈশাখীর ভ্রূকুটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। পাঁজী দেখিলে যদিও দেখা যায় যে বৈশাখ মাস আর নাই, তিনি প্রচণ্ডতর জ্যৈষ্ঠকে আসন ছাড়িয়া দিয়া ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তবু ঝড়ের বিরাম নাই। ধূলি ধ্বজা তুলিয়া প্রবল বিক্রমে তিনি জয়রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন তাপক্লিষ্টা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া।

বৃন্দাবন দাওয়ার উপর বসিয়া গাম্‌ছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছিল। তাহার জীর্ণ বাড়ীখানির চেহারা জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে, একটা নিরানন্দতার প্রলেপ কে যেন অদৃশ্যহস্তে গৃহ ও গৃহস্বামীর মুখে সমানভাবে মাখাইয়া দিয়াছে। কাতু নাই, তাই এ-বাড়ীতে আর হাসি নাই, কোলাহল নাই, তরুণ প্রাণের কোনো সাড়া নাই। আপনার দুঃখ ও চিন্তার ভারে অকালজরাগ্রস্ত বৃন্দাবন কোনোরূপে টিকিয়া আছে, স্বামী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিতা লবঙ্গ আরো যেন কঠিন ও কঠোর হইয়া আপনার হৃদয়ের জ্বালায় চারিদিকে জ্বালা ধরাইয়া বেড়াইতেছে।

ভাঙা সদর-দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার পিছনে একটি কিশোরী বিধবা। দুজনের মাথাতেই বেতের প্রকাণ্ড ঝুড়ি। বৃন্দাবন আশঙ্কাপূর্ণ-দৃষ্টিতে আহাদের দিকে তাকাইতেই বৃদ্ধাটি কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব জায়গায়

পাঠিয়েছিলে কায়েত-খুড়ো। আমরা ছোটোলোক বটি, কিন্তু এমন ছোটোলোকোমি বাপেব কালে দেখিনি। তত্ত্ব তা'রা নিলে না গো, এই নাও তোমাদের জিনিষপত্তর।'' ঝুড়ি দুইটা দুম্‌দুম্ করিয়া দাওয়ার উপর নামাইয়া তাহারা মায়ে-ঝিয়ে বসিয়া পড়িল।

একটা ঝুড়ি ভর্ত্তি বাসি মিষ্টান্ন, অল্পদামী খেল্‌না, পানের মশলা। আর একটাতে একখানা খয়ের-রঙের শাড়ী, গোলাপী কাপড়ের উপর কালো লেসের ঝালর-লাগানো একটি জ্যাকেট, লাল ডুরে গাম্‌ছা, কোঁচানো ফরাস্‌ডাঙার ধুতি-চাদর, বিলাতী এসেন্স্, চুলের তেল, সাবান, ফিতা, কাঁটা। লবঙ্গকে ঘরের বাহিরে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া বুড়ী আর-একপালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল ''এই নাও গো, জিনিষ-পত্তর মিলিয়ে নাও। যেমন গেছে তেম্‌নি এসেছে, কিছু তা'রা ছোঁয়নি। হেঁটে-হেঁটে পা-দুটো ত খসিয়ে এসেছি; তাও যদি গাল-মন্দ-ছাড়া একটা ভালো কথা শু'নে আস্‌তাম। কুটুমের বাড়ী প্রথম তত্ত্ব, কোথায় পেট ভ'রে খাবো, কাপড় টাকা বখ্‌শিশ পাবো, তা না এক-ফোঁটা জলসুদ্ধ মুখে দিতে বল্‌লে না গা, এমন চামার কুটুম করেছ।''

''তা আমায় বল্‌ছিস্ কেন লা, আমি কি তোদের পাঠিয়েছিলাম? যার সোহাগের কুটুম, তা'কে শোনাগে যা, জিনিষ বুঝিয়ে দিগে যা,'' বলিয়া লবঙ্গ দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দুই পক্ষ হইতে গাল-মন্দ খাইয়া বুড়ীর মেজাজ ভীষণ রকম চড়িয়া উঠিল। সে চেঁচামেচি করিয়া একটা প্রলয় কাণ্ড করিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া বৃন্দাবন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—''থাম্ বাছা থাম্, রাগ করিস্‌নে। বৌটা নানা জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়ে-পেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে, তা'র কথা কি ধর্‌তে আছে? বোস্, একটু জিরিয়ে নে, জলটল খা, বুড়ো মানুষ এতটা পথ হেঁটে এসেছিস্।''

মিষ্ট কথায় একটুখানি শান্ত হইয়া বুড়ী বাক্যের স্রোত মাঝ-পথে থামাইয়া চুপ করিয়া গেল। তত্ত্বের ঝুড়ি হইতে মিষ্টান্ন তুলিয়া, ভাঁড়ার হইতে মুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন তাহাদের তৃপ্তিপূর্ব্বক জলযোগ করাইল। তা'র পর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল ''তা'রা কি বল্‌লে?''

বুড়ী বলিল, ''না বল্‌লে কি? শাশুড়ীটা যেন সাক্ষাৎ রাক্ষুসী গা, আমাকেই যেন তেড়ে খেতে এল। বলে, 'নিয়ে যা তোর আড়াই আনার তত্ত্ব, তা না হ'লে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর্‌ব। চার-শ টাকা দিতেএখনও বাকি, তা বেয়াই-বেহায়ার খেয়াল আছে? তা'র এক পয়সা না দিয়ে দুটো কাপড় আর মিষ্টি পাঠিয়েছেন মেয়ে জামাইকে সোহাগ ক'রে! লাথি মারে আমার ছেলে অমন তত্ত্বের মুখে। গিয়ে তা'কে বল্‌গে যা, পূজোর তত্ত্ব ভালো ক'রে করে যেন, ভালো চায় যদি। তখনো যদি টাকা না পাঠায় ত তা'র মেয়েরই একদিন কি আমারই একদিন।' ''

বৃন্দাবন শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ''কাতুকে দেখ্‌তে দিলে?''

''সেইসময় পুকুর থেকে জল নিয়ে ফির্‌ল, তাই দেখ্‌তে পেলাম, তা না হ'লে কি আর দেখা কর্‌তে দিত? আহা, অমন সোনার পিরতিমে, তা'র যা দশা হয়েছে খুড়ো!

তুমি দেখ্‌লে চিন্‌বে না; দুখানি হাড়-ছাড়া কিছু আর বাকি নেই, অমন যে দুধে-আল্‌তা-গোলা রং, তাও যেন কালী হ'য়ে গেছে।''

বৃন্দাবন বলিল ''কথা-বার্ত্তা কইলে কিছু?'' ''শাশুড়ীটা একবার ঘরের ভিতর গেল। তখন আমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্‌লে, 'কৈবত্ত দিদি, জ্যাঠাকে বলিস পূজোর সময় যেন ভালো ক'রে তত্ত্ব ক'রে আমায় নিয়ে যায়, তা না হ'লে এরা আমায় মেরে ফেল্‌বে। আমাকে একবেলা মোটে খেতে দেয়, আর সবাই মি'লে বকে, মাঝে-মাঝে মারে।''

বৃন্দাবন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সদাহাস্য-ক্রীড়াময়ী আদরিণী ভাইঝিটিকে এই ভয়াবহ বর্ণনার মধ্যে সে যেন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাইতে দেয় না, গাল দেয়, মারে। কি নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর সে স্বহস্তে তাহার স্নেহের পুত্তলিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের শীর্ণ বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা বিপুল দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। সে ত রিক্ত. সর্ব্বস্ব হারা, কিসের জোরে কাতুকে তাহার নির্য্যতনকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিবে? বাগান, বাড়ী,—সব মহাজনের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, দুদিন পরে তাহাকেই সস্ত্রীক পথে দাঁড়াইতে হইবে। নগদ টাকা, কাতুর মায়ের গহনা, এমন-কি, নিজের পরলোকগতা পত্নীর এক-জোড়া সোনার বালা, যাহা সে অনেক-কষ্টে এতকাল লবঙ্গের শ্যেন দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সমস্তই কাতুর বিবাহে খরচ হইয়া গিয়াছে। নিজেকে বন্ধক রাখিলেও আর তাহার কোথাও এক-পয়সা ধার পাইবার আশা নাই। লবঙ্গের গুটি-কয়েক গহনা আছে, কিন্তু তাহা সে চাহিবে কোন্ মুখে? নিজের বিবাহের পর স্ত্রীকে একটা সোনা-রূপার কুচি কখনও হাত তুলিয়া দেয় নাই, আদর-যত্নেও যে অত্যধিক করিয়াছে তাহা কোনো শত্রুতেও বলিবে না। এখন কি বলিয়া সে লবঙ্গের বাপের-দেওয়া গহনা-ক'খানা দাবি করিবে? আর করিলেই বা কি? লবঙ্গকে কাটিয়া ফেলিলেও যে সে আপনার শেষ সম্বলটুকু ছাড়িতে রাজি হইবে না, তাহা বৃন্দাবনের বেশ ভালো করিয়াই জানা ছিল।

''ব'সে ভাব্‌লে আর কি হবে? যা হয় একটা বিহিত কোরো, মেয়েটা তা না হ'লে বাঁচ্‌বে না,'' বলিয়া কৈবর্ত্ত বুড়ী তাহার কন্যা লইয়া বিদায় হইয়া গেল। বৃন্দাবন পাথরের মতন বসিয়াই রহিল। খানিক পরে লবঙ্গ বাহির হইয়া তত্ত্বের জিনিষগুলা বকিতে-বকিতে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

বৃন্দাবন সারাদিন ভূতাবিষ্টের মতন ঘুরিয়া বেড়াইল। টাকার চেষ্টায় বৃথা সকলের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া অপমানিত হইয়া আসিল। সন্ধ্যা বেলা ঘরে আসিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল, সহস্র সাধ্য সাধনা বাক্য-ব্যয় করিয়াও লবঙ্গ তাহাকে কিছু-একটা মুখে দেওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু দিন কাটিয়াই চলিল। আষাঢ়ের বিপুল ধারা বর্ষণে জ্যৈষ্ঠের তাপ জুড়াইয়া গেল, আবার দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল, খালে, বিলে, কুমুদ-কহ্লারের আগুন ধরিয়া উঠিল, দূরে মাঠে শরৎলক্ষ্মী কাশখচিত হরিৎ বসনাঞ্চল দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতে

লাগিল। কিন্তু ভগ্ন-হৃদয় বৃন্দাবনের জীবনের মেঘ কাটিল না, বৈশাখের কাল ঝড় যেন তাহার বুকে চিরন্তন বাসা বাঁধিয়া বসিল।

পূজার ত আর দেরি নাই। বৃন্দাবন যেন পাগল হইয়া উঠিল। সে যার-তার কাছে গিয়া পায়ে ধরে, যাকে তা'কে মারিতে যায়। লবঙ্গ তাহার রকম-সকম দেখিয়া বলিল "আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও বাপু, এখানে থেকে কি শেষে পাগলের হাতে খুন হ'য়ে মর্‌ব?" বৃন্দাবন কিছু জবাব না দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সারাদিন আর তাহার দেখাই পাওয়া গেল না।

তাহার ভাত আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া যখন শ্রান্ত লবঙ্গ রান্নাঘরেই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তখন বৃন্দাবন চুপি-চুপি ফিরিয়া আসিল। তাহার পদ-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া লবঙ্গ নিদ্রা-জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কে গা?"

বৃন্দাবন সাড়া দিয়া বলিল, "আমি। একবার এ-দিকে শু'নে যাও।"

লবঙ্গ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এখন শুন্‌ব কি ঘোড়ার ডিম, গিল্‌বে না, কত-রাত আর ব'সে থাক্‌ব?"

"না আমার ক্ষিদে নেই, তুমি শু'নেই যাও না।" লবঙ্গ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও উঠিয়া আসিল।

বৃন্দাবন তাহাকে শোবার ঘরে টানিয়া আনিয়া বলিল "তোমার গোটা-দুই গয়না আমায় ধার দাও, আস্‌চে মাসে আবার গড়িয়ে দেবো।"

রাগে ও বিস্ময়ে লবঙ্গের প্রায় বাক্-রোধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "একেবারে সব লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এসেছ? আমার গয়না চাও তুমি কোন্ হিসেবে? কখনো কিছু দিয়েছ আমায়? দাসীর মতন হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে, এক-বেলা ভিক্ষে ক'রে, ধার ক'রে খাই আমি, অন্য স্বামী হ'লে এতদিন গলায় দড়ি দিত স্ত্রীর এমন দশা দে'খে। আর তুমি বুড়ো ধাড়ী এসে স্বচ্ছন্দে বল্‌ছ, 'গয়না দাও, আবার গড়িয়ে দেবো। কি দিয়ে গড়াবে শুনি? এই ঘরের ভাঙা বাঁশ গুলো দিয়ে?"

বৃন্দাবন গোঁজ মুখ করিয়া বলিল, "যা দিয়েই গড়াই, দিলেই ত হ'ল, তুমি এখন দাও না?"

লবঙ্গ গলার স্বর আরো চড়াইয়া বলিল, "আমাকে খুন কর্‌লেও দেবো না। কি কর্‌বে তুমি আমার গয়না নিয়ে?"

"কাতুকে আন্‌ব, তা'রা বাকি টাকা না দিলে কিছুতেই পাঠাবে না। ওকে তা'রা মারে, খেতে দেয় না, বড় যন্ত্রণায় আছে।"

"আর আমি বড় সুখে আছি না? খেয়ে-খেয়ে ফু'লে উঠ্‌ছি। মরুক গে তোমার ভাই-ঝি, হাড়জ্বালানী, সর্ব্বনাশী তা'র জন্যেই না এই দুর্গতি আজ।"

বৃন্দাবন চোখ পাকাইয়া বলিল, "গয়না দাও বল্‌ছি, তা না হ'লে ভালো হবে না।"

"মা গো, খুন ক'রে ফেল্‌লে গো, তোমরা কে কোথায় আছ, এস গো," বলিয়া লবঙ্গ এমন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির

হইয়া পড়িল। তাহার দুঃখভার-পীড়িত মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। সমস্ত মন জুড়িয়া বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া কেবল একটা কথাই জাগিয়াছিল, টাকা চাই।

চলিতে-চলিতে সে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও তাহার জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ সাম্‌নে জলরাশি দেখিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতে কখন সে গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই ত তাহাদের গ্রামের সীমান্তপ্রবাহিনী বাঁকা নদী। সে চলিয়াছে কোথায়, কেনই বা?

শুক্লা দশমীর আধো জ্যোৎস্নায় বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। জনমানব নাই, চারিদিক্ খাঁ-খাঁ করিতেছে। বৃন্দাবনের কোনোদিকেই খেয়াল ছিল না, কেবল একটা ভাবনাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল, 'টাকা চাই।'

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল, আগা গোড়া বস্ত্রাবৃত, নদীর স্বল্প-গভীর জল পার হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনের গাটা একবার ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল, এই বাঁকা নদীর ধারেই যে তাহাদের দুই গ্রামের শ্মশান! কিন্তু তাহার অভিভূত মন বেশীক্ষণ ভয়কেও আমল দিল না ভূতই যদি হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার আর ভয় কিসের?

মূর্ত্তিটি ততক্ষণ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ আলোকে বৃন্দাবন দেখিল তাহার হাতে ছোটো একটি ক্যাশবাক্স, চাদরের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। মানুষটি এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়াছে যে সে স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বৃন্দাবন হঠাৎ একলাফে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া ক্যাশবাক্সটি কাড়িয়া লইল। মানুষটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানেই বালির উপর গড়াইয়া পড়িল। তাহার চাদরের আচ্ছাদন খুলিয়া গেল।

বৃন্দাবনের তখন সে-দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে আছড়াইয়া ক্যাশবাক্সটা ভাঙিতে ব্যস্ত ছিল। দুইচারবার আছাড় দিতেই তাহার ডালাটা খসিয়া আসিল, গুটি-কয়েক ছোটো ছোটো গহনা বাহির হইয়া পড়িল।

এক-জোড়া সোনার বালার উপর চোখ পড়িতেই বৃন্দাবন সর্পাহতের মতো চম্‌কিয়া উঠিল। তাহার পর বাক্স গহনা, সব ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই ভূপতিতা, নারী-মূর্ত্তির পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না ক্ষীণ আলোয় দেখিল, সে বিস্ফারিত-স্থির-নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, বুকের উপর হাত দিয়া দেখিল সেখানে কোনো স্পন্দন নাই।

এমন-একটা হৃদয়-ভেদী হাহাকার সেই শ্মশানভূমিও কখনো শোনে নাই বোধ হয়। "মা গো, তুই আমার কাছে আস্‌ছিলি, আমিই তোকে যমের মুখে ঠেলে দিলাম।" তা'র পর দুইটি দেহ পাশাপাশি সেই বালির উপর পড়িয়া রহিল, কোন্‌টি জীবিত, কোন্‌টি মৃত কিছুই আর বোঝা গেল না।

ভোর হইতে-না হইতে সেই পথে লোকচলাচল সুরু হয়। পথিকের দৃষ্টি ক্রমে তাহাদের উপব পড়িল। তাঁহার পর গাঁয়ের লোক, পুলিশ, দারোগা, ডাক্তার সবই এক-একে উপস্থিত হইল।

ডাক্তার মৃত বালিকার দেহ সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া রায় দিলেন, হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

জীবিতটিকে লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদের কাজ অত সংক্ষিপ্ত হইল না। হত-চেতন বৃন্দাবনকে কোনোপ্রকারে সচেতন করিয়া যখন সহস্র প্রশ্নেও তাহার নিকট হইতে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না, তখন মারের চোটে তাহাকে তাহারা পুনর্ব্বার হতচেতন করিয়া ফেলিল।

একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মৃতা বালিকা এবং তাহার জ্যাঠা পাশাপাশি শুইয়া চলিল। কাতু পূজার সময় বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

'প্রবাসী'—১৩৩২

গাঁয়ের ডাক্তার

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

ডাক্তার বেচারাম চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তারী বিদ্যাটা তাঁহার কতখানি জানা ছিল তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, সেসব কথা বলিয়া বিশেষ আবশ্যকও নাই।

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র। আজ কালকার দিনে দশ টাকায় দিন চালানো বড় কঠিন, তবে কোনক্রমে তাঁহার চলিয়া যাইত, কারণ সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না।

লোকটী ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, কোনও জটিল ব্যাপারে কিছুতেই জড়াইয়া পড়িতেন না। এখানে বাস করিয়া গ্রামের একজন হইয়াও তিনি সকলের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন।

রায়েদের প্রকাণ্ড বড় বাগান, মাঝখানে বড় একটী পুষ্করিণী, জলটি তাহার কাচের মত স্বচ্ছ। বাঁধানো ঘাটের দুইপার্শ্বে সারি সারি কয়টী বকুল গাছ। বর্ষার সময়ে বকুল ফুটিয়া উঠিত, ঝরিয়া তলা বিছাইয়া পড়িত। এ পাশের কেয়াগাছগুলিতে ফুল ফুটিত, কেয়া বকুলের গন্ধ লইয়া মাতাল ভ্রমর ছুটাছুটি করিত। আম গাছের শাখায় বসিয়া দোয়েল শিস দিত, পাতায় পাতায় খঞ্জন নাচিয়া বেড়াইত। বকুলতলা শূন্য হইতে না হইতে এদিককার শিউলি গাছগুলি সাদা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিত, সমস্ত রাত্রে গন্ধ বিলাইয়া সকালে ঝরিয়া পড়িত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ফুল কুড়ানোর বিরাম ছিল না, সমস্ত বাগানটা তাহাদের অশান্ত পদবিক্ষেপে, চপল চীৎকারে তরল হাসিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই বাগানের একটী পার্শ্বে পথের ধারে ছিল চক্রবর্ত্তী ডাক্তারের ছোট্ট খড়ের ঘরখানা। চারচালা বারান্দা, মাঝখানে দুখানা মাত্র ঘর। এক দিককার বারান্দা খানিকটা ঝাঁপ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহাই রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হয়। ঘর হইতে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দাতব্য চিকিৎসালয়। এ ঘরটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খুঁটিগুলিতে উই ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, চাল অনেক জায়গায় নাই, দেয়ালটি কোনক্রমে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। এই ঘরখানির মধ্যে গুটি দুই ছোট আলমারী আছে, একখানা অতি জীর্ণ কোন অতীতের সাক্ষী চেয়ার আছে,—তাহারই সমসাময়িক একখানা টেবিলও সেখানে আছে।

যিনি এই দাতব্য চিকিৎসালয়টী স্থাপন করিয়াছিলেন সেই দয়ার্দ্রহৃদয় উদারস্বভাব জমীদার রজনীনাথ এখন পরলোকে। দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া ছিল; ইহারা ব্যারামে পড়ে, এক শিশি ঔষধ পায় না, ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দরিদ্রের কষ্ট তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিজ ব্যয়ে এই চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন লোকে খাঁটি

ঔষধ পাইয়াছে, সকল রকম ঔষধই তখন মজুদ থাকিত। তাঁহার অন্তে চিকিৎসালয় গৃহটির সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার কথানুসারে তরুণ জমিদার অবনীনাথকে বাধ্য হইয়া এই চিকিৎসালয়ে বৎসরান্তর কিছু করিয়া ঔষধ আনাইয়া দিতে হইত, অপদার্থ ডাক্তারকে মাস মাস দশটা করিয়া টাকা যোগাইতে হইত।

ঔষধ আগে আসিত প্রচুর, লোকে খাঁটি ঔষধ পাইত, এখন ডাক্তারখানায় আছে শুধু ক্যাষ্টর অয়েল ও কুইনাইন মিকশ্চার। সেই ডাক্তার মহাশয়ই এখনও মিকশ্চার তৈয়ারী করেন, কিন্তু এখন তাঁহার হাত কাঁপে, জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ঔষধের শিশি দিয়া তিনি যখন বলিয়া দেন— কেমন থাকে বলে যাস, —বলিতেই মনে পড়িয়া যায় তিনি যে ঔষধ দিয়াছেন তাহা নিছক জল মাত্র। যে ঔষধে তিনি আগে একটি দাগ করিতেন এখন তাহাতে আট মাত্রা হয়।

কিন্তু এ মিথ্যাকে ঢাকার সকল চেষ্টাই তাঁহার ব্যর্থ হইয়া যাইত। কেন না লোকের অসুখ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছিল, তথাপি অজ্ঞ লোকেরা এই ঔষধই গ্রহণ করিত।

তাঁহার দেশ পূর্ব্ববাংলার কোন পল্লীগ্রামে। কদাচিৎ তিনি দেশে যাইতেন, কারণ, তাঁহার কেহই ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভে পত্নী পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক জিদ করিয়াও পুত্রের আর বিবাহ দিতে পারেন নাই।

দেশ হইতে ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায়ই পত্র দিতেন, মাঝে মাঝে দেশে আসা দরকার। তদুত্তরে তিনি জানাইতেন তাঁহার কি যাইবার যো আছে, একদণ্ড কোথাও সরিবার যো নাই, কারণ এত বড় গ্রামটার সব লোকগুলি তাঁহারই মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে, তিনি একটা দিন কোথাও গেলে ইহাদের দেখার লোক নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের পাঁচু মণ্ডল, ছকু মিঞা, রামচন্দর সাক প্রভৃতি লোকগুলি তাঁহার বারাণ্ডায় বসিয়া পাঁচটা সুখ দুঃখের কথা পাড়িত, তাহারই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানাইয়া দিতেন—"এই দেখ, আমার ভাই ভাইপো দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে চিঠির ওপর চিঠি দিচ্ছে, কিন্তু যাই বা কি করে? তাদের লিখে দিলুম,—এখন তো আমার কোন রকমেই যাওয়া হতে পারে না এই সব অসুখ বিশুখ নিত্য এ গাঁয়ে লেগে রয়েছে, চোলে গেলে যদি কিছু হয়—অমারই পাপ,— তোমাদের আর কি।"

গ্রামের বুদ্ধিমান মণ্ডলগুলি চমকাইয়া উঠিত, আরও ভাল করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে আঁকড়াইয়া ধরিত, "তা কি হয় ডাক্তার মশাই, আপনি গেলে আমরা দাঁড়িয়ে মরব। যাও বা এক আধ শিশি ওষুধ পাচ্চি তাও আর পাব না।"

গদগদকণ্ঠে ডাক্তর বলিলেন, "সেটা কি আমি বুঝিনে মণ্ডল,—এই জন্যেই তো যাইনে, নইলে সেখানে আমার অভাব কিসের? দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়্ছি, তারা এখন আমায় বসিয়ে খাওয়াতে চায়; কিন্তু ওই যে বল্লুম,— কেবল তোমাদেরই জন্যে,—নইলে এখানে থাকায় আমার কি লাভ হয় বল?"

এমনই করিয়া দিন বেশ কাটিয়া যাইত।

২

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। আম বাগান আমে ভরিয়া উঠিয়াছে, বালক বালিকাদের দৌরাত্ম্যও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে কয়টি দল কাগজে লবণ ও হাতে ছুরি,—অভাবে শামুকের খোলা লইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত দুপুরটা ইহাদের শ্রান্তি নাই।

ডাক্তার মশাই নিজের গৃহটীর মধ্যে একখানা তক্তার উপরে মাদুরটা বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, পাঁচু মণ্ডলের বিধবা মেয়ে নারায়ণী বাসনগুলা মাজিতে লইয়া গিয়াছিল; সে সেগুলা মাজা শেষ করিয়া বারাণ্ডায় উপুড় করিয়া সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে শ্রান্তভাবে বলিল, "বাবা—কি রোদ; চারিদিক যেন ঝলসে উঠছে।"

গৃহমধ্য হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক্তার মশাই বলিলেন, "তোকে তো তখনি বারণ করলুম নারাণী—এত রোদে ওগুলো মাজতে নিয়ে যাসনে—শুনলিনে তো আমার কথা।"

নারায়ণী শ্রান্তভাবে বাবাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনার যেমন কথা ডাক্তার মশাই, বিকেল বেলা কি ঘাটে যাবার যো আছে? গাঁয়ের ভদ্দর লোকের ছেলেরা এমন বদ, ঘাটে পথে দেখলে যা না তাই বলে বসে। আমরা গরীব মানুষ, তাদের কথা বলতে পারিনে যে, তাই সব সয়ে যেতে হয়।"

আর একদিনকার কথা ডাক্তারের মনে জাগিয়া উঠিল। নাবায়ণীর পিতা একদিন বড় দুঃখ করিয়াই বলিযাছিল, "ভদ্দরলোকের ছেলেদের জ্বালায় আমাদের মত গরীব লোকদের পরিবার নিয়ে গাঁয়ে বাস করা দুরূহ হয়ে উঠল দেখছি।"

কেন যে সে একথা বলিয়াছিল তাহা বুঝিতে ডাক্তারেব বিশেষ বিলম্ব হয় নাই, একদিন ঘাটেব পথে এ প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন।

তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, "কথা শোনার চেয়ে দুপুরে কাজ করে রাখিস সে ভাল; কিন্তু এখন এই দুপুর রোদে কি করে বাড়ী ফির্‌বি নাবাণী? খানিকটা বস, রোদটা একটু ক'মে আসুক, তারপরে যাস।"

এই মেয়েটীব বিবাহ হইয়াছিল খুব কম বয়সে, সে নাকি তখন চার পাঁচ বছরের ছিল মাত্র, সাত আট বৎসর বয়সেই সে বিধবা হয়। মা এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, বছর খানেক হইল তিনি মারা গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতা আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই নূতন বধূটীর সহিত নারায়ণীর মোটেই সদ্ভাব জন্মে নাই। বধূটী প্রায় তাহার সমবয়স্কা, ঝগড়া বিবাদে সুদক্ষা, নারায়ণীকে সে আদতেই দেখিতে পারিত না, প্রায়ই তাহাকে খাইতে দিত না। নারায়ণীও নূতন বধূকে জব্দ করিবার চেষ্টায় আহোরাত্র ফিরিত; ইহার জন্য তাহাকে শাস্তিও পাইতে হইত বড় কম নয়, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিত না। দৈহিক উৎপীড়নে সে বড় একটা কাবু হইত না, আহার বন্ধ করিলেই একটু মুস্কিল বাধিত। ডাক্তাব মশাইয়ের কাছে দুই একবার ভাত খাইতে পাইয়া সে ভয়শূন্য হইয়াছিল; বাড়ীতে নিত্য অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বধূটীকে মারিয়া ধরিয়া পলাইয়া সে এখানে আসিয়া জুটিত। সন্ধ্যার সময় তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।

তাহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর; যৌবনসীমায় পা দিয়াও মেয়েটী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অধুনা কেমন করিয়া সে যে বুঝিল ছেলেরা তাহাকে বিদ্রূপ করে, এবং তাহাতে কেমন করিয়া তাহার লজ্জা অনুভব হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।—

ডাক্তার একবেলাই কোন রকমে ভাতে ভাত রাঁধিতেন কিছুদিন হইতে এই মেয়েটী তাঁহার রাত্রের আহার্য্যে ভাগ বসাইতেছিল বেচারা বৃদ্ধকে একবেলা আহ্মর করিয়া থাকিতে হইত।

মেয়েটী যে দিন এখানে আসিয়া জুটিত সে দিন সে আর কিছুতেই নড়িতে চাহিত না। ডাক্তার ডাক্তারী বইগুলা নাড়াচাড়া করিতেন, পাতা উল্টাইতেন, আর সে অবাক হইয়া বসিয়া দেখিত। বোধ হয় ভাবিত ডাক্তার অত মোটা বইগুলা কি করিয়া পড়েন। ডাক্তার যখন বইগুলা রাখিয়া শ্রান্তভাবে তামাক টানিতেন ও নানা দেশ বিদেশের গল্প করিতেন, তখন সে হাঁ করিয়া সেই সব গল্প যেন গিলিয়া খাইত। ডাক্তার নিজেদের দেশের গল্প করিতেন, কত নদীর গল্প করিতেন, কলিকাতার একটা বাগানে কত রকম জন্তু জানোয়ার আছে সে সব গল্প সবিস্তারে শুনাইতেন, শুনিতে শুনিতে বালিকা শ্রোত্রীর চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত হইয়া উঠিত। ডাক্তার গল্প সমাপ্তে যখন নিয়মিত দিবানিদ্রাটুকু উপভোগ করিতেন তখন সে বসিয়া বসিয়া সেই সব কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করিত, এবং এই ভ্রমণকারী ডাক্তারটীকে অসাধারণ মানুষ বলিয়া ধারণা করিত।

সে একদিন বারাণ্ডায় আঁচলটা বেশ ভাল করিয়া বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, তাহার পরই বলিল, "কাল গল্প বলবেন বলেছিলেন, আজ বলুন না।"

ডাক্তার অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "কিসের গল্প বল্‌ব বলেছিলুম?"

নারায়ণী বলিল, "আপনার দেশের গল্প। অন্য দেশের অনেক গল্প শুনেছি, আপনার দেশের গল্প ভাল ক'রে বলুন।"

"আমার দেশের গল্প?" ডাক্তার হাসিয়াই আকুল, "আমার দেশের গল্প শুনবি,—তবেই হয়েছে। আচ্ছা, শোন তবে।"

সে এক আশ্চর্য্য গল্প। ডাক্তারের দেশ,— সে মেঘনা নদীর ধারে, সেখানে নীচে ধূ ধূ করে সবুজ জল, উপরে ধূ ধূ করে সুনীল আকাশ। এপার হইতে ওপারটা দেখায় শাড়ীর পাড়ের মত। ডাক্তারের বাড়ী সেই নদীর ধারে—শাড়ীর পাড়ের মত জায়গা তাহারই উপরে। আজও মনে পড়ে নৌকায় করিয়া মেঘনার বক্ষে ভ্রমণ, মাছ ধরা, আনন্দের সেই সব গান। হায় রে, আজ সে সবই অতীতে মিশিয়া গিয়াছে, অতীতের সেই সুখময় দিনগুলার পানে তাকাইয়া তিনি আজ কিছুতেই সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করিতে পারেন না।

গল্প শুনিতে শুনিতে নারায়ণীর চোখে কেবল সেই বিগত দিনগুলি ফুটিয়া উঠিত, সে বাস্তব চোখে নৌকায় উঠা, মাছ ধরা দেখিত, কাণে গান শুনিত।

এই একদিন কি তাহার গল্প শোনা? সে প্রায়ই আসিয়া জুটিত, ডাক্তারের দেশের গল্প তাহার কাণে বড়ই ভাল লাগিত। সেখানকার লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদের মতই তাহাদের দিন যায় কিনা ইত্যাদি কথাগুলা সে বিশেষ করিয়া জানিয়া

লইত। বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটু একটু দুলিতে দুলিতে হঠাৎ সে কখন স্থির হইয়া যাইত, তাহার মনটা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত উত্তালতরঙ্গময়ী মেঘনার ওপারে সেই গ্রামখানির মধ্যে।

হঠাৎ কোন দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, "আপনার বিয়ে হয় নি ডাক্তার মশাই?"

ডাক্তার হাসিতেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানা গাম্ভীর্য্যের অন্ধকারে ছাইয়া উঠিত; তিনি বলিতেন, "বিয়ে?—না, বিয়ে আমার হয় নি।"

বালিকার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিত, "বিয়ে হয়নি? আচ্ছা বিয়ে হয়নি কেন—বলুন না। আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখনও কেন বিয়ে করেন নি?"

সে সব কথার উত্তর এই ক্ষুদ্র বালিকার কাছে দেওয়া যায় না, কাজেই ডাক্তার একেবারে নীরব হইয়া যাইতেন। বালিকা বুঝিত না বৃদ্ধ এখানে সকলের মধ্যে থাকিয়া নিজের অতীত দিনের স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। বালিকা জানিত না, বিবাহের কথায় বৃদ্ধের মনে সেই অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দেয়, কাজেই সে বার-বার সেই গোপন কারণটী জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

ডাক্তার ইহার কথাকে চাপা দিবার মতলবে আবার এক আজগুবি গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন, নারায়ণী তাহার প্রশ্ন ভুলিয়া যাইত, আবার হাঁ করিয়া গল্প গিলিত।

এই চিকিৎসালয়টী ছিল ডাক্তারের প্রাণ। আজ, এই ভগ্ন গৃহখানার পানে তাকাইয়া তাঁহার মনে পড়ে ইহার প্রতিষ্ঠান-দিনটীর কথা। আজ সেই গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতে কাহারও দৃষ্টি নাই।

একদিনকার বৈশাখী ঝড়ের একটা দমকায় চালের মট্‌কাটা সশরীরে কোথায় উধাও হইয়া গেল, চালের যে খড়গুলি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার নমঃশূদ্রদের মণ্ডল, পাঁচু মণ্ডলের বাড়ী দেখা দিলেন; সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া সে ঘরের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমরা তো দেখ্‌তে পাচ্ছ ঘরটা ভেঙ্গে পড়ছে, এখন উপায় কি?

পাঁচু মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখুন ডাক্তার মশাই, ঘরটা একেবারে নতুন করেই করতে হবে নইলে মোটেই থাকবে না। ওর খুঁটীগুলো সব পচে গিয়েছে, দেয়ালটারও অনেক জায়গায় খারাপ হয়ে গেছে। এতে খরচ ত বড় কম হবে না ডাক্তার মশাই, আমরা কি এ খরচ করতে পারব? কোনরকমে ছেলেপুলেগুলোকে মানুষ করি, ক্ষেত খামারের কাজ করি, বছরে খাজনা দিতে ত্রাহি ত্রাহি কর্‌তে হয়।"

মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এই কথায় সায় দিল।

নিরুপায় ডাক্তার বলিলেন, "তবে উপায়?"

নিতাই দাস বলিল, "এককাজ কর্‌লে হয় ডাক্তার মশাই, বাবুর কাছে গেলে হয় না? শুনেছি বাবু এসেছেন এখন দিন কতক থাকবেনও বটে। তিনি অব্যিশ্যি ঘরটা নতুন করে তুলে দেবেন,— দেওয়ারই কথা, কারণ তাঁর বাপেরই জিনিস তো।"

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঠিক, বাবুর কাছে যাওয়াই উচিত।"

যুবক জমিদারের রুদ্রমূর্ত্তি ও অশিষ্ট আচরণের কথা মনে করিয়া ডাক্তার দমিয়া গেলেন।

ইব্রাহিম মিঞা বলিল, "আপনি এখনই যান ডাক্তার মশাই, বাবু এখন বাইরেই আছেন, এই আমি দেখে আস্‌ছি।"

অবশেষে তাহাই করিতে হইল।

*   *   *   *   *

অবনীনাথের বৈঠকখানা তখন গুলজার, বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ। সম্প্রতি এখানে একটা থিয়েটার ঘর তৈয়ারী করিবার কথা চলিতেছে। একটা বাঁধা ষ্টেজ না থাকিলে থিয়েটার করা চলে না, অভাবটা সকলেরই ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধু বান্ধবেরা যথাসাধ্য দু এক টাকা চাঁদা দিবেন, বাকি সব অবনীনাথ দিবেন।

ডাক্তার গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। নায়েব মহাশয় জমিদার বাবুর নিকটে অগ্রসর হইয়া জনান্তিকে বলিয়া দিলেন—"ডাক্তার মশাই,—"

"আঃ, ডাক্তার মশাই—"

বিকট একটা হো হো হাসির ধমকে ঘরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সব বর্ব্বরদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে ডাক্তারের মাথাটা নুইয়া পড়িতেছিল, তিনি ইহাদেব কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইবেন কিরূপে?

অবনীনাথ ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "বসুন মশাই, ওই টুলটাতেই না হয় বসে পড়ুন।"

ডাক্তার ভগ্নপ্রায় টুলটার পানে একবার চাহিলেন। এই গৃহটার মধ্যে টুলে বসিলে তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনি বসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন, "আমার দরকার খুব সামান্য, শেষ করে এখনি চলে যাচ্ছি।"

রাখালচন্দ্র হাতে একটা তুড়ি দিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইবামাত্র অবনীনাথ একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, "চুপ কর রাখাল। হ্যাঁ আপনার যা কথা একটু তাড়াতাড়ি করে বলে ফেললেই ভাল হয় ডাক্তার বাবু, আমার এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "না আপনার কাজে বাধা দেব না, দুই একটা কথাতেই শেষ হবে। আপনার পিতা ৺রায় মহাশয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে যে ঘরটী তৈরী করে দিয়েছিলেন সে ঘরটীর অবস্থা ভারী খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনি বাৎসরিক ওষুধ দেন কিন্তু ঘরটার দিকে কোনদিন চান নি। আপনার পিতার কীর্ত্তি এ, খুব আশা করছি ঘরটাকে আবার ঠিক করে দেবেন দয়া করে।"

অবনীনাথ খানিক চুপ করিয়া রহিলেন তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন ওইতেই চালিয়ে নিন ডাক্তার বাবু, ওদিকে বিশেষ আর কিছু করা হবে না। আমি মনে করছি আমাদের বাড়ীতেই অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটীর একটা শাখা খুলে দেব। এতে আমার একটা পয়সা লাগবে না, বরং গাঁয়ের লোকেরা ভাল ডাক্তার পাবে, ভাল ওষুধটাও পাবে।"

ডাক্তারের মাথাটা ঘুরিতেছিল, খানিক তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ

পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে ভাল কথা, কিন্তু এখনও তার দেরী আছে, ততদিনে গোটাকত টাকা দিয়ে এ ঘরের চালটা—"

রুদ্রগর্জ্জনে তরুণ জমিদার বলিয়া উঠিলেন "যান যান, আর বেশী কথা বলবেন না। জমিদারের এক কথা, এর বেশী আর বলা হবে না। আর দেখুন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে! শুনলুম আপনি নাকি একটা নৈশ পাঠশালা করেন চাষার ছেলেদের পড়াবার জন্যে? এটা ভয়ানক খারাপ কাজ হচ্ছে, জমিদারের বিপক্ষে একটা ষড়যন্ত্র বাধিয়ে তোলারই ইচ্ছে আপনার। ওই সব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আর কি জমিদার বলে তেমনিই খাতির করবে? লেখাপড়া শিক্ষা মানে— ছোটলোকগুলোর মাথা খাওয়া,— সেটা জানেন?"

দৃঢ় অথচ ধীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, "না, আগে জানি নি, এখন জানলুম। আপনি যা বললেন এ সত্য কথা, বুঝলুম আপনি তরুণ হ'লেও ভবিষ্যৎ ভাবতে পাবেন। এই সব ছোটলোকেরা—আপনার লাথী বুক পেতে নিচ্ছে অসহ্য ব্যথায় লুটিয়ে পড়ছে তবু জানতে সাহস নেই তাদের, কেন লাথী খেলে। লেখাপড়া শেখালে, আত্মবোধ শক্তি জন্মালে তারা এমন ভাবে লাথী বুক পেতে নেবে না। কিন্তু জমিদারবাবু আপনি জানেন না আপনার বাপ যে ছিলেন,—এই ছোটলোকেরাই তাঁর কতখানি প্রিয় ছিল, তিনি এদের মূল্য বুঝতেন, তাই এদের মানুষ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি নিজে নৈশ পাঠশালা করে শিক্ষা দিতেন, আপনাব সে কথা আজ মনে না থাকতে পারে, যারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে তারা ভুলে যায় নি। আপনি সব রকমে গ্রামটাকে উন্নত করতে চান, করুন, কিন্তু এই সব ছোটলোকদের বাদ দেবেন না, কারণ এরাই হবে আপনার উন্নতির প্রধান সহায়,—এ কথা মনে রাখবেন।"

ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

পথে পাঁচুমণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল, সোৎসুকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল ডাক্তার মশাই?" হায়রে অভাগা দরিদ্রগুলি, তোদের বেদনা বুঝিবে কে? ব্যথিত না হইলে পরের ব্যথা কেহ বুঝে না, নিজের চোখে অশ্রু না ঝরিলে কেহ অন্যের অশ্রুজলের মূল্য বুঝে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ও ঘরে আর ডাক্তারখানা চলবে না পাঁচু। কিছুদিন পরে বাবুর বাড়ীতেই একটা ঘরে ডাক্তারখানা হবে, একজন বড় ডাক্তার আসবে, সেই তোদের দেখাশোনা করবে। যাই হোক ওষুধ খেয়ে বাঁচবি তখন পাঁচু, শুধু জল খেয়ে আর সর্দ্দি কাশিতে ভুগে মরবি নে।"

পাঁচুমণ্ডল ভারী খুসি হইয়া উঠিল,—"সত্যি ডাক্তাব মশাই, তা হলে আমরা বাঁচব বটে। সেবারে আনন্দবাবুর ছেলের ব্যারামে সেই যে কোত্থেকে একজন বড় ডাক্তার মশাই এসেছিলেন তাঁর কি-ই বা চেহারা, কি-ই বা নলচালা। কাণে লাগিয়ে সেই যে নল চাললেন, ছেলে একেবারে দুদিনে খাড়া হয়ে উঠল। আচ্ছা ডাক্তার মশাই, আপনি কেন নলচালাটা শিখলেন না?"

কপালে হাতখানা ঠেকাইয়া মলিন হাসিয়া ডাক্তার কেবলমাত্র বলিলেন, "অদৃষ্ট।"

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি থাকবেন তো ডাক্তার মশাই? দুজন ডাক্তার মশাই থাকলে—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমার আর থাকা কই হয় পাঁচু, দুচার দিনের মধ্যেই চলে যাব ভাবছি।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া পাঁচু বলিল, "চলে যাবেন,— কেন?"

ডাক্তার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাপাসুরে বলিলেন, "এখানে থেকে কি করব পাঁচু, আমার মত লোককে দিয়ে কোন কাজই হবে না। নতুন ডাক্তার আসবেন, ওষুধ তিনিই দেবেন, লোককে দেখাশোনা তিনিই করবেন। বাবু গাঁয়ে একটা বড় স্কুল করবেন, তোমাদের ছেলেপুলেদের নৈশ পাঠশালায় পড়তে হবে না, সেখানে ভাল পড়া হবে। বাবু তোমাদের কর্ম্মশ্রান্ত জীবনে আনন্দ ধারা ঢালবার জন্যে থিয়েটার ঘর করবেন, বিনা পয়সায় সে আনন্দ তোমরা উপভোগ করতে পারবে। দুর্দ্দিনে আমি তোমাদের কাছে ছিলুম, সুখের দিনে তোমরা তো আমায় ডাকবে না পাঁচু, তাই আগেই আমি সরে যেতে চাই। আমার যোগ্যতা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, অসীমে নিজেকে বিস্তার করবার যোগ্যতা আমার নেই। একদিন এমনি কাজ খুঁজতে খুঁজতে তরুণ বয়সে তোমাদের কাছে এসেছিলুম, এখন এখানকার কাজ সাঙ্গ হয়ে গেছে। আবার খুঁজে দেখি গিয়ে কোথায় একটা কাজ পেতে পারি।"

৪

সমস্ত রাত্রিটা সে দিন ডাক্তার ঘুমাইতে পারিলেন না। কি একটা অসহ্য বেদনায় সারা বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া আসিতেছিল, বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই গ্রামে এই সব দরিদ্রদের মাঝে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি আজ বাহিরের লোক নহেন, এই গ্রামের একটী অধিবাসিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

তাঁহার নৈশস্কুলে অনেকগুলি নীচবংশীয় ছাত্র ছিল। এই সব অন্ত্যজদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা অন্তরিক ঘৃণা করিতেন, ইহাদের স্পর্শ করা দূরে থাক ছায়া মাড়াইতেও সঙ্কুচিত হইতেন। অবনীনাথ স্কুল করিতেছেন, কিন্তু এই সব ছেলে কি সেই স্কুলে পড়িতে পাইবে? কয়েকটী ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহারা কালে একটা মানুষ হইতে পারিত। চালনা না করিলে—এত পড়াশুনা—ডাক্তারের এতটা পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়াই তিনি একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্টই জানাইলেন অবনীনাথ যে সব কার্য্য করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কয়েকটী কথা বলিবার মত আছে। প্রথম—

যে ডাক্তার আসিবেন তাঁহার শুধু ভদ্রলোকদের দেখিলেই চলিবে না, দরিদ্রদেরও দেখিতে হইবে এবং ভদ্রলোকদের মত দরিদ্রদেরও যত্ন করিয়া ঔষধ দিতে হইবে। গ্রামে যে স্কুল হইবে ইহাতে শুধু ভদ্রলোকের ছেলেরাই প্রবেশাধিকার পাইবে না, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, মালী, জেলে প্রভৃতিরাও পড়িতে পাইবে এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করা বিশেষ আবশ্যক। অবনীনাথের একটা কথা তিনি জানিতে চাহেন; যদি অবনীনাথ এ সকল প্রস্তাবে সম্মত না হন তিনি স্বর্গীয় কর্ত্তার স্বহস্তলিখিত দলিলের বলে নিজে যেমন আছেন তেমনি থাকিয়া এই সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

স্বর্গীয় জমিদার পুত্রের খেয়ালের উপর প্রজাদের শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে মরিতে পারেন নাই। বিজ্ঞ জমিদার নিজের উইলে ইহা লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং জমীদারীর আয়ের তিনভাগের একভাগ এই সকল কার্য্যে ব্যয় হইবে এ সম্বন্ধে একটা লেখাপড়া করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়াছিলেন। তিনি মানুষ চিনিতেন, ডাক্তারকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

এতদিন অবনীনাথ নিতান্ত দয়া করিয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহা কিছু দিতেছিল ডাক্তার তাহাই লইতেছিলেন, একটা আপত্তি তিনি করেন নাই। কিন্তু দরিদ্রদের এবার বিশেষরূপে নির্য্যাতিত হইতে হইবে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল, তিনি দরিদ্রদের দাবী লইয়া জমিদারের বিপক্ষে দৃঢ়পদে দাঁড়াইলেন।

এই পত্রখানা অবনীনাথের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিল। তিনি বরাবরই এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে দেখিতে পারিতেন না, তিনি ঠিক জানিতেন এই বৃদ্ধ ভিতরে ভিতরে প্রজাদের উত্তেজিত করে, সেই জন্য প্রজারা নিয়মিত খাজনা ভিন্ন জমিদারের সেলামি একপয়সাও দেয় না। এই পত্রখানা তাঁহার জিঘাংসাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল; কি করিয়া এই বাঙ্গাল বৃদ্ধটাকে বিশেষরূপ জব্দ করিয়া, লোকের কাছে ঘৃণিত নিন্দিত করিয়া চিরবিদায় দেওয়া যাইতে পারে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল অবনীনাথের বহুমূল্য হীরার আংটীটা হারাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল সেদিন রাত্রে যখন ডাক্তার দেখা করিতে গিয়াছিলেন তখন আংটীটা টুলের পাশটায় পড়িয়াছিল—হঠাৎ মনে পড়ায় অবনীনাথ খোঁজ করিয়া আর পান নাই।

গ্রামের ছোট বড় সকলেই পরস্পর পরস্পরের পানে তাকাইল, বিস্ময়ে সকলেই বলিল, "অ্যাঁ, ডাক্তার মশাইয়ের এই কাজ?"

পাঁচুমণ্ডল শুনিয়া মাথা নাড়িল; রন্ধননিরতা পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, "দুনিয়ায় সাধু সবাই। বাবু আজ সকালে আমায় ডেকে বললেন, খবরদার পাঁচু, চোরের দিকে যেন চাস নে। গরীব মানুষ,—থানা পুলিস জড়িয়ে শেষটায় কেন মরবি? বাবু আরও বললেন, দেখ পাঁচু, আমি একটা ডাক্তারখানা করছি, সহরের খুব বড় ডাক্তার আসবে,— সেই তোদের দেখবে শুনবে ওষুধ পত্তর দেবে? আর পাঠশালায় ছেলে পড়াবিই বা কেন? আমি মস্ত বড় স্কুল করব—যেখানে ডাক্তারখানা রয়েছে ওইখানে, সেইখানে ছেলে

পুলেদের পড়াবি। বাবুর ইঁটের পাঁজা তৈরী হচ্ছে, মাস খানেকের মধ্যে আগুন পড়বে, তারপর ইটগুলো হয়ে গেলে ইস্কুল হতে আর কতক্ষণ?"

ডাক্তার মশাই চোর—কথাটা শুনিয়াই নারায়ণী তাঁহার গৃহে ছুটিল।

বেলা তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, অস্তগামী রবির সোণার মত কিরণটুকু গাছের পাতায় পাতায় পড়িয়া ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিজের জরাজীর্ণ বেতের বাক্সটা বারাণ্ডায় টানিয়া আনিয়া তাহার ভিতরের কাপড় জামাগুলো ফেলিয়া কি খুঁজিতেছিলেন।

নারায়ণী একেবারে কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল, "কি খুঁজছেন ডাক্তার মশাই?"

"একটা জিনিস নারাণী।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় ভার।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "আংটী ডাক্তার মশাই?"

ডাক্তার দুইটী চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিলেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আংটী নয়; আংটীর চেয়ে বেশীর দাম তার, সেইটাই খুঁজছি।"

ব্যগ্র চোখে নারায়ণী দেখিল, হিজিবিজি কি সব লেখা বহুপুরাতন এক টুকরা কাগজ পাইয়া ডাক্তার মশাইয়ের চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি অতি যত্নে সেখানা হাতের মধ্যে রাখিয়া বাক্সে কাপড় জামা তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নারায়ণীর পানে চাহিয়া মলিন মুখের একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কাল সকালে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব নারাণী।"

"চলে যাবেন,—কোথায় যাবেন, আবার কবে আসবেন?"

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ডাক্তারের হৃদয় স্পর্শ করিল, তাঁহার দীপ্ত চোখ দুইটা অজ্ঞাতে কেমন করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যে যাব তা এখনও ঠিক করতে পারিনি; তবে এ গ্রাম হতে জন্মের মতই যাচ্ছি, আর যে ফিরে আসব না, এ কথা ঠিক।"

নারায়ণী অন্যদিকে চাহিয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল, খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আংটী চুরি করার কথাতেই আপনি—"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তুইও কি ভাবিস নারাণী আংটী আমি নিয়েছি?"

ছোট্ট একটী "না" বলিয়াই নারায়ণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আবার একখানা পত্র লিখিয়া জমীদার মহাশয়ের লেখা দলিলখানি দিয়া একটী বালককে তিনি অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

* * * * *

ঘাটে নৌকা বাঁধা, নৌকায় খানিক দূর গিয়া তবে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাওয়া যাইবে। স্থলপথ দিয়াও যাওয়া চলে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠের দারুণ রৌদ্র স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে গমন প্রশস্ত ভাবিয়া ডাক্তার নৌকা ঠিক করিয়াছেন।

নিস্তব্ধ ঘাটে আসিয়া ডাক্তার একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলেন। ওই—অদূরে দেখা

যাইতেছে আমবাগান, উহারই মধ্যে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চিকিৎসালয়, চিরপরিচিত ছোট ঘরখানি। আজ তাঁহার সব হারাইয়া চোর বদনাম লইয়া কেবলমাত্র একটি বাক্স সম্বল করিয়া চিরবিদায় লইতে হইতেছে, এ দুঃখ কি কিছুতেই যায়? এত শীঘ্র তিনি পরাজয় মানিতেন না, যদি বদনামটা তাঁহার বিস্তৃতি লাভ না করিত। আজ তিনি ছোট বড় সকলের কাছে ঘৃণিত, কাহারও নিকটে মুখ দেখাইবার যো আজ তাঁহার নাই। কাল রাত্রে তিনি পাঁচুর বাটীতে গিয়াছিলেন, সে গৃহমধ্য হইতে তাঁহাকে শুনাইয়া কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল,—"বল গিয়ে বাড়ী নেই। জমীদারের বিষচোখে ওঁর জন্যে পড়তে পারব না।"

আরও কি শুনিবার জন্য তিনি এখানে পড়িয়া থাকিতে চান?

দেশটা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার বুকে বড় ব্যথা বাজিতেছিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিতে ছিল। ইহার পথ, ঘাট, মাঠ সবই যেন তাঁহার আজন্মকালের পরিচিত ছিল, অনেক সময় তিনি নিজেই ভুলিয়া যাইতেন, তিনি এখানকার কেহ নহেন, বিদেশী মাত্র। ইহার অধিবাসীরা তাঁহার কেহই ছিল না, আপনার স্বভাবগুণে তিনি ইহাদের বড় আপনার হইতে পারিয়াছিলেন। এর উদার সুনীল আকাশ, বহমান মৃদুল বাতাস, পাখীর কলগীতি, সবই তাঁহার বড় আপনার ছিল। আজ এ সব ছাড়িয়া যাইতে হৃদয় চাহিতেছিল না, তাই দুই পা চলিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পিছন দিকে চাহিতেছিলেন।

নারায়ণী আসিয়া প্রণাম করিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, ঊর্দ্ধনেত্র নত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুই এসেছিস নারাণী—?"

নারায়ণী কাঁদিয়া বলিল, "হ্যাঁ ডাক্তার মশাই, বাবা আসতে দিচ্ছিল না, আমি পালিয়ে এসেছি।"

একটা বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমি যাচ্চি নারাণী, কিন্তু যতদিন আর বেঁচে থাকবো তোদের কথা ভুলব না। তোদের গরীব ডাক্তার মশাই কিছু দিয়ে যেতে পারলে না রে, কিন্তু অনেকখানি নিয়ে চললো।"

মাঝি ডাকিল, "বাবু আসুন, ট্রেণ ধরতে হবে।"

চমকাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, এই আসি। আজকের দিনে, এই অবস্থায় সবাই আমায় পর বলে ভাবলে, সবাই আমায় দূরে রেখে দাঁড়ালে, কেবলমাত্র তুই নারাণী,—তুই মাত্র আমায় আপনার ভেবে কাছে এসে দাঁড়ালি। আজ শেষ বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে নিজেকে একেবারে একলা ভেবে একলা চোখের জল মুছছিলুম, তুই এমনি সময় এসে তোর চোখের জল আমায় উপহার দিলি; যাতে জানতে পারলুম—সবাই আমায় ভুলে গেলেও তুই ভুলবি নে। আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি— যেন সুখী হতে পারিস।"

গোপনে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি নৌকায় উঠিলেন।

নদীর কালো জল চিরিয়া নৌকা সোজা অগ্রসর হইল। অতৃপ্ত নয়নে ডাক্তার দেখিতে দেখিতে চলিলেন, সবই চির পরিচিত। তাঁহার এই শেষ বিদায়ের ক্ষণেও গ্রাম পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে।

ফিরিয়া দেখিলেন শূন্যঘাটে নারায়ণী একা দাঁড়াইয়া উচ্ছলিত অশ্রুজল মুছিতেছে।

'বঙ্গবাণী'—১৩৩৩

রূপান্তর

শ্রীসুনীতি দেবী

গত রাতের জড়ানো খোঁপাটি কখন আলগা হয়ে পিঠের উপর দীর্ঘ বেণী হয়ে ঝুলছিল কল্যাণী তা টের পায় নি। তেমনি ভাবেই শিউলি তলায় ফুল কুড়োচ্ছিল। জুতার শব্দে মুখ তুলে দেখে—বেড়ার ধার দিয়ে কে এক অপরিচিত তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চলে গেল। একটু বিস্ময় ও একটু লজ্জায় সে সরে গেল বটে, কিন্তু প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তার পুস্পকোমল মুখের ছাপ অনিলের মন থেকে সরাতে পারল না।

সহুরে ছেলে অনিল এসেছিল পল্লীতে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে ছুটি কাটাতে। সেখানে যখন বাঙালী প্রেমের দেবতা সাতকুল মিলিয়েই প্রেমে পড়িয়ে দিলেন, তখন সে কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের দিয়ে বাপের কাছে মনের কথাটা জানাতে দেরী করল না। তার পিতা জীবন ধারণ ও ছেলের পড়ার খরচের জন্যই বোধ হয় ডাক্তারী একেবারে ছাড়েন নি, নয় তো বিপত্নীক হয়ে পর্য্যন্ত সংসার ত্যাগীর মতই থাকতেন। তিনি উদাসীন ভাবেই মত দিলেন। পিতৃমাতৃহীনা, মামাদের অন্নে পালিতা কল্যাণীর জীবনে অঘটন ঘটল। বিনা চেষ্টায়, বিনা পণে তার বিবাহ হয়ে গেল। মামারা খুসী হলেন, মামীরা টিপ্পনী কেটে বললেন—"বুড়ো মেয়ের কত নভেলী রঙ্গ জানা ছিল, কই আমাদের একটা মেয়ে পুরুষ মানুষের সামনে অমন ফাঁদ পাতুক দেখি! ছি ছি লজ্জায় মরি।"—

যাক, "চতুর্দ্দশ বসন্তের মালাগাছি" গলায় পরে অনিল কলকাতায় ফিবল। কল্যাণী মামা-বাড়ী থেকে চিরদিনের মতই বিদায় হল।

লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে সরস্বতীর পূজার উপকরণগুলি অনিল অবহেলায় ছড়িয়ে ফেলল। ঝি আর ঠাকুর মিলে এতদিন যেমন করে সংসার চালাচ্ছিল, তার কোন ব্যতিক্রম হল না। অনিল কল্যাণীকে কোন কাজ করতে দিত না। কল্যাণীর জীবন এখানে স্বাধীন, মুক্ত, শ্বশুর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকেন, আর কেউ নেই যার জন্য তাকে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে, দুটি নবীন জীবন প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দিল। কল্যাণীর কাছে এ একেবারে নূতন জগৎ। শুধু তারই জন্য এত আয়োজন, এত আদর,—একজন লোকের সে সর্ব্বস্ব,—এ যেন স্বপ্নাতীত সুখ। অনিলের সোহাগ বাধা বন্ধন সীমাহারা হয়ে কল্যাণীকে ঘিরে যেন এক নিমেষে নিঃশেষ হতে চায়, কি সে আবেশচঞ্চল দিবস ও রাত্রিগুলি।

বন্ধুরা দুচার দিন সবুর করে অনিলকে আক্রমণ করল। বলল,—"বউ কি আর কারো হয় না নাকি? সব প্রেম এক সঙ্গে শেষ করলে চলবে কেন? দেউলে হয়ে যাবি যে;"—

অনিল তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না, কাজেই এক একদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে যেত। কল্যাণীর সে দিন সারা সন্ধ্যা যেন কাটতে চাইত না।

একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় কল্যাণী গালে হাত দিয়ে জানালার ধারে বসে পথ চেয়ে আছে,—হঠাৎ পিছন থেকে ঝরণার কলহাস্যে ঘর ভরিয়ে কে যেন বলে উঠল,—"বলি ও নতুন বৌ, একা বসে হচ্ছে কি?"

কল্যাণী চমকে চেয়ে দেখে রাজ্যের রূপ দিয়ে গড়া একখানি প্রতিমা, ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে, এবারে সে একেবারে কল্যাণীর কাছে এসে বসল। বলল—"পাশের বাড়ীতে একা একা থাকি, তোমায় আসতে দেখে ভাবলাম যাহোক সঙ্গী জুটল। ওমা! তা তোমার নজরই নেই। আমিই কি আসতে ফুরসুৎ পাই? তোমার কত্তাটি তো নড়বার নাম করে না। কি তুক করেছ ভাই? আমায় একটু শিখিয়ে দেবে?"

কল্যাণী হেসে ফেলল। তারপর আর কি— নিমেষে দুজনের মধ্যে নিবিড় প্রণয় জন্মে গেল। খানিক গল্পের পর কল্যাণী বলল,—"আমি তোমায় তা'হলে স্বর্ণ-দি বলেই ডাকব, কেমন?"

স্বর্ণ মুখ খানা ভার করে বললে—"তা ত বলবেই, না হয় আমার সাত বছর বিয়ে হয়ে গেছে, না হয় আমি তোমার চেয়ে দু তিন বছরের বড়, তোমার নয় সবে বিয়ে হয়েছে, তুমি না হয় কচি খুকী, তাই বলে "দিদি" বলে আমায় বুড়ী করে দেবে? সে হবে না। এস আমরা সই পাতাই।"

বাস্ অমনি তাই ঠিক হয়ে গেল, আর দুই সইতে মনের কথা বলাবলির আর শেষ রইল না। ঘুরে ফিরে সেই স্বামী- সৌভাগ্যের কথা। কল্যাণী বলল,—"তুমি ভাই কি সুন্দর দেখতে, তোমার বর তোমায় খুব ভালবাসে, না?"

স্বর্ণ অমনি বলল,—"ও আমার পোড়া কপাল, আমি নাকি সুন্দর, তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর না কে বেশী সুন্দর, তুমি না আমি?"

কল্যাণী লজ্জায় লাল হয়ে বলল,—"যাও তুমি ভারি দুষ্টু।"

স্বর্ণর হাসিতে আবার ঘরের অন্ধকার কোনাগুলিও যেন হেসে উঠতে লাগল।

এমন সময় অনিলের গলার স্বর বাইরে শোনা যেতেই স্বর্ণ পালাল, বলে গেল,—"আর জানালা খুলে প্রেম করোনা, আমি সব দেখতে পাই কিন্তু।"

অনিল ঘরে ঢুকে বলল,—"বেশ, বেশ, আমি ভাবছি তুমি একা কষ্ট পাচ্ছ, তাই তাড়াতাড়ি ফিরছি, আর তুমি এদিকে এমন বন্ধুত্বে মগ্ন যে কখন ফিরেছি টেরই পাওনি। নীচে ঠাকুরের সঙ্গে কত চেঁচামিচি করে তোমাদের হুঁস আনতে হল।"

তারপর দুদিন অনিল বেরুল না। শেষে বন্ধুরা একদিন বাইরে থেকে ডেকে বলল,—"ও বৌদি, দড়ি টা একটু লম্বা করে দিন, ওকে চড়িয়ে আনি। আবার ফিরিয়ে দেব ঠিক।"

এ সব শুনে কল্যাণী লজ্জায় মরে যেতো, জোর করে অনিলকে বাইরে পাঠিয়ে দিত।

একদিন কথায় কথায় স্বর্ণ বলল,—"তুমি ভাই কেমন রোজ সেজেগুজে থাক, বেশ লাগে দেখতে।"

কল্যাণী বলল, "তুমি সাজলে পার।"

স্বর্ণ হতাশভাব দেখিয়ে বলল,— "সে কথা বল কেন? সাজতে কি আমার অসাধ? বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ভাবলাম এইবার দুখানা গয়না কাপড় পরবো, ভালমন্দ পাঁচরকম খাব-দাব, তার জন্যেই তো বিয়ে। নয়তো বাপ মা কি শুধু শুধু অম্বলরুগী মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে? বয়সকালে একটু সখ মেটাবার জন্যেই ত বিয়ে। তাও আমার কপালে হল কই?"

কল্যাণী বিবাহ সম্বন্ধে সইর এমন হীন আদর্শের কথা শুনে দুঃখিত ভাবে বলল,—“ছি, ভাই, স্বামীর কথা অমন করে বলতে নেই? বিয়ে বুঝি শুধু সাজগোজ করা? --আর তোমার সাজতে সখ হলে কি আর তিনি বারণ করবেন?’

স্বর্ণ বলল,—“তবে শোন, তোমার দেখাদেখি কাল বিকেলে দিব্যি রঙীন সাড়ীখানী পরে, টিপটী কেটে, মুখে একটু পাউডার ঘসে বসে আছি। ওমা! এসে বলে কিনা—‘থিয়েটারে যাবার উদ্যোগ হচ্ছে বুঝি, ও সব আমি পারব-টারব না।”—বলেই চোখ বুঁজে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তবেই বোঝ কার জন্যই বা সাজা, দেখবে না, তারিফ করবে না, শেষে উল্টো চাপ কিনা থিয়েটারে যাবার জন্য সেজেছি। টান মেরে সব খুলে ফেলে, এমন বকুনিটাই দিলাম। আমার চেচাঁনিতে বাড়ীতে কাক চিল বসতে পেল না, কিন্তু তার কানে কি কিছুই গেল?”

বিস্মিত হয়ে কল্যাণী বলল,—“স্বামীকে বক?”

স্বর্ণ বলল,—“বকি না? একশবার বকি। শুধু বকি, পারলে মারি। সে ছেলে ঠেঙিয়ে খায়, আমি তা'কে ঠেঙিয়ে খাই।”

কল্যাণী জিভ কেটে বলল,—“ছি, ছি।”

স্বর্ণ আড়চোখে কল্যাণীর মুখের ভাব দেখে কোন মতে হাসি চেপে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল,—“আমায় যদি ভালবাসে তবে কি আর বকিঝকি? তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাই, বলি অনিল বাবুর মত হও, তা, কোন গ্রাহ্য করে না। আমি যা শক্ত মেয়ে, নয় ত কবে হাত ছাড়া হয়ে যেত। তোমরা সুখী লোক, আমার দুঃখ কি বুঝবে বল।”

কল্যাণীর মন স্বর্ণর প্রতি করুণায় ভরে উঠল। সে বলল,—“আহা সই, তোমায় কেমন করে না ভালবেসে থাকে?”

স্বর্ণ এবার হাসিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলল,—“নাঃ তোর সঙ্গে দুষ্টুমি করে ও সুখ নেই। ঠাট্টাও বুঝিস না।”

২

স্বচ্ছন্দ জীবনগতির মাঝখানে হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। অনিলের বাবা দুদিনের জ্বরে মারা গেলেন। ছেলের জন্য এমন কিছু রেখে গেলেন না যাতে দিনের পর দিন বসে খাওয়া যায়। নব পরিণীত দম্পতি এক চমকে স্বপ্নরাজ্য থেকে কঠিন পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে পড়ল। অনিল বি. এ. পরীক্ষা দিতে ছুটল। বইগুলি ঝেড়ে মুছে কল্যাণী বারবার তাতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, —“মা ওঁকে পাশ করিয়ে দাও।” কিন্তু সরস্বতীর কৃপা হল না। অনিল ফেল হল, আর সঙ্গে সঙ্গে বহু কষ্টে এক সদাগরী আপিসে সামান্য মাইনের একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে নিল। অনিলের কবি কল্পনার সঙ্গে এ জীবন মাপ না খেলেও, পেটের দায়ে তাকে এটা মাথা পেতে নিতে হল।

ঝি, ঠাকুর বিদায় নিল। এ বাড়ীতেও আর চলে না। অনিল অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর খুঁজছে শুনে স্বর্ণ বলল,—“আমাদের একতলার একখানি ঘর অমনি পড়ে থাকে,

তোমরা সেইখানে এসো। কল্যাণী খুব খুসী হয়ে অনিলকে রাজি করাল। অত অল্প ভাড়ায় অন্য জায়গায় ঘর পাওয়াও যেত না। ঘরের জানালার ধারে একটা শিউলি গাছ আছে। সেটা দেখে অনিল বলে উঠল, —"বাঃ কি মজা, ফুল ফুটলে আবার তুমি তেমনি করে কুড়োবে, আর আমি চেয়ে দেখবো, তোমায় দেখাবে যেন মূর্ত্তিমতী শারদলক্ষ্মী।" এমনি করে পরিবর্তিত জীবনের কষ্টটুকু তারা আনন্দ দিয়ে বরণ করে নিল। অনভ্যস্ত দুঃখের মধ্যে অনিলের সুখ—কল্যাণীর তন্ময় সেবা, সে যে এমন—সুনিপুণা গৃহিণী তা অনিলের জানা ছিল না। অনিল মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করলে কল্যাণী হেসে বলত,—"বিয়ের আগে পর্য্যন্ত ঘরেব কাজইত করে এসেছি, এতে আব বাহাদুরী কি?"

অনিল বলত,—" তোমার হাতের সেবা বড় মিষ্টি লাগে, তবু করতে দিতে কষ্ট হয়। আমার হাতে পড়ে তুমি একটু বিশ্রাম করতে পাও না।"

কল্যাণী ছল্‌ছল্‌ চোখে অনিলের মুখ চেপে ধরত—তাব এই সুমিষ্ট প্রতিবাদটুকু অনিল প্রাণ ভরে উপভোগ করত।

কল্যাণী ভারী হিসাবী হয়েছে। অধিকাংশ দিন নিজের ভাগের তরকারিটুকু ও-বেলার জন্য রেখে ঝাল, টক যা হয় দিয়ে পাতের ভাতগুলি শেষ করত। অনিল তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যায়, কিছু টের পায় না। নিজের কোন ভাগ কতটুকু কমিয়ে অনিলের ভাগ বাড়ানো যায়, এই তার চিন্তা, একদিন স্বর্ণ দুটো পান দিয়েছিল, কল্যাণী কি ছুতোয় নীচে এসে সে দুটো তুলে বাখল। বাজে খরচ কমাতে গিয়ে পান আনা তাদের বন্ধ ছিল। অথচ অনিল পান খেতে কি ভালবাসে, বিকেলে অনিল পান খেয়ে কত খুসী বলল,—"আপিসে মাঝে মাঝে বাবুর পান দেয়, তোমাব খাওয়া হয় না ভাবতাম। যাক, তোমার সই থাকতে ভাবনা নেই দেখছি,—বলেই চোখ পড়ল কল্যাণীব তাম্বুলরাগলেশহীন ঠোঁটের উপর, অনিল বলে উঠল,—"তুমি বুঝি খাওনা? পানের দাগ দেখছি না যে!"

কল্যাণী বলল,—"সে ধুয়ে ফেলেছি। কখন দিয়েছিল।"—মিথ্যা বলতে গিয়ে হেসে ফেলতেই অনিল তাকে বাহুপাশে বন্দী করে বলল,—"ও দুষ্টু।" অন্যায় করে আবার মিথ্যা কথা।

কল্যাণী বলল,—"দোষের জন্য এ রকম শাস্তি পেলে দোষ যে রোজই করব।"

স্বামীর জন্য এইটুকু করতে পারলে এত খুসী করা যায় ভেবে কল্যাণীর আনন্দ আর ধরে না, এমনি করে দারিদ্র্যের মধুরতাটুকু তারা ভোগ করত, বিষটুকু গায়ে মাখত না।

কল্যাণীর নিপুণ হাত দুখানি অভাবের মধ্যেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রাখত। অনিল একদিন বলল,—"আমার মত সৌভাগ্য কারুর নেই, আমার পরিষ্কার কাপড় চোপড় আর চেহারার চাকচিক্য দেখে আপিসের বন্ধুরা হিংসায় মরে। বৌয়ের মুখঝামটা খেয়ে অর্দ্ধেকের দিন কাটে। তারওপর আমাদের মতন গরীব কেরাণীরাও কত জনে বৌয়ের গয়না গড়াবার ভাবনায় পাগল পারা। আর তুমি ত একখানা কাপড়ও চাও না।"

কল্যাণী উত্তর দিল,—"অভাব থাকলে তো!"

অনিল বলল,—"নাঃ, অভাব আবার কিসের? রাজার হালে তোমায় রেখেছি।"

কল্যাণী বলল,—"না ত কি!"

অনিল একটু চুপ করে থেকে বলল—"সত্যিই যাই বল, পৃথিবীতে তোমার মত কেউ নেই।"

কল্যাণী মনে মনে জানত তার মত কেন, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী জগতে শতসহস্র আছে, তবু এই কথাটী তার অন্তর মধুতে ভরে দিল। প্রিয়তমের কাছে সে অতুলনীয়া, এর চেয়ে সুখ তার কল্পনারও অতীত।

অনিল আবার বলল,— "তোমার কোন সাধ নেই কল্যাণী?"

কল্যাণী মাথা নীচু করে বলল,—" তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারলেই আমার সব সাধ মিটবে।'

জানি না এ কথা শুনে অদৃষ্টদেবতা অলক্ষ্যে হেসেছিলেন কিনা।

৩

প্রথম যখন আপিসে ঢোকে তখন অনিলের বিশ্বাস ছিল, সে শীঘ্রই এই জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু অন্ন জোটাবার মত কাজ আর কোথায় পেল না। শেষে অনিল কেমন করে তার চির অবজ্ঞাত কেরাণী জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত কেরানীকুলের সর্ব্বনাশা নেশা রেস খেলাও তাকে পেয়ে বসল। কল্যাণী প্রথম প্রথম কত বোঝাতো, শেষে কান্নারূপ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করল, অনিল কখনও কখনও অনুতপ্ত হয়ে বলত,—"আচ্ছা এই শেষ।" কখনও জিতে কখনও হেরে কতবার যে প্রতিজ্ঞা করত আর এ সবে সে যাবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না।

এই সময়ে কল্যাণীর জগতে আবার নূতন রং ধরল, সে নাকি মা হবে। অনিল যখন আনন্দ করতে গিয়েও বলল,—"খরচপত্র বড্ড বাড়বে তাইতো?"—তখন কল্যাণী অনাগত সন্তানের পক্ষ নিয়ে অনিলের উপর ভারি অভিমান কবল, ও মনে মনে অজাত শিশুটিকে আদরে ডুবিয়ে ফেলল।

এই সময়টা তার স্বামীর সঙ্গ তাকে যথেষ্ট তৃপ্তি দিত না, অনিলকে কাছে পাবাব ও তার আগেকার আদর যত্ন পাবার তৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠত। আবার অনিল শিশুটির কথায় তেমন উৎসাহ দেখায় না বলে অভিমানে সে আলোচনা বন্ধ করে ফেলত। অনিল আজকাল ক্রমশঃ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—শুধু খাওয়া আর শোওয়া বাড়ীতে হয়, অধিকাংশ সময় ছুটির দিনটাও বাইরে কাটায়, যে সময় মনের শান্তি সব চেয়ে প্রয়োজন, সেই সময়টা কল্যাণীর কেবল উদ্বেগের মধ্যেই কাটতে লাগল, আর এতদিন এই শান্ত কোমল মেয়েটির স্বভাবে যা মোটেই ছিল না, সেই খিটখিটে ভাব দেখা দিল।

কল্যাণীর প্রাণপণ প্রয়াস ছিল স্বর্ণ যেন এ সব জানতে না পারে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বর্ণর চোখে অনিলের পরিবর্ত্তন ধরা পড়তে কি দেরী হয়? স্বর্ণরবুকটা বেদনায় ভরে উঠত। স্বামীর অনন্যনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী স্বর্ণ সইর সৌভাগ্যে কতই সুখী ছিল, সে

প্রথম প্রথম অনিলের অতটা আঁচল ধরা ভাব পছন্দ করত না, কিন্তু তাও যে এ অবহেলার থেকে ভাল ছিল; কেমন করে অনিল এত বদলাতে পারল তা সে ভেবেই পেত না। অনিলের মন ভোলাবার জন্য সন্ধ্যা হলেই সে নানা ছুতায় কল্যাণীকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিত। দু'একদিন আপত্তি করে কল্যাণী কিছুই বলত না, কিন্তু সুযোগ পেলেই অনিল ফিরবার আগেই সব খুলে ফেলত্। অমন করে ফাঁদ করে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার যেন মাথা কাটা যেত।

চুপ করে থেকে থেকে একদিন কল্যাণী অনিলকে বেশ দু কথা শোনাবে ঠিক করল। অনিল তাসের আড্ডায় বেরুবার উদ্যোগ করতেই কল্যাণী বিরক্তভাবে কি বলল, অনিল পাল্টা জবাব দিল,—"তুমি কেবল পেঁচার মত মুখ করে থাকবে, তাই যতক্ষণ পারি বাইরে কাটাই।"

কল্যাণী আহত পক্ষীর মত বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। অনিলও ভযানক লজ্জিত হয়ে পড়ল। তার পর বোঝাপড়ার ধুম, কল্যাণী বলল,—"তুমি আর আগের মত নেই, মোটেই আমায় দেখতে পার না" ইত্যাদি।

অনিল ও অনেক যুক্তি দেখিয়ে স্বপক্ষ সমর্থন করল,—তার সময কই দু'দণ্ড বাজে কথা বলবার, তা ছাড়া কল্যাণী ও কি বদলায়নি, তা ছাড়া বয়সও তো বেড়েছে, তা ছাড়া আর ও কত কি। শেষে কল্যাণীর যুক্তি—দুঃখ দারিদ্র্য লাঘব করবার জন্যই তো প্রেম ও তার নিতান্ত প্রকাশ দরকার,—একথা মেনে নিলেও অনিল কার্য্যতঃ খুব বদলাল না।

নিয়ত পরিবর্ত্তন শীল জগতে মানুষের মন যদি বদলায় তাতে দোষ কি? একদিন যে অফুরন্ত প্রেম কপালে জুটেছিল তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়াই তো উচিত, তা কেন চিরদিন থাকবে না বলে আবদার করা কি বিজ্ঞের কাজ? দর্শন শাস্ত্রের এত কথা কল্যাণীর জানা ছিল না। জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়েস ও তার তখন হয়নি, বিজ্ঞতার বালাই ও ছিল না। কাজেই কল্যাণী নিজের অদৃষ্টের উপর রাগ করত, তাতে অদৃষ্টের ক্ষতি হল না, তার নিজের বুকটাই ভেঙে-চুরে শত খান হতে লাগল।

যে দিন কল্যাণীর মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হল. সে-দিন স্বর্ণকেই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সাবাদিনে অনিলের দেখা পাওয়া যায় নি, রেসে হেরে রাত্রে যখন ফিরল তখন সংবাদ পেল কি না মেয়ে হয়েছে। বাঙালী পিতৃপিতামহের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মনের সংস্কারটি যে মেয়ে হওয়ার খবরে উৎফুল্ল হল না, তা বলাই বাহুল্য। টাকাও সেদিন অনেক হেরেছিল। যে কারণেই হোক শ্রান্ত কল্যাণীকে দুটো মিষ্ট কথা বলবার অবকাশ আজকার দিনেও তার হল না।

এমনি করেই ধীরে ধীরে একটা বছর ঘুরে গেল, শেফালী আপন মনে ফুটে ঝরে গেল, কেউ খোঁজ নিল না। কল্যাণীর শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর মানসিক অশান্তি জুটে তাকে যেন আর সেরে উঠতে দিল না। এখন ঝগড়া না করে যখন তখন কেঁদে--কেটে সে অনিলকে উত্যক্ত করে তুলত। বুঝত না. আগে এক ফোঁটা চোখের জল দেখলে যে অধীর হত, সে আজকাল এত বুক ভাঙ্গা কান্নায় কেমন করে উদাসীন থাকে। আগে অত

না পেলে, না পাওয়ার ব্যথা কি এমন করে বাজত? রাণী কখনও ভিখারিণী হয়ে বাঁচে? এই রকম নানা চিন্তায়, নিরর্থক অভিমানে, আপনাকে সে আপনি কষ্ট দিত। আহা অনিল তবু যদি মেয়েটার পানে ফিরে তাকায় তাহলেও বুঝি কল্যাণী শান্তি পায়।

তারপর আকাঙ্ক্ষাও রইল না, অভিমানও রইল না,—রইল শুধু বিরাট শুষ্কতা ও শূন্যতা, মরুভূমির জ্বালাও বুঝি তার মত উগ্র নয়।

কল্যাণীর অবহেলায় অনিল আরও দূরে গেল। স্বর্ণের কাছেও কল্যাণী মনেব দ্বার রুদ্ধ করল। তার একান্ত আপনার রইল শুধু একটি মেয়ে লুকিয়ে তাকে বুকে চেপে কত কথা বলত, তার শিশু তার কোমল হাতখানি মায়ের মুখের উপর বুলিয়ে ডাকত— "মাম্মা"।

কল্যাণী যখন শয্যা নিল, তখন অনিল তো দুরের কথা, স্বর্ণও ভাবে নি—প্রদীপ এত শীঘ্র নিভবে। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও কিছু হয়নি। যে—দিন স্বর্ণ অবস্থা সঙ্কট বুঝতে পারল সে দিন ব্যাকুল হয়ে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে বলল,—"আমাব সইকে বাঁচাও"।— তিনি ডাক্তার ডেকে আনলেন,—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল।

উদ্বেলিত অশ্রু চোখে চেপে স্বর্ণ কল্যাণীর মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল,— "সই, বড় কষ্ট হচ্ছে কি? অনিল বাবুর আপিসে খবর পাঠাব?"

অতি শ্রান্ত কণ্ঠে কল্যাণী উত্তর কবিল,—"না ভাই, স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরে সতীর স্বর্গে যাবার ইচ্ছা নাই। ভগবানের কোন দয়ার ভিখারী আমি নই"।—

স্বর্ণর চোখের জল বাধা না মেনে উছলে উঠল। চোখে দুটি ঈষৎ খুলে কল্যাণী বলল,—"না, না, ভগবানের দয়া আছে বই কি। না হতে কি তোমায় পেতাম? মেয়েটাকে দেখো ভাই।"

তার পর শেফালী বনের অশরীরী কামনা যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাতাসে মিলিযে গেল।

লোকেরা কল্যাণীকে যখন পথে বারকবে "হরিবোল" দিল, তখন দুটি নাবী বলাবলি করে গেল,—"আহা, সৌভাগ্যবতী সতী, নোয়া সিঁন্দুর নিয়ে চলল।"

কথাটা শুনেই স্বর্ণ শিউরে উঠে দুই কান ঢেকে মেজেয় লুটিয়ে পড়ল।

'বিচিত্রা'—১৩৩৪

ঈদের চাঁদ

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"আম্মা একটু পানি—"

"বেশী পানিও তো নেই বাবা, সন্ধ্যা না হলে পানি আনাও যাবে না, যে লোকের ভিড়,"—

"ভিড় কেন আম্মা?"

"আজ যে রে ঈদ?"

"ও— মোটেই মনে ছিল না। বাবা একবার ঈদের সময় আমাকে আচকান আর জরির টুপী কিনে দিয়েছিল সেগুলি কি হল মা?"

"তোমার ছোট হয়ে যাওয়ায় বিলিয়ে দিয়েছি।"

মাতাপুত্রের কথা হইতেছিল। বাহিরে তখন আকাশে সূর্য্য সোনার কিরণে সন্ধ্যার নীলাম্বরীর পাড় বুনিতেছিল।

"কি খেলেন আজ?"

"যা ছিল তাই খেয়েছি— তোর অত কথার কি দরকার?"

"তা আম্মা সত্যি কথাটা বলুন—"

"দুটো মুড়ি ছিল তাই খেয়েছি।"

"কেন চাল নেই?"

মা কথা কহিলেন না, দুর দিগন্তের পানে চাহিয়া চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেশী দিনের কথা তো নয়, মাত্র পাঁচটি বছর আগে এই দিনে তিনিও যে কত রকম রাঁধিয়া দশজনকে খাওয়াইছেন, আর আজ ঘরে এক মুঠা চাউলও নাই, রুগ্ন পুত্রটির পথ্য নাই। সম্মুখে ওই জমীদার বাড়ী। তিনি তো একদিন বধূবেশে সেই বাড়ীতেই আসিয়া ছিলেন। বর্তমান জমীদার তখন বালক মাত্র, এক মাথা কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, হৃষ্ট পুষ্ট বারো চৌদ্দ বছরের ছেলেটা আসিয়া সন্দেহ মিশ্রিত ভয়ের সহিত লাল বেন'রসী জড়ানো পুটুলীর পানে চাহিয়া ডাকিয়া ছিল, "ভাবি।" সদ্য ভ্রাতৃহারা ষোল বছরের মেয়েটি সে মুখে বুঝি মৃত ভ্রাতার সাদৃশ্য পাইয়াছিল, ঘোমটা একটু ফাঁক করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমননিই তো।

বালক মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিল, "আম্মা, দেখলে বকবেন, আপনাদের ঘরে আসতে মানা কিনা। একটু কথা বলুন না।" কিশোরীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু নির্ঝর ছুটিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বস ভাই," সহসা একটি স্থূলাকার চাকরাণী ঘাড় কাত করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "আ, আমার কপাল! আমি রাজ্যি খুঁজে, হয়রান, আর আপনি এখানে? সে কথা মনে নেই বুঝি?" বালকের মুখ শুকাইয়া উঠিল, তবুও সে নব-বধূর সম্মুখে একটু নির্ভীকতা দেখাইয়া বলিল, "যা, যা, অত ফাজলামো করিস নে।" "আমি ফাজলামো করি, আচ্ছা বলিগে তবে আম্মার কাছে," বালক আর কথাটি না কহিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, তবুও দেখা যাইত এই দুটিতে রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্নে ছায়া-শীতল বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া নানা উপায়ে আহরিত টক কুল ও ডাঁসা পেয়ারার সদ্ব্যবহার করিতেছে, কোন দিন বোনটি সযত্নে নানা প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া ভাইটির প্রতীক্ষা করিত, চোরের মত দু এক বার তাহাদের বাড়ির দিকে উঁকি ঝুঁকিও দিত, হঠাৎ দুরন্ত বালক দমকা হাওয়ার ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "আম্মাকে এমন ঠকিয়েছি আপা! এমনি তো আসতে দেবে না, তাই পায়খানা যাব বলে বদনা নিয়ে এসে বদনাটা পায়খানায় রেখেই চম্পট দিয়েছি," কিশোরী বোনটী একমুহূর্তে প্রবীণার ন্যায় গম্ভীর হইয়া বলিল, "ছি ভাই—মাকে ফাঁকি দিতে নেই, মার সঙ্গে মিথ্যে বল্লে, আল্লা রাগ করেন।" বালক শঙ্কিত নয়নে মিটিমিটি চাহিত, তখন বোনটি বলিত, "আচ্ছা আজ যা করেছ মাফ চাইলে আল্লা মাফ করবেন, আর কখনো অমন কাজ করো না।" এই রকম কত ছোট খাট ঘটনা। স্বামী ইহাতে সন্তুষ্টই হইতেন, তাঁর নিজের ও আর কেউ ছিল না, বধূটির তো চতুর্দ্দিকই শূন্য।

আজাহারের পিতা মৃত্যু কালে বড় বিশ্বাসে পুত্রটিকে ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ছিলেন। তা পিতৃব্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেন নাই, সেকেণ্ড-ক্লাসএ থাকিতেই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, বলিলেন, 'ও জমীদারের ছেলে জমীদার, লেখা পড়ার জন্য কষ্ট করবে কোন দুঃখে?—নিজেই যা আছে তাই বুঝে নিতে শিখুক," ফলে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আজাহাবকে সেরেস্তার সিংহাসনে বসান হইল, কিন্তু আমলাদের উপর গুপ্ত নিষেধ রহিল যেন তাহাকে দলিল পত্র না দেখায়, তবুও বালক বুদ্ধি বলে অল্প দিনেই বুঝিল যে তার নিজের বড় বেশী কিছু নেই, সবই বাকী খাজনার দায়ে নিলাম পড়িয়াছে, বেনামীতে বাখিয়াছেন ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র- বৎসল পিতৃব্য।

আরো কিছু দিন গেল, সহসা একদিন ঝড় উঠিল, জমিদার সাহেবের ভ্রাতার নাম করিয়া আফসোস করিতেই বালক আজহার তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর মায়া কান্না কাঁদবেন না, চাচা সাহেব! বাবার শোকে আমাকে তো পথের ফকির করেছেন।" তার অল্পদিন পরেই পিতামাতা এবং সহায় সম্পদহীনা বনিয়াদী বংশের কন্যা এই বধুটিকে ভ্রাতুষ্পুত্রের গলায় গাঁথিয়া আম বাগানের ওপরে একখানা গৃহ এবং কয়েকখানা জমি পত্র দিয়া বলিয়া বেড়াতে লাগিলেন, "আজকাল কার দিনে এত কেউ করে না। ভাই যেমন সঁপে দিয়েছিল, তেমনি লেখাপড়া শিখিয়েছি, বিয়ে দিয়ে সংসারীও করে দিয়েছি," সবাই বলিল, "ঠিক তো।"

তারপরে বালক জমিদারের জমীদারী ছয় মাসে উড়িয়া গেল, কেন না বেশী কিছু তো ছিল না। যখন সম্পত্তি পাওয়া গেল তার একমাস পরেই সূর্য্যাস্তের লাট, অত আসে টাকা কোথা হইতে?—পিতৃব্য বলিতে লাগিলেন, "আমি কি করব?—ওর নসীবে নেই, নাহলে আমি সব চুলচিরে বুঝিয়ে দিয়েছি, জমীদারী রাখা কি এসব ছেলে-ছোকরার কাজ?" পরের বৎসর আল্লাহতালার আশীর্ব্বাদের মত ফুলের মত ছোট্ট ও সুন্দর ফারহাদ আসিল, তরুণী মাটি লজ্জা রক্তিম মুখে স্বামীর পানে চাহিল, নব জাগ্রত স্নেহ ভরা অন্তরে তরুণ

পিতার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, ''কি সুন্দর!''—পরের দিন ভাইটি আতাহার আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ''ওগো আপা! কি সুন্দর পুতুলের মত বাচ্চা;—ওকে আমি নেব—'' একটু পরেই অভিমান ভরা সুরে বলিল, ''এবার আমাকে কম আদর করবেন নাতো?'' ''না রে পাগলা!'' বলিয়া সে স্নেহময়ী বড় বোনটির মতই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিল।

তার পর কত দুঃখের দিনও গিয়াছে, আতাহার পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। একটা দোকানে হিসাব লিখিয়া আজাহার মাসে দশটী টাকা পাইত, আরও দু'চার জায়গায় ছেলে পড়াইয়া কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিল। তবু—কি সুখেই যে ছিল তারা? বাহিরের অনটনের এবং প্রাচুর্য্যের সুখ এই দুয়ের মধ্যে কে যে জয়ী হইয়াছিল তা তো তার অজানা নাই।

ষোলটা বৎসর ঠিক যেন ষোলটা মূহূর্ত্তের মত চলিয়া গেল, বিদায় বেলায় আজাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, ''আর সময় নেই মেহের, বড় সুখেই জীবনটা কাটল, সব সময় আল্লাহতালার উপর নির্ভর করো, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, ও করুণাময়, তাঁর কাছে কেউ বিমুখ হয় না, ফরহাদ ঘুমিয়েছে, ওকে জাগিয়ো না, যেমন করে পারো মানুষের মত মানুষ করবার চেষ্টা করো—বিনা চিকিৎসায় অকালে আমার দিন ফুরিয়ে গেল, অথচ আমাব সবই ছিল, আছে। মানুষের উপর নির্ভর করো না, কারো কাছে হাত পেত না, বিশেষতঃ ও বাড়ীতে, আতাহারের উপর কত আশা করেছিলে, সম্পদের নেশায় সেও সব ভুলে গেল, প্রতিজ্ঞা কর কখনো ওদের কাছে কিছু চাইবে না, না খেয়ে মরলেও না''—চোখের পানিতে ভাসিয়া মেহের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আজাহারের মুখেও বড় সুখের হাসিই ফুটিয়াছিল।

''আম্মা? মা?'' অতীতের রূপসী মেহের কল্পনায় মিলাইয়া গেল, অকাল বৃদ্ধা জননী স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় উত্তর দিল, ''কেন বাবা?'' ''সারাদিন এমনি না খেয়ে থাকবে? তার চেয়ে বরং রহমতের মাকে ডেকে ওবাড়ীতে পাঠাও না।'' মার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বর্ষিত হইল, তীব্র কণ্ঠে শুধু বলিল ''ফরহাদ।''

''আজ ঈদ নয়—''

''কে বলেছে?''

''কাল মেঘের জন্য কিছু দেখা যায় নি, সবাই ভেবেছে চাঁদ উঠেছে বুঝি, আজ কলকাতা থেকে তার এসেছে কাল ঈদ, আজ চাঁদ উঠবে।''

''এত পোলাও, কোর্মা, ফিরনি, জরদা যে রাঁধা গেল—এগুলোর কি হবে?''

''আরে তাকি পড়ে থাকবে?'' ''আচ্ছা ঈদ যদি নাই হয় তবে ওদের কাপড় চোপড় গুলি একটু বদলে আনুক না,''

''আবার কি বদলাবে?''

''হেনার শাড়িটা ফিকা হলদে রং এনেছে, ফিকা নীল কি সবুজ হলে ভাল হতো, ও ফরসা তো; আর শিউলি একটু ময়লা, ওরই কাপড় এনেছ ঘননীল, ওটা আনুক গোলাপী।''

জমিদার সাহেব ও বেগম সাহেবা কথা বলিতেছিলেন। বেগম সাহেবা দেখিতেও মন্দ নয়, বেশ ফরসা রং, দোহারা শরীর, বয়স তেইশ চব্বিশ, যাইতে যাইতে সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন," ওই যাঃ ভুলে গেছি, ওবাড়ীর ফরহাদের নাকি বড় অসুখ, ওদিকে চিকিৎসা দুরে থাকুক, পথ্যও চলে না।"

"কেন চলবে না? বাপ তো শুনি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের কত বিষয় পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিল, তা মা'টির হাতে কিছু জমাও নেই?"

"আমি তো জানিনে কি হয়েছে, না হয়েছে, এ বাড়ীতেই যা বদনাম, না হলে গাঁশুদ্ধ লোকে ভাই সাহেবের তারিফ করে, আপাকেও তো মন্দ লাগে না।"

আপার নাম স্মরণে সহসা আতাহারের মনের বন্ধ ঘর যেন এক ঝলক প্রভাত কিরণে প্লাবিত হইয়া উঠিল, কত দিনের সেই স্মৃতি! একটি বোন ও একটি ভাই! সেই স্নেহে কোমলা ও কর্ত্তব্যে কঠোরা আপা! সেই ফুলের পুতুল ফরহাদ! আজ তো তাহাদিগকে সে মনেও করে না, কত জঞ্জালের আবরণে তাহাদের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আপাওতো একটু খোঁজ নেয় না, সেকি অভিমান করিয়াছে? অভিমানিনী বোনটি, সে ডাকিলেও কি আসিবে না?

"ফরহাদ"

"মা!"

"উঠে বসতে পারচি নে বাবা?"

"না আম্মা, বড় দুর্ব্বল লাগে,আলোটা আড়াল কর, আঁধার বেশ মিষ্টি, ওমা চেয়ে দেখ ওই বনটায় কেমন জোনাকী জ্বলে, ঝিঁঝিগুলি ডাকে, ওরা যেন ডাকে "আয়" "আয়" কি যেন কখন ফেলে এসেছি, বলে "খুঁজে নিবি আয়।" আজ আমি মরে গেলে অমনি বনে রেখে দেবেতো? গোরস্থানটায় বড় জঙ্গল হয়েছে।"

"ফরহাদ! বাবা জানিসনে কি এসব বললে আমার কত কষ্ট হয়?"

"হোক না একটু, আমিতো চিরদিন তোমাকে কষ্টই দিয়েছি, আজ যাওয়ার সময় আর অন্য কি দেব?"

"আমি না যেতেই তুই যাবি?"

"সময় হতে কি করব? ডাক পড়ল যে, কত দুঃখ যে তোমার অদৃষ্টে আছে! বাবা চলে গেলে কত কষ্ট করে নিজ হাতে গাছ গাছড়ালাগিয়ে, সেলাই করে এতদিন কাটালে, আমা হতেও তো কোন সাহায্য পাওনি, মন দিয়ে শুধু পড়েছি আর ভেবেছি এতেই তোমার দুঃখ ঘুচবে, এখন দেখি সব ভুয়া, মানুষ চোর হয় কেন, ডাকাতি করে কেন কিছু বুঝেছ? আমি বেঁচে থাকলে যাঁরা পরকে ঠকিয়ে কোর্মা পোলাও খেয়ে ভুঁড়িওয়ালা হয় তাদের ভুঁড়ি কেটে টাকা বের করে আমার মত দুঃখীদের দিয়ে দিতাম, একে অন্যায় বল আর যাই বল। নইলে কেউ পোলাও কোর্মা নর্দ্দমায় ঢেলে দেয়, কেউ বা তিন দিনেও খেতে পায় না কেন? চিরদিন জেনে এসেছি স্রষ্টার বিচারে কোন ভুল নেই, কিন্তু—"

"ওরে বিশ্বাসেই যে তৃপ্তি আর শান্তি মেলে।"

"তা মিলতে পারে, কিন্তু ভাত যে মেলে না, এটা ঠিক, এইযে দুনিয়া জুড়ে হাহাকার উঠেছে "অন্নচাই", "বস্ত্র চাই"— কেন তা মেলে না?

"যখন সময় হবে মিলবে, সময় হয়নি তাই মেলে না।" "হ্যাঁ খুব সত্যি কথাই তো, টাকার চাপে কতকগুলি লোক হাঁফিয়ে উঠেছে, অথচ তাদেরই চোখের সম্মুখে অসংখ্য প্রাণী "হা অন্ন", "হা বস্ত্র", বলে কবরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, আর সময় হবে কখন?"

"তারা হয়ত সময় থাকতে শক্তির অপব্যবহার করেছে, তার পর অসময়ে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। যেদিন লোকে শক্তি ও সময়ের মূল্য বুঝতে এবং সদ্ব্যবহার করতে শিখবে সে দিনই অনেকটা দুঃখ ঘুচবে।"

"ঠিক কথা"। "আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় তো এই টুকুই বুঝেছি,—আর বাজে বকিসনে বাবা, মন খারাপ করে কি লাভ?—তুই নিজে মানুষ হ, প্রত্যেকে যদি নিজের ঘরের দুঃখ ঘুচাতে চেষ্টা করে, তাহলেই তো দুনিয়াব অভাব অনটন ঘুচে যায়।" "না আম্মা;—নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরের দুঃখও মোচনের চেষ্টা করা উচিত। বড় দুষ্টু হয়েছি আমি; তোমার সঙ্গে তর্ক করি—না?—আচ্ছা আর কথা বল না, তোমার পা দুটি আরও কাছে আন, আজকাল তো শুধু পায়ে বেড়াও—তবুও কি নরম!— যেন একরাশ ফুল, তোমার চোখ দুটি মাগো ভোরের তারা।"

সম্মুখের কতকটা পড়ো জমি; তাতে, কতকালের দুই-চারটি শুষ্কপ্রায় গাছ, তার পরেই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, অনেক দূরে দু'একটা আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। ছেলের চুলগুলি হাত বুলাইতে বুলাইতে মা সেদিকেই চাহিয়াছিলেন। রুক্ষ চুলগুলি মুখের চতুর্দ্দিকে উড়িতেছে। সন্ধ্যা তারার ন্যায় চোখ দুটি বিষাদে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। তিনি ভাবিতে ছিলেন অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ছেলে যে কথাগুলি বলিয়াছিল তাই—সত্যই তো দুনিয়াব কেহ অতিরিক্ত সুখী আর কেহ অতিরিক্ত দুঃখী—কেন? মানুষ মাত্রই একে অপরের ভাই, কেহ সেকথা ভাবে না কেন?

"আম্মা?"

আবার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল, মা উত্তর দিলেন "কি বাবা"। "তোমার হাতটা আমার গায়ে দাও—আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূরে বসে আছ, আচ্ছা-তুমি না বলেছিলে ও বাড়ীর ছোট চাচাকে তুমি খুব ভালবাসতে— তাঁর সাহায্যও কি নেওয়া যায় না?" "না বাবা, অভাবে পড়লে কোন আত্মীয়ের সাহায্য নেওয়া সয় না, বরং পরের কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া যায়। যখন সে ছোট ছিল একদিন বলেছিল যে বড় হয়ে নাকি তার বাড়ীতে আমাদের সক্‌লকেই নিয়ে যাবে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে পরীর মত বৌ আনবে, কত কি বলত, আর একবার বছর দশেক আগে—তোমার বাবার অসুখ হওয়ায় অনেক মিনতি করেছিল যেতে'—"গেলে না কেন?" "সময় হয়নি বলে যাওয়া হয় নি, তাতেও ঠিক একই কথা বলেছিল, যেদিন সে মনের সমস্ত জটিলতা মুছে ফেলে বংশগত বিদ্বেষ ভুলে ছোট ভাইটির মত হবে সেদিন সময় হবে, যাক,— সেদিন যদি না-ও আসে এই টুকুই আল্লাতাল্লার কাছে চাই যেন কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে না হয়।"

"সেদিন আসবে না আম্মা, গরীব কোনদিন বড়লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না, যদি তার গায়ে না জোর থাকে।"

"এত কথা তুই কোথায় শিখলিরে?" "এই সহজ সত্যটাও কি কারোর কাছে শিখতে হয়? এইতো চোখের সামনে বড় মানুষ ভাই—বিষয় সম্পত্তি সব থাকতেও বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমাবও আজ সেই অবস্থা, কিন্তু ঐ জমিদারীর অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী আমাদের।"

"সবই জানি, কি করব বল?" "তাই হোক-আর তো কোন বন্ধন তোমার থাকবে না, মিথ্যে মায়ায় কাজ কি, চাচা যদি কোনদিন সাহায্য করতেও চান সে ভিক্ষা তুমি নিও না।"

"আচ্ছারে তাই হবে, এখন তুই একটু চুপ করে থাক, মুখ শুকিয়ে যাবে যে;—কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে, আমি নামাজটা পড়ে নি—"

"আমাকে একটু বুকে নাও মা"—"কেনরে? আজ আবার বাচ্চা হয়ে গেলি নাকি?" মা'র বুকে মাথা রাখিয়া অপলক দৃষ্টিতে সে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সেই দেখাটুকু যেন তার দীর্ঘপথের পাথেয়! "একটু পানি", "মাও,—ওকিরে?—ওকিরে?—পানি পড়ে যায় কেন?" কিছুনা, আম্মা, আমার মাথাটা উপর দিকে করে দিন, কিছু হয় নাই,—মনে আছে তো—'ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না এলায়হে রাজেউন" সকলেই তাঁর কাছে যাবে তো একদিন, তবে আর দুঃখ কিসের?"

"বাবা!—ফরহাদ!"

"মাগো সন্ধ্যা হলো বুঝি—আমার সামনের জানালা খুলে দাও—আমি আকাশ দেখবো—আজ না ঈদ—ঈদের চাঁদ এসেছে আমার জন্যে—না আম্মা—"

অনাথিনীর বুক দুলিয়া উঠিল, কাতর স্বরে সে ডাকিল—"ফরহাদ"।

ফরহাদের চোখে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল—নির্জ্জন মরু প্রান্তরে যেমন ধীরে নিঃশব্দ চরণে রাত্রি নামিয়া আসে।

ফরহাদের সর্ব্ব শরীর একবার শুধু কাপিয়া উঠিল—তাহার পর দুই কম্পিত কর চাঁদের শীর্ণ রেখাটির দিকে একবার নাড়িয়া পড়িয়া গেল।

মেহেরের বুকে অশ্রুর সাগর গর্জ্জিয়া উঠিল।

এমন সময় দুরে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল, যেন আনন্দ-ধ্বনি, বেড়ার ফাঁক দিয়া একটা বাতি দেখা গেল, ক্রমে নিকটে আসিল, যে আসিয়াছিল সে দুয়ারের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, উৎকর্ণ হইয়া একটু প্রতীক্ষা করিল, তার পর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ফরহাদ ঘুমিয়েছে বুঝি? যাক—টাউনে লোক পাঠিয়েছি, ভোরে সিভিল সার্জ্জন নিয়ে ফিরবে—ও সেরে উঠলে আপনাকে শুদ্ধ ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই, ও'র লেখাপড়ার ভাল রকম বন্দোবস্ত করতে হবে—অমন করে চেয়ে রইলেন কেন?—ঈদের চাঁদ উঠেছে কিনা তাই সালাম করতে এসেছি, আজকের দিনে আমাকে মাফ করে দিন আপা? ছোট ভাইয়ের দোষ কি মনে করে রাখে?—আজ নিশ্চয়ই আপনার

কাছে এতদিনের বে-আদবীর বদলে স্নেহই পাব, এখনও সময় হয় নি?

মা স্থির দৃষ্টিতে মৃত পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। উদাস করুণ দৃষ্টি তুলিতেই চোখে পড়িল চন্দ্রলেখা! ঈদের চাঁদ! হায়রে ঈদ!

দুই কান ভরিয়া বাজিতে লাগিল সেই যুগ যুগান্তরের ব্যথাভরা অমর বাণী—গরীব কখনো বড় লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না, যদি তার গায়ে জোর না থাকে।

জোর গায়েও নাই, মনেও নাই, সব দেনা-পাওনা তো ফুরাইয়াই গেল, শূন্য তহবিলে আর কিসের কারবার? অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মাফ? — মাফ তো বহু পূর্ব্বেই করেছি ভাই, কিন্তু তোমার সাহায্য নেবার সময় আর এ জীবনে হবে না, ফিরে যাও, পথ ফুরিয়ে এসেছে, এ সময় আর পথ-ভ্রষ্ট করো না, দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করো, সেই-ই আমার সেবা হবে।"

ক্রমশঃ রাত্রির গাঢ়তায় চাঁদ ডুবিয়া গেল।

'মাসিক মোহাম্মদী'—১৩৩৫

সাবধানী

শ্রীহেমমালা বসু

দত্তপুকুর গাঁয়ের দত্তবাবুরা খুব ডাকসাইটে লোক; ভাল লোকেরা মনে করত, লক্ষ্মী সরস্বতী শুধু এঁদের বাড়ীতেই একসঙ্গে বাস করেন। সরস্বতীর বাসস্থান তো বাইরে থেকে বুঝতে পারা যায় না; তবে লক্ষ্মীর প্রত্যাশীতে ভরা সেই চকমিলানো বাড়ীখানি ও ধান-ভরা প্রকাণ্ড মরাইগুলির পানে তাকালেই লক্ষ্মীদেবী যে এখানে আছেন তা বেশ বুঝতে পারা যায়। সেই জন্যেই এই "সাত-আনির" বাবুরা খাজনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভয়-ভক্তিও বরাবর আদায় ক'রে আসছেন, তাঁদের তিনটি ভাইকে তিন দিক্‌পালের মতই গাঁয়ের সবাই মান্য করে।

কিন্তু দুষ্ট লোকেরা বল্‌ত, আগে এঁদের এত তালুক-মুলুক ছিল না; বর্ত্তমান জমিদারের পিতা পরলোকগত বিপিন দত্তের বুদ্ধিতেই নাকি এত সব হয়েছে। 'নয় আনি'র 'কর্ত্তা মারা গেলে পরে এই কাকাবাবুটি নাবালক ভাইপোদের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তার পরেই "নয়-আনির" ভাল ভাল তালুকগুলো নিলাম হয়ে গেল ও 'সাত-আনি' তা কিনে নিয়ে মুলুকের কর্ত্তা হয়ে পড়লো।

বিপিন দত্তের ছোট-গিন্নীর ছোটখাটো, গোলগাল, কালো মেয়েটাকে তার ঝি সাবধানী বলে ডাক্‌ত। সে বড় হ'লে পরও এই নামই তার রয়ে গেল, "লতিকা' বা 'কণিকা,' এমনি একটা ভাল নাম আর রাখা হলো না। দুষ্ট লোকরা বল্‌ত, যার কিছুতেই ভালো নেই, তার ভালো নাম রেখে কি হবে? বাড়ীর কর্ত্তা বিপিন দত্ত, এতকাল কাশির অসুখে ভুগে ভুগেও তো বেঁচে ছিলেন, মেয়েটা মার পেটে আসবার পরই না একদিন কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আটকে গিয়ে একেবারে পটোল তুললেন! তা ছাড়া মেয়েটা ভূমিষ্ঠ হবার পরই ছোট গিন্নী এমনি অসুখে পড়লেন যে, সারা বছর তাঁকে শয্যাধরা হয়েই থাক্‌তে হয়েছিল। 'এর নাম অপয়া রাখলেই ঠিক হতো!'

বুড়ো ঝির কাণে এ সব কথা গেলে আর রক্ষে ছিল না; সে তাদের সঙ্গে 'কুরুক্ষেত্র' ক'রে বাড়ী এসেও বকে মরতো। সেদিন বিকেলে ছোট-গিন্নী যখন এক ধামা তেঁতুল নিয়ে কাটতে বসেছেন, কোথা হ'তে ছুটে এসেই ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কথাই সুরু করে দিলে—'পোড়া লোকের মুখে আজকেও আগুন দিতে এলাম, ওরা এত মিছে কথাও কইতে পারে মা! আমি তো কত ছেলেই মানুষ করলুম, এমন লক্ষ্মীমেয়ে আর একটিও দেখিনি! কি সুবুদ্ধি মেয়ে তোমার এই সাবধানী! বিষ্টি হ'লে পরে এই টুকুন বেলা থেকেই কেমন পা টিপে টিপে চলে, কক্ষণো উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে না; আপনার কাপড়টি জামাটি শুকুলে পরই অমনি কুঁচিয়ে এনে আনলায় রেখে দেয়। খেলনাটি পুতুল গুলিরই বা কি যত্ন! আর ভুলো পট্‌লা—বড় বৌদির ছেলেরা যেন সব কি রকম। বই শেলেট কি খেলবার ঐ গুলো, কোথায় যে কি ফেলে রাখে কিছু ঠিক নেই! তোমার সাবধানীর মাথার চুলটিও সিঁথের এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারে না, এমনি তার পরিপাটি! এ মেয়ে

কখনো সামান্যি নয়! আমার মনে হচ্চে ছোট-মা, কোন্ দেবতাই বা দয়া ক'রে তোমার গর্ভে এসেছেন, নইলে এই একরত্তি মনিষ্যির কি এত বুদ্ধি হ'তে পারে? তুমি এই বারে ওর বে-থা দাও ছোট মা, এই মেয়ে হতেই তোমার দুঃখু ঘুচবে; কথায় বলে না—

'শত পুত্তুর সম কন্যে যদি সুপাত্তরে পড়ে!''

ছোট-গিন্নী মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনলেন, অস্তগামী সূর্য্যের পানে চেয়ে নীরবে চোখের কোণটি মুছেও ফেললেন, মুখে কিছুই বললেন না। ''কেঁদ না ছোট-মা, ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, আর কি জন্যে কাঁদবে, সুখের দিন তো এল বলে!'' ব'লে ঝিও তার কাজে চলে গেল।

একলা ঘরে বসে, তেঁতুলের বীচি ছাড়াতে ছাড়াতে ছোট-গিন্নী কত কথাই ভাবতে লাগলেন; বিয়ের পরের এই বারোটা বছর এমনি করেই তাঁর কেটে গেছে! ঝি ওর একটা কথাও কিন্তু বাড়িয়ে বলেনি। বিপিন দত্তের বুড়ো বয়সের এই মেয়েটা, বুদ্ধিতে বুড়োদেরও হার মানিয়ে দেয়। তাকে যে দেখে সেই তো অবাক হয়ে যায়। আচ্ছা বুড়ো ঝির একথা কি সত্যি হ'তে পারে না— ছোট-গিন্নীর দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে কোনো দেবতা কি তার গর্ভে জন্ম নিতে পারেন না? কলিকাল বলেই না, নইলে আগেকার দিনে এমন ঘটনা কতই তো ঘটেছে!

মানুষের জীবনে কোনো দিন দুঃখের, কোনো দিন বা সুখের হয়ে আসে। সুখ কা'কে বলে ছোট-গিন্নী এখনো তা জানতেও পারেননি। গরীবের ঘরে জন্ম নিয়ে আঠারোটা বছর সেখানে কত কষ্টই পেয়েছেন, বিধবা মা বিয়ে দিতে না পেরে, শেষটা কিনা দত্তবাড়ীর সেই ঘাটের মড়াটির সঙ্গে তাঁকে গাঁটছড়া বেঁধে বিদায় করে দিয়েছেন! তার পর থেকে অমন মাকে তিনি আর মা ব'লে মনেও করেন নি। মা হ'লে কি তিনি এমন সৎসতাতোর ঘরে, ঘরে তো নয়—সতীনকাঁটার বনে মেয়েকে বনবাস দিতে পারতেন? একটি দু'টি নয়—বুড়োটির ছেলে মেয়ে, বউ নাতিতে বাড়ী একেবারে ভর্ত্তি! তার ছেলেরাই যে মস্ত মস্ত, সব বুড়ো হ'তে চলেছে। কর্ত্তাটিকে দেখলে তাঁর মনে এত ঘেন্না হতো যে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করতো। পয়সা দেখে মা বিয়ে দিলেন—হায়, শুধু পয়সাতেই কি সুখ হয়? বরং সুখের যে আশাটুকু এতদিন ছিল, 'বড় ঘর ছোট বর' পাবার জন্যে তিনি যে কত ব্রত উপবাস করেছিলেন, সে আশা তো ফর্‌সা হয়েই গেল! যাক্, তার দুটি বছর পরে বুড়োটি যেই মারা গেলেন, এই গুঁড়োটিকে পেটে ক'রে তিনিও বিধবার সাজে সাজলেন; কে জানে, আর কতকাল তাঁকে এমনি হয়ে থাক্‌তে হবে? দশটা বছর তো একাদশী করেই কাটলো! প্রেম, প্রণয়ের কথা তাঁর কাছে শুধু কথাই থেকে গেল, তার স্বাদ তিনি আর এ-জীবনে পেলেন না!

তিনি দু'চক্ষে দেখতে না পারলেও কর্ত্তাটি কিন্তু তাঁকে ভালবেসেছিলেন, নইলে আট হাজার দশ হাজার টাকার এক বাক্স গয়না—কৌটো-ভরা গিনি মোহর আর তাড়া-বাঁধা সব নোট তাঁকে দিয়ে গেলেন কেন? মনের ঘেন্নায় কর্ত্তার দেওয়া গয়নাগুলো যদিও তিনি একটি দিনও গায়ে ছোঁয়ান নি, তবু এখন এই তো তাঁর সম্বল; সাবধানীকে বিয়ে

দিতে হ'বে, জীবনের অনেক পথই যে এখনো তাঁর পড়ে রয়েছে।

ছোট-গিন্নী এমন নিবিষ্টমনে এই-সব চিন্তা করছিলেন যে, সাবধানী যে ঘরে ঢুকলো তা টেরও পেলেন না; সে তেঁতুল-বীচিগুলোর দিকে হাত বাড়ালে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলো। তখন সন্ধ্যে হয়েছে, মনের সঙ্গে তাঁর ঘরখানিও আঁধারে ভরে গেছে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ''একটা আলো নিয়ে আয় তো সাবধানী, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল!''

সাবধানী যখন উঠে গেল, ছোট-গিন্নী একটু গর্ব্বের সহিত তার দিকে চেয়ে দেখলেন। কালো হ'লেও মেয়েটি কুৎসিত ছিল না; ডুরে সাড়ীখানি ঘুরিয়ে পরে খাটো চুলের গোছা নাচাতে নাচাতে যখন সে পাঠশালাতে পড়তে যায়, পথিকরাও তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ফরসা, মাঝারি, আর সব মেয়েদের মাঝখানে তাকে একটুও খারাপ দেখায় না।

পিদিমটি পিলসুজের ওপরে রেখে সাবধানী তেঁতুল-বীচির কাছে বসে পড়লো; ছোট-গিন্নী তার চিন্তা-সূত্রটি জোড়া দিয়ে ঠিক ক'রে নিচ্ছিলেন, সে একটি কথাতেই তা একেবারে ছিন্ন করে দিলে—''শোন মা, আমি এই মাত্তর রান্নাঘরের ধার দিয়ে আসছিলুম; দেখলুম মেজ বৌদি রাঁধ্‌ছে, আর বড় সেখানে বসে বল্‌ছে কি জান— 'হ্যাঁ সৎমা নাকি আবার মা! দুঃখের কথা কি বলব মেজবউ, ওঁদের বুদ্ধি থাকলে তো আসল নকল বুঝে নিতে পারবে।' আমায় দেখতে পেয়ে বড় বউ অমনি চুপ হয়ে গেল— কেন মা?''

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা বঁটিটি কাৎ করে রেখে উঠলেন ও ত্রস্তপদে বারান্দায় এসেই আকাশ কাঁপিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার তুললেন—''সৎমা যে মা নয় সে সবাই জানে। ওলো ছোটলোকের মেয়েরা, সে কথা বলে তোরা আর কি করবি? আমার যা করবার তা ভগবানই করেছেন! থাকতেন যদি আজ উনি, ও মুখ কি আর দর্শন করতুম? নাক কান কেটে ঘরভাঙানীদের তা হলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতুম!''

রান্নাঘর নীরব হয়েই রইল; ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক শব্দ ভিন্ন যখন আর কোনো শব্দই সেখান থেকে শুন্‌তে পাওয়া গেল না, তখন ছোট-গিন্নী বিজয়ী বীরের মত গম্ভীর মুখে ঘরে এসে জানালার ধারে গিয়ে বসলেন। তাঁর মনের গরম চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দেখে সাবধানী আর সেখানে থাকা উচিত বোধ করলে না, তেঁতুলের ধামা বঁটি সব খাটের নীচে ঠেলে দিয়ে বীচিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন তার ঝির সন্ধানে গেল।

২

এমনি ঘটনা দত্তবাড়ীতে নিত্যই ঘট্‌তে লাগলো, কারণ সাবধানী দৌত্যকার্য্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। পাড়ার ওবাড়ীর লোকেরা কে কি বলে বা কে কি করে, খাবার বেলা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বড়বউ বড় মাছ খানা কোন্ দিন কার পাতে ফেলে দিয়ে যায়, এসব জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই এখন আর ছোট-গিন্নীর অগোচর থাকে না; ফলে বৌ দু'টি বড় মুস্কিলে পড়ে গেল। কলহ-বিদ্যায় তাদেরও কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা ছিল, তার পরিচয় স্বামীর কাছে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকত—এই ক্ষুদে শাশুড়ীটির ক্ষুরধার রসনার ধারে তারা এগোতেও পারত না, কারু কাছে বলে কয়ে কোন লাভও পেত না। শান্তস্বভাবা

মেজ বউকে সবই সহ্য করতে হ'ত, কারণ মেজ রবীনবাবু কানভাঙানী কথাগুলো মোটে কাণে তোলে না। বড় অসহ্য বোধ হলে বড়বউ যদি বড়বাবুর কাছে দুঃখের কথা বলতে যান, তবে কখনো শোনেন, "এখানে থাকতে হলে এ সব সয়েই থাকতে হবে!" কখনও বা "উনি আমাদের মা, ছেলের কাছে মার নিন্দে করতে এসো না তুমি!" এই আদেশ শুনেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তাঁদের স্বামীরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য না হয়ে আদেশ ও উপদেশ দাতা স্বামী হওয়াতে ছেলেপুলে ভিন্ন আর কারু উপরে কর্ত্তৃত্ব করতে না পেরে তাঁরা বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই রইলেন।

সাবধানী পরমসুখে গোপালের মত গোকুলে বাড়তে থাকলো। এখন তার চেহারার আরও উন্নতি হয়েছে। কালো রঙটি কচি কলাপাতার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মুখের লাবণ্য বেশ ফুটে বেরিয়েছে, চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে পড়েছে দেখে ছোট-গিন্নী মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেদিন তিনি ছেলেদের খাবার সময় সামনে বসে একথা সেকথার পরে সাবধানীর বিয়ের কথাটি পাড়লেন, সেদিন বড়বউ বড় আশ্বস্ত হয়ে তাঁব কথাগুলি শুনতে লাগলেন; অন্তরালস্থিতা মেজবউয়ের মুখখানিও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁদের বিশ্বাস, ছোটমা এমনি তো লোক মন্দ নন; কোনো দিকেই চোখ দিয়ে দেখেন না, আপন মনে আপনার ঘরটিতে থাকেন। যত অনিষ্টের গোড়া ঐ সাবধানী, ওকে বিদেয় করতে পারলেই বাড়ীর আপদ যায়। কিন্তু বড়বাবু নবীন দত্ত সাংসারিক বুদ্ধিতে একেবারেই যে নবীন, তা নইলে এমন দরকারী কথাটা তিনি কি করে হেসে উড়িয়ে দিলেন? মেয়েটা আর একটু বড় হোক না ছোটমা! বিয়ে না হয় হলো, কিন্তু এইটুকুন মেয়ে পরের ঘর করতে পারবে কি? আর তুমিই কি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

ছোট-গিন্নী তবুও বললেন, "মেয়েছেলের বাড় কলাগাছের বাড় বাবা! গেল আশ্বিনে সাবধানী এগারোয় বুঝি পা দিয়েছে, এখন থেকে চেষ্টা না দেখ্‌লে এর পরে একেবারে কাঁটার মত গলায় বিঁধে বস্‌বে যে! তুমি হচ্ছ এই গাঁয়ের মাথা, শাস্তর মেনে না চললে তোমাকেও তো লোকের কাছে খাটো হতে হবে।"

বড়বাবু হেসে বললেন, "এখন ঘরে ঘরেই মেয়ে বড় হচ্ছে, সেজন্যে তুমি ভেব না ছোটমা! ও বেচারাকে আর কিছুদিন সোয়াস্তিতে থাকতে দাও।"

ছোট-গিন্নী নীরব হয়ে গেলেন। যার বুদ্ধি নেই, তা'কে আর কি করে বোঝাবেন! দুধের বাটিটা স্বামীর পাতের সামনে রেখে তখন বড়বউ আধ-ঘোমটার ভিতর থেকে ফিস ফিস করে বললেন, " তোমার বোন এখনো ছোটটি নেই গো, দশ বছর বয়েস হ'লে কি হবে? সে বিশ বছরের মতই বুদ্ধি ধরে; এ মেয়েও যদি পরের ঘর না করতে পারে, তবে আর পারবে কে? বাবা মেয়ে তো নয়, যেন পাকা বাঁশের ঝাঁকাটি!"

দশচক্রে পড়ে বড়বাবুও ভূত হ'তে রাজী হলেন—ঘটক ডেকে সাবধানীর বিয়ের কথা বলে দিলেন। সাবধানীর আঁদর এখন আরও বেড়ে গেল। ছোট-গিন্নী মশুর ডাল বাটা, সর ময়দা মাখিয়ে মেয়েকে ফরসা করতে লেগে গেলেন, সহর থেকে সাবান ও ক্রীম পাউডারও আনালেন। বড়বউ বড় মাছখানা এখন তার পাতেই ফেলে দেন, দুধের

বাটিটা বেশ কানায় কানায় পূর্ণ করে দেন, লুচি-সন্দেশ, ফল-মূল, সবই সে এখন আশ মিটিয়ে খেতে পায়। বিয়ে হবে বলে বৌদিরাও তাকে যত্ন করছেন দেখে তার মনে হলো বিয়ে জিনিষটা নিশ্চয়ই বেশ মজার। সেও মনের আনন্দে তার প্রতীক্ষা করে রইলো। মাসের পর মাস এমনি ক'রে কাবার হতে লাগলো, ঘটক সেই যে গেল, আর তো কই এলো না। ছোট-গিন্নীর ভাবনা বড্ড বেশী বেড়ে গেল।

সেদিন সকাল বেলা বুড়ো ঝিকে বাইরে থেকে ছুটে আসতে দেখে ছোট-গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, "কি হলো লো তোর, ছাড়া গরুর মত অমন করে ছুটে বেড়াচ্ছিস কেন?"

ঝি বসে পড়েই বল্‌লে, "একটা জিনিষ দেখে এলাম ছোট-মা, আজ বড়বাবুর বৈঠকখানায় লোক আর ধরে না! কাশী থেকে কেদার-ঠাকুর ফিরে এয়েছেন। তিনি বাইরের ঘরে বসে সক্কলের হাত দেখছেন শুনে আমি ভিড় ঠেলে দোরগোড়ায় গিয়ে দেখি তিনি বড়বাবুর হাত দেখছেন। বল্‌লেন কি জান ছোট মা, "আপনার বড় বিপদ আসছে বাবু, বিষয়-সম্পত্তি সব একেবারে যাবার দশা হবে, এ সময়টা খুব সাবধানে থাকবেন।" এই না শুনে আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না, বড্ড ভয় করতে লাগলো। ধরো যদি তার কথাটা সত্যিই হয়— হেই মাগো, তবে আমরা কোথা যাব?"

ঝির কথা শুনে বধূরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন; ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "ঠাকুরটিকে বাড়ীর ভেতরে ডেকে আন্‌না ঝি, সাবধানীর হাতখানা দেখাবো; ওর বিয়ে হবে কি না কিছুই যে বুঝতে পারছি না!"

"ছোট-মার যেমন কথা, অমন মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা!" বলে ঝি বেরিয়ে গেল ও কেদার-ঠাকুরকে তখনি সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাঁকে দেখেই বধূরা ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। ছোট-গিন্নী ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে আসন হাতে করে বারান্দায় উঠে দেখলেন, সেখানে একটি যুদ্ধ বাধবার যোগাড় হচ্ছে। পটলা যাত্রার দলের ভীমসেনের মত চীৎকার করে বলছে, "আমার বল্‌টা এক্ষুণি বার করে দে সাবধানী, নইলে কত মার খেতে পারিস দেখে নেব!"

সাবধানীও জন্তু-বিশেষের মত মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিলে, "ইস্, মার অমনি পড়ে রয়েছে! জানিস আমি কে? আমায় গড় কর বল্‌ছি পটলা, আমি তোদের পিসী হই! নইলে বড়দার কাছে বলে দিয়ে মার খাওয়াবো না!"

তার পরেই যে কাণ্ড হলো, ছোট-গিন্নী ছিলেন তাই মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিলেন। তারপর আসনখানা বিছিয়ে কেদার-ঠাকুরকে দু'টি টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে সাবধানী কাঁদ্‌ছে দেখে তিনি আবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শান্ত করতে লাগলেন। এদিকে পটলা ঠাকুরের সামনে ময়লা হাতখান মেলে ধরে বল্‌লে, "যে মারটা মেরেছি, ও মেয়ের কান্না এখন থামছে না! আপনি ততক্ষণ আমার হাতটা দেখুন না ঠাকুর-মশাই! আমি কি হবো, ভাল পাশ-টাশ করতে পারব কিনা বলুন তো?"

কেদার-ঠাকুর হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা দাও দেখি। বাঃ, বেশ হাতখানি তো! রবি রেখা সুস্পষ্ট, বৃহস্পতি উচ্চস্থ—ধন, মান, বিদ্যা, যশ, আয়ু, মানুষের যা দরকার তোমার

সে সবই বেশ হবে, খোকা! শুক্র পারিজাত রেখাটিও তোমার হাতে দিব্বি রয়েছে দেখছি, তুমি খুব কর্ম্মঠ, সুখী, ভোগী হ'তে পারবে, বাবা!''

''সত্যি!'' পটলা মহানন্দে লাফিয়ে উঠলো, ও ''ওরে ভুলো, তোরা শুনে যা, ঠাকুর-মশাই আমার হাত দেখে কি বলচেন'' ব'লেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝি সাবধানীকে ধরে এনে কেদার-ঠাকুরের সামনে বসিয়ে দিলে; ছোট-গিন্নী একটা থামের আড়ালে বসে তাঁর কথা শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলেন। সাবধানীর হাতখানি দেখতে দেখতে ঠাকুর-মশায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি কিছুই বলছেন না দেখে ঝি জিজ্ঞেস্ করলে, ''আমাদের মেয়ের হাতখানা কেমন দেখলেন, বাবা-ঠাকুর?''

কেদার-ঠাকুর ধীরে ধীরে বললেন, 'বলেই যাই। মা শুনুন! এই মেয়েটি শনির ক্ষেত্রে জন্মেছে, সেজন্যে সাংসারিক বুদ্ধি এর ভালোই হবে; কিন্তু রবি রেখাটি নেই বললেই হয়, বৃহস্পতিও নীচস্থ—তাই এর জ্ঞান, সৎবুদ্ধি বা যশ-ভাগ্য বড় ভাল হবে না। পিতৃরিষ্টির জন্যে মেয়েটি তার পিতার দর্শন পায় নি; চতুর্থে প্রবল পাপগ্রহ থাকাতে মাতার মৃত্যুর কারণ হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর কাছ থেকে আপনি একটু তফাৎ হয়েই থাকবেন মা।''

সাবধানী হাতখানা ছেড়ে দিয়ে কেদার-ঠাকুর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে ছোট-গিন্নী বলে উঠলেন, ''মেয়েটার বিয়ে হবে কি না, তা তো জান্‌তে পারলুম না ঝি!''

ঠাকুর ফিরে চেয়ে বললেন, ''বিয়ে হবে বৈকি মা! এই বছরেই মেয়ের আপনার বিয়ে হয়ে যাবে, আপনি সে ভাবনা করবেন না।''

তিনি চলে গেলেন। ছোট-গিন্নী তবুও সেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দেখে ঝি বললে, ''ওঠো গো ছোট-মা, রান্না করগে যাও, বেলা হয়ে পড়েছে।''

ছোট-গিন্নীর চোখে জল টল টল করতে লাগল, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, ''ঠাকুর কি বলে গেলেন ঝি, সাবধানীই আমার মৃত্যুর কারণ হবে?''

ঝি ত্র্যস্ত হয়ে বললে, ''ও সব কথা বিশ্বেস করচো কেন? মানুষের মুখের কথা কি কখনো সত্যি হয় ছোট-মা? কেন যে এই অলক্ষুণে বামুনকে ডেকে এনেছিলুম, মিন্সে একটা কথাও ভাল বলে গেল না গা!''

৩

কেদার-ঠাকুরের কথাগুলি ক্রমে ক্রমে সবাই ভুলে গেল, কিন্তু ছোট-গিন্নী ভুলতে পারলেন না। মেয়ের বিয়ের ভাবনার চেয়ে এখন এই ভাবনাই তাঁর বেশী হয়ে দাঁড়ালো। অনেক রাতে একলাটি বসে তিনি স্তিমিত দীপালোকে একবার সাবধানীর ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে দেখেন, আবার আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবেন, ভগবান! তুমি আমায় মা বাপ দাও নাই, স্বামীসুখেও বঞ্চিত করেছ; সন্তানও কি দাও নাই প্রভু? মরে-বেঁচে কত ক'রে যাকে মানুষ করলুম, তাকেই কি আমার মৃত্যুর কারণ ক'রে পাঠিয়েছ?

"ছোট-মা, ঘুমুচ্চ না কি?" বড়বাবুর ডাক শুনে ছোট-গিন্নী বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "না, ঘুমুইনি এখনো। এত রাত্তিরে তুমিও কেন জেগে রয়েছ বাবা?"

"আর ছোট মা!" ক্লান্তস্বরে উত্তর হলো, "বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি আমি! ন' আনির সরিকদের সঙ্গে আমাদের যে মোকদ্দমা লেগে উঠলো। গাঁয়ে এমন কেউ নেই যে একটা সুপরামর্শ দেয়। তাই সা-নগরের মহেশ-ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলুম, তিনি যদি মধ্যস্থ হয়ে আপোষ করে দেন। এই তো সেখান থেকে ফিরে আসছি। সা-নগরের সরকারদের ছেলে খগেনকে দেখে আমার বড্ড পছন্দ হলো, তাই সব খোঁজ-খবর নিয়ে এলাম। ছেলেটি কুড়ি-একুশ বছরের হবে, বেশ চালাক চট্‌পটে, কোঠাবাড়ী, বাগান-পুকুর সব আছে, বাপের তেজারতি কারবার এখন সেই চালাচ্ছে। খগেন পাশ-টাশ বেশী করতে পারেনি, বাপ মরে গেল কি না, তাই বাড়ী ছেড়ে সহরে গিয়ে পড়তে পারলে না, গাঁয়ের স্কুলেই এন্ট্রেন্স অবধি পড়েছে। বিধবা মা আর দুই ভাই বোন নিয়ে তার সংসার। এই তো খবর, এখন তুমি যদি বল, তবে কথাটা তাদের কাছে পেড়ে দেখি, কি দাঁড়ায়।"

ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "যা শুনলুম, তাতে অমত হবার তো কিছু নেই। ছেলেটি লেখাপড়ায় খাটো, এই একটা কথা। কিন্তু বি-এ, এম-এ পাশ ছেলে এই কালো মেয়ে বিয়ে করবে কেন বাবা? ওরা যদি রাজী হয়, তবে তুমি এই খানেই কথা ঠিক ক'রে ফেল। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি মোকদ্দমা করতে যাচ্ছ কেন? ন' আনির ছেলেরা তো আমাদের পর নয়, ভাই-ভাইয়ের গোল মিটাতে কতক্ষণ বা লাগবে! এত কাল এখানে এসেছি, এমন অলক্ষুণে কথা আর তো শুনিনি!"

বড়বাবু ম্লান হেসে বললেন, "বিপদ যখন আসে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, ছোট-মা! ন'আনির বাবুরা আমাদের ভাল ভাল তালুক, জমি-জমা সমস্তই নিতে চায়, বলে এ-সব তো আমাদের। আমরা নাকি তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছি, তারা আদালতে তাই প্রমাণ করবে। বিনা চেষ্টায় সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মোকদ্দমা করা কি ভাল নয়? লড়েই দেখা যাক না কি হয়।"

বড়বাবু চলে গেলেও ছোট-গিন্নী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। একি ভীষণ সংবাদ— মোকদ্দমা! সেদিন সেই ঠাকুরটি যা জানিয়ে গেলেন, সে তো সুরু হয়েই গেল, এর পরে আরও যে কি হবে, জানি না!

কয়েক দিন পরই খগেনের কাকা দু'জন ভদ্রলোক সঙ্গে ক'রে সাবধানীকে দেখ্‌তে এলেন, বড়বাবু শুষ্কমুখে হাসি এনে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। খবর পেয়ে বধূরা খাবার করতে আর ছোট-গিন্নী সাবধানীকে সাজাতে বসে গেলেন। অতিথিদের জলযোগ হ'লে পরে সাবধানী পান দিতে গেল। তার হাত থেকে পান নিয়ে বরের কাকা বললেন, "এইটি বুঝি আপনার বোন, নবীনবাবু? বেশ মেয়েটি। মা, তোমার হাতখানা দাও তো দেখি!"

আবার হাত দেখা! কেদার-ঠাকুরের কথা মনে পড়ে সাবধানীর মুখটি শুকিয়ে গেল, ইনি আবার কি বলবেন, কে জানে! কিন্তু তিনি তার আশঙ্কা আর বাড়ালেন না, হাতটি একটু মেলে ধরেই হেসে বললেন, "বেশ হাতটি মায়ের। এমন লক্ষ্মী ঘরে নেওয়া ত

সৌভাগ্যের বিষয়, নবীন বাবু! আমাদের এ মেয়ে বেশ পছন্দ হয়েছে। এখন আপনি কবে খগেনকে পাকা দেখতে যাবেন, সেইটে শুনেই উঠ্‌তে চাই।"

বড়বাবু বললেন, "সাবধানীর হাতের লেখা দেখবেন না? শুনলুম, লেখাপড়াও না কি বেশ শিখেছে।"

একথা শুনে সাবধানী আবার ভয় পেল; তার সেই আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা সে কাউকে দেখাতে চাইত না। বৃদ্ধটি যখন বললেন, "মেয়েদের হাতের লেখা, ওসব আমরা দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, মেয়েটির হাতে লক্ষ্মীর কৃপা আছে কি না। একখানা চিঠি লিখতে পারলেই বা কি, না পারলেই বা কি।' তখন সাবধানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁদের প্রণাম করে উঠে গেল। তাঁরা উঠবার উপক্রম করছেন দেখে বড়বাবু দেনা-পাওনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তা'তেও খগেনের কাকা হেসে বললেন, "ওসব দরদস্তুর আমরা মহৎ লোকের সঙ্গে করি না। আপনাদের ব'লে হাত ঝাড়লে পর্ব্বত! এমন ঘরের মেয়ে ঘরে আনাই আমরা মহালাভ মনে করি, আর কিছু চাই না নবীনবাবু!"

ভদ্রলোকটির অমায়িক ব্যবহারে বড়বাবু খুব সন্তুষ্ট হ'লেন ও অবিলম্বে সা-নগরে গিয়ে পাত্র আশীর্ব্বাদ ক'রে এলেন। সাবধানীর বিয়ে ঠিক হ্‌তেই আত্মীয়েরা এসে আমোদ করতে লাগলেন। মোকদ্দমার কথা মনে না করে বড়বাবুও এ-বিয়েতে বেশ খরচ করতে লাগলেন, বরের জন্য হীরের আংটী প্রভৃতি দামী দামী দানের জিনিষ সহর থেকে আনালেন। কনে-গয়নার কথায় তিনি বললেন, "সাবধানীর গয়না আর গড়াতে দিলুম না, ছোট মা! তোমার গয়না থেকেই ওর গা-সাজানো সব বার করে দাও।"

ছোট-গিন্নী বললেন, "আমি গিনি দিচ্ছি, তুমি তাই দিয়ে কনে-গয়না গড়াতে দাও। আমার গয়না তো সাবধানীর গায়ে এখন লাগবে না বাবা!" বড়বধূর বড় বড় চোখের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে বড় বাবু তাতেই রাজী হলেন। এতই যখন দিচ্চেন, স্যাকরার মজুরীর কয়েক শো টাকা, সে কি আর দিতে পারবেন না!'

বিয়ের দিনের বিকেল বেলা খগেন সদলবলে এল ও গোধূলিলগ্নে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেল। শুভদিনে নূতন কাপড় গয়না পরে, মনটিও নূতন ভাবে ভরে সাবধানী নূতন স্থানে বাস করতে চললো। ঝিও তার সঙ্গে যাবে বলে তসরের সাড়ী আর তাগা দু'গাছা পরে তৈরী হয়ে রইলো। যাবার বেলা মা ও ভাই বোনরা কেঁদে মেয়েকে বিদায় দিলেন, বধূরাও কাজ ফেলে ছুটে এসে স্নেহ-সম্ভাষণ করলেন। সেখানেও শ্বশ্রূমাতা এই বড় লোকের মেয়েটিকে বড় আদরেই গ্রহণ করলেন। যত্ন, আদর, ভালবাসা, সাবধানীকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে রইলো। বৌভাতের পর সাবধানী যখন মায়ের কাছে ফিরে এল তার মুখের হাসিটি দেখে ছোট-গিন্নী কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেললেন; বুড়োঝি তার শ্বশুরবাড়ীর এত সুখ্যাতি করলে যে, শুনে তিনি ভাবলেন, আমার কাজটি তো বেশ ভালোই হয়ে গেল—এখন আর কিছুরই জন্য আমি ভাবি না!

এদিকে বড়বাবু চোখে আঁধার দেখতে লাগলেন—সাবধানীর বিয়েতে যা ভেবেছিলেন

তাঁর ঢের বেশী খরচ হয়ে গেল, মোকদ্দমাতেও জলের মত অর্থ ব্যয় হতে লাগলো। কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই যে চললো, তিনি তা রোধ করবার কোনো উপায়ই ভেবে পেলেন না।

৪

পরের বছর ষষ্ঠী বাটার নেমন্তন্নে খগেন যখন এল, দত্তদের অবস্থা তখন বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে। মোকদ্দমাটি জেলা কোর্ট হ'তে হাইকোর্টে নেওয়া হয়েছে, বড়বাবু বড় বেশী ভাবনায় পড়ে গেছেন—শূন্য হাতবাক্সটির পাশে ভীষণ গম্ভীর মুখে বসে তিনি সংসার শূন্যময় দেখছেন। খগেন যাবর বেলা সাবধানীকে নিয়ে যেতে চাইলে। ছোটগিন্নী খুসী মনেই মেয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তিনি আপনার টাকা খরচ ক'রে জামাইটিকে ষষ্ঠীবাটা দিয়েছিলেন, আরও কিছু খরচ ক'রে মেয়ের সঙ্গে সব তত্ত্বের জিনিষ দিয়ে দিলেন। দিন দিন সংসারের অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, সাবধানীকে যে আর এখানে আনতে পারবেন, সে আশাও নেই। যাবার বেলা মেয়েকে বার বার ক'রে চিঠি লিখতে বলে মা চোখের জল মুছে ভাবলেন, ভাগ্যিস্ সাবধানীর বিয়েটা হয়েছিল, নইলে এখন যে কি হতো!

হাইকোর্টে মোকদ্দমা যাবার ছয় মাস পরেই বড়বাবু পাগলের মত হয়ে পড়লেন। খরচ কমাও, খরচ কমাও ব'লে তিনি বড়বউকে ব্যস্ত ক'রে তুললেন, 'আর যে চলে না গো, হাট-বাজার, খাওয়া দাওয়া, সব বন্ধ করে দাও।''

বড়বউ বললেন, ''পেট যখন রয়েছে, তার পাটও থাকবেই। আমি তো চেষ্টা করছি, কিন্তু এত বড় সংসারের কোন্ খরচটা যে কমানো যেতে পারে, আমায় তুমি দেখিয়ে দাও।''

বেগতিক দেখে বড়বাবু নিজেই সংসারের ভার নিলেন ও দিনকয়েক বাদেই বুঝতে পারলেন, এ-সংসার বড় বিষম স্থান। তাঁর দুরবস্থা কেউ বোঝে না, আপনার পাওনা-গণ্ডা কেউ ছাড়তে চায় না। তখন বুড়ো ঝি ও গুরুর চাকর নিতাই বাদে আর সব চাকরদের জবাব দিলেন, অতিথি অভ্যাগতের আগমন, সাহায্যদান, সব বন্ধ ক'রে দিলেন। নিন্দায় দেশ ভরে গেল। চাকরদের চলে যেতে দেখে বধূরা কোনো আপত্তি করলেন না, মুখটি আঁধার ক'রে, কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে নিয়ে তাঁরা ঝাটপাট, বাসন-মাজা সব কাজই করতে লাগলেন। এ-সংসারে সুখ তো তাঁদের ছিলই না, এখন স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও যেতে দেখে বড়বধূ স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ অর্থাৎ ভাল মুখে কথা বলাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু বড়বাবু অবিচল। সমুদ্রে পড়ে তিনি বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরেছিলেন, এ সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা গ্রাহ্যও করলেন না—কি ক'রে মোকদ্দমাতে জয়ী হ'তে পারবেন, 'প্রাণপণে শুধু সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

বছর তিন গেলে পরে বড়বাবুর ব্যারিষ্টার লিখ্লেন, ''এ-বছরেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, অবস্থা এখনই খুব সঙ্গীন। এখন যিনি মোকদ্দমাটি ঠিক ভাবে চালাবেন, তিনিই

জয়ী হতে পারবেন।'' চিঠিখানা পড়ে কপর্দ্দকহীন বড়বাবু ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন, ''আর এ-বছরটা তুমিই তবে চালিয়ে দাও, ভগবান!'' খাজনার টাকা যা-কিছু আদায় হয়েছিল, সমস্তই মোকদ্দমার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শূন্য বাক্সটি বন্ধ ক'রে বসলেন।

সংসার অচল হয়ে উঠলো। সরকারকে বাজারের তাড়া দিয়ে যখন ফল হলো না, তখন বড়বধূ তেল ঘি মাছ তরকারির ফর্দ্দখানা বড়বাবুর কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানা হাতে করে বড়বাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন। তাঁকে দেখেই মেজবধূ আড়ালে সরে গেলেন, বড়বধূ গম্ভীরমুখে বসে ডালে কাটি দিতে লাগলেন। রান্নঘরের সামনে এসে বড়বাবু বললেন, ''তেল-ঘিটি যে সেদিন সব এনে দিয়েছে, এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেছে? আজ আর বাজার করবার দরকার নেই, ভাতে ভাত রেঁধে নিয়ে সবাই মিলে হবিষ্যি কর!''

এই-কথা কানে যেতেই বড়বধূ মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি ধরে উঠলেন। অন্য অস্ত্রের অভাবে বাক্যবাণই বর্ষণ করতে লাগলেন, ''কি, তুমি আমায় হবিষ্যি করতে বল্‌চ? আমার শত্রু যে, সে হবিষ্যি করুক! সোনাদানা কখনো তো কিছুই দিতে দেখলুম না, রাঁধবার একটু তেল আর দুটো মাছ তরকারি তাও দিতে পারবে না তুমি?''

সুখ-দুঃখের সঙ্গিনীর সু-মুখের এই সুন্দর কথাগুলি শুনেই বড়বাবুর মুখখানা শুকিয়ে গেল, তিনি এ-কথার আর উত্তর দিলেন না। তখন মেজবধূ গলা অবধি ঘোমটা দিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লেন ও দিদির হাতটি ধরে টেনে আড়ালে নিয়ে বললেন, ''দিদি, বড়ঠাকুরের চোখমুখ দেখেছ, ভেবে ভেবে কি হয়ে গেছে? ওঁকে তুমি আর কিছু বলতে পাবে না ভাই, এই আমার মাথার দিব্বি রইল।''

বড়বধূ কেঁদে বললেন, 'আজ থেকে তুই এই পোড়া সংসারের ভার নে মেজবউ, নিত্যকারের এই 'নেই নেই' আমি যে আর বরদাস্ত করতে পারি না!'' ধনী পিতার আদরিণী কন্যা মেজবধূর গহনার বাক্সটা কতকগুলো নোটের ভারে ভারী হয়ে উঠেছিল। সে আপাততঃ সেই বাক্সটার ভার লাঘব করাই মনস্থ করলে ও মৃদু হেসে দিদি ও বড়ঠাকুরকে এই সংসারের ভার থেকে মুক্তি দিয়ে দিলে।

ছোট-গিন্নী এই-সব দেখে বুঝলেন, তাঁর একবেলার আহারও আর এ-সংসার থেকে মিলবে না। এরা হয়তো দিতে চাইবে, কিন্তু মেজেবধূর বাপের টাকার জিনিষ তিনি কি ক'রে মুখে তুলবেন? কাজেই তিনিও সেদিন হ'তে আপনার দরকারী জিনিষ আপনিই আনাতে লাগলেন। এতেও কিন্তু নিস্তার পেলেন না—একদিন দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ঘরে এসে তিনি যেমন হরতুকীর কৌটাতে হাত দিয়েছেন, অমনি শুনতে পেলেন, ''ছোট-মা!''

মুখশুদ্ধিটুকু মুখে ফেলে দিয়ে ছোট-গিন্নী বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন, বড়বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মেজবাবু অস্থিরভাবে পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। সেখানে আর কেউ না থাকলেও পাশের ঘরটিতে অনেকের অস্তিত্ব অনুভব ক'রে ছোট-গিন্নী একটু অবাক হয়ে বললেন, ''আমায় ডাকছ নাকি, বাবা?''

"হ্যাঁ: বড় মুস্কিলে পড়েই আজ তোমার কাছে এসেছি, ছোট-মা! কলকাতা থেকে শচীন আরও হাজার-পাঁচেক টাকা পাঠাতে লিখেছে, আমার হাতে এখন আর একটি পয়সাও নেই!"

ছোট-গিন্নীকে নীরব দেখে বড়বাবু আবার বল্‌লেন, "এত দিন অনেক কষ্ট করেছি তবুও ধার করিনি। এখন আমায় এত টাকা কেউ ধারও দেবে না। বড়বউয়ের তো বেশী গয়না নেই—তোমার গয়নাগুলো যদি মাসকতকের জন্যে দাও, তবে আমাদের বড়ই উপকার হয়। কোথাও বাঁধা রেখে টাকাটা নিয়ে আমি নিজেই কলকাতায় গিয়ে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারি। শুনানীর সময়ও হয়ে এসেছে। এ- মোকদ্দমায় আমাদেরই জিত হবে, এতে তুমি একটুও সন্দেহ করো না। ছ'মাসের ভেতরেই তোমার গয়নাগুলো ছাড়িয়ে এনে দেব, ছোট-মা!"

এমন কাতর, ভিক্ষুকের মত এমন দীননয়নে বড়বাবু বিমাতার মুখপানে চেয়ে রইলেন যে, দেখলে পরে দুঃখ হয়। ছোট-গিন্নী ধীরে ধীরে বললেন, "আমায় বড্ড কঠিন সমস্যায় ফেলেছ, বাবা! আজকের দিনটে আমায় ভেবে দেখ্‌তে দাও, কাল যা হয় তোমায় জানাব।"

বড়বাবু অনুনয় ক'রে বল্‌লেন, "ভেবে দেখবার আর সময় নেই ছোট-মা! বুঝ্‌ছো তো এই মকদ্দমার উপরেই আমাদের মরা বাঁচা নির্ভর করছে। যেমন করেই হোক, এর খরচ চালাতে হবে, এতে জয়ী হ'তেই যে হবে—তা নইলে আমাদের আর কিছুই থাকবে না।"

"বাবা, সবই বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু মনে ভরসা পাচ্ছি না। গয়না আর আছেই বা ক'খানা? যেদিন থেকে মেজ-বৌয়ের হাতে সংসার গেছে, আমার খোরাকীও যে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এই গয়না বাঁধা দিয়েই যে আপনার খরচ চালাচ্ছি। তাও যদি তোমরা নিতে চাও তো নাও—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। কত কালের ভেতরে তোমাদের একটিবার দেখতেও পাই নি, একদিনও বল্‌তে শুনিনি, ছোট-মা কি করছ, বেঁচে আছ কি মরে গেছ। আজ দরকার পড়েছে, তাই তো দেখা দিতে এসেছ বাবা, দরকার ফুরোলেই আবার তেমনিই তো করবে!" বলেই ছোট-গিন্নী ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।

তখন অসহিষ্ণু রবীন দত্ত একবার জ্বলন্ত চক্ষে ছোট-গিন্নীর দিকে তাকালেন, তার পরে বড়বাবুর অতি ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কেন তুমি ওঁর কাছে দুঃখ জানাতে এসেছিলে দাদা? উনি ছোট-মা, আমাদের মা নন! মিছে অপমান হয়ে গেলে! মেজবৌয়েরও তো অনেকগুলো হীরেমুক্তোর গয়না আছে, আমার ঘড়ি চেন কি হীরের আংটীগুলো নেহাৎ কম দামের হবে না। এ-সব বাঁধা দিলে যদি না হয়, বিক্রী করলে পাঁচ সাত হাজার টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুমি তাই নিয়ে শীগ্‌গির কলকাতা চলে যাও, ভগবান দয়া করলে ওতেই কার্য্যসিদ্ধি হবে।"

এর পরে বড়বধূ আর শ্রোতা হয়ে থাকতে পারলেন না, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মহোৎসাহে স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন,—"আমি ওঁকে এ-কথা অনেকবার বলেছি ঠাকুর-পো! সৎমা কক্ষণো মা হতে পারে না! তা উনি কি কারু কথা

কাণে তোলেন? তা হ'লে আজ ওঁর এ দুর্দ্দশা হতো না! সাবধানীর বের খরচা দেওয়া উচিত ছোট-মার, উনি তখন কারে পড়েছিলেন, দিতেনও। আমি ওঁকে সেকথা কতবার যে বল্‌লুম, মোকদ্দমা সুরু হয়ে গেছে, এখন এই বাজে খরচাটা করো না! উনি কিছুতেই ছোট-মাকে এই সোজা কথাটা বল্‌তে পারলেন না। বলি, এখন কেমন হলো? ঐ যে কথায় বলে না—বুদ্ধিমান দেখেই শেখে, বোকা সে যে ঠেকে শেখে, বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখ্‌তে হয় ঠেকে—এর মত সত্যি কথা আর নেই!"

৫

বধূর মুখের এই মধুর কথাগুলি শুনেও ছোট-গিন্নী চুপ করে রইলেন। তাঁর এই সহিষ্ণুতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। বাস্তবিক, তিনি এখন খোলোস ছাড়া সাপের মতই নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

ছোট-গিন্নীর ঘরের মেজেয় আঁচল বিছিয়ে ঝি শুয়ে পড়লো ও তাঁকে চিন্তামগ্না দেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "বসে রইলে কেন ছোট-মা, শুয়ে পড় না। আজকালকার বৌরা কি আর শাশুড়ীকে মানে? ঘরে ঘরেই এই-সব কাণ্ড দেখতে পাই। তোমার তো আরও সৎসতাতোর ঘর!" তিনি তবুও বসে রইলেন দেখে ঝি মনের দুঃখে নাক ডাকাতে সুরু করলো।

ঝির ঘুম ভাঙলে পরে ছোট-গিন্নী তা'কে বল্‌লেন, "তুই এখুনি নিতাই আর তার মাকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি এক জায়গায় যাব।" ঝি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আবার কোথা যাবে ছোট-মা?" ছোট-গিন্নী আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "সাবধানীর বাড়ী যাব রে, নিতাইকে নৌকা নিয়ে আস্‌তে বল্; আমি গেলে পরে তুই এই ঘরেই বসে থাকিস্ আর কোথাও যেন যাসনি, চারদিকে শত্তুর!"

ঝি চেঁচিয়ে উঠলো, "একি বল্‌চ গা ছোট-মা? আই মাই, তুমি কেন সাবধানীর বাড়ীতে থাকতে যাবে? লোকে বল্‌বে কি তা হলে!"

ছোট-গিন্নী ধমকে বললেন, "ষাঁড়ের মত গলা করে চেঁচাস্ নি ঝি, চুপ কর। সাবধানীর বাড়ী আমি থাক্‌তে যাচ্ছি না কি? তা'কে অনেক দিন দেখিনি, তাই দেখে আস্‌ব ভাব্‌ছি।"

"এইবারে বুঝতে পেরেছি। "ও সাহস করো না গো ছোট-মা। যাদের জান না, তাদের অত বিশ্বেস করতে যেও না। ঘরের জিনিষ ঘরেই রেখে দাও।"

"থাম্, তোকে আর আমায় বুদ্ধি দিতে হবে না। নিতাইকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়, সে যেন তার মাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমায় আবার সন্ধ্যের ভেতরেই আস্‌তে হবে তো!"

বুড়ী অগত্যা নিতাইয়ের মাকে ডেকে নিয়ে এল। নিতাই খালের ঘাটে নৌকা এনেছে শুনে ছোট-গিন্নী সিন্ধুক খুলে গয়নার বাক্সটি বার করলেন ও গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে সেটা লুকিয়ে নিয়ে চললেন। তাই দেখে ঝি একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "তারা, তারা! কাজটা ভাল করলে না গো, ছোট-মা!"

নিতাইয়ের নৌকা যখন সা-নগরে খালের ধারে ভিড়লো, তখন সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে। ছোট-গিন্নী নীরবে বসে ছিলেন, এবারে বললেন, "জিজ্ঞেস ক'রে করে আমার জামাইবাড়ীতে যা তো নিতাইয়ের মা, সাবধানী আর খগেনকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি এখান থেকেই তাদের দেখে যাব, বাড়ীতে আর উঠবো না।"

খবর পেয়েই সাবধানী ছুটে এসে নৌকায় উঠ্লো। "মা, তুমি এসেছ? কত কাল পরে তুমি আমায় মনে করলে মা!" বলে সাবধানী তাঁকে প্রণাম করলো। ছোট-গিন্নী বল্লেন, "ভাল আছিস তো সাবধানী? এবার অনেক দিন পরে তোকে দেখ্তে পেলুম।"

"ভাল কই, আছি একরকম; এতদিন আমায় নিতে লোক পাঠাও নি কেন মা? ওরা কত বলেন, মার একটি মেয়ে ঘরে এনেও কুটুমের সুখ হলো নাকো!"

ছোট-গিন্নী সাবধানীকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন, সে এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, যৌবন তার সারা অঙ্গে কোমলতা মাখিয়ে দিয়েছে; তার পূরন্ত মুখটিতে চুম্বন ক'রে তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "কোথায় নেব মা তোমায়? সেখানকার এখন যা অবস্থা হয়েছে! তাই তো তত্ত্বটাও আর করতে পারিনি। ওরা ভাববে আমরা পাই না খেতে, উনি মেয়েকে তত্ত্ব করছেন! ষষ্ঠী কি পূজোয় খগেনকে চুপি চুপি টাকা পাঠিয়ে দিইছি, তোকে রাঙা সাড়ী আর সন্দেশ কিনে দিতে। সে তা দিয়েছে তো, সাবধানী?"

কন্যা সলজ্জভাবে বলিল, " সে তো দিয়েইছে। তাতে এরা খুসী হয় নি মা, আরও অনেক বেশী পাবে বলে আশা করেছিল। আচ্ছা মা, এমন হলো কেন?"

"সে আমি কি ক'রে জান্‌ব? আজ ক' বছর ধরে একটা কি মোকদ্দমা করছে বলে তো শুন্‌তে পাই। এর পরে যে আরও কি হবে, জানিনে মা। শোন্ সাবধানী, বড্ড বিপদে পড়েই আমি তোর কাছে এসেছি; আজ বড় কর্ত্তা আমার গহনাগুলো বাঁধা দেবে বলে চাইতে এসেছিল, আমি দিইনি। বল্‌লে যদিও, ছ'মাস পরেই ছাড়িয়ে এনে দেব, তা নেবার বেলা সবাই অমন বলে থাকে—ও ছাঁদা কথায় বিশ্বেস ক'রে সর্ব্বস্ব খুইয়ে শেষে কি ভিক্ষের ঝুলি সার করব? তাই আমার এই বাক্সটা তোর কাছে রাখতে এনেছি, ওখানে রাখা আর নিরাপদ নয়! এটাকে খুব লুকিয়ে রাখতে পারবি তো? তোর পোর্টম্যাণ্টোব একেবারে তলায় এই বাক্সটি রেখে তার ওপরে কাপড়চোপড় রাখ্‌বি, তা হলে কেউ টের পাবে না," বলে ছোট-গিন্নী চাদরের ভিতর থেকে বাক্সটি বার করতে যাচ্ছিলেন, খগেনকে আস্‌তে দেখেই ফের ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

খগেন তাঁকে প্রণাম ক'রে সাবধানীকে বল্‌লে, "মাকে এখনো এখানে বসিয়ে রেখেছ? মা, উঠে আসুন তো! চলুন, আমাদের বাড়ী একটু পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন।'

ছোট-গিন্নী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "নৌকো থেকে আর উঠ্‌ব না বাবা! অনেক দিন তোমাদের দেখিনি তাই একটু দেখে গেলুম, বাড়ীতে আজ আর যাব না।"

"সে কি! এলেন যদি, মার সঙ্গে কি দেখাটাও করবেন না?"

"না বাবা, রাত হয়ে এল, বাড়ী যাই। আর এক দিন তখন বেলাবেলি এসে বেয়ানের

সঙ্গে গল্প ক'রে যাব, আজ আর আমায় সে অনুরোধ করো না! ওদিক পানে যদি যাও, আমার সঙ্গে একটু দেখা কোরো বাপ! তোমরাই আমার সব, তোমরা যদি খোঁজ খবর না নাও, তবে আর কে নেবে?''

খগেন মাথাটি নীচু ক'রে বল্‌লে, ''আমি ওদিকে বড় যাই না, বাড়ীতেই আমার কাজ। তা বল্‌ছেন যখন, মাঝে মাঝে চরণ দর্শন ক'রে আসব।'' ছোট-গিন্নী হাসি মুখে তার পানে চেয়ে রইলেন। তাঁকে নীরব দেখে খগেন, ''আচ্ছা, আমি তবে আসি মা!'' বলে প্রণাম ক'রে নৌকা থেকে উঠে গেল।

তার পদশব্দ মন্দীভূত হ'লে পরে ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, ''আমিও যাই, রাত হয়ে গেল। এই বাক্সটি খুব লুকিয়ে নিয়ে যা সাবধানী! তোর তো খুব বুদ্ধি, দেখিস্‌ মা, এর কথা কাউকে জানিয়ে যেন নির্ব্বুদ্ধির কাজ করিস নি!''

সাবধানী হেসে বল্‌লে, 'না না, সে ভয় তুমি কোরো না। আমি তোমার বাক্সটি এমনি ক'রে লুকিয়ে রেখে দেব, কেউ টের পাবে না! এখন আমায় তুমি কবে দত্তপুকুরে নিয়ে যাবে, তাই বলো তো মা?''

ছোট-গিন্নী কেঁদে বললেন, ''তোকে কি আর সেখানে নিয়ে যেতে পারব সাবধানী? ভগবান কি সেদিন আর দেবেন? দেখি, মোকদ্দমার কি হয়। আমি তো আবার এটা নিয়ে যেতে আসব, তখন তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। দু'বছর হতে গেল তুই এখানে এসেছিস, না সাবধানী?''

সাবধানী চোখ দু'টিকে যথাসাধ্য বড় করে বল্‌লে, ''দু'বছর কি বল্‌ছ, তার চেয়েও ঢের বেশী! এখন আমায় নিয়ে যেতে পারবে না তো, কাজেই তাই-ই সই! উঠি আমি তবে, মাগো! তোমারও রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাকেও এর পরে হয় তো বকুনি খেতে হবে।''

কন্যার সঙ্গে ছোট-গিন্নীও পারে উঠে এলেন। অদূরে সাবধানীদের বাড়ীখানি অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তিনি একবার সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে সাবধানী উঠে দাঁড়াতেই বাক্সটি তার হাতে দিয়ে ছোট-গিন্নী আকুলস্বরে বল্‌লেন, ''এটাকে খুব সাবধান করে রাখিস, সাবধানী! আমার সর্ব্বস্ব আজ তোর কাছে রেখে গেলুম; একথা খগেন কি আর কাউকে জান্‌তে দিবিনি, আমার মাথা খাস! ওবাড়ী থেকে বড়কর্ত্তা কি আর কেউ যদি আসে, তাদেরও কিচ্ছু বল্‌বি নি বুঝলি?''

'ইস, তা আমি বললে তো! তোমার কিছু ভয় নেই মা, বাক্সটি তোমার কাছে যেমন ছিল, এখানেও তাই থাকবে,'' বলে সাবধানী আঁচল চাপা দিয়ে বাক্সটি লুকিয়ে নিয়ে চললো। সে বাড়ী ঢুকলে পরে ছোট-গিন্নী নৌকায় উঠে এলেন, নিতাইও অমনি নৌকা খুলে দিলে।

ঘরের দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে সাবধানী তার বড় বাক্সের কাপড় বার করছিল। একটি লোক যে ঘরে ঢুকলো তা সে জান্‌তেও পারে নি। কার একখানা হাত পিঠে পড়াতেই সে চমকে চেয়ে দেখে খগেন। তাকে দেখেই সাবধানী তাড়াতাড়ি সেই বাক্সের দিকে পিছন ফিরে বস্‌লো। তার উপরে সে কাপড় চাপা দিয়েছিল, তবু ভাল ঢাকা পড়ে নি। খগেনের

দৃষ্টি সেই উজ্জ্বল, মসৃণ, কালো রঙের বাক্সটির যে একটু খানি কোণ বেরিয়েছিল, তার পরেই স্থির হয়ে রইল। কিন্তু তার কথা জিজ্ঞেস না করে সে একটু হেসে বল্‌লে, ''এমন সময় বাক্স খুলে কাপড়ের দোকান সাজিয়ে বসেছ কেন গো! যখুনি বাড়ীর ভিতরে আসি, তোমায় একটা কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেই দেখতে পাই!''

''কাপড়গুলো বড্ড এলোমেলো হয়েছিল, তাই একটু গুছিয়ে রাখ্‌ছি,'' বলে সাবধানী আরও কাপড় ফেলে বাক্সের কোণটিও ঢাকা দিলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! স্তূপাকার কাপড়ের নীচে থেকে গহনার বাক্সটিবার করেই খগেন বলে উঠলো, ''বাঃ, ভারি সুন্দর বাক্সটিতো! এ-বাক্সটি কার সাবধানী?''

খগেন ছিল উপকথার মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের মত— দেখ্‌তে সে ভারি শান্ত, কিন্তু তার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিটা খাতকদের আর সাবধানীর কাছে মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়তো। সাবধানী তার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেত। দত্তপুকুরের বাড়ীতে, ভুলো পটলা বা বৌদিদিদের সামনে সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, এখানে এসে তা একদম লোপ পেয়ে গেছে। খগেনের দু'দিনের শাসনেই সেই বীর বালিকাটি এখন ভিজে বেড়ালে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তা'কে নিরুত্তর দেখে খগেন বললে, '' তোমায় মা বুঝি এই বাক্সটি তোমায় দিয়ে গেছেন? তুমি যে কি করছ, এমন জায়গায় কি এই বাক্স রাখে? এখান থেকে চুরি হয়ে যেতে পারে, ও একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক বইতো নয়! দাও, আমি এই সিন্দুকে রেখে দিই, কেমন?''

খগেন বাক্সটি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সাবধানী সভয়ে বললে, ''মা এ-বাক্সটি আমায় একেবারে দিয়ে যান নি—''

''তোমায় রাখতে দিয়েছেন তো? তিনি যখন চাইবেন, তখন সিন্দুক থেকে বার ক'রে দিলেই হবে।'' ব'লে খগেন বাক্সটি হাতে ক'রে সে ঘর থেকে চলে গেল।

৬

সে হপ্তায় ছোট-গিন্নী সাবধানীর চিঠি পেলেন। সে লিখেছে, ''মা, তোমার বাক্সটি আমি বেশ ভালো ক'রে রেখেছি, তার জন্যে তুমি ভেব না। বড়দার মোকদ্দমার কি হলো আমায় জানিও।''

চিঠিখানা পেয়ে ছোট-গিন্নী নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। দিন যেমন যাচ্ছিল, যেতে লাগলো। বিশেষ দরকার না হ'লে তিনি আর বউদের সঙ্গে কথা বলেন না, বাবুরা বাড়ীর ভিতরে এলে তাদের সঙ্গে দেখা করেন না, আপনার মনে গুম হয়ে থাকেন। শুধু তিনি ছাড়া বাড়ীর সবাই চিন্তাকুল, বিষণ্ণ। বিষাদের প্রতিমূর্ত্তির মত বধূরা ঘুরে ফিরে বেড়ান, তাঁদের ছেলেরাও এখন মন খুলে হাসি খেলা করে না। এমনি ক'রে ছটি মাস কেটে গেল।

একদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে ছোট-গিন্নী খুব সোরগোল শুনতে পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দেখলেন, একখানা হলুদ খাম হাতে ক'রে বড়বাবু উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে ঘিরে পাড়ার অনেক লোক আনন্দকোলাহল করছে বধুরাও হাসিমুখে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন। ছোট-গিন্নী কি হয়েছে ব'লে এগিয়ে আসতেই

বড়বাবু তাঁর সামনে এসে বললেন, "মোকদ্দমায় আমাদেরই জিত হয়েছে ছোট-মা! কলকাতা থেকে এই মাত্র টেলিগ্রাম এসেছে, মায় খরচাসুদ্ধ ডিক্রী পাওয়া গেছে। যাক্ সম্পত্তি তো রক্ষে হয়েছে, আর ভাবনা নেই।"

মেঘ কেটে যে রোদ উঠ্‌লো, ছোট-গিন্নীর মুখেও তা ছড়িয়ে পড়লো—" মোকদ্দমায় জিত হয়েছে?" এই কথাটির পুনরুক্তি করেই তিনি হেসে বললেন, "তুমি জিতবে বই কি বাবা! তোমার ধর্ম্মের শরীর, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষে করেছেন।"

ধীরে ধীরে বড়বাবু বারান্দার 'পরে বসে পড়লেন। বিপদ চলে গেছে—কিন্তু সে যে দাগ কেটে দিয়ে গেছে, তা বুঝি আর যাবার নয়। এই ক'টা বছরের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অপমানের স্মৃতিগুলি সব এক সঙ্গে মনে পড়ে বড়বাবুকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লো। তাঁর মূর্চ্ছিতের মত অবস্থা দেখে ছোট-গিন্নী তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জল এনে মাথায় চাপড়ে দিলেন, বড়বউ ছুটে এসে হাওয়া করতে লাগলেন। আনন্দধ্বনি থেমে গেল, সবাই অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইলো। একটু সুস্থ হয়ে বড়বাবু বিমাতার পানে চেয়ে বললেন, "একটা বছর আমার বড় কষ্টে গেছে, ছোট-মা!"

ছোট-গিন্নী ধীরে ধীরে বললেন, "জানি বাবা সব। বড় কষ্টই সহ্য করেছ তুমি—কোনোখান থেকে সান্ত্বনা বা সাহায্য কিছুই তো পাওনি! এ শুধু ভগবানই দিতে পারেন, মানুষ তা দিতেও যে পারে না! তিনি যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি! ওঠো, হরির লুট দাও, আমি যাই স্নান ক'রে সত্যনারাণ পূজোর যোগাড় করে দিই গে।"

সন্ধ্যা হ'তেই মহাসমারোহে হরির লুট, সত্যনারায়ণ পূজো হ'তে লাগলো। আজ কত কথা, কত হাসি, কত গান—কত লোক এসে কত রূপে বড়বাবুকে অভিনন্দিত করছে! বিপদের দিনে যারা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, আজ তারা ফিরে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে! পূজো শেষে অনেক রাত্রে ঘরে এসে ছোট-গিন্নী দেখলেন, বড়বধূ তাঁর খাবার নিয়ে বসে রয়েছেন। তিনি যেতেই হেসে বললেন, "তোমার ছেলে এই-সব পাঠিয়ে দিলেন ছোট-মা! আজ থেকে আবার তোমার সব খরচই সংসার থেকে দেওয়া হবে; এতদিন দিতে পারেন নি বলে উনি মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন।"

ছোট-গিন্নীর খাওয়া হ'লে বধূ আবার বললেন, "কাল সাবধানী আর ঠাকুরঝিদের আনতে পাঠাই ছোট-মা, তাদের অনেক দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি।

তিনি উত্তর দিলেন, "বড়মেয়েকে আনতে পাঠাও। আর দিন-কতক যাক, সাবধানীকে আমি তখন আপনি গিয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বধূ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তুমি যাবে মেয়ে আনতে ছোট-মা!"

"হ্যাঁ, আমাকেও একবারটি সেখানে যেতে হবে।"

নিতাইয়ের মার কাছে মা এসেছেন শুনে সেদিনও সাবধানী হাতের কাজ ফেলে ছুটে গেল, দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই ছোট-গিন্নী পারে উঠে এলেন। মার হাতটি ধরে মেয়ে আবদার করে বললে "এবারে তোমায় ও বাড়ীতে যেতেই হবে মা! আমার শ্বাশুড়ী বাড়ী নেই, তাঁকে পাড়া থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি এখুনি।"

ছোট-গিন্নী হেসে বললেন, "আচ্ছা চল্, যাচ্ছি। খগেন বাড়ী আছে তো, সাবধানী?" "আছেন" ব'লে সাবধানী মুখ নীচু করলে।

ছোট-গিন্নী নিতাইয়ের মাকে সন্দেশের হাঁড়িটি নিয়ে আসতে ব'লে মেয়ের সঙ্গে চললেন। বাড়ী গিয়ে খগেনকে না দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "খগেন কোথা সাবধানী?"

"এই যে ওঘরে ছিলেন। কোথা গেছেন হয়তো, এখুনি আসবেন।"

"আমি এসেছি শুনেও সে চলে গেল! ও, তার মাকে ডাকতে গেছে বুঝি? এ-ছেলেটি কে সাবধানী, তোর দেওর? থাক্ বাবা থাক্, আর পেরণাম করতে হবে না, এমনিই সব ভালো থাকো" ব'লে মেয়ের হাত ধরে পাশের ঘরে গিয়ে মা বললেন, "আমার বাক্সটি এখন বার করে দে না সাবধানী, কেউ কোথাও নেই, এই তো সময়।"

মায়ের মুখ পানে চেয়ে মেয়ে বললে, "সেটা তো আমার কাছে নেই।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ছোট-গিন্নী তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, "তোর কাছে নেই কি রকম?"

"সে বাক্স তো তুমি নিজেই এসে নিয়ে গেছ, মা!"

"ওমা, তুই কি বলচিস, সাবধানী! আমি আবার কবে এখানে এলুম? তোর সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হলো?"

"আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি—আমি যে সেদিন নেমন্তন্নে গেছলুম। বাড়ী এসে শুনলুম, তুমি নাকি সেই বাক্সটা নিয়ে গেছ।"

"সাবধানী, সাবধানী!" মায়ের ভীষণ মুখের পানে চেয়ে মেয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "আমি তো মিছে বলিনি মা, যা শুনেছি তাই বলছি।"

নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। বাক্সটা কি তবে তোর কাছে নেই, খগেনকে রাখতে দিয়েছিলি? আমি তোকে বার বার ক'রে মানা করেছিলুম সাবধানী, কাউকে জানাতে—"

"আমি ইচ্ছে ক'রে জানাইনি মা! উনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে বাক্সটি যে দেখে ফেল্লেন। তার পরে, 'দাও, আমি সিন্দুকে রেখে দিই—এ বাক্স ওখানে রাখলে যে চুরি হয়ে যাবে' ব'লে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। দিন পোনেরো হবে, ও পাড়ায় আমাদের নেমন্তন্ন হয়েছিল। আমি সেখান থেকে এলেই উনি বললেন, "তোমাব মা যে আজকেও এসেছিলেন, আমি তাঁকে বাক্সটা দিয়ে দিয়েছি।"

"তাই সে আমায় দেখেই পালিয়েছে! আমি যাই সাবধানী, যে-কথা তোর মুখে শুনলুম, খগেনের মুখ থেকে তা শোনবার আগেই চলে যাই।"

সাবধানী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে, "না মা, তুমি এখন যেও না। তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা কি শোনোই না, আমাকে ঠাট্টা করতেও তো পারেন। মেজঠাকুরপো, যাও তো, তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এস।"

নগেন বারান্দা থেকে সব শুনছিল, এইবারে ছুটে দাদাকে ডাকতে গেল। ছোট-গিন্নী

তখন আর দাঁড়াতে পারছিলেন না, মাথা ঘুরে মাটিতেই বসে পড়লেন। সাবধানীও শুকনো মুখে তাঁর পাশে বসে রইলো। দু'জনেই নীরবে কম্পিতবক্ষে খগেনের প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল। সাবধানী আলো নিয়ে এলে ছোট-গিন্নী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি যাই সাবধানী, ও গয়না যার হাতে পড়েছে, তার কাছ থেকে বার করা আমার কর্ম্ম নয়। মিছেই এতক্ষণ বসে রইলুম।" নির্ব্বাক কন্যার মুখ পানে চেয়ে এই কথাটি বলেই তিনি বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেন।

খগেন তখুনি এসে বললে, "এত ডাকাডাকি করছ কেন? কাজের সময় ডাকলে পরে বড় বিরক্ত বোধ হয়।"

তাকে দেখেই সাবধানী বলে উঠলো, "তুমি কি মাকে সেই বাক্সটি দাওনি? তার জন্যে এতক্ষণ বসে থেকে মা যে কেঁদে চলে গেলেন।"

"ডাক না তোমার মাকে, নিয়ে যান তাঁর বাক্স। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে, এতে কাঁদবার কি হয়েছে," বলে খগেন চাবি নিয়ে সিন্দুক খুল্‌তে গেল। তাই দেখে সাবধানী খগেনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে খালের ধারে এল। সেখানে তারা আর সে-নৌকাখানা দেখতে পেলে না, কিন্তু নৌকা বাওয়ার শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। লজ্জা ভয় ভুলে গিয়ে সাবধানী খালের ধার দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ডাকলে, "মা, ফিরে এস। তোমার বাক্স বার করে দিচ্ছি, ফিরে এসে নিয়ে যাও তুমি, মাগো!"

সাবধানীর ডাক শুনতে পেয়ে ছোট-গিন্নী চমকে উঠলেন। নিতাই জিজ্ঞেস করলে, "ফিরে যাব নাকি, মা-ঠাকরুণ? খুকীদিদি আপনাকে ডাকচেন বলে যেন বোধ হচ্চে।"

ছোট-গিন্নী কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "সে আর আমায় ডাকবে না রে, ও আমাদের শোনবার ভুল। একবার যে ভুল করেছি, আবার তাই করব? সে যদি বলে, "কই তোমায় আমি ডাকিনি তো—' তখন? সে হবে না নিতাই। খুব জোরে বেয়ে চল্‌ তুই, যাতে শিগ্‌গীর বাড়ী পৌঁছতে পারি।"

ছোট-গিন্নী সাবধানীকে নিয়ে এসেছেন ভেবে সবাই ছুটে এলেন। বড়বধূ বললেন, "সাবধানীকে আর খগেন বাবুকে নিয়ে এলে না কেন, ছোট-মা?" সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি ঘরে গিয়েই দোর বন্ধ করলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের বেলা তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁকে আর তখন চিনতে পারা যায় না। চোখমুখ বসে গেছে, যেন কত অসুখে ভুগছেন, চেহারা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে অসহ্য বেদনায় তাঁর মন অনবরত টন টন করছিল, তিনি না বললেও তা কারো কাছেই অপ্রকাশ রইল না। পাড়ার লোকেও এ বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। বড়বধূ বল্‌লেন, "খগেন বাবু খুব চালাক তো! আমার মনে হয় মেজবউ, এ-সব সাবধানীরই কারসাজি। ও মেয়েও তো কম চালাক নয়— এখন পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আপনি কেমন বোকাটি সেজে বসে রয়েছে।"

বাড়ীতে বড়বাবুর বোনেরা সবাই তখন এসেছেন। এ-কথা শুনেই তাঁদের ছোট বোনটি

ছোটমার ঘরে ছুটে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ছোটমা, তোমার সমস্ত গয়নাই কি ওখানে রেখে এসেছো এখানে কিছুই নেই? আহা, কি চমৎকার প্যাটার্ণের সব গয়না গো, কত হীরে মুক্তো বসানো। আমার মা যখন সে সব পরতেন, তাঁকে একে বারে রাণীর মতোই মানাতো।"

ছোট-গিন্নীর কঠিন মুখ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে মেয়েটি এইবারে করুণসুরে বললে, "বল না ছোট-মা, কি হলো? তোমার মুখেই সব শুনি! আমাদের মনেও যে আশা ছিল, তুমি যখন মা হয়েছ, তখন মার মতই সবাইকে সমান দেখবে। ওমা, এ কি হলো গো!"

এই ব্যাপারে ছোট-গিন্নী মেয়েজামাইকে যতই দোষী করুন, পাড়ার দুষ্টুলোকের তাতে সায় দিলে না। তারা বল্‌তে লাগল, "ও সব গয়না পরে তো সাবধানীই পেত, পাঁচজনার ঘর দেখে বুদ্ধি ক'রে না হয় আগেই হাত করেছে, এতে যদি কারো দোষ থাকে, তবে সে সম্পূর্ণ বড়বাবুর। তিনি যদি বিমাতার গয়নার ওপরে শনির দৃষ্টি না দিতেন, তবে তা কক্ষণো এমন ক'রে উড়ে যেত না!"

মেজবধূর গহনাগুলি বন্ধনমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছে শুনে ছোট-গিন্নী সেদিন বাইরে এসে দেখ্‌লেন, বড়বাবু নিজেই তা নিয়ে এসেছেন। তার ঘরের সামনে সেই বাক্সটি রেখে দিয়ে তিনি বললেন, "এই ধর মা, তোমার গয়না তুমি মিলিয়ে দেখে নাও। আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমার জন্যেই আমাদের ধন মান সব রক্ষে হয়েছে। তোমার ধার আমরা কখনো শোধ করতে পারব না।"

মেজবধূ ঘর থেকে-বার হচ্ছেন না দেখে বড়বধূ বাক্সটি তুলে নিয়ে তাঁকে দিতে গেলেন। যাঁরা সেখানে ছিলেন, সবাই বলতে লাগলেন, "এমন লক্ষ্মী বউ আর হয় না, ওর দয়াতেই তো দত্তদের জমিদারীটা রক্ষে পেয়ে গেল।' ছোট-গিন্নী এক পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখলেন্ শুনলেন, একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি এই ভাবতে ভাবতে ঘরে গেলেন যে, যদি তিনি সেদিন বড়বাবুকে গয়নাগুলি দিতেন, তবে তা আজ ঘরে ফিরে আসতো, সবাই তাকে লক্ষ্মী মা বলে মনেও করতো। তাঁর কি দুর্ব্বুদ্ধি হলো—বড়বাবুর মত ধর্ম্মপ্রাণ লোককে বিশ্বাস না ক'রে সাবধানীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে তিনি সর্ব্বস্ব হারালেন। তাঁর এই বুক-ফাটা দুঃখে কারো সহানুভূতি নাই, সবাই ভাবচে, যেমন কর্ম্ম তার ফলও তেমনি হয়েচে।

কিন্তু কেন এ মনোবেদনা। ছোট-গিন্নী যার জন্যে ও বাক্সটি যত্ন করে রেখেছিলেন, সেই তা নিয়েছে। তবে কেন সে কথা মনে হলেই মনটা ঘৃণায় ভরে উঠে— সাবধানীর মুখ দেখতেও আর ইচ্ছে করে না? সুদিন ফিরে আসার পরে সবাই আবার আগেরমত আসা-যাওয়া করছে, শুধু সে-বেচারাই আর এখানে আস্‌তে পারছে না। মনকে তিনি বোঝাতে চান, এ-সব খগেনের কারসাজি, সাবধানীর এতে কোনই দোষ নেই। মন তাও বুঝতে চায় না—সে বলে সব জেনে শুনে সাবধানী কেন চুপটি করে রয়েছে, তাঁর কাছে আর চিঠিও তো লেখে না। সে চেষ্টা করলে কি আর এতদিনে ও বাক্সটা তাঁকে দিয়ে

যেতে পারত না? তিনি যখন সেখানে সর্ব্বস্ব রাখতে গিয়েছিলেন সে তো তাঁকে মানাও করতে পারতো, "মা, এখানে ও সব রেখো না গো, এরা লোক তেমন সুবিধের নয়।" হায়, ঘরের জিনিষ কি কুক্ষণে বার করে দিয়ে এলেন, আর ত ঘরে আনতে পাবলেন না। ছোট-গিন্নী এ কথা যত ভাবেন, তাঁর মন ততই জ্বলে-পুড়ে যায়— কেবলি চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, "সাবধানী, সাবধানী! ওরে, তুই এই করলি? এইজন্যেই কি তোকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম!"

৭

এই কষ্ট ছোট-গিন্নীকে যেন অভিভূত করে ফেললে তাঁর দেহও ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রতিরাত্রেই জ্বর হয়, তিনি তারও কোন প্রতিকার করলেন না। জ্বর যখন তাঁকে শয্যাধরা করে ফেললে, বড়বাবু জানতে পেরে কবিরাজ নিয়ে এলেন। ছোট-গিন্নী কিছুতেই তাঁকে হাত দেখালেন না, তাঁর ওষুধ স্পর্শও করলেন না। বড়বধূ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি কি করছ বল তো, ছোট-মা, শেষটা অচিকিচ্ছেয় মারা যাবে না কি? আমাদের তো আর সবই হয়েছে, এই দুর্নামটুকুই এখন বাকী আছে—সাবধানীকে বলে পাঠাই, সে এসে তার মার চিকিচ্ছে করুক। না, তুমি মানা করো না, আমি আজই সেখানে লোক পাঠাব।"

অতি ক্ষীণ-স্বরে ছোট-গিন্নী বললেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি বউমা, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। যেকটা দিন আছি, আমায় শান্তিতে থাকতে দাও। তোমরা কেন এই নিয়ে এত গোল করছ? শুধু একটি অনুরোধ, সাবধানীর মুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়— তোমাদের কাছে আর কিছুই আমি চাই না!"

"তোমার এ-অনুরোধ রাখবার মত নয় ছোট-মা। এত রাগ করবার কিছুই তো হয়নি। ওরা ছেলেমানুষ বই তো নয়, না বুঝতে পরে যদি কিছু অন্যায় করেই থাকে, তার কি আর মাপ নেই?"

"না, নেই। মানুষ শুধু বিচার করতেই পারে, সে মাপ করতে জানে না, বড়বউ। আমি তো জীবনে ও-কাজটা কখনো করতে পারলুম না," বলেই ছোট-গিন্নী অতিকষ্টে পাশ ফিরে শুলেন। বড়বধূ নীরবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। তখন তাঁরও মনে হলো, সত্যই এ-জগতে মাপ নেই। তিনি তো শাশুড়ী বলেও এঁকে মাপ করতে পারেন নি, এই তেজস্বিনীর তেজ কমাবার ইচ্ছা তিনিও কত করেছিলেন।

অর্দ্ধঅচেতনের ন্যায় ছোট-গিন্নী সারারাত সেই এক কথাই বলতে লাগলেন। তাঁর জ্বরবিকারের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বড়বাবু প্রাতে উঠেই কবিরাজকে ডেকে পাঠালেন ও আপনি সাবধানীকে নিয়ে আসতে সা-নগরে ছুটে গেলেন।

তার কাছে ছোট-গিন্নীর এ-অসুখের কথা শুনে খগেন মুখটি ম্লান করে বললে, "ও, তাঁর এত অসুখ করেছে? আপনার আরো আগে আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

সাবধানী কেঁদে বললে, "ও বড়দা, মার গয়নার বাক্সটা ওঁকে বার করে দিতে বলো না, সেটা না-নিয়ে আমি যেতে পারব না!"

বডবাবু বললেন, "ছোটমাব সেই বাক্সটি নিযে চল খগেন। ওটা হাতছাড়া হওযাতে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেযেছেন। যাক্, যা হবাব তা তো হযেই গেছে—এখনও তিনি যাতে মনে শান্তি পান, তাই কবাই তোমাব কর্ত্তব্য।"

খগেন গম্ভীবস্ববে বললে, "আপনাবা ইচ্ছা কবলে ওটা অনেক আগেই নিযে যেতে পাবতেন, ওব জন্যে কেন আমাকে দোষী কবছেন? সাবধানীব কাছ থেকে সেই বাক্সটা নিযে আমি সিন্দুকে বেখে দিযেছি, নিবাপদে থাকবে বলে। নইলে আমি কেন বাখতে যাব বলুন, আমাব কিসেব অভাব?"

বডবাবু ব্যস্ত হযে বললেন, "তুমি একটু শীগ্‌গিব কবে চল খগেন, ও সব কথাব সময এখন নয। ওদিকে যে কি হচ্ছে, কে জানে।" খগেন তখুনি পাশেব ঘবে গেল ও বাক্সটা নিযে এসে বললে, "এই নিন আপনাদেব জিনিষ। সাবধানীকেও নিযে যান, তাঁব সেবা কবতে পাববে। আমি গিযে কি কবব বলুন, আমায দেখে তো তিনি খুসী হ'বেন না।"

বডবাবু বললেন, "কেন খুসী হবেন না খগেন, তুমি তাঁব একটি মাত্র জামাই। ছোট মা যদি বেঁচে ওঠেন, যত পাব তখন মান অভিমান কবো। এখন শীগ্‌গিব ক'বে চল, নইলে শেষ দেখাও যে হবে না।"

নৌকা থেকে নেমেই সাবধানী বাক্সটি নিযে ছোটগিন্নীব ঘবে গেল। তাঁব মুখেব পানে চেযেই ভযে তাঁব প্রাণ উঠে গেল, সে এত মলিন। মুখেব উপব ঝুঁকে পডে সে আকুল-স্ববে বল্‌লো, "মা, মা। ও মা আমি এসেছি যে, চেযে দেখ।'

লাল চক্ষু দু'টি ঘবেব উপব দিকে স্থিব বেখে ছোটগিন্নী তখন কি বলছিলেন। সাবধানীব কথা যে তিনি শুনতে পেলেন, তা বোধ হলো না। বডবউ বল্‌লেন, "ছোটমাব এখন জ্ঞান নেই। সাবধানী, চুপ ক'বে বোস্। কবিবাজ বলেছেন ঘণ্টা দেডেক পবেই তাঁব জ্ঞান হবে, তখন যা হয বলিস্।"

বাক্সটি মাব, পাশে বেখে সাবধানী বল্‌লে, "জ্ঞান নেই বলচ কি তুমি বৌদি? ওই তো মা কথা বল্‌চেন।"

"উনি বিকাবেব ঘোবে প্রলাপ বক্‌চেন, তুই চুপ ক'বে বসে শোন্।"

বডবাবু ও খগেন আস্তে আস্তে এসে বিছানার পাশে দাঁডালেন। ছোট-গিন্নী তখন বলছিলেন "জানিস ঝি, কেদাব-ঠাকুব ঠিকই বলেছিলেন কিন্তু। আমি যদি তাঁব কথাটা মনে বাখতুম, তা হলে আব এ-কষ্টটা সইতে হতো না। বড কষ্ট মনে বইল। সাবধানী এই কবলে। আমাব মেযেজামাই আমাকেই ঠকালে। বড যাতনা—উঃ, প্রাণ যে যায।"

এতো প্রলাপ নয—মাব মনেব ব্যথা যে মুখ দিযে বেবিয়ে পড়ছে। সাবধানী কেঁদে বলে উঠলো, "মা, ওমা, তুমি ও-কথা আব বলো না। শুনে আমাব বড্ড কষ্ট হয। সাবধানী তো কিছু কবে নি মা। যে কবেছে সে যে তোমাব সামনেই বযেছে তাকে যত খুসী বল। আমায তুমি ভুল বুঝে চলে যেও না।"

খগেন চোখ পাকিযে সাবধানীব পানে চাইল। সে তখন আকুল হযে কাঁদছিল। তাব

সেই দৃষ্টি ব্যর্থ হ'ল দেখে খগেন বড়বাবুকে বললে, "দেখুন এইজন্যেই এখানে আমি আস্‌তে চাইনি। এসব অন্যায় কথা কত আর শুন্‌তে পারা যায়, বলুন!"

এই কথাটি কাণে যেতেই সাবধানীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে খগেনের মুখ পানে চেয়ে সে বলে উঠলো, "আমার এ কথাটা অন্যায়? মার কথাগুলো কাণ পেতে শোন—যা করেছ তুমি, তার ফলটা চোখ দিয়ে দেখ। এখন তো বেশ ভালোমানুষের মত দাঁড়িয়ে রয়েছ। মার এই গয়নাগুলি হাত করবার জন্যে কত ফন্দীই না এঁটেছিলে! এই বাক্সটা কেউ খুলে দাও তো, আমি দেখ্‌ব, কিসের লোভে মার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারা যায়! দেখব, ওতে এমন কি আছে—যা মার চেয়েও বেশী বলে তুমি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলে! এখন তুমিই আবার ন্যায়-অন্যায়ের কথা কি করে যে বলচ!"

এর পরে খগেন আর মেষচর্ম্মাবৃত হয়ে থাক্‌তে পারলে না, সে তখন নিজ মূর্ত্তি ধরে গর্জ্জে উঠলো, "এসব তুমি আমায় কি শোনাচ্ছ সাবধানী? যেন আমি তোমার মার গয়না চুরি ক'রে খেয়ে ফেলেছি। একটা ভাঙ্গা বাক্সে রাখতে যাচ্ছিলে, ভাল মনে ক'রে আমি সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলুম, তার জন্যে এত! তোমার মা তো আমার নিন্দে চারদিকেই রটিয়ে দিয়েছেন, আবার তুমিও তাই করছ! আচ্ছা, থাক, এর ফল বাড়ী গিয়ে তখন দেখ্‌বে," ব'লেই খগেন সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেগতিক বুঝে বড়বাবু, "আরে শোন শোন, ও খগেন!" ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তার পেছনে চললেন। কিন্তু খগেন আর ফিরেও চাইলে না, যে নৌকায় এসেছিল, তাতেই উঠে সে বাড়ী চলে গেল।

সকলের সারাদিনের চেষ্টায় সন্ধ্যেবেলা ছোট-গিন্নীর চেতনা ফিরে এল। তিনি চেয়ে চেয়ে সবাইকে দেখ্‌তে লাগলেন। সাবধানী শিয়রে বসে কাঁদ্‌ছে দেখে তাকে বললেন, "তুই কাঁদ্‌চিস কেন রে, সাবধানী? এতদিন পরে এলি যদি, হেসে খেলে বেড়া; শুধু শুধু কাঁদতে আছে কি?"

গহনার বাক্সটি তাঁর সামনে রেখে সাবধানী বললে, "মা, এই দেখ, তোমার সেই বাক্সটি আমি নিয়ে এসেছি।"

ধীরে ধীরে, তার ওপরে একখানি হাত রেখে ছোট-গিন্নী বল্‌লেন, "এনেছিস, তা বেশ করেছিস। ওর ভেতরে যা যা ছিল, সব ঠিক আছে তো, সাবধানী?"

"তা আছে বৈকি। তোমার বাক্স তো আমরা কখনো খুলিনি মা, ওর চাবিও আমাদের কাছে ছিল না। আমায় তুমি এইবার মাপ কর মা!"

কন্যার কাতর মুখের পানে চেয়ে ছোট-গিন্নী হেসে বললেন, "তা করব বৈ কি, তোর উপরে রাগ করবার আমার কিছুই তো রইল না। তুই খালাস পেলি, এখন আমাকেও তাই পেয়ে যেতে দে। বাবা নবীন, তুমি এদিকে এস তো! শোন, এই গয়নার বাক্সটা তোমার মার। কর্ত্তা আমায় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে আমার কোন অধিকার ছিল না। সতীনের জিনিষ ব'লে তিনি বেঁচে থাক্‌তেও তা আমি কখনো গায়ে দিইনি। পরে লুকিয়ে

রাখ্‌তে গিয়ে যে যাতনা ভোগ করেছি, আজ তারও অবসান হয়ে যাক। এ বাক্সটা তোমরাই তুলে রাখ বাবা, আর কারো এ ভার সইবে না। আমি যাই। ছোট-মা ব'লে যদি কখনো মনে কর, তোমার বিপদের দিনে যে ভুল করেছিলুম, জেনো, আমি সৎমা ব'লেই অমন করিনি—ওটা যে আমাদের স্বভাব, পুরুষজাতকে বিশ্বাস করতে পারি না। তাই ছেলেকে বিশ্বাস না করে মেয়ের কাছে সব রেখেছিলুম। ওখানেও যে ছেলে রয়েছে, সে কথাটা তখন মনেই পড়েনি!''

বড়বাবু বললে, ''ও গয়নায় আমাদের আর দরকার নেই ছোট-মা, ও আপনি সাবধানীকেই দিন। খগেন যে রকম রেগে গেছে, এ বাক্সটা না নিয়ে গেলে ওকে হয় তো অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।''

ছোট-গিন্নী অবিচলিতস্বরে বললেন, ''তা হোক; এ-জগতে আসাই তো ঐ জন্যে বাবা! তাই বলে যাবার বেলা আর অন্যায় করতে পারব না। ও-বাক্সটি তোমরা ছাড়া আর যার কাছে থাকবে, আমার মনে হচ্ছে, তার কখনো ভালো হবে না। তোমার শ্বাশুড়ীর গয়নার বাক্সটি তুলে রেখে দাও তো বউমা। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, তাঁর বউ এসে এসব পরবে, তাই ওর একখানি গয়নাও কেউ ছুঁতেও পায়নি। ও নিয়ে কত কাণ্ডই যে হয়ে গেল! সন্তান ওরই জন্যে মাকে ভুললে, মাও সন্তানের চেয়ে তার অপরাধটাই বেশী করে দেখলে। ও জিনিষ বড় ভয়ানক! সাবধানী, তোকে আমি কিছুই দিয়ে যেতে পারলুম না, কিন্তু মনে-প্রাণে আশীর্ব্বাদ করে গেলুম, ধর্ম্মে যেন মতি রাখ্‌তে পারিস।''

বড়বধূকে গহনার বাক্সটি নিয়ে চলে যেতে দেখে সাবধানী চোখে অন্ধকার দেখল। সে বুঝলো, এর জন্যে তা'কে অনেক কষ্ট পেতে হবে। খগেন কিছুতেই বাক্সটি দিতে চায়নি। সে বুঝেছিল মা নিশ্চয়ই আর সেরে উঠতে পারবেন না, সাবধানী বাক্সটি আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। এই ভেবে সে শুধু তার দোষস্খালনের জন্যেই বাক্সটি বার করে দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা যে রকম দাঁড়ালো, তার ফলে তার লুব্ধ স্বামীর ভীষণ ক্রুদ্ধ মুখ খানা মনে হ'তেই ভয়ে সাবধানী শিউরে উঠল। ভোরের সময়, যখন ছোট-গিন্নীর প্রাণ পরলোকের পথে যাত্রা করলো, তখন সেও সেইখানে যাবার কামনা ক'রে মৃতা জননীর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল।

'প্রবাসী'—১৩৩৬

নীড়ভ্রষ্ট

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

আঘাতটা যতক্ষণ সহনের সীমার মধ্যে থাকে, ধ্বনিতে, ভাষাতে মানুষ ততক্ষণ তাহাকে অসহনীয় বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থই সে যখন সেই অসহনীয়তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ রাখিয়া দেয় না—রাখিয়া দেয় আপনার নিষ্ঠুর ছাপটা আহতের চোখে মুখে।

পঙ্কজ যে দিন শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতর পদটা ত্যাগ করিল, সে দিন ক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গ তীব্রকণ্ঠে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত আপনার যথাসর্ব্বস্ব সাধারণের হিতকল্পে দান করিয়া রিক্ত হস্তে পণ্ডিচারী আশ্রমে চলিয়া গেল, সে দিন মর্ম্মাহত সুহৃদ-মণ্ডলীর মুখে আর একটিও বাণী ফুটিল না,—শুধু বর্ষার দিনে ঘোলাটে আকাশের মত নিষ্ঠুর বেদনার একটা ম্লানিমা সকলকে যেন ঢাকিয়া রাখিল।

ইহাই হইল পঙ্কজের হেঁয়ালীভরা জীবনের প্রথম আরম্ভ। কিন্তু এই আরম্ভেরও একটা সূচনা আছে, —সপ্তমীতে পূজা হইলেও প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হয়। চৌধুরীরা বংশানুক্রমে বড়লোক। সেই বংশের শেষ পুরুষ পঙ্কজের পিতা প্রশান্ত। জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ভাণ্ডার যাহাদের ভোগের নিমিত্ত পূর্ণ থাকে, সৌভাগ্যের সহিত দুর্ভাগ্যও তাহাদের জীবনের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে। বনেদী বংশের ছেলে প্রশান্তও তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। বরঞ্চ অন্তরের উচ্চতা, চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এই উভয়বিধ জিনিষই চাঁদের আলোক-দীপ্তি ও ছায়ার অন্ধকারের মত তাঁহার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইহার একটা কারণও ছিল। শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া প্রশান্ত বিধবা দিদির অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনের তুলনায় আদরের পরিমাপটা প্রশান্তের ভাগ্যে বেশী পরিমাণেই জুটিত। কিন্তু-অতি জিনিষটা কখনই ভাল ফল দিতে পারে না, তাহার উদাহরণ অনেক আছে। প্রশান্তর বেলা তাহার অভাবও হইল না। তখন প্রশান্ত ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র। কথাটা প্রতিমার কাণে উঠিল,—বিশ্বাস হইল না। শত্রুরা হিংসা করিয়াই বলিয়াছে।

যাহারা কথাটা বলিয়াছিল, প্রশান্তর কোপ-দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল! ছল-ছুতার অভাব হইল না, দিদির দরবারে অভিযোগ রুজু হইল, বিদায়ের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। বুদ্ধিমানরা বুঝিতে পারিল, চৌধুরী সংসারে স্থায়িত্ব লাভ করিতে হইলে কোন্ পথটা অবলম্বন করিতে হইবে।

কিন্তু মৃগ যেমন কস্তুরীর গন্ধ লুকাইতে পারে না, প্রশান্তর ব্যাপারটা তেমনই চাপা পড়িয়াও গুপ্ত রহিল না—প্রশান্তর জন্যই।

সে দিন প্রতিমা কনিষ্ঠের পড়িবার ঘরটায় কি একটা প্রয়োজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এটা-ওটা নাড়িতে-চাড়িতে অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে মেয়েলি হাতের লেখা একখানি পত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আতর-মাখা রঙ্গীন কাগজে আড়ম্বরপূর্ণ

প্রণয়-সম্ভাষণটাও ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার খামখানি ছিল না। তাই প্রতিমা পত্রখানি যে কাহার উদ্দেশে লিখিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রশান্ত জবাবদিহি করিলেন, নব বিবাহিত বন্ধুর পত্নীর লিখিত পত্র তিনি কাড়িয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্নেহের দুলাল, কনিষ্ঠের কথাটা প্রতিমা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্নেহই মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসী করিয়া তুলে। মাসকয়েক পূর্ব্বে প্রশান্ত বন্ধুর বিবাহ বলিয়া প্রতিমার কাছ হইতে এক জোড়া ব্রেসলেট আদায় করিয়াছিলেন। আপনার নির্ম্মল অন্তরখানির পানে চাহিয়াই যে প্রতিমা প্রশান্তর বিচার করিতে বসিতেন!

প্রতিমা অবশেষে ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। নিজের না-পরা হীরা-মুক্তার গহনাগুলা ভ্রাতৃবধূর অঙ্গে পরাইয়া তিনি নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিলেন। মা যে মৃত্যুকালে শান্তকে তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন।

নূতন জীবন, তীব্র মাদকদ্রব্যের মত প্রশান্তকে কিছুদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। প্রতিমা নিশ্বাস ফেলিলেন,—দুঃখ নহে, আরামে। দুষ্টগ্রহ কাটিয়াছে বোধ করিয়া। প্রশান্তও সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিদির স্নেহ মমতা-ভরা বুকখানিকে স্ফীত করিয়া তুলিলেন। গভীর আনন্দে প্রতিমা ক্ষণেকের জন্য কনিষ্ঠের মাথাটা আপনার বুকে চাপিয়া ধরিলেন, দুই চোখে তাঁহার আনন্দের অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

গৃহের সুখ পুরাতন হইয়া আসিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত স্বাধীনতাও পাইয়াছিলেন। সুতরাং এবার তিনি গভীর জলের মাছ হইলেন।

শরতের নির্ম্মল আকাশ হইতে বজ্র বাহির হয়। এক দিন সকালে দেওয়ান শ্যামাচরণ আসিয়া মূলচাঁদ জহুরীর গহনার তালিকাখানি দিদি-রাণীর সম্মুখে দাখিল করিল। কিছু না বুঝিতে পারিয়া প্রতিমা সেখানি তুলিয়া লইলেন। তালিকার নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যার পানে চাহিয়া সহসা তাঁহার বিশাল নেত্র বিস্ফারিত হইল—ভীতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এত গহনার ক্রেতা কে?"

উত্তর হইল, "খোকাবাবু।"

প্রতিমার আর বাক্‌স্ফূরণ হইল না। তিনি পাষাণ প্রতিমার মতই স্তম্ভিত-ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শুধু অন্ন-জল নহে, চন্দ্র-সূর্য্যের মুখদেখা অবধি বন্ধ করিয়া প্রতিমা শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বধূ রমা ভীত হইল; প্রশান্তও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রুদ্ধ কপাটগাত্রে আঘাতের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল; চোখের জলে ভাসিয়া প্রশান্ত পুনঃ পুনঃ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, অনেক শপথ-বাণীর সহিত মিনতি চলিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বিফল হইল, প্রতিমা দরজা খুলিলেন না। অবশেষে প্রশান্ত জানাইলেন, না খাইয়া তিনি আজ সারা দিন দাঁড়াইয়া আছেন, দিদি কপাট না খুলিলে তিনি অন্ন গ্রহণও করিবেন না। এবার প্রতিমার আসন টলিল। আর কি তিনি রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? শান্ত তাঁহার অনাহারে! সারাদিনের বদ্ধ দুয়ার সেই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া গেল। প্রশান্ত দিদির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

গম্ভীর মুখে প্রতিমা কহিলেন,—"শান্ত, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।"

প্রশান্ত কহিলেন,—"তা হলে আমরাও যাব, দিদি-ভাই।" প্রশান্তর অন্তরটাও বোধ হয় একটা পরিবর্ত্তন চাহিতেছিল।

প্রতিমা চমকিয়া উঠিলেন। উপস্থিতবুদ্ধি একটা সৎপরামর্শ দিল—প্রশান্তর এ মোহ কাটাইতে হইলে এখান হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই সুপরামর্শ। এত দূরে তাহাকে লইয়া সরিয়া যাইতে হইবে, যেখানে এই সর্ব্বনাশা সংসর্গের অতি ক্ষীণ প্রভাবও পতিত হইতে পারিবে না। কনিষ্ঠের হাতখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে প্রতিমা কহিলেন,—"শান্ত, যাবি ভাই আমার সঙ্গে?"

অপরাধটা যখন অপরাধীর নিজের স্কন্ধে বোঝার মত ভারী হইয়া চাপ দেয়, কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা তখনই জাগিয়া উঠিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনকে অধীর করিয়া তুলে। আর সেই সন্ধিক্ষণের শুভ মুহূর্ত্তে ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন থাকে, নিপুণ পরিচালকের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া সে জীবনের স্রোতটা ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হয়। দুর্ব্বল মন লতার মত একটা সুদৃঢ় অবলম্বন প্রার্থনা করিয়া থাকে; যাহাকে জড়াইয়া সে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে। প্রশান্ত সম্মত হইল।

প্রতিমা কহিলেন,—"এই দণ্ডেই যেতে হবে।"

প্রশান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার কক্ষের চারিপাশে দৃষ্টিপাতের পর দিদির মুখের পানে তাকাইলেন,—কৃষ্ণ, প্রোজ্জ্বল নেত্র-তারকা তুলিয়া প্রতিমা স্থির-দৃষ্টিতে সহোদরের পানে চাহিয়াছিলেন। প্রশান্ত আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মতিজ্ঞাপনের চিহ্নস্বরূপ মাথাটা এক পাশে হেলিল।

* * * * *

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে উচ্ছৃঙ্খলার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে স্বাস্থ্যের পরিণাম কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রভাতচন্দ্রের মত ভ্রাতার দীপ্তিহারা মুখের পানে চাহিয়া প্রতিমা শঙ্কিত-চিত্তে পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলায় বাসা বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘুণধরা গাছে যেমন হাজার জল ঢালিলেও রক্ষা করা যায় না, তেমনই ঘুণধরা দেহ-মনকে হাজার যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না। প্রতিমা সব বুঝিতেন! ভ্রাতৃবধু রমার সরলতা-ভরা মুখখানির পানে চাহিলেই তাঁহার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিত। দেবতার পায়ে প্রার্থনা করিতেন, "ঠাকুর, আমার যদি এতটুকু পুণ্য থাকে, এক দিনও যদি তোমায় প্রাণ দিয়ে ডেকে থাকি, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি স্বর্গ-মোক্ষ কিছুই চাই না, ইষ্টদেবতা! শুধু রমার সিঁথের সিঁদুরটুকু উজ্জ্বল রেখ তুমি।"

দেবতা দয়াময়। একান্ত প্রার্থনা তিনি নিষ্ফল করিতে পারেন না। রমার সীমন্তে সিঁদুরের রেখাটা তিনি উজ্জ্বল রাখিলেন। অন্নপূর্ণা তাহাকে আপনার পায়ে স্থান দিলেন। সেবার অন্নকূটের পর কাশীতে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

রমার শেষকৃত্যটুকু সারিয়া আসিয়া প্রশান্ত কহিলেন,—"আর কেন দিদি ভাই! ফেরা যাক।"

প্রথম আঘাতটা জীবনে বড় দুঃসহ হইয়াই অনুভূত হয়। প্রশান্তের অস্বাভাবিক শান্ত ও নির্ব্বিকার মুখের পানে চাহিলেই উহা বেশ বুঝা যাইত। ভূমিকম্প থামিয়া যাওয়ার পর চূড়াহীন মন্দিরের মতই তাঁহাকে দেখাইতেছিল।

জীবনে যাঁহারা যত বেশী আঘাত পাইয়া থাকেন, সহিবার শক্তিটা তত বেশী পরিমাণেই তাঁহাদের বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানুষের স্বভাবই এই। প্রতিমা নীরবে কনিষ্ঠের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

দিদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া প্রশান্ত পড়িয়াছিল; বিয়োগান্তদৃশ্যপূর্ণ অতীত আজ এই শোকাহত চিত্তের উপর আপনার অমোঘ আধিপত্য দেখাইতেছিল। দিদির এই কোলটুকুতে শোয়া লইয়া শৈশবে কত দিন কত মান অভিমানের পালা অভিনীত হইয়াছে! শরীরের এতটুকু অসুস্থতা বোধ হইলে এই কোলের মাঝেই প্রশান্তর সারাটা দিন কাটিয়া যাইত। দিদি বকিতেন, নামাইতে চেষ্টা করিতেন,—আবার দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া চুমাতে চুমাতে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই আনন্দ-চঞ্চলতাভরা সুখের শৈশব অতর্কিতে কখন্ সরিয়া গেল; বাল্য আসিল; দুরন্তপনার আর অন্ত রহিল না। তাহাও সরিয়া গেল,— কৈশোর দেখা দিল, তাহার শেষ সীমা হইতে তিনি একটু একটু করিয়া দিদির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। তাঁহার আলাদা ঘর, স্বতন্ত্র বিছানা। লোকজন সবই দিদি নিজস্ব করিয়া তাঁহাকে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। আশ্রিত অনুগতের উপর একটু একটু করিয়া প্রভুত্ব সঞ্চয়ও তিনি করিতে লাগিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার লইয়া যৌবন দেখা দিল, দিদির কাছে আসিবার সাহস তাঁহার লুপ্ত হইয়া গেল। একটা মস্ত জমীদারীর মালিক তিনি, তাঁহার নামের স্বাক্ষরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, ইহা ক্রমে তিনি বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যে দিন দিদি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অনাচারের মধ্য হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া আসিলেন, সে দিন সমস্ত অন্তরখানি দিয়া প্রশান্তও যে যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবনের একটা পৃষ্ঠা উলটাইয়া দিবেন! একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত পাশ ফিরিলেন।

প্রতিমা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"শান্ত!"

প্রশান্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। প্রতিমা কহিলেন,—" কোথা যেতে চাস? বাড়ী?"

প্রশান্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। সেখানে যে অনেক প্রলোভনের ফাঁদ পাতা আছে! দুর্ব্বল চিত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন না। রমার কাছে আর তাঁহাকে অপরাধী হইতে হইবে না, ইহাই যে তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশান্ত কহিলেন,—"না।"

প্রতিমা স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কোথা যাবি, ভাই?"

প্রশান্তর শূন্য দৃষ্টি অস্তগামিনী দিবার শেষ আলোকরেখার প্রতি নিবদ্ধ ছিল; সেখান হইতে দৃষ্টিটাকে সরাইয়া, দিদির কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া কহিলেন,—"না, দিদি ভাই, আর কোথাও যাব না।"

* * * * *

দেবতার দুয়ারে তাহার জন্য যখন প্রতিমার মাথা খোঁড়ার অন্ত ছিল না, মানতেরও সংখ্যা

ছিল না, তখন সে আসে নাই। যখন আসিল, তখন সম্পূর্ণ অনাহূত হইয়াই দেখা দিল। তাই তাহার আগমনে প্রতিমার ওষ্ঠে হাসি ফুটিল না। মন তাঁহার কুণ্ঠিত হইল। নিজেকে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন,—শিশু দেবতা!

প্রতিমা এবার অতি সতর্কতার সহিত পঙ্কজকে লইয়া দূরে দূরে ফিরিতেন—আত্মীয়দের কাছে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। জীবন-ভরা দুঃখের মধ্য দিয়া প্রতিমা সংসারের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রৌঢ়বেলায় ভ্রাতুষ্পুত্র পঙ্কজের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা পঙ্কজকে শিখাইতেন, জন্ম অধিকারে প্রাপ্যটার যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে পরিণামে ক্ষতিকর দুর্ভাগ্যকেই বরণ করিতে হয়। বুঝাইতেন, মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে কর্ম্মের উপর। অনেক জমা আছে বলিয়া অনেক খরচের অধিকারী হওয়া মহা পাপ।

উর্ব্বর ভূমিতে বীজনিক্ষেপের মত পঙ্কজের শিক্ষা সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য পঙ্কজ য়ুরোপ যাইতে চাহিল। বিনা প্রতিবাদে প্রতিমা সম্মতি দিলেন। জীবন ভরিয়া তিনি একে একে যাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিতে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে অসময়ে ফাঁকি দিয়া সরিয়া গিয়াছে। তাই পঙ্কজ যখন আসিয়া সুদূর সাগরপারে গোটাকয়েক বছর কাটাইয়া আসিবার প্রস্তাব করিল, নিষেধের বাণী তখন প্রতিমার ওষ্ঠে ফুটিতে পারিল না।

অক্সফোর্ড, হার্ব্বার্ট প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত—ইউনিভারসিটি হইতে প্রাপ্ত উচ্চ উপাধি-প্রাপ্তির সংবাদ পঙ্কজ যখন তার যোগে পিসীমার নিকট প্রেরণ করিত, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রতিভার গৌরব প্রতিমা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আপনার ব্যথা, আনন্দ সবই আপনার ভাঙ্গা বুকখানির মধ্যে চাপিবার শক্তিটুকু প্রতিমা নিয়ত অন্তর্যামীর পায়ে ভিক্ষা করিতেন।

পঙ্কজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। জগতে তাহার একটি মাত্র স্নেহচ্ছায়াশীতল আশ্রয় ছিল। দুই হাতে সে প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিল, শিশুর মত পঙ্কজ প্রতিমার বুকের উপর মাথাটা রাখিয়া আনন্দের অশ্রুতে তাহা ভাসাইয়া দিল।

প্রতিমা বেশী কথা কহিতেন না, আস্তে আস্তে শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের গাত্রে নিবিড় স্নেহভরা আপনার কোমল হাতখানা বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

না খুঁজিলেও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। অযাচিত হইয়া প্রতিমাকে পরামর্শ দিল, এইবার ভাইপোর বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরবাসী কর।

প্রতিমার তরফ হইতে উৎসাহ ত দূরের কথা, মুখের একটা উত্তর অবধি আসিল না; তা বলিয়া উৎসাহের অভাব হইল না। পাঁচজন পঙ্কজের বিবাহের সম্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু প্রতিমার উদাসীনতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিস্মিত আত্মীয়বর্গ পঙ্কজের কাছে অনুযোগ করিল। উচ্চহাসিতে পঙ্কজ কহিল—নিজে খেতে পাই না, শঙ্করাকে দেবো কোথা হতে? লোক অবাক্ হইয়া গেল। কতবড় জমীদারীর মালিক না পঙ্কজ। আত্মীয়রা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিল। আত্মীয়তার দাবী লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, অভিমান করিয়া পরের মত তাহারা সরিয়া গেল।

পঙ্কজের একটা পেটের সংস্থান এইবার যাহা হইল,—সেটাকে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পঙ্কজ নিজে অবধি পারিল না। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের যে উচ্চ পদটায় সে বসিবার অধিকার পাইল, তাহার বেতনের সংখ্যায় চারিটা অঙ্কপাত করিতে হয়।

প্রজাপতির দৌরাত্ম্য এইবার তাহার উপর আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। তনুহীন দেবতাটিও বোধ করি এই অবসরে পঙ্কজের উপর একটা অলক্ষ্য শরনিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে পঙ্কজের এক প্রতিবাসী যখন তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে করিতে বয়সের প্রভেদ ভুলিয়া অথবা অন্তঃপুরের তাড়নায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় পঙ্কজের পায়ের উপর হাত দিলেন, তখন পঙ্কজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। কথাটাকে হাসিয়া উড়াইবার শক্তিও তাহার ফুরাইয়া গেল। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে পঙ্কজ তাঁহাকে পিসীমার কাছে যাইতে অনুরোধ করিল।

উমাপদ জানাইলেন,—তাহাই করা হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক্।

পঙ্কজ নিজেকে মনে মনে অত্যন্ত বিপন্ন জ্ঞান করিল, রীতার কমনীয় মুখখানির উপর অজ্ঞাতে যে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে, ইহা সে প্রথম অনুভব করিল। উমাপদকে আশ্বাস দিল—কথাটা সে নিজেই পাড়িবে। ভদ্রলোক তখনকার মত প্রফুল্ল মুখে গৃহে ফিরিলেন।

আহার করিতে করিতে পঙ্কজ একসময় হাসিয়া কহিল,—"তোমার হাতের রান্না না খেলে পেটই ভরে না, পিসীমা! যা অভ্যেস ক'রে দিচ্ছ।"

একটু হাসিয়া প্রতিমা কহিলেন,—"আমি ত সব রাঁধি না। দু' একখানা যা—"

বাধা দিয়া পঙ্কজ কহিল,—"ওই দু' একখানাতেই ত মাটী ক'রে দিয়েছ, পিসীমা। আর যদি কাউকে শেখাতে—" পঙ্কজ আশা করিয়াছিল,—তাহার এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হইবে না, পিসীমা বিবাহের কথা পাড়িবেন; কিন্তু পিসীমা তাহার ধার দিয়াও গেলেন না। মৃদু হাস্যে প্রতিমা কহিলেন,—"অভ্যাসটা কোন কিছু নয় রে! যখন যেমন।"

পঙ্কজ হতাশ হইল; কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল,—"হাঁ, ভাল কথা পিসীমা! আজ যে উমাপদ বাবু এসেছিলেন। সে এক মহা কাণ্ড বাপু।"

পিসীমা নীরব। ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিহিত মহা কাণ্ডটা যে কি, তাহা অবধি জিজ্ঞাসা করিলেন না, তথাপি পঙ্কজ নিরস্ত হইল না। বিপরীত স্রোতের মুখ হইতে নৌকাখানা ঘুরাইয়া লইবার জন্য মাঝি যেমন করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার সমস্ত শক্তিটুকু হস্তস্থিত হালখানার উপর সুকৌশলে প্রয়োগ করে, পঙ্কজ তেমনই করিয়া আপনার মনের সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করিয়া বলিয়া চলিল,—"উমাপদ বাবু বললেন, এবার ত চাকরী-বাকরী কর্চ্ছ—গরীবের দায় তোমাকেই উদ্ধার কর্ত্তে হবে! হ্যাঁ পিসীমা, রীতিকে তুমি দেখেছ?"

পঙ্কজ যে মেয়েটির নাম অবধি জানে, তাহাও পিসীমাকে জানাইয়া দিল। প্রতিমার মুখে কিন্তু উৎসাহ বা উদ্বেগের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। ঈষৎ আনত মুখে তিনি কহিলেন,—"হাঁ, রোজ যে আমায় ফুল দিয়ে যায়।"

পঙ্কজ হাসিয়া উঠিল। "ও হরি! এর মধ্যে সে তোমার ফুল যোগাতে আরম্ভ করেছে।

কৈ, আমার চোখে ত তা এক দিনও পড়েনি।" যাহার প্রভাবটা নষ্ট করিবার জন্য দ্রুতকণ্ঠে পঙ্কজ এতগুলো কথা বলিয়া গেল, যৌবন-সুলভ সেই দুষ্ট লজ্জাটা কিন্তু তাহার আরক্ত আভা পঙ্কজের সুগৌর মুখখানির উপর বুলাইয়া দিতে ভুলিল না। প্রতিমার দৃষ্টির কাছেও তাহা চাপা রহিল না।

পঙ্কজের আহার শেষ হইয়া আসিয়াছিল। "পাণ আনি" বলিয়া প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল।

* * * * *

পঙ্কজ উমাপদকে জানাইয়া দিল,—বিবাহে সে সম্মত।

দুই হাত তুলিয়া আন্তরিক লক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে উমাপদ মহা উৎসাহে বাহির হইয়া গেলেন।

ভিতরে আসিয়া পঙ্কজ প্রতিমাকে সংবাদটা দিল,—অনেকক্ষণ একটা উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিমা মুখ তুলিলেন না; কথা কহিলেন না; নীরবে শুধু তরকারিগুলা যেমন খণ্ড বিখণ্ড করিতেছিলেন, তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন।

পঙ্কজের যৌবনস্ফীত মুখখানা একটা নিগূঢ় অভিমানের ব্যাথায় ভরিয়া উঠিল। কুণ্ঠিত-চরণে, নিঃশব্দে সে আপনার পড়িবার ঘরখানিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। ইটালীদেশ হইতে পঙ্কজ পিতার একখানি ফটো অয়েলপেণ্টিং করাইয়া আনিয়া ছিল। আজ অকস্মাৎ সেই চিত্রের পানে চাহিতেই দুই চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। পিতৃ-অভাবের দুঃখ জীবনে এই প্রথম ত্রিশ বৎসর বয়সে অনুভূত হইল।

একটা নিষ্ফল আবেদন পঙ্কজের সারা অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া সেই চিত্রখানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রিতে আহারেব স্থানে প্রতিমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পঙ্কজ আসনের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা কোথা?"

দাসী উত্তর করিল, "জ্বর হয়েছে! শুয়ে আছেন।"

আসনে আর বসা হইল না। উদ্বিগ্ন-মুখে পঙ্কজ প্রতিমার কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

কক্ষের আলো নিবান ছিল। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক শয্যায়, মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঙ্কজ নিঃশব্দচরণে বিছানায় বসিল, পিসীমার কপালে হাত দিল।

প্রতিমা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। চমকিয়া হাঁকিলেন, "শান্ত!"

পঙ্কজ কহিল,—"আমি, পিসীমা। অসুখ করেছে তোমার?"

প্রতিমা আর কোন কথা কহিলেন না। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পঙ্কজ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। আস্তে আস্তে কহিল,—"ডাক্তারকে ফোন করি?"

তেমনই অবস্থায় থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন,—"না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পঙ্কজ ডাকিল,—"পিসীমা!"

প্রতিমা কহিলেন,—"বাবা!"

প্রতিমার বুকের উপর হাতখানা রাখিয়া পঙ্কজ কহিল,—"আমাকে এমন ক'রে তুমি দূরে ঠেলেছ কেন, পিসীমা?"

প্রতিমার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি দেখা দিল। পঙ্কজের কোলের উপর আপনার মাথাটা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—"তোকে কি আমি দূরে ঠেলতে পারি, যাদু! তুই যে আমার শান্তর দেওয়া ধন, বাবা।"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,—"তবে?"

"তবে? সে আর কি শুনবি, বাবা। তোর পিসীমার দুঃখের বোঝা একটুখানি নেড়ে দেখতে গেলে সারা জীবনটা তোর দুঃখে যে ভরে উঠবে, সোনা আমার! তাই যত আঘাত এই বুকখানাতেই সয়ে নিয়েছি। আমার শেষের সঙ্গে যেন এরও শেষ হয়ে যায়।"

পঙ্কজ কিছু বুঝিতে পারিল না। কি যেন একটা অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হইবার উৎকট আগ্রহে তাহার সারা বুক খানা ভরিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—"সুখ হোক, দুঃখ হোক, আমার ন্যায্য পাওনা হতে আমায় বঞ্চিত করো না, পিসীমা।"

প্রতিমা কহিলেন,—"ভয়াবহ ভূমিকম্পটা যতক্ষণ পৃথিবীর তলায় ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ জগতের মঙ্গল।"

"তা হোক, পিসীমা। তুমি ত এটুকুও জান, চিরদিন সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে পারে না; এক দিন তাকে জাগতেই হবে, সে আছে এই প্রমাণ কর্ত্তে। সেই জন্যই মানুষ আগে হতে তাকে চিন্‌তে শেখে তার হাত হতে নিজেকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবে ব'লে।"

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিলেন। যে ধ্বংসকারী হলাহলকে তিনি আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে এই স্নেহ-নিধিটিকে দিবেন?

পঙ্কজ আবার ডাকিল, "পিসীমা—"

প্রতিমা ব্যাকুল-দৃষ্টিতে পঙ্কজের মুখের পানে চাহিলেন। প্রশান্তর হারানো মুখখানি যেন অনুক্ষণ পঙ্কজের মুখের মাঝে ধরা দিতেছে। ত্রস্তকণ্ঠে পিসীমা কহিলেন,—" কেমন ক'রে তোর আশা আনন্দভরা বুকখানা চূরমার ক'রে ভেঙ্গে দেব, বাবা!"

দৃঢ়কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল, "ভাঙ্গাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাই হোক্। ভগবানের ইচ্ছার প্রতিরোধ করবার শক্তি মানুষের নেই। তার চেষ্টা শুধু বাতুলতা!"

প্রতিমা কহিলেন, "তা জানি; কিন্তু মানতে পারি কি? সত্য হলেও অপ্রিয় ব'লে আমরা পদে পদে অনেক কিছু গোপন কর্ত্তেই চাই—ব্যথার হাত হতে রক্ষা পাব ব'লে।"

অধীরকণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,—"দু'দিন পার বটে, কিন্তু চির দিন পার না। সে শুধু সত্য বলেই যে এক দিন ব্যক্ত হবে। তাকে বৃথা গোপন করার দুঃখ এমন ক'রে তুমি একা ভোগ কর কেন, পিসীমা?"

"কেন করি?—"একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতিমা চোখ বুজিলেন, সেই মুদিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে প্রতিমা চোখ চাহিলেন। তিনি যেন এই কয় মুহূর্ত্ত ধরিয়া অন্তরের মাঝে ডুবিয়া অতীতের ছবিখানিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার পর যখন কথা কহিলেন, তখন মনে হইল, এ যেন প্রতিমার কণ্ঠস্বর নহে। সেই সংযত বাণী, উচ্ছ্বাসবিহীন একান্ত শান্ত কণ্ঠস্বর নহে। কঠোর অপরাধে সঙ্কুচিতা নারীর মিনতিভরা কণ্ঠের অনুনয়পূর্ণ বাণী বিচারকের কাছে দয়া-ভিক্ষার মত।

প্রতিমা কহিলেন, "তোর বাপকে, আমার শান্তকে তুই অভিসম্পাত করিস নি, পঙ্কজ। তাকে হারিয়ে তার কাছ হতে পাওয়া ব'লে তার প্রতিকৃতি তুই। তোকে বুকে জড়িয়ে আমি বেঁচেছিলুম, বাবা।"

অশরীরী আত্মার আগমনে ভয়ার্ত্ত মানুষের দেহ-মন যেমন কণ্টকিত হইয়া উঠে, পঙ্কজের দেহ-মন যেন তেমনই একটা আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মাথার চুলগুলা অবধি সোজা হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত-নেত্রে সে শুধু কহিল, "বল।"

যন্ত্র-চালিতের মত প্রতিমা কহিলেন, "অতি জিনিষটা ভাল ফল দিতে পারে না। শান্তর জীবনে তার অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। আমার অত্যধিক আদর-স্নেহই তাকে অমন দ্রুতভাবে অধঃপতনের চরম সীমায় ঠেলে দিয়েছিল, বাবা। তা ব'লে দিদির প্রতি ভালবাসার তার অভাব হয় নি, বাবা। বুঝতে পাল্লুম, যে ঘূর্ণাবর্ত্তে সে পড়েছে, সেখান হতে উদ্ধারের একমাত্র পথ—তাকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে পালান।"

"তাই পালালুম। ভাই আমার একটা আপত্তি অবধি তুল্লে না। রমাকে নিয়ে, শান্তকে নিয়ে, আমি অনেক দেশ ঘুরলুম; পঙ্কজ, তখন তোর আগমনই আমার একান্ত প্রার্থনা হয়েছিল।"

প্রতিমা উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিলেন। পঙ্কজের এককানা হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "পঙ্কজ, যাদু আমার! ধন আমার! মানিক আমার! ভগবান্ সে দিন তোকে দিলেন না যদি, তবে কেন এ পথ দিয়ে দিলেন?" প্রতিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পঙ্কজের মনে হইল, রবিকরালোকিত উজ্জ্বল সৌধচূড়া হইতে তাহাকে যেন অতল অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইতেছে। অসহায়ভাবে সে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আপনার মুঠাটায় আপনি চাপিয়া ধরিল। না জানি কোন্ কঠোর সত্য তাহাকে ধুম্র হইতে ধুলা করিয়া দিবে।

প্রতিমা কহিলেন, "অকালে যে ফুটে, অকালেই তারে শুকাতে হবে। তাই ঠাকুরের কাছে শান্তর আয়ু ভিক্ষা করতে পাত্তুম না। চাইতুম রমার এয়োত, তা পেলুম,— ভাগ্যমানী আমার কপাল-ভরা সিঁদূর নিয়ে চ'লে গেল। শান্ত যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বুঝলুম, এ পরিবর্ত্তন তার সইবে না, তবু কথা কইতে পাত্তুম না। রমার শোকে তার দুর্ব্বল বুকখানা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাবার দিন শান্ত আমার হাত দুখানা চেপে ধল্লে, একটা ভিক্ষা চাইলে, না বল্‌তে পাল্লুম না। যত বড় বজ্র হোক, বুক পেতে নেব স্বীকার কল্লুম! শান্ত তোর কথা বল্‌লে। তুই আমার রমার কোলে না এলেও তুই শান্তর ছেলে। শান্ত আকুল-মিনতিতে

বল্লে, "সে অস্থানে তাকে রেখ না! অনাচারে উৎপত্তি হলেও আমার দ্বারা আনীত ব'লে তার মানুষ হওয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। দিদি-ভাই, শিশু-দেবতা।' আরো বল্লে কি জানিস্? বল্লে, 'দিদি-ভাই' এইবার অনেক বোঝা-পড়ার সময় হয়ে এল, যতটা পাবি, বোঝাটা হাল্কা করবার চেষ্টা কর্চ্ছি।' বল্‌তে বলতে সে বসে উঠল, এক ঝলক তাজা রক্ত বেলয়ারের পটটায় তুলে দিয়ে বল্লে, 'দিদি-ভাই' আমার সব কর্ত্তব্য তুমি নিয়ে আমায় ছুটী দাও, আমি আর পারছি না।"

"তোকে আনালুম— যে ঠিকানা সে দিয়ে গিয়েছিল, সেখান হতে। তখন তুই দেড় বছরের। দেশ হতে অনেকগুলা বছর বাইরে কাটিয়েছিলুম, কেউ বুঝতে পাল্লে না, তুই রমার কোলে এসেছিলি কি না। সে সন্দেহ অবধি কোন দিন কারু মাঝে জাগে নি। তবু ভয়, ভাবনা, আতঙ্ক আমায় দেশে থাকতে দিত না। আত্মীয়বর্গের ত্রিসীমা মন আমার মাড়াতে চাইত না। সকলে জান্‌ত, শান্তর শোকেই আমি বাড়ীতে থাক্‌তে পারি না; দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।"

চোখের সম্মুখে মুহূর্ত্তে যদি কক্ষটা উল্টাইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ করি, পঙ্কজ এমন করিয়া অভিভূত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন, "আমার সবখানি অন্তর জুড়ে আজ তুই বসেছিস্। শান্তর বংশধর ব'লে তোকেই প্রতিষ্ঠা করেছি। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, রূপ সব দিক দিয়েই তুই চৌধুরী-বংশ উজ্জ্বল করেছিস। কিন্তু এমনই দুর্ব্বল এই মন, এমন ক'রে এ আপনার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'বে আছে, কিছুতেই একে আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, বাবা। চৌধুরী-বংশের চৌদ্দপুরুষ তোর হাতের জল পাবে, ভাবতে গা আমার শিউরে উঠে।"

'বসুমতী'—১৩৩৭

উমাপতি

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী সরস্বতী

এক

কালীগঞ্জ স্টিমার যখন গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন ঢাকা মেল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে।

হঠাৎ ষ্টিমার খানি চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়ায় এই বিলম্ব। ঘড়ির দিকে চাহিয়া ট্রেন ধরিবার আশায় নিরাশ হইয়া আজিকার রাত্রি যে ষ্টিমারেই কাটাইতে হইবে, ইহারই জল্পনা-কল্পনা যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই করিতেছিল। ইহার মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে বালক-বালিকা, ও মালপত্র বেশী, তাঁহারা রাত্রি যাপনের জন্য বিছানা পত্র বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থাও করিতেছিলেন, তবে বেশিরভাগ লোকই ট্রেন ধরিবার আশায় স্টিমার ঘাটে ভিড়িবার পূর্বেই, মালপত্র -সহ নীচের তলায় গিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্টিমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র কুলির ও যাত্রীদিগের চীৎকার, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি—কে কাহার আগে গিয়া ট্রেন ধরিবে।

একে অল্প মিনিট কয়েক সময় হাতে তাহার উপর ষ্টীমার ঘাট হইতে ষ্টেশন কতকটা যাইতে হয়, পথেও ভীষণ অন্ধকার। অল্প জন কতক যাত্রী যাঁহাদের সঙ্গে অচল এবং সচল মাল ছিল না, তাঁহারাই শুধু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কোনরকমে ট্রেন ধরিলেন।

ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া উঠিলেন—"সুবি, সুবি, আমি গাড়ীতে উঠতে পারলাম না, শীগগির নেমে পড়।" ভদ্রলোকের মুখের কথা চলন্ত ট্রেনের শব্দে সম্পূর্ণ শ্রুতিগোচর না হলেও ব্যাপার বুঝিতে সুবির বিলম্ব হইল না। সুবিকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ভদ্রলোকটি দেখেন জিনিসপত্র সহ কুলী তাঁর পিছনে আসিতে আসিতে হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি 'কুলী, কুলী' বলিয়া ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে। রাত্রিকাল, তাহাতে যেরকম সময় পড়িয়াছে, নিজের সঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভদ্রলোকটী সুবিকে পুরুষের কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

দুই

সুবির বয়স চোদ্দ কি পনের, পাতলা ছিপছিপে একহারা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর—একবার দেখিলে পুনর্বার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। একখানি কাল চওড়া পাড়ের শাড়ী মাদ্রাজী ফ্যাসানে পরা, গায়ে একটী পাতলা ব্লাউজ, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে সরু সরু দুগাছি তারের বালা ও কাপড় আটকান একটী প্লেন ব্রুচ ছাড়া অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। মাথায় কাপড় নাই বলিয়া মনে হয় মেয়েটী এখনও অবিবাহিতা।

গাড়ীতে সুবি একেবারে একা, স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ সে বেঞ্চের কোণ ঠেসিয়া জড়সড় ভাবে বসিয়াছিল। সে গাড়ীতে পুরুষ-যাত্রীর মধ্যে একটি চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক ছাড়া অন্য কেহ ছিল না।

ব্যাপার বুঝিতেও সুবির মিনিট কয়েক বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু আপনার অসহায় অবস্থা বুঝিবামাত্র একটা অব্যক্ত অস্ফুট আর্তনাদের সহিত সে সেই গতিশীল ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য গাড়ীর দরজার হাতল ঘুরাইতেই তাহার সম্মুখের বেঞ্চে উপবিষ্ট যুবকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কি করেন? মারা পড়বেন যে।"

বাস্তবিক পক্ষে ট্রেনের গতি তখন বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা কানে না তুলিয়া ঝড়ের বেগে সুবি ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। "সর্ব্বনাশ। কি করেন, কি করেন" বলিতে বলিতে সেই যুবকটিও সেই গভীর নিশীথের কৃষ্ণ যবনিবা তলে, বনানী বেষ্টিত স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। বিপদ জ্ঞাপন শিকলটী টানিয়া গাড়ী থামাইবার কথাও তাহার মনে হইল না। চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার দরুন গুরুতর আঘাত না লাগিলেও অল্পবিস্তর আঘাত উমাপতির যে না লাগিয়াছিল এমন নয়। টাল সামলাইয়া উমাপতি সুবির খোঁজ করিল কিন্তু কোথায় সুবি? গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে উমাপতির যেটুকু সময় বিলম্ব হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে তাহাদের উভয়ের ব্যবধানের দূরত্বটি হইয়াছিল অনেকখানি, সে কামবায় অন্য যাত্রী কেহ থাকিলে হয় ত শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইলে লোকজন, আলোক, আশ্রয় সবই মিলিত, এখন এই বিরাট অন্ধকার স্তূপের মধ্যে কেমন করিয়াই বা সে সুবির খোঁজ করিবে, আর এই জনহীন প্রান্তরের বুকে এই দীর্ঘ রাত্রিই বা কাটাইবেন কেমন করিয়া? তথাপি আশায় নিরাশায় লাইনের ধার বাহিয়া সে অগ্রসর হইল, কিছুদুর যাইতেই দেখিল,—লাইনের বাহিরে মৃতের মত কি একটা পড়িয়া আছে, নিকটে গিয়া দেখিল—সুবিই বটে।

মেয়েটী মাথায় চোট পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভয়ে সে প্রায় আধমরার মত হইয়াছিল, উমাপতিকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া সুবির বিবর্ণ মুখখানি আতঙ্কে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল, এবং একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্বরিতপদে উঠিয়া বসিল। উমাপতির মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে তীক্ষ্ণ - কণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"আপনি যদি আমার কাছ থেকে সরে না যান"—কথাটা শেষ করিল না—কিন্তু তীব্রদৃষ্টিতে রেলের লাইনের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনের কথা উমাপতির নিকট স্পষ্টই হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ছিঃ! কি ছেলেমানুষি করেন! কি বিপদে পড়েছেন ভেবে দেখুন দেখি একবার! দেরী করবেন না, আসুন আমার সঙ্গে।"

মেয়েটী একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উমাপতির মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা জানিয়া লইল, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

তিন

সুবিকে সঙ্গে করিয়া উমাপতি যখন গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও সুবির ভগ্নিপতির সন্ধান করিতে না পারিয়া সুবিকে লইয়া এখন কি করা ভাবিয়া উমাপতি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

মাসখানেক পূর্বে সুবি তার ভগ্নীর গৃহে গিয়াছিল, ভগ্নিপতি তাহাকে তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইতে যাইতেছিলেন। ভগ্নীর বাড়ী যাইতে হইলে এখনই উজান স্টিমারে উঠিতে হয়, উমাপতি সুবিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভগ্নীর বাড়ী যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উমাপতির অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল।

সুবির ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি বলিল—"গাড়ীর তো এখন অনেক দেরী, একটা ভাল হোটেলে গিয়ে চলুন ততক্ষণ স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।"

যাত্রীদিগের বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান গোয়ালন্দে নাই। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র-ঝলসিত অনাবৃত রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে শত চক্ষুর দর্শনীয় হইয়া বসিয়া থাকিতে উভয়েই দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই সুবিও এ প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

চার

পরদিন কুষ্টিয়া ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া নয়নপুর পৌঁছিতে জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ দিবাও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। নদী হইতে পুনরায় গরুর গাড়ীতে দুই মাইল পথ চলিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা একখানি মেটে খড়োবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। অন্য সময় হইলে অর্থাৎ, এই দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া উমাপতির সঙ্গে না আসিয়া ভগ্নীপতির সঙ্গে আসিলে আনন্দোন্মত্তা বালিকা এই বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিবামাত্রই এতক্ষণ ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইত। আজ বাড়ীর দিকে গোযান খানি যতই অগ্রসর হইতেছিল, ততই তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ করিতেছিল, দ্রুত বক্ষস্পন্দনের সহিত হাত-পা একেবারে অসাড় নিস্পন্দ—নাড়িবার শক্তিও যেন নাই।

গাড়ী থামিলে তার এই নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া উমাপতি বলিল—"সুমুখের এই বাড়ীই ত আপনাদের?"

সুবি মাথা হেলাইয়া জানাইল—"হাঁ, এই তাদের বাড়ী।"

উমাপতি বলিল—"তা হলে আপনি নেমে বাড়ির ভেতর যান, আমি এই গাড়ীতেই ফিরে যাই।"

সুবি তেমনি ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। বিস্মিত উমাপতি একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"আমি নেমে বাড়ীর কাউকে ডেকে দেব কি?"

সুবি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর চাউনিটুকু উমাপতির মুখের উপর স্থির করিয়া জড়িতস্বরে বলিল—"বাড়ী ঢুকতে আমার কেমন যেন বড্ড ভয় করছে—"

"এই কথা, আসুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

উমাপতি সুবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ী দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় কয়েকটী বালক বালিকা সুবিকে ঘিরিয়া উল্লাসভরে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ও মা দিদি এসেছে।"

সুবির ভগ্নিপতি রাজবাড়ী ষ্টেশন মাষ্টারের নামে গোয়ালন্দ হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন,— ট্রেন পৌঁছিলে তাঁহারা যেন সুবিকে নামাইয়া লন। পরের ট্রেনে সেখানে পৌঁছাইয়া তিনি জানিতে পারেন, সুবি নামে কোন মেয়ে সে ট্রেনে ছিল না। ভদ্রলোক নিরুপায় হইয়া সুবির পিতাকে সকল সংবাদ সংক্ষেপে জানাইয়া টেলিগ্রাম করেন। টেলিগ্রাম খানি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুবির পিতা জগমোহন ভট্টাচার্য্য এই দুঃসংবাদে এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, উপস্থিত কি করা উচিত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। বয়স্কা মেয়ে একা পথে।— কোথায় গেল সে।

সুবির মা সুবিকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া আত্মহারার মত ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"বের করে দাও, বের করে দাও, এখুনি ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দাও ওকে"— বলিতে বলিতে জগমোহন ঘরের দাওয়া হইতে লাফাইয়া উন্মাদের মত সুবি ও তাহার কাছে আসিয়া তাহাদের মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। পিতার এই ক্রোধোন্মত্ত রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সুবির ম্লান মুখখানি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উমাপতি একেবারে বাড়ীর ভেতরে না গেলেও সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে সকল ব্যাপারই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল। দেখিয়া শুনিয়া উমাপতি একেবারে নির্ব্বাক, এতক্ষণ যাই-যাই করিয়াও সুবির এই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় যাইতে পারিতেছিল না। এদিকে সুবির পিতার কর্কশ চীৎকারে, পাড়া প্রতিবাসী বর্গের ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষে ও তাঁহাদের নির্লজ্জ অবান্তর প্রশ্নে, নিরপরাধ বালিকার এই দারুন বিব্রত অবস্থায় উমাপতির করুণ হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভিতরে আসিয়া বিনয়-পূর্ণ স্বরে বলিল— "শুনুন আপনারা, আপনারা যা ভেবে এই নিরপরাধ মেয়েটীর কষ্ট দিচ্ছেন, তা ঠিক নয়। ইনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমায় ভদ্র সন্তান বলেই জানবেন। আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।" পরে আনুপূর্ব্বক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উমাপতি বলিল—"এর মধ্যে দুষণীয় ত কিছু নেই—"

মুখ খিচাইয়া জগমোহন বলিয়া উঠিলেন—"বাপু হে, সে যেন আমি বুঝলাম, অন্যে বুঝবে কেন? একে বয়স্কা মেয়ে, তায় দুদিন বাদে তার বিয়ে দিতে হবে। একথা তখন তো আর গোপন থাকবে না। কে ওই মেয়েকে গ্রহণ করবে? এই তুমি যে মুরুব্বিয়ানাচালে এত বক্তিমে করছ, তোমাকেই যদি ধরে পড়ি, তুমিই কি ওকে নিতে চাইবে?"

দারুণ উত্তেজনায় বৃদ্ধ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং পুনরায় গর্জ্জিয়া স্ত্রীর

দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হয় মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে মার, নয় যে ওকে সঙ্গে করে এনেছে, তার সঙ্গী করে দাও।"

উমাপতির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে ধীর কণ্ঠে বলিল —"তাতে আমি মোটেই অসম্মত নই। যদি বিনা অপরাধে এত বড় সাজা ওঁকে নিতেই হয়, আমায় জানাবেন শেষ পর্য্যন্ত ওর বোঝা আমার ভারী হবে না ;" বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পাঁচ

তারপর বছর খানেক কাটিয়া গিয়াছে—আজও সেদিনের স্মৃতি উমাপতির মনে দোল দিয়া যায়। সুবির ব্যথাতুর পাণ্ডুর মুখখানির কথা ভুলিতে সে চেষ্টা খুবই করে, কিন্তু পারে না তাই পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া যখন সে শুনিল—'তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়া মা বিবাহ সম্বন্ধ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন—তখন মায়ের উপর অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে তখনকার মত তাঁহাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—এ বিবাহ করিতে সে পারিবে না, অন্যত্র সে কথা—দিয়াছে।

সুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"দোসরা অঘ্রাণে বিয়ে ঠিক করে দাদা চিঠি লিখেছেন। মেয়েও তিনি নিজে দেখে পছন্দ করে তবে তাঁদের পাকা কথা দিয়েছেন। গরীবের মেয়ে, একটী নগদ দেবার শক্তি নেই। তাঁরা যা দু' এক খানা গয়না ইচ্ছে করে দেবেন তাই। দাদার আগ্রহ তেমন ছিল না, মেয়েটী দেখেই কিন্তু তাঁর কেমন মমতা পড়ে গেছে। না না করেও মেয়েও ত কম দেখা হল না, এমন সুশ্রী কমনীয় মুখ সচারাচর চোখে পড়ে না।"

চটি জুতার অগ্রভাগে উঠানের মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে উমাপতি বলিল—"তুমি মামাকে লিখে দাও মা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না। এখনও সময় আছে, তাঁরা অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ অনায়সেই ঠিক করে নিতে পারবেন।"

সুলোচনা জ্বলিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—"লিখতে হয়, তুমিই লিখে দাও। আমি পারব না।" তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। উমাপতি মাথা হেঁট করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে জাগিতেছিল,—সেই দুর্দ্দিনের চিত্র; সুবির করুণ কোমল মুখখানি, তার আত্মনির্ভরশীল কাতর চাউনিটুকু; কিন্তু .....

ছয়

যদিও বেলা দুইটার পূর্ব্বে ডাউন ষ্টিমার আসে না, মাল বোঝাই ইত্যাদিতে তিনটার পূর্ব্বে ছাড়ে না, এবং ষ্টিমার ঘাট হইতে তাহাদের বাড়ীও অধিক দূর নয়, তবুও সুলোচনা

বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল গুছাইয়া বেলা বারটার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—ভয় পাছে ষ্টিমার ছাড়িয়া যায়।

সেদিন হইতে মাতা ও পুত্র এই দু'টি অতি নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা অসন্তোষের ভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া ছিল। মায়ের একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া উমাপতি এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে।

ইহার পরে সে এ বিবাহ সম্বন্ধে মুখে আপত্তি সূচক আর কোন কথাই বলে নাই সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরের বেদনা মুখে এমনি ক্লিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে, সুলোচনার মাতৃহৃদয়কেও ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কেবলি মনে হইতে ছিল-পুত্রের অমতে বিবাহ দিয়া তাহার দাম্পত্য জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের উপর একটা অশান্তির বোঝা চাপাইতে যাইতেছেন। নৌকার মধ্যে সকলেই নীরব। কেবল নদীর তরঙ্গ ভঙ্গের সহিত কল্‌কল্ ছলছল শব্দ। এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুত্রের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সুলোচনা বলিলেন—''নেমে মালটালগুলো ওজন কর না? ষ্টিমার এসে পড়লে তখন ত আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।''

উমাপতি বলিল—''ষ্টিমারের ধোঁয়া দেখা না গেলে কোনদিনই মাল ওজন করে না।''

একটু নীরব থাকিয়া সুলোচনা বলিলেন—''নেবে জিজ্ঞেস করে আয়না, স্টিমার আসবার আর কত দেরী?''

উমাপতি মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর হেমন্তের খররৌদ্র বিভাসিত উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া পদ্মার বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজির মেলা, কখনও বা নদীর চরে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে কৃষক পল্লীর মৃন্ময় কুটির; কখন বা সর্ব্বগ্রাসী প্রলয় নৃত্যকারী পদ্মার ভাঙ্গনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একসময় ফিরিয়া আসিয়া, নৌকার মধ্যে শুইয়া একখানি মাসিক পত্রের পাতা উলটাইতে লাগিল। 'স্মৃতির দংশন' শীর্ষক গল্পটি তাহার মনকে আকর্ষণ করিল, গল্পটি পড়িতে পড়িতে তাহার কেবলি মনে হইতেছিল তাহার মনের ভাব লইয়াই যেন গল্পটি লিখিত হইয়াছে। মোহাবিষ্টের মত ভাবিতে ভাবিতে উমাপতি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! স্বপ্নে দেখিল,—পিতৃপরিত্যক্তা ব্যথিতা সুবি ম্লানমুখে করুণ নয়নে চাহিয়া যেন তাহার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছে। ''আহা! মাথাটী এমন করে হেলে পড়েছে বিছানায় উঠে শুলে হয় না?''

মায়ের স্নেহ কোমল হস্তের স্পর্শের সঙ্গে তাঁহার মৃদু ভর্ৎসনায় উমাপতির তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নৌকার মাঝি বলিয়া উঠিল—''বাবু, জাহাজের ধোঁয়া দেখা যাতিছে।''

সাত

গোয়ালন্দে ট্রেণে উঠিতে গিয়া ইন্টার ক্লাসের মেয়ে কামরার দিকে চাহিয়া উমাপতির হৃদকম্প উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক, বিছানার বাণ্ডিল, কলার কাঁদি, ফলের ঝুড়ি,

ঘিয়ের টিন, ক্ষীরের হাঁড়ি প্রভৃতিতে কামরা পূর্ণ। তারপর যাত্রীর ভিড়, কাচ্ছা-বাচ্চার কান্না এবং মহিলাগণের স্থান দখল লইয়া, "তুমি শুয়ে আছ, আর বসতে যায়গা পাব না? কেন আমি কি ভাড়া দিই নি না কি?" ইত্যাদি ইত্যাদি ঝগড়া পুরোদমে চলিতেছে। পুরুষের কামরায়ও স্থানাভাব। অগত্যা উমাপতি মা ও ভাইবোনদের লইয়া এঞ্জিনের কাছাকাছি একখানি থার্ড ক্লাসের অপেক্ষাকৃত খালি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি জমাট-বাঁধা অন্ধকার ও নীরবতার মাঝে আকাশে উজ্জ্বল তারকার মালা, পথিপার্শ্বস্থ বনবীথির মধ্যে খদ্যোতের মেলা এবং মাঝে মাঝে অনাদৃত স্টেশনগুলির চকিত আলোক ছাড়া পথে দর্শনীয় কিছু না থাকিলে ও উমাপতি জানালার বাহিরে দৃষ্টি স্থির করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার "বসে থাকবি কতক্ষণ, রাত জেগে কি শেষটা অসুখে পড়বি? শুয়ে পড়না"—মৃদু ভৎর্সনায় সে বাঙ্কের উপর শয্যা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

উমাপতির যখন ঘুম ভাঙিল তখনও উষার আলোক ধরণীর বক্ষ আলোকিত করে নাই। ঘম ভাঙিতেই উমাপতির কানে চাপা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল। সে বুঝিতে পারিল, নিদ্রিত থাকিবার সময় এই নবাগতাদের গাড়ীতে আগমন হইয়াছে। গাড়ীর আরোহিবর্গ প্রায় সকলেই নিদ্রিত, কেবল কোল ঘেসিয়া বসিয়া উমাপতির বিবাহিতা ভগিনী শৈবলিনী ও আর দুইটি মেয়ে হাসি গল্পে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সেই চাপা কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ও হাসির শব্দ মাঝে মাঝে উমাপতির কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল।

মেয়েদের এমন একটা বয়স আসে, যখন দুনিয়ার দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, অভিযোগ কোন কিছুই তাহাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। বয়সের রঙ্গিন নেশা তখন মনকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখে।

এই নবাগতা মেয়েদুটীর মা একদিকের বেঞ্চে শুইয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

তাহাদের কথাবার্ত্তার যেটুকু অংশ উমাপতির কানে গেল, তাহাতে সে বুঝিল, যদিও মাঝরাত্রেই তাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছে, কিন্তু কথাটা বেশীক্ষণ আরম্ভ হয় নাই, উঃ বাপরে এই সময়টুকুর মধ্যেই এত বন্ধুত্ব।

আর অল্পক্ষণ পরেই ছাড়াছাড়ি হইবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া শৈবলিনী ক্ষুণ্নস্বরে একটী মেয়েকে বলিল "বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই, হয় ত জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না। নতুন সাথিটিকে পেয়ে আমায় ভুলে যেও না যেন, বুঝলে?"

মেয়েটি সলজ্জ হাসির সহিত মুখখানি নত করিল শৈবলিনী তাহার হাতখানি পরম স্নেহে আপনার হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু চাপ দিয়া বলিল—"চিঠিব উত্তর কিন্তু দিও ভাই।"

তার পর কাহার বাড়ীর নম্বর কত ইহা লইয়া দুইজনের মধ্যে একটু আলোচনা হইল, কেন না, কেহই বাড়ীর নম্বর অবগত নয়। মিনিট কয়েক চিন্তার পর স্থির হইল,—মায়ের নিকট হইতে উভয় পক্ষই ঠিকানা জানিয়া লইবে।

হঠাৎ শৈবলিনী বলিয়া উঠিল "দেখ ভাই, আমার কি ভুল। আদত কথাই যে জিজ্ঞেস

করতে ভুলে গেছি। তোমার শ্বশুর বাড়ী গ্রাম পোস্ট অফিস, জেলা, আর ভাই তোমার বরের নামটী আমায় বল? তোমার বিয়ে ত এই পরশু, বিয়ে হলেই ত শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে?''

শৈবলিনীর প্রশ্নে মেয়েটী একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না, শৈবালিনী বলিল—''লজ্জা কি ভাই, এখনও তো তোমার বিয়ে হয় নি, বরের নাম বলতেও কোন দোষ নেই।

যে মেয়েটী এতক্ষণ তাহাদের নিকট বসিয়া উভয়ের গল্পের রসাস্বাদন করিতেছিল, সে তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—''কি মেজদি, বলব তোমার বরের নাম? বলি?''

পূর্ব্বোক্ত মেয়েটী ঈষৎ কোপ কটাক্ষ ভগ্নীর মুখের পতি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সে দমিবার বা ভীত হইবার পাত্রী নহে। সে হাসিতে হাসিতে শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—''তা জানেন না, এই আমার মেজদিদির পতি তিনি—''

শৈবলিনী বলিল—''তা যেন বুঝলাম, তা বলে কি তাঁর নাম নেই?''

পরম বিজ্ঞের মত মেয়েটী বলিল—''একটু বুদ্ধি খরচ করলেই সব বোঝা যায়। আচ্ছা, শুনুন তবে—আমার ঠাকুরমা আদর করে দিদিকে সুভদ্রা বলে ডাকতেন, অত বড় নাম ধরে ডাকতে অসুবিধে হয় বলে সবাই ওকে সুবি বলেই ডাকে, কিন্তু ওর আসল নাম হচ্ছে উমারাণী। তাই ওর বরের নাম ও হল উমাপতি। কেমন আমি ঠিক বলেছি কি না?''

মেয়েটী হাসিতে লাগিল। বালিকার হাস্যোচ্ছ্বলিত মুখের দিকে চাহিয়া শৈবালিনী বলিয়া উঠিল—''আচ্ছা, তোমার দিদির শ্বশুর বাড়ী গাঁয়ের নামটি কি ভাই?''

বালিকা তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—''তা জানেন না, আমড়া, আর জেলা পাবনা, —অর্থাৎ কি না, আমরা আর আমড়া খেতে পাব না।''

শৈবলিনী বারেকমাত্র মেয়েদুটির দিকে চাহিয়া উঠিয়া গিয়া অন্য বেঞ্চে নিদ্রিতা মায়ের গায়ে ঠেলা দিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল— ''ও মা, মা, উঠে দেখ কে! আমাদের গাড়ীতেই আমাদের বৌদি'',

আনন্দের বেগে শৈবলিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বিস্মিত চকিতা সুলোচনা বলিয়া উঠিলেন—''কই?''

বাঙ্কের উপর উমাপতিও সেই সময় তাহার ভাবী পত্নীর মুখখানি দেখিবার লোভে চোরাদৃষ্টিটুকু মেয়েটীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এ কি; এ কোথা হইতে আসিল, এ যে সুবি; দারুণ মানসিক উত্তেজনায় হয় ত তাহার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া উমাপতি পুনরায় মেয়েটীর মুখখানি দেখিবার জন্য চাহিল, লজ্জা অভিভূতা বালিকা মাথা নিচু করিয়া বেঞ্চের কোণ ঘেসিয়া অপরাধীর মত জড়সড়ভাবে বসিয়া রহিল। লুব্ধ মধুপের মত তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাপতির অনুসন্ধিৎসু নেত্রযুগল যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল, তাহাতে আর তাহা[illegible]তে বিলম্ব হইল না,—কে সে?

'গল্পলহরী'—১৩৩৮

দর ও দস্তুর

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"পর, পর মা, গয়না পর,—

সেই গল্পটা মনে পড়ে, ছোট বেলায় শুনেছিল—সবটা ভাল মনে নেই। মনে হয় সেই মেয়েটা কাঁদতে লাগল। প্রকাণ্ড অজগর সাপটা তাকে জড়িয়ে সমস্ত শরীর সমস্ত হাড় অস্থি চূর্ণ করে দিতে লাগল দরজা বন্ধ—ঘরের ভেতর সে আর সেই সাপ।

ব্যাকুল হয়ে কেঁদে মেয়ে বলে, 'মা আর গয়না পরব না'— বন্ধ দরজার বাইরে ঠাকুমা দিদিমা মা সবাই বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—'পর, পর মা, গয়না পর';—

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল—গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে বসে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

সূর্য্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ—এক দিকে গোটাকতক সোণালী পাড় কাপড়ের মতন পড়ে আছে। তা থাক। অন্য সময় ঐ কাপড়ের পাড়ের শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে, মেজ বোনকে ডাকে—আজকে তার চোখে ও-সব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর এমনিই চেয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ গল্পটা 'পর, পর মা, গয়না পর'। আর সেই মেয়েটা তার পর মরে গেল। গেল তো! বেশ হল, বেশ হয় সেও যদি মরে যায়।— রোজ রোজ আর কেউ দেখাতে পারে না।

আজকে ওরা আবার বড়রা কেউ ছিল না—সব না কি ছেলেটীর বন্ধুরা!— ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখ্‌তে জানে? কেন 'ছোটকা' তো বল্লেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি—বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়ীতে নেই কিনা—' তারপর বল্লে—'গান জানে?'

কাকা বল্লেন, 'জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা—' একটা ছেলে একটু মুখটিপে হেসে বল্লে,—" ছেলে মানুষই মেয়ে হয় মশাই—'

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল,—ছাই হ'ল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না। এমন কি বিচ্ছিরী করে চেষ্টা করলেও ও রকম হয় না। কাকা কেন বল্লেন না—গান ও জানে না।

ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা না কি সভ্য,—ওরা না কি সব বিদ্বান।—ওদের বোনকে এদের কেউ অমনি করে দেখে।—

সেজদি এলে কাপড় কেচে,—ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

'ওমা তুই বুঝি এখানে বসে।—আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন। খাবার খাস্‌নি যে! কাঁদছিস কেন?'

ও রাগ করে বল্লে, 'কই কেঁদেছি'? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এলো'।

'ওরে,"এ দুঃখ সবারি করতে হয় রে! তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার

মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বল্লে,—'চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই। বড় খোঁপা— দেখে ভাবলে বোধ হয় গুছি দিয়ে চুল বাঁধা—

ওতো ভাল— সেই প্রতিমা— আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো?— তার আবার দেখতে এসে সব বলে, 'মশাই হাতে মনে হচ্ছে 'কড়া' পড়েছে। নন্দাই রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বল্লেন, 'টিপে দেখুন হাত'। ছেলেটী এম-এ পাশ করেছেন, বাড়ী আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস্ তার! শ্বাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার!— তা বলে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল— কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বল্লে, 'দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে যাঁরা হাঁটালে!'

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই হাসলে, 'হাঁটালেন তো বাড়ীর কেউ নয়—মামা শ্বশুর'—

নিভা আরও অবাক হয়ে বল্লে, 'জামাই বাবুর মামা তো! তা' তুমি সেখানে গিয়ে রাগ করনি, কিচ্ছু বল নি কারুকে? জামাই বাবুকেও না?'

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে—'

নিভার রাগে গা জ্বলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ী ছাতে কে উঠলেন, বল্লেন, 'তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বল্লে?'

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল কথার গন্ধ পেয়ে—পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ, দেখে তো গেল,— এখনি কি বলবে, কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ করে?—বাবা এই দুটী ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই।— যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটী যদি একটু ফরসা হ'ত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখ্‌লে, কত কি—'

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গী করে বল্লেন, 'লেখা নিয়েই বা কি করবেন— গানেই বা কি করবেন? সেই মুনীয়ার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসিমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে। তার রং তেমন ছিল না—ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে—বিয়ে তো হ'ল,—এখন শুনি না কি, বর কারুর কাছে কোনো জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খেকিয়া! ক্যাঁক করে বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি!— কোনোখানে পাঠায় না— মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ—কাজের বাড়ীতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বল্লেন 'অথচ মরতে সব বিয়ের সময় সব জিগ্গেস করে।—যার হাতে পড়বে সেই যদি ও-সব না চায়-ছাই দরকারেও লাগে না।'—

'তা' দরকার লাগে না বটে, কিন্তু সুনীলার মেয়েটী সে কি চমৎকার গায়—' মা এলেন; কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে নিভা কই?—কি সব ঢং বলতো।----খাবার খেলে না অবধি;—চিরকালকার জিনিষ, তারা নিয়ে যাবে---দেখবে না? দেখছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন'।

মার পিছন দিয়ে নিভা নেবে গেল।

'ভাল লাগে না মানি, তা কি করব ছাই?'—এক সঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হ'ল যে মার আর কথা বেরুলো না মুখে—

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে। মার কাজ সারা হ'ল।—

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমুচ্ছে—নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চুরুট খাচ্ছেন।— বেশী চিন্তিত হলেই তার সিগারেট খাওয়া অভ্যেস,—অন্যমনে প্রতিদিনের দ্বিগুণ খান সেদিন।

নিভার জননী জলের ঘটী, দুধের বাটী, পানের ডিবে, মিছরী বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

'তার পর?'—

চুরুটটা হাতে নিয়ে স্বামী বল্লেন 'কিসের?'—

'এই যে গো,—নিভাকে দেখে কি বল্লে?—পছন্দ করেছে ছেলে?'

স্বামী অন্যমনে দুটানে সেটাকে টেনে আধখানাই ছুঁড়ে বাইরে ফেলে বল্লেন, 'কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে,— ছেলের ছোট ভাই ছিল, বলে গেল'—

মাতাপিতা দুজনেই—জানালার পথে রাস্তায় গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে মাতা বল্লেন, 'মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল,—কতবার যে সব দেখলে'—

বাপ চুপ করেই রইলেন।

মা আবার বল্লেন, 'ওরা না কি বলে— আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।'

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন; বল্লেন; 'মিছে বলে না।'

খানিক চুপ করে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা ঘুমুচ্ছে?'

মা বল্লেন, 'হ্যাঁ'।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো, ক্লান্ত স্বামী ঘুমুলেন।'

নিভার মার চোখে আর ঘুম এলো না। মনে হয়, বারে বারেই নব নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখেছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন—শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারো বা গহনা, কারো বা গহনার ওজন, কারো বা গহনার রং, কারো বা নিজেরি রং;—কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতামাতা; যা হোক; তাহোক অমনিই তো হয়ে থাকে;—বলে, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না!

—ছোট বোন সুধারি তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন করে দেখেছিল তারা। ৬০ ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল কাঁটা হয়ে ওঠেনি!—তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ক্রুটী সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয় ত তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা' হোক। আজ সুধার ঐশ্বয্যি দেখে কে? ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ঘর বাড়ী হীরে মুক্তো!—

আহা, তা বেঁচে থাক্। আহা! বাবা দেখে যান নি!

কিন্তু : —

তা কি হবে—এই রকমই তো সব ঘরে : —

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটীর মুখের দিকে একবার চা'ন। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে—তারি সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিসটা কোথায় সরে গেছে। ঠিক করে দিয়ে মা শুয়ে পড়লেন।

আকাশে নিস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক করে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভিতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্ব্বদিনের চেয়ে বেশী করে সর ময়দা সাবান, স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন করে, শাড়ীর সঙ্গে জামার রংয়ে মিল করিয়ে ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজাল।

অবাধ অপমানবোধ কেবলি নিভার চোখের কোলে উপচে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

'কাকে আবার না দেখেছে,'— কে আবার না দেখে'—' তোর রকম দেখে বাঁচিনে'— 'চোখ মুখের কি ছিরি হবে।' মেজদি বল্লে,—' বেশ দেখাচ্ছে এবার। —নিভার মুখখানি যে বেশ!'—

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত করে—, মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হ'ল।

খোস গল্পে আসর জমে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার সমস্যা, ঘি দুধের দুর্মূল্যতা, পাশ করার নিষ্ফলতা, এবং মূর্খ গেঁইয়াদের উপার্জ্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

'বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি,— ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না—!'

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হাঁ'— বলে সমর্থন করলেন। তার পর কন্যাদায় ও তার পর পাত্র পক্ষের নানারকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে যদি কারো গায়ে বাজে।

'কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই কালোকে ফরসা করতে জানা!'—মাতুল ডাক্তার— বেশ নাম করাও,—উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল,—ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বল্লেন, 'তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা। ওষুধ বিষুদ নয়! এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটী যক্ষ্মা কালো মেয়ের বিবাহ হ'ল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই।—বলব কি— আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটী সোনার চাঁদ— যেমন রূপ, তেমনি গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনি বুঝলেন কি না?'—মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন।—অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নিপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—'

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাস্‌বার চেষ্টা করলে, তাঁব সঙ্গে পাছে ভদ্রতার লাঘব হয়। আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ক্রুটী ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এলো। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এলো না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্‌পার কি ওস্‌পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ী ও বাড়ীর চিনু বিনু রুনু রেবা আশা সব বারাণ্ডার ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোণে—দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

'জানো ভাই, আমার বে'তে পাঁচবা দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শ্বাশুড়ী দেখলেন অমনি সব কথা ঠিক হওয়া'।—

তো ভাই তোমার বাবা যে তেমনি ৬ হাজার করে খরচ করেছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল'—

'দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই।'

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, 'তা বলে তোরা যারা রূপসী তাদের সব ভাল হবে? তা হলে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হ'ল?—'

সে যে তার বাপের একটি মাত্র মেয়ে অত বিষয় সেই পাবে—আর কালো, তা কি— মুখখানি সুন্দর। স্বামী খুব আদর যত্ন করে'—

মুখরা মেয়েটি শ্যামা,—বিদ্রূপ হাস্যে সে বল্লে, 'তাই বল্—আসল কথা টাকা— তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুর বাড়ীর যত্ন,'—

যে তর্ক করছিল সে বল্লে রাগ করে,—তা টাকা তো কি? যার বাবার আছে তিনি দেবেন না?'

কেউ হারে না—নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে।

মনের একপাশে দাঁড়ায় আকাশ ভরা তারা—অন্যধারে পৃথিবী জোড়া অন্ধকার—সেদিন মেজদি এসেছিল। ওপরে এলো তারা।

'হ্যাঁরে, ন' ওপরে একলা?'

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। মেজদি বেশ করে বসে, সান্ত্বনা দেবে ভেবে, বলে 'এমনি হয়েছে ভাই।'— সে তাদের পাড়ার কন্যাদের নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে 'কি করবি—, এমনি ঘরে ঘরে—'

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ীর কার এক কৃষ্ণা কন্যাদায়ের ভয়াবহ—অথচ উজ্জ্বল ব্যাখা দেয়; অর্থাৎ মেয়েটি বিয়ের পরে না কি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে— তাব চেয়ে আমাদেব নিভা দিবা ঢের ফবসা'—

রাত্রিও বাড়ে,—গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃ-মাতৃভক্ত স্বামীদেব বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁচার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বর-পক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।—

অনেক রাত্রে মেজদি গেল ছেলে শোওয়াতে--

চুপ করে থেকে তাকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, 'আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাই বাবুরাও অমনি করেছিলেন?'

মেজদি সোজাসুজিই বল্লে,—'দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বৈকি। তা' সে তো কিনা আমার দিদি-শাশুড়ী আর শ্বশুর কবেছিলেন। উনি তার কি জানেন?'

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'তাহলেও ভাই উনি তো মা বাপের ছেলে বলতে পারতেন না কি?'

মেজদি—'তা কি করে বলবেন? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তারা যা করবেন ভালর জন্যেই তো?—আর এ তো সবাই করে।'

নিভা অপ্রস্তুত ভাবে বল্লে, 'তাহলেও অত বিদ্বান জামাইবাবু'—

মেজ দিদি বল্লে 'তাতে কি'— ?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষ সমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনো; — সে ভাবত বোধ হয়, তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, 'আচ্ছা ভাই, তোমার শ্বাশুড়ী না কি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ করে রইলেন?'

'তা কি করে বল্‌বেন?—তুই এক পাগ্‌লী। মা বাপকে বলা যায়? হলই বা শোনালেন আমার শ্বাশুড়ী—তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে। আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে,

তাঁরা আর এমন কি বলেছেন?—বিয়েতে লক্ষ কথা হবে,—আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হল ধারা।'

যুক্তি সঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ করে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণ—তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, 'ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হ'ল, ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নে না! নিভাকেও খেতে ডাক্।

নিভা উঠল্।

এবারে সে কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দিদি ভাই, তোমাদের জামাই বাবুদের ভাল লেগেছিল?'

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজ দিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'স্বামীকে ভাল লাগবে না, কেন? শোনো একবার মেয়ের কথা!— হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও'!—মাগো,—ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব.—কই ঐসব কথা তো ভাবেও নি— মেজদিদি, সেজদি এবং মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এলো।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায়নি। দর থাকলে আদর থাকে। পাঁচ বোনের প্রথম নয় শেষ নয় সে; আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন মেজদি সেজদি ঘুমুলো, ছেলেরা, ভাইয়েরা ঘুমুলো;—মার ঘটি বাটী ডিবে রাখার শব্দে নিভা উঠে বস্ল। সবাই ঘুমুচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল তাই,—'কিরে?'

'একটু জল খাব।'—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।—

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়ীই অন্ধকার।—

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।—

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।—

'কিরে?'

'আমায় ও-রকম করে বিয়ে দিয়ো না মা!'—

'কি রকম করে'—মা ভ্রু কুঞ্চিত করলেন।

'ঐ কেবলি টাকা আর গয়না করে।—আমি ওদের ভালবাসতে পারবো না'— তার চোখ ছল ছল করে এলো।

শোনো কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে—তার সঙ্গে তোর ভালবাসার কি?—পাগল আর কি।— এরাও তো টাকা নিয়েছিলেন'—তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা' আর বল্লেন না।—

'রাত হয়েছে, যা শুগে'—

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন,—'নিভা কি বলছিল?'

মা বল্লেন। নিভার বাপ একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বল্লেন 'তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না—দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই—আমারো নেই!'

স্ত্রী একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলেন!

কথা উল্টে বল্লেন,—'ওরা কি বল্লে? জবাব করে, দেবে? পছন্দ হয়েছে? কিন্তু কেমন ধরণ যেন!'

শেষ কথার জবাব না দিয়ে স্বামী বল্লেন, 'ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের —রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে,—সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনে বৈশাখ মাসে দেবে।''

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন 'সে কি উপায়?

'কিছু বেশী টাকা। নগদ ওরা নেয়না, কিন্তু 'রকম' নেয়'—

খানিক চুপ করে থেকে পত্নী বল্লেন, তা কি করবে?'

তাই দোব আরকি। ছেলেটী ভাল, স্বাস্থ্য ভালো, বাপের অবস্থা ভালো,—বাজারে দর আছে।—তাছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটী দেবে—আদরও করবে—তার পর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বল্লেন—'আর তুমি তো বলেইছো ঠিকই—ভালবাসতে কোনোই ত বাধা হয় না'।—

'ভারতবর্ষ '—১৩৩৯

অভিমান

শ্রীআশালতা দেবী

"সতীশ, তোমার মত বন্ধু আর কিরণের কে আছে বলো! তুমি কি ওর ভায়ের মত হয়ে এই কাজটুকু করে দেবে না?"

ভবানীপুর অঞ্চলের একটি ছোট সুন্দর বাড়ীর একতলায় বসে নীরজা সুন্দরী একটা শ্বাস ফেলে প্রশ্নগুলি পর পর করে গেলেন।

চৈত্রমাসের বিকেল বেলা! সামনে ফুলের ঝুড়ি রয়েছে, পাথরের বাটীতে করে তিনি বেলের সরবৎ তৈরী করছেন। আপেলের গুচ্ছ ডিজাইন করা বড় কাঁচের প্লেটে সুগন্ধি বরফ সংযুক্ত দলিত খর্ম্মুজা। এ তাঁর ছেলের বৈকালী। এখনো সে কলেজ থেকে লেকচার দিয়ে ফেরেনি। ইতিমধ্যে আপন অন্তরের একটা গোপন অভিলাষ সতীশের কাছে তাঁকে এতগুলি প্রশ্ন করিয়ে ছাড়ল। ফলের খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত ওঁর আঙুল গুলির দিকে তাকিয়ে সতীশ বললে, "বেশ তো, মাসীমা! আপনাকে এত করে বলতে হবে কেন? আমার যা সাধ্য নিশ্চয়ই করব।"

আগেকার কথাটা হয়ত শোনা দরকার। কিন্তু খুব সাধারণ কথা। যা নিরানব্বুই পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আজকাল ঘটে থাকে। আজকালকার ছেলেরা যে বলা মাত্রই বিয়ে করতে চায় না, তা কে না জানে? কিরণের বেলাতেও তাই হয়েছিল। কিরণের কোনো অভাব নেই। তাঁর পৈতৃক বাড়ী এবং ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা রয়েছে। তার উপরে সে একটা ভাল কলেজে লেকচারার হয়ে ঢুকেছে। মনে একটা উচ্চ আশা ছিল, বিলেত থেকে একটা ভালমত ডিগ্রী আনবে। কিন্তু বাড়ীতে বিধবা মা সে খবর শুনে একান্ত করুণ রসের যে ঝর্ণা ছোটালেন তাকে বিপর্য্যস্ত করতে সেই যথেষ্ট, তবুও ভয় তাঁর একেবারে ঘুচল না। ভয়টা একেবারে নিশ্চিন্ত করে ঘোচাতে এখন তিনি যা নিয়ে লেগেছেন, সেটা কিরণের বিয়ে। অবশ্য বিয়ে করতে কিরণের তেমন ঘোরালো আপত্তি কিছুই ছিল না। তবু বিয়ে না-করাটা, আলস্যের আমেজের মত। শীতকালে লেপের ভাঁজের মত এমন আরামের সঙ্গ ওর মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই অভ্যাসটাকে ভাঙতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। ওর সকলের চেয়ে বড় খেয়াল এই যে, বিয়ে করার উপায় রয়েছে, যখন খুসী করতে পারি অথচ এখনো চুকিয়ে দিয়ে করে ফেলিনি—এটার ভিতরে একটা ঈষৎ উত্তেজক আনন্দ রয়েচে। যেমন ড্রয়ারে একটা পুরু খামের চিঠি রয়েছে, তা যখন খুসী বের করে পড়তে পারি অথচ করব করব করে বার করা হয়ে উঠছে না। কৌতূহলটা উত্তরোত্তর জমা হতে থাকল। এ আপত্তি তত জোরালো আপত্তি না। ও যদি বলত, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হব, বা খদ্দর পরে সিডিশাস স্পীচ দিয়ে জেলে যাব—তাহলে অবিশ্যি ওর মায়ের অশ্রুবর্ষণ করার সার্থকতা ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েরা করুণরসের বন্যা। তারা প্রস্তুত হয়েই আছে, একটু সুযোগ পেলেই অঝোরে ঝরে পড়বে। অতএব কিরণের এই সৌখীন আপত্তি ও ওর মায়ের কাছে পাহাড়ের মত ঠেক্‌ল এবং তাতে ঠেকে ওঁর মনের

অনেকখানি করুণ মেঘ যখন—তখন এক পশলা বর্ষণ করতে সুরু করল। এখন সতীশকে নিভৃতে পেয়ে তিনি যা বললেন তার মোট কথাটা এই যে—আপাততঃ একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান তাঁর হাতে আছে। আজ তাকে দেখতে যাবার কথা, কিন্তু কিরণ যেতে চাইছে না কিছুতেই; সতীশ যদি কিরণকে কোনো মতে রাজী করিয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে পারে—কন্যা পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে, না গেলে কি লজ্জার কথা! মেয়েটির রূপ আছে, একবার চারি চক্ষুর মিলন হলেই বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশ এসেছিল কিরণের কাছে একখানা বই ধার নিতে। কিরণ বাংলা বই কিনে থাকে এবং তার চেয়েও যা বেশী কথা, বাংলা বই পড়ে। সতীশ একটু আগে এসে পড়েছে, কিরণের কলেজ থেকে আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো আসেনি। মাঝখানে নীরদাসুন্দরীর এলাকায় আটক পড়ে এই সমূহ বিপদ। যা হোক ওঁকে খুব ভরসা দেওয়া গোছের একটা কথা বলে সতীশ চট করে সরে পড়ল। কিরণের ঘরে ঢুকে পাখাটা খুলে দিল।

আধ ঘণ্টা খানেক পরে, কিরণের সঙ্গে বসে সরবতে চুমুক দিতে দিতে প্রতিশ্রুতিটা সতীশের মনে পড়ল; বললে, চলই না দেখে আসা যাক। বাংলা দেশে কনে দেখতে যাওয়া তো একটা সোজা কাজ,—যা কিনা একটা পান খেয়ে ফেলার চাইতেও সোজা। কিরণের কুড়েমি আসছিল। তবু ও উঠে সাজ গোজ করে বেরুল। একজন যদি ওকে কিছু বলে, পারত-পক্ষে সেটা না-শোনা ওর পক্ষে অসম্ভব-চক্ষুলজ্জা নামে একটি ছোট্ট উপসর্গ যার মূলে রয়েছে।

কিরণ সারাটা পথ একটা নতুন পড়া বই এর কথা উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে করতে এসেছে। সে যে কনে দেখতে যাচ্ছে, এমন কথা তার স্মরণেও ছিল না; যেন দায়ে পড়ে একটা বাজে ফিল্ম দেখতে যাচ্ছে। রাত্রিতে বড় মশা লেগেছিল বলে ভালো দেখে একটা মশারি কিনতে বেরিয়েছে। কোনো অপরিচিতাকে দু চোখ মেলে দেখবে এবং হয়ত তাকে সম্ভাবিতা পরিচিতার পদের চেয়ে ও বেশি পদমর্যাদা একদিন দেবে এটা মনে হওয়ায় যে উত্তেজনা, যে বক্ষস্পন্দনের দুরু-দুরু ভাব, তা কিরণের মনের অলি গলি খুঁজলে পাওয়া যেত না। সব দোষটাই বা কিরণের আল্‌সে স্বভাবের বা ওর শিথিল অমনোযোগ—গীতার উপরে কি করে দিই? বাংলা দেশের কণে দেখা কথাটাই এখন শাক, মাছ, আলু কেনার মত হয়ে পড়েছে। যেন এই কথাটা মনে হওয়া মাত্রই কার ও মনে জোয়ার উঠবে না।

একেবারে শ্যাম বাজারে, বাড়ীটার দোর-গোড়ায় এসে পড়ে কিরণের চমক ভাঙল, তাইত কি বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে দিয়েই না তাকে এখন যেতে হবে। যাক, পালাক্রমে সমস্ত বস্তু ঠিকঠাক হল এবং পঞ্চমাঙ্কের শেষ মুহূর্ত্তে পানের রূপোর ডিবে হাতে করে আর্বিভাব হলেন মায়া দেবী। কিরণ ভাবল, কি সঙ্গতি-জ্ঞানের অভাব। আচ্ছা ধরা যাক মেয়েটি কিছু একটা উপলক্ষে আড়ালে আসবেই আমাকে দেখবে, ভাল করে দুচোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখবে, এত বড় শাদা সত্যটা মনে মনে বড় বেশি করে জানলেও মুখে স্বীকার

করতে বাধে। তাই আমি এলুম তোমাকে দেখতে নয়, না হয় পান-ই দিতে। কিন্তু একটা ভাঙা সিগ্রেটের কেসে করে পানের বদলে, খুব দামী সিগ্রেট ও তো গোটাকতক আনতে পারতে, এটা কি এরা জানে না যে, এ যুগে পান খেতে কটা ছেলেই বা পছন্দ করে?

মেয়েটি সত্যই সুন্দরী। কিন্তু কিরণের তা মনে হল না, ওর রুচি খুঁত খুঁত করতে লাগল এ আর এমন কি! ওর মনে অবিচ্ছিন্ন নদীর স্রোতের মত নারী রূপের যে একটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল প্রবহমাণ আদর্শ ছিল তাকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে, একটা ভারী পাথরের মত স্রোতের মুখে বেশ করে বাঁধ বাঁধবে— এত রূপ কি এ মেয়েটির আছে? গালের পাশে আর একটা তিল হলে যেন ভাল হত। ঠোঁটটা বড় বেশী পাতলা। গালের রঙ গোলাপী বটে, কিন্তু ম্যাজেণ্টা নয়, হয়ত আর ও কিছু আঙ্গুর এবং বেদানার রস খাওয়ালে হতেও পারে, কিন্তু উপস্থিত তো নয়। কিরণ খুব হাসল, সিগারেট খেল দু চারটে, কালোপযোগী আসর-সাজান গোছের কথাবার্ত্তা বলল, মোট কথা ও যে বর একথা ওর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না, কারণ ও মেয়েটি তার মনে ধরল না। কিন্তু সতীশের আচরণ এর বিপরীত। সে এই মেয়েকে নিজের কণে বলে দেখতে আসেনি? এসেছে বন্ধু হয়ে। সে একে নূতন দৃষ্টিতে দেখছিল। মেয়েটির সলজ্জ সুন্দর কৌমার্য্য ওর চোখে ঘোর লাগাল। গোধূলির আলোয় কিরণ যখন ডিবে খুলে একটা পান খাওয়া যা কিনা ভাবল, তখন সতীশ আপন অভিভূত চোখের অপলক দৃষ্টি দিয়ে এই মেয়েটির বাঁদিকের সিঁথিতে যে আরক্ত আভা এসে পড়েছে ওদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে, তাকে যেন মুগ্ধ সরমে ছুঁয়ে গেল।

পথে আসতে আসতে কিরণ যখন অজস্র কথায় আজকের সন্ধ্যা যাপনের হাস্যকর ব্যাপার গুলো রঙ চড়িয়ে বলাবলি করে হাসির স্রোতে ভেসে যেতে চাইল, সতীশ তাকে আমল দিল না। সে গম্ভীর হয়ে কতদূর আকাশের—সত্যি, চৌরঙ্গীর বড় বড় বাড়ীগুলোর ঘেঁসাঘেঁসি মাঝে আকাশকে কত দূরেই না মনে হয়—তারার দিকে চেয়ে রইল। যেন ওয়ালফোর্ডের এমন সুন্দর গতিশীল বাসের দোতালায় চড়ে ঝাঁকুনি খাওয়াটা বা চারিদিকের বেঞ্চে বসে কত রকম না মানুষের বিবিধ বাজে গল্প শোনাটা একটা নেহাৎই অবাস্তব জিনিস। কিরণ ভেবে পেল না, সতীশের আজ হল কি! শেষে সতীশ বাড়ী ফিরে যাওয়ার আগে, যেজন্য সে এসেছিল, সেই বইখানা নিতে ভুলে গেল।

ছুটিতে কিরণ মাকে নিয়ে বরাবরই কোথাও যায়। এবারেও তারা কলকাতায় থাকল না, দেওঘর গেল। ইতিমধ্যে মায়াদেবীর আভিভাবক বর্গ কিরণের আশা ছেড়েছেন, অথচ অভাবিতরূপে আর একটা প্রত্যাশা এসে জুটেছে। সতীশ মন্দ পাত্র নয়, কিরণের চেয়ে দুচার নম্বর কম পেলেও, সেও প্রথম শ্রেণীর মার্ক রাখে। সে অনেকটা আযাচিত হয়েই এঁদেরকে আপন অভিপ্রায় জানিয়েছে। সতীশের আবার সাধারণ পঞ্জিকার পত্রে কিছু পারিবারিক পাঁজির অনুশাসন ছিল, যেমন বৈশাখ মাসে এঁদের পরিবারে কোনো বিবাহের ফল অমঙ্গল হওয়ায় বৈশাখ মাসে বিয়ে হয় না, জৈষ্ঠ মাসে বড় ছেলের বিয়ের বাধা।

থাক যত বাধাই আসুক, সতীশ মনে জানে ওর আশার আলো একদিন সুতহিবুক লগ্নের মুখ দেখবেই। সেই মেয়েটার সাথেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এমন কি সতীশ এমনও মনে করল যে, ওর পায়ের মাপ পেলে পছন্দমত জুতো কিনে রাখে। কেমন রঙের শাড়ি সে পছন্দ করে জানতে পারলে দোকান ঘেঁটে আলনা ভর্তি করে রাখে। খস খস পছন্দ করে না চম্পক করে, গন্ধের ইঙ্গিত পেলে সেই সাবান কিনে বাথরুমের সোপকেস রাখার ব্রাকেট্ গুলো পুরিয়ে রাখে। এক কথায় মায়াদেবীর ওর ঘরে আসাই হয়ে গেছে, কেবল একদিন বাজনা বাজিয়ে ধুম করে লোককে জানানো চাই। যেন পরীক্ষা শেষ করে দেওয়া হয়ে গেছে, কেবল যা গেজেট হতে বাকী। এমনি ধরনের একটা নিশ্চিন্ত দ্বিধাহীন প্রতীক্ষার দিন কাটিয়ে সতীশের কাছে মায়া নামে সেই গোধূলি বেলায় দেখা মেয়েটি নেহাৎ ঘরের মেয়ে হয়ে উঠল। যাকে দেখে একদিন তার চোখে রঙ লেগেছিল, মনের আবেশ এসেছিল, যাকে দেখে একদিন চৌরঙ্গীর প্রকাণ্ড বাড়ীগুলোর ওপরের আকাশে যে-তারার আলো কাঁপছে সেই তারার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করেছিল, সেই দুর্লভতমা মেয়েটি নিতান্ত শাদা ও সাধারণ হয়ে এল। এখন তাকে এমন কল্পনা করা যায় যে সতীশ যে শাড়ীটি ভাল বাসে সেই শাড়িটি পরে জ্বলা উনুনের আঁচে বসে বসে সে ডিমের কচুরী ভাজছে, ওর খালি সিগারেট কেসটা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বার করে নিয়ে চুরুট ভরে রাখছে।

ইতিমধ্যে সতীশ একদিন শ্যামবাজারে গিয়ে শুনতে পেল—মানে, মায়ার সঙ্গে রোজ একবার করে দেখা না হলেও, সে রোজই একবার করে সে-বাড়ী-যেত-মায়ার কাকাবাবুর বেরি বেরির মত হয়েছে, কলকাতার শাদা চাল এবং ময়দা তাঁর বরদাস্ত হচ্ছে না, কি করা যায়? এসম্বন্ধে তিনি সতীশের পরামর্শ চাইলেন। কি আর করা যায়? এ সব চেয়ে সোজা উত্তর যা সকলেরই জানা থাকে এবং সতীশেরও ছিল তাই সে পুনরাবৃত্তি করল, "একবার জল-হাওয়াটা বদলিয়ে আসুন।" নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে এপরিবারের বহুকাল থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর দেওঘরের প্রকাণ্ড বাড়ী — কি একটা কুটির হবে, নামটা ধরে নেওয়া যাক "সর্ব্বেশ্বর কুটীর," তারই একতলাটা তিনি ছেড়ে দিতে চাইলেন আগ্রহ করে। চিঠিপত্রে কথাবার্ত্তা ঠিক হল। তারপর একদিন এঁরা চলে গেলেন। ওর কাকীমা ছেলে মানুষ এবং নিঃসঙ্গভীরু বলে মায়াকে ও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সতীশের ইচ্ছে ছিল যেতে। কিন্তু এই সময়েই ঠিক কলকাতায় তার হাজার রকম কাজ পড়ে গেল। এখন যে কলকাতা তাকে ছুটী দেবে তা মনে হল না।

নীরদাসুন্দরী এদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। সমস্ত বাড়ীতে তিনি একা। আজকাল ছেলের সঙ্গে মার প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। তার ওপরে যে-সব নবীনা-মণ্ডলী-ফুরফুরে সাজসজ্জা করে সকাল বিকেল বেড়াতে বেরোয় তাদেরও সাথে নতুন করে ভাব জমাতে এ বয়সে তিনি আর পেরে উঠেন না। মায়ার সুন্দর, প্রশান্ত প্রভা দেখে তাঁর ঘন ঘন উতলা নিঃশ্বাস পড়ল। মনে করলেন—'ছেলে, বিয়েতো সেই করবে-ই, কিন্তু এমন জিনিসটি হাত ছাড়া হয়ে অপরের হাতে পড়ল।"

এখানে মায়ার কথা একটু বলা দরকার। মায়া আজকালকার মেয়ে হয়েও তার চেয়েও বেশী আর একটু কিছু। তার শান্ত, আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্য্যের মাঝে ভারি একটা উজ্জ্বল লাবণ্য ছিল। প্রেমের মাঝে ফাল্গুন সন্ধ্যার অজস্র উচ্ছলতার মত যে মাদকতা আছে তার চেয়েও অধিক করে তাকে স্পর্শ করত ভালবাসার একটি অচঞ্চল মহিমা, যা প্রেমাস্পদকে সকল অবস্থাতেই সম্ভ্রমের সঙ্গে রক্ষা করে। তাই কিরণ যেদিন ওকে দেখতে গিয়ে যা তা বাজে বকে, হাজার রকম ফাজলামি এবং লঘুচটুল গল্প করে এসে ওকে প্রত্যাখ্যান করল সেদিন ওর মনে খুব লেগেছিল। এবং তার ওপরে সেই প্রত্যাখ্যানকে সতীশ যখন কুড়িয়ে নিতে এল তখন তার মন কষ্ট পাওয়ার চেয়েও বেশি ক্লিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু বাঙালীর মেয়ে এই সামান্য কারণে প্রথা-পথ থেকে সরে দাঁড়াবে কি করে? এতে কি যায় আসে? একজন পছন্দ না করে আর একজন এসে করবে। এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটছে, এবং যে-ব্যথা শতকরা নিরানব্বুই জন মেয়ে পরিপাক করছে, তা নিয়ে বাইরে একটা সহনাতীত দৃশ্য দেখাতে ওর বিতৃষ্ণার অবধি ছিল না, তাই মায়ার অন্তর্লোকে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, সেখানে ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান এবং তিতিক্ষার যে একটা মিশ্রিত ছায়ালোক ওর মনের গভীর ঐশ্বর্য্যের মাঝে লীলায়িত হয়ে উঠল সে কথা কেউ টের পেল না, পাবেই বা কি করে? মনের ভিতরে যাই হক, সকল ক্ষোভ ও অশান্তির উপরে যবনিকা পতন করে স্থির হয়ে থাকা মেয়েদের একটা বড় ক্ষমতা।

কিরণের এখানে একঘেয়ে লাগছে না। কলকাতার আর যাই হোক, সময় যে কাটছে না এমন কথা কখনো মনে পড়বার অবকাশ হয় না। মনটা একটু নিরিবিলি হবে, তবে তো সে একান্তে বসে ভাবতে পারে, তার কি হচ্ছে বা কি চাই, কিন্তু যুদ্ধের জায়গায় ভয়ানক আহত অঙ্গ নিয়ে ও সৈনিক যেমন মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করে যায়, গতির উত্তেজনায়, মৃত্যুর মাদকতায় তার মনে ও পড়ে না কোন অঙ্গে তার রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে, কলকাতার কিরণের অনেকটা তাই হয়েছিল। কলকাতায়, সে যে ভিতরে ভিতরে পিপাসার্ত হয়ে উঠেছে, তার মনের গহনবাসী নিঃশব্দ উপবাসে রোজ জীর্ণ হতে জীর্ণতর হতে বসেছে, কলকাতায় তার মনের যে মানুষ তারার আলোয় চুপ করে বসতে চায়, দিনরাত্রির প্রবহমাণ সঙ্গীতকে দুই কান দিয়ে শুনতে চায়, সে এমন অবসরও কোনদিন পেল না যে, বুঝতে পারে, ভিড়ের ঠেলায় ধাক্কা খেয়ে আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, চলতে চলতে, তার জীবনের দিনগুলো একটা অসার্থক শূন্যতায় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। একথাটা তার ওখানে মনে পড়বার সময় ছিল না। এবং সময় না থাকলে অনেক বড় বড় উপলব্ধি ও মনের অন্ধকার কোণটায় কোণ ঠেসা হয়ে দাঁড়ায়, অনেক ভাল ভাল বই ও শেলফের ওপর উত্তরোত্তর জমতে থাকে। দেওঘরের ওই দিকের পাহাড়গুলোর পাদদেশে, সে তার মোটর নিয়ে রোজ বিকেলে যেত। একটা বটগাছের ঘন ছায়ায় মোটরটা রেখে পাহাড়ের ওপর একটু উঠে একটা পাথরের উপর বসত। এতদিনে তার দুচোখ দর্শনীয়কে প্রাণ ভরে দেখবার সময় পেল। দুপুরের রোদ শাদা প্রখর আলো থেকে ক্রমশ একটু একটু করে স্তিমিতাভ হয়ে রঙীন হয়ে আসছে। পাহাড়ের চারিপাশের লতাগুল্ম এবং বড় বড় গাছের শ্যামলাভা

ক্রমাগত রূপ ও রেখা বদলাচ্ছে। দুপুর থেকে বিকেল হল এবং তারপর সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসরতার মাঝে ঐ গাছটার ওপরে প্রথম একটা তারা দেখা দিল জগৎ সংসারের এইসব ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনা, যা প্রতিদিনই অবলীলাক্রমে ঘটে থাকে, তারই মাঝে কিরণের মন ডুবে গেল। হৃদয় বিস্ময়ের পার পেল না।

একদিন অভ্যাসমত সে গাড়ীখানা নীচে রেখে পাহাড়ের ওপরে উঠছে। আজ তার আসতে কিছু দেরী হয়ে গেছে, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। চারিপাশের ঘন সবুজের ওপর একটা গাঢ় লাল আভা এসে পড়ছে। দুটো রঙই সমান উদ্ধত, তারা পরস্পরে মিলল, কিন্তু মিশল না। তাই এ দুটো কঠিন স্বতন্ত্র রঙের মিলন চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা সতেজ ভাব রয়েছে। যদি ও এখনই তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, সন্ধ্যার সরম-কুণ্ঠিত ধূসর অবগুণ্ঠন তারার আলোয় দীপ জ্বেলে তার একটু আবেগ উদ্ধত অভিমানের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং বনশ্রীর গাঢ় সবুজের প্রাচুর্য্য সন্ধ্যার শান্তি এবং স্তব্ধতার মাঝে, মোহময় সুখের মত একটু একটু করে আবিষ্ট হতে হতে একেবারে ডুবে যাবে। তা যাক, কিন্তু এই মিনিটের এই অপর্য্যাপ্ত সবুজ এবং অজস্র লাল আলো কিরণের বড় ভাল লাগছিল, ওঃ, কিন্তু আজ যে সে একলা হল না। সামনেই মায়ার কাকাবাবু তাঁর ছড়িটা পাশে রেখে একটা পাথরের ওপরে বসে হাঁপাচ্ছেন। কিরণের মন মুহূর্ত্তে বিষিয়ে গেল। উঃ একটা ছোট মানুষের কি ক্ষমতা! ওই বেরিবেরি আক্রান্ত, মোজা এবং ডার্ব্বি-সু পরা ভদ্রলোকটি এক নিমিষে এতবড় বিশাল পাহাড় এবং এতবড় সীমাহীন আকাশকে একেবারে সঙ্কুচিত করে দিল। যাক; হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে সে ছোটখাট একটা ভদ্রতার নমস্কার করল। মোজাপরা যেন অতিরিক্ত আহ্লাদে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভাগ্যিস কিরণের সঙ্গে দেখা, তা না হলে এই কাঠখোট্টা পাহাড়ে বসে বসে তিনি কি করতেন? মাথার ওপরের দিগন্ত-বিলীন আকাশের দিকে চেয়ে কি মানুষের সময় কাটে? তা কি ঘরের কড়ি কাঠ যে বসে বসে একটা একটা করে গুনেও কিছু সময় কাটতে পারে। না, সে আশ্বাস ও নেই। কাজেই কিরণ এখন ওঁর কাছে অমূল্য হয়ে দেখা দিল। সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ''আরে মশাই, বেরিবেরির জ্বালাতে গেলাম। কিনা করেছি? চালের ভুসো খেয়েছি, তরকারির খোসা চিবিয়েছি, কাঁচা টমেটো আর কাঁচা ডিমের দুবেলা করে শ্রাদ্ধ করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। বুঝলেন না, বেরিবেরি যাকে একবার ধরেছে তার আর নিস্কৃতি নেই। এই দেখুন না, দুপা উঠেই হাঁপাচ্ছি। তবু বাড়ীর মেয়েদের সখ— আসতেই হল।''

কিরণ তার পাশে বসল। কিছুক্ষণ একথা সে কথার পর — মানে, কলকাতার আলুর চেয়ে এখানকার আলুর দর কত সুবিধে, এবং গরম সত্ত্বেও বেরিবেরির দরুণ তাঁর পায়ের শোচনীয় অবস্থার জন্য কেনই বা তাঁকে মোজা পরতে হয়েছে—এই ধরণের আলোচনা কিছুকাল চলার পরে হঠাৎ তিনি বললেন, ''দয়া করে একটা কাজ যদি করেন, শুনেছি ত্রিকূট পাহাড়ে সন্ন্যাসীরা আস্তানা নিয়ে কোথাও কুটীর বেঁধেছেন এবং তাদের গৃহপালিত গোরুগুলি বিশেষ দুর্বিনীত। সঙ্গে মেয়েরা একলাই ওপরে উঠছেন, কারণ আমার ক্ষমতায়

কুলোল না—যদি তাদের অনুসরণ করেন। অন্ততঃ গোরুতে তাড়া করলে তাঁরা যেন হিল-উঁচু জুতো সুদ্ধ পাহাড় থেকে পড়ে না যান।"

কিরণ মনে মনে হেসে ভাবল—"মন্দ ভার নয়।' মুখে বলল, "কিন্তু তাঁরা আমাকে চেনেন না, তাঁদের অনুসরণ করলে হয়ত তাঁদের বেড়ানোটাই মাটি হবে।"

"সে সন্দেহ করছেন না কি? হাঃ হাঃ, কিন্তু অপরিচিতই বা কিসের? আপনার বিশেষ বন্ধু সতীশের সঙ্গে মায়ার যখন ওমাসে বিয়ে হবে, তখন কি আপনি বন্ধুর স্ত্রীকে অপরিচিতা মনে করবেন?" যাক, কিরণ এঁর ব্যগ্রতা দেখে পাহাড়ে উঠতে সুরু করল। কিছু দূরে অস্পষ্ট প্রায় নারীমূর্ত্তি দেখা গেল। কিরণ প্রথমটা ঠাহর করতে পারেনি। আর ও কিছু দূর চড়ে দেখে, তাঁদের সঙ্গে তার দূরত্বটা কমে যাচ্ছে, তবে কি ওঁরা চলছেন না? গোরুর উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে নাকি? না শ্রান্তি? কাছে গিয়ে সে দেখে—এ দুটোর একটাও না, তবে এর চেয়েও গুরুতর আর একটা তৃতীয় কারণ। একটি মেয়ের পায়ে পাথরের কুঁচি ফুটে বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে এবং আর একজন ব্যাকুল হয়ে, আর কিছু না করতে পেরে কেবল আঙ্গুল দিয়ে তার ক্ষত মুখের প্রবল রক্ত উৎসারণের মুখটা চেপে রয়েছে। মেয়েটি কে?—যার মাথার কাপড় নেই আর পায়ের নিরতিশয় যাতনা সত্ত্বেও মুখে একটি অটল শান্তি—কেবল অত্যন্ত ব্যথা সহ্য করার ক্লেশে মুখে একটা প্রবল শোণিতাভা গাঢ় ছায়া ফেলে মুখখানা লাল টুকটুকে করে তুলেছে। এতো সেই মায়া যাকে একদিন সে বিকালবেলায় দেখতে গিয়ে পছন্দ করেনি। হ্যাঁ করেনি বটে। কিন্তু সে দোষ কি তার? অত বিশ্রী অস্বাভাবিক 'ব্যাকগ্রাউণ্ডে' রেখে আঁকলে অনেক বড় বড় চিত্রকরের ছবি ও তো আমল পেত না। যদি এই মেয়েটিকে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রকৃতির একক আবেষ্টনের মাঝে রেখে দেখা যেত; যদি তাকে ভাল করে পরখ্ করতেই হবে এই ভাবটা মনকে নিরন্তর খোঁচা দিয়ে দিয়ে তার দেহের রূপকে টুকরো টুকরো করে তার মুখের লাবণ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিকে অত্যুগ্র করে না তুলত, তাহলে কি সে এই মেয়েটিকে কেবল এই মেয়েটি বলে নিত না? তা হলে কি তার মনে হত না যে, এই মেয়েটি সমস্ত জগৎ এবং জগৎকে ছাড়িয়ে ও তারাভরা কোটি কোটি জগতের মাঝে একাকী এবং অদ্বিতীয়? তার গালের পাশে একটি ছোট তিলের অভাব থাকলেও সে অভাবটা তখন মনে পড়ার অবসর পাবে না। অপার বিস্ময়ে, আমি যাকে দেখলাম তাকে ঠিক তেমনি করে দেখতে দ্বিতীয় বার কেউ পারবে না। কিন্তু এই সব কথা মনে ওঠা এবং সে রসে মনকে সিক্ত করে নেওয়ার চেয়েও জরুরী, মেয়েটির রক্ত ক্ষরণ কোন উপায়ে বন্ধ করা।

মায়ার কাকীমা বললেন, "হিল উঁচু জুতোয় অসুবিধে হওয়ায় সেইটে খুলে খালি পায়ে হাঁটতে যেতেই এই ব্যাপার ঘটেছে।"

মায়ার কাকীমা বৃথা সঙ্কোচ না করে বললেন, "ভাগ্যিস আপনি এসেছেন। আপনি এর পায়ের কাটাটা হাত দিয়ে চেপে থেকে ততক্ষণ বন্ধ করে রাখুন, আমি একটা সহজ ওষুধ জানি, তার উপায় দেখি,"

কিরণ হাঁটু পেতে বসল, এবং ওর দৃঢ় বলিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে মায়ার পায়ের আহত স্থানটা ধরে রইল। মায়া চোখ তুলে তাকাল। কিরণের ওপর অভিমান তার আজও যায়নি। যার ওপর এত অভিমান, তাকে দিয়ে পায়ে হাত দেওয়াতে হল—এ লজ্জার পার কোথায়? কিন্তু সে কিছু বলল না, বা অনর্থক ব্রীড়া সঙ্কুচিতা হয়ে পা নিয়ে টানাটানি করল না। অভিমানকে যদি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে হয়, নিঃশব্দ উপেক্ষা দিয়েই সে তা দেবে, এরচেয়ে শক্তিশালী তীর আর নেই। মায়ার কাকীমা জঙ্গল থেকে গাঁদাগাছের কিছু কচি পাতা নিয়ে এসে একটা পাথর দিয়ে তা ছেঁচে ওর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। খানিকটা বিশ্রাম করে ওদের দুজনের সাহায্যে মায়া নীচে নেমে এল।

ওরা চলে যাওয়ার পরে ও অনেকক্ষণ অবধি কিরণ নীচে নেমে ঘাসের ওপর বসে রইল। মায়াকে আজ তার ভাল লেগেছে এবং তার চেয়ে ও বেশি ওকে দেখে তার দুচোখে বিস্ময়ের ঘোর লেগেছে। যাকে দুচোখে মানুষ বিস্ময় নিয়ে দেখে তাকে যে কত গভীর করে দেখে তা বলে শেষ করা যায় না। কিরণ আজ মায়াকে আপন ভাবী বধূ বলে দেখেনি, আজ দেখেছে সেই মায়াকে, যে মায়া একটি মুহূর্ত্ত ওর জীবনকে একটা বিন্দুতে ছুঁয়ে অগাধ শূন্যে মিশিয়ে যাবে; যে আবার তারই হতে পারত, কিন্তু যে এখন একটি নিমিষ আপন বেদনার্ত্ত দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন ভাবেই কোন দিন তার এক চুল ও আপন হতে পারবে না। এই সুন্দরতা এবং অপ্রাপ্যতার মাদকতা ওকে কি রকম যেন করে তুলল। মনে মনে ভাবল, আমরা নব বধূকে দেখতে যাওয়ার নাম করে তাকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু যেমন করে দেখলে তাকে পাব সে-দেখা দৃষ্টিতে সঞ্চার করে নিতে পারে কে? তা কি ফরমায়েস দিয়ে করা যায়? এরপর বাড়ীতে এসে তার দিন রাত্রিগুলো অন্যভাবে কাটল, খুব একটা হতাশায় ক্ষোভ, তা নয়। তবু একটা নতুন সুর মাঝে মাঝে শোনা যায়। বসে ভাবতে ইচ্ছে করে, একটি মেয়ে কেমন আছে এখন? তার শোয়ার ঘরের দাঁড়ান আয়নাটার সামনে বসে রাত্রিতে শোবার আগে সে দীর্ঘ চুলগুলি কি করে ফিতে দিয়ে আটকে রাখে। হয়ত ফিতেটা একহাতে এবং চুলগুলি অন্য হাতে ধরে ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে না, তাই ঠোঁটের আড়ালে ঝক ঝকে দাঁতগুলির একটু ঝলক দেখা যায়, হয়ত দাঁত দিয়ে কালো ফিতেটা সে চেপে ধরেছে। হয়ত বিকেল বেলায় বেড়াতে যাবে বলে আলমারীর পাল্লাটা খুলে রেখে শাড়ীর পাড় বাছতে বাছতে বাইরের রোদে ভরা নীল আকাশের দিকে চেয়ে গুণ গুণ করে একটা গানের একটা লাইন গেয়ে ওঠে, হয়ত চাবির রিং এর গোছাটা ভুলে কোন কাপড়ের তলায় রেখে দেয়, তারপর খেয়াল হলে গান থেমে যায়। উৎসুক, প্রত্যাশিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে খুঁজে দেখে।

মায়া কেমন আছে, সে খবরটা অবিশ্যি মায়ার কাছে অনায়াসেই নেওয়া যায়। কিন্তু তা নিতে ওর গরজ নেই। কল্পনায় সে যে মেয়েটির অনুসরণ করে, মা কি তাকে দেখেছে? এবং নীরদাও এ সব কিছু খবর ওকে দিতে উৎসুক নন। ছেলের ওপর একটা খুব হাল্কা নয় ক্ষোভ এখন তাঁর মনে রয়েছে। তাছাড়া মায়াকে যত দেখছেন, যত কাছে পাচ্ছেন, তাঁর এই ক্ষোভ ততই বেড়ে চলেছে। মায়া বেশি কথা বলে না। প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব

দেওয়া ছাড়া সে প্রায়ই চুপ করে থাকে। এখানে আসাটা ওর পক্ষে কষ্ট কর হয়েছে, বিশেষ করে সেই ব্যাপারের পর, আবার এসে কিরণ ও তার মার সঙ্গে একবাড়ীতে থাকাটা যেন ওর আহত স্থানে আবার আঘাত দিচ্ছে। সতীশকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে না—যার ওপর প্রবল অভিমান রয়েছে তাকে এ সময়ে অভিমানকে ভাসিয়ে দিয়ে বোধ করি গভীর ভালবাসা যায়। কারণ, অভিমানটা ভালবাসারই ওপিঠ। কিন্তু একজন যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর একজন সেই মুহূর্তে যদি সেই পরিত্যক্তা নারীর প্রসাদ প্রার্থী হয়ে আসে তবে তাকে সেই মেয়ে কি করে নেবে? তাকে আপন আহত হৃদয়ের আচ্ছাদন করে নেবে, তাকে নিজের অভিমানের ইন্ধন বলে নেবে, কিন্তু তাকে সত্যই তারই মূল্যে নেওয়া মানে তাকে শ্রদ্ধাহীন আত্মবঞ্চনায় না নিয়ে শ্রদ্ধার আসনে নেওয়া— এ কি সে পারবে? বোধ করি পারবে না। অন্তত মায়া তা পারে নি। তার ওপর সেদিন পাহাড়ে ওর অসহায় আহত অঙ্গে কিরণ যখন হাত ছোঁয়াল, নতনেত্রে ওর রক্তাক্ত পায়ের তলায় জানু পেতে বসে আপন বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ওর রক্ত থামাবার চেষ্টা করল, তখন মায়া ভেবে পেল না অভিমান কি করে এত মিষ্টি হয়? যে অপমানীতা নারী নানা উপায়ে নানা ইন্ধন দিয়ে আপন অভিমানকে প্রবলতর করতে দীর্ঘ সাধনা করেছে, কেন তার সকল শুষ্কতা ছাপিয়ে, এমনি মধুর অভিমান মাধুর্য্যে রসে সমস্ত মনকে কানায় কানায় ভরে তুলল। এ অভিমান থেকে মুক্তি চায় কে? মায়া কি চায়? সে যে অভিমানকে দুর্গ প্রাচীরের মত কেবলই দুর্ভেদ্য করতে চেয়েছে, সে এই? তাই যদি হয় তবে এ অভিমানের আবেশময় মধুরতা থেকে তাকে বাঁচাবে কে? এতদিন ধরে সে কি এরই জন্য সাধনা করেছে? রাত্রিবেলায় নিজের বিছানায় শুয়ে সে বালিশে মুখ রেখে মিষ্টি করে ছোট্ট করে আস্তে আস্তে বলে, "তুমি তো আমাকে নিলে না, তুমি তো আমাকে চাওনি, আমি তোমার মনের মতন নই। কিন্তু তবু তুমি আমার কষ্ট সহ্য করতে পারলে না কেন? কেন সেদিন আমার পাদস্পর্শ করে আমার ক্লেশ কমাতে গিয়েছিলে?" তার ভিতর কার তীক্ষ্ণধী মেয়েটি বলে, "এ আর বুঝতে পার না? এত ভদ্রতার একটা অঙ্গ। কেউ অসহায় অবস্থায় অস্থানে বিপদে পড়লে শিক্ষিত ভদ্রলোক পেছপা হবে কেন?" কিন্তু অভিমানিনী মেয়েটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে সম্মান দেয় না। তার কেমন করে কি জানি কেবলই মনে হতে থাকে, "তুমি আমাকে নিলে না, কিন্তু তবু তুমি আমার ক্লেশ ও সহ্য করতে পার না।" সতীশ একটা না একটা কাজের ফেরে পড়ে কলকাতায় ঘূর্ণিপাক খাচ্ছিল, তার একটা চাকরী হবার কথা ছিল। মানে সে গত বছর ডাক্তারী পাশ করে এধার ওধার ছোট ছোট কাজ নিলেও, একটা ভাল মত চাকরীব চেষ্টায় লেগে ছিল। কলকাতায় ডাক্তারী করার ইচ্ছা ও ছিল না, ধৈর্য্যও ছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারী বিভাগে গোটা কতক পদ খালি হওয়ায় সুপারিশের জোরে সে চাকরী পেল। চাকরী পেয়ে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তার মনের দু একটা ধারাও বদলাতে সুরু করল। মনটা খালি লোভী-ছেলের মত খুঁৎ খুঁৎ করে। কেনই বা সে তাড়াতাড়ি করে মায়ার সঙ্গে বিয়েটা পাকা করে ফেলল? কিরণের চেয়ে সে কোন অংশে কম? কিরণ যে মেয়েকে 'কিছু না' বলে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সেধে ঘরে বয়ে আনতে তার

এত কি গরজ ছিল? সতীশের আত্মসম্মানে একটা হুল ফুটতে লাগল। যেন কিরণের পুরানো, পরিত্যক্ত চটিটাকে অর্দ্ধেক দামে পুরান জুতোর দোকান থেকে কিনতে গেছে। মায়াকে কিরণ নিজের স্ত্রী বলে পছন্দ করতে গিয়ে যদি ফিরে না আসত, তাহলে হয়তো সতীশের মনের এই খোঁচাটা ওঠবারই অবকাশ পেত না। কিরণের না পছন্দ হওয়া একটি মেয়ে বলে মনের কাছে মায়া এসে দাঁড়াল। তাছাড়া এক চৈত্র সন্ধ্যায় যে মেয়েকে সে আরক্ত অপরূপ লজ্জায়, বন্ধুর অদূর ভবিষ্যতের স্ত্রী বলে দেখেছিল, যার চারিদিকে দুরতি ক্রমণীয় আলোক মণ্ডল ছিল, যে আলোর ধাঁধায় তার চোখে রঙ লেগেছিল, সে তো এখন মিলিয়ে গেছে ম্লান হয়ে, কবে কোন কালে, মায়া তো এখন তার পাকাপাকি কথা দেওয়া বিয়ের বধূ। তার কল্পনা মণ্ডলের জ্যোতিরুৎসবে তারার দল সব এক এক করে নিবে গেছে, এখন আছে কেবল ভোর হয়ে আসার নিঃসঙ্গ পাণ্ডুরতা, সে যে একজনের অনাদৃতা নারী, তারই নিষ্প্রভ আভা, হ্যাঁ, সতীশের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিল। তাছাড়া কাল বাগবাজারে দিদিমার বাড়ী গিয়েছিল; তিনি হাসি তামাসা করে একটি মেয়েকে সেই চিরন্তন পান আনার ছল করে কাছে ডেকে নিয়ে এলেন তার সামনেই। মেয়েটি অবিশ্যি মায়ার চেয়ে ভাল দেখতে কি খারাপ দেখতে অত তুলনা মূলক সমালোচনা সে করবার অবকাশ পায়নি। কিন্তু দিদিমার কাছে কথা প্রসঙ্গে শোনা গিয়েছিল, মেয়েটির বাবা কলকাতার পশারওয়ালা খুব বড় একজন ডাক্তার, মেয়ের বিয়েতে টাকা ঢালতে কার্পণ্য করবেন না। মায়ার যেমন বাপ নেই, কাকা-জ্যেঠার পরে ভার, তেমন নয়। এই কথাটা কদিন ধরেই তার মনে খোঁচা দিচ্ছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে মনে করল, কাজে যোগ দেবার আগে একবার দেওঘর ঘুরে আসা যাক। একা একা থেকে তার মনের খেদটা উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলেছে।

তাই এক সকালে সতীশ কিরণদের বাড়ীতে এসে হাজির। এবারে নীরদাসুন্দরী সঙ্গে তার জমল না। নীরদার ব্যবহারে এবারে একটা প্রচ্ছন্ন কাঠিন্য, তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, যদি তিনি সেদিন সতীশকে অত করে কিরণের কণে দেখতে যাওয়ার অনুরোধ না করতেন তা হলে বোধ করি তাঁকে মায়াকে হারাতে হত না; যদি তিনি অত ব্যস্ত না হতেন, যদি আর ও অপেক্ষা করতেন; কিরণকে তাড়া দিয়ে, শ্যামবাজারের বৈঠকখানা ঘরে পানের ডিবে হাতে মোতি-মুক্তা আর বেণারসী দিয়ে সাজানো মায়াকে দেখতে না পাঠাতেন। দেওঘরের সেই অস্তসূর্য্যের আভাময় পাহাড়ে নারীর বেদনা হত, শান্ত অটল স্থৈর্য্যের মাঝে রক্তসিক্ত পাদস্পর্শ করে মায়াকে দেখতে দিতেন তাকে, প্রথমেই—তা হলে কিরণ কি বলত বলা যায় না।

কিন্তু সতীশ কথাটা বুঝতে পেরে এবং নীরদার নীরব উপেক্ষায় আহত হয়ে মনে মনে আর ও রেগে গেল। এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার পরে চোট পাট শুরু করল। মায়ার এমন কি দাম আছে যে, তার জন্য বন্ধু বিচ্ছেদ! বন্ধুর এমন মা, বলতে গেলে তার আপন মায়ের মত, তাঁর সঙ্গে মনান্তর, ব্যাপারটা কোনো ক্রমেই কি সোজা করা যায় না?

পরের দিন বিকেলে সতীশ ও কিরণ পাহাড়ে বেড়াতে গেল। সতীশের ভাবটা কিছু

উন্মনা, কি একটা কথা যেন বলি বলি করেও বলতে বাধছে। শেষে জিজ্ঞেস করল, "তারপর, কেমন লাগছে জায়গাটা? নীচের তলায় ওদের সঙ্গে কেমন ভাব হল?"

কিরণ মনে করল সতীশের কি ঈর্যা হয়েছে নাকি? তাই তাড়াতাড়ি দেওঘরে ছুটে এল, এবং তাই এমন আভাময় আকাশ, এমন বনের দৃশ্য, এখানে এসেই ঐ প্রশ্ন।

সে বলল, "আলাপ তো ভাল করে একদিন হবেই এবং সেদিন বোধ করি প্রতিদিন এগিয়েই আসছে। কাজেই আগে থেকে আর বেশি চেষ্টা করিনি।"

সতীশ আমল পেল না, মায়া যে এই সামনের মাসেই তার স্ত্রী হয়ে কিরণের বন্ধুপত্নী হবে, এবং তখন ভাল করেই আলাপ করবে, এই কথাটার আবৃত্তি করে সে যে কথা ভুলে থাকতে চায়, কিরণ সেই কথাটার ওপরেই বেশি জোর দিল। কেন কিরণ বার বার এই কথা মনে করিয়ে দেয়? ওর মনের অস্থির চাঞ্চল্য ওকে চুপ করে থাকতে দিল না, আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কিরণ, মায়া কি দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয়? তোমার পছন্দ হল না কেন?"

এবারে কিরণেব হাসি পেল, বলল, "মায়া সুন্দরী নয় একথা কে বলেছে? ভয় নেই হে, তোমার বাসররাত্রিতে আমন্ত্রিত হয়ে তোমার স্ত্রীর রূপের প্রশংসায় আমি এমনি মুখর হয়ে উঠব যে, বলবে, না জানি মুখর এখনি রটাবে আরো কি স্তুতির কথা?"

সতীশ অসংবরনীয় হয়ে উঠল, কিরণের আজ হয়েছে কি? সে কি মিষ্টি কথায় তাকে আপমান সুরু করল? যে মেয়েকে সে নিজে নিতে পারল না, তাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে এখন স্তুতির ফন্দি আঁটছে। মরীয়া হয়ে বলে ফেলল, "আমি সে মনে করে বলিনি; যে মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারলে না, যাকে নিজের স্ত্রী মনে করতে তোমার পেল হাসি, এখন বন্ধুর স্ত্রী মনে করে তার সম্বন্ধে যত খুসী মুখর হতে পার। কি আশ্চর্য্য তুমি। আর কি অদ্ভুত ব্যবহার তোমার!"

কিরণ এবার গম্ভীর হয়ে বলল, "কি বলছ তুমি, মায়াকে আমি পছন্দ করেছি বা অপছন্দ করেছি তাতে কি যায় আসে?"

"বিশেষ যায় আসে। আমি যে মায়াকে বিয়ে করবই, এই কথাটা কি আমার গায়ে লেখা আছে? পাকা কথা হয়েছে? তাতে আমার কি যায় আসে? তখন একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে এবং তাঁর অভিভাবকদের তোমার মত নিষ্ঠুরের নিদারুণ প্রত্যাখ্যান থেকে বাঁচাতে আমি যদি একটা কথা বলেই থাকি, তাতেই কি ধরে নিতে হবে যে, আমি সে মেয়েকে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠেছি? আমি মায়াকে বিয়ে করব না, করব না, করব না,— সোজা কথা বলে দিলুম।"

তাদের অনতিদূরে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং তার ভিতর থেকে কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে মায়া নামল। তার পায়ের ক্ষতটা সেরেছে বটে, কিন্তু পাছে কোনক্রমে সেপ্টিক হবার ভয় থাকে বলে ডাক্তারের পরামর্শ মত এখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এই কদিন অভিমানিণী মায়া আপন অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাল ছেড়ে দিয়েছে; এই মিষ্টি অভিমানের সঙ্গে তার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। বাইরের জীবনকে তার স্থান ছেড়ে দিয়েও

মনের নিভৃত একটি প্রচ্ছন্ন কোণে সে এই অভিমানকে আশ্রয় দিয়েছে। তার ধ্যানের জীবন এই কদিনেই প্রশান্ত নিমীলিত একটি ছায়া তার মুখে ফেলেছে। সে আভায় তার অভিমানী-মুখ একটি আপন রূপ পেয়েছে। তাছাড়া পায়ের আঘাতের পর ওর একটু সেপ্টিক জ্বরের মত হয়েছিল, জ্বর ভোগের পর ও আরো একটু রোগা হয়ে গেছে। দুর্ব্বল নারীদেহ যেন নারীর কোন কোন রূপকে আরও ফুটিয়ে তোলে—বিশেষ করে অভিমানের রূপ। তাই গাড়ী থেকে মায়াকে যখন নামতে দেখল, তখন ওর কৃশ, ম্লান, এক অপরূপ আভায় দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে কিরণ আর্ত্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "সতীশ, এ কথাটার মানে কি জান? একবার ওঁকে আমি প্রত্যাখান করেছি। তারপর আবার যদি তুমি ওঁকে প্রত্যাখান কর, সেটা কতদূর অমানুষিক ব্বর্বরতা বলতে পার কি?"

সতীশ কঠিন স্বরে বলল, "এখন তা বলবে বই কি। ভেবে দেখ তো তুমি নিজে যখন ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিলে তখন তোমার নিজের বিবেককে কি বলেছিলে। আমার মত করে তিরস্কার করেছিলে কি?"

"হয়ত তখন কিছুই করিনি, করা দরকার বলে মনে করিনি। কারণ, তখন ওর জীবন সম্বন্ধে আমার কোন অন্তঃদৃষ্টি ছিল না, কিন্তু আজ করব, কারণ হঠাৎ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "কারণ ওকে এখন আমি ভালবাসি।" সতীশ অবাক হয়ে চেয়ে রইল, বলল, "ওঃ! তবে তো আর কথাই নেই। তবে একথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন? কাল ভোরের ট্রেনে আমি চলে যাব কলকাতা, যাবার আগে মায়ার কাকাকে জানিয়ে দিয়ে যাব কথাটা যে এ বিয়ের বর বদল হয়ে গেছে।"

পরের দিন সতীশ পাঞ্জাব মেলের কামরায় বসে বসে ভাবছিল কাজটা কি বোকার মত হল? কিন্তু কিরণকে কি বলতে হয়। লোকটা বন্ধুত্বের আবরণে কি ভয়ঙ্কর সব জিনিস চাপা দিয়ে রেখেছে। বন্ধু কলকাতার কাজে ব্যস্ত; আর ইনি দিব্যি বসে ভাবী বন্ধু পত্নীর সঙ্গে প্রেম জমাচ্ছেন। থাক আর কিরণকে আমল দেবো না। এমন কি ওর সঙ্গে আর মেশামেশি ও করা চলবে না। হয়ত কোনদিন আব্দার করে বসবে যে, 'সতীশ, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, আমারটির সঙ্গে তো তোমার জানা শোনা আছেই।' আর মায়াকেই বা কি বলতে হয়। মেয়ে মানুষের এত অধঃপতন আমরা হিন্দুবাড়ীর ছেলে আমাদের মনে বাজে—যাক গে। এসব বাজে কথা। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কিন্তু হল কি ভাল? একটা খোঁচা থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সতীশ তার একটার মধ্যেই বা পড়ে, বোধ করি ওটা ওর খুঁৎ খুঁতে স্বভাবের দোষ।

কিরণ প্রথম বুঝতেই পারেনি, এত সহসা সতীশ এসে কি করে গেল। ও যে ক্ষেত্র থেকে সরে গেল তা কাল রাত্রে ওর টাইমটেবিল নিয়ে অতিব্যস্ততা দেখেই বোঝা গেছে। কিন্তু তখনো সমস্ত জিনিষটার চেহারা তার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠেনি। অনেক রাত্রিতে, সামনের খোলা মাঠটা থেকে পাইচারী করে করে শ্রান্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরছে এমন সময় নীচের তলা থেকে বেরি বেরি আক্রান্ত ভদ্রলোকটি ডাকলেন, "একবার শুনুন।" গিয়ে

বসতে তিনি বড় রকম উদগত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করে বললেন, "আপনারা আজকাল কার ছেলে তাও জানি এবং আপনারা সভ্যতার উন্নততর যুগের তরুণ একথাও অস্বীকার করব না। কিন্তু এইগুলো কি খুব ভাল কাজ?"

এই বড় দীর্ঘ ভূমিকাটা যে কেন, তা আন্দাজ করতে পেরে কিরণ 'নার্ভাস' হয়ে উঠল। কাকা মশাই বলে চললেন, "মায়াকে একবার আপনি ঘটা করে দেখতে গিয়ে পছন্দ করলেন না। তারপর আপনার বন্ধুর সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়ে যাবার পরে আমরা যখন কেবল বসে আছি কবে স্যাকরা গহণা দিয়ে যাবে বলে, তখন তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বিয়ে করতে পারবেন না।"

কিরণ বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না, যা হওয়া উচিত তা ভগবান ঘটাবেনই। আমি মাকে জানিয়ে সব ঠিক করে দেবো।" বলেই কোন ক্রমে সে পালিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বুঝতে পারল সতীশ বিয়ের বর বদল হওয়ার কথাটা জানায়নি। বোধ করি ক্রোধ বশতঃ জানিয়েছে কেবল, যে সে এ বিয়ে করবে না। সতীশটা যে কি, তা সে বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারল না আজকে এই মিনিট অবধি। কাকা মশাই মনে করলেন তাঁকে একটা মোটা রকম ভগবানের আশ্বাস দিয়ে কিরণ বোকা বুঝিয়ে চলে গেল। রাগের চোটে তাঁর বেরিবেরিকে ও বুঝি বা নিমিষের জন্য ভুলে গেলেন।

রাত্রিতে নানা ভাবনায় কিরণের ভাল করে ঘুম হল না। ভাবনায় ঘুম হয়নি কি? না, তার সমস্ত মন ছাপিয়ে এমন একটা মধুরতার স্রোত বইছিল যে, এত ভাল মনের অবস্থায় মানুষের ঘুম আসে না। কেবলই ওর মনে পড়ে, মায়া আজ রাত্রে কি কষ্ট পেয়েছে, কারণ, কাকা মশাই যখন কিরণকে ডেকে কথা কইছিলেন তখন সে দ্বারের আড়ালে শাড়ীর খসখস শুনেছিল এবং চলে যেতে যেতে নিমিষের জন্য ব্যাণ্ডেজে আবদ্ধ মায়ার পদপ্রান্ত দেখতে পেয়েছিল। কাজেই, ও কথাটা শুনেছে বই কি; এবং ওর মত তেজস্বী মেয়ের পক্ষে একথাটা কত ক্লেশকর তা ও সে বুঝতে পারে। তাই যতবার ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়, ব্যথার বেদনায় অথচ একটা গভীর আনন্দের উদ্বেলতায় ওর সমস্ত মন ভরে অধীর হয়ে ওঠে। যেন ওর যা কিছু মনের কথা তা আর একজনের মাঝে বিলীন হয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু পারছে না কেন? আর একটা সন্দেহ ও থেকে থেকে ওর মনে উঁকি মারছে। সতীশকে কি মায়া চায়? তা যদি চায় তাহলে এ চাওয়া মেটাবার কোন সম্বল তার হাতে নেই। রাত্রি বেলায় কিছুতেই ঘুম এল না বলে ভোরের দিকে বিছানায় পড়ে থাকতেও আর তার ভাল লাগল না। তখনো অন্ধকার রয়েছে। বিছানা থেকে উঠে ও ওদের পিছনের দিককার বাগানে বাঁধান চাঁপাগাছের তলায় বসতে গেল। কিন্তু এত ভোরেও সেখানে মায়া বসে রয়েছে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে অন্যমনস্ক হয়ে। তার পীড়িত নারী-প্রকৃতির সমস্ত পুঞ্জীভূত বৈরাগ্য তার মুখে। প্রথমটায় সে কিরণের আসা টের ও পেল না। যখন পেল তখন খুব একটা আড়ম্বর করে উঠে যাওয়া বা সঙ্কোচে মরে যাচ্ছে এমন ভাব কিছুই দেখাল না। নিঃশব্দে উঠে চলে যাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে কিরণের কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। এর দিকে চেয়ে কেউ কি কিছু

বলতে পারে? মনে পড়ল তার শ্যামবাজারে যাওয়ার কথা। তার লীলাচপল হাস্যচটুলতা মনে পড়ল। তারপর দেখল সেই মাত্র বিনিদ্র শয্যা থেকে উঠে আসা, বহু ক্লেশের পব শান্ত বৈরাগ্য বেদনাচ্ছন্ন নারীর দৃষ্টি। মায়া ভিতরে চলে যাচ্ছিল। কিরণ অনেকটা আপন অজ্ঞাতেই অস্ফুট স্বরে বলল, "তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?" বলতে বলতে তার কি যে হল, কাছে গিয়ে মায়ার হাত দুটি আপন হাতে নিযে ছেলেমানুষের মত আব্দারের স্বরে বলল, "মায়া, তোমাকে প্রথম যেদিন দেখতে গেলুম আমাকে দেখা দিলে না কেন?" মায়া সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখের বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে চাইল।

"হ্যাঁ জানি, তুমি আমার সামনে বেরিয়েছিলে যখন তোমার কাকা বললেন, "মা লক্ষী পান নিয়ে এস তো।' তখন তুমি সত্যিকারের লক্ষী মেয়ের মত ঝকঝকে, পানের ডিবে হাতে করে আমার সামনে বেরুলে। কিন্তু সে তো আদেশ পালন। সে কি আমাকে দেখা দেওয়া? বলতো? তখনই যদি দেখা দিতে তা হলে কি আমি তোমাকে এত কষ্ট পেতে দিতুম? তোমার কষ্ট যে আমার ও কষ্ট তা কি এখনো জান না? তোমার আদেশ পালনে ব্যস্ত লক্ষী মেয়েটির বদলে, তোমার মধ্যের অভিমানিনী মেয়েটিকে তখন কেন আমাকে দু-চোখ ভরে দেখতে দিলে না?"

মায়ার চোখে জলের আভাস। বরফের মত, গাঢ় অন্যমনস্ক বৈরাগ্যের ছায়া সে মুখে আর নেই।

'উদযন'—১৩৪০

পরিণীতা

শ্রীনিখিলবালা সেনগুপ্তা

১

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, রন্ধনগৃহে বসিয়া মাধুরী-কচুরী ভাজিতেছে। এ বাড়ীতে চায়ের কারবার নাই। বাড়ীর কাহারও যে চায়ে রুচি নাই, একথা বলা চলে না। তবে মুখ ফুটিয়া কাহারও সে রুচি ব্যক্ত করিবার সাহস নাই।

মাত্র কয়েকখানা কচুরীভাজা শেষ হইয়াছে, এমন সময় বিমল আসিয়া দরজায় হাতখানা রাখিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী মাথার কাপড়টা একটু ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, "এসো ভাই, এখানে বসেই খাবে কি? খাওনা, আমি গরম গরম ভেজে দিই।"

বিমল ধীরপদে অগ্রসর হইল, মাধুরী দেবরকে একখানি পিঁড়ি পাতিয়া দিল এবং একখানা রেকাবে গরম গরম কচুরী ভাজিয়া দিতে লাগিল। বিমল ও বিনা বাক্যব্যয়ে আহারে মন দিল।

মাধুরী বলিল, "কি ঠাকুরপো, মুখখানা অমন ভার যে? নতুন বিয়ে করেছ, স্ফুর্ত্তি করবে। দুদিন পরেত বিদেশ চলে যাবে, তখন ও বেচারী কি স্মৃতি নিয়ে থাকবে? একটু হাস্যরস, একটু—"

বাধা দিয়া বিমল বলিল,—" আচ্ছা, যে বৌ-ই তোমরা এনে দিয়েছ! ছোট একটি পুতুল, ওদিয়ে আলমারী সাজান চলে, আমার কি হবে? জীবনের বসন্ত সে ব্যর্থই হয়ে যাবে, তার আগমনী গাইবার কেউ নেই।"

"তা তোমাদের এঘরে ঐ নবছরের মেয়েটি এসেছে বলেই না ঘরে ঢুকতে পেরেছে। আমার মত ১৫/১৬ বছরের ধাড়ী মেয়ে যদি হত, তবে কি আর তোমরা সহজে ঘরে আনতে? মনে নেই তোমার? তোমার ভাই যখন আমায় বিয়ে করলেন, তখন থেকেই ৪/৫ বছর ত আর ওঁর এ বাড়ীতে পা দেবার অধিকার ছিল না। অপরাধ, আমি ম্লেচ্ছ ভাষা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা! তারপর আমার সৌভাগ্যেই বল, আর দুর্ভাগ্যেই বল, উনি যখন সেই কঠিন ব্যারামে পড়লেন, তখন থেকে না আমাদের এ বাড়ীতে পা দেবার অধিকার হল। আর তোমাদেরও বলিহারি! যাঁদের বাপ অমন গোঁড়া সেকেলে, তাঁর ছেলেদের আবার এ সাহেবী কেন? তাঁদের আবার ইংরেজী জানা বৌ না হলে বৌ পছন্দ হয় না।"

"তোমার তাতে দুঃখ কি বৌদি তুমি না হয় ৪/৫ বছর বাপের বাড়ী আদরে ছিলে, তারপর এখানে এসেছ, এখানেও ত অনাদর পাচ্ছ না? শিক্ষিতা মেয়ে ছিলে, নিজের গুণে সকলকে আপনার করে নিয়েছো। দাদাও সুখী হয়েছেন। আর আমার কথা ভাবত ঐ ন'বছরের অশিক্ষিতা একটা পুতুল এনে দিয়েছেন, তাকে শেখাবেন সংস্কৃত আর সেকেলে রামায়ণ মহাভারত পড়া!"

"বেশ ত। তুমি বাপের বাড়ী রেখে, স্কুলে দিয়ে একেলে করে গড়ে নাও না?"

"তা হলেই হয়েছে! এ বাড়ীতে আর আসতে হবে না—ওকেও না, আমাকে ও না। আর ঐ কচি মেয়েকে রাধাকেষ্ট নাম পড়াতে পড়াতে আমি যে বুড়ো হযে যাবো।"

"তা ৬/৭ বছর ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে ; সেটুকু ধৈর্য্য না ধরলে চলবে কেন?"

"আর দুঃখের কথা বৌদি, কাকেই বা বলি, কেই-বা শোনে! সেদিন দেখলুম কমলা গালে হাত দিয়ে আমবাগানে বসে বসে কি ভাবছে, সামনে তার পুতুল ছড়ান। মনে করলুম, আমার বুঝি কপাল ফিরল, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি কমল, কার কথা ভাবছ? পোড়া কপাল! সে বলে কিনা, 'সেই যে সইয়ের ছেলের সঙ্গে আমার একটা পুতুলের বিয়ে দিয়েছিলুম! আমার সব কবিত্বই পণ্ড হয়ে গেল, ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলুম।"

মাধুরী একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "আহা বেচারা ত জানে না, কি বললে তুমি খুসী হতে। একটু সবুর কর, ওকে শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দিন লাগবে না।"

গহনার রুনু রুনু শব্দে তাহাদের গল্প থামিয়া গেল। তাহারা পেছন ফিরিয়া দেখিল, কমলা! মাধুরী ডাকিল, 'আয় ভাই কমলি আয়।'

কমলা আসিয়া একখানি পিঁড়ি লইয়া দিদির পার্শ্বে বসিল। মাধুরী আদর করিয়া কমলার মুখখানি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল,— "কিরে কমলি, বরের যে তোকে পছন্দ হচ্ছে না; তোর পছন্দ হয় বরকে?"

বাধা দিয়া কমলা বলিল,—"যাও দিদি, তুমি ভারি অসভ্য,"

'কেনরে, অসভ্য হলুম কিসে?'

'ঐ যে তুমি বল্লে,—বর!'

কমলার কথা শুনিয়া মাধুরী ও বিমল উভয়েই হাসিল। কমলাকে ছেলে মানুষ পাইয়া তাহারা কোন কথাই উহাকে গোপন করিয়া বলিত না, নিন্দা, প্রশংসা উভয়ই তাহার সাক্ষাতেই করিত। কমলাও দিদি অথবা বর, কাহাকেও লজ্জা করিত না। বিপদে পড়িত বিমল। গুরুজনের কাছে কমলা সম্মুখে পরিলে, সে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত।

২

শ্রীকান্ত রায় এককালে সরকারী কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সরকার হইতে পেনসন পাইয়া থাকেন। তাঁহার নিবাস নাকি কোন পল্লীগ্রামে ছিল। সেই পিতৃপিতামহের বসতবাটী এখন নদীগর্ভে লীন, সুতরাং তিনি সপরিবারে ঢাকাতেই বাস করেন, তাঁহার তিনটি কন্যা—সকলেই বিবাহিতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মলচন্দ্র রায় কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার। মাধুরী নির্মলের পত্নী। বিমলচন্দ্র রায় নির্মলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবার সে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় থাকিয়া এম-এ পড়িতেছে, শ্রীকান্ত রায় চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাই পাঁচ জনে তাঁহাকে একটু ভয় ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখে। তিনি মনে করিতেন, বর্ত্তমানের ইংরাজী শিক্ষিতা মেয়েরাই যত অনর্থের মূল।

তাহারাই সেকালের সুখের যৌথ পরিবারের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া দিয়া, ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিয়াছে; স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিয়া সংসারের সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সুতরাং বালিকাদিগকে যথার্থ সুশিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্য তিনি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, বালিকাদিগকে খনা, লীলাবতী, গার্গী অথবা এমনই একজন তৈয়ার করিবেন।

বলা বাহুল্য, মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ তথাকার বিদ্যা শেষ করিয়া পার্শ্বস্থিত উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না। তখন সেই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালিকারাও তাহাদিগকে একটু টিটকারী দিতে ছাড়িত না,— 'কিরে খনা, লীলাবতীরা, এখানে এলি যে মেমসাহেব হতে?'

শ্রীকান্ত বাবু তাঁহার বাড়ীর মেয়েদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে দেন নাই। বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহার শিক্ষিতা কন্যারা যে তাঁহার দেওয়া শিক্ষার কোন মর্য্যাদাই রক্ষা করিত না, তাহা তিনি জানিতেন।

ভুলও করিয়াছিলেন তিনি মস্ত। মেয়েদের তপস্বিনী করিয়া তিনি তাপস কুমার জামাতার সন্ধান করেন নাই। সেখানে তিনি সংস্কৃত পড়া পণ্ডিত অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষিত অধ্যাপককেই আমল দিতেন বেশী। নিজের পুত্রদিগকেও তিনি ইংরাজী শিক্ষায় চরম স্থানে পৌঁছিতে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহিতই করিতেন। কিন্তু বধূ ঘরে আনিতে গিয়া ইংরাজী শিক্ষিতাকে অস্পৃশ্যবৎ বর্জন করিতেন।

যখন বিমল পাশ-করা একটি মেয়ের মত সঙ্গিনী চিত্র মনে মনে আঁকিতেছিল, এমনি সময়ে পিতা তাহার গলায় গাঁথিয়া দিলেন কমলার মত একটি ক্ষুদ্র অশিক্ষিতা বালিকাকে। বিমলের বধূ পছন্দ হইল না; কিন্তু পিতা যাহা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবার ক্ষমতা বাড়ীতে কাহারও ছিল না—মাতারও না। কাজেই বিমলের অন্তরের ক্ষোভ অন্তরে রহিয়া গেল।

শ্রীকান্ত রায় নিজের বাড়ীর মেয়েদিগকে মনের মত করিয়া গড়িয়া পরের ঘরে দিতে বাধ্য হইতেন। সেখানে তাহারা তাঁহার দেওয়া শিক্ষা দীক্ষা জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিয়া পরের মনের মতই গড়িয়া উঠিত। আবার পরের ঘর হইতে যে সকল কন্যা তিনি নিজের ঘরে আনিতেন, তাহারাও পরের দেওয়া শিক্ষার গণ্ডী এড়াইতে পারিত না। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার জন্যই বুঝি এবার নবমবর্ষীয়া বালিকা-বধু গৃহে আনিয়াছেন। তিনি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে, যাহাকে এই বালিকার সমস্ত জীবনের সঙ্গী হইতে হইবে, এ বিবাহে তাহার একটা মতামতের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, আর ভাবিবেনই বা কেন? হিন্দু বিবাহ —এখানে বর অথবা কন্যার রুচি-অরুচির প্রশ্ন লইয়া কেই বা কবে মাথা ঘামাইয়াছেন।

৩

দুই বৎসর হইল বিমল কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি কমলা তাহার পিত্রালয়েই

বাস করিতেছে। তাহার বয়স অল্প, সুতরাং আরও দুই এক বৎসর পিতৃগৃহে বধূকে রাখিতে শ্বশুরের আপত্তি ছিল না।

কমলার পিতার কর্মস্থানে উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। কমলা মাতার সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকিয়া বালিকাগণের পুরস্কার উৎসাহের সঙ্গে দেখিত। অবশেষে সে একদিন বায়না ধরিল, সেও পড়িবে। পিতা ভাবিলেন, বিদ্যালয় তাঁহার বাড়ীর অতি নিকটে, এ অবস্থায় গেলই বা কমলা। সেখানেত আর কোন ব্যাটাছেলে নাই; শিক্ষার ভার ত সব মেয়েদেরই হাতে। তারপর, কাহার কপালে কি আছে কে জানে। অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা যদি সে পাশ করিতে পারে, তবে ত আর তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরের গলগ্রহ হইতে হইবে না।

কমলাকে তিনি স্কুলে দিলেন। এক বৎসর সে স্কুলে পড়িয়া ক্লাশে প্রথম হইয়া প্রমোশন পাইয়াছে। আনন্দ তাহার ধরে না। ইতিমধ্যে কি জানি কেমন করিয়া বধূর এই অনধিকার চর্চ্চার খবরটি শ্রীকান্তরায় মহাশয়ের কানে পৌঁছিয়াছে। বৈবাহিকের এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি ত চটিয়াই লাল।

বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিতা পুত্রবধূকে তিনি আর গৃহে আনিবেন না, পুত্রকে আবার বিবাহ করাইবেন ইত্যাদি রূপে শাসাইয়া তিনি কমলার পিতাকে পত্র দিলেন, কমলার পিতা ভাবিয়াই পাইলেন না যে, মেয়েকে স্কুলে দিয়া তিনি কি এমন অপরাধ করিয়াছেন। অভিমানে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল। তাঁহার কন্যা কি এতই একটা তুচ্ছ জিনিষ যে, পান হইতে চূন খসিলেই বৈবাহিক পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করাইবেন। তিনি বৈবাহিকের পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

বিমল প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করিয়াছে, কমলার পিতা তাহা শুনিলেন এবং জামাতাকে একবার শ্বশুর-গৃহে যাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন।

উত্তরে বিমল অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখিল,—'পুতুল খেলার বয়সও আমার অনেক দিনই চলে গিয়েছে; সুতরাং ওখানে গিয়ে আর কি কর্ব্ব?'

জামাতার পত্রের শ্লেষটুকু বুঝিতে শ্বশুরের বিলম্ব হইল না। তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, যেন বিমলের কৃত অবজ্ঞার দানটুকু তাহার নিবিড় স্নেহের ধারায় ধুইয়া দিবেন। বালিকা কন্যার শিশু হৃদয়ে এই সকল স্নেহ বা তাচ্ছিল্য কোন রেখাই পাত করিতে পারিল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল; কমলা পিতৃগৃহেই রহিয়া গেল। শ্বশুর বাড়ীর কেহই তাহার কোন খোঁজ করিল না। কমলার পিতাও স্থির করিলেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি চির কুমারী করিয়াই রাখিবেন।

৪

কয়েক বৎসর যাবৎ বিমল কলিকাতায় স্কটিসচার্চ্চ কলেজে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ করিতেছে। বিবাহের পর হইতে তার প্রাণে আর শান্তি নাই। বিবাহের পূর্বে বরং সে ছিল ভাল—মুক্ত বিহঙ্গের মত। তারপর একটি অবোধ বালিকার সঙ্গে পিতা তাহার এ

সম্বন্ধটা কেনই বা স্থাপিত করিলেন। সেই শিশুর সঙ্গে তাহার কদিনেরই বা সম্বন্ধ। এখন সে যে বিবাহিত নহে, একথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার সে বিবাহ করিয়াছে এ কথাটাও বলিতে তাহার প্রাণ চায় না। কমলা এখনও না জানি কত বড়ই হইয়াছে হয়ত এই মালতীর মতই হইয়া থাকিবে। কিন্তু হায় রে কোথায় মালতী আর কোথায় সেই গ্রাম্য অশিক্ষিতা কমলা! হ্যাঃ, কাহার সঙ্গে সে তাহার তুলনা করিতে বসিয়াছে।

নিজের ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া বিমল যখন এই সকল চিন্তায় মগ্ন, তখন গৃহে প্রবেশ করিল মাধুরী। বিমল হঠাৎ একটু চমকাইয়া সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল,—'এই যে বৌদি এসেছ, তোমার কথাভাবছিলুম! বসো।'

মাধুরী বসিল।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল। ''বাবাকে বলেছিলে, বৌদি?''

''কি কথা, মালতীকে বিয়ে করতে যে তুমি ক্ষেপে উঠেছ, সেই কথা?—হ্যাঁ, বলেছিলুম।''

বিমল সোৎসুক নয়নে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল—

--''তিনি কি বল্লেন?''

''তাঁকে বোঝাতেই পারলুম না যে, মালতীরা খৃষ্টান নয়, তিনি বলেন, 'যদি ওরা হিন্দুই হবে, তবে স্কটিস্ চার্চ্চে গিয়ে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে বি-এ পড়তে যাবে কেন? বিমলের এসব কথাও বিশ্বাস করতে বল? বৌমা, ছেলেটা কি শেষে খৃষ্টান হয়ে যাবে?' আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কি প্রশান্তবাবুকে একথা বলেছ কি যে, তুমি বিবাহিত হয়েও মালতীকে বিয়ে করতে চাচ্ছ?''

বিমলের মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। সে যে বিবাহিত, তাহার নিকট মালতীর মাতুল প্রশান্ত বাবু অথবা মালতীর পিতা কন্যা দান করিতে স্বীকার কেন করিবেন? তবে কি সে বিবাহের কথাটা গোপন করিয়া যাইবে? আর তাহার পিতার কথা? না হয়, সে পিতার অমতেই বিবাহ করিবে।

বিমলের চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া মাধুরী বলিল,—'ঠাকুর পো, একটা কথা বলব?'

'কি বলবে বল।'

'কমলাকে তোমরা কি অপরাধে ত্যাগ করলে? তাকে আনলে হয় না? তোমার অনেকখানি আকাশ কুসুম ভেঙ্গে দিচ্ছি বোধ হয়। কিন্তু সে বেচারীও ত দুই এক বৎসর স্কুলে পড়েছিল। আর এই অপরাধেই না তোমরা তাকে ত্যাগ করলে? আবার সেই পড়োই আর একজনকে বরণ করে ঘরে আনবার সঙ্কল্প কচ্ছ! অন্যায় করা হবে না তার প্রতি?'

''অপরাধটা ত আমার কাছে নয় বৌদি! সে যদি ঐ মালতীর মতই হতো, তবে কি তারই মত আমার সুপ্ত আশা আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে পারত না? ভেবে দেখত, দুজনের শিক্ষা দীক্ষা দুরকম হলে ভাব গাঢ় হতে পারে কি?''

মাধুরী কথা কহিল না। তাহার স্নেহ কোমল হৃদয় কমলার ব্যথায় হাহাকার করিতেছিল।

মালতী প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায়ের ভাগনী। তাঁহারই কলিকাতাস্থিত বাসভবনে থাকিয়া কলেজে পড়ে, আবার ছুটি হইলে পিতার নিকট চলিয়া যায়। প্রশান্তবাবুর পরিবার বর্গ আধুনিক ধরণের সুতরাং মালতী স্কটিস চার্চ্চ কলেজে পড়িবে, এ বিষয়ে বাড়ীতে কাহার ও কোন আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ প্রশান্তবাবু ও যখন ঐ কলেজের একজন অধ্যাপক। প্রশান্ত বাবু পড়াইতেন দর্শন শাস্ত্র। গণিতের অধ্যাপক বিমলের, তাহার বন্ধু প্রশান্তের বাড়ী যাতায়াত ছিল। আর মালতী যখন তাহার ছাত্রী, তখন তাহাকে অঙ্কটা মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেই বা বিমলের বাধা কি? কিন্তু মালতীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মেধাশক্তি ও চালচলনে যে বিমল ক্রমেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহা বুঝি মালতীর চক্ষু এড়াইল না। সুতরাং সে তাহার পড়ার ঘরে বিমলের নিকট পড়িতে আপত্তি করিত, বলিত কলেজেই সে বুঝিয়াছে। বাসায় কোচিং এর আর তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মামা যে কেন তাহার এ আপত্তিতে কোন আমলই দিতেন না, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

সেদিন বিমল মনে মনে স্থির করিল আজ প্রশান্তের কাছে যেমন করিয়াই হউক বিবাহের কথাটা উত্থাপন করিতে হইবে। আর গ্রীষ্মের বন্ধও ত আসিল, মালতীও তখন পিতার নিকট চলিয়া যাইবে। এবার নাকি তাহারা আম খাইতে দেশে যাইবে। নিজের বিবাহের কথাটা কি সে গোপন করিয়া যাইবে?—করিলই বা। কমলার খবর ত সে ৮/৯ বৎসর পায় না; সে ইহ জগতে আছে কিনা তাহাই বা কে জানে? সে যদি থাকিতই তবে তাহার পিতা কি একবারও জামাতার সংবাদ লইতেন না?

কলেজ হইতে ফিরিবার পথে বিমল প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—'মালতী ত পড়াশুনা বেশ ভালই করছে, তাকে আর কতদূর পড়াবে?'

'যতদূর সে পড়তে চায়।'

পরীক্ষার ত আর দেরী নেই, এর পর কী ইউনিভারসিটীতে পড়তে দেবে?'

'ক্ষতি কি?'

বিমল দেখিল, যে কথাটা সে পাড়িতে চায়, প্রশান্ত তাহার ধার দিয়াও যায় না। অগত্যা সে নিজেই বলিল, —'হিন্দুর মেয়ে বিয়ে দেবে না?'

'মেয়ে যেমন বিদুষী হয়ে উঠেছে, তার উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি কোথায়?'

'কেন, বাংলায় কি পাত্রের এতই অভাব?'

'পেতুম যদি তোমার মত একটা জ্ঞাণী, গুণী পাত্র, তবে কি আর মালতীর বিয়ে আজও বাকী থাকত?'

প্রশান্ত বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিল,—

'বিমল তুমি বিয়ে করনি?'

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। বিমলের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে কোন উত্তর দিল না। প্রশান্তবাবু ও আর এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

৫

মালতীর বি এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; সে দেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকে বিমল ও মালতী সম্বন্ধে কানাকানি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

বিমলের পিতা দেখিলেন, কাজটা তিনি ভাল করেন নাই। যদি পুত্রের বাসনানুরূপ একটি বধূ ঘরে আনিতেন, তবে আর এমন হইত না, হইতইবা বধূ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা। মাধুরী ত ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। সে ত তাহার সেবা যত্নের এতটুকু ত্রুটি করে না, তাহার কার্য্যকলাপে ত তিনি একটুকু খুঁত খুঁজিয়া পান না। তবে তাঁহার এ গোঁড়ামী কেন? সংসারে এ অশান্তির সৃষ্টি তিনি কেন করিলেন? কালের প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে তিনি চলিতে চাহিয়াছিলেন; কৃতকার্য্যতা লাভ ত তাঁহার কোন দিনই হয় নাই। তবে বৃথা এ প্রচেষ্টা কেন?

এবার তিনি বধূকে গৃহে আনিবেন, স্থির করিলেন! তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিবেন, এ কল্পনা তাঁহার কোন কালেই ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন বৈবাহিক তৎকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু সেই তরফ হইতে যখন এইরূপ কোন প্রার্থনা আসিল না, তখন তিনি যে বধূকে আর আনিবেন না বলিয়াছিলেন, তাহাকে আবার আনিবার প্রস্তাব কেমন করিয়া করিবেন? প্রস্তাবটা কি অপর পক্ষ হইতেই হওয়া বেশী বাঞ্ছনীয় ছিল না? কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন ত আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। সুতরাং বৈবাহিকের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিয়া তিনিই অনেক কাল পর তাঁহাকে পত্র দিলেন এবং বধূকে সাদরে গৃহে আনিবার সঙ্কল্প ও জানাইলেন।

আজ বিমলের কর্ম্মস্থলে, কমলা আসিবে, শ্রীকান্তরায় বহুপূর্বেই কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। মাধুরীর আজ আনন্দ ধরে না।

কিন্তু বিমল?—আজ তাহার অন্তরে যে তুফান উঠিয়াছে, তাহা কবে, কেমন করিয়া থামিবে, কে জানে? প্রশান্তকে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? আর মালতী! সেকি তাহার মনের ভাব টের পাইয়াছে? প্রশান্ত যদি তাহাকে আভাস দিয়া থাকে! মালতী তবে তাহাকে কি মনে করিবে?—মনে করিবে ন' কি সে প্রতারক! উঃ, তাহার মাথা যেন ঘুরিতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে প্রশান্তবাবু ডাকিলেন—"বিমল"—বিমলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! ধীরপদক্ষেপে সে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে চলিল। তাহাকে দেখিয়া প্রশান্ত বাবু গম্ভীর সুরে বলিলেন,—"কি হে. আজ নাকি তোমার পত্নী আসছেন? এ কথাটা কি তোমার এতদিন বলা উচিত ছিল না? আগে জানলে কি আর তোমায় মালতীর সঙ্গে মিশতে দিতুম? মেয়েটার জীবনটা এমন হেলায় নষ্ট করতে তোমার বিবেকে একটুকু ও বাধল না?"

অবনত মস্তকে বিমলের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রশান্তবাবু চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন,— কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

তিরস্কৃত হইয়া বিমল যন্ত্রচালিতের মত আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। অন্তরে কে যেন তাহার দাবানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। তবে কি মালতীও তাহাকে ভালবাসিত? যদি না বাসিবে, তবে ইদানিং সে বিমলেব সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না কেন?

মাধুরী দরজায় আসিয়া ডাকিল,—"ঠাকুরপো, উঠে দেখ, কমলা এসেছে।"

বিমলের চিন্তা সূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমলার মুখখানা অবগুণ্ঠনে সম্পূর্ণ আবৃত নহে। মালতী যেমন করিয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া কলেজে যাইত। কমলাও ঠিক তেমনি করিয়াই আসিয়াছে, এ কে?—বিমল কি স্বপ্ন দেখিতেছে? বেচারা আবার চক্ষু মুছিয়া কমলার দিকে ভাল কবিয়া তাকাইল। মাধুবী কমলাকে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

বিমল অবাক বিস্ময়ে কমলার পানে চাহিয়া বলিল.

"মালতী, তুমি—তুমি-?"

নত মস্তকে, একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া; কমলা বলিল, —"আমি মালতী নই, মিষ্টার রায়, আমি কমলা; বাবা ইউনিভার্সিটিতে আমার নাম বদলে দিযেছিলেন মাত্র।"

"ও, বুঝেছি, তবে প্রশান্ত সব জানত। আর তুমি—?"

"আগে জানতুম না, পরে শুনেছিলুম।"

বাহির হইতে প্রশান্ত বাবু ডাকিলেন,—"বিমল-"

বিমল প্রসন্ন মুখে, ত্বরিত পদে বাহিরে গেল। প্রশান্তবাবু বলিলেন—"কি হে, বৌ পেয়ে ত মশগুল। এই নাও, মালতী তোমার বৌয়ের জন্য প্রেজেণ্ট পাঠিয়েছে।"

বিমল দেখিল, তাহাদেরই বিবাহ কালীন আলোকচিত্র!

'জয়শ্রী'—১৩৪১

মরু-তৃষা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

যন্ত্র-দানবের বিরাট্ দেহ প্রায় একযুগ ধ'রে ব'সে আছে শহরের অর্দ্ধেকের অধিকারী হ'য়ে,—আর বাকী অর্দ্ধেক ভরিয়ে রেখেছে ওরই সেবাইতের দল। ঘড়ির কাঁটায় সকাল দুটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাণে গিয়ে পৌঁছায় ওর আহ্বান; কর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ঐ গুরু-গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি সকলকে জানায় নিজের অস্তিত্ব, শক্তির সাফল্যে যার প্রতিষ্ঠা, আর ঐ প্রতিষ্ঠার পাদমূলে মাথা নত ক'রে ফেলে ওর সেবাইতেরা—বিরাট লৌহ ফটক খুলে যায়; আবার বন্ধ হয় সকলের প্রবেশ শেষে; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিল রেখেই ওরা যেন কাজ ক'রে যায়, কোনও ক্ষণেই ভুল হবার উপায় নাই— যেন অভ্রান্ত।

দূর গ্রামে—ভাঙ্গা কোঠার দালানে ব'সে তামাক টানিতে টানিতে কারখানার কালো চিমনীটার অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গার দেখে—আর জগু ভাবে ওকেও একদিন এই ঘরের মায়া কাটিয়ে—ঐ দূর শহরে—ঐ চিমনীর তলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে চাকরীর চেষ্টায়, নইলে দিন আর চলে না! যদিও আত্মীয় আত্মীয়ার বালাই নেই, তবু নিজেকে নিয়েও তো ভাবতে হয়। গাঁয়ে থেকে, তাস পাশা খেলে, আড্ডা দিয়ে আর উপার্জ্জনের অভাবে আধ-পেটা খেয়ে আর কতদিন কাটবে!

জগু ভাবে— আর ছিলিমের পর ছিলিম নিঃশেষ ক'রে ঝাড়ে, আবার সাজে; কিন্তু কোনও কাজেই এগোয় না, বড় জোর থাকোহরির সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে সমালোচনা করে; কারণ— সেও আসে শুধু দুঃখ জানাতেই। কেউ কিছু না জানতে চাইলেও সহানুভূতির শুধু "আহা" টুকুই ও শুনতে ভালবাসে, তাই উৎসাহিত হ'য়ে ব'লতে শুরু করে—

"তুমি তো আর আমার পর নও হে, বরঞ্চ আপনার আপনি সম্বন্ধ, তাই তোমায় ব'লতে আমার এক ফোঁটাও লজ্জা নেই—ভাবি—কি হবে তোমায় লুকিয়ে, তুমি তো আর কাউকে ব'লতে যাচ্ছ না। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ—"

টেনে টেনে হাসা ওর স্বভাব। সেই সঙ্গে সঙ্গে—"তুমি" শব্দ ক্রমে "তুই" হ'য়ে দাঁড়ায়। কালো, শিরওঠা সরু হাত দুখানা নেড়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে' বলে—

"তারপরে জানিস, এই সংসারের দায়ে আমি সব খুইয়েছি মাইরি! আর পরের উব্‌গার করা! ও, সে জানে দশখানা গাঁয়ের লোক; এই থাকোহরির মত আর একটি লোক কেউ এ পিরথিবীতে খুঁজে বের ক'রতে পারে? ফেলুক বাজী! বুকের পাটা থাকে, চলে আসুক থাকোহরির সঙ্গে বাজী জিততে, তবে বুঝবো মরদ।—"

হাতের চেটোয় একটা ছোট রকম কিল মেরে, সকলের মুখের দিকে একবার তাকায়, তারপরে গলার স্বরটা একটু কোমল করে, একটু হেসে বলে—

"হুঁ, মোড়লী করে সবাই—কিন্তু কাজে করুক দেখি? সে-টি হবার উপায় নেই। এখনও ব'লবে ও-পাড়ার হারু বোস আর হাটখোলার পেঁচো ময়রা। সেই যেবার হারুর

ছেলেটাকে সাপে কামড়ায়, সেবারে কেউ গেল না ওঝা ডাকতে, শেষে গেল এই থাকোহরি। আর পেঁচোর দোকানে যেদিন চোরে সিঁদ কাটে, সেদিন কোথায় ছিল পেঁচো, আর কোথায় ছিল পেঁচোর ইয়ারের দল? হুঁঃ, সে এই থাকোহরি ভাগ্যিস আসছিল তারিণীর বাড়ী থেকে তাস খেলে, তাই—"

এই পর্যন্ত ব'লে—সকলের মুখের দিকে তাকায়, হয়তো দুই একটা বাহবা-শব্দের আশা করে, কিম্বা আর কিছুর।

কিন্তু এ গেল তার বীরত্বের পরিচয়। দুঃখের পরিচয়ে গোটা দুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

" সেই যেবারে—আশ্বিনে বড় ঝড় হয়, জানো! যেবারে রায়বাবুর বাড়ীর পিরতিমে গেল চুরমার হয়ে, আর সেই পাপে বাবুরা সবংশে নিধন হ'লো! সেইবারেই আমার বড় ভাই মারা যায় গাছ চাপা পড়ে; বড় ভাই ব'লে বড় ভাই! আমার চেয়ে সাত বছরের বড়, আর উপার্জ্জনকারী ভাই। সে থাকলে আজ আমার ভাবনা কিসের? পায়ের ওপর পা রেখে জুড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতাম; কিন্তু কপালে নেই, তাই তিনি স্বগ্যে গেলেন; আর সব ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। কি আর করি' বল, নিজেও যদি একমুঠো খেতে পাই, তবে ওরাই বা পাবে না কেন ভেবেই সবাইকে এক জায়গায় ক'রে রেখেছি। কিন্তু রাখলেই কি নিস্তার আছে—একে এই দিন-কাল, তাতে আয় নেই, তাই ভুব্‌না শালার দোকানের দেনা দিন দিন বেড়েই চ'লেছে; জানিস তো সব, শেষ সম্বল বো'র কাঁখের রেট ছড়াও গেল মার অসুখে—ঐ আশু কবরেজের খপ্পরে, আর ছাড়াতে পারলাম না।

নৈরাশ্যের কাতরতায় ভরা একটা সঘন নিঃশ্বাস ওর বুকের পাঁজর কয়টা কাঁপিয়ে এসে বাইরের আবহাওয়াটা ভারী ক'রে তোলে; উপস্থিত সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কেউই উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়, আবার যেন একবার হাঁপ নিয়ে থাকোহরি বলে "এখন কোলের মেয়েটাকে দুধের বদলে ফ্যান খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে, দুধ কেনবার পয়সা কোথায়? বলে, নিজেদের পেটেই দুবেলায় ভাত জোটে না, তার দুধ! আর কীই বা আছে, যা বেচে দুধ খাওয়াব! বাকী শুধু ভিটেটুকু। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ!....."

আবার সেই টেনে হাসি! ও হাসির শব্দ কান্নার মত করুণ, তবু ও হাসে।

জগু দাওয়ায় ব'সে তামাক খেতে খেতে ভাবছিল, ঘরের ছাদটা মেরামত করাতে না পারলে এবারের বর্ষায় হয়তো সব সমেত একদিন পাতাল-প্রবেশ ক'রতে হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি, তাতে তেমন পয়সাই বা কোথায় যা এই বেকার অবস্থায় কিছু খাওয়া খরচের জন্যে রেখে বাকী সে ঘর মেরামতে লাগাবে! তা ছাড়াও মার রেখে যাওয়া গয়নাগুলো, যা এই কয় বছর মহাজনের কাছে থেকে সুদে আসলে সমান হ'তে চ'লেছে, তাও উদ্ধার করা খুব দরকার—নইলে আর চলে না।

এতগুলো ভাবনা যখন অসংলগ্নভাবে জগুর মগজে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তাল ঠোকাঠুকি করছিল, তখন ধীরে ধীরে বাখারীর দরোজা ঠেলে এলো থাকোহরি; থাকোহরির

দৃষ্টি লোলুপ; জগুর সযত্ন-রোপিত পুঁই মাচা, লঙ্কা গাছ থেকে আরম্ভ ক'রে হাত-দেড়েক চারা শাকের ক্ষেত পর্য্যন্ত এক নজরে দেখে নিয়ে দাওয়ায় উঠে এলো। মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে ব'ললে—"লালশাকের ক্ষেত শুকিয়ে উঠেছে কেন? রোজ জল না দিলে গাছ বাঁচে? তোর যেমন কাজ!—"

জগু মুখ থেকে হুঁকা সরিয়ে ব'ললে—"বোস।"

থাকোহরি ব'স্‌লো দুই হাঁটু জড়ো ক'রে, উবু হ'য়ে; চারিদিকে আর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে ব'ললে—

"খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে দিয়েছিস্ বুঝি? তা বেশ! বেশ! একদিক দিয়ে, মাইরি ব'লছি জগু, তোর মত কাজের লোক আর আমি একটি খুঁজে পাই নে। এমন তোর....."

জগু ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলে; ব'ললে—

"এখনও চানই হয়নি তার খাওয়া!"

পরে থাকোহরির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—

"তোমার?"

থাকোহরি যেন এই প্রশ্নটার জন্যই তৈরী হ'য়েছিল; কপালে একবার করাঘাত ক'রে উত্তর দিলে—

"আমার খাওয়ার কথাও আবার লোকে জিজ্ঞেস করে! বলে কোথায় চাল আর কোথায় হাঁড়ি!"

এ প্রসঙ্গটার ইতি ক'রতেই বোধহয় জগু এই সময় হুঁকোটা থাকোহরির হাতে দিলে, থাকোহরি নির্ব্বাকে সেটায় পর পর টান দিতে লাগলো; ক'লকের আগুণ শেষ হ'তে মুখ তুলে দেখলে জগু উঠবার উপক্রম ক'রছে।

হুঁকোটায় শেষবার টান দিয়ে থাকোহরি মুখের ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে—"গোটাকয়েক টাকা ধার দিতে পারিস্ জগু? টাকা আষ্টেক, নেহাৎ কম ক'বে পাঁচটা টাকা দে; দেখ্ আমার বড় টানাটানি—মানে বড় অসময় প'ড়েছ মাইরি, দে ভাই! কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবো তোর। নইলে পাওনা টাকার জ'ন্যে ভুব্‌না শালা ......"

জগুর বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে আরো বড় হ'য়ে উঠলো; ব'ললে "আমি দেব তোকে টাকা ধার? পাগল হ'য়েছিস! পাবো কোথায়?"

থাকোহরি যেন অনেকটা আশা নিয়েই এসেছিল, তাই হতাশায় নুয়ে প'ড়লো, উত্তর দেবার মত ওর ক্ষমতা রইল না। কিছুক্ষণ পরে, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উচ্চারণ ক'রলে—

"পারবি নে?"

জগু নির্ব্বাকে মাথা নাড়লে; থাকোহরিও হাতের হুঁকোটায় টান দেওয়া ভুলে নতমুখে ব'সে রইল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কেটে যাবার পরে জগু মুখ তুলে ডাকলে—"থাকোহরি! ওরে থাকো!"

থাকোহরি মুখ তুলে তাকাতে প্রশ্ন ক'রলে—

"খুব বেশী দরকার!"

থাকোহরি জানালে হ্যাঁ।

জগু কিছুক্ষণ কি ভেবে উঠে ঘরে গেল, যখন ফিরে এলো যখন তার হাতে সোণার একটা শিলে আংটি ঝক্ ঝক্ ক'রছে।

বার কয়েক সেটার দিকে তাকিয়ে ব'ললে—

"আমার অবস্থার কথাও তো জানিস, দিন তিনেক একবেলা খাচ্ছি; কিন্তু তবু ....."

একটু চুপ ক'রে থেকে যেন স্বগত ব'ললে—

"আর শুধু এইটুকুই বাকী ছিল, বাপের দেওয়া সখের আংটি! আজ তোর হাতেই দিই, নিয়ে যা থাকোহরি। কিন্তু ...."

থাকোহরির দিকে তাকাতেই কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলার উপক্রম ক'রলো।

বাধা দিয়ে জগু ব'ললে—

"কিন্তু এক কথা—এটা ভুব্‌নাকে দিয়ে ব'লবে এক কুড়ির একটাকা কমে আমি বেচবো না; সোজা কথা, আর যে টাকা পাবে তার অর্দ্ধেক আমার। তবে আমার নাম করিস না। সোজা ব'লবি অমুক লোকের আংটি, কারণ ওর সঙ্গে আমার রাগারাগি কি না! —নইলে আমিই যেতুম.....।"

থাকোহরি আংটি নিয়ে পেছন ফিরে নামতেই জগু ফিরতি ডাকলে—" শোন্—"

থাকোহরি ফিরলো।

রুক্ষস্বরে যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে জগু ব'ললে —"মনে রেখো আমি শুধু-হাতেও তোমায় বিশ্বাস ক'রে টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে শোধ করা চাই; নইলে....."

থাকোহরি জগুর সে রুক্ষতা গায়েও মাখলো না, এক মুখ দাঁত বের করে ব'ললে "তুই আমায় তেমনি পেলি জগু! এতদিন দেখেও তুই আমায় চিনলি নে?"

জগু কি একটা জবাব দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

এক হাতের তালুতে অন্য হাত ঠুকে, মুখখানা অসম্ভব রকম ভারি ক'রে থাকোহরি ব'ললে—"এটা জেনে রাখিস জগু, মরদ্‌কা বাত, আর হাতিকা দাঁত। এর নড়চড় হবার জো-টি নেই; মানে পিরথিবী উল্টে গেলেও একথা মিথ্যে হবার উপায় নেই। তেমনি মরদ এই থাকোহরি! কাউকে সে পরোয়া করে না; তা সে হোকনা কেন ভুব্‌না আর হোকনা কেন লাট বেলাট! ও সব আমার কাছে নেই! সোজা মানুষ আমি, ওসব বেঁকা চোরাব ধার ধারিনে। জানিস জগু, এই তোর কাছ থেকে আংটি বেচার টাকা যেমন হাত পেতে নিচ্ছি, তেমনি, তিনমাস কেন—আসছে মাসে যদি না হাত উপুড় ক'রে ফেরৎ দিয়ে যাই তো—আমার নামে খেঁকি কুকুর পুষিস্।"

জগু নীরবে ব'সে রইল, উত্তর দিলে না।

থাকোহরি যেতে যেতে জগুর সযত্নরোপিত পুঁই শাকের গোটা কয়েক ডাঁটা মুচড়ে

ভেঙ্গে নিয়ে,—জগুর বাড়ীর পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি খেতে যে অন্য পুঁইডাঁটার চেয়ে সুস্বাদু এই কথাটাই সবিস্তারে প্রকাশ ক'রতে ক'রতে বার হ'য়ে গেল। জগু ক'লকের ওপোরে হাত রেখে দেখলে তাতে আগুন আছে কিনা, তার পরে বোধ হয় আগুন না থাকাতেই সেটাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে ব'সে রইল পথের দিকে তাকিয়ে, থাকোহরি এখনি টাকা নিয়ে ফিরবে ব'লে।

রাত্রে, ঘুমিয়ে লোকে যা স্বপ্ন দেখে তা ভোলাই স্বাভাবিক, আর মনে থেকেও কোন লাভ নেই, কারণ কাজের স্রোতে ছেঁড়া সূতোর মত এক এক ক'রে ভেসে যায়। কিন্তু, যার সৃষ্টি হয় জাগরণে, দিনের আলোয়, অফুরন্ত অবসরে যার পুষ্টি, তাকে ভোলা যদিও সহজ নয়, তবু অবস্থা বিপর্য্যয়ে মানুষই মানুষকে উপদেশ দেয় এই ব'লে যে—ও তোমার নয়, তোমার সাজে না। তেমনি অবস্থায় প'ড়েছে জগুও।

বাপ যদুনাথ যখন ওর জগন্নাথ নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে প্রাণ ত্যাগ করে তখন ওর বয়েস আঠারো , তার পরে আজ কয়বছর ধীরে ধীরে কেটে গেছে; বাপের অভাবে, যদুর যা কিছু জমা ছিল ভাঙ্গিয়ে, আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েও বেশ স'য়ে এসেছিল; কিন্তু মুস্কিল ক'রলে অর্থের অভাব। বাপের আশা ছিল ছেলে হাকিম হ'য়ে হুকুম ক'রতে না পারলেও ফাঁড়িদার হ'তে পারে এবং সেই আশায় গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের প্রাইমারী স্কুলে ছেলেকে ভর্ত্তি ক'রেও দিয়েছিল; কিন্তু ছেলের লক্ষ্য ছিল বোধ হয় অন্য রকম, তাই পথেই শ্লেট বই রেখে সোজা চম্পট দিতে ইতঃস্তত ক'রতো না। কিন্তু আজ সে দিনের সঙ্গে আর ওর অবস্থার সঙ্গে অনেক পার্থক্য ব'লেই বোধ হয় জগুর মনে দুঃখ হয়, সময়ে অসময়ে তাই কুলুঙ্গীতে তোলা সেই পুরোণো বই শ্লেটগুলো নাড়াচাড়া করে, আবার গুছিয়ে রাখেও। বটতলার ছাপা, রংদার দুই একখানা নভেল হাতে এলেও ফিরাতে পারে না, ছেঁড়া ঠোঙ্গা করা খবরের কাগজও প'ড়তে সাধ হয়। বিস্মৃত সুখস্বপ্নের রেশের মত হঠাৎ যদুর আশার কথা মনে পড়ে, হয়তো নিজেরও কোন সুপ্ত বাসনা ওর সঙ্গে জড়ানো ছিল—তারা আজ জেগে ওঠে বেদনার রাজ্যে, নিরাশার শয্যায়।

দুঃখ হয়, মায়া হয় ওদের দেখে; কিন্তু দেখেই বা লাভ কি? আর লাভ লোকসান খতিয়ে দেখার ধৈর্য্যও তো ফুরিয়ে এসেছে, তবু বেশ আছে সে। মাঝে মাঝে বিরক্ত করে শুধু ঐ থাকোহরিটা এসে; হয়তো বা ওর তাসের আড্ডায় টেনেও নিয়ে যায়।

আংটী সে নিয়ে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে জগু স্থির ক'রলে থাকোহরি হয়তো এবেলায় টাকা পায়নি, ওবেলা এসে দিয়ে যাবে।

কিন্তু, পরপর কয়দিন কেটে যাবার পরও যখন থাকোহরির দেখা পাওয়া গেল না, তখন ও সত্যই চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লো।

প্রতিদিন দূরের ঐ কারখানার বাঁশী ডাক দেয়— হারানো স্বপ্নের এতটুকু সুর যেন ওর কঠোর স্বরে মিশান আছে!

গ্রামের এই সংক্ষিপ্ত জীবন, এই একটানা সুর—এই একতালে পা ফেলে চলার ওপরে

একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে; সব একঘেয়ে, কিন্তু এরই বাধা কাটিয়ে সে চায় বৈচিত্রের মাধুরী।

কিন্তু তার উপায়? সব গেছে, শেষ সম্বল ঐ আংটীটা! ......

মনে মনেই সে গর্জ্জে উঠলো—

দাঁড়া হতভাগা!

* * * * *

রাত্রি গভীর; ঘুম ভেঙ্গে জগু শুনলে দূরে, কিছুদূরে বাঁশী বাজছে।

ও সুর সাধা যে কার হাতের, ও বাঁশী যে কে বাজায় তা বুঝতে দেরী হ'লো না, কারণ ও বড় পরিচিত।

জগু উঠে ব'সলো; বালিশের তলা থেকে দেয়াশালাই বের ক'রে আলো জ্বাললে, তামাক খেলে; তারপরে ঘরের দরোজায় তালা দিয়ে বার হ'লো বংশীবাদকের উদ্দেশ্যে।

নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ হ'লেও থাকোহরির বাঁশী বাজানোর হাত আছে; ছোকরা উচ্ছন্নে গেল শুধু সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে।

কিন্তু, তাতে জগুর কি? চুলোয় যাক্ ওর সঙ্গী, আর চুলোয় যাক ও, জগুর চাই নিজের জিনিস, হয় আংটী, নয় টাকা।

থাকোহরি পরম নিশ্চিন্তে নদীর বালুচড়ায় ব'সে বোধহয় চোখ বুজিয়েই বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল; পেছনে, জগুর পায়ের শব্দে খেয়াল হ'লো না। খপ্ ক'রে ওর চুলের মুঠি ধ'রেই জগু গর্জ্জে উঠ্‌লো—

"তবে রে শালা—"

থাকোহরি শীর্ণকায়, জগুর তুলনায় দুর্ব্বল; তাই বোধহয় লাগবার ভয়ে মাথাটাতে ঝাঁকানি পর্য্যন্ত দিলে না। কাতর স্বরে ব'ললে—

"ছাড় ভাই জগু, লাগছে মাইরি!"

জগু চুলের মুঠি ছাড়লে বটে, কিন্তু ওর একখানা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে। পাশে ব'সে প'ড়ে কঠোর স্বরে ব'ললে—

"আংটী দে, নইলে এক চাপড়ে আজ যদি তোর জান না নিই তো—"

জগুর মুঠোর মধ্যে থেকেই থাকোহরির হাতখানা একটু কেঁপে উঠলো ব'লে মনে হ'লো, কিন্তু সে ক্ষণিকের; চ'টে উঠে থাকোহরি জবাব দিলে—

"আংটী আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি নাকি যে চাইবা মাত্তর ফেলে দেব! চল আমার সঙ্গে বাড়ীতে, ফেলে দিচ্ছি তোর আংটি। আমি খেয়ে ফেলি নি তোর জিনিস।"—

জগু উত্তর দিলে না, কিন্তু হাতের মুঠোটায় যেন আরও একটু জোর দিলে ব'লে মনে হ'লো।

উঠে দাঁড়িয়ে থাকোহরি ব'ললে—

"অত ছোট মন নিয়ে থাকোহরি বাস করে না, মনে রাখিস্ জগু। চল্ আমার বাড়ী—তোর আংটি যদি এখনি না ফেলে দিই তো আমার নামই থাকোহরি নয়; চল—"

জগু ওর পাশাপাশি চ'ললো। হাত অনেক আগেই ছেড়েছিল, তবু পাশে পাশে যাওয়াই ভালো; কারণ ওকে বিশ্বাস কি! ও নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ! ...

মাটির দেওয়াল ঘেরা ও গোলপাতার ছাউনী দেওয়া মুখোমুখি কয়খানা ঘর, হাত তিনেক চওড়া হাতনে, আর তার কোলের কাছের ছোট উঠোনখানি বেশ পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছে।

প্রভুর পায়ের শব্দে জেগে বোধহয় পোষা কুকুরটা বার দুই ডেকে উঠলো, তারপর লুটিয়ে প'ড়লো পায়ের কাছে।

অন্ধকার দাওয়ার ওপাশ থেকে থাকোহরির মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"থাকো. এলি বাবা?"

থাকোহরি সে কথার কোনও উত্তর দিল না; হাতনের একখানা ছেঁড়া চাটাই পেতে জগুর উদ্দেশে ব'ললে—

"বোসো।"

জগু বসলো।

এক ক'লকে তামাক সেজে এনে থাকোহরি জগুর হাতে দিয়ে ব'ললে—'ব্যাপার কি জানো!'

জগুর তখন ব্যাপার জানার মত সদিচ্ছা না থাকলেও হুঁকোর মায়াটাও ত্যাগ ক'রতে পারলো না—নির্ব্বাকে তামাক টানতে লাগলো।

থাকোহরি ব'ললে—

"হুঁঃ! তারপর, ভুব্‌নাকে ব'ললাম তোমার কথা; আংটীটাও দেখালাম, শেষে ও শালা বলে কি জানো? বলে ও সোনা পাকা নয়, খাদ মিশেল, —তাই কুড়ি সে কিছুতেই দেবে না; আমিও সহজে ছাড়বার পাত্তর নই; ব'ললাম, সে হবে না, জগু আমার বন্ধু লোক, আর বিশ্বাস করে আমার হাতে যেখানে সোনার জিনিষ ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে কেটে ফেললেও আমি তার নেমক হারামি করতে পারবো না। এত কথা ব'লতে তবে ভুব্‌না এলো সোজাপথে! তাও পনেরোর বেশী কিছুতেই উঠলো না—"

ব'লে দুটো টাকা ট্যাঁক থেকে বের ক'রে জগুর হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর বাকী তের টাকার হিসেব মুখোমুখি চট্‌পট্‌ দাখিল ক'রে ফেললো। জগু কোনও কথা বলতে পারলে না, টাকা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রতে লাগলো—সেই সঙ্গে ডান হাতখানাও মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠে এলো থাকোহরির কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু কাঁধের ওপরে পড়লো না, পেছন থেকে বাধা দিল' থাকোহরির মার কণ্ঠস্বর।

জগু ফিরে দেখলে কম্পিত হাতে প্রদীপ নিয়ে থাকোহরির মা ধীরে ধীরে এই দিকে আসতে আসতে স্নেহকাতর স্বরে ব'লছে—

"ভাত খাবি নে থাকো? একে বৌমানুষ, তাতে কচিছেলের মা, আর কত রাত তোর ভাত আগলে রান্নাঘরে ব'সে থাকবে, বল্‌তো বাবা?"

জগুর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা অজ্ঞাতেই যথাস্থানে ফিরে এলো। থাকোহরির মা এগিয়ে

এসেছিল, হাতের প্রদীপটা তুলে ধ'রে দৃষ্টির ক্ষীণতা দূর করার চেষ্টায় দুই চোখ বিস্ফারিত ক'বে কিছুক্ষণ নির্বাকে জগুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে ব'ললে—

"ও, তুমি জগন্নাথ! ও পাড়ার যোদোর বেটা! আমি বলি বুঝি আর কেউ..."

জগু নির্ব্বাকে বিদায় নিলে।

নির্জ্জন পথ চ'লতে চ'লতে হাওয়ায় তাল পাতা পড়ার মড়্ মড়্ শব্দে ও একবার শিউরে উঠলো, তারপরেই মনে হ'লো হাতের তলায় থেকেও টাকা দুটো যেন বুকের মধ্যে আগুনের সেঁক দিচ্ছে।

* * * * *

যন্ত্রদানবেরও দয়া আছে, তাই বোধ হয় তার লক্ষ লক্ষ সেবাইতের নামের খাতায় একদিন জগুর নামটাও লেখা হ'য়ে গেল—

"শ্রীজগন্নাথ কাহার।"

মনের আনন্দে পিতৃ-পুরুষের ভিটেয় পুরাতন মরিচা ধরা তালার চাবি লাগিয়ে জগু শহরের পথ ধ'রলো; লাল ধুলোয় ভরা সোজা, বেঁকা, উঁচু নীচু পথ; প্রায় ক্রোশ তিনেক গেলে তবে শহর।

তা হোক, তবু ওকে আজ এবেলার মধ্যে পৌঁছাতেই হবে, কারণ কাল সকাল থেকে কাজ আরম্ভ, আজ তার যোগাড় ক'রতেই হবে, নইলে উপায় নেই। আর কি দরকার উপায়ের? এতদিন নিরবিচ্ছিন্ন আবদারের মধ্যে থেকে থেকে অবসরের ওপরে ওর একটা গভীর অবসাদ এসে গেছে; তাকে দূর ক'রতে হবে নূতন জীবনের প্রারম্ভে, নব কাজের প্রেরণায়। তাই চাই আজ ঐ একটানা ব্লকের একখানা ঘর, নিজের নামের ঘরখানাকে মনের মত সাজাতে, গোছাতে; যাতে সামনের কাজের সাতটা দিন কোনও রকমে পার হ'য়ে যায়, তারপর আবার দেড়দিন ছুটি, শনি রবিবার।

এ ছুটি অবসাদ ভরা নয়, জীবনের চাঞ্চল্যে ভ'রপুর,—আনন্দে উজ্জ্বল।

সত্যিই জগু একসঙ্গে পেল অনেকগুলো জিনিষ, —ঘর, কাজ ও সঙ্গী। কাজ সে নিয়মমতই করে, ঘরখানাও যাহোক কিছু দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে, আব সঙ্গী অর্থাৎ সুধুয়ার গল্প, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফকিরের ভাঙ্গা বেসুরো হারমোনিয়মের সঙ্গে তেমানি বেয়াড়া গলার গান শুনে শুনে মনটা অনেকটা হাল্কা হ'য়ে এসেছে।

তবু হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, থাকোহরির শুক্‌নো মুখ আর ভুব্‌নার তাগাদা! ও-গুলো জীবন থেকে নিশ্চিহ্নে মুছবার জন্যেই ও রোজ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সিদ্ধি খায়, — হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় সুর তুলে চীৎকার করে—

"যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে..."

তাসের আড্ডা আজও জ'মে ওঠে, কিন্তু থাকোহরির দাওয়ায় নয়, ফকিরের ঘরে; সেখানে প্রদীপের বদলে কোনও দিন বা হ্যারিকেন, কোনও দিন বা কোরোসিনের ডিবে জ্ব'লে জ্ব'লে অনবরত ধূমোদগার করে, আর ঐ আলোয় চেষ্টা ক'রে দেখা যায়—ঘরের দেয়ালে আঁটা বিড়ির বিজ্ঞাপন, কালীঘাটেব কালীর পট কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের লীলার দুই একখানা

ছবি; হয় তো বা রেশমী চুড়ীর শিকল, আর ধুলি-মলিন কাপড়-জামা।

দড়ির খাটিয়ায় ব'সে ওরা তামাক, নয় বিড়ির বাণ্ডিল মিনিটে মিনিটে ধ্বংস করে; সেই সঙ্গে চলে গান, গল্প আর খেলা, রাত দশটা পর্য্যন্ত।

প্রায় বছরখানেক পরের কথা।

ছুটির দিন; দরোজার ফাঁক দিয়ে চোখে সকালের আলো এসে লাগলেও জগু বিছানা ছাড়ে নি—ওঠেনি, দরোজাও খোলেনি।

হঠাৎ বাইরে থেকে বন্ধ দরোজার ওপোরে কে আঘাত ক'রে ডাকলে "জগু"!

এ কণ্ঠস্বরে সুধুয়া, ফক্‌রে কিম্বা রাইচাঁদের নয়—তাই উঠে দরোজা খুলেই চ'মকে উঠলো—দেখলে সামনেই থাকোহরি দাঁড়িয়ে—

থাকোহরিও যেন জগুকে দেখে চিনতে পারছে না, তাই যেন নিস্পলকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে; ওর বুকের সব কয়খানা পাঁজরা গুণে নেওয়া যায়, চো'খ প্রায় আধ ইঞ্চি ব'সে গেছে; মাথার চুল বড়, রুক্ষ্ম, হাওয়ায় উড়ছে।

এ যেন এক বছর আগের সে থাকোহরি নয়, তার কঙ্কাল।

জগুর জিহ্বা যেন অজ্ঞাতে উচ্চারণ ক'রলে।

"থাকোহরি"

থাকোহরি তাকিয়েইছিল; শান্ত, অথচ কাঁচের মত উজ্জ্বল সে চোখ। ধীরস্বরে উত্তর দিলে,

"হ্যাঁ আমি। টাকা চাইতে এসেছি জগু, এই শেষবার; আর কখোনো চাইবো না, মাত্তর দশটা টাকা ধার দে জগু—"

জগু বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেল।

থাকোহরি অন্য কোনও দিনের মত এগিয়ে এসে জগুর পা জড়িয়ে ধ'রলে না, কাঁদলেও না; যেমন শান্ত ধীরস্বরে আগে কথা ব'লেছিল ঠিক তেমনি স্বরেই ব'ললে—

"ভুবনা টাকার জন্য আমার মাকে মেরেছে; বৌকে..."

ওর গলার আর স্বর বার হ'লো না। কিন্তু জগুর মন তখন পাথরের মত শক্ত, থাকোহরির পূর্ব্ব অপরাধের অধ্যায় পর পর ওর মনে ভেসে উঠলো; মনে হ'লো ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়; কারণ ও মাতাল, বিশ্বাস ঘাতক, ধাপ্পাবাজ!

অসহ্য রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগু কয়েকপা এগিয়ে এলো, থাকোহরির জীর্ণ-শীর্ণ দেহে একটা ঠেলা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—

"কিছু শুনতে চাইনে; বেরো তুই এখান থেকে, বেরো ব'লছি, নইলে ঠেঙিয়ে পা ভাঙবো তোর...."

মুখ থুবড়ে প'ড়তে প'ড়তে থাকোহরি কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলে; তারপর একবার মাত্র জগুর আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

সারাদিন মনটা বড় খারাপ, কিছুই ভালো লাগছে না; সুধুয়ার রসিকতা, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফক্‌রের গান, সবই যেন কেমন একঘেয়ে লাগছে।

ভালো নয়, দুনিয়ায় কিছু ভালো নেই, কেউ কারো ভালোও করে না; সব স্বার্থপর, ধাপ্পাবাজ, জুয়াচোর; একা থাকোহরিই নয়।

থাকোহরি নীরবে চ'লে গেল, কিন্তু কেন?—ব'লবার মত কিম্বা জগুর কাজের প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতাও কি তার ছিল না? কিম্বা ব'লতে এসেছিল—"ভুবনা, পাওনা টাকার জ'ন্যে বাড়ী এসে ওর বুড়ী মাকে মেরেছে, আর বউকে ..." কথাটা ভালো ক'রে শোনাও হয় নি; কিন্তু এতক্ষণ পরে মনের একটা অজ্ঞাত স্থান যেন বেদনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠলো, সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো থাকোহরির মায়ের মুখের সঙ্গে তারও মরা মা-বাপের ছবি, এমনি কাতর এমনি অসহায়তার সাদৃশ্য। আজও সেখানে সাত পুরুষের ভিটের গাঁথুনি মাটীর মধ্যে মিশে যায় নি—তাই আজও সেই দূরের পানাপুকুর, উচু নীচু গ্রাম্য পথ, বন-জঙ্গলের সঙ্গে দুর্ব্বল, স্নেহকম্পিত হাত বাড়িয়ে ক্ষীণস্বরে মনের একপাশ থেকে ডাক দিচ্ছে। সেখানে আজও নদীর বালুচড়ায় থাকোহরির বাঁশী বাজে, বন-বীথির মধ্যে থেকেও নিরাশ অবসরে পাখীর কুজন কাণে আসে।

জগু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—

নাঃ, থাকোহরিকে অমন ক'রে তাড়ানো ভালো হয় নি।

* * * * *

ঘরের দরোজায় তালা এঁটে, ফকরে, সুধুয়া, রাই চাঁদকে ব'লে পরদিনই সকালে জগু বার হয়ে প'ড়লো, সোজা গ্রামের পথ ধ'রে।

কত দিন ... কতদিন গ্রামে যায়নি, এপথেও হাঁটেনি; গ্রামবাসীদের চেনা মুখগুলোও ভু'ল হ'য়ে এসেছে বোধহয় —কিন্তু ....

ভাবতে ভাবতে সমস্ত পথটা এসে থাকোহরির বাড়ীর কাছে ও থ'মকে দাঁড়ালো; থাকোহরির বাড়ী পুলিশে ভর্ত্তি, পথের ধুলোয় প'ড়ে ওর মা কাঁদছে, বৌ ব'সে আছে নিস্তব্ধভাবে, কোলের মেয়েটা বোধহয় কেঁদে কেঁদে কোলের ওপরেই ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

জগু এগিয়ে এলো।

রুদ্ধশ্বাসে ও যে খবরটার প্রতীক্ষা কর'ছিল, তাই পেলে গ্রামবাসীর একজনের মুখ থেকে; কাণের কাছে মুখ এনে সে ফিস্ ফিস্ ক'রে শুনিয়ে দিলে।

"ভুব্‌নাকে খুন ক'রে থাকোহরি কাল রাত্তিরেই পালিয়েছে।...."

নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে জগু অনুভব ক'রলে পৃথিবী যেন পায়ের তলার থেকে ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে মৃদু থেকে মৃদুতর হ'য়ে কাণে আসছে থাকোহরির মায়ের করুণ ক্রন্দন।

এজাহারে জগু ব'ললে—

"ও কাজ ও করেনি হুজুর, করেছি আমি।"

ওর কণ্ঠস্বরে দুর্ব্বলতা নাই, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

থাকোহরি যেন জগুর কথার ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রতে গেল, কিন্তু পারলে না,—বিবর্ণ ঠোঁট দুটো একবার মাত্র কেঁপে উঠেই স্থির হ'য়ে গেল।

চারিদিকের লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে—জগুর উদ্দেশ্যে আর দুটি নারীর

সজল চোখের কাতর দৃষ্টি ভেসে এলো, কৃতজ্ঞতা বহন ক'রে।

জীবনের ক্ষেত্র আজ আরও বড়, আরও বিস্তৃত ; সীমার ঐ ক্ষীণ রেখাটুকুও যে, যে কোনও মুহূর্তে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তা জগু জানে: কিন্তু সান্ত্বনা এইটুকু, যে আর কেউ কোনওদিন ওর কাছে সাহায্য চাইতে আসবে না; থাকোহরিও নয়। কারণ, জগু আজ তার সব দেনা সুদ সমেত শোধ ক'রে তাকে দিলে—সঙ্কীর্ণ জীবন; আর তার বদলে নিলে মৃত্যুর অপার মুক্তি। কারা কপাটের শিকল বাজিয়ে প্রহরী জানায় সে ঠিক আছে।

অন্য লোকে নিজেদের মধ্যে বলা কওয়া করে— লোকটা খুনী।

জগু ভাবে এবরঞ্চ বেশ হ'ল,—

বড়বাবু এতদিন নিশ্চয় তার জায়গায় অন্য লোক ভর্ত্তি ক'রেছে; ফকরে, সুধুয়া, রাইচাঁদও এতদিন নিশ্চয় তার খবর পেয়েছে; এখন হয়তো জগুকে ম'নে প'ড়লে ওদের ভয় করে, কিম্বা ঘৃণা হয়। কিন্তু থাকোহরি! থাকোহরি তো তাকে জানে! হয়তো জানে ব'লেই আজও সময়ে সময়ে পাষাণপ্রাচীর ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—তারপর সেদিনের মত নির্বাক্ মুখে ধীরে ধীরে বার হ'য়ে যায়। তাহ'লেও বাইরে থেকে তার বাঁশী বাজে, আর সেই সুরের সঙ্গে ভেসে আসে ওর মা বউয়ের রোদন ভরা কণ্ঠস্বর—ওরা যেন এক সঙ্গে জগুর আত্মার মুক্তি-প্রার্থনা ক'রছে।

'প্রবর্ত্তক'—১৩৪২

নীড়-চ্যুতা

শ্রীমতী প্রতিভাকণা দাশগুপ্তা

নির্ম্মলের কথা

ঢাকা মেলে প্রিয় বন্ধুর আসবার কথা। তাই আগুয়ান হয়ে বন্ধুকে আনবার জন্যে প্রত্যুষেই প্লাটফরমে উপস্থিত হলাম। আমার উপস্থিত হবার দশ মিনিটের মধ্যেই দানবের ন্যায় এসে উপস্থিত হল ঢাকা মেল। কিন্তু প্রয়াগ প্রবাস যাত্রী বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলল না। অবশেষে বন্ধুরত্নে নিরাশ হয়ে ফিরছি সহসা শুনলাম ভয়মিশ্রিত কণ্ঠের একটী আহ্বান— "দেখুন।" পশ্চাতে ফিরে দেখি একটী শ্যামবর্ণা ১৪/১৫ বছরের কিশোরী সঙ্কোচের সহিত অপেক্ষা কর্চ্ছে। পরিধানে একটী সেমিজ ও আধময়লা একখানি শাড়ী।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমায় ডাকছ।" ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানাল। বোধ করি আমায় খদ্দরধারী দেখে আহ্বান করতে সাহস পেয়েছিল।

"দয়া করে আমায় একটা আশ্রমে পৌঁছে দেবেন?"

প্রশ্ন করলাম—"কোন আশ্রমে যাবে?"

আনত দৃষ্টিতে মেয়েটি বলল—"কোন অনাথ আশ্রমে—কারণ আমি নিরাশ্রয়া।"

তার অনুরোধের গুরুত্ব অনুমান করে বল্লাম—"যখন কোন ঠিকানা দিতে পারছ না—তখন হঠাৎ তোমায় কোথায় নিয়ে যাব। তার চেয়ে বরং আমাদের বাড়ীতে চল—সেখান থেকে তোমার নির্দ্ধারিত জায়গায় চলে যেও।"

মেয়েটীর হাবভাব ও লজ্জাশীলতাই প্রমাণ যে সে ভদ্রঘরের, সম্মতি হওয়াতে একখানি ট্যাক্সি ডেকে তাকে নিয়ে তো উঠলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে। সমস্ত রাস্তাটী গুরুর নাম স্মরণ করে এসে পৌঁছলাম বাড়ীর দরজায়। মা গাড়ীর শব্দে দরজায় এসে বল্লেন— "এ কাকে নিয়ে এলি? প্রতুল আসেনি?"

উত্তর কল্লাম—"কই তাকে ত পেলাম না, এখন এ মেয়েটীর দায় উদ্ধার কর।" বলেই—আমি বেরিয়ে পড়লাম কার্যস্থলের দিকে।

অপরাহ্নে মা বল্লেন— মেয়েটি ভদ্র কায়স্থ বংশের। নাম তাব বিভা। পিতৃহীনা মাতা তাহার কয়েকটি নাবালক ছেলে মেয়ে ও এই বিবাহ যোগ্যা মেয়ে নিয়ে গ্রামেরই পাঁচজনের সাহায্যে পালিতা, কিন্তু মেয়ে দিন দিন বয়স বেড়ে ধিঙ্গি হয়ে উঠল তা সত্ত্বেও পার করতে না পারায় গ্রামের সমাজ পতিদের কম নির্যাতন ভোগ করতে হয় না। শেষে তারাই ঘাটের মড়া ৬০ বছরের একটি তৃতীয় পক্ষীয় বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হওয়ায় মাতা অসম্মতি প্রকাশ করেন। সেই কারণে সমাজ পতিরা শাসিয়ে গেছেন—যে—যেখানকার যত সাহায্য বন্ধ করব—যদি মাগী, মেয়ের বিলি বন্দোবস্ত না করিস', ধিঙ্গি মেয়ে যে গ্রামের ছেলেগুলোর মাথা খাবে, এত অনাচার তারা সইতে পারবে না।

শিক্ষিতা মেয়ে মার এই অসহায় অবস্থা সহ্য করতে না পেরে নিজের ভাগ্য নিজেই পরখ করতে বেরিয়েছে। তার বাপ অল্পদিনই মারা পড়েছেন। বিভা তার বাপের কাছেই

ম্যাট্রিক ষ্টাণ্ডার্ড ধরে পড়েছে—তবে পরীক্ষা দেওয়া ঘটে ওঠেনি। বাপ সদাগরী অফিসে সামান্য বেতনে কাজ করত। মেয়েকে পাশ করানোর আশা হৃদয়েই পর্য্যবসিত ছিল। এই তো বিভার ইতিবৃত্ত।

২

বিভার কথা

সেদিন প্রাতে গ্রামের মাতব্বররা যখন শাসিয়ে গেল তখন নিজের এই নারীজন্মের জীবনব্যাপী অসহায় অবস্থাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে, বুঝলাম আমার জন্যে আমার বিপন্ন ভাই বোন গুলি অনাহারে মারা যাবে।

মা আমার স্বর্গস্থ পিতার উদ্দেশ্যে কাঁদতে লাগলেন, কিন্তু আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল ভবিষ্যত ভাবনায়। মাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম - মা, আমাকে তোমার ছেলে মনে কর, বাবা আমায় যা শিখিয়েছেন তা দিয়েই হয়ত কলকাতায় গেলে আমার একটা উপায় করতে পারবো, অনুমতি দাও। মিছে আমাকে ধরে রেখে ভাইবোন গুলোর খোরাক নষ্ট করনা। মনে কর বিভা মবে গেছে। কিন্তু মা স্বীকৃত হলেন না। শেষে রাত্রির অন্ধকারে সামান্য একখানা চিঠিতে বিদায় নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কি অশান্তিতেই না দিনটা কেটেছিল।

ভাগ্যচক্রে প্রকৃত মানবের সাহায্য পেয়ে আজ দুমাস যাবৎ কলকাতার সন্নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে এসে পড়েছি, আমি এখানকার মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রী। কথা আছে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে নিতে হবে—বর্তমানে সে জন্যে অস্থায়ী। মাইনে পাই ২৫ টাকা। মাকে পাঠাই দশ টাকা।

স্কুল সংলগ্নেই আমাদের কোয়ার্টার্স। ছোট ছোট মেয়ে গুলিকে পড়িয়ে বেশ শান্তিতেই দিন চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মার চিঠি পত্র পাই।

তাই এই শান্তিটুকু পেয়ে সকালে উঠে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীর উদ্দেশেও একটা প্রণাম সেরে নিই।

অপরাহ্নে প্রধানা শিক্ষায়ত্রী তাঁর অফিস ঘরে ডেকে বল্লেন, 'বিভা আমাদের সেক্রেটারী নগেনবাবু তোমায় পড়াশুনোর সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন। আমার তো সময় নেই দেখতেই পাচ্চো, দুমাস ধরে ওনার সাহায্য পেলে তুমি অনায়াসে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে।'

পরমুহূর্ত্তেই নগেন বাবুর দিকে ফিরে তিনি বল্লেন—'মিঃ রায়। আপনার ছাত্রীর সহিত আপনি তাহলে আলাপ করুন। 'ও' যা লাজুক এর ভেতর তো আপনাদের পরিচয় হয়নি। আমি কিন্তু একটু কার্য্যক্ষেত্রে যাচ্ছি কিছু মনে করবেন না।"

বলেই তিনি চঞ্চল পদে বেরিয়ে গেলেন। পড়াশুনায় লেগে গেলাম। নগেনবাবু প্রত্যহই সন্ধ্যায় আমার নির্দ্দিষ্ট কোয়ার্টারে হাজির হন। আমার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি নগেনবাবুকে সুনজরে দেখতে অপারগ হয়ে পড়ছি। তাঁর অত্যধিক আগ্রহ

দেখে আমি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়লাম। সময় সময় তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সেই খরদৃষ্টি পূর্ণ চোখে চোখ পড়লেই আমি ভয়ে সঙ্কুচিতা হয়ে পড়ি।

ক্রমশ তিনি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে লাগলেন। তার আদেশ যেন আমায় শিরোধার্য্য করে নিতেই হবে। আমার যেন ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত লোপ পেল। ক্রমে তিনি বই পত্র আদান প্রদানে আমার স্পর্শ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। প্রথমে দূরত্ব রেখে পড়াতে বসতেন। ক্রমে সে পরিসর কমে একেবারে পার্শ্বে বসতে লাগলেন। তাঁর ক্ষণিক স্পর্শে আমার শিরা উপশিরায় মাদকতা এনে দিত— যদিও মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত।

এরূপে এক মাস পার হয়ে গেল, সে দিন ছিল রবিবার। প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও ২/১ জন শিক্ষয়িত্রী যারা স্কুলে থাকেন তাঁরা গেছেন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে। আমি একাই ছোট ছোট মেয়েদের বোর্ডিং এ গার্জ্জেন হয়ে আছি। নগেনবাবু এলেন পড়াতে, আমার মনটা গেল বিগড়ে, 'না ও' করতে পারি না। অসন্তুষ্ট হবেন। ভাববেন দয়া করে পড়াচ্চি কি না, সাহায্য না পেলে পাশই বা কর্ব্ব কি করে? আর চাকরীটাই বা থাকবে কেন, না পাশ করলে?

কিছুক্ষণ পড়ানোর পর দিলেন একটা সাবষ্টেন্স লিখতে। আমি নীচু হয়ে আদেশ পালন করছিলাম হঠাৎ আকর্ষিতা হয়ে চমকে উঠলাম। একেবারে ক্রোড়ের উপর টেনে নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"বিভা। তুমি আমায় পাগল করেছ—তুমি আমার হও। তোমার পাদপদ্মে আমার ধন মান ঐশ্বর্য্য সব অর্পণ কর্চ্ছি।"

৩

নির্ম্মলের কথা

সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে ও ততোধিক শ্রান্ত মনে নিজের মেসগৃহে এসে প্রবেশ করলাম। মাতৃহীন গৃহ আমার মেসেই রূপান্তরিত হয়েছিল—কারণ মাতা বন্ধুসহ প্রয়াগগতা, আর রবিবাবুর কেষ্টার সামিল আমার ভৃত্য লোটা মহারাজের অনুগ্রহে আমার গৃহের রূপ খুলেছে। কিন্তু গৃহ প্রবেশে সে রূপটী— দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলাম। যাদুকরের হস্তস্পর্শে গৃহের রূপ পরিবর্ত্তিত, প্রভুভক্তকে স্মরণ করতেই শুনতে পেলাম।

"১০ বাজে নতুন দিদিমণি এসেছেন—এ সব তাঁরই কাজ।"

ক্ষণেক হতভম্ব অবস্থায় কাটিয়ে গমনোদ্যত বার্ত্তাবাহীকে অতিথি সৎকারের বিষয় জিজ্ঞাসা করতেই অন্দর হতে মৃদু কণ্ঠে উত্তর শুনতে পেলাম "হাঁ নিমুদা। সে জন্য আর আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলেই মূর্ত্তিমতী বিভাদেবী এসে হাজির হলেন সকাশে। মূর্ত্তি তার রুক্ষ। আঁধারে ও আলোতে সে তার সজল আঁখি গোপন করতে না পেরে বলে উঠল—"নিমুদা'। এবার আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি—একটু আশ্রয়

দিতে হবে। যে অবস্থায় পড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি তা আপনার কাছে মুখ ফুটে বলতে পারবো না। সেখানে আর থাকলে মান সম্ভ্রম থাকতো না। আমি হতভাগী, তাই মা ও আজ এখানে নেই নতুবা তিনি পায়ে ঠেলতে পারতেন না।''

মুহূর্ত্তের জন্য চোখ তুলে দেখলাম অশ্রুবিন্দু তার রক্তিম গণ্ডদেশ প্লাবিত করে দিয়ে ঝরছে।

সান্ত্বনার সুরে বললাম —''বিভা কেঁদো না। দেখি তোমার জন্য কতদূর কি করতে পারি যতদিন জোগাড় কিছু না হয় এইখানে থাক। মা হয়ত শ্রীঘ্রই ফিরবেন। তবে কান্না রেখে জোগাড় দেখ গিয়ে। আজ আর হোটেলে খেতে যাব না। বাড়ীর ভাত অনেকদিন খাইনি।'' একটী সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলে সে ধীরে বার হয়ে গেল। যাই হক প্রতিষ্ঠানের কাজে অবহেলা করে দেশের জ্ঞানী ও ধনীর দ্বারে দ্বারে ঘুরলাম। কিন্তু কাহারও কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে জুটল না। অনেক উপদেশও শুনলাম। তার সারমর্ম্ম ''কোন সমিতিতে দিয়ে দাওগে। আমার সময় কোথা ব্যবস্থা করবার এই সামান্য ব্যাপারে,'' মোট কথা নিরাশ্রয়া বালিকার স্কুল বোর্ডিঙের ব্যয়ভার বহনে সকলেই অস্বীকৃত। সে দিনেও দ্বিপ্রহরে অনেক ঘোরাঘুরির পর বিমুখ হয়ে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করেই শয্যায় শুয়ে পড়লাম। বিভা তাড়াতাড়ি একখানা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে ভর্ৎসনার সুরে বলল ''নিমুদা, আর আপনাকে আমি জায়গায় জায়গায় ভিখারীগিরী করতে দেব না। শেষে রোগে পড়লে কে দেখবে আপনাকে—মা তো প্রয়াগে, লোটা তো মোটে সম্বল। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না, অমি একটা উপায় শীগগীরই করে নেব।''

আমি তখন মুদ্রিত নেত্রে মনোরাজ্যের অতলে ডুবার কার্য্য সাধনে ব্যাপৃত, তার কথা শেষে যখন স্বপন ভাঙ্গল—তখন মনোমুকুরে ভেসে উঠছে বিভার সুন্দর মুখটি। তার সঙ্গে পেলাম তার জন্য আকর্ষণ তার প্রতি কার্য্যে সৌন্দর্য্য বোধ। তার প্রতি কথায় অমৃত বর্ষণ। এ যেন আমার সমুদ্র মন্থন।

সে ভালবাসে কিনা ভাবতেই চোখ মেললাম। আমার মুগ্ধ নয়ন তার সজল চোখের কাজল তারায় উত্তর পেয়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিল। তার আঁখি পল্লব নেমে পড়ল। আমি ও বিবেকের কশাঘাতে উঠে পড়লাম, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যে তাকে একটি সুন্দর বিশ্বাসী আশ্রয় করে দিতেই হবে নতুবা নিজের সম্মান বুঝি আর বজায় থাকে না।

শেষ পর্যন্ত বিভাকে নারী রক্ষা সমিতির সাহায্যে একটা স্কুল বোর্ডিঙে রেখে এলাম। বিদায়কালে ধীরে ধীরে এসে অনেকক্ষণ ধরে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। তুলে বললাম—''মন দিয়ে লেখাপড়া করে পাশ কর। তা হলেই নিজের ও মার দুঃখ দূর হবে।'' মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, ''আর কোনদিন কি আসবেন না? বলেছিলাম ''আসব বই কি।''

কিন্তু গৃহে ফিরে বিষণ্ণতার প্রতিমূর্ত্তি বড়ই কষ্টদায়ক হয়েছিল।

৪

বিভার কথা

আমার প্রার্থিত দেবমন্দির হতে প্রায় ছ মাসের বেশী নির্ব্বাসিত হয়ে এখানে এসেছি। স্কুলের ও বোর্ডিঙের মেয়েদের সঙ্গে হাসি গল্প সবই করি—কিন্তু নিজে শান্তি পাই না।

মেয়েদের বাপ-মার, ভাই বন্ধুদের চিঠিপত্র আসে—আমার সে আশা নেই, মার কালেভদ্রে ২/১ খানা চিঠি আসে, মেয়েরা ছুটীতে বাড়ী যায়, কত আত্মীয় স্বজন নিতে ও দিতে আসে আর আমি বোর্ডিঙেই ছুটীটা একাকী নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটাই, আবার পাঁচজনের মধ্যে থেকে নিজের জীবনের গতিকে ভাবতে দেখলেই মেয়েগুলো জ্বালিয়ে মারে—হ্যাঁ বোন। তোর নিমুদা তো আর একটীবার ও দেখা করতে এলো না।

'সে হয়তো ঘাড়ের ভূত নামিয়ে সংসারী হয়ে বসেছে। কিন্তু আমাদের রাই যে কালী হয়ে গেল।' তখনি এক ধাক্কা মেরে বলি— 'বেরো পোড়ার মুখি।' কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতে বসি কই একবার খোঁজও তো নিলেন না আর, সত্যি বেঁচে আছি না মরেচি। মনে হয় —কিসের তরে তিনি আসবেন। দুদিন ভুতের মতন ঘাড়ে চেপেছিলাম বই তো নয়। নেহাৎ বিমুখ করতে তাই একটা হিল্লে করে দিয়ে গেছেন—নতুবা কি সম্পর্কই বা তার সাথে আমার।

আজ উল্টোরথের ছুটী। মেয়েরা অনেকেই আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী গিয়েছে। ২/৪ জন যা আছে তারা যে যার ঘরে হয় গল্পের বই নিয়ে ছুটীটা উপভোগ করছে বা কেউ কেউ মিলে মজলিস দিচ্ছে। আজ আর বাঁধা রুটীনের বাধ্য বাধকতা তত নেই।

মাথার সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, এমনি সময় ঝি এসে আমায় ভিজিটিং রুমে যাবার জন্য বলে গেলো। ভাবলাম এ হতভাগিনীর সহিত কে দেখা করতে এলো। এতদিনে সত্যিই কি নিমুদার মনে পড়েছে। যাই হোক, ঝির পেছনে পেছনে গিয়ে ভিজিটিং রুমে প্রবেশ করতেই বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট দুখানা চিঠি দিয়ে ঝিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম খানা খুলতেই দেখলাম স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী লিখেছেন—"তোমার স্বভাব চরিত্রে কতকগুলি রিপোর্ট তোমার ভূতপূর্ব কর্ম্মস্থল থেকে এসেছে। উপরন্তু তুমি তোমার মাতৃভূমি একা পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলে। তথায় তোমার মাতা ও ভাইবোনেরা বাস করে। তোমার স্বভাব চরিত্রের জন্য কেউ তোমার খোঁজ খবর বড় একটা নেন না। অধিকন্তু যে লোকটী তোমায় এখানে দিয়ে গিয়েছেন—তিনিও বিশেষ সুবিধার লোক নন্ এবং তুমি অনাত্মীয়া হয়ে তার গৃহে বহুদিন কাটিয়ে এসেছ, এ সব কারণে অন্যান্য মেয়েদের সংস্পর্শে তোমায় রাখা উচিত নয় বিবেচনা করে তুমি কল্যকার মধ্যে তোমার আত্মীয় ডেকে এনে চলে যাবে এই আমার আদেশ জানবে।

ইতি —নীহারিকা দেবী
(প্রঃ শিক্ষায়ত্রী)

দ্বিতীয় খানা ছিল একখানা পোষ্টাফিসের ছাপ মারা লেফাপা। সেটা যে কি প্রকারে খুললাম বলতে পারি না। চোখে তখন আমার বান ডেকেছিল। তার ভিতর থেকেই দেখলাম

সেটা ভূতপূর্ব স্কুলের সেক্রেটারী নগেন রায়ের লেখা। লিখেছে, তার স্কুলের কাজ ছেড়ে দেওয়াতে সে মর্মাহত। সেখানে আমার অবারিত দ্বার, দুঃখে—কষ্টে পড়লেই যেন চলে যাই, চাকরী আমার বজায় আছে ইত্যাদি।

এর পর সবই পরিষ্কার হয়ে গেলো। কেন আমার আশ্রয় এখানকার হারালাম। কার চাতুরীতে, সবই চোখে ভেসে উঠল। আবার যাতে তার জালে পড়ি সে আশায় নগেন বাবু আমায় নীড়চ্যুতা করলেন। বড় দুঃখেই ভগবানকে ডেকে বললাম—"তুমি আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন আশ্রয় রাখলে না। নতুবা বিনা দোষে আজ আমার তোমার, এই বিরাট বিশ্বে একটু স্থান হয় না।"

কতক্ষণ টেবিলের উপর মাথা রেখে সেখানেই কেঁদেছিলাম সে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ "বিভা" আহ্বানে ধরা পড়ে গিয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে মাথা তুলতেই দেখি—"আমার কুমারী জীবনের ঈপ্সিত ধ্রুবতারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।" কিন্তু এত শীর্ণ কেন।

তখন আর গোপন করা বৃথা। চিঠি দুখানা ঠেলে দিতেই তিনি তুলে নিয়ে পড়লেন পরমুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন, দৌড়ে যেতে যেতে বললেন—"আমি গাড়ী আনচি তুমি বিদায় পত্র দাখিল করে তৈরী হয়ে নাও।"

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে স্কুল ও বোর্ডিং হতে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলাম—আজ আর দূরত্ব রেখে না বসে একেবারে পাশে এসেই বসলেন, ঘোড়ার গাড়ী ছাড়তেই আমার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন "জানো বিভা; টাইফয়েড রোগের বিকারে শুধু তোমার কথাই বলেছি। আমি কি তোমায় পাবার আশা করতে পারি।"

গলায় আঁচল দিয়ে তখনি একটা প্রণাম করতেই বুকে টেনে নিলেন— সেই প্রিয় বুকে মুখ লুকিয়ে বড় সুখে বললাম—"মার কি আমায় পছন্দ হবে।"

আমার কানে পরমুহূর্তেই অমৃত বর্ষিত হল—"সে ভার আমার"। ও সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় চুম্বনে প্রিয় আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

"দীপালী"—১৩৪৩

রাজুর মা

আশাপূর্ণা দেবী

কাঠের পার্টিশনের ওপিঠ হইতে দেখিতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু পাওয়া যায়। পশ্চাদ্‌পদ হইবার মেয়ে রাজুর মা নয়, লোহার শিক তাতাইয়া কাঠের দেওয়ালের গায়ে মৌলিক একটি জানালা তিনি অনায়াসেই করিয়া লইয়াছেন। দালানের মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়া বাড়ীখানা দুই ভাগ করা, অথচ দালানেই বলিতে গেলে ইন্দিরার সমস্ত সংসার। দুখানা ঘরের বড়টিতে ইন্দিরার দাদা তাঁহার বিশাল দেহ, অগাধ বই আর সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র লইয়া কায়েমী হইয়া আছেন। ছোট ঘরখানায় ইন্দিরা দাদার মেয়ে মিলিকে লইয়া শোয়। ছিমছাম পরিষ্কার ঘর। ইন্দিরার পাতলা ঝরঝরে অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে সজ্জিত চেহারার সঙ্গে এই ঘরখানির যেন আশ্চর্য একটা সাদৃশ্য আছে, শিশির তো তাই বলে। এই ঘরখানিকে আকারণ জিনিষপত্রে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে ইন্দিরার ভারী মায়া হয়। তা ছাড়া, দাদার মনে কোন বিকার নাই বলিয়াই পারে।

এই তো সেদিন আমের দরুন বড় টুকরীটা দাদার ঘরে টেবিলের তলায় দেখিয়া চক্ষু কপালে তুলিতেই দাদা হাসিয়া বলিয়াছিল—জানিস্‌নি ইন্দু, ভারী কিন্তু আরাম। চেয়ারে বসে পা ঝুলিয়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরাতে হয় না, দিব্যি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসা যায়; আঃ থাক না, থাক না, টেবিলের তলা থেকে কে ওকে দেখতে পাচ্ছে?

সে-যাত্রা একটা বেতের মোড়া আনাইয়া দিয়া তবে রক্ষা পাওয়া যায়। দাদা মোটা মানুষ, আরামের জন্য না করিতে পারে এমন কোনো উদ্ভট কাণ্ড নাই। মনে করিয়া এটুকু তাহার আগেই করা উচিত ছিল ভাবিয়া লজ্জিত হয়। আহা, বেচারা দাদা, বৌদি থাকিলে কি এই বয়সে এমন হইয়া যাইত?

দাদা, বোন আর মিলি, এই তো সংসার; দালানের একপাশেই ইন্দিরার হাতের পরিপাটি করিয়া সাজান ভাঁড়ার। পাশে শেলফে চায়ের সরঞ্জাম, তরকারীর ঝুড়ি, জলের কুঁজো, মাজা বাসন। জালের আলমারীতে ফলমূল দুধ খাবার টুকিটাকি সব। পুবের জানালা ঘেঁসিয়া যে বেতের টেবিলটা পাতা তাহারই কাছে চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহারা চায়ের আসর জমায়। আর সিঁড়িতে উঠিয়াই ডানহাতে কোণের জায়গাটায় তোলা উনুন জ্বালিয়া ইন্দিরা রান্না করে। কড়ার গায়ে খুন্তি বাজাইয়া গান গায়, আর ডাল ভাত চড়াইয়া দেওয়ালে পিঠ ঠাসিয়া কিসের সব মোটা মোটা বই পড়ে। ইহারই সামনাসামনি রাজুর মার অভিনব জানালা। কাজেই এদিকের জীবন-যাত্রার অনেকখানি ছবিই ওপিঠের অধিবাসিনী যুগলের দৃষ্টিগোচর হয়। মা আর মেয়ে, একখানি ঘর ও দালানের বাকি অংশটুকু লইয়া ইহাদের কাজ কারবার, শুধু জল আনিতে হয় নীচে নামিয়া। এ অংশে জলের কল নাই, নাই বলিয়াই ভাড়া সস্তা। তিনতলার ইতিহাস এইখানেই শেষ, একতলা ও দোতলার সবটা জুড়িয়া বাড়ীওয়ালা নিজে তাঁহার 'রাবণের গোষ্ঠী' লইয়া রাজত্ব করেন। করুন, তাঁহার জানালায় উঁকি দিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই, রাজুর মার মত কৌতূহলী স্বভাব কিছু আর সকলের

নয়। কিন্তু কৌতূহল হইবার কথাও; পার্টিশনের গায়ে চোখ রাখিয়া রাজুর মা একাগ্র চিত্তে যাহার উপর নজর রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিধবার আচার আচরণ তাহার নয় অথচ আপনাকে বিধবা বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার আপত্তি নাই। প্রথম যেদিন সামনের অংশটা ভাড়া লইয়া তাহারা উঠিয়া আসিল, রাজুর মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহাদের তত্ত্ব লইতে আসিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞ চক্ষুতে মেয়েটাব "পোড়া কপালের" খবর গোপন রহিল না।

রাজুর মত সাজ নাই হোক— রাজুর মার শিক্ষাই আলাদা, পনের বছরে বিধবা হইয়া কে আর মাথা মুড়াইয়া হাত খালি করিয়া, একখানি থানে লজ্জা নিবারণ করিয়া জীবন কাটাইতে পারে? তা নয়, তবু ইন্দিরার উল্টাইয়া বাঁধা চুলের বোঝা, সাদাসিধা সেমিজের উপর সরু কালাপাড় শাড়ী, আর একগাছি করিয়া সোনার সরু তারেব মত চুড়ি দেখিয়া রাজুর মার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

এখনকার দিনে অবশ্য অনেক "হাতি হাতি' মেয়ে আইবুড়োই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের বাঁকাসিঁথি, রকমারি শাড়ি, আর 'ভাবন' দেখিলে অষ্টাঙ্গ জ্বালা করে। এ মেয়েটার পরণ-পরিচ্ছদ দেখিলে তবু চক্ষু জুড়ায়।

তাই প্রথম দৃষ্টিতেই সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া রাজুর মা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, ও হরি মধুসূদন! বলি, ইরি মধ্যেই পোড়াকপাল পুড়িয়ে বসে আছো! আমার রাজুর মতনই অদেষ্ট দেখছি! বলি কতদিন এমনধারা হয়েছে?

'পোড়াকপাল'ও পুড়িয়া গেলে অবশিষ্ট কি থাকে ইন্দিরা অবাক হইয়া একটু ভাবিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, কি জানি, কবে মনে নেই তো। হবে একদিন। হাসির কথা নয়, তবু হাসি যেন ইন্দিরার একটা রোগ। অল্পবয়সী বিধবা মেয়ের মুখে হাসিটা তেমন মানায় না। এই তো রাজুর মার রাজু; স্বামী তাহার যেদিন হইতে মরিয়াছে, হাসিও তাহার সেইদিন হইতে একেবারে ঘুচিয়াছে। বৈধব্যের কথা উল্লেখ করিলে আজো তাহার মুখখানি করুণ হইয়া আসে।

আর এ মেয়ে হাসিয়া গান গাহিয়া স্ফূর্তি করিয়া সারা বাড়ীতে যেন বিদ্যুত ছড়াইয়া বেড়ায়।

স্বভাব যে তাহার ভাল নয় এ বিষয়ে এতদিনে আর মায়ে মেয়েতে মতভেদ নাই। কিন্তু ঘরে যাহার পাহাড়ের মত বড় ভাই বসিয়া, এমন ধারা বাচালতা সে করে কোন সাহসে, সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। অসহ্য হয় রাজুর মার। বেহায়া ছুঁড়ির কীর্তি-কলাপ দেখিয়া তাঁহার সর্ব শরীর জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু চটাইবার সাহস হয় না, অবস্থা তাহাদের তো রাজুর মার মত দুর্দশাগ্রস্ত নয়। যখন-তখন এটা-সেটা চাহিলে মেলে, টাকাটা-সিকাটা ধার লইয়া ভুলিয়া গেলে চাহিবার কথা কাহারও মনে পড়ে না। কাজেই মাতা-কন্যায় ঘরে বসিয়া টিপ্পনি কাটা ছাড়া আর কিছু করিবার বড় জো নাই।

কাঠের দেয়ালে পাহারা তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে পালা করিয়া নিয়মিতই দেন; আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লুচি ভাজার গন্ধে বিরক্ত হইয়া রাজুর মা ঠোঁট বাঁকাইয়া

হাসিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিলেন, রান্না বুঝি আজ এস্‌টোভেই হচ্ছে, হ্যাঁ গা ইন্দু?

হঠাৎ গলার আওয়াজে চমকিয়া উঠিয়া ইন্দিরা বলিল, কে, মাসীমা? হ্যাঁ, এবেলাটা স্টোভেই সেরে নিই, ভারী তো রান্না।

রাজুর মা সহজে কথা থামাইতে চাহেন না, বলেন, ভাত আর তা হলে হয় না? ওই ময়দাতেই—তো সত্যি বাছা, কার নেগেই বা ভাতের ন্যাঠা করবে, মনিষ্যির মধ্যে তো ভাইটি আর মেয়েটা! তোমার কিছু আর রেতে ভাত চলবে না, ময়দার পাট করতেই হবে। বলো না, পোড়াকপালের অনেক জ্বালা।

ইন্দিরা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, যা বললেন মাসীমা, সেই জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরছি।

রাজুর মা উৎসাহিত হইয়া বলেন, তা ভাই তো তোমার অপারগ নয় বাছা, বামুন একটা রাখলেই পারে! শরীর তো তোমার ভাল নয়, আঁষ নিরিমিষ্যি কুটনো বাটনা সবই তো ওই একহাতে!

ইন্দিরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, হায় হায় মাসীমা আবার বামুন রাখবে? কলি-কালে কি কেউ কাউকে অমনি ভাত দেয়, এত বড় মেয়েকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে?

বলিয়াছি যে, হাসি তাহার রোগ, এমন কথাগুলি চোখের জল মুছিতে মুছিতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলে তবেই না তাহার যথার্থ স্বাদ পাওয়া যাইত!

রাজুর মা কেমন যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়েন। কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া যাইবেন বিধাতা পুরুষ এমন করিয়া তাঁহাকে গড়েন নাই। কথা পাল্টাইয়া বলেন, তা যা বলেছ বাছা, মাছ কি 'এস্‌টোভেই' হবে? না কি এবেলা আর ওপাট হয় না? নিরিমিষই সব?

ইন্দিরা তেমনি অপরূপ ভঙ্গীতে হাসিয়া ওঠে, কোথায়? নিরিমিষ কিসের? আমার তো আবার মাছ নইলে খাওয়াই হয় না।

রাজুর মা শিহরিয়া সচকিতে কহেন—আ আমার পোড়া কপাল! অ হাবা মেয়ে, বামুনের ঘরের 'বিধবা' মা, তামাসার ছলেও অমন কথা মুখে আনতে নেই বাছা। মহাপাপ, মহাপাপ, কত জন্মের পাতকের ফলে এ জন্মের এই দুগ্‌গতি, আর পাপ বাড়াসনে বাছা।

ইন্দিরা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলে—তামাসা নয় মাসীমা, মাছ আমি বরাবরই খাই।

রাজুর মা অবিশ্বাসের ভান করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকেন, কিন্তু তখনকার মত কথা আর তাঁহার জোগায় না।

রাজুর কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলেন, শুন্‌লি রাজু, শুন্‌লি, 'আসপদ্দার' কথাটা? নিজের মুখে স্বীকার করা শুন্‌লি? ধন্যি বলি বুকের পাটা! এ্যাঁ! হে মা কালী, ওপর থেকে দেখছো মা, বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে যে মুখে মাছ খায় সে মুখে ওর পোকা পড়ুক।

রাজু হাতের, খুন্তিখানা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলে, তুমিও যেমন মা, স্বভাবই যখন ভাল নয় তখন আর খাওয়ার বিচার—

মা কাংস্য কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া ওঠেন—অমন কথা মুখে আনিস্‌নে রাজি।

স্বভাবচরিত্তিরের কথা কেউ তো আর চাক্ষুস দেখতে যাচ্ছে না। সোমত্ত বয়সে অমন কত কি হয়। তাই বলে সদ্য সদ্য মাছ ভেঙে মুখে দেবে? তিনকুল নরকে পতিত হবে না? ঘোর কলি, ঘোর কলি, কালে কালে কতই দেখবো।

রাজু একখানা আংটাবিহীন কড়ার ভিতর উল্টাইয়া উল্টাইয়া পরোটা ভাজিতেছিল, জননী তাহার দিকে একবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দিনকে দিন কি কুঁড়েই হচ্ছিস লা? করছিলি কি এতক্ষণ? শুকনো 'কাট' দুখানা পরোটা ভাজতে রাত যে তোর দুপুর বেজে গেল, দুখানা বেগুনও তো ভাজিসনি দেখছি, ও ছাই গলা দিয়ে নাববে কি করে?

রাজু অবাক হইয়া বলে, বেগুন আবার কোথা? ওবেলাই তো লালডাঁটার চচ্চরি অমনি হ'ল।

রাজুর মা বিরক্ত হইয়া বলেন, থাকবে আর কোথা থেকে? শনির 'দিষ্টিতে' যে সর্বস্ব উড়েপুড়ে যাচ্ছে মা, আমায় এখনো খাওনি কেন তাই শুধু ভাবি।

এরকম তিরস্কার রাজুর গা-সওয়া, প্রতিবাদ সে করে না। করিলে মার কাছে টিঁকিতে পারিত না। নিঃশব্দে দুইখানা উঁচু উঁচু পাথরের খোরায় দুইগোছা পরোটা রাখে, ঘর হইতে এক বাটি আখের গুড় বাহির করিয়া আনে, একসেরি ঘটি দুইটা ভরিয়া নেয়, খুরসী পিঁড়িখানা মায়ের দিকে আগাইয়া দিয়া নিজে মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া আহারে মন দেয়।

পার্টিশনের অপর দিকে তখন ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে; লুচিভাজা শেষ করিয়া ইন্দিরা গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেগুলা একটা বড় পিতলের কৌটায় ভরিয়া তুলিতেছিল, পিছন হইতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতে আসিতে শিশির বলে, বা, বেশ মেয়ে, রান্না ঘরে একলা একলা দিব্যি হাত চলছে?

ইন্দিরা চমকিয়া তাকাইয়া বলে, ও আবার কি?

শিশির গম্ভীরভাবে বলে, না তাই বলছি, সাধারণ মেয়েরা অবশ্য করেই থাকে, তা থাক, তা বলে তোমার মত একজন বিদুষী ভদ্রমহিলার পক্ষে— সমাজে রাষ্ট্র হয়ে পড়লে মুস্কিল আর কি।

ইন্দিরা তাড়া দিয়া বলিয়া ওঠে, আহা, ইয়ার্কির আর বিষয় খুঁজে পেলেন না। যাও, তোমার সঙ্গে কথা নেই।

—কেন, চুরি ধরে ফেলেছি বলে?

—আঃ, আবার ওই রকম গেঁয়োমী? নিজের দোষ ঢাকতে এখন যা তা কতকগুলো বকা হচ্ছে, না? খুব তো এলে আটটার সময়? অত করে বলে দিলাম কাল—

শিশির হাসিয়া বলে, সবে তো আটটা কুড়ি, এতেই ফাইন ধরবে না কি?

—ধরা উচিত, এক মিনিটে রসাতল হয়ে যেতে পারে, জানো? কুড়ি মিনিট তো—

রসভঙ্গ হয়। ওদিক হইতে রাজুর মা 'ভারীগালে' শুধান, হ্যাঁ মা ইন্দু, দাদা বুঝি তোমার 'সকালই' বাড়ী এলো?

ক্লাব হইতে ফিরিতে দাদার একটু রাতই হয়।

ইন্দিরা চালাক মেয়ে, 'ছিদ্ররহস্য' তাহার অজ্ঞাত নয়. প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেও দেরী হয় না, হাসির একটা ঝিলিক্ তাহার মুখে চোখে খেলিয়া যায়, কিন্তু গলাটা ভারী করিয়া বলে, কই মাসীমা, দাদা কি আর সহজে ফিরবেন? যার নাম সেই রাত দশটা।

রাজুর মা পরম অমায়িক ভাবে বলেন, ঘরে যেন কার গলা পেলাম বাছা তাই শুধুচ্ছি।

শিশির কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল, ইন্দিরা ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া বলে, উহুঁ, একলাই আছি মাসীমা, মিলিটাও আজ সন্ধ্যা বেলাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাসীমা অস্ফুট স্বগতোক্তি করেন, তাতেই তোমার এত বাড় বেড়েছে মা।

ইন্দিরাকে দেওয়ালের সহিত আলাপ জমাইতে দেখিয়া শিশির চটিয়া সিঁড়ির দিকে আগাইতেছিল; ইন্দিরা ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, কি, পালাচ্ছ না কি? ভারী সাহস দেখছি যে!

— তা কি করবো? তোমার অমূল্য সময় যদি বাজে খরচ করতে না পারো, বসে বসে ভাঁড়ারের শিশি-বোতলগুলো গুনতে হবে না কি?

ইন্দিরা সিঁড়ির রেলিঙে হাত রাখিয়া বড় সুন্দর একটু হাসিল।

শিশিরের যাইবার লক্ষণ বিশেষ দেখা গেল না কিন্তু কণ্ঠস্বর সমান গরম রাখিয়া কহিল, হাসছো মানে? ভাবছো যেতে পারি না?

— কই যাও তো?

— যাই না যাই আমার ইচ্ছে, তা বলে মনে করো না, তোমার জন্যে থাকছি।

— আমি তো তাই-ই ভাবছি।

— ইস্, নিজেকে অত প্রাধান্য দিও না। আমি এসেছিলাম, তোমার দাদার কাছে।

— দেখতেই পাচ্ছ দাদা নেই, চলে যাও তবে!

— তোমার কথায় না কি? এই বসলাম, কি করে তাড়াও দেখি।

উভয়েই হাসিয়া সিঁড়িতেই বসিয়া পড়ে। খুব যে সান্নিধ্য বাঁচাইয়া বসে তাহাও নহে।

শিশির বলে, কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? আমাকে যে বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছিলে বড়!

—ও একটি হাসির ব্যাপার, বলবো এখন পরে। শোন, এস্রাজ শুনবে? নতুন একটি গৎ শিখেছি।

—নাঃ থাক, তোমার সাদা কথা এস্রাজের সুরের চাইতে আমার কিছু কম ভালো লাগে না।

—উঃ এতদূর? চিকিৎসা করাতে হয়।

—কতদিন আর জ্বালাবে? দাদার সঙ্গে তো দেখাই হয় না! মিলিটা কোথায়? তোল না একটু ক্ষ্যাপাই—

—থাক, ঢের হয়েছে, নিজেই তো ক্ষেপে রয়েছ।

— যা বললে। সব সময়ে সাদা শাড়ী পর কেন? আমি কিন্তু তোমায় ডুরে শাড়ী ছাড়া কিছু পরতে দেব না।

— আর কি? পরলে তো? ডুরে শাড়ী পরা দেখলে আমার মনে হয় একটা সাপ গায়ে জড়িয়ে ধরেছে।

—তোমার যতসব উদ্ভট কল্পনা। হ্যাঁ, আমায় যে কি একটা বই দেবে পড়তে বলেছিলে? ভুলে গেছ? বেশ, আমিও আর কিছু দিচ্ছি না।

ছোট ছোট সব সাধারণ কথার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি হইয়া আসে নিবিড়। কণ্ঠস্বর যে কখন মৃদু হইয়া আসে টেরই পায় না। তুচ্ছ কথাতেই যে মধু সঞ্চিত থাকে, যাহারা তেমন তুচ্ছ কথা কহিতে জানে তাহারাই শুধু বুঝিতে পারে।

ও পিঠের কথা ইন্দিরার মনেও থাকে না।

তাহার থাকে না, কিন্তু কলিযুগ যদি সত্যযুগ হইত, সকন্যা রাজুর মার ধিক্কারে মা ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই। অথচ কলিযুগ এমনি নিরীহ জীব যে, মা বসুমতী দ্বিধা হওয়া তো দূরের কথা, আকাশ হইতে একটা বজ্র পতন হইয়াও এই নির্লজ্জ মেয়েটার মুখের হাসি ঘুচাইয়া দিতে পারিল না।

গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া হাতের ঘটি-গামছা নামাইতে নামাইতে রাজুর মা কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, বাড়ীওলা গিন্নির দেমাকটা একবার দেখেছিস রাজি? সেদিনকের সেই 'বচসা'র পর থেকে তো আর মাগীর চৌকাঠ ডিঙোইনে। গঙ্গা নেয়ে ফিরছি, দেখি না, মাগী হন্ হন্ করে যাচ্ছে, 'ভদ্দরতাই' করে বললাম, বলি দিদি যে? মা গঙ্গার আজ দেখি বড় ভাগ্যি? মুখখানা বিষ ক'রে থাকল, কথাই কইলে না। আমার বলে গরজ বড় বালাই, সেধে আবার ছুঁড়ীর কথা তুললাম, জানলি রাজু? বলি, অমন ধারা ভাড়াটে রেখে গেরস্তর পাপ বাড়াবেন না দিদি, এই যে বুকের ওপর বসে অনাচার করছে, এটা কি ভাল? বলে কি জানিস—বলে—ভাড়াটের সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ, মাস চুকতেই টাকাটা ফেলে দেয়, সে-ই ঢের, ঘরে বসে কে কি করছে না করছে জানার দরকার কি? শুনলি একবার ঠ্যাকারের কথা? ছোটলোকের পয়সা হলেই এমনিধারা হয়। আমি বামুনের মেয়ে হয়ে প্রাতঃস্নান করে তিলি মাগীর সঙ্গে ডেকে কথা কইলাম, তা একটু নত হওয়া নেই? গোছা ভর্তি চুড়ি হাতে দিয়ে ধরাকে সরা দেখছেন; এত তেজ কি ধর্মে সয়? এখনো দিনরাত হচ্ছে। হরি মদুসূদন! তুমি দেখছো। মেয়েমানুষের তেজ পদ্মপত্রে জল।

রাজু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আমাদেরও মা দুমাসের ভাড়া বাকী পড়েছে।

রাজুর মা বিরক্ত হইয়া কহেন, তুই আর 'নেই আঁকড়ে' কথা কসনে রাজু। বাড়ী ভাড়া নোক অমন ছ'মাস একবছর ফেলে রাখে। মাস চুকতেই দেবার ক্ষ্যামতা কিছু সকলের থাকে না। ঘরে বসে রোজগার করতে তো শিখিনি! তা হলেও বা একটা উপায় হোত। চিরটা কালই দৈন্যদশায় কাটলো! মুখপোড়া বিধাতার বিচারও তেমনি, নইলে তুমিই বা কেন সাত সকালে তিনকুল খেয়ে আমার বুকে এসে বসবে?

ন্যায্য কথা বলিতে গেলেই কেমন করিয়া যেন আপনার দুর্ভাগ্যের খোঁটা আসিয়া পড়ে। বেচারা কাজের ছুতা করিয়া পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু মনে স্বস্তি থাকে না। মা যে তাহার হাঁড়ি মুখ করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিবে তাহাও ভাল লাগে না। ঘুরিয়া

ফিরিয়া আসিয়া বলে জানো মা, হল্‌দে বাড়ীর ওই নীচের তলার ভাড়াটেদের বৌটাকে শাশুড়ী-ননদে মিলে কাল কি খোয়ারটাই করলে, আহা মারতে শুধু বাকী রাখলে। বুড়ির যা শাসন, বলে কি— আসুক আজ নবনে, তোকে যদি না জুতো খাওয়াই তো আমার নাম নেই।

রাজুর মা কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না, কহেন—কখন লা? আমি কোন্ চুলোয় ছিলুম, কই দেখ্‌লাম না তো! যেন এমন একটা মুখরোচক বস্তুর পরিচয় না পাওয়া রাজুর মার পক্ষে একপ্রকার ক্ষতি।

— তুমি? তুমিও যেই ভাগবদ কথা শুনতে বেরুলে, সন্ধ্যে জ্বেলে ধুনো দিচ্ছি আর বাঙাল বুড়ির চীৎকার কানে এল, বৌকে কি শাপ-শাপান্ত, বাব্বাঃ!

—কি হয়েছিল কিছু বুঝলি? বৌটাকে তো হাবাগোবা ভালমানুষ বলে মনে হয়, করেছিল কি?

—কি জানি মা ভাল বুঝতে পারলাম না; নাকছাবি নাকছাবি করছিল তো বারবার; হারিয়ে টারিয়ে ফেলে থাকবে। তা সে যাই করুক, অত যন্ত্রণা দেওয়া কিন্তু ভাল নয় বাপু, পাঁচটা বাড়ীর লোক কাতার দিয়ে দাঁড়াল, বুড়ির গলার জোরে, ছিঃ!

'অল্পবয়সী বৌঝির' 'খোয়ার' শুনিলে রাজুর মার, কেন জানি না, বড় আনন্দ হয়। একমুখ হাসিয়া বলেন, তা আপচো নষ্ট করলে শাউড়ী ননদে অবিশ্যি শাসন করবে। সোনার সামিগ্রী হারালে কি আর টাটে তুলে ফুল চন্দন দে পূজো করবে? তা পর, কি হল? ছোঁড়া এসে কি বল্‌লে টল্‌লে? মার-ধোর করলে বোধ হয়।

— তা আর কিন্তু শুনিনি মা, বিষ্টি এল বলে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম কি না। বর ওর কখন এল টের পাই নি। সন্ধ্যে বয়ে যাচ্ছিল, আহ্নিক করতে বসলাম।

রাজুর মা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া বলেন, তোর যে কেমন এক-দশা; কি হ'ল শেষটাই জানতে হয় তো! আহ্নিক তো পালাচ্ছিল না বাছা। এমন আশ্চয্যি, কোন চুলোয় যদি বেরিয়েছি তো অমনি—আ মোলো, আবার যে বৃষ্টি এল চড়বড়িয়ে? মুখপোড়া আকাশ, দিনরাত্তির কেঁদে কেঁদে মরছেন। মুখে কেউ নুড়ো জ্বেলে দেয় না!

—ও মা, ঘুঁটে ক'খানা যে বাইরে পড়ে— বলিয়া রাজু ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

মা হরিনামের মালা গাছটি হাতে করিয়া বোধ হয় হরিনামের উদ্দেশ্যে 'ছিদ্রপথে' আসিয়া দাঁড়ান।

ঠিক তেমনি সময়ে ভিজিতে ভিজিতে এক গা জল লইয়া শিশির আসিয়া হাজির। ইন্দিরা বঁটি পাতিয়া কুটনো কুটিতে বসিয়াছিল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলে, একি কাণ্ড? ভিজে যে নেয়ে গেছ?

শিশির চুলের জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঁচু গলায় বলিয়া ওঠে, তোমার পরম পূজনীয় দাদাটি গেলেন কোথায়? ডাক তাঁকে।

ইন্দিরা হাসিয়া.ফেলে—সক্কাল বেলা দাদা তোমার ঘরে আগুন দিয়ে এল নাকি? হ'ল কি? এই নাও তোয়ালে, মাথাটা মোছ তো আগে, কাপড় এনে দিচ্ছি, বদলে ফেল। ছিঃ ছিঃ, কি ভীষণ ভিজেছ!

শিশির মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলে—আর থাক, যথেষ্ট আত্মীয়তা হয়েছে। ডাক দাদাকে, আমি আজ একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—কি মুস্কিল, দাদার তো এখন অর্ধেক রাত; ততক্ষণ বরং শুকনো কাপড় পরে এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে তাজা হয়ে নাও, তার পর সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হ'য়ো।

—কেন, আমি কি তোমার এক পেয়ালা চায়ের লোভে টালা থেকে টালিগঞ্জে ছুটে আসছি?

ইন্দিরা মুখখানি ভাল মানুষের মত করিয়া বলে, তা' হলে?

তা হ'লের উত্তরে হয়তো অনেক কিছু বলিবার ছিল, নীরেন আসিয়া চেঁচামেচি বাধাইয়া তোলে, আরে, একি? রাত দুপুরে ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও হয়ে চোখ রাঙানো? মানে কি? মিলিটা তো ভয় পেয়ে—

শিশির বিস্ফারিত চক্ষে বলে, রাত দুপুরে!

—নাতো কি? এই বাদলার দিনে এ সময়ে কোন্ ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে উঠেছে? ছিঃ ছিঃ, কাঁচা ঘুমটাই মাটি করে দিলে।

নীরেন হতাশভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়ে—অনেক সাধনার জিনিষ হে, বোঝ না তো মর্ম্ম?

— দাদা, দাদা, তুমি আর বলো না, তোমার তো সাধনার জিনিষ নয়, সাধা জিনিষ। ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া ওঠে।

—তাই তো বলছি রে, ছেলেবেলা থেকে সাধনা করে করেই না এখন সাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শিশির যে ভিজে কাকটি হয়ে? ইন্দু, একটা কাপড়-জামা দে। মিলি, তোয়ালে আনো।

—এই তো দাদা, সব হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি, বাবু যে নেবেন না? ভীষণ রাগ! ঘুম ভেঙে ছুটে এসেছেন, তোমায় বিনা নোটিশে ছ'মাসের ফাঁস দেবেন।

নীরেন হতাশভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলে, অপরাধ? যেন ঘরের দেওয়ালে অপরাধ খুঁজিয়া পাইবে।

শিশির চুলের মধ্যেকার জলকণাগুলি ইচ্ছাকৃত অসাবধানে ইন্দিরার গায়ে ছিটাইতে ছিটাইতে সব্যঙ্গে বলে, আজ্ঞে অপরাধ আপনার কেন? আমারই। বলি মশায়, পরের বৌ আটকে রেখে দিনরাত ঘুমের সাধনা করাই বা কেমন ভদ্রতা?

ইন্দিরার হঠাৎ যেন ঘরের ভিতর কি একটা কাজ পড়িয়া যায়। উঠিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না।

নীরেন বিস্মিত হইয়া বলে, পরের বৌ আটকে? এবং পরক্ষণেই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিশিরের পিঠে ভীষণ দুইটা থাবড়া মারিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরাইয়া তোলে।

মেয়েমানুষের হাসি তো অসহ্যই, পুরুষের হাসিও রাজুর মার গায়ে বিষ ছড়াইয়া দেয়। ঠোঁট উল্টাইয়া বলেন— কিসের সুখে যে লোকে দিবে-রাত্তির ঘর ফাটিয়ে হাসে তাও জানিনে। কথায় বলে 'উচ্চহাসি সর্বনাশী'। হরি মধুসূদন, হরি মধুসূদন, যত হাসি তত কান্না।

ইহার পর যে কথাবার্তা চলিতে থাকে তাহার সাড়ে তের আনা রাজুর মার অবোধ্য। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসেন; ঝাঁটা মার না অমন কথার মুখে।

এবং সরিয়া আসিয়া কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া এবার বোধ হয় সত্যসত্যই পূজায় মন দেন।

ও অঞ্চলে আরো যে কি হইল রাজুর মার অগোচর! রাজু ছুটিয়া আসিয়া বলে, ও মা, শুনছ কাণ্ড?

মা তাহার তখন পূজাপাঠ সারিয়া একবাটি চালভাজা লইয়া গুছাইয়া বসিতেছে। বলে, একটা কাঁচা লঙ্কা দে তো রে রাজু, তোর যে আবার চালভাজা মুখে রোচে না। খা না এক মুঠো, বর্ষার দিনে লাগবে ভালো।

—আচ্ছা, রাখো দু'টি। শোনো তাহলে বলি মা, মেয়েটাকে আমরা বিধবা বলে ঠিক করে রেখেছি, শুনছি নাকি বিয়েই হয় নি এখনো। কি ঘেন্নার কথা মা, ছি ছি, না-হক কতদিন কত ছাইভস্ম বলা হয়েছে তার ঠিক নেই। আমার কিন্তু মাঝে সন্দেহ হত বাপু।

সন্দেহ যে রাজুর মারও না হইয়াছে তাহা নয়; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে সন্দেহকে আমল দেন নাই। রাজুর চাইতে যে মেয়ে বড় বই ছোট হইবে না, তাহার যে আজও সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যত পড়িয়া আছে এই কি মনে স্থান দিবার মত কথা!

অপ্রসন্ন মুখে বলেন, এ সুখবরটি কানে ধরে তোমায় বলে গেল কে?

রাজু মাতার অপ্রসন্নতাটুকু লক্ষ্য করিল না, সহাস্যে কহিল, সব যে শুনলুম নিজের কানে। ওই ছেলেটার সঙ্গেই নাকি, অনেক দিন থেকে বিয়ের ঠিক। ভাজ হঠাৎ মারা যাওয়াতে, কে কচি 'মাওড়া' মেয়ে দেখে তাই বলে বিয়ে করতে পারছিল না। এখন বড় হয়েছে, কোন বোর্ডিঙে নাকি ভর্তি করে দেবে। কথার ভাবে ভঙ্গিতে সবই বোঝা গেল। আসছে মাসেই নাকি বিয়ে!

রাজুর মা নিঃশব্দে মুঠো মুঠো চালভাজা গিলিয়া একঘটি জল সাবাড় করিয়া ঘটিটা সশব্দে মাটিতে ঠুকিয়া বলেন, তবে আর কি, শিন্নি মানি গে!

রাজু অপ্রতিভ হইয়া বলে, না তাই বলছি—শুনলাম কি না। হলে কিন্তু বেশ মানায়, না মা? মেয়েটাও যেমন খাসা দেখতে ছেলেটারও তেমনি চেহারা। বেশ সাজন্ত হবে।

সহসা রাজুর মা জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন, হবে তা তোর কি লা? দিনরাত পরের কথায় তোর কিসের কাজ? হাতের নোয়া ঘুচিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়েছে। পূজো নেই, আহ্নিক নেই, দুদণ্ড ঠাকুরদেবতার নাম নেই, খালি পরচর্চা। লোকের সুখ ঐশ্বয্যি দেখে দাঁত বের করে হাসতে লজ্জা করে না? বেহায়া ছুঁড়ি কোথাকার। দূর হ, আমার সুমুখ থেকে দূর হ। একটা সাতছেলের মা বুড়োমাগীর বিয়ে না 'নিকে', তাই নিয়ে আদিখ্যেতা করতে এসেছে! যমেও নেয় না তোকে?

বিদ্রোহ করিতে রাজু জানে না। অন্যায় তিরস্কার তাহার গা-সহা। সামনে থাকিলে উত্তরোত্তর বাড়িবে বই কমিবে না জানিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায়।

মাতা কন্যার গমন-পথের পানে বিষদৃষ্টি হানিয়া রূঢ় চাপাগলায় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া

বলেন, সোমত্ত মেয়ে মা-বাপের বুকের ওপর শুধু হাত নেড়ে বেড়ানোর চেয়ে কুলে কালী দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াও ভাল। দিনরাত চক্ষুশূল হয় না।

রাজু শিহরিয়া ভাবে, রাগিলে মার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। থাকে না-ই বটে। গুম হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজুর মা দুম্‌দুম্‌ করিয়া পা ফেলিয়া উঠিয়া পড়েন। পায়ের ধাক্কায় একটা নিমীলিতা নয়না বিড়ালবালা সচকিতে ছুটিয়া পলায়, জলের ঘটিটা কাৎ হইয়া গড়াইয়া যায়, চালভাজার বাটিটা ছিটকাইয়া 'হেন্‌শেলে' আশ্রয় লয়। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সযত্নরোপিত টবের তুলসী-চারার গোড়া খুঁড়িয়া খানিকটা মাটি লইয়া পার্টিশনের গায়ের সাধের জানালায় লেপিয়া দিয়া আসেন। এবং কিছু যেন সান্ত্বনা পাইয়া টানিয়া টানিয়া সনিঃশ্বাসে বলেন, গেরস্ত ঘরের মেয়ের নিত্য নতুন 'নীলেখেলা' আর চোখে দেখা যায় না। হরি নারায়ণ! হরি নারায়ণ! বামুনের ঘরের মেয়ে হই তো রাত পোহাতেই এ পাপ-পুরী ত্যাগ করে তবে আর কাজ।

বলিয়াছি যে, রাজুর বুদ্ধি শুদ্ধি অল্প, মায়ের ব্যবহারের অর্থ বোঝে তাহার সাধ্য নয়। বিধবা মেয়ের লীলাখেলা হাসিয়া হাসিয়া উপভোগ করিতে যাঁহার বাধে না, কুমারীতেই বা তাঁহার এত আপত্তি কিসের, বেচারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, বোকার মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে।

১৩৪৪ সালের আনন্দবাজার, শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

মনস্তত্ত্ব

শ্রীআশালতা সিংহ

আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার তীব্র নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখি। বলিতে গেলে সেই জোরেই আমার কাগজখানা আজ কাল কার এই বাজারেও বেশ চলিতেছে, মাঝে মাঝে প্রবন্ধগুলি গৃহিনীকে পড়িয়া শোনাই। তিনি শুনিয়া খুসী হন এবং বেশ তারিফ করেন, কারণ তিনি দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়িয়াই লেখাপড়ায় ইতি করেন। বাড়ীতে অনেক গুলি ভাইবোন ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে তাহাদের খেলা দিতে নাওয়ানো খাওয়ানো সমাধা করিতে বিদ্যার দৌড় ঐ দ্বিতীয় ভাগ অবধি আসিয়া থামিয়া গেছে। আর অগ্রসর হইবার অবকাশ পায় নাই। সেজন্য তিনি মনে করিতেন যাহারা দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়িয়া লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই সুগৃহিনী হইবার উপযুক্ত। আর যারা কেতাবে অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে তাহারা দিনরাত্রি ফ্যাশান সিনেমা থিয়েটার হুজুগ এবং স্বামীকে নিত্য নূতন ফন্দীতে জ্বালান ছাড়া আর কোন বিষয়েই পটু নয়। যাই হোক দিন কাটিতেছিল একরকম শান্তিতেই। অফিস যাইবার সময় হাতের কাছে পান সাজা ভর্ত্তি ডিবা পাই। খাইতে বসিয়া সুক্তো এবং মাছেব ঝালের স্বাদ ভালোই হয়। গৃহিনী গর্ব্ব করিয়া বলেন আজকালকার ইংরেজী জানা মেয়ে বিয়ে করলে এমনই হতো? তখন একদিন উড়ে বামুন পালালে তোমাকে ভিজে চাল কিংবা দোকানের খাবার খেয়ে অফিসে দৌড়াতে হতো। টের পেতে মজাটি। আমি ও সায় দিয়া বলি, তা বটে।

এমনই করিয়া বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রথম মেয়েটি নবছরে পড়িয়াছে। বাড়ীর আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রতিবেশী হরি বাবুর বাড়ীতে তাঁহার ছেলেদের মাষ্টারের কাছে পড়া বলিয়া লইয়া কখন যে সে ইংরাজী গ্রামার শিখিয়াছে এবং ভগ্নাংশের আঁক কষিতে সুরু করিয়াছে আমি তাহার কিছুই খবর রাখি না। সেদিন সকাল বেলায় বাইরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের জন্য একটা ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লিখিতেছি। তাহাতে আজকালকার মেয়েদের স্যাণ্ডাল এবং চশমা পরা হইতে সুরু করিয়া তাহাদের হাঁচি কাসিটিকে অবধি কষিয়া গাল দিয়াছি। সবচেয়ে চোখা কথাগুলি শেষে দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব ভাবিতেছি এমন সময় মেয়েটি আসিয়া আব্দারের সুরে কহিল বাবা আমি স্কুলে ভর্ত্তি হবো। বীণা, রমা ইলা, বেবী সবাই তো স্কুলে পড়ে। অবনীবাবু বলছিলেন আমি যদি স্কুলে ভর্ত্তি হই খুব অল্প বয়সেই ম্যাট্রিক দেব। আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। বীণা, রমা, বেবী এ সব যে একেবারে অতি আধুনিক নাম। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক এ সব ভয়ঙ্কর কথা সুবোধিনী শিখিল কোথা হইতে? ন বছরের মেয়ে এবার তাহার রান্নাঘরের কাজে এ্যাপ্রেন্টিস্‌গিরি করিবার সময় হইয়াছে। সুপবিত্র প্রাচীন হিন্দু বাড়ীর কন্যা হইয়া এমন বিবেক বিরুদ্ধ কথা তাহার মুখে শুনিয়া আমি দস্তুর মত আঘাত পাইলাম। কাগজে বড় বড় কথা লিখিয়া কথা বলিবার ভঙ্গীটাও আমার কেমন বক্তৃতার ছাদের হইয়া গিয়াছিল,

হঠাৎ শুনিলে মনে হইত স্কুলের ছেলেদের ডিক্টেশন দিতেছি। আমার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সুরু করিলাম, দেখ সুবোধিনী তুমি হিন্দু বাড়ীর ন বছরের মেয়ে এখন আর তোমার বালিকা সুলভ চপলতা শোভা পায় না। তোমার উপর ভবিষ্যৎ জাতি গঠন নির্ভর করছে। স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে কতকগুলো বিজাতীয় শিক্ষা গলাধঃকরণ করবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? নারী-জাতির যা চরম কর্ত্তব্য সেই গৃহস্থালীর কাজকর্ম শেখা, রন্ধন অবহেলা করনা .... কথার মাঝখানে বাধা দিয়া মেয়ে হাসিয়া বলিল রান্না করলে বুঝি স্কুল যাওয়া যায় না। ওই যে নীনাদের স্কুলের মিষ্ট্রেস ননীদি বারো মাস নিজে রান্না করেন, আর সাড়ে নটার মধ্যে তৈরী হয়ে স্কুলে যান সে হয় কি করে আমি বুঝি সকালে কতদিন তার বাড়ী যেয়ে দেখিনি? ওই তো কাছেই তার বাড়ী। এখান থেকে দেখা যায়। উনি কি করেন শুধু রান্না, কত কাজ করেন কী চমৎকার সব এমব্রয়ডারি। আর কত পড়েন। উনি বলেন সারাদিনে ঘণ্টা দুইয়ের বেশী রান্নাতে দিতে হয় না। যদি বুদ্ধি করে ব্যবস্থা করা যায়। তা বলে উনি মায়ের মত শিল পেতে একরাশ লঙ্কা বাঁটেন না, কিংবা সকাল থেকে সুক্তো, শাক, ছেঁচকি, আবোল তাবোল দশটা তরকারী করেন না।

যত শুনিতেছিলাম ততই বিস্ময়ে হতবাক হইতেছিলাম। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করিতেছিল। উঠিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা ভেবে দেখব, তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা স্থির করব। আজ আমার অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে সুবোধিনী, সুবোধিনী কহিল আচ্ছা। কিন্তু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ লাভ নেই। তিনি শুধু বড়ি, ডালা, কুলো, হাঁড়ি, সরা এই সব নিয়েই ব্যস্ত। আপনি নিজেই ভেবে মত দেবেন বাবা। আর আমাকে সুবোধিনী বলে ডাকবেন না। এবার তার জায়গায় সুচরিতা বলে ডাকবেন। ননীদি বদলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নাম জিনিষটাও ফেলনা নয়। ওটাও বেশ সুন্দর হওয়া চাই। আমি অবশ্য ননীদির সব কথা বুঝতে পারি না। কিন্তু সুচরিতা নামটাই আমার বেশী ভালো লাগে। আপনার লাগে না বাবা।

গৃহিনীর কাছে কথাটা পাড়িতেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন। নিজের মেয়েকে আজকালকার মেয়েদের মত পটের বিবি করতে চাও করো। তারপরে মজা যখন টের পাবে তখন কিন্তু ভুগবার বেলায় আমি ভুগছিনে।

কথার সঙ্গে তাঁহার হাতের খুন্তি ঘন ঘন চলিতে লাগিল, কড়াইটা দুম করিয়া নামাইয়া কহিলেন, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। দাঁড়াও তো আমি দেখাচ্ছি মেয়েটার মজা। হরি বাবুর বাড়ীতে আনাগোনা করে যত খ্রেষ্টান মাগীগুলোর সঙ্গে মেলামেশার ফলে অধঃপাতে গেছে। দুদিনে আমি শায়েস্তা করচি, কোথা সে?

আমি তখনকার মত তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। স্মরণ করাইয়া দিলাম, হরি বাবু আমাদের বাড়ীওয়ালা, লোকটি অতিশয় ভদ্র এবং অমায়িক। এবং আমার গৃহিনীর যেরূপ শুদ্ধাচার বা শুচিবাই তাহাতে কলিকাতা সহরে এত অল্পভাড়ায় এমন সর্ব্বদিক দিয়া সুবিধার ভাড়াবাড়ী আর না পাওয়া যাইতে পারে। তখন আমার চেয়ে অসুবিধাটা ঘটিবে তাঁহার ঢের বেশী। অতএব গলার স্বরটা একটু নামাইলে যেন ভালো হয়। আহার শেষ করিয়া

পান এবং দোক্তার ডিবেটি সঙ্গে লইয়া অফিস রওয়ানা হইলাম, কথাটা তখনকার মত চাপা পড়িল।

পাঁচটার সময় অফিস হইতে ফিরিতেছি, দেখি আমাদের পাশে হরিবাবুর আর একটা যে ছোট বাড়ী আজ দিন তিনেক হইতে খালি ছিল তাহাতেই ভাড়াটে আসিয়াছে। ভাড়া গাড়ীর মাথায় তোলা উনুন, রজনীগন্ধার টব, খালি হর্লিক্স এবং গ্লুকোজের টিন, আচার এবং মোরব্বার জার, ইকমিক কুকার রকমারি জিনিষ। দেখিয়া মনে হয় নূতন ভাড়াটেরা একটু সৌখিন প্রকৃতির এবং আধুনিক। ভাড়া গাড়ীর পিছনে কিছু দূরে একটা ট্যাক্সি আসিতে ছিল, আসিয়া দোরগড়ায় থামিল। একজন সুশ্রী বাঙ্গালী ভদ্রলোক নামিলেন, তাঁহার বছর পাঁচেকের একটি ছেলেই হইবে বোধ করি বাপের কোলে চড়িয়া নামিল। তাহার পর স্যাণ্ডালশোভিত চরণযুগল এবং ফেরতা দিয়া পরা লম্বা স্কার্ট পাড়ের ঝলমলানি দেখিয়া বিতৃষ্ণায় তাড়াতাড়ি চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইলাম। আমারই বাড়ীর পাশে আধুনিক শিক্ষিতা স্যাণ্ডাল পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা দিব্য সংসার জমাইয়া বসিবেন চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধবিষ্ট হইয়া উঠিলাম এবং স্থির করিলাম আজই সুবোধিনীকে ডাকিয়া বকিয়া দিব, তাহার স্কুলে ভর্ত্তি হইবার প্রস্তাবে কোন মতেই রাজী হইব না। ওর ঘন ঘন হরিবাবুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিব। অফিস হইতেই শরীরটা অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছিল, সহরে ভারি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে তাহারই বিষ শরীরে ঢুকিল নাকি বুঝিতে পারিতেছি না। এ সময়ে আদা দেওয়া গরম এক পেয়ালা চা পাইলে ভালো হয়। বাড়ীতে পা দিয়াই হাঁকিয়া বলিলাম ওগো এক পেয়ালা চা আদা দিয়ে খুব গরম গরম এনে দাও। গৃহিনী উত্তপ্তস্বরে বলিলেন দাঁড়াও। আমার এখন মরবারও অবসর নেই। ঝি মাগী বাসনে এঁটোর দাগ রেখেছে। লঙ্কা মজিয়ে দিয়ে গেল, এই অবেলায় নেয়ে মরি, সুবোধিনী কোথা গেল? ডাক না তাকে ধিঙ্গি মেয়ে একটি কুটো ভেঙ্গে দুগাছি করবে না। রাতদিন নেকাপড়া হচ্ছে ঝাঁটা মার অমন নেকাপড়ার মুখে।

সুবোধিনীর খোঁজে গিয়া দেখিলাম সে বেচারী লেখা করে নাই, ক্ষুধার্ত্ত এবং ক্রন্দনরত ভাইগুলিকে প্রাণপণ চেষ্টায় ভুলাইয়া রাখিতেছে। আমার প্রস্তাব শুনিয়া ম্লান মুখে কহিল বাবা কেমন করে চা করবো? মা তো আমাকে ভাঁড়ার ছুঁতে দেবে না। সেই নিজে স্নান করে কাপড় ছেড়ে তবে কখনো ভাঁড়ার থেকে জিনিষ বার করে দেবে। এই দেখচ না এরা খিদেয় কাঁদছে তবুও ... যদি প্রবন্ধে শুদ্ধান্তঃচারিনীদের একান্ত শুদ্ধাচারের পক্ষ লইয়া অনেক যুক্তিবাণ বর্ষণ করিয়াছি। তথাপি বড় বিরক্ত হইয়া বাজার হইতে জলখাবার আনাইয়া ছেলে গুলাকে ঠাণ্ডা করিলাম এবং চা চিনি কিনিয়া আনিয়া সুবোধিনীর হাতে দিলাম। ঐটুকু মেয়ে বেশ নিপুণতার সহিত তাহার ক্ষুদ্র গৃহিনীপনা সমাধা করিল।

শেষ অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতই বোধ হইতেছে, পরদিন সকালে অসুস্থ শরীর লইয়া অলসভাবে শয়ন ঘরের ইজিচেয়ারটায় বসিয়া আছি। পাশের নূতন ভাড়াটেদের জীবনস্রোতের কলগুঞ্জন এখান অবধি ভাসিয়া আসিতেছে। গোলমাল না বলিয়া গুঞ্জন বলিতেই ইচ্ছা করে। একটি মিষ্ট নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল ...... ওমা তুমি এতক্ষণে উঠলে।

আমার কতক্ষণ সব রজনীগন্ধা আর গোলাপ গাছের টবে জল দেওয়া হয়ে গেছে। দুবার চায়ের জল গরম করলাম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ... একটু দাঁড়াও আমি চট করে তোমার ডিমটা ভেজে আনি। ওকি খোকা কেকটা ফেলে উঠছিস কেন। আমি কাল রাত্রিতে তোর জন্য নিজে করেছি। ও ঐ আঁকুর বেরোনো ছোলাগুলোর উপর খোকার বড্ড লোভ। শুধু খোকার নয়, তোমার ও দেখচি..... সকাল নটা দশটা পর্য্যন্ত এমনই গল্প হাসি কথাবার্ত্তা প্রতিনিয়তই শোনা যাইতে লাগিল। মন্দ লাগিতেছিল না। একলা চুপ করিয়া শুইয়া আছি। অফিসে ছুটি লইয়াছি। কোন কাজ নাই। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বই খুলিয়া নাড়া চাড়া করা এবং লেখা ছাড়া গল্পের বই কস্মিন কালেও পড়ি নাই। এ যেন একটি গল্পের নির্বার স্রোত পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অন্য সময় কেমন লাগিত জানি না। হয়তো কেন নিশ্চয়ই ভাল লাগিত না। আজ কিন্তু মন্দ লাগিতেছে না। দুপুরবেলা মা বোধ হয় ছেলেকে পড়াইতে বসিলেন। পড়াইবার আওয়াজ খোকার কথা ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না, খোকার বাবা নিশ্চয় কাছারি কিংবা অফিস গিয়াছেন। অনুমান ভুল নয় চারটার সাড়া পড়িতে পড়িতেই স্টোভের আওয়াজ পাওয়া গেল। পোয়ালা নাড়ার ঠুন ঠুন শব্দ ষ্টোভে কচুরি সিঙ্গাড়া ভাজিবার সুঘ্রাণ তারপর একটা ভারি জুতার শব্দ এবং তারপর খাওয়া এবং খাওয়ানোর সহিত মিলিয়া রাজ্যের গল্প হাসিতে জায়গাটা যেন মুখর হইয়া উঠিল।

আজ যদি সত্যি সিনেমা যেতে চাও চটপট কাজ সেরে নাও। কাজ আমার অনেকক্ষণ সারা হয়ে গেছে মশায়। ওবেলায় মাংস আর ইক্‌মিক কুকারে পোলাও করেছিলাম। দুপুরে তুমি অফিস বেরিয়ে গেলে পরে। ফিরে এসে ষ্টোভ জ্বেলে একটু গরম করে দিলেই চলবে, আজ তোমার পড়বার ঘরে একটা জিনিস দিয়ে এসেছি। কি আন্দাজ করোনা। পারলে না? রজনী গন্ধার একটি তোড়া। কি বলছ? যা পরি তাতেই মানায়। অত আর বাড়িয়ে বলোনা বাপু। কেন আজ বুঝি মাছের কচুরিটা অন্য দিনের চেয়ে ভালো হয়েছে? খোকাকে বাপু আমি তাড়াতাড়ি স্কুলে দিতে চাইনে। আমার কাছে পড়ে ত ও চমৎকার প্রোগ্রেস করছে। স্কুলে সেই তো আর সবার সঙ্গে এক বছরে এক ক্লাস।

ক্রমশ রাত্রি হইল। একাকী ঘরে বসিয়া অনেক কথা ভাবিতেছিলাম। পাশের বাড়ীর জীবনধারার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে নিজেকে তেমন একাকী লাগে নাই। কিন্তু বোধ হয় তাহারা বেড়াইতে গিয়াছে কিংবা সিনেমায় গিয়াছে। সমস্তই নিঃশব্দ। সুবোধিনী এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিয়া কহিল বাবা একা কি ভাবচেন? একটু দুধ খান, ঘুমোন। অসুস্থ শরীরে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভালো নয়। বেচারীর মুখখানি ম্লান। স্কুলের কোন প্রসঙ্গই তুলিল না। বোধ হয় মায়ের কাছে কষিয়া বকুনি খাইয়াছে।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ ঠাহর নাই। ঘুম ভাঙ্গিল একটা সুমিষ্ট করুণ সুস্বরে। পাশের বাড়ীতে এস্রাজ বাজিতেছে।

হরিবাবু পয়সার সাশ্রয় করিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটাইয়া যে ভাড়াবাড়ী করিয়াছেন, সে গুলি একই বাড়ীর মত। শুধু মাঝখানে একখানা পার্টিশানের দেয়াল। ধুপের সুঘ্রাণ এবং রজনী গন্ধার সৌরভটুকু অবধি স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সকালে উঠিয়া সুবোধিনীকে

চুপি চুপি ডাকিয়া কহিলাম আজ তুই স্কুলে ভর্ত্তি হবি। আমার কাছে টাকা নিয়ে রাখিস। ফর্ম্ম আনিস, আমি সব লিখে দেব। ভেবে দেখলাম আমার আপত্তি নেই। সুবোধিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল ফর্ম্ম কবে এনে রেখেছি। ননীদি সব ঠিক করে দেবেন বলেছেন কিন্তু মা—

কহিলাম তোর মাকে আমি ঠেকিয়ে রাখব ভাবনা করিসনে।

মেয়েটি পুরোপুরি উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে। এস্রাজ বাজাইতে ও বেশ শিখিয়াছে। আমি অবশ্য কাগজে পুরাদমে প্রবন্ধ লিখিতেছি এবং সে প্রবন্ধের সুর ঠিক তেমনি আছে, তেমনি ঝাঁঝালো এতটুকু বদলায নাই। আমার এবম্বিধ আচরণ হয়তো মনস্তত্ত্বঘটিত কোন জটিলতম সমস্যাব মধ্যে পড়ে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব নামটাই শুনিয়াছি, ও বস্তু লইয়া কখনো চর্চা করি নাই।

'আনন্দবাজাব পত্রিকা'—১৩৪৫

নিতাই দাসের মেয়ে

শ্রীকণা দত্ত

সাদা আর রাঙ্গা শালুকফুলে ডোবাটার অর্দ্ধেকটাই ছাওয়া, পানিফল আর শুশনি শাকে বাকী অর্দ্ধেকটা। দূর থেকে হঠাৎ চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন, কচি সবুজ নরম গালিচাতে, কে মুঠো ভরে ছড়িয়ে দিয়েছে —একরাশ রাঙ্গা আর শাদা ফুল। প্রচুর কৃশতা এবং ততোধিক দীর্ঘতায় অবনত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে গোটাকয়েক নারকেল গাছ, ঠিক ঐ ডোবাটার পানেই। মনে তাদের ঐ পাতা ঢাকা জলের বুকে, নিজেদেরই প্রতিবিম্ব দেখে নেবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কিনা, কে তা জানে?

কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গোটাকয়েক তাল গাছের গুঁড়ি কেটে পর পর সাজিয়ে, একটাঘাট পাড়ার মেয়েদের সারাদিনের অর্দ্ধেক প্রায় সেখানেই কাটে; অত্যাবশ্যক বিবিধ প্রয়োজনের তাগিদে। নিতাই দাস— যার এই ডোবাটা—সে যে ইচ্ছে করলে বাঁধান ঘাট একটা না করতে পারত তা নয়। কিন্তু মেয়েদের, যারা কিনা তার কাছে ঐ ডোবাটার চেয়েও অপ্রয়োজনের সামগ্রী, তাদের কোন সুখ সুবিধার জন্য এতটুকু পয়সা বৃথা ব্যয় করতে সে রাজী নয়। যত দিন ঐ তালগাছের গুঁড়িগুলো, বৃষ্টিতে পচে না ভেঙ্গে পড়ে, ততদিন পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত মনে উদাসীন থাকবে, এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ঘরে পোষা এক পাল সাদা কাল হাঁস, ঐ ঘন আবর্জ্জনার ভেতরেই কোন মতে করে নিয়েছে, নিজেদের বিচরণের যথোপযুক্ত ঠাঁই। তারই ভেতর কখনও ডুবে, কখনও ভেসে তাদের দিনের পর দিন কাটে। সন্ধ্যেবেলা নিজেরাই জল থেকে উঠে, গা ঝাড়তে ঝাড়তে সিক্ত দেহে গিয়ে ঢোকে নিজেদের নির্দিষ্ট আশ্রয়টুকুতে। জানে, সেখানে মজুদ আছ ভুষি আর জল দিয়ে মাখা ভাত একান্ত তাদের জন্য।

ডোবাটার ঠিক পাড়েই, আম বাগানের স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় নিতাই দাসের মাঠকোঠার বাড়ীখানা। রাঙচিতের গাছ কেটে কেটে বেড়া দেওয়া হয়েছে তার চারিদিকে। অজস্র নীল অপরাজিতা, রক্তরাঙ্গা তরুলতা, আর বিচিত্র বেগুনি রং এর ঝালর লাগান ঝুমকোলতা বেড়াখানি ছেয়ে গেছে। অযত্ন বর্দ্ধিত বুনো লতা, কারও তত্ত্বাবধানের প্রতীক্ষা রাখে না। আপনার মনে আপনিই বেড়ে চলেছে, অবকাশহীন দ্রুত কালের তালে তালে পা ফেলে। কাল কিশোরী মেয়ের, শুভ্র নিষ্কলঙ্ক অন্তর শোভার মতই, নীল অপরাজিতাগুলির শুভ্র বুক, আরও কুণ্ঠিত সলাজ দৃষ্টি। বাড়ীর চারিদিকের বাগানে, বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই কিছু না কিছু ফল মজুদ থাকে। বুড়ো নিতাই দাস, সমস্ত রাত অন্ধকারে প্রেতের মত ঘুরে ঘুরে সেই বাগান পাহারা দেয়। বাদুড় আর চোরের সাধ্য কি, নিতাই দাসের সেই জ্বলন্ত জাগরিত সজাগ দৃষ্টির এতটুকু কাছে এগোয়। কার জন্য যে এত সঞ্চয়ের আকণ্ঠ তৃষা, নিতাই তা নিজেই বোঝে না। তবু, স্বামী স্ত্রী প্রাণপণে সঞ্চয় করে প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম সামগ্রী। রাতের সীমাহীন অতল অন্ধকারে বারে বারে নিজের বাড়ীটার দিকে চেয়ে নিতাই দেখে নেয়।

তৃপ্ত শীর্ণমুখখানি তার কি যেন এক অব্যক্ত হিংস্র আনন্দে ভরে ওঠে। নীচ সে—অপরের অস্পৃশ্য না হলেও, বংশ মর্যাদায় অনেক, অনেক নীচে তার স্থান তা সে জানে; তবু সে সুখী। অসহ্য গর্ব্বে বুকখানা তার ফুলে উঠে। তার পূর্ব্বতন তিন পুরুষ ধরে ধরে যে ধন সঞ্চয় করে গেছে, সে তার এতটুকু নষ্ট হতে দেয় নি, বরং প্রাণপণে খেটে সে আরও সঞ্চয় করেছে—তার দৈনিক প্রয়োজনের ঢের বেশী। যে চৌধুরীরা অজন্মার বছরে তাকে খুঁটীর সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিল—অনিদ্রা আনাহারে সারারাত, তাদের মত তিনটে চৌধুরীকে আজ নিতাই দাস এক সঙ্গে কিনে ফেলতে পারে। এমন ক্ষমতা আর এত অর্থ তার আছে।

রূপালী শাদা জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে গলে পড়েছে, আমগাছের ফাঁকে ফাঁকে, তার বাড়ীর সারা অঙ্গকে প্রশস্ত বাঁধান উঠানে, সারি সারি সাত আটটা মরাই বাঁধা। সম্বৎসরের মত ধান আর যাবতীয় রবিশস্য সেখানে সর্ব্বদাই মজুদ। বাড়ীর একপাশের প্রকাণ্ড খড়ো এক খানা ঘরকে গোয়ালঘরে পরিণত করা হয়েছে। তাতে তিনটে গাইগরু, দুটো বলদ। সম্প্রতি বাছুরও হয়েছে একটা। দুটো বলদ মাঠে খাটে, আর এক জোড়া গাড়ীতে জুড়ে ভাড়ায় খাটান হয়। তা ছাড়া মুরগী, হাঁস, ছাগল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, রাতের আঁধারে শেয়ালে দুচারটে টেনে নিয়ে গেলেও ধরবার উপায় নেই।

চিরদিন ধরে মানুষ যা কামনা করে আসছে সবই নিতাই এর আছে, শুধু নেই বংশে পুত্র সন্তান। একমাত্র মেয়ে সুলোচনার বিয়ে দিয়ে চিরকাল মামার অশ্রদ্ধার অন্নে প্রতিপালিত নীলবরণকে ঘরজামাই রূপে বরণ করে আনা হয়েছে। সুলোচনার বয়স তখন সাত আর নীলবরণের বার। তারপর কেটে গিয়েছে কত রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন আর কত স্নিগ্ধ রাত। সেদিনের শিশু স্বামী স্ত্রী আজ কর্মক্ষম, স্বাস্থ্য ও যৌবনের উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। আজ সুলোচনার কোলে সাত বৎসরের শিশু কন্যা হিরণী। আঙ্গুলের ফাঁকে অনায়াসে গলে পড়া জলের মতই দিনগুলি কাটছিল অতি সহজেই। সংসারে খুঁটিনাটি ছোট বড় সব প্রয়োজনের দাবী মিটিয়ে হাতে অতি অল্প সময়ই থাকে, নীলবরণের প্রতি মন দেবার।

তবু সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুলোচনা বারে বারেই ও কারণে অকারণে, না না ছুতায় নীলবরণেরই কাছাকাছি ঘোরে। আজন্মের সাথী, এই লোকটির প্রতি ভালবাসার যেন তার অন্ত নাই। হোক সে ঘরজামাই। তার বাপের অন্নে প্রতিপালিত; তবু সুলোচনা আর পাঁচজনের মত নয়। নীলবরণকে সে শ্রদ্ধা করে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করে আর সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। স্বামীর কর্মক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাটখানি সযতনে আপনার আঁচল খানি দিয়ে মুছিয়ে বাতাস করে। তার পেশীবহুল সুপুষ্ট বক্ষ আর সবল কর্ম্মঠ বাহু দুটি বারে বারে প্রশংসমান নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর স্বামী সৌভাগ্য অথবা স্বামিগর্ব্বে সারা অন্তর তার পুলকে আনন্দে ভরে যায়।

সেদিন কিন্তু নীলবরণ ক্ষেত থেকে আর হেঁটে বাড়ী এল না; এল দুজন কৃষাণের কাঁধে ভর দিয়ে। হাঁটবার ক্ষমতা যেন তার ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে। স্বামী কন্যার

মঙ্গল কামনায় সুলোচনা তখন দুয়ারে জল ছিটিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপখানি রেখে, জীবন দেবতাকে প্রাণের প্রণাম জানাচ্ছে।

স্বামীকে অসময়ে শুয়ে পড়তে দেখে, উদ্বিগ্ন মুখে কাছে এল। সে সমর্থ দেহ আজ যেন কি এক অজানা আশঙ্কায়, কি এক দারুণ নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। অনেক দূর থেকে যেন শুধু কথার রেশটুকু ভেসে আসছে, এমন ক্ষীণ স্বরে নীলবরণ বলল—

"পা দুখানি ক্রমেই যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে রে পাগলি, কি হল কে জানে?"

যেন সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুর মতই ক্লান্ত অস্ফুট স্বরে দিনান্তের কোলাহলময় ধরণীর সীমাপ্রান্তে কেঁদে আছড়ে পড়ল, আলোর পৃথিবী থেকে চির অন্ধকারের দেশে যায় যারা, সেই মুমূর্ষু অভাগাদের কণ্ঠ হতে ও জীবাযজ্ঞের শেষ আহুতি মুহূর্তে এমনি করুণ সব হারানোর বেদনাময় আকুতি, এমনি অস্ফুট ব্যর্থ আর্ত্তনাদ শোনা যায়।

কিন্তু মৃত্যুই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা নয়। তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা আছে। তা জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা। নীলবরণের অদৃষ্টেও তাই ঘটল শেষ পর্য্যন্ত। নিতাই দাস জামাই এর জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ করে সহর থেকে বড় বড় ডাক্তার আনাল পর্য্যন্ত, কিন্তু সবলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন, সহরের সরকারী হাসপাতালে বন্দোবস্ত করতে।

সুলোচনার চোখের জলের মিনতিকে অগ্রাহ্য করে নীলবরণকে একদিন হাসপাতালেই স্থানান্তরিত করা হল।

নারীর চোখের জল নারীর মতই তুচ্ছ অবহেলার সামগ্রী; সে মেয়েরই হোক আর স্ত্রীরই হোক। নিতাই দাসের কাছে তার নিজের মতামতই সবচেয়ে দামী জিনিষ। আর কারও কোন সুখদুঃখের এতটুকু মূল্য সে দেবে না। তিনমাস অক্লান্ত ব্যর্থ চেষ্টায়, ডাক্তাররাও শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। নীলবরণের বাড়ী যাবার হুকুম নামা এল হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে। নিতাই দাসের বাড়ীতে খবর এল।

এবার আর সুলোচনা কারুর কথা মানবে না। হিরণীকে, তার মা ত্রিগুণনার কাছে দিয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল—

"বাবার সঙ্গে, ওকে আমিই আনতে চললুম মা, ভজাকাকাও যাবে।

ত্রিগুনা অবাক বিস্ময়ে মেয়ের তৈলসিক্ত কপাল খানার উপর প্রকাণ্ড মেটেসিন্দুরের পাটকিলে রংএর ফোঁটা, আর সিঁথিতে মোটা করে লেপে দেওয়া সিন্দুর রেখার দিকে চেয়ে রইল। অর্দ্ধমৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন সেখানেই জাজ্বল্যমান।

ত্রিগুনাকে নির্ব্বাক দেখে, সুলোচনা আবার বলল—"রোগা মানুষ, একটু যত্ন আত্তি না করে আনলে চলবে কেন মা? বাবা, ভজকাকা ওরা পুরুষ মানুষ, ওরা ঠিকমত পারবে কেন?"

ত্রিগুনার মুখে এবার যেন প্রথম কথা ফুটল, এমনি বিস্ময়ে আপ্লুত সে স্বর—"তবু তোর যাওয়া হয় না, সুলো, সরকারী—দাওয়াইখানা বিস্তর লোকের মেলা সেখানে, আমাদের ছোট লোকের ঘরে ওতে নিন্দে হয় মা।"

কিন্তু সুলোচনা সে বারণ মানবে না। নাক পর্য্যন্ত মাথাব কাপডখানি টেনে. সে সোজা গিয়ে গরুর গাডীতে উঠে বসল। নিতাই দাসের হাজার অনুরোধেও গাড়ী থেকে সে কিছুতেই নামবে না। অগত্যা গ্রামের ধুলি ধুসরিত কাদা আর অসংস্কৃত মেঠো পথ ভেঙ্গে গরুর গাড়ীখানি সদর হাসপাতালে প্রকাণ্ড ফটকে এসে শেষ পর্য্যন্ত থামল।

হাসপাতালেব জমাদারেরা কয়েকজনে ধরাধবি করে নীলবরণকে গাড়ীতে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারদের সম্মিলিত পরিশ্রম, নীলবরণের শরীবের উপবার্দ্ধকে এই আকস্মিক জ্বরার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। হাঁটু পর্য্যন্ত পা দুটী তার একেবারে পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন। সরকারী ডাক্তার বাবু গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। লোক তিনি মন্দ নন, সুলোচনার মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখখানি আর পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণামাখান আহত মৌন দৃষ্টি, তাঁর মনের কোন সে সূক্ষতম কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করল. কে জানে? তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে লুকিয়ে, একশিশি দামী মালিশ এনে তিনি সুলোচনাব হাতে দিলেন। আশ্বাস মাখান কোমল স্বরে বললেন, —"এটা রোজ বেশ করে নীলবরণের পায়ে মালিশ করে দিও মা, ভাল হলেও হতে পারে। অনেকেই ত ভাল হয়ে যায় দেখেছি।" মুখে একথা তিনি বললেন বটে, কিন্তু সেকথা যে কত মিথ্যে তা শুধু তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁর অন্তর্য্যামী।

সুলোচনার ঝাপসা কুয়াসাম্লান দৃষ্টি যেন অকস্মাৎ ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাক্তাবের মুখেও তৃপ্ত প্রসন্নহাসি।

পরের দ্রব্য অপহরণ করে আর মিথ্যা কথা বলেও যে এই অভাগিনী নারীর ব্যর্থ তরুণ জীবনে তিনি সামান্য কটী দিনের জন্য একটু সান্ত্বনা, একটু আশার আনন্দ এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এইত তাঁর অনেক পাওয়া, তিনি জানেন অন্তর্যমী এ ছলনায় ক্রুদ্ধ হবেন না। জীবন্ম দেবতা তাঁর এ চৌর্যবৃত্তি ক্ষমা করবেন।

নিতাই আর ভজহরি ধরাধরি করে নীলবরণকে গাড়ী থেকে নামাল। ত্রিগুনা জামাইয়ের অবস্থা দেখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। অদূরে দাঁড়ান সুলোচনার শিশু কন্যাটীও অকারণে ভয় পেয়ে চমকে কেঁদে উঠল। কিন্তু সুলোচনার দৃষ্টি নিথর নিষ্কম্প। আঁচলের তলায় ঢাকা ও ম মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সতী সে। সাত বছর বয়স থেকে আজ এই পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একমনে সে নীলবরণকেই ভালবেসেছে, পূজা করেছে। তার অপটু অক্ষম জীবন্মৃত স্বামীকে সে বাঁচিয়ে তুলবে; তার শ্রদ্ধায়, তার সেবাযত্নে, আকাশে তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতি, তার অখণ্ড বিশ্বাসে, অন্ধভক্তিতে দৃঢ় মুষ্টিতে প্রাণপণে সে চেপে ধরল হাতের শিশিটাকে। পিতার সখেদ আক্ষেপ, মায়ের অজস্র কান্না, মেয়ের অফুরন্ত আর্ত্তনাদ, কিছুই যেন আজ সুলোচনার তপস্যাকে পারবে না টলাতে। সেই নিষ্ঠুর মহাদেবের জন্য তপঃক্লিষ্টা গৌরীর ঐকান্তিক তপস্যার তেজ যেন আজ নিতাই দাসের মেয়ে সুলোচনার চোখে জেগেছে।

কোন কিছুই আজ তার সে নির্ব্বাক ধ্যানকে ভাঙ্গাতে পারবে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখে তার জেগে আছে স্বয়ং দেবতার বরাভয় মাখান প্রসন্ন হাসির আশ্বাস; আর হাতে

আছে তার জীবন্মৃতকে উজ্জীবিত করে তুলবার, অমৃত সুধা।

ডোবাটার আশেপাশের বনবাদাড়গুলো ফণী মনসার ফুলে ভরে গেছে। বাড়ীর চারিদিকে বুনো আশশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দরী হলুদ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। কুরচি আর ঘেঁটুফুলের উগ্র গন্ধে দখিন হাওয়া ভরপুর। আকন্দের গাছগুলোয় অজস্র বেগুনে-শাদা ফুল—ভাঙ্গা ডালগুলো, থেকে তাদের ফোঁটা ফোঁটা ক্ষীরের মত আঠা ক্ষরে ক্ষরে ঝরে পড়ছে। কাগজিলেবু গাছেও ফুল ধরেছে। শ্যাম সবুজ পাতার বুকে ছোট্ট ছোট্ট শাদা ফুল। অন্দর মহলের প্রশস্ত উঠানটাতে তখন ত্রিগুণা, কৃষাণদের দিয়ে, গোলাগুলো ভরে সিদ্ধধান গুলো, তুলে রাখবার ব্যবস্থা করছিল। সম্প্রতি সাত বৎসরের মেয়ে হিরণীর বিয়ে দিয়ে সুলোচনা গৌরীদানের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তের বছরের নাতজামাই অটল, ত্রিগুনাকে সাহায্য করেছে তার কাজে। ত্রিগুনাও নিতাই দাসের যোগ্য সহধর্ম্মিনী। প্রাণ থাকতে এতটুকু জিনিষ সে কাউকে ছুঁতে দেয় না। এই একটি নারী, যাকে বিধাতা তার শ্রেষ্ঠ দানগুলি নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েও, প্রতিদানে একফোঁটা কৃতজ্ঞতা কোন দিন পান নি। ত্রিগুণা তখনও প্রাণপণে বকে চলেছে, আমনধান এবার যথেষ্ট হয়নি কেন? সরষে অড়হরই বা এত কম হল কি করে? শাকসব্জীর অর্দ্ধেকের বেশীই ত পাঁচভুতে লুটে খেল। তারও যেমন অদৃষ্ট! নইলে একচোখ দেবতারা, একটা ছেলেই বা দিল না কেন তাকে, যে কি না দরদ দিয়ে অন্ততঃ জমিজায়গাগুলো দেখাশুনো করত। আক্ষেপের তার আর বিরাম নেই, পূর্ণচ্ছেদ নেই। অদূরে চণ্ডীমণ্ডপের উঁচু দালানটিতে বসে নীলবরণ একমনে তখন ঘরের কুসুমবীচি আর মটর ছোলা দিয়ে ভাজা মুড়ি, আর ঘরেরই ভিয়েনে তৈরী গুড় সহযোগে, সকালবেলার জলযোগটা সম্পন্ন করে নিচ্ছিল। সুলোচনা এদিক ওদিক চেয়ে দেখে চট করে তার আঁচলের তলা থেকে দুখানা বাসী জিলিপী বার করে স্বামীর বাটীতে ফেলে দিল। মায়ের বাক্স থেকে চুরি করা পয়সায় কেনা এ দুটী। ত্রিগুনা দেখতে পেলে আজ আর মেয়েকে আস্ত রাখবে না। অনর্থক পয়সা খরচ করা সে কোন মতেই সইতে পারে না, তা সে মেয়েই করুক আর যেই করুক।

জিলিপী দুটো দেখে নীলবরনের শীর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আনন্দ বিকশিত হাসিতে মুখখানা ভরে সে সুলোচনার পানে চাইল। সুলোচনা তখন সেখান থেকে সরে গেছে। আজ আর মুহূর্ত্তের জন্য ও তার দাঁড়াবার অবসর নাই। ঘোষেদের বাড়ী আজ বিয়ে। সম্প্রদানের পিঁড়ী আর ঘরের মেঝেতে আল্পনা এঁকে দেবার জন্য গিন্নী তাকেই বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন।

গোয়াল ঘরের পাশে গোয়ালা তখন বাছুরটাকে দূরে নীচু একটা পেয়ারা গাছের ডালে বেঁধে রেখে দুধ দুইবার বন্দোবস্ত করছিল। নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত অশান্ত জীবটিকে হিরণী গায়ে গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল।

সুলোচনা মেয়েকে ডাকতে গিয়ে দেখল সাদা দুধের ফেনা, বালতিটা থেকে উপচে পড়বার উপক্রম করছে।

"ছিপতি কাকা, বাড়ীর জন্য আধসের টাক দুধ রেখে বাকীটা ঘোষেদের বাড়ী পৌঁছে

দিও, ওরা বলে রেখেছে।'' কর্মব্যস্ত ত্রিগুনার কানেও কথাকয়টি পৌঁছল। সেখান থেকে প্রাণপণে চীৎকার করে সে বলে উঠল—

''আর সঙ্গে সঙ্গে দামটাও চেয়ে নিও ভাই।'' সুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতিও হাসল, হিরণীও। এই অর্থলোভী নারীটিকে সকলেই যেন মনে মনে একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। সুলোচনা হিরণীকে ডেকে নিয়ে ঘাটে চলল। মেয়ের রঙীন ডুরে শাড়ীটির এক প্রান্ত মাটীতে লুটাচ্ছে , মাথার চুলগুলি রুক্ষ, তেলের সংস্পর্শ রহিত।

সুলোচনা আঁচল থেকে সন্তর্পণে এক টুকরো সুগন্ধি সাবান বার করে মেয়েকে মাখাল, নিজেও একটু মাখল। তেলের বাটী থেকে অনেক করে তেল নিয়ে মেয়ের মাথায় মাখাল। দুজনে যখন ডুব দিয়ে বাড়ী ফিরল, সারা উঠান তখন রোদে রোদে ছেয়ে গেছে। হিরণীকে কাপড় ছাড়তে পাঠিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকল।

নীলবরণ তখন বসে বসে বেতের টুকরী আর মোড়া বুনছে। সুলোচনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, ''এত বেলা অবধি ঘাটে কি করা হচ্ছিল শুনি?''

স্বামীর প্রশ্নের বাঁকা ধরনে সুলোচনা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। অক্ষম উত্থান শক্তি-রহিত নীলবরণ, নিজের জীবনের কুৎসিত অবস্থার পর থেকে সুলোচনাকে কোন কাজে একটু বেশীক্ষণ দূরে থাকতে দেখলেই, নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে, সজীব প্রাণের সতেজ উচ্ছলতার দিকে, তার রোগক্লান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যর্থ জীবন যেন ঈর্ষ্যার চোখে চেয়ে থাকে। সুলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত্তের ছোট খাট হাসি, কথা আর অকারণ চঞ্চলতাকে সে আজ কাল রীতিমত ঘৃণা করে, সন্দেহ করে, স্বামী যার অকালবার্দ্ধক্যে জ্বরাগ্রস্ত, চির-শয্যাশায়ী, সে নারী যে হেসে দুটো কথা কারুর সাথে বলবে, তার এই অসহায় স্থবির জীবনে সে তা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। যৌবনের প্রতি বার্দ্ধক্যের, শৈশবের প্রতি যৌবনেরও এই চির বুভুক্ষা। জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অনুভূতির পানে চেয়ে আছে মৃত্যু তৃষাতুর নেত্রে। যে মুহূর্ত্তে একটী পরিপূর্ণ সুখী নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভরা তৃপ্ত জীবনস্রোত লীন হয়ে মিশে যাবে তার মুখে, পাণ্ডুর বিবর্ণ প্রেত-হাসি, চির আকাঙ্ক্ষার ঐ জীবনাটিকে প্রাণপণ শক্তিতে সে আপনার হিমশীতল বুকে আঁকড়ে ধরবে। ম্লান, নিষ্প্রভ চোখে ফুটে উঠবে তখন উজ্জ্বল মধুর তৃপ্ত হাসি।

আকস্মিক প্রশ্নে বিপর্য্যস্ত সুলোচনা কোন মতে নীলবরণকে জানাল যে, সে আর হিরণী ঘোষেদের বাড়ী যাবে। নীলবরণের রাগ যেন আরও এক মাত্রা বেড়ে গেল।

''সবাই মিলে সেজেগুজে তো চললি, আর আমি যে ঘর আগলাতে পড়ে থাকব, কে আমায় খেতে দেবে শুনি?'' যেন সে যে বাড়ী পড়ে থাকবে এতে সুলোচনারই দোষ সব চেয়ে বেশী। গলার স্বরটাকে আরও একটু নামিয়ে দিয়ে সুলোচনা বললে—

''মা, চোরের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে এক পা কোঁথাও নড়বে না, বাবাও বাগানে ঘুরবে, মাকে আমি সব বুঝিয়ে যাব গো।''

সুলোচনা কাপড় পরতে চলে গেল। যে অকারণে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে সন্তুষ্ট করা জীবনে সব চেয়ে কঠিন কাজ। ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে রেখে বারোদোলের মেলা থেকে

কিনে আনা, মুগা সুতোর চৌখুপী ডুরে শাড়ী খানা আর লেস বসান গোলাপী একখানা সেমিজ পরে ভিজে চুলগুলোর প্রান্তভাগে একটা গিট দিয়ে, মাথার সিঁদুর রেখাটাকে আরও একটু মোটা করে দিল। বাক্সে দুচারখানা যা তোলা গয়না ছিল তাও পরে নিল।

হিরণীর ততক্ষণে কাপড় পরা হয়ে গেছে। সুলোচনা মায়ের হাত বাক্স থেকে হিরণীর গয়নাগুলো বের করে পরিয়ে দিল মেয়েকে। নিজের কৌটা থেকে গোলা সিন্দুর খানিকটা বেশ করে কপাল, সিঁথি, আর হাতের গোছাখানেক নোয়ায় দিল লেপে। সুলোচনার পায়ের ধুলো নিল হিরণী। মনে মনে সুলোচনা মেয়েকে আশীর্বাদ করল।'' সুস্থ সবল সোয়ামী নিয়ে সুখী হও মা; আমার মত ভাঙ্গা কপাল যেন তোমার না হয়।'' কি একটা কাজের জন্য ত্রিগুনা যেন সেদিকে এল। মেয়ে আর নাতনীর গাভরা গয়না দেখে তার চক্ষু স্থির। তীক্ষ্ণ সুরে মেয়েকে আক্রমণ করল—''হ্যাঁরে সুলি, কেমন তোর আক্কেল বল তো? এই কচি মেয়ের গায়ে গয়না চাপালি? দৈবে একটা যদি খোয়াই যায়?''

''যাবে ত আমারই যাবে মা, তোমার কাছে কখনও চাইব না, এ বলে দিলুম আমি।''

ক্রোধ ও বিস্ময়ে আপ্লুত ত্রিগুনাকে গ্রাহ্য না করেই সুলোচনা মেয়ের হাত ধরে খিড়কী দরজার দিকে রওনা হল। অটলকে সে এড়াতে চায়। হোক সে সধবা, তবু ভাল কাপড় জামা পরে জামাই এর সামনে ঘুরে বেড়াতে যেন কেমন তার একটা বিশ্রী সঙ্কোচ লাগে। তাছাড়া নীলবরণের কটুক্তিকেও সে মনে মনে ভয় করে।

ঘোষেদের বাড়ী যখন মা ও মেয়ে গিয়ে পৌঁছল বেলা তখন আর নেই। অজস্র দামী রঙীন সব কাপড়ে হাল ফ্যাশনের জড়োয়া মণি মুক্তোর গয়নার আর সেন্টের উগ্র সৌরভে সে বাড়ীর আবহাওয়া ক্রমেই ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ সবের চেয়ে, মুখরোচক খাদ্যসামগ্রীর গন্ধই সুলোচনাকে বেশী আকৃষ্ট করল যেন। কিন্তু তা নিজের জন্য নয়, একান্ত করে তার অসহায় লোভী স্বামী নীলবরণের জন্য।

বিয়ে-বাড়ীর হাঙ্গামা যখন চুকল রাত তখন অনেক। কনের দিদি মধুমালতী হিরণীকে আগেই খাইয়ে দিয়েছিল, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই সেখানে বসে খেতে রাজী হল না। মধুমালতী অগত্যা একটা পরিষ্কার কাপড়ে দুজনের উপযোগী মিষ্টান্ন বেঁধে তার হাতে দিল। ঘুমে হিরণীর চোখ দুটি বুজে আসতে চায়। তাদেরই পাড়ার আর একটি মেয়ের সঙ্গে সুলোচনা হিরণীর হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ী ফিরল।

কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত নয়, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না ঝরানো নিশা। তবু শুকনো বনপাতার মৃদু মর্ম্মর আর নিশাচর পাখীদের অকারণ ডানার ছটফটানীতে সুলোচনার গা শিউরে উঠল।

আবছা আলো ছাওয়া বাগানটিতে সঙ্গীহীন প্রেতের মত নিতাই দাস একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে সুলোচনাকে দেখেই সে কাছে এল। কর্কশ কণ্ঠে বলল—''এত গয়না গাটী পরে এই গভীর রাতে কি না ফিরলেই চলত না? যা বাড়ী যা, জামাই রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়েছে।''

নিতাই আবার একাই লাঠিখানা ঠকঠক করে ঘুরে বেড়াতে সুরু করল।

হিরণীকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে সুলোচনা তাক থেকে সন্তর্পণে মালিশের তেলের শিশিটা পাড়ল। তারপর ধীর পদে নিজের ঘরের দিকে চলল। ঘরের কোণে স্তুপীকৃত অড়হর জড় করা, ইঁদুরের উৎপাতে নীলবরণ মাঝে মাঝে হাতের বাঁশের লাঠিটা ঠক ঠক করে। ক্ষুদ্র প্রাণী, ততোধিক ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিয়ে সশঙ্ক চিত্তে চঞ্চল চরণে ছুটে পালায়।

ঘরে ঢুকতেই একটা বিশ্রী তীব্র গন্ধে সুলোচনা নাকে কাপড় চাপা দিল। এ উৎকট গন্ধের সাথে তার পরিচয় আছে। তার অবর্ত্তমানে কোন কৃষাণের হাতে পায়ে ধরে নীলবরণ তাড়ী আনিয়ে পেট পুরে খেয়েছে।

সুলোচনা আস্তে আস্তে খাটের পাশে তার হাতের নেকড়ার পুঁটুলীটা রাখল। কোণের কেরোসিনের ডিবার মৃদু আলোয় দেখল তখনও নীলবরণ ঘুমায় নি। নেশার ঘোরে অর্দ্ধ-আচ্ছন্নের মত চোখ নিমীলিত করে পড়ে আছে মাত্র। অকস্মাৎ ঘরের ভিতর মানুষের শব্দ পেয়ে চোখ মেলে সুলোচনাকে দেখেই বুঝি নেশাটা তার মাথায় চড়ে গেল। হাতের পাকা বাঁশের লাঠিটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সুলোচনার মাথায় দিল বসিয়ে। মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাতের মার, তবু কপালের কোণ ফেটে ফিনকি দিয়ে উষ্ণ রক্তের ধারা ছুটল। নীলববণ হাতের লাঠিটাকে আছড়ে ফেলে, তখনও অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলে চলেছে—

"কোন ঠাঁই থাকা হয়েছিলো, শুনি? বাড়ীতে খোঁড়া সোয়ামী তোর, রাত উপোস করে পড়ে আছে, আর তুই কি না রাতের অর্দ্ধেক পহর পর্য্যন্ত পরের বাড়ী বসে বসে ফুর্ত্তি করবি, ঘরে থাকতে মন লাগে না, লয়?"

পরনের শাড়ীর আঁচল খানা কপালে চেপে, সুলোচনা তখন নিষ্পলকে তার সামনে মেঝেয়, টুকরো টুকরো শিশিটার পানে চেয়ে আছে। নীলবরণের মারকে সে গ্রাহ্য করে না, তার সাত বৎসর বয়স থেকে এই এতখানি বয়স পর্য্যন্ত, সে যে কতবার নীলবরণের হাতে মার খেয়েছে, তার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। ঐ যে তার সম্মুখে ভাঙ্গা শিশিটা থেকে পড়ে গেল সমস্ত সঞ্জীবনী সুধাটুকু। এ দুঃখ সে রাখবে কোথায়? প্রতিদিন সে দেবতার চরণে নিয়মিত মাথা নত করেছে, এই ওষুধেই যাতে তার স্বামী সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে যায়। অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিতা নারী অন্ধ বিশ্বাসে প্রতিটি দিন আশা করেছে, একমাত্র এরই প্রভাবে সে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে সমর্থ হবে কর্ম্মময় জীবনে। সে আশার আজ হল চির অবসান। অবলুপ্ত হল সে বিশ্বাসের স্থৈর্য্য। শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে এই হতাশার বেদনা শতগুণ বেশী আঘাত করল তাকে; সুলোচনার সারা শরীরে, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন দুঃসহ তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি, সীমাহীন অনন্ত আকাশের অপার পরিধির মত নিঃসঙ্গ ভয়াবহ শূন্যতা যেন ক্রমেই সুলোচনাকে গ্রাস করে আসছে। এতদিনকার আশাকে ক্ষণভঙ্গুর কাচের বাসনের মতই অতি সহজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখার আঘাতে, সুলোচনার শরীর মন, দুই-ই যেন, অকস্মাৎ, ভুঁয়ে ভেঙ্গে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায়। আকস্মিক অবসাদে একেবারে নিঃশেষে শেষ হয়ে যাবার দুর্নিবার আকুতিময় আকাঙ্ক্ষা জাগল তার প্রাণে। অগাধ নীলিমা হতে জ্বলন্ত একটি তারা খসে পড়ল সুলোচনার মৃত্যুব্যথা-জর্জরিত মুখের পানে চেয়ে।

স্বামীর ঐ পঙ্গু পা দুইখানিতে শক্তি আনবার জন্য কি সাধনাই না সে করেছে এ কদিনে। চিরবন্দী ও নির্জ্জন অন্ধকার কারাগৃহে বসে এতটুকু আলোর জন্য এত উঞ্ছবৃত্তি, এত মিনতি করে না। সবই হয়েছে তার ব্যর্থ। ঐ জীবন্মৃতকে শক্তি আর জীবনে জাগিয়ে তুলবার কোন সম্বলই আর তার রইল না।

ভোরের আলো ভাল করে ফুটতে না ফুটতেই, ঘোষগিন্নী বড় মেয়ে মধুমালতীকে পাঠিয়ে দিলেন সুলোচনাকে ডেকে আনতে।

রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত নিতাই তখন চণ্ডীমণ্ডপের খাটিয়াখানায় আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ত্রিগুণা, ঘরদরজায় গোবর জল ছিটিয়ে, হাঁস মুরগীগুলোকে ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করছে।

মধুমালতী তাকে গ্রাহ্য করল না। বাড়ীতে তাদের বিস্তর কাজ পড়ে আছে। একমাত্র সুলোচনাকে তার বিশেষ প্রয়োজন, তাই ভোর না হতেই সে ছুটে আসছে তার কাছে। স্তম্ভিত উৎসাহিত ত্রিগুণাকে ফেলে রেখেই, সোজা সে সুলোচনার ঘরের দিকে এগোল। সুলোচনার ঘরের আমকাঠের দরজাখানা সম্পূর্ণই উন্মুক্ত,

রক্তাক্ত চোখ দুটি অতি কষ্টে কোনমতে খুলে নীলবরণ তখন তাদেরই বাড়ী থেকে আনা খাবারের পুঁটলীটি খুলে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে একমনে আর সুলোচনা, মেঝে থেকে নিঃশেষে মালিশের তেলটুকু মুছে নিয়ে, ঘুমভরা চোখে প্রাণপণে মালিশ করে চলেছে। তার কপালের খানিকটায় গাঢ় নীল আর বেগুনে কালশিরা পড়ে ফুলে উঠেছে। শুকনো কালো রক্ত তার পাশে জমাট হয়ে জমে আছে। মধুমালতী সে বীভৎস দৃশ্যে নিজের মনে শিউরে উঠল। সুলোচনাকে তার আর ডাকা হোল না। নীরবে চিন্তিত মুখে সে নিজেদের বাড়ী পথে ফিরে চলল। নিতাই দাসের বাগান পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল গোটা কয়েক বাতাবিলেবু, গাছের চারিদিকে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। মানবের সতৃষ্ণ দৃষ্টির গোপন আক্রমণ থেকে ফলগুলিকে সযত্নে বাঁচাবার প্রয়াস। শুকনো সূচের মত তীক্ষ্ণ কাঁটার বেড়া। তবু তাকে আশ্রয় করে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছে, কতকগুলো নাম না জানা বুনো লতা। মধুমালতীর মনে হল, ওরা যেন ঠিক ঐ নিতাইদাসের মেয়ে সুলোচনার প্রতীক। ভালবাসা পায় না, তবু ভালবাসে, অবহেলা, লাঞ্ছনা আর অকারণ কটুক্তি লাভ করে। তবু ভক্তি করে—করে শ্রদ্ধা আর পূজা। প্রতিদানে কিছু পেল বা না পেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; শুধু নিজের সব স্বত্বটুকু নিঃশেষে বিলিয়েই চিরসুখী। ছন্দে গাঁথা অনেক আড়ম্বরে এদের প্রেম হারিয়ে যায় না। সহ্যে আর সেবায় ধৈর্য্য আর স্নেহের প্রতিটি ক্ষুদ্র নিদর্শনে, এদের প্রেম শুভ্র হীরকখণ্ডের মতই দুঃখের আঁধারে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলতে থাকে—চিরদিন, চিরকাল।

'বঙ্গশ্রী'—১৩৪৬

পরিশেষ

প্রতিভা বসু

মাধুরীকে দেখে হঠাৎ অরবিন্দ থম্‌কে গেল। দেখলো বোধ হয় আট বছর পরে, কিন্তু চিনতে তার এক পলকের বেশী প্রয়োজন হলো না। মাথাটা যথাসম্ভব নিচু করে সে যেন নিজেকে একটু আড়াল করবার চেষ্টা করলো।

বিয়ে বাড়ী। প্রকাণ্ড চকমিলানো দালানের চৌকো উঠোনে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। ঝলমল করছে আলোতে। মাঝখানে হাত তিনেক ফাঁক রেখে লম্বালম্বি টেবিল আর ভেনেস্তা চেয়ার ফেলে দুদিকে খাবার ব্যবস্থা—একদিকে মেয়েরা, একদিকে পুরুষেরা। অরবিন্দর অনেকক্ষণ থেকেই মনে হয়েছে যে যে-মেয়েটি তার দিকে পিছন ফিরে খেতে বসেছে তার হাতির দাঁতের মত শুভ্র মসৃণ ঘাড়েব উপরকার ঢেউ খেলানো চুলের অবিন্যাস্ত ঢিলে খোঁপাটি সে যেন চেনে। হঠাৎ মেয়েটির মুখ ঘুরলো এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ স্পষ্ট দেখতে পেল সত্যিসত্যিই সে মাধুরী। মনের মধ্যেটা একটু কেমন করলো যেন—একটু বিবেকের দংশন হয়তো—পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে।

খেয়ে উঠে সে আর দেরী করলো না—শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে বেরিয়ে পড়লো সেখান থেকে। তারপর পানের দোকান থেকে দুখিলি পান এক প্যাকেট সিগারেট কিনে সামনে যে বাস পেল তাতেই চড়ে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে ফিবে বাড়ী ফিরলো রাত বারোটায়।

মেমসাহেব নিশ্চয়ই এতক্ষণ জেগে নেই। আর থাকলেও তার সঙ্গে দুটো কথা বলে শান্তি পাবার আশা করা নিতান্ত মূঢ়তা। ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে সে টোকা দিল, কলিং বেল টিপলে ফল হত বেশী কিন্তু যদি এ্যানির ঘুম ভাঙে তবে আজ রাত্রে মল্লযুদ্ধ। প্রায় দশ মিনিট টোকা দেবার পরে বয় এসে আস্তে দরজা খুলে দিল। অরবিন্দ নিঃশব্দে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে পোষাক ছেড়ে শুযে পড়লো; ঘুম এলো না অনেকক্ষণ—আর তারপর যখন ঘুমুলো তখন বাকী বাতটুকু সে এমন সব স্বপ্ন দেখলো যা থেকে নির্ঘুম রাত্রিও মানুষের পক্ষে অনেক কাম্য।

দোষ আর কার। সমস্ত দোষ অরবিন্দরই তো। অববিন্দ যখন ভাইয়ের পয়সায় চার বছর মেম পুষে পুষে ফতুর হয়ে দেশে ফিরলো তখন তার মাথার কোষে কোষে শয়তানি বুদ্ধি জাল ফেলেছে। দেশে থাকতে তার সুনাম ছিল। লেখাপড়ার ব্রিলিয়েন্ট না হলেও ভাল ছেলে বলেই সকলে জানতো। বি, এ, পাশ করবার পরে তার হঠাৎ ঝোঁক চাপলো বিলেত যাবে। অক্‌স্‌ফোর্ডে পড়বে। অরবিন্দর দাদা অনন্ত বাবু তখন রাঙামাটির সিভিল-সার্জ্জন। তিনি ভাইয়ের ইচ্ছাকে সদিচ্ছা বলেই মনে করলেন এবং বিনা আপত্তিতে চোখের জল সামলে রাজি হলেন। অরবিন্দ দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। তার স্বাস্থ্য, তার রং, তার চাল চলন, কথাবার্ত্তা সমস্তই নিখুঁত ভাবে সুন্দব এবং বিলেত গিয়ে এই সৌন্দর্য্যই তার কাল হল। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সহজেই মেয়েদেব মনোহরণ করলো এবং শেষ পর্য্যন্ত সস্তা মেয়েদের পেছনে ঘোরাটাই পেশা করে চার বছরে ভাইয়ের রক্ত জল-করা সঞ্চিত সমস্ত

অর্থ খুইয়ে—ফতুর হয়ে দেশে ফিরে এলো। ফিরে আসার তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। যে রসে সে ডুবেছিল সে রসের বড় আঠা, সাধ্য কি তা থেকে এত সহজেই সে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু তবু তাকে আসতে হলো—মনের মধ্যে নানারকম প্যাঁচ এঁটে সে লক্ষ্মীছেলের মত ঘরে ফিরে এলো। অনন্ত বাবু ভাইয়ের অধঃপতন সমস্তই বুঝলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। দিনকয়েক অরবিন্দ ভাইয়ের একান্ত অনুগত থেকে হঠাৎ একদিন ব্যবসা করবে বলে হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে বসলো, ব্যবসা বিষয়ে তার কি পর্য্যন্ত জ্ঞান তার তালিকাও সে ঘণ্টা তিনেক ব'সে ভাইয়ের কর্ণগোচর করালো, কিন্তু অনন্তবাবু নিঃশব্দে ব'সে পাইপ টান্‌তে লাগলেন, জবাব দিলেন না।

সেদিন রাত্রেই তিনি শুয়ে শুয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'দ্যাখো, অরবিন্দর কিন্তু আবার পালাবার মতলব, এখন যে ক'রেই হোক ওকে বাঁধ্‌তে হবে।'

'কেন? কি ক'রে বুঝলে?'

'বয়স তো হলো, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কাজেই বুঝতে দেরী লাগে না।'

স্ত্রী অন্নপূর্ণা একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'বাঁধতে হলে তো বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় দেখি না।'

'আমি তো তাই বলি।'

'দ্যাখো ভাল ক'রে ভেবে'—অন্নপূর্ণা চিন্তিত ভাবে পাশ ফিরলেন।

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ পাইপ টেনে আবার বল্লেন—'অরবিন্দ আমার সন্তানের অধিক। আমার সন্তান নেই একথা আমার কখনো মনে হয় না। সেই অরবিন্দ চোখের উপর এমন ভেসে যাবে?'—

অন্নপূর্ণা নিঃশ্বাস টেনে বল্লেন, ' সে তো ঠিক কথাই।'

অনন্তবাবুর বহুকাল পরে মনে পড়লো মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে তাঁর, ঠিক বাইশ বছর বয়সে যখন প্রৌঢ় পিতা আবার অরবিন্দর মাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন ঘরে, তখন পিতার দুর্ম্মতিতে লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হয়ে সে গৃহত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এই অরবিন্দর মা, ঐটুকু আঠারো বছরের মেয়ে—ফিরিয়ে আনলো তাকে ঘরে, বিয়ে দিয়ে সংসার পাতলো। তারপর ঠিক মায়ের মত স্নেহে যত্নে কর্ত্তৃত্বে সত্যিকারের মা হয়ে উঠলো দু'দিনেই। তিনি যখন মারা যান অরবিন্দ তখন সাত বছরের একফোঁটা ছেলে। অনন্তবাবুর চোখে অরবিন্দের সেই সাত বছর বয়সের পুষ্ট চেহারা ভেসে উঠ্‌লো স্পষ্ট হয়ে। কি ভালই তিনি বেসেছিলেন ভাইকে—মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ' তোমার মনে পড়ে আনু—অরবিন্দের মায়ের মৃত্যুর কথা?'

'তা আর পড়ে না। একফোঁটা তখন অরবিন্দ—আমার হাত ধরে উনি কেঁদে ফেল্লেন, ''বৌমা আজ থেকে তুমিই এর মা,''—অন্নপূর্ণার মুখ করুণ হয়ে উঠলো বল্‌তে বল্‌তে। অনন্তবাবু বিষণ্ণভাবে আধশোয়া অবস্থা বসে রইলেন অনেকক্ষণ—তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপরেই অরবিন্দর বিবাহপর্ব্ব। মাধুরীর বাবা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র অরবিন্দকে দেখে একেবারে ভুলে গেলেন, মাধুরী তখন আই, এ, পড়ে বেথুনে। আঠারো বছরের মেয়ে। কাঠের কারবারে লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় মিত্র বিনা-দ্বিধায় অরবিন্দর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দিলেন। বিয়েতে তিনি হাজার দশেক টাকা খরচ করলেন, তা ছাড়া মেয়েকে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মুড়ে দিলেন সোনা দিয়ে। বিয়েতে মাধুরীর একান্ত অমত ছিল। বেচারা এমনিতেই ছেলেমানুষ, তার উপর নতুন নতুন কলেজের আস্বাদ পেয়েছে, এ রকম হুট্ করে বিয়ে করাটা তার ভাল লাগলো না। কিন্তু বিয়ের পর অরবিন্দকে তার সত্যিই ভালো লেগেছিলো। তাঁর মধুর কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্ত্রীকে বললেন, 'কত তোমার ভয় ছিল—একটা মেয়ে, তাকে আমি জলেই ফেললাম বুঝি— খোঁজ খবর ছাড়া বিয়ে, দেখোতো এখন কেমন জামাই?'

মাধুরীর মা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'থাক্ থাক্ আর গর্ব্ব করতে হবে না—মাত্রই তো আজ দশদিন বিয়ে হয়েছে।'

এদিকে অরবিন্দর বৌদিও মাধুরীকে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তার সমস্ত রুদ্ধ মাতৃস্নেহ যেন প্রবাহ বইল মেয়েটির কাঁচা মুখ-খানির দিকে তাকিয়ে। দশদিন পরে যখন বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ করে অরবিন্দ ফিরে এলো শ্বশুর বাড়ী থেকে, অনন্তবাবু একটু আড়াল বুঝে স্ত্রীকে বল্লেন, "অরবিন্দকে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে দেখেছ?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

'এবার ভাই আমার আর পালাবার নাম করবে না।'

'তা তোমারি তো ভাই।' তারপরে দু'জনেই চোখে চোখ রেখে একটু হাসলেন।

অরবিন্দ মাধুরীকে দেখে একটু অবাক হয়েছিল সত্যিই। জীবনে বহু মেয়ে দেখবার তার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ঠিক মাধুরীর মত যেন সে কাউকেই দেখেছে মনে হ'লো না। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি! কিন্তু একখানা সুন্দর মুখ নিয়েই তো অরবিন্দর কারবার নয়, তাতে তার আশও মেটে না, কাজে কাজেই মনকে সে প্রশ্রয় দিল না। প্রেমই বল যাই বল ওসব তো সাময়িক একটা উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়—মনে মনে অরবিন্দ বিবেককে বোঝালো—আর জীবনে উত্তেজনা যদি ভোগই করতে হয় তবে একাধিক স্ত্রীলোক ছাড়া সেটা সম্ভবই নয়। আর সে প্রমোদস্থল হচ্ছে ইয়োরোপ। অতএব দিন কুড়ি পরে একদিন রাত বারোটার সময় সে নিঃশব্দে উঠে বসলো বিছানায়। মাধুরী নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছিল বালিসে মাথা রেখে—বড় সুন্দর ওর ঘুমন্ত মুখ। ক্ষণিকের জন্য অরবিন্দর মুখ নেমে এসেছিল ওর মসৃণ সাদা কপালের উপর, কিন্তু তক্ষুনি সংযত হয়ে মনকে শাসালো, ছিঃ। নীল সেড্ দেওয়া টেব্‌ল ল্যাম্পের মৃদু আলোকে সে অনায়াসেই ঘরের সব কিছু দেখতে পায়. বালিসের তলা হাতড়ে বার করলো আলমারীর চাবি—তারপর অত্যন্ত মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো আলমারীর কাছে। সমস্ত গহনা মায় অরবিন্দর মৃত মায়ের চিহ্ন মুক্তার কণ্ঠি টি পর্য্যন্ত পুটুলি বেঁধে সে যখন আলমারী বন্ধ ক'রে বালিসের তলায় চাবি রাখলো—

তখন থরথর করে পায়ের তলাটা একটু কেঁপে উঠ্‌লো তার কিন্তু সে মাত্র একটা পলক— তারপরেই নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। যথারীতি খোঁজ খবর টেলিগ্রাম সমস্তই হল এবং অবশেষে মাধুরী ফিরে এলো তার পিত্রালয়ে। অনন্তবাবু এ আঘাতের পরে খুব বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে অন্নপূর্ণার কি গতি হল মাধুরী কোন খবরই নিল না। মাস ছয়েক পরে সিঁথির সিঁদুর নিজের হাতে ঘষে ঘষে তুলে শাঁখা নোয়া খুলে ফেলে সে আবার মাধুরী মিত্র নাম নিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হল। অমঙ্গল আশঙ্কায় তার মা আপত্তি তুলেছিলেন প্রথমে কিন্তু ও এমন ভাবে তাকালো মায়ের দিকে যে মা আর দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস পেলেন না। তারপর এই আট বছরে যা পরিবর্ত্তন হয়েছে তা এই যে মাধুরীর বাবা মারা গেছেন, মাধুরী এম,এ পাশ করেছে এবং তার বয়স হয়েছে ছাব্বিশ।

* * * * *

ভোরের দিকে অরবিন্দর ঘুমের একটা মধুর আমেজ এসেছিল কিন্তু এ্যানির সরু সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকারে তা ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে উৎকর্ণ হয়ে সে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়, মনে মনে নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হতে লাগলো—কালকে অত রাত্তিরে ফেরার অপরাধের। এর মধ্যেই দরজায় এ্যানির টোকা শুনে সে যথাসম্ভব হাসিভাব মুখে এনে লাফ দিয়ে দরজা খুলে বললো, 'গুড্ মর্ণিং'।

'গুড্‌মর্ণিং,' এ্যানির গম্ভীর স্বর বেরুলো। অরবিন্দ চেয়ার টেনে ওকে বসতে অনুরোধ করে সিগারেট ধরালো, তারপর নিজে থেকেই বল্‌ল 'কালকে বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরতে বড়ই রাত হয়ে গেল তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি কাল—তুমি ঘুমিয়েছিলে তাই'—

'চুপ কর'—অরবিন্দর পক্ষে রক্ত জল-করা সুরে এ্যানি বল্‌লো—তারপর হলদে রংয়ের গাউনটা অনর্থক এপাশ থেকে ওপাশে দু'একবার নেড়ে চেড়ে রূঢ় স্বরে বল্‌ল, 'আর কতদিন এরকম ভাবে চলবে ঠিক করেছ? তোমার সঙ্গে যখন স্বামী ছেড়ে বেরুই তখন এই কথা ছিল? তোমরা ভারতীয়—কাল চামড়ার মানুষ—সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা যে তোমরা করবেই এ বুদ্ধি তখন আমার ছিল না ভেবে আমি এখন অনুতপ্ত।'

'কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি?

'নিশ্চয়ই'—এ্যানি এত জোর দিয়ে কথাটি উচ্চারণ করলে যে অরবিন্দর বুক কেঁপে উঠ্‌লো—'আমি তোমাকে অর্থবান ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় বুঝতেই পেরেছিলে যে তোমার রূপ আমাকে তিলমাত্র আকর্ষণ করেনি—করেছিল তোমার টাকা আর তুমিও আমায় সেই প্রলোভন দেখিয়েই বিয়ে করেছিলে—আশা করি সে কথা তোমার মনে আছে।'

'আছে!'

'তুমি লম্পট! তুমি জোচ্চোর! তাই ভান করতে তোমার এতটুকু আটকায়নি। কোথায় গেল সেই অর্থ? বম্বে থাকতে তবু কিছু রোজগার ছিল—আর এই দু'মাসে কলকাতা এসে মাসে চার পাঁচশো টাকার অর্দ্ধপয়সা বেশী হয় না। তাও তো অদ্দেকের উপরে আমার নিজের উপার্জ্জন।'

'খরচ তো তোমারি সব।' অরবিন্দ অনেক সাহস সঞ্চয় করে কথাটা বললো। কিন্তু উত্তরে এ্যানি এমন ভাবে তাকালো যে অরবিন্দর সমস্ত সাহস ফুৎকারে নিবে গেল।

'আমি চাই টাকা'—এ্যনির ভদ্রতাব মুখোস আর রইল না—'বুঝতে পেরেছ, টাকা। আমেরিকা থাকতে ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ করতে তখন বহু মেয়েমানুয তোমাকে পুষতে দেখে প্রলোভনে পড়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি মেয়ে ভাগানোই ছিল তোমার ব্যবসা। তাছাড়া একবার তুমি দেশে বিয়ে করে আবার আমায় বিয়ে করেছ কেন? তোমাকে আমি জেল খাটাতে পারি জান? তিরিশ হাজার টাকাব দাবীতে আমি ডিভোর্স আনবো; তারপর তোমাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে দেশে ফিরে যাব। জান তো আমি সাদা চামড়ার মেয়ে?' বলতে বলতে এ্যানি তার সাদা বাহু অববিন্দর দিকে প্রসারিত ক'রে দিল—'আর দেখছ আমার রূপ—যে কোন যুবককে আমি একটি ইঙ্গিতে এখনো ঘুরিয়ে দিতে পাবি।' অরবিন্দ নিঃশব্দে বসে রইল বিছানায়—একটি শব্দও আব উচ্চারণ কবলো না। এ্যানি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো, 'আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিতে চাইনা, তবে আর একটি মাস তোমাকে সময় দিলাম—এর মধ্যে তুমি আমার ইচ্ছেমত যদি ভাল ভাবে চল এবং তোমার উপার্জ্জন যদি বাড়ে তো ভাল নয়ত আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না।' এ্যানি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আর অরবিন্দ বসে রইলো স্থাণুর মত।

খানিকক্ষণ পরে নেপালি বয় ট্রেতে করে তার ঘবেই ছোট হাজরি এনে হাজির করেছে।

'কেন এনেছিস?' অরবিন্দ রুখে উঠ্‌লো বিছানায় বসেই।

বয়টাকে একটু ঘাবড়াতে দেখা গেল না, মেমসাহেব যখন বেড়িয়ে গেছেন তখন আর ভাবনা কি—অরবিন্দকে সে ভয় পায় না কিন্তু ভালবাসে—খুব ভালবাসে কেননা সে বুঝেছে বাইরের অরবিন্দ তার একটা খোলস মাত্র— ভেতরের মানুষটি অত্যন্ত ভীরু, কোমল। মেমসাহেব অরবিন্দকে যখন নির্য্যাতন করে তখন তার মনে হয় কোমরের পেটি থেকে কুক্‌রি খুলে তার সাদা বুক লাল করে দেয়—কিন্তু তার কাপুরুষ মনিব নিঃশব্দে কুকুরের মত হজম করে।

অরবিন্দর ধমকের পরেও সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে—অরবিন্দ চাযে চুমুক না দেওয়া পর্য্যন্ত সে যাবে না। একটু পরে অরবিন্দ আবার বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে?'

'চুয়া পানি ঠাণ্ডা ভৈ গয়'—

'ভৈ গয় তো তোর কি! তুই যা।'

'বাবু চুয়া পিত্ত'—অত্যন্ত স্নেহের সুর বেরুলো নেপালীর গলা থেকে। অরবিন্দর মনের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগলো। দ্বিতীয় কথা না বলে সে আস্তে চা ঢাললো কাপে—মনে হলো কতকাল পরে তার কোন প্রিয়জন কাছে ব'সে খাওয়াচ্ছে। খেতে খেতেই বাইরের ঘরে লোকজনের খস্ খস্ শোনা গেল—বয় তাড়াতাড়ি গেল তাদের বসাতে আর অরবিন্দ ত্রস্তে চা সেরে কাপড় চোপড় বদ্‌লাতে উঠে এলো।

অরবিন্দ যে কাজ করে সেটা একটু অভিনব। কুৎসিত মানুষ সুন্দর করা, মোটাকে

রোগা করা, সোজা চুল কোঁকড়া করা—এ সমস্ত কথাই তার সাইন বোর্ডে লেখা আছে। বম্বেতে এসে সে এই ব্যবসা ক'রে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছে দু'বছরে—কিন্তু তারপরই তার বুজরুকি আর লোকে বিশ্বাস করতে চাইল না। বুদ্ধিটা অবশ্য এ্যানির, এজন্য তাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়—আর সে সত্যি পারেও এমন কাজ—ভ্রু চাঁছা, চোখ টান করা, চামড়া সাদা করা, ঠোঁট ধনুক করা—কিন্তু অরবিন্দর এসব ঠিক আসে না—তাছাড়া যে সমস্ত কথা বললে ব্যবসাতে লোক জমান যায় সে সমস্ত সে আয়ত্ত করতে শেখেনি। কতকাল আর থাকা যায় জোচ্চুরি ক'রে—অরবিন্দ ট্রাউজার্সের মধ্যে সার্ট ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবলো—এবার সে নিশ্চয়ই এসব ছেড়ে দেবে, কোন ইস্কুলে মাষ্টারি—বীমার দালালি যা হোক একটা চোখ বুজে সে—

চিন্তায় বাধা পড়লো—বয় এসে তাড়া দিল বাইরে যাবার জন্য। হঠাৎ অরবিন্দর কি হল, নিমেষে টান মেরে গা থেকে খুলে ফেললো সার্টটা তারপর ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা সুরে বল্ল, 'বলে দে আজ সাহেবের অসুখ—কাজ বন্ধ।' তারপর ব'সে ব'সেই সে অনুভব করতে লাগলো বাইরের ঘরের অস্পষ্ট চলা-ফেরার শব্দ আর দু'একটা কথার টুক্‌রো। অনেক শিকার গেল, যাক্‌গে। অলস ভাবে উঠে অরবিন্দ একটা সিগরেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

বেলা প্রায় এগারোটায় এ্যানি ফিরে এলো কোথা থেকে—আজকাল তার বন্ধু জুটেছে অনেক। জুটুক, অরবিন্দর আপত্তি নাই—ও যদি কারো সঙ্গে চলে গিয়ে মুক্তি দিত অরবিন্দকে তবে সে মাথা মুড়িয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো। কিন্তু এ্যানি যে বড় ধূর্ত্ত। অরবিন্দ ততক্ষণে স্নান সেরে দাড়ি কামিয়ে দরকারী চিঠিপত্র লিখতে বসেছে—এ্যানি এসে সোজা তার ঘরেই ঢুক্‌লো।

'কেমন লোক হয়েছিল আজ?'

'একজনও না—'

'একজনও না! স্কাউণ্ড্রেল, মিথ্যে কথা বলছ?'

মিথ্যে কথা বলাই তো আমাদের ব্যবসা'—

এ্যানির মুখ লাল হয়ে উঠলো রাগে—

'ও সমস্ত চলবে না, যা পেয়েছ সব দাও।'

'সত্যি কিছু পাইনি'

'ফের মিথ্যে কথা বলছ?'

'মিথ্যে কথা কেন বলবো, ভারতীয়েরা মিথ্যে কথা বলে না।'

'রোগ্'—এ্যানি ক্ষেপে গেল। পাছে অরবিন্দ ঠিক ঠিক মত সব না দেয় এজন্য খদ্দের চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত এ্যানি কক্ষনো বেরোয় না বাড়ি থেকে—আজ ক' দিন থেকে অবিশ্যি বেরুচ্ছে কিন্তু ফিরে এলে অরবিন্দ কড়ায় ক্রান্তিতে তাকে সমস্ত দিয়ে দেয়। আজকে অরবিন্দর মতিগতি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঝড়ের মত সে তক্ষুণি আবার বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আর অরবিন্দ পরম নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে অর্ধসমাপ্ত চিঠি

শেষ ক'রে ব্যাঙ্কের বই খুলে দেখতে লাগলো কত আছে তার হাতে। অরবিন্দর এত সাহস হল কি ক'রে সে কথা সে নিজেই বুঝলো না—এ্যানির সঙ্গে প্রকাশ্য ঝগড়া ক'রে তার একথা একবারও মনে হল না এরপরে কি হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে শিষ্ দিতে দিতে সে সমস্ত ঘর ঘুরতে লাগলো, আর কেমন একটা উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে লাগলো।

সমস্ত দিন কিন্তু এ্যানি ফিরলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অরবিন্দ যখন খেতে বস্‌লো তখন এ্যানির জন্য কেমন যেন তার মমতা হল। আহা— কত দূর দেশ থেকে শুদ্ধু এই টাকার লোভে মেয়েটা এসেছে তার সঙ্গে— সত্যিই তো আশানুরূপ সে কি পেল? আমেরিকা থাকতে সে দু'হাতে উপার্জ্জন করেছে। বাড়ি করেছিল, গাড়ি করেছিল—মন টিকলো কৈ তবু? শেষের বছরটায় তার দেশে ফিরবার জন্য পাগল হতে বাকী ছিল। কোথা থেকে জুট্‌লো এই মেয়েটা? শেষের দিকে অরবিন্দর আর স্পৃহা ছিল না মদে মেয়েমানুষে—কিন্তু এই মেয়েটা আবার ভজালো তাকে। কেন সে মজ্‌লো? অরবিন্দ কাঁটা চামচে নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করতে লাগলো প্লেটের মধ্যে। আজ ফিরে আসুক এ্যানি—এ্যানি যা চায় সব দিয়ে সে তা'কে ঠাণ্ডা করে বিদায় দেবে—সমস্তই তো প্রায় গেছে—যা আছে তাও যাক্— সব যাক্ তারপর আবার সেই বারো বছর আগেকার অরবিন্দ। বারো বছর আগেকার অরবিন্দ, বারো বছর আগেকার অরবিন্দ—কথাটা বারে বারে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে ভারি ভাল লাগলো তার।

বেলা চারটে পর্য্যন্ত ঘন ঘন ঘড়ি দেখে দেখে অরবিন্দ ক্লান্ত হল তবু এ্যনি ফিরে এলো না। মনটা একটু কেমন বিষণ্ণ লাগলো যেন। চারটের পর সে বেরুলো। কেন বেরুলো কোথায় যাবে কিছু তার মনে হল না। ধরমতলা দিয়ে এস্‌প্লেনেডে এসে সে কালিঘাটের ট্রামে চড়ে এগিয়ে এলো গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে। ফুর ফুরে হাওয়া—অরবিন্দের সমস্ত শরীর মনে এক আশ্চর্য্য মুক্তির আনন্দ। জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে সে নেমে পড়লে লাফ দিয়ে, তারপর রাস্তা পার হয়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো হরিশ মুখার্জি রোডের উপর। ভেতরে ভেতরে এই রাস্তাটিই যে তাকে সমস্তটা দিন ধরে এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনেছে এটা সে এতক্ষণ পরে বুঝতে পেরে যেন হঠাৎ থম্‌কে গেল। নিঃশ্বাসটা কেমন ভারি ভারি বোধ হল—স্তব্ধ হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ—তারপর আবার ধীর পায়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে ফিরে এলো বড়ো রাস্তায়। লাল রংয়ের একটি দোতলা বাড়ীর ছবি তার মনে হল চকিতে—মনে হল আট বছর আগেকার আঠার বছরের একটি মেয়ে আর তারপর সেই কালকের দেখা মাধুরী—ঐযে ট্রাম যায়—অরবিন্দ টপ ক'রে উঠে পড়লো লাফ দিয়ে কিন্তু বসতে গিয়েই যাকে দেখলো তাকে দেখেই সে আর বসতে পারলো না—অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো ভেতরটা, ট্রামের দরজার হাতলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল মূঢ়ের মত।

মাধুরী কি দেখেনি অরবিন্দকে? দেখেছে। কালও দেখেছে আজও দেখছে। তাছাড়া চিনতেও তার একটি নিমেষ ক্ষয় করতে হয়নি। কালকে দেখে তার সমস্ত রক্ত বোধহয়

মাথায় উঠে এসেছিল আর আজকে দেখেও তার কাণ জ্বালা করতে লাগলো। মনে হল এই মুহূর্ত্তে নেমে যায় ট্রাম থেকে। ভেতরে ভেতরে তার কেমন একটা যন্ত্রণা হতে লাগলো কিন্তু অসহায় ভাবে বসে রইল সে চুপ ক'রে। তার নিজের উপর রাগ হলো। কেন, কেন এই লোকটি সম্বন্ধে সচেতনতা? এ লোকটা তার কে? সে মাধুরী মিত্র, তার হাতে 'শাঁখা' নেই, তার কপালে সিঁদুর নেই—কখনো তার বিয়ে হয়নি—তবু এই লোকটার অস্তিত্বে তার এই যন্ত্রণা কেন? উৎকণ্ঠিত ভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগলো এলগিন রোডের মোড়টুকুর জন্য। কী কুক্ষণে আজ সে বেরিয়েছিল—এলগিন রোডে এসে পৌঁছুতে দেরী হল না। মাধুরী নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। রাস্তা ছেড়ে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে সরে দাঁড়ালো অরবিন্দ আর অরবিন্দর ঠিক বুকের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলো মাধুরী। অরবিন্দ আস্তে এসে মাধুরীর পরিত্যক্ত আসনে ব'সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে—আর থেকে থেকে শিরশির করতে লাগলো বুকের ভেতরটা।

বাড়ী ফিরে শুন্‌লো মেমসাহেব ফিরেছেন—অরবিন্দ তক্ষুনি এ্যানির ঘরে টোকা দিয়ে ঢুকলো। দেখ্‌লো ঘর অন্ধকার—পূবের দিক্‌কার খোলা জানালার আব্‌ছা আলোকে দেখা গেলো এ্যানি একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে কপালে হাত রেখে। অরবিন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এসে বসলো, 'এ্যানি সমস্ত দিন তুমি কোথায় ছিলে?'

এ্যানি জবাব দিল না।

'তুমি রাগ ক'রেছ?'—অরবিন্দর স্বভাবমধুর স্বর বেরুলো এবার—'রাগ করো না—তুমি যা চাও তাই হবে।' এ্যানি এবার নড়ে চড়ে ব'সলো —'তুমি সকালে আমাকে ঠকালে কেন?' কথার স্বর ভাঙা ভাঙা—অরবিন্দর মনে হল এ্যানি কেঁদেছে—আস্তে এ্যানির একখানা হাত চুম্বন করে সে বল্‌ল, 'আমি সত্যিই ঠকাইনি— ভোরে আজ আমি একটি খদ্দেরও গ্রহণ করিনি—সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন?' এ্যানির স্বর রূঢ় শোনালো—

'কেন আর কি—এমনি! আমি ভেবেছি এসব লোক ঠকিয়ে উপার্জ্জন আর করবো না।'

'ও—এতোদিনে বুঝি বিবেক গজালো? আমার ব্যবস্থা?'

'তুমি যে রকম চাও।'

'আমি যা চাই তা তুমি মেটাতে পারবে?'

'চেষ্টা করবো।'

এ্যানি চুপ ক'রে রইল।

অরবিন্দ সস্নেহে বল্‌ল—'আমি তোমাকে সতিাই ঠকিয়েছি—তুমি তো রাগ করতেই পার, তবে আমি ভেবেছি—আমার কাছে যা কিছু আছে সমস্ত কুড়িয়ে কাচিয়ে হাজার পনেরো হয়তো হবে—দু'এক হাজার আমি রেখে সমস্তই তোমাকে দিয়ে দেব—তাছাড়া এই বাড়ীর আসবাব পত্র বেচেও কিছু পাবে নিশ্চয়—সব নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও, ইচ্ছে মত বিয়ে করে আবার সুখী হও।'

'ওঃ এত দয়া তোমাব।'

এ্যানি যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখে কথা কয়ে উঠ্‌লো।

পরের দিন থেকে এ্যানির স্বভাব দেখে ভৃত্যমহল অবাক হ'য়ে গেল। বিলিতি মেয়ের যতখানি ভদ্রতা জানা থাকে সমস্তই এ্যানি অকৃপণ ভাবে অরবিন্দব উপর প্রয়োগ করলো। এক রাত্রির মধ্যে যেন একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। তাবপর পনেরো দিন সমানে ঘুরে ঘুরে অরবিন্দ এক বীমার অফিসে দেড়শো টাকা মাইনের এক কাজ পেলো এবং আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়িব আসবাবপত্র বেচে শ'পাঁচেক টাকা এবং চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ দিয়ে এ্যানিকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসে জীবনের মত নিশ্চিন্ত হল। এবার মনে হল তার বৌদিব কথা। দাদার মৃত্যুর খবর সে বিলেত থেকেই জানতে পেরেছিল, তাবপরে অভাগিনী বৌদি যে কোথায় কাব আশ্রয়ে কি ভাবে আছেন তা সে কিচুই জানতে পাবে নি। শ্যামবাজারে বৌদিব এক উকিল দাদা ছিলেন একথা সে জানতো কিন্তু এতদিন তাঁরা সেই একই বাড়ীতে আছেন কিনা এ বিষয়ে অরবিন্দর সন্দেহ হলো। তবু ও একদিন সন্ধেবেলা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে সেই বাড়িতে গিয়েই উপস্থিত হল। আশ্চর্য্য, এখনো দাদার সেই সাইনবোর্ডটি ঝোলানো আছে সামনের দরজায়। অরবিন্দ সসঙ্কোচে ভেতরে গিযে বেল টিপতেই একটি চাকর বেরিয়ে এলো।

'নগেন বাবু বাড়ী আছেন?'

'না, কর্ত্তা বাইরে গেছেন।'

অরবিন্দ বল্‌ল, 'নগেন বাবুর এক বিধবা বোন এখানে থাকেন জান?'

চাকরটি ঈষৎ চিন্তা ক'রে বল্‌ল, 'কে, বড় পিসিমা?' আন্দাজেই অরবিন্দ বল্‌ল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড় পিসিমাই—যাঁর ছেলেপুলে নেই।'

'তিনি আছেন।'

অরবিন্দ হাতে স্বর্গ পেলো, 'এক্ষুনি তাকে ডাক, বল যে তার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। আমার তাঁকেই দরকার।' এমন অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে অরবিন্দ কথাটা বল্‌ল যে চাকরটি পর্য্যন্ত একটু অবাক হল। যাই হোক ভেতরে গিয়ে সে খবর দিতেই অন্নপূর্ণাকে খানিক পরে দরজার সামনে দেখা গেল। অরবিন্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, তারপর এক সময় নতমুখে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বল্‌ল, 'বৌদি, আমাকে ক্ষমা কর।' অন্নপূর্ণার দু'চোখ ভরে জল এলো—নতুন ক'রে মনে পড়লো তাঁর সমস্ত কথা। নিঃশব্দে তিনি অরবিন্দর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন।

অরবিন্দ যে কি কথা বলবে ভেবে পেলো না। সাদা ধবধবে থান কাপড়ে আর অলঙ্কারহীন শূন্য হাত দু'খানায় তাঁকে যে কি অদ্ভুত লাগলো অরবিন্দর চোখে, অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারলো না।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ?'

'ভালই। তোমার শরীর ভাল আছে? নগেনদা কোথায়? অরবিন্দ সহজ হবার চেষ্টা করলো।

'দাদার তো ঐ দাবার নেশা—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো। কবে এলে?'

'এসেছি অনেকদিন, এতদিন তোমার কাছে আসবার মত অবস্থায় ছিলাম না। এখন আমি একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়ে একা আছি ধরমতলায়, তোমাকে নিয়ে যাব বলে এলাম।'

'আমাকে?'—অন্নপূর্ণা কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন, একটু থেমে বল্লেন, 'যিনি তোমার কাছে থাকতে পেলে এখনো সংসারে বেঁচে থাকতেন তিনিই গেছেন।'

'বৌদি তুমি আমার মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' অরবিন্দর গলা ধরে এলো। সহসা দরজার অন্তরালে একটা হাসিখুসি চেহারার আভাস পাওয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই একটি মহিলা এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফর্সা ধবধবে কপালের উপর এতবড় সিঁদুরের ফোঁটা, আধা ময়লা একখানা লাল পাড়ের শাড়ি পরনে। লক্ষ্মীশ্রীতে ঝলমল করতে করতে সেখানে এগিয়ে এলেন। 'দিদি, অরবিন্দ এসেছে আমাকে বলনি যে? আমি গল্প শুনতে পেয়েই বুঝতে পেরে ছুটে এলাম। তারপর অরবিন্দ, কবে এলে তুমি?' আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে অপরূপভাবে হাসতে লাগলেন তিনি। 'আরে বৌদি যে, কেমন আছ?' অরবিন্দর স্বাভাবিক প্রফুল্লস্বর আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো এবার নগেনদার স্ত্রীকে দেখে—'বাঃ তুমি দেখ্‌ছি একটুও বুড়ো হওনি',—নত হয়ে সে পায়ের ধূলো নিতে এলো। হৈমন্তী খপ ক'রে ওর দু'হাত চেপে ধরলেন, 'কর কি কর কি—সাহেব মানুষ প্রণাম ট্রণাম করে না, এমনিতেই সুখে থাক। কবে এলে তুমি? খবর কি তোমার? বসো বসো—চা খাবে না?' হৈমন্তী ঠিক সেই রকমই আছেন। অরবিন্দর ভেতরটা ফুট্‌তে লাগলো আনন্দে।

'চা তো নিশ্চয়ই খাব কিন্তু তার আগে তুমি বসো তো একটু— বৌদি তুমিও বসছো না কেন?'

'না তোমরাই বসো। আমি বরং চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।' অন্নপূর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'অরবিন্দ, তুমি আগের মত চায়ের সঙ্গে পেঁয়াজকুচো, শুকনো লঙ্কা আর আলু দিয়ে চিঁড়ে ভাজা খেতে ভুলে গেছ নিশ্চয়।'

'একটুও না— ভেজেই সেটা পরীক্ষা কর না আজ।'

' তবে যাই আমি ভাজি গিয়ে।' হৈমন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন।

'চল আমিও যাই।'

'তুমি যাবে রান্নাঘরে? না বাপু, তুমি সাহেব মানুষ এখানই বসে থাক।'

অরবিন্দ মৃদু হেসে হৈমন্তীর পেছনে পেছনে বাড়ীর ভেতরে এলো। এ বাড়ি তার নখদর্পনে।

বৌদির সঙ্গে কতবার সে এখানে এসেছে, কত জ্বালিয়েছে এদের হল্লা করে। ছেমোনুষের মত কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে বাড়িটি দেখতে লাগলো ঘুরে ঘুরে।

খানিক পরেই নগেনদা এলেন। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। হাসিতে গল্প গুজবে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে অরবিন্দ নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এলো বাড়ীতে।

যাবার সময় অরবিন্দ অনেক সংকোচ অনেক ভয় অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে কেউ তার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলো না এবং যে নামটির আদ্যাক্ষর উচ্চারণ করলেও তার হৃদয়কম্প হতো সেই মাধুরী সম্বন্ধে পর্যন্ত কেউ সেখানে টুঁ শব্দ করলো না। তাদের এই কৌতূহলহীন সভ্য মনের পরিচয়ে অরবিন্দ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠ্লো। এটুকু সে বুঝলো যে এর মধ্যে বৌদির ইঙ্গিত রয়েছে। বৌদির চিরসংযমী অভ্যাসের কাছে বহুবারের মত আবার নতুন করে সে মাথা নোয়ালো।

অরবিন্দর যে চাকরী তাতে ছুটির বালাই নেই। সাড়ে ন টায় প্যান্টের উপর কোট চাপাতে চাপাতে ছোটে আর ফেরে আলো জ্বাললে। সেই নেপালী চাকর পহ্লমন আছে তার সঙ্গে। সেবায় যত্নে সে তাকে আগলে রাখে মায়ের মত। ফিরে এলে দেরীর জন্য অনুযোগ করে আর শরীরের দিকে নজর দিতে উপদেশ দেয়। রবিবার ভোরে উঠেই অরবিন্দ বল্‌ল, 'এই পহ্লমন আজ আমার বৌদি আসবে, তুই ঘর টর গুলো কিন্তু সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখবি।' পহ্লমনের ফোলা ফোলা নেপালি চোখ ছোট হয়ে এলো বিস্ময়ে, 'কিস্‌কা বহু? আপকো? আপকো সুহাসিনী?'

অরবিন্দ হেসে ফেল্‌ল, 'আরে বহু নয়, বৌদি—বড় ভাইকা সুহাসিনী— বেটা জংলি, এতদিন বাংলা মুলুকে আছিস্ বাংলা জানিস্ না।'

'হামি?'—পহ্লমনের দাঁত বেরিয়ে গেল এবার—'হামি তো বাংলাই বোলে সরবদা। মাইজি কব্ আয়গা বাবু?'

'আজই! এক্ষুনি আমি তাঁকে আন্‌তে যাচ্ছি—কাপড় চোপড় ঠিক করে দে।'

'ল্‌লোঃ'—পহ্লমন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আটটা বাজতেই অরবিন্দ গিয়ে হাজির হল নগেনদার বাড়ি। নগেনদা তখন দ্বিতীয় প্রস্ত চায়ে মশগুল। 'আরে এসো এসো— কোথায় গেলে— ডাক না তোমার বৌদিকে'—নগেনদা ব্যস্ত হয়ে উঠ্লেন।

'আপনি বসুন না, আমি নিয়ে আসছি ডেকে।' কিন্তু ডাক্‌তে হল না, তিনি গলা পেয়ে নিজে থেকেই এলেন—'বাব্‌বা চমৎকার মানুষ ভাই তুমি'—এসেই তিনি অরবিন্দকে অনুযোগ করলেন—' সেই গেছ বুধবার রাত্তিরে আর এলে রোববার সকালে, এর মধ্যে আর তোমার অবসর হলো না নাকি?'

অরবিন্দর বৌদিও এলেন, 'এতদিন আসনি কেন?'—মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন।

'আমার অবসর কোথায়? কি গোলামী আমি করি তা তুমি নিজের চোখেই দেখবে'খন, এইতো রোব্‌বারটুকু যা ছুটি।' তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'নগেনদা আমি কিন্তু আজ বৌদিকে নিয়ে যেতে এসেছি। নগেনবাবুর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। 'তুমি কি পাগল, অরবিন্দ?'

'কেন, এতে পাগলামীর কী রয়েছে?'

'তা তো তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।' নগেনবাবু চায়ের পেয়ালার মুখ ডোবালেন। আর অরবিন্দর কান গরম হ'য়ে উঠলো—ইঙ্গিত বুঝে; সহসা জবাব দিতে পারলো না।

সেদিন রাত্রের ব্যবহারে তার মনে একটা সূক্ষ্ম আশা বাসা বেঁধেছিল, সে যে মেম নিয়ে এসেছে এটা বোধহয় এঁরা কেউ জানেন না। ওঁরা যে সেদিন চেপে ছিলেন সে কথা ভেবে সে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠলো। 'আমি অনেক অন্যায় করেছি—কিন্তু তাই বলে বৌদির কাছেও কি ক্ষমা নেই নগেনদা?'—কথাটা সে সহজ ভাবেই বলতে চেয়েছিল কিন্তু কি রকম করুণ শোনালো।

অন্নপূর্ণা চুপ ক'রে বসেছিলেন, অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে জল এলো। 'ক্ষমা আবার কি ভাই, তুমি যে সতিাই ফিরে এসেছ নিজের ঘরে, তা আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো জান বিধবা মানুষের—'

'বিধবার সমস্ত নিয়ম তুমি পালন করতে পারবে বৌদি— সেখানে আমি একা,'— অরবিন্দ অন্নপূর্ণার মুখ থেকে যেন কথাটা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগলো, 'বিশ্বাস করো সেখানে আমি একা।' পরিপূর্ণ শান্তির সঙ্গে সে একথা উচ্চারণ করলো যে সে একা।

'তবে যে শুনলাম'—নগেনদা অর্দ্ধেক বলেই হৈমন্তী ও অন্নপূর্ণার দিকে তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দিলেন।

'ঠিকই শুনেছিলেন, কিন্তু সে সব বালাই আর নেই এখন।' নগেনদা কথাটা বিশ্বাস করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দব আগ্রহকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা স্বামীর মৃত্যুর পরেই ভাইয়ের বাড়ী চলে এসেছিলেন—টাকা পয়সা অনন্তবাবু কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—একা অরবিন্দই তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত করেছিল—তবু মৃত্যুর পরে বিশ হাজার টাকার একটি লাইফ ইনসিওরেন্স পাওয়া গেল। নগেনবাবু সমস্ত টাকা অন্নপূর্ণার নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। অরবিন্দর কাছে আসবার দিন পাঁচেক পরে অরবিন্দ যখন শুতে যাবে অন্নপূর্ণা তাকে ডেকে বল্লেন, 'অরবিন্দ—টাকা ক'টা বরং তোমার নামেই বদলে রাখ।'

'ক্ষেপেছ?'—অরবিন্দ সাত হাত পিছিয়ে গেল—'এততেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি নাকি? ওসব ঝামেলা আমি আর নেবো না কিছুতে।'

অন্নপূর্ণা তাকে নিজের বিছানার প্রান্ত দেখিয়ে বল্লেন, 'বসো একটু, কথা আছে তোমার সঙ্গে।' অরবিন্দ পা ঝুলিয়ে ব'সতেই তিনি বল্লেন, 'তোমাকে যখন ভয় ছিল তখন সেই ভয় কাটাবার জন্যেই একটা গুরুতর অন্যায় করেছিলাম, এখন আর ভয় নেই, টাকাটা তোমার কাছেই রাখ, আর আমার একটা শেষ অনুরোধ যে মাধুরীর একটু খোঁজ নাও। মেয়েটার সর্ব্বনাশের জন্যে আমরাই দায়ী—তোমার দাদার আত্মা শান্তি পাবে না নয়তো।' অন্নপূর্ণার গলা ধ'রে এলো—কে'শে নিয়ে বল্লেন, 'যদি তুমি অনুমতি দাও আমি নিজে যাই তাকে আনতে।'

'সে কি আসবে?' অরবিন্দর জবাবটা বিষণ্ণ শোনালো। 'আসবে না? বল কি— হিঁদুর মেয়ে স্বামী ডাকলে কি না এসে পারে? আর তা ছাড়া ওরা আছেও ভারি কষ্টে। হরিশ মুখার্জ্জী রোডের অত বড় বাড়ীটা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিক্রী হ'য়ে গেছে। এতটুকু একটু নিচতলার অংশ নিয়ে ওরা আছে। দাদার কাছে শুনলাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ে যেমনি উঠেছিলেন—পড়েও গেছেন তেমনি ধাঁ করে। মাধুরী বোধহয় চাকরী করে।'

'কিন্তু আমার মনে হয়'—অরবিন্দ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মাথা নেড়ে বললো, ওখানে গেলে তুমি অপমানিত হয়ে আসবে।'

'পাগল!' অন্নপূর্ণা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। আর সত্যি সত্যি নগেনবাবুকে খবর দিয়ে আনিয়ে একদিন তিনি মাধুবীদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। মনে মনে তাঁরও যে দ্বিধা ছিল না তা নয়— কেন না মাধুরী যে তাদের সম্পর্ক একেবারেই অস্বীকার করেছে একথা তিনি লোক-পরম্পরায় শুনেছিলেন কিন্তু মনের সে দ্বিধাকে তিনি আমল দিলেন না। হাজার হোক, স্বামীর ডাক তো। অরবিন্দ অফিসে গিয়েছিলো, সে কিছুই জানতো না। বাড়ী ফিরে সে বৌদির ঘরে গিয়ে দেখলো যে তিনি অতিশয় বিষণ্ণ মুখে গালে হাত রেখে ব'সে আছেন বিছানায়।

'একি বৌদি, তুমি বিছানায় ব'সে আছ যে সন্ধ্যেবেলা?' অন্নপূর্ণা চোখ তুলে তাকালেন জবাব দিলেন না।

'কি হয়েছে তোমার?'

'সেখানে গিয়েছিলাম।'

'সেখানে?'—বলেই অরবিন্দ কথাটা বুঝতে পরে চুপ ক'রে গেল।

'তোমার কথাই ঠিক অরবিন্দ—মাধুরী আমাদের অস্বীকার ক'রেছে।'

'তাই তো উচিত'—অববিন্দ গলার স্বরে ফাজলেমির ভাব আনবার চেষ্টা ক'বলো।

'কেন—উচিত বল্‌লে কেন?'

'বাঃ, উচিত বলবো না—ওর সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্কটা হল কবে?'

'কেন তুমি কি তাকে নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করনি?'

'বিয়ে করলেই কি পতিদেবতা হয়ে বসা যায় নাকি বৌদি? তোমাদের যুগ আর নেই।'

'আমাদের যুগ না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তো সধবা মেয়ে আর কুমারী হয়ে যেতে পারে না।'

'হিন্দু বিবাহে যে ডিভোর্স নেই—এটা মস্ত খুঁত তা নৈলে যে বেচারা এতদিনে দিব্যি বিয়ে করে সুখী হতে পারতো।'

'কে জানে বিয়েই হয়তো করবার জন্য কুমারী সেজেছে— তোমাকে বলবো কি অরু—সিঁথিতে পর্য্যন্ত এক ছিটে সিঁদুর রাখেনি মেয়েটা। আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো, তারপর মাকে ডেকে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অরবিন্দ এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—'ও যদি বিয়ে করে বৌদি আমি কিন্তু একটুও বাধা দেব না।'—বলে সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আফিস থেকে ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে আবার পরিপাটি ক'রে পোশাক পরতে ব'সলো অরবিন্দ।

'একি, এক্ষুনি আবার যাচ্ছ কোথায়?'

ধুতির কোঁচাটা বার দুই মুড়ে অরবিন্দ মুখ তুলে বল্‌লো, 'মনেই ছিল না—একটা

নেমন্তন্ন রয়েছে যে আজ পাঁচটার সময়—বাজলো তো প্রায় ছ'টা।'

'চায়ের?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'এই কাছেই।'

অরবিন্দ দ্রুত হস্তে চুলে দু'বার ব্রাস বুলিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়েই সে সর্ব্ব প্রথম দু'খিলি পান কিনে গালে পুরলো—এটা তার অভ্যেস। বিকেলের দিকে সে প্রায়ই বেরোয় না, আফিস থেকে ফিরতেই তো রাত হয়ে যায়, কতকাল যে বিকেল দেখে না তার ঠিক নেই। ভারি ভালো লাগলো তার। বিলিতি গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে সে হেঁটে এগুতে লাগলো। কিন্তু এখন তো তার দেরী করবার সময় নেই, যেতে হবে সেই বালিগঞ্জে। আচ্ছা বাসে গেলে হয় না? অরবিন্দর মন সায় দিল না। ছোঃ, বাসে চড়ে নষ্ট করবে নাকি এই অমূল্য বিকেলটি—ট্রামে সুন্দর গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে—ভাবতেই কি আরাম। অরবিন্দ ট্রামে উঠে ব'সে সিগরেট ধরালো।

সুপ্রকাশের সঙ্গে অরবিন্দর লণ্ডনেই প্রথম আলাপ। ছিপ্‌ছিপে সুন্দর এক ছোকরা—দেখলেই ভাল লাগে। বাপ বিহারের মস্ত উকিল—বিস্তর টাকা—নানাদিক থেকেই অরবিন্দর ওর সঙ্গে ভাব জমাবার একটা তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল আর বন্ধুতা গভীর হ'তেও সময় লাগলো না বেশী। কিন্তু এই বছর পাঁচেক যাবত তাদের আর দেখা শোনা হয়নি। হঠাৎ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে পরশু দিন দেখা হয়ে গেল। অরবিন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ওকে দেখে।

'একি, তুমি?'

'আরে অরবিন্দ যে'—পিঠে চাপড় খেয়ে পিছন ফিরে সুপ্রকাশ অবাক হয়ে গেল—'কবে ফিরলে তুমি?'

'এই তো বছর আড়াই, কি আশ্চর্য্য—তুমি কলকাতায় আছ অথচ এই প্রথম দেখা হ'ল। কি করছ তুমি, কোথায় আছ?

'আছি বালিগঞ্জে, আর কলেজের রাখালি করি।'—সুপ্রকাশ মিষ্টি ক'রে হাসলো—'আর তুমি?'

'আমার আবার খবর'—অরবিন্দও হাসলো।

সুপ্রকাশ আন্তরিক ভাবে ব'ললো, 'আমার বাড়ীতে চল না।'

'আজ? এখন?' —ঈষৎ চিন্তা ক'রে অরবিন্দ বল্‌ল, 'না আজ যাব না—বরং অন্য একদিন— তোমার ঠিকানা কি?'

সুপ্রকাশ শুধু ঠিকানাই দিল না, বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাতের নখ দিয়ে ছবি এঁকে এঁকে বোঝাতে লাগলো বাড়ীটা ঠিক কোথায়।

'বিয়ে করেছ?' অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো।

মধুর হাসিতে সুপ্রকাশের মুখ ভরে গেল—' ভেবেছিলাম ও হাঙ্গামায় আর কাজ

নেই কিন্তু সম্প্রতি মনে হচ্ছে বিয়ে ব্যাপারটা তত খারাপ নয়, যত খাবাপ বলে অন্ততঃ আমার ধারণা ছিল।'

'কেন বলত?'—অববিন্দ প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌ল, 'নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছ।'

'উঃ লাগে'—

'তবে বল শিগ্‌গির—তিনি কোন ভাগ্যবতী যিনি শিবের তপস্যায় বাঁধা দিলেন।'

'তিনি ভাগ্যবতী কি না জানি না—তবে আমি যে ভাগ্যবান হবো তাঁকে পেলে একথা নিঃসংশয়েই মনে করতে পার।'

'তাই নাকি? তবে তোমার এঞ্জেলটিকে একদিন দেখাও না।'

'বেশ তো—পর্শু আমার বোনের জন্মদিন—উনিও আসবেন, তুমিও যেয়ো।—আর শোনো—এসব নিয়ে কিন্তু কোন ইঙ্গিত ক'র না।'

'কেন?'—

'পাগল! এটা একান্তই আমার নিজের মনের কথা।'

'ভাল! ভাল!'—অরবিন্দ বেপরোয়া ভাবে খানিকক্ষণ ওর পিঠ চাপড়িয়ে বিদায় নিল।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় অরবিন্দ গিয়ে সুপ্রকাশের ওখানে পৌঁছল। সুন্দর একতালা বাড়ি—সামনে সবুজ কম্পাউণ্ড, গেট থেকে লাল সুরকির প্রশস্ত রাস্তা গোল হয়ে বেঁকে গিয়ে গাড়ি বারান্দায় ঠেকেছে। বাড়িটি দেখা গেল ঝক্ ঝক্ করছে আলোতে, অরবিন্দ একটু ইতস্ততঃ করে আবার নম্বরটা মিলিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর মধ্যে। একদল অতিথি বোধহয় ফিরে যাচ্ছিল—সুপ্রকাশ আর উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে দেখা গেল বিদায় সূচক নানারকম ভদ্রতা ক'রে তাদের বিদায় দিচ্ছে। গাড়ীটা হেড্ লাইট জ্বালিয়ে তার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বোঁ করে—সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রকাশের আন্তরিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যে অরবিন্দ! অবশেষে এলে তা হলে?'—সুপ্রকাশ দ্রুত এগিয়ে এলো—'এই যে আমার বোন সুমিত্রা—এর উপলক্ষ্যেই আজ—।' অরবিন্দ যুক্ত করে অভিবাদন জানালো। সুমিত্রা হেসে বল্‌ল, 'আসুন'। সুমিত্রা একটু এগিয়ে যেতেই সুপ্রকাশ অনুচ্চারিত স্বরে বল্‌ল, 'তুমি একটা সিলি ফুল—'

'কেন?'

'এত দেরীতে এলে যে কারো সঙ্গেই তোমার দেখা হল না। আমার এঞ্জেলটিও তো পালাবার উপক্রম করেছিলেন, নানা অছিলায় ধরে রেখেছি।'

'তা হলেই যথেষ্ট।'

অরবিন্দকে নিয়ে সুপ্রকাশ ড্রইংরুমে ঢুকলো। ঘর প্রায় শূন্য। এখানে ওখানে দু'চার জন স্ত্রীপুরুষের স্বল্পতম ভিড়—কিন্তু জানালার দিকের সেটিতে যে মেয়েটির পাশে গিয়ে সুমিত্রা দাঁড়ালো এবং তা'কে ব'সবার অনুরোধ জানালো তাকে দেখে অরবিন্দর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ক'রে উঠলো। সুমিত্রা মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল বটে কিন্তু অরবিন্দর গলা দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না আর মাধুরী বিবর্ণ মুখে সেটির কোণে ব'সে ঘামতে লাগলো দৈবের নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে।

সুমিত্রা উঠে গিয়ে চা নিয়ে ফিরে এলো। অরবিন্দ দু'চারবার কেশে চেষ্টা করলো আলাপ জমাতে—কিন্তু বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে চুপ ক'রে গেল। সুপ্রকাশ এলো ভেতর থেকে, 'আরে অরবিন্দ তুমি যে একেবারে ভদ্রলোক হয়ে আছ। কথা টথা বল।'

অরবিন্দ যেন খেই পেল সুপ্রকাশকে দেখে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'এইতো এদিকে'—মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'এঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন, দেখবেন অদ্ভুত আমুদে মানুষ আমার বন্ধুটি।'

মাধুরী অতি কষ্টে একটু হাসলো এবং একটু পরেই বল্‌ল, 'আমার এবার যাওয়া দরকার, সুপ্রকাশ বাবু।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমি নিজে গিয়েই তো আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো কথা দিয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন দয়া ক'রে। দাসেদের পৌঁছিয়ে দিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে আমার গাড়ী।'

'গাড়ির দরকার কি, আমি স্বচ্ছন্দে ট্রামে চলে যেতে পারবো।'

'না না সে কি হয়। একটু বসুন দয়া ক'রে।'

'এত ব্যস্ত হয়েছিস্ কেন, বস্ না আর একটু'—বলে সুমিত্রা ব'সে পড়লো তার পাশে। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, মিঃ দত্ত ইনি আমার সহপাঠিনী ছিলেন এখন সহকর্ম্মিণী।'

অরবিন্দ বোকার মত হাসলো।

'কিছুই খাচ্ছেন না আপনি'—সুমিত্রা আবার অনুযোগ করলো।

'না, না, খাচ্ছি বইকি—খাওয়া বিষয়ে আমি একান্ত নির্লজ্জ।' বল্‌তে বলতে সে হঠাৎ তাকালো মাধুরীর দিকে।

মাধুরী নিমেষে চোখ নামিয়ে ফেল্‌ল তার মুখ থেকে এবং পরমুহূর্ত্তেই সোজা দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'না ভাই, আমার আর দেরী করা চলে না—আমি ট্রামেই যাই।'

'আর একটু, আর একটু'—সুপ্রকাশ অনুনয় করে বললো।

সুমিত্রা মৃদু হেসে বল্‌ল, 'তুমি আজকে আমাদের মাননীয় অতিথি, তোমাকে পৌঁছিয়ে দেবার সম্মানটুকু অন্ততঃ আমাদের দাও।'

মাধুরী নিরুপায় ভাবে চুপ করে ব'সে পড়লো। আর অরবিন্দ তক্ষুনি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বল্‌ল, 'সুপ্রকাশ, আমিও কিন্তু ভাই আর বসবো না আজ—মিস্ কর, অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার জীবনের এই শুভ-দিনটিতে আস্‌তে পাবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেও আমি খানিকক্ষণ আপনাদের সুমধুর সাহচর্য্য লাভ করতে পারলুম না'—বল্‌তে বল্‌তে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো—'অত্যন্ত অভদ্রতা, অত্যন্ত অসভ্যতা হচ্ছে বুঝেও আমি নিরুপায় হয়েই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে বাধ্য হলাম'—হাতের ঘড়ির দিকে ব্যস্ত ভাবে চোখ বুলিয়ে —'নিশ্চয়ই আমাকে মার্জ্জনা করবেন।'

'ওকি এই তো এলে,' সুপ্রকাশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ণ বাজলো গাড়ি বারান্দায়। উৎকর্ণ হয়ে সুপ্রকাশ এগিয়ে এলো একবার দরজার সামনে—তারপরেই ফিরে এসে বল্‌ল, 'আচ্ছা, চল।'

'আমি— আমি কেন—'

'নাও নাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না,' সুপ্রকাশ তাকে ঠেলে এনে গাড়িতে ঢুকিয়ে দিল— মাধুরীও এগিয়ে এলো নিঃশব্দে। 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম মিস্ মিত্র,' সুপ্রকাশ ভদ্রতা জানাতে জানাতে ড্রাইভারকে নামিয়ে নিজেই ড্রাইভ করতে বসলো সামনে। ভেতরে মাধুরী আর অরবিন্দ অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বে নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল।

গাড়ি রাসবিহারী এভিনিউ পার হয়ে যখন রসা-রোডে এসে পৌঁছুলো অরবিন্দ অত্যন্ত আস্তে, প্রায় কানে কানে বলার মত করে ডাকলো, 'মাধুরী'।

মাধুরী কাঠ হয়ে গেল অরবিন্দর ডাক শুনে। 'আমি বলছিলাম কি'—অরবিন্দ বিপন্নের মত বল্‌ল, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, কালকে যে বৌদি গিয়েছিলেন তোমাদের ওখানে সেকথা আমি জানতাম না।'

মাধুরী নিস্পন্দ।

অরবিন্দ—যাতে শোনা না যায় এভাবে সুপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য বল্‌ল, 'তোমাদের এন্‌গেজমেন্টের কথা শুন্‌লাম।'—

'এন্‌গেজমেন্ট!'—মাধুরীর গলা চিরে শব্দ বেরুলো।

'কী হলো?' সুপ্রকাশ চালাতে চালাতে মুখ ফেরালো। সে কথাটা শুনতে পায়নি, কিন্তু অদ্ভুত ভাঙ্গা আওয়াজটা শুনেছিল।

'কিছু না, ধন্যবাদ,' মাথুরী হাসি টেনে বল্‌ল।

অরবিন্দ একটু অপেক্ষা করে আবার নীচু স্বরে বল্‌ল, 'হ্যাঁ, এন্‌গেজমেন্ট না হয়ে গেলেও তোমরা উভয়ে যে বিবাহে ইচ্ছুক একথা আমি শুনেছি। তুমি একটু দ্বিধা ক'র না মাধুরী। আইনত বলপ্রয়োগ করে তোমার উপর আমি দাবী জানাতে পারি, কিন্তু আমাকে ততটা বর্ব্বর যদি মনে না কর তা হ'লে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এতটুকু কেলেঙ্কারিও আমি করবো না এই নিয়ে। তোমাব বিয়েতে আমি সত্যি সুখী হবো। বিশ্বাস কোরো। অরবিন্দ চুপ করলো। মাধুরী কিছুই বুঝতে পারলো না ওব কথার তাৎপর্য্য। বিবাহের কথাটা ইনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? একবার বিবাহ করেই কি তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? দু'বার তার ঠোঁট নড়লো অরবিন্দকে কোনো কথা বল্‌বার জন্য কিন্তু বলা হলো না।

মাধুরীর বাড়ির দরজায় গাড়ি এসে থামতেই সুপ্রকাশ নেমে দরজা খুলে দিয়ে হেসে বল্‌ল, 'নিন এইবার আপনার শান্তি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'সুপ্রকাশ আবার গাড়ী ছোটালো অরবিন্দর বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে অরবিন্দর যে কী হল, ভাল করে খেতে পারলো না, ঘুমুতেও পারলো না রাত্রিতে। তিন দিন পরে আপিসে গিয়ে পুরু এক খামে মাধুরীর লেখা এইটুকু এক চিঠি পেলো।

'মাননীয়েষু—আপনি যা শুনেছেন তা যে একান্তই মিথ্যে কথা সেকথা জানাবার জন্য আমাকে আজ এই চিঠিখানা লিখতে হল।

মাধুরী মিত্র।'

অরবিন্দ একবার দু'বার তিনবার, বোধ হয় লক্ষবার ঐ কথা কয়টি, পড়লো তারপর চিঠিখানা অতিশয় সযত্নে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে কাজে মন লাগাবার চেষ্টা করলো। আফিসের মধ্যে দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত সময় যে তার কি ভাবে কেটেছিল তা সে নিজেও জানে না—এক সময় প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেকে সে মাধুরীদের হরিশ মুখার্জ্জি রোডের দরজার কড়া নাড়তে দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘন ঘন পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছলো, ঘাড় মুছলো এবং ব্যাকুলভাবে মাথার চুলের মধ্যে দিশাহারা হয়ে আঙ্গুল চালাতে লাগলো।

দরজা খুলে দিয়ে অরবিন্দকে দেখে মাধুরী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মিনিট খানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বল্ল, 'কাকে চান?'

'তোমার মা বাড়ি নেই, মাধুরী?' অরবিন্দ ক্ষীণ গলায় বল্ল।

'না।'

'ও,'—একটু চুপ ক'রে থেকে বল্ল, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?'

'না'—একটু থেমে—'কথা থাক্‌লে আমাকেও বলে যেতে পারেন।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল্‌বো?' হঠাৎ যেন সহজ সুর ফিরে এলো অরবিন্দর গলায়। অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরে এসে বসলো সে। 'আমাকে যদি অস্বীকারই করতে পার মাধুরী তবে আচরণটা একটু ভদ্রভাবে করাই তো উচিত।'

মাধুরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল দেয়াল ঘেঁসে।

'বসো না, বাঃ'—তারপর একান্ত স্বাভাবিক হয়ে, বল্ল, 'শোনো মাধুরী, সত্যি বল্‌তে তোমার মার সঙ্গে আমার কিন্তু একটুও দরকার নেই—আর আমি যে এখানে কেন এসেছি, কার কাছে এসেছি তাও বলা শক্ত। আপিস্ শেষ ক'রেই কালিঘাটের ট্রামের ভিড়ে বাদুড়ের মত ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে চলে এলাম। একগ্লাস জল খাওয়াবে?'

'চা খাবেন?'—মাধুরীর মৃতের মত রক্তহীন ঠোঁট ফাঁক হয়ে কথা বেরুলো।

'যদি দয়া কর তুমি—কিন্তু আগে একটু জল দাও—আমার গলা শুকিয়ে দেখ কাঠ হয়ে গেছে।' অরবিন্দ রুমাল দিয়ে মুখে হাওয়া করতে লাগলো। মাধুরী লজ্জিত ভাবে পাখাটা খুলে দিয়ে জল নিয়ে এলো। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটা খেয়ে অরবিন্দ গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বল্ল, 'আর চা খাবো না, মাধুরী, আমি এক্ষুনি চলে যাব, তুমি বরং ততক্ষণ একটু এখানেই বসো।'

'একটা কথা বলি'—অরবিন্দ একটু দম নিয়ে বল্ল, 'আমি ধরমতলায় একটা ফ্ল্যাটে বৌদিকে নিয়ে আছি শুনেছ বোধ হয়, যদি তুমি আমাকে কখনো ক্ষমা কর, কখনো যদি দয়া কর আমাকে, তবে তুমি অবশ্য যেয়ো সেখানে।' অরবিন্দ এবার উঠে দাঁড়াল টুপি হাতে করে—একটু থম্‌কে দাঁড়াল যেতে যেতে, তারপর একান্ত সহজভাবে মাধুরীর ঠাণ্ডা মসৃণ হাতের উপর নিজের কঠিন হাতখানা মুহূর্ত্তের জন্য ছুঁইয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। মাধুরী দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। এক সময় দু' চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো সেই হাতের উপরে।

'পরিচয়'—১৩৪৭

লুক্রেশিয়া

বাণী রায়

"গতকল্য রাত্রে গাড়িয়াহাট রোডে একটি খানার পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবেশ যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রহারজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল। যুবকটিকে অবিলম্বে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গড়িয়াহাট রোডে যে যুবকটিকে আহত অবস্থায়া পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম শ্রীযুত প্রবীর গুহ বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রকাশ, শ্রীযুত গুহ গতকল্য অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে তিনি গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার পকেটের টাকা, ঘড়ি ও হাতের হীরার আংটি প্রভৃতি কিছুই অপহৃত হয় নাই। সম্ভবত আততায়ীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রহারে অচৈতন্য করিয়াছিল, কিন্তু কোন ভয় পাইয়া তাহারা তাঁহার টাকাকড়ি প্রভৃতি অপহরণ না করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার সি. আই. ডি. পুলিস এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।"

সংবাদপত্রে এই সংবাদটিতে কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কর্ণেল প্রশান্ত গুহর একমাত্র পুত্র প্রবীর গুহকে কে না চেনে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত লেখক, জনপ্রিয়, কমনীয়মূর্তি প্রবীর গুহ কলিকাতা-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত, মনস্বী ছাত্র প্রবীর গুহের এই আকস্মিক বিপদে ছাত্রছাত্রী-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

পুলিস বহুদিন অপরাধীর অন্বেষণ করিল। প্রবীর গুহ আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটি চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাহার ছাত্রজীবন শেষ হইল নিরাশার অন্ধকারে। তাহার উদ্ধত লেখনী মূক হইল কলম ধরিবার অসামর্থ্যে। শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতার সহিত সে কার্সিয়াঙে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইতে গেল। প্রায় এক বৎসর যাবৎ সে সেইখানেই আছে।

পুলিসের নিকট জবানবন্দীতে প্রবীর গুহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সে গড়িয়াহাট রোড দিয়া একাকী ফিরিতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের মধ্যে একজন মুখোশপরা লোক সহসা তাহাকে আক্রমণ করে। তাহার পর আর তাহার কিছু মনে নাই। আততায়ীর চেহারা সম্বন্ধে প্রবীর গুহ কিছুই বলিতে পারে নাই।

এই আক্রমণের প্রকৃত ঘটনা এবং আক্রমণকারীর প্রকৃত পরিচয় জগতে তিনটি ব্যক্তি মাত্র জানে—প্রবীর গুহ নিজে, মালিনী সেন এবং আমি।

জানি, এখনও প্রবীর গুহর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়, তাহার প্রতিভার অপমৃত্যুর জন্য অজানা সেই দুর্বৃত্তকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ইংরেজ শাসনের নিন্দা করা হয়—পথচারী ব্যক্তির জীবন এখনও নিরাপদ নয় বলিয়া।

আমি জানি, প্রবীরকে নিষ্ঠুরভাবে কে প্রহার করিয়াছিল এবং কেন। আমি জানি, কেন প্রবীর গুহ লক্ষপতি পিতার পুত্র হইয়াও পুলিসের নিকট প্রকৃত ঘটনা বলে নাই। আমি জানি, কেন মালিনী সেনের গর্বিত মস্তক আজ অবনত, কেন প্রবীর গুহের নামে তাহার নয়নে বহ্নি জ্বলিয়া উঠে।

আমি অমর সোম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পঞ্চবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, মালিনী আমার সহপাঠিনী এবং প্রতিবেশিনী।

মালিনীর পিতা পাটনায় জজিয়তি হইতে বিরাম লইয়া হিন্দুস্থান পার্কে আমাদের পাশের বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। মালিনীর এক ভ্রাতা অধ্যাপক, অন্য ভ্রাতা ব্যারিস্টার। বাহির হইতে আই. এ. পাশ করিয়া আসিয়া মালিনী আশুতোষ কলেজ হইতে বি. এ. পাস করে।

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ি। আমার ইংরেজীতে অনার্স ছিল, মালিনীরও তাই। পাশাপাশি বাড়ি, উভয় পরিবারে সৌহার্দ্য। মালিনীর সহিত আমার সখ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

আজ মালিনী আমার কে জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু মালিনী আমার কে নয় তাহার উত্তরও আমার জানা নাই।

মালিনী বাংলার বাহিরে মানুষ। সমস্ত প্রকৃতিতে তাই তাহার একটা উন্মত্ত বন্যতা। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে অতিমুক্ত লতাটির মত। বাঙালিনীর ভীরু, নম্রতা তাহার মধ্যে নাই, আছে অগ্নি, আছে দীপ্তি। তাহার ক্ষীণ শ্যাম দেহে, আকর্ণবিশ্রান্ত কিন্তু অনতিপ্রশস্ত নয়নে, বক্র রক্ত-অধরে আছে অনল—যাহা পুরুষ চিত্তকে দগ্ধ করে, জ্বালা দেয়।

মালিনী কবিচিত্ত। তাহাদের বাগানে বসিয়া কতদিন তাহাকে দেশী বিদেশী কাব্য পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমাকে সে চিরদিন সঙ্গদান করিয়াছে, কিন্তু আমার নীরব প্রেম সে গ্রহণ করে নাই। বর্ষণমত্ত সন্ধ্যায় তাহার অবাধ্য অলক উড়িয়া আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, রৌদ্রপ্রসন্ন দিনে সে আরাম ভ্রমণে আমাকে সঙ্গী করিয়াছে, আকুল নিশীথে আমার সুরে সুর মিশাইয়া সে গান গাহিয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসায় তিলেকের জন্য সে ধরা দেয় নাই। তাহার অনল অন্য শিখাতে খুঁজিয়া মরিত, আমি তাহাকে কেবল শীতল জলই যোগাইযাছি।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মালিনী আমাদের বাড়ি আসিল, তাহার চঞ্চল চরণচ্ছন্দে গৃহ মুখর হইয়া উঠিল।

কি, একা একা ব'সে কবিতার বই পড়ছ? বাবাঃ, শেলীর কবিতা এখনও পড় তুমি! আমার ও ন্যাকামির ছড়া ভাল লাগে না। খালি ঘ্যানঘ্যানানি! বিকৃত ক্রন্দনের সুরে মালিনী আবৃত্তি করিল—

Oh light me as a wave, a leaf, a cloud
I fall upon the thorns of life . ... I bleed.

খিলখিল করিয়া হাসিয়া মালিনী আমার পাশে কাউচে লুটাইয়া পড়িল।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। মালিনী আমার হাত হইতে বই কাড়িয়া লইল। চল, ইউনিভর্সিটিতে ভর্তি হওয়া যাক। অনার্সে তুমি আমি কেউই তেমন ভাল করি নি। এবারে গোড়া থেকেই ভাল ক'রে পড়ব--- তুমি হবে ফার্স্ট, আর আমি সেকেণ্ড; না, আমি ফার্স্ট, তুমি সেকেণ্ড?—মালিনী আমার চুলের উপর হাত রাখিল।

তাহার স্পর্শের উন্মাদ আকর্ষণ প্রাণপণে সংবরণ করিতে করিতে আমি উত্তর দিলাম, তুমিই ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড।

এই গেল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের ইতিহাস।

* * * * *

মাসখানেক পর। বিকাল চারিটায় মালিনী এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একত্রে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, মালিনীর ব্যরিস্টার দাদার গাড়িতে আমরা ফিরিতেছিলাম—পথে কোর্ট হইতে তাহার দাদাকে তুলিয়া লইতে হইবে।

সেনেট হলের পাশ দিয়া আসিতে হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়া আকুল স্বরে মালিনী বলিয়া উঠিল, অমর, ও কে?

চাহিয়া দেখি, গাড়ির চলার পথ করিতে লোহার গেটে একটি হস্ত স্থাপন করিয়া প্রবীর গুহ দাঁড়াইয়া। শিশুর মত স্ফুরিত ও সুগঠিত তাহার অধরোষ্ঠে জলন্ত সিগারেট। প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার জ্যোতি, দীর্ঘ সারসগ্রীবা একটু পশ্চাতে হেলানো। নারীসুলভ কমনীয় মুখে ঈষৎ বিরক্তি ও অপার আত্মমর্যাদার ছাপ। সাধারণের সহিত তাহার কোন সংযোগ নাই, যেন থাকিতেও পারে না।

মালিনীর উত্তেজিত, মুগ্ধ মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, ওর কথাই তো তোমাকে বলছিলাম সেদিন। ওই হচ্ছে প্রবীর গুহ—গতবারে ইংরেজী অনার্সে ফার্স্ট হয়েছে। আমাদের ইংরেজী কাগজটার সম্পাদক, আর সেমিনারের সেক্রেটারি।

ওই প্রবীর গুহ! ভারী সুন্দর লেখে কিন্তু, অমন জোরালো লেখা কমই পড়েছি। আর লেখার সঙ্গে চেহারারও মিল আছে, তাই না?

প্রবীর গুহ তাকাইল না, সোজাসুজি কোন নারীর দিকে সরলদৃষ্টিতে দেখা তাহার জন্মগত অনভ্যাস। তবে মালিনীকে সে পূর্বেই দেখিয়াছিল জানি। দেখিবার বস্তু কোন কিছুতে, বিশেষত স্ত্রীজাতিতে থাকিলে, তাহা তাহার বুদ্ধিপ্রখর দৃষ্টি এড়ায় না।

গাড়ি জনযানবহুল পথে আসিল। প্রবীরের উন্নত, কমমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আধস্বরে, কপোত-গুঞ্জনের মত মালিনী আবৃত্তি করিল—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা,
আঁধারে মলিন হ'ল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তরোয়াল।

আত্মবিস্মৃত হাসি তাহার মুখে, নয়নে স্বপ্নের ছায়া।

মালিনীর স্বপ্নালস হাসি আমার চিত্তে দহন আনিল। তাহাকে পরিহাস করিয়া সতর্ক করিলাম।

চেহারাটা বাঁকা তরোয়ালের মতই, কিন্তু চরিত্র? সাবধান মালিনী, প্রবীর গুহের নৈতিক চরিত্রে শিথিলতা আছে। কোন মেয়েই ওর হাত এড়ায় না।

মালিনীর বক্র অধরে শাণিত হাসি ঝলকিয়া উঠিল। প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের যোগ থাকে না, অমর। চাঁদ কলঙ্কী ব'লেই সুন্দর। আর— লোকে তো অনেকই বলে। এদেশে তিলকে তাল ক'রে তোলার প্রথা আছে, আমি জানি।

এত সুন্দর কি দেখলে তুমি, মালিনী? তুমি তো কোন পুরুষকে সুন্দর দেখ না?— অজ্ঞাতে হয়তো একটা নিশ্বাস পড়িল।

তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়তো প্রবীর গুহকে কেউ বলবে না। কিন্তু আমি দেখছি ওর ব্যক্তিত্বকে, ওর প্রতিভাকে; চেহারা তার আধার মাত্র। কি আশ্চর্য!

তাহার দিন দুই পরে বিতর্ক-সভায় প্রবীর গুহ নোয়েল কাওয়ার্ড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। কুশাগ্র বুদ্ধি তাহার, তীক্ষ্ণ বচনবিন্যাস। প্রতিপক্ষের কলরব ভেদ করিয়া তাহার উদাত্ত কণ্ঠ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া ফেরে; তাহার যুক্তি অসীম জ্ঞানের পরিচয় দেয়। সুমুখের আসনেই মালিনী, রক্তপদ্মবর্ণের শাড়ি তাহার রূপকে মুখরতর করিয়া তুলিয়াছে। চঞ্চল দৃষ্টি তাহার বারংবার প্রবীরের স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টির সহিত মিলিত হইতেছিল।

তাহার পরের দিনই মেয়েদের বসিবার ঘরের সামনে দেখিলাম, প্রবীর ও মালিনী অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করিতেছে। প্রবীরের পদ্মপলাশ নেত্রে ব্যাধের কটাক্ষ, মালিনীর নয়নে আত্মসমর্পণের অসহায়তা।

সহসা মনে হইল, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তিমিরগুণ্ঠনে ঢাকিয়া গেল, যেন আমার চারিপাশে শত শত অলিন্দ স্থপতিশিল্পের নিদর্শনরূপে আমাকে বেড়িয়া ধরিল। সম্মুখে খরস্রোতা টাইবার, তাহার তীরে উচ্চ গিরিশ্রেণীর উপরে আভাস-স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিল রোম নগরী। কত যুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া আমার জন্মান্তরের প্রিয়া যেন অশান্ত ক্রন্দনে আমাকে ডাকিতেছে। 'লুক্রেশিয়া!' ডাকিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আমি—আমি তো 'কোলোটিনাস' নহি, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অমর সোম। আমার নির্যাতিতা, 'লুক্রেশিয়া' তাহার বিষাদম্লান দৃষ্টি, অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি লইয়া ক্ষণতরে দেখা দিয়া সরিয়া গিয়াছে। আমার সহপাঠিনী মালিনী শুধু ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রবীর গুহর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। আমার 'রোম' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে। কুয়াশাস্তিমিত অতীতের পটে টাইবারের স্রোত ঝিলিক দিয়া আবার বিস্মৃতির তমিস্রায় অন্তর্হিত হইল। আমি তো 'কোলোটিনাস' নহি, তবে কিসের প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ? আমার হস্ত কেন আপনি মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সমগ্র শরীর আহত ব্যাঘ্রের মত কাহার উপর সরোষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়?

মনে মনে হাসিলাম। রাত্রিজাগরণ ও কাব্যচর্চার মাত্রা কমাইতে হইবে। মালিনীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম; প্রবীর গুহ তখন চলিয়া গিয়াছে।

কি কথা হচ্ছিল তোমাদের? বেশ তো আলাপ হয়ে গেছে দেখছি। —প্রশ্ন করিলাম। মালিনী উত্তর দিল, একটা চ্যারিটি পার্ফর্ম্যান্স হবে, তাই গান দিতে বলছিলেন।

কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। প্রবীর গুহেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আভাসে জানি, নারীদেহের প্রতি তাহার দুর্বার লোভ। কুমারীর কোমল অধর তাহার লেখনীকে প্রেরণা যোগায়; পবিত্রতার নীতিশাস্ত্রে তাহার আস্থা নাই। সে প্রতারক নহে, কিন্তু সে শিকারী। সে তাহার লক্ষ্যকে জানাইয়া দেয় যে শরসন্ধান চলিতেছে। হৃদয়হীন সে নহে, অতি-আধুনিক মাত্র।

ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—

If Collatine, thine honour lay in me,
From me by strong assault it is bereft.

কি বলছ অমর?—মালিনী জিজ্ঞাসা করিল।

বলছি—। আবার অজ্ঞানের মত শুনিলাম আমিই বলিতেছি—

Yet die I will not till my Collatine
Have heard the cause of my untimely death;
That he may row, in that sad hour of mine,
Revenge on him that made me stop my breath.

কোথা থেকে বলছ অমর? কোলাটাইন নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।—মালিনীর চক্ষুতে নিবিড়তা নামিয়া আসিল। সুদূর আকাশে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে নামটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল।

লঘুকণ্ঠে বলিলাম, শেক্‌স্পীয়রের লুক্রেশিয়ার আক্ষেপ বলছি বুঝলে? যখন প্রবীর গুহর সঙ্গে কথা বলছিলে, কেন জানি না, কেবলই তোমাকে লুক্রেশিয়া ব'লে ভুল করছিলাম। স্বামী কোলোটিনাস বাইরে। নির্জন ঘরে লুক্রেশিয়াকে সেক্‌টাস আক্রমণ করেছে তার সর্বনাশের জন্যে। কোলোটিনাস অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মালিনী হাসিয়া উঠিল। পাথরের মালা যেন মেঝেতে ছিঁড়িয়া পড়িল, এমনই রাগিণীময় তাহার হাস্য। একটি কৃশকায় ছাত্র চলিতে চলিতে ফিরিয়া চাহিল। একজন ছাত্রী বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

অদ্ভুত কল্পনা তোমার! আমি রোমান সুন্দরীই বটে! আচ্ছা, প্রবীবকে কি মনে হ'ল?

সেক্‌টাস।

তীব্রদৃষ্টিতে ভর্ৎসনা হানিয়া চাপা গলায় মালিনী বলিল, ছিঃ!

ছয় মাস পরে।

মালিনীর গৃহে সান্ধ্যভোজন। উপলক্ষ কিছু নহে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

প্রবীর বসিয়া ছিল বাঁকানো সেটিতে অলস ভঙ্গিতে। হাতে তাহার ধূমায়মান সিগারেট। সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া উজ্জ্বল হীরক-অঙ্গুরীকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিম অধরোষ্ঠে ইস্পাতের মত ধারালো কৌতুকের হাস্য। চোখে নরম, প্রেমজড়িত আদরের দৃষ্টি। সকলেব সম্মুখে যাহা মুখে আসে না, তাহা যেন দৃষ্টির সহিত সে মালিনীকে নিবেদন করিতেছিল। প্রতিটি কটাক্ষ যেন তাহার এক একটি চুম্বন।

মালিনী আমার পাশে বড় সোফায় বসিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছিল। আজও সে পরিয়াছে রক্ত-গোলাপ রঙের রেশমী শাড়ি। কালো চুলে জড়ানো তাহার গোলাপের মালা; হাতে লাল গালার জরি-জড়ানো চুড়ি, কানে গলায় লাল প্রবালের গহনা। এ যেন জলন্ত বহ্নি-শিখা, উদগ্র-কামনায় জ্বলিতেছে কাহাকেও আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত।

আর ওই যে স্তিমিত-গৌর তরুণ পুরুষ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অর্ধশয়ান, যাহার প্রশান্ত ললাটে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হইতেছে, অলস তন্দ্রার ছায়া রমণীসুলভ আঁখিপল্লবে বাসা বাঁধিয়াছে, যাহার সবল দীর্ঘ তনু প্রেম ও কামনায় প্রোজ্জ্বল— সেও এই একই অগ্নি আগ্নেয়গিরির ভস্ম-আবরণে সে প্রসুপ্ত। তাহাকে চেনা যায় না; অথচ তাহারই অগ্নি-উদগীরণে একদিন ধ্বংস আসে—কত পম্পিয়াই তাহার লাভাস্রোতে ভাসিয়া যায়। একই বহ্নি উভয়কে আকর্ষণ করিতেছে প্রবল বেগে, শুধু তাহার রূপ বিভিন্ন। সর্বনাশা এই মোহ, কে কাহাকে গ্রাস করিতে পারিবে ঠিক নাই।

আমার অবশ দেহে মালিনীর রক্ত-অঞ্চল বহুবার লাগিতেছে। তাহার চপল বাহু কতবার আমাকে ছুঁইয়া গেল। কতবার আমার কাঁধে সে করাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া আমার চোখের উপর নত হইয়া হাসিল। কি অন্ধ আকর্ষণ তাহার দিকে আমাকে অহরহ টানে! প্রতিটি রক্তকণিকা তাহাকে খুঁজিয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় মন্থর হইয়া যায়। পুরুষের বুভুক্ষু যৌবন নিয়ত তাহাকে প্রার্থনা করে। মনে হয়, কত দিন হইতে চিনি তাহাকে। কত নীল সমুদ্রের পাশে পাশে তাহার আঁখি আমাকে সঙ্কেতে ডাকিয়াছে। কত দুর্বার রণক্ষেত্রে তাহার মুখের ছবি আমার শত্রু-রক্ত-স্নাত হস্তে বল যোগাইয়াছে। আমি তাহাকে চিনি। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহার সহিত আমার যোগাযোগ। কিন্তু এ জন্মে অমর সোম বৃথাই মালিনী সেনকে চাহিয়া মরে। মালিনী জনারণ্যে তাহার সে চেনা মুখখানি ভুলিয়া গিয়াছে।

যাই বল মালিনী, ছেলেমেয়েতে বন্ধুত্ব আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে 'আবাহনে' একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি বছরখানেক আগে। আর নিছক নিরামিষ বন্ধুত্বের প্রয়োজন কি? যদি মনে দোলা লাগে, লাগুক। কারও কোনও ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুখ পেলে কেন ছেড়ে দেব?—হাতের সিগারেটের দিকে চাহিয়া প্রবীর চিন্তিতভাবে বলিল।

মালিনী হাসিল। মনে হইল সে যেন ধরিয়া লইয়াছে, প্রবীরের উচ্ছৃঙ্খল কথাবার্তার সহিত তাহার চরিত্রের কোন যোগ নাই। অধিকাংশ শিল্পীর মত প্রবীরও আত্মপ্রতারক। উন্নতমনা, সংযমী প্রেমিক তাহার মধ্যে চিরজাগ্রত। মুখের কথায় প্রবীর অন্তরকে গোপন করিতেছে।

মনে হইল চিৎকার করিয়া বলি মালিনী, মালিনী! এত তেজ, এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভুল ক'র না। প্রবীর গুহর খেলাই এই। সে যা মনে করে, হাসির ছলে অন্য পক্ষকে পূর্বেই তা জানিয়ে দেয়। অপর পক্ষ যদি সেটাকে পরিহাস বা মুখের কথা মাত্র মনে করে, তবে দোষ প্রবীরের নয়।

প্রবীর চুম্বনের ভঙ্গিতে অধর অগ্রসর করিয়া সিগারেট ধরিল। মৃদু টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল, বিবাহের প্রয়োজন নেই, নিরামিষ বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন নেই। জগৎটা

কেবল দেখে যাও। আনন্দ, আনন্দই সার। জীবন ক্ষণিকের। তাই বলি মালিনী, পুরুষের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'র না। কারণ—

Friendship's cool water
Any moment can change into wine.

মালিনীর দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলাম, বন্ধুত্বের শীতল পানীয় তাহার কাছে বহু পূর্বেই সুরায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

সকলকে বিদায় দিয়া মালিনী বাগানে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চৈত্রের রাত্রি, আকাশে ভরা জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না তাহার বক্ষ অধরে, তীক্ষ্ণ নয়নে, কালো চুলে।

প্রবীরকে নিয়ে একটু বাড়িয়েছ মালিনী। এখনও সাবধান হও। প্রবীর ভাল ছেলে নয়।

মালিনীর দীপ্ত সৌন্দর্য জ্বলিয়া উঠিল। ভাল কি মন্দ, তা নিয়ে লোকের মাথা-ব্যথা কেন? ভাল ছেলে! ভাল ছেলে দেখে দেখে আমার অসহ্য হয়েছে। আমি শিশু নই, অমর, মনে রেখো।

মরিয়া হইয়া বলিতে লাগিলাম, প্রবীরদের বাড়ি অত্যন্ত সেকেলে। আর, তুমি তো জান ও বিবাহে বিশ্বাস করে না। এখন তো দূরের কথা, কোন দিনই হয়তো বিয়ে করবে না। মালিনী, বিপদে পড়বে তুমিই, কারণ তুমি ওকে যতটা ভালবেসে ফেলেছ, ও তোমাকে তা বাসে নি।

আহতা সর্পীর মত মালিনী দেহ আকুঞ্চিত করিল, সুর্মালাঞ্ছিত ছুরির ফলকের মত সঙ্কীর্ণ তাহার চক্ষু সর্পীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চোখে ঘৃণা ও দম্ভ।

কি পাগলের মত বকছ অমর? বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না এখানে। প্রবীরকে আমি হয়তো ভালবেসেছি ; না জেনে অস্বীকার করব না। কিন্তু আমি জানি, আমার ভালবাসার ও যোগ্য। লোকে ওকে বোঝে না, ওর প্রতিভার মূল্য মিনমিনে বাংলা দেশ দিতে পারে না। তোমরা, তথাকথিত শুদ্ধ শান্ত ভাল ছেলেরা, ওর মুখের কথা, বাইরের ব্যবহার দেখে ভুল কর। বড় সুন্দর মন প্রবীরের। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। সমস্ত সামাজিক বন্ধন, সংস্কারের ওপরে প্রবীর গুহ। অসাধারণ ওর ব্যক্তিত্ব।

নদীর ধ্বংসমুখী তীরে দাঁড়াইয়া আছে আমার প্রিয়া। তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই আমার। অদৃশ্য বিপদ তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সরল শিশুর মত নিজের পবিত্র নির্ভরশীল মন দিয়া সে বিশ্বের বিচার করিতে চায়।

আবার তাহার দিকে চাহিলাম, বলিলাম, তুমি প্রবীরকে বোঝ নি মালিনী, যতই তোমার বুদ্ধি থাক বা দীপ্তি থাক। চিরকাল বাংলার বাইরে তুমি মানুষ, সরল খোলা জীবন তোমার, মানুষের জটিলতা-কুটিলতার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। মালিনী, তুমি সৎ মেয়ে, অসৎ পুরুষের কামনা বোঝা তোমার সাধ্যের বাইরে। প্রতিভা আছে প্রবীরের, কিন্তু সে প্রেমিক নয়, কামুক।

অমর, অনেকক্ষণ তোমার ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সহ্য করেছি, আর নয়। মনে রেখো,

প্রবীর আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই। আমার সঙ্গে প্রবীরেরও বন্ধুত্ব আছে, তোমারও তাই। কিন্তু সে তো কখনও আমাকে উপদেশ দিতে আসে না?—মালিনী সম্মুখের গাছ হইতে দুটি ফুল ছিঁড়িয়া সরোষে কুটিকুটি করিয়া ছড়াইয়া ফেলিল।

যন্ত্রণায় আমার মুখ নীল হইয়া গেল। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো মালিনীর অর্ধচন্দ্র ললাটে নিজের ছায়া দেখিতেছিল। শিথিল তাহার কেশবন্ধন, আঁখিতটে বিপুল শ্রান্তি। বক্র রক্ত-অধরে তাহার চাঁদের আলো। আজ যেন সে অধর তত বক্র, তত উদ্ধত নয়। যেন অন্য অধর তাহাকে নিজের বলে নত করিয়াছে। তাহার অধরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতি কষ্টে আবার বলিলাম, উপদেশ দিচ্ছি না মালিনী, বন্ধুত্বের দাবিতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তোমার ভাবালু কবি মন এ পৃথিবীতে চলে না। প্রবীর তোমার মত নয়। তুমি যা, বাইরে সে তারই ভান মাত্র। কিন্তু ও কি মালিনী, ও কি তোমার ঠোঁটে— প্রবীর কি— ? মালিনী, মালিনী, উত্তর দাও।

আহত পশুর মত বেদনায় আমার স্বর নির্জন রাত্রিতে বীভৎস শুনাইল।

গর্বিতা রাণীর ভঙ্গিতে মালিনী গ্রীবা বক্র করিল।—হ্যাঁ। যা অনুমান করেছ সত্যি। প্রবীর আমাকে চুম্বন করেছে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো তাকে ভালবাসি।

তাহার পর প্রায় পনরো দিন মালিনীদের বাড়ি যাই নাই, কথাবার্তাও হয় নাই। ক্লাসে দেখি, সম্রাজ্ঞীর মত মালিনী নির্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসে, কোন দিকে না চাহিয়া ক্লাসের শেষে চলিয়া যায়। আর মাঝে মাঝে দেখি, বিকালে তাহার গাড়িতে প্রবীর গুহকে।

সন্ধ্যার ছায়া টাইবারের তীরে তীরে নামিয়া আসিয়াছে। কুঞ্চিতকেশ মেষপালকেরা অঙ্কুশহস্তে দুগ্ধফেনের মত শুভ্র মেষকুলকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। দূরে—উচ্চ পর্বতবক্ষে মিনার গম্বুজ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। গোধূলির মুমূর্ষু আলো রোমকে স্বর্ণফলকে মুড়িয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নকুহেলীমণ্ডিত প্রাসাদগৃহে সুপ্তা সুন্দরী। কত যুগের অন্ধকার বিস্মৃতি যেন দূরে সরিয়া গেল, মনের গহন অতল হইতে নিদ্রিত অনুভূতি আবার জাগিয়া উঠিল। আবার প্রতিশোধের অনল দেহে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সেক্‌টাসের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া লোলুপ অসি উদ্যত হইতে চায়।

নিরুদ্ধ কামনাভারে দেহ মূক। লুক্রেশিয়ার ঘুমন্ত অধরে সেক্‌টাসের অধর। লুক্রেশিয়ার দেহবল্লরীর উপরে সেক্‌টাসের কঠিন দেহ নামিয়া আসিতেছে ধীরে—অতি ধীরে।

বদ্ধকণ্ঠে স্বর আসিল না, চমকিয়া জাগিয়া দেখিলাম, শয্যা ঘর্মাক্ত। প্রবীর গুহ তাহার কাগজের জন্য একটি কবিতা চাহিয়াছে, তাহাই লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নের স্পর্শ তখন যেন চোখে লাগিয়া আছে। তখন যেন কানে লুক্রেশিয়ার আর্ত্ত হাহাকার ভাসিয়া আসিতেছে। কতদূর শতাব্দীর পারে বসিয়া সে যেন আহ্বান করিতেছে। তাহার হৃদয়মথিত করুণ রোদন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কোলোটিনাস! কোলোটিনাস!

এ ডাক না শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চিত্ততন্ত্রী এই এক সুরে বাঁধা যুগ যুগ হইতে। জানি, আমাকে যাইতে হইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা সারিয়া লইলাম। মালিনীর বাড়ি সন্ধ্যার পর পৌঁছিলাম। বাহিরের ঘরে মালিনীর অধ্যাপক দাদা ও ব্যারিস্টার দাদা উচ্চ স্বরে আলোচনায় রত। মালিনী মাতৃহীনা, তাহার বড় বউদিদি রাস্তার দিকের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাদর আহ্বান চিরদিনই মালিনীর বাড়িতে পাই। প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম, মালিনী কলেজ হইতে এখনও বাড়ি ফেরে নাই, সঙ্গে গাড়িতে আছে কেবল প্রবীর গুহ। অধ্যাপক বলিতেছেন, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমার। স্ত্রীশিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা। ব্যারিস্টার আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, এ তোমার বেশি বলা হচ্ছে দাদা। কলেজের বন্ধু, ভদ্রঘরের ছেলে। তার সঙ্গে বেড়াতে গেছে তাতে ক্ষতি কি? মেয়েদের কি এতই ঠুনকো মনে কর—এতই দুর্বল? আর মালিনী সে জাতের মেয়ে নয়। নিজের ভার সে নিজে নিতে জানে।

আমার দিকে চাহিয়া অধ্যাপক চুপ করিলেন। হায়! তাঁহারা মনে করেন, মালিনীর বরমাল্য একদিন আমার কণ্ঠেই পৌঁছিবে।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন, আমারই প্রতীক্ষা শুধু শেষ হইল না।

অবশেষে গভীর রাত্রে এক গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল। দেখিলাম, এক ছায়ামূর্তি নামিয়া অসংলগ্ন দ্রুত পদে পিছনের দ্বার দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, মালিনী!

সহসা তাহার ক্ষীণ দুই বাহু আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া মালিনী কাঁদিয়া উঠিল। দেবতার মন্দিরে পূজারীর মত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় দুই হাতে আমি সেই চিরপ্রিয় মুখখানি তুলিয়া দেখিলাম।

চক্ষু তাহার আরক্ত, অধর বিশুদ্ধ ও স্ফীত। কবরীর বন্ধন অর্ধেক খুলিয়া চুল জটাতে পরিণত হইয়াছে। শাড়ির স্থানে স্থানে কাদা, গায়ের জামা ছিন্ন, সমস্ত শরীর তাহার যেন কেহ শুষিয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আমার নিকটে মালিনী কম্পিত ভগ্নস্বরে সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সে ও প্রবীর বেড়াইতে গিয়াছিল লেকে, ফিরিবার পথে প্রবীর তাহাকে গড়িয়াহাটার নির্জনতম কোণে তাহাদের একটা বাগান-বাড়ি দেখাইতে লইয়া যায়। তাহার উদ্দেশ্য মালিনী বুঝে নাই, মালিনী তাহাকে বিশ্বাস করে। গাড়ি অনেক দূরে ছিল, বাগান-বাড়ি নির্জন। বসিবার ঘরে প্রবীর তাহাকে লইয়া প্রেমাভিনয় আরম্ভ করে। মালিনী প্রথমে তাহাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছিল, কিন্তু শেষে প্রবীরের কামনার মাত্রা দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পলাইতে সমর্থ হয় নাই। কুমারী-জীবনের চরম অসম্মান তাহার হইয়া গিয়াছে।

সর্বশরীর মালিনীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, নিদারুণ শ্রান্তিতে আত্মগ্লানিতে সে অবসন্ন। শিশুর মত তাহাকে বক্ষে তুলিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলাম, সস্নেহে শয্যায়

শোয়াইয়া দিলাম। চক্ষের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, ডাক্তার ডাকি?

না অমর, না। আমার লজ্জার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ যেন জানে না। উঃ লোক জানাজানি হবে ব'লে কুকুরটাকে শিক্ষাও দিতে পারব না, এই আমার ক্ষোভ।— নিরুপায় ক্রোধে মালিনী শুভ্র মুক্তাদন্ত দিয়া বিছানার চাদরখানা ছিন্ন করিতে লাগিল।

লোক-জানাজানি হবে না, তাকে শিক্ষাও তুমি দিতে পারবে মালিনী। আমি এখনই যাচ্ছি। এখনও তো সে গড়িয়াহাটার বাগান-বাড়িতে আছে বলছিলে না? অসহ হৃদয়াবেগ দমন করিয়া শান্তস্বরে বলিতে পারিলাম।

তুমি যাবে? তুমি যাবে অমর?—উত্তেজনায় মালিনী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাও। আমি, আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি, সেই কষ্ট সেটাকে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর অমর, এর শাস্তি তুমি দেবে তাকে? দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে না? মাটিতে তার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেই মুখ তোমার জুতো দিয়ে থেঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মের মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসে নি। আজ স্পষ্টই বলেছিল।

আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। আবার শতাব্দীর বিস্মরণের পরপার হইতে সেই গীতি বাজিয়া উঠিল—

Revenge on him, that made me stop my breath!

দরজার বাহিরে আসিতেই কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল দুর্বল ভগ্নস্বরে, অমর?

দেহ তখন আমার রোমান বীরের বীর্যে উদ্বেল, তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না। কিন্তু যে কণ্ঠের একটি মাত্র আহ্বান আমাকে মৃত্যুর তীর হইতেও ফিরাইতে পারে, সেই কণ্ঠের আহ্বানে আবার ফিরিলাম।

বালিশে মুখ লুকাইয়া, অস্পষ্ট স্বরে মালিনী কহিল, কিন্তু, তাকে প্রাণে মেরো না অমর।

প্রবীর গুহের সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই রাত্রে গড়িয়াহাটার রাস্তায়। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম পথের পাশে।

প্রবীর আমাকে চিনিয়াছিল, কারণ আমি মুখে কোনও মুখোশ ধারণ করি নাই, এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্বে প্রস্তুত হইবার সময় দিয়া আক্রমণের কারণ খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তাহার পরের ঘটনা সকলেই জানিয়াছে। প্রবীর শক্তিশালী, নিজেকে রক্ষার চেষ্টাও তাঁহার প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমি, আমি তো তখন শুধু বিংশ শতাব্দীর অমর সোম ছিলাম না, আমি তখন কোলোটিনাস।

প্রবীর আমার নাম পুলিসের নিকট করে নাই, ইহাও তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয়।

* * * * *

মালিনী আজও বাঁচিয়া আছে—আমিও আছি। লুক্রেশিয়ার পরিণতি তাহার হয় নাই। কিন্তু সে আমার কাছে আজ মৃতা। সে অন্যোপভুক্তা বলিয়া আমি দূরে সরিয়া যাই নাই—

অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয না। কিন্তু আমাব যাহা জানিবাব, তাহা তাহাব সেই চবম অবমাননাব সময়ে তাহাব মুখ হইতেই শুনিযাছি। তাহাব যন্ত্রণা আমি ভুলিতে পাবিযাছি ভুলিতে পাবি নাই কেবল তাহাব মুখেব একটি কথা -তাকে প্রাণে মেবো না অমব।

বোমেব প্রাচীন গাথায ও মহাকবি শেকস্পীযবেব কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমাব জীবনে তাহাব সংশোধন হইযা গিযাছে।

আমাব লুক্রেশিযা আজীবন সেকটাসে আসক্তা।

'শনিবাবেব চিঠি'--১৩৪৮

পথের বোন

শ্রীবানী চন্দ

কলকাতা থেকে বোলপুর আসছিলুম; বিকেলেব ট্রেন, অসহ্য গরম, কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে. ভিতরের জামাটা ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে সেপ্‌টে গিয়ে দারুণ অসোয়াস্তিতে মন ভরিয়ে দিচ্ছে;---কলকাতায় বোমা পড়ার আতঙ্কে ভীত ত্রস্ত যাত্রীদলের ভিড় এড়িয়ে কোন রকমে হাওড়ায় উপস্থিত হলুম। ছেলেদের কামরাগুলিতে ভিড়ের আতিশয্য দেখে সঙ্গীদের সঙ্গলাভের লোভ পরিত্যাগ করে মেয়েদের কামরাতে উঠে পড়লুম। মনে মনে বরং একটু আরামই পেলুম, চুপচাপ নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বেশ সাবারাস্তা যেতে পারব এই কল্পনা করে।

কামবায় মাত্র দু'টি মহিলা, প্রৌঢ়া তাদের বলা চলে না—যুবতীও নয়, এ দু'য়ের মাঝামাঝি; প্ল্যাটফরমের দিকের পাতলা গদি-মোড়া সরু বেঞ্চিতে মুখোমুখি পা মেলে বসে দু'জনের মাঝখানে রাখা ঘন নীল রঙেব রুমালের উপর সদ্য-ক্রীত বরফের চাকাগুলি থেকে কড়মড করে দুজনে বরফ খাচ্ছিলেন আর থেকে থেকে হাতের তালুতে, কপালে, মুখে, মাথায় বরফ ঘষছিলেন। অনুমানে মনে হয় তাঁবা দু'টি জা'। দু'জনেই যৌবনের প্রায় শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছেন; শুধু তফাতের মধ্যে এই---বড়টি বিধবা, ছোটটি সধবা। বিধবাটির রং যাকে বলা চলে শ্যামবর্ণ, বেশ লম্বা চওড়া মোটাসোটা শরীরের গড়ন, তাঁব শরীরের এই স্থূলত্বটুকু বাদ দিলে তিনি যে মুখশ্রীর অধিকারিণী— তাতে তাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলা চলত। তাঁব ঠোঁটের কোণার হাসিটি মুগ্ধ করে দর্শকদের। সে হাসি শুধু নয়ন-ভোলানো নয, মনও ভোলায়। মনে পড়ে যখন গল্পের কোথায়ও হাস্য-মুখরা কৌতুক-প্রিয়া বৌদির কথা পড়ি, লেখক বোধ হয় এমনি হাসির কথাই বর্ণনা করেছেন। চোখে তাঁর সোনার চশমা, গলায় সোনার পা‍ প্যাটার্ণের চওড়া হার, বাঁ হাতের আঙুলে সোনার একটি আংটি; সাদা সেমিজের উপর সাদা থান ধুতি পরা, পাশে লোহার শিকে গরদের চাদরটি আটকানো। যদিও তিনি মুখোমুখি বসে আছেন কিন্তু সঙ্গিনীটির সঙ্গে নিজে বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলছেন না, থেকে থেকে কেবল সঙ্গিনীটির কথা শুনে হাসছেন আর বরফের টুকরোটা এ গাল থেকে ওগাল করছেন। সধবাটির পরণে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি; দু'হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, চুড়ির সামনে আবাব মোটা মোটা দুগাছি বালা, গলায় দু'তিনটে সরু মোটা চেন হার; মাথায় ঘোমটা; পায়ে আলতা। ভদ্র মহিলাব মুখের মধ্যে নাকটি বেশ উঁচু, মুখচোখের গড়নও মন্দ নয়, সামনের দাঁতগুলি ঈষৎ বেরিয়ে এসেছে। যখন গল্প করতে করতে থেকে থেকে হেসে উঠছিল, হাসিটি তাঁর বড় সুন্দর লাগছিল—আবার কিন্তু যেই মুহূর্তে মুখ বোজেন অমনি মুখের ভাব যেন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। আশ্চর্য হয়ে তাঁর এই মুখের ভাব-বদল দেখছিলুম। সতিাই হয়ত তিনি বিরক্ত হচ্ছেন না, হাসতে হাসতে এক মুহূর্তের মধ্যে এমন কিছু বিরক্তিকর ভাবনা বা কাজের কথা তাঁর মনে হ'তে পারে না, হলেও মুহুর্মুহু হাসি গল্পের

মাঝে তা' এত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিছুতেই। অথচ কি বিড়ম্বনা বিধির, যে এত হাসতে পারে তার মুখে অমন বিরক্তিব রেখা এঁকে দেন কোন হিসেবে?

ট্রেণ ছাড়তে আর কত দেরি? যে গরম, এক মুহূর্তকে যেন এক প্রহর বলে মনে হচ্ছে। এ পাশের বেঞ্চিটাতে নিজে একটু নড়ে চড়ে বসলুম। মনিপুরী খেসটা খুলে বেঞ্চিতে ছড়িয়ে না পেতে বালিশের সঙ্গে জড়িয়ে পিঠের কাছে রাখলুম--- ঠেস দিয়ে আরাম হবে। এই গরমে ঘুমের আশায় শোবার জায়গা অধিকার করে রাখা বৃথা। অথচ এমনিই মন, গাড়িতে যত ভিড় থাকে ততই যেন ঘুমে চোখ বুজে আসে, পা মুড়ে বসতে পা টন টন করে। দু'পা ছড়িয়ে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করে পাশের লোককে সরিয়ে দেবার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে কতবার কত কষ্ট পেয়েছি মনে। আর আজ এত জায়গা থাকতে এক কোনায় পিঠের কাছে বালিশ দিয়ে জড়সর হয়ে পা মুড়ে বসে রইলুম হাতপাখাখানি হাতে নিয়ে।

ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে একটি মেয়েকে দরজা দিয়ে ভিতরে ঠেলে দিলে, কুলি এনে তুলল বড় একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছেলেটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলে তার হাতের বোঁচকাটি। মেয়েটিকে বল্লে—ট্রেণ ছাড়বে এক্ষুনি, আমি পাশের কামরাতেই থাকব, তুই আর দেরি করিসনে, শুয়ে পড়। বলেই অন্য কামরার দিকে চলল। মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে বোঁচকাটি খুলে একটি চাদর, একটি বালিশ ও তার উপরে ভাঁজ করা, বোধহয় নিজের হাতের কাজ-করা ঝালর-দেওয়া একটি বালিশের ঢাকা খুলে বালিশটির উপর পেতে দুহাতে বুলিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকলে— অ' মেজদা— এইটে নিয়ে যাও, নয়ত তোমার কষ্ট হবে, অ' মেজদা—

চমকে উঠলুম, কী গলার সুর, কী কাতর স্নেহমাখা অনুরোধ। অমন ডাকে মেজদা কেন—রাস্তার লোকও বুঝি সে অনুরোধ এড়াতে পারে না। মেজদা দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এল—বালিশ চাদর হাতে করে আবার তেমনি ভাবে ছুটে গাড়ীতে উঠল। মেয়েটি দরজার জানালাা দিয়ে মুখ বের করে দেখল।

ট্রেন ছাড়ল— মেয়েটি এসে মাঝের বেঞ্চিতে আমার দিকে মুখ করে বসে হেসে বল্লে— সেই কোন সকালে উঠেছি, এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হলুম।

এইবারে আমিও তাকে দেখলুম। তার ভাইকে ডাকার সুরে যে রস ঢেলে দিয়েছিল তার মুখের ভাবেও সেই একই রস আমার ভিতরটা করুণায়, মায়ায়, ভালোবাসায় তার প্রতি ভরে দিলে।

বছর আঠারো উনিশ বয়স হবে তার, ছিপছিপে গড়ন, পরণে কালো নরুন-পাড় সাদা শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে একটি সাদা জামা, তার উপরে পাত্‌লা সাদা সরু মুগা পাড়ের একটি ওড়না জড়ানো। দু'হাতে দু'গাছি সরু সোনার চুড়ি, গলায় সরু একটি সোনার চেন, বাম বাহুতে কালো সুতোয় বাঁধা একটি তামার ছোট্ট কবচ। সুতোটি যখন হাতে বাঁধা হয় তখন বোধ হয় মাপ ঠিকই ছিল, এখন সেটি অনেকখানি ঢিলে হয়ে গিয়ে বারে বারে নেমে আসছে। বর্ণ তাব উজ্জ্বল শ্যাম, মুখের গড়ন আগে বোধ হয় গোলই ছিল

এখন গাল দুটো ভেঙ্গে পড়াতে লম্বাই দেখায়। কপালের দু'পাশ থেকে চুলগুলি নেমে এসে আবার পিছনে সরে গিয়ে ছোট কপালের গড়নটি আরো সুন্দর করেছে। ভুরু দু'টি বেশী টানা না হ'লেও বাহার আছে তা'তে। তার মুখের মধ্যে সব চেয়ে নজরে পড়ে আগে, তার কালো কালো করুণ ডাগর চোখ দু'টি। সে চোখ তাকে যেন গোপন রাখেনি কোথাও। সব মনের কথা, বুকের ব্যথা চোখ দু'টিতে এনে ধরে সবার সাম্‌নে। দু' চোখের নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালি পড়ে গেছে। নাকটি চলনসই তার, ঠোঁট দু'টি বেশী মোটাও নয়, সরুও নয়; কিন্তু তা'তে বিশেষত্ব এই যে-যেটা আমার বড় ভালো লেগেছিল, যেজন্য তার মুখের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়েছিলুম—তার উপরের ঠোঁটের এমন গড়ন যে সে গড়নে ঠোঁটের দু'পাশে বড় করুণ ব্যথাভরা ভাব ফুটে রয়েছে। কোনরকমে দেহে জড়ানো ধুতিখানার ভারও যেন টানতে পারছে না এমনি অবসাদ এসে গেছে তার মনে। চোখে, মুখে, দেহে চলনে, বলনে, ভাষায়, ভঙ্গীতে এই করুণ মূর্তি কি এক বেদনায় আমার মনপ্রাণ ব্যথিয়ে দিল, স্তব্ধ হয়ে বসে বসে তাকে দেখতে লাগলুম।

মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠল, উঠে শিথিল হস্তে ওড়নাটি খুলে বেঞ্চির এক পাশে রাখল। বোঁচকা থেকে গামছায় জড়ানো ভিজে সাদা পেটিকোটটি বের করে, খুলে, ঝেড়ে, আমার মাথার উপর বাঙ্কে মুখের সামনে মেলে টাঙিয়ে দিলে। মুখের সামনে এ রকমভাবে কোন কিছু ঝুলছে তা' কোনদিন সয়েছি কিনা জানিনে। আর আজ ভিজে পেটিকোটটি হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উঠে এক একবার আমার নাকে মুখে লাগ্‌ছে কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না; বরং ছোট শিশুর ছোট হাতের ছোট ছোট চাপড় মা নিজের গালে যে ভাবে আদরের সঙ্গে অনুভব করে তেমনি আমি যেন পরম আদরের সঙ্গে মেয়েটির এই সরল উৎপাত সইতে লাগলুম। মনের মধ্যে এক স্নেহস্নিগ্ধ ভাব মেয়েটির প্রতি অনুভব করতে লাগলুম।

মেয়েটি পিছন ফিরে মাঝের বেঞ্চিতে একটি আধ-ময়লা বিছানার চাদর পাট করে পাত্‌লো, বালিশের উপর আর একটি নীল লাল সবুজ রঙের রেশমী সূতোয় পদ্ম-পাতা-জল-আঁকা পরিষ্কার বালিশ-ঢাকা টেনে টেনে সমান করে রাখলো। যেখানে শোবে বলে বালিশটি রাখলে, দেখি সে জায়গাটিতে আমারই পাশের জানালা দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি জানালার খড়খড়ি নামিয়ে দিলুম। হাওয়া বন্ধ হলে আমার গরম লাগতে পারে সে কথা মনে হলেও তাকে প্রশ্রয় দিতে পারলুম না। আজ যে এইটুকু গ্রামের মেয়ের একটু খানি সুখ সুবিধের জন্য মুহূর্তের তরেও নিজেকে ভুলতে পারছি একথা মনে হ'তে প্রাণ ভরে উঠল গভীর তৃপ্তিতে। মনে হ'ল যেন প্রাণের ভিতরে কোনও সম্পদের সন্ধান পেলুম আজ, যা' কেবল নিজেরই ভাবনা চিন্তায় আড়াল করে রেখেছি এতকাল।

এতক্ষণে মেয়েটি শোবার জায়গাটি পরিপাটি করে পেতে বেঞ্চির একপাশে বসে মাথার কাপড় সরিয়ে দিয়ে এলো করে বাঁধা চুলের গোছা খুলে দিলে। কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ কালো চুল পিঠ ছাপিয়ে বেঞ্চির উপর লুটোপুটি খেতে লাগলো; সঙ্গে সঙ্গে নাকে এলো ভিজে চুলের ভাপ্‌সা গন্ধ।

মেয়েটি দু'হাতে চুলগুলি নাড়া দিতে দিতে আমাব দিকে তাকিয়ে বল্লে— কতদিন বাদে আজ চান করেছি, এতক্ষণে খুলবার ফুরসুৎ পাইনি। বলে চুলগুলি দু'ভাগ করে চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে নখ-আঁচড়া দিতে লাগলো।

ওপাশের বেঞ্চিতে তখনও তেমনি ভাবেই ববফ খাওয়া চল্‌ছে। শেষ বরফের চাকাটি নীল রুমালে জড়িয়ে সধবাটী কামরার কাঠেব মেঝেতে দু তিন আছাড় দিয়ে গুঁড়োগুঁড়ো করে দু'জনে টুকবোগুলিকে ভাগাভাগি করে নিলেন। বড়টি গম্ভীর ভাবে সেগুলোকে মুখে পুরলেন; ছোটটি গুঁড়ো বরফগুলি হাতে ঘষে দু'হাতে কপালে মুখে বুলিয়ে হাত মুখ ঠাণ্ডা করলেন, বড় টুক্‌রোটি একবাব মাথার তালুতে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘষে, দু'বার দু' কাণের পিঠে বুলিয়ে টুকরোটি মুখে পুরে নীল রুমালটি কোমরে গুঁজলেন, শাড়িটা টানাটুনি দিয়ে ভালো করে পড়ে, মাথায় কাপড় দিয়ে সভ্যভব্য হলেন। বড়টিও উঠে গরদের চাদরটি ভালো কবে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। গাড়ি একটা ষ্টেশনে থামল; তাঁবা নামবার জন্য এ পাশে দবজার কাছে এলেন। নামবার আগে বড়টি এই মেয়েটিকে একটু ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন—এমনি কবে ঘুরে বস খানিক, জানালা দিয়ে রোদ আসছে চুল শুকিয়ে যাবে শিগ্‌গিরই; বলে নেমে গেলেন।

এইবারে মেয়েটিও আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমার ডান পায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লে—'দিদি পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো কেন? ফ্যান পড়ে গেছে বুঝি?'

মেয়েদের ফ্যান পড়া ছাড়া আর কিছুতে জখম হ'তে পারে এ ধাবণা বোধ হয সে করতেই পারে না কখনও। কোথায় ভাতেব হাঁড়ি থেকে ফ্যান গালতে গিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলা, আর কোথায় "বাটা" কোম্পানিব স্যাণ্ডেল পরতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা—ঐ দু'য়েব তফাৎ কত। কিন্তু তাকে ধাক্কা দিতে মন সরলো না। ঘাড় নেড়ে বল্লুম—হ্যাঁ ভাই তা'ই।

সে আমার আব একটু কাছে এসে বল্লে—তা' দিদি, তোমার এমন সাদা-সিধে বেশ কেন? হাতে শুধু শাঁখা, পরণে মোটা শাড়ি, চুল রুক্ষু, সিঁদূর বাড়ন্ত, পায়ে আল্‌তা নেই—

কতজাযগায় ঘুরেছি, কত ট্রেনে চড়েছি; কিন্তু নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে এমন অপ্রস্তুতে কোনদিন পড়িনি, আজ যেমন পড়লুম এই এইটুকু বালিকার এই অবাক্ চাউনি ও একান্ত সরল সহজ প্রশ্নতে। কি বলব ভেবে পেলুম না, দু'হাতে কপালের দু'পাশের এলোমেলো চুলগুলি সরাতে লাগলুম।

মেয়েটি বাঙ্কের উপরে তার বড় ট্রাঙ্কটির দিকে তাকাতে লাগল, বল্লে, 'কি করে ট্রাঙ্কটা খুলি। অত উঁচুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে খুলতে গেলে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

আমি বল্লুম—'ট্রাঙ্কটা খুলবার কি নিতান্তই দরকার তোমার?'

সে মাথা হেলিয়ে জানালে, হ্যাঁ।

আমি উঠে ট্রাঙ্কটা ধরে টান দিলুম, অত্যন্ত ভারী, দু'হাতে ধরে সহজে নামাতে পারব বলে ভরসা হ'ল না। চেয়ে দেখি মেয়েটি এগিয়ে আসছে আমাকে সাহায্য করতে। তাড়াতাড়ি সে ধরবার আগেই কোন রকমে অতি কষ্টে ট্রাঙ্কটি নামিয়ে দিলুম। হাতে খুব লাগল কিন্তু তাকে যে কষ্ট করতে দিলুম না এই আত্মপ্রসাদই আমায় তা' ভুলিয়ে দিলে।

মেয়েটি ট্রাঙ্ক খুলল। দেখলুম ভিতরে খান কয়েক কালো পাড় মিলের শাড়ি, দু'তিনটি জামা, দু'টি পেটিকোট, একটি মশারি, দু'টি ছোব্‌ড়া ছাড়ানো নারকেল, একটি মুখ বাঁধা মাটির হাঁড়ি। সে বল্লে—'মা'র জন্য কাসুন্দি নিয়ে যাচ্ছি শশুর বাড়ী থেকে। আমার বাপের বাড়িতে কাসুন্দি করতে নেই, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—মা কোনটি খেতে ভালোবাসেন সংগ্রহ করে আনি। নয়ত প্রাণ কাঁদে। নারকেল দুটিও শশুর বাড়ীর গাছের। এবারে চন্দ্রপুলি গড়তে শিখে এসেছি, মাকে করে খাওয়াব।'

ট্রাঙ্কে আরো কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষের নিচে ছিল একখানি চামড়ার ছোট সুটকেশ। সেখানি খুলে তার ভিতর থেকে বের করল একটি সুগন্ধি তেলের শিশি, একটি ছোট আয়না ও গোলাপী রং এর একটি চিরুনি। বের করে এইসব হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি অবাক হয়ে হাত দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখে বল্‌লুম—ওকি--কি হবে ওসব দিয়ে? সে ডাগর ডাগর চোখ মেলে করুণ ঠোঁটে হাসি টেনে বল্লে, 'ভালো লাগছে না দিদি তোমাকে এভাবে দেখতে। একটু সাজিয়ে দিই আমার নিজের হাতে, মানা ক'রো না।'

চম্‌কে হাত সরিয়ে নিলুম। কা'কে বাধা দিতে যাচ্ছিলুম! কি অধিকার আমার—কি স্পর্দ্ধা রাখি আমি এমন আদর মাখা আব্দার অগ্রাহ্য করবার! আজ এই সরল মেয়েটির কাছে আমার বেশভূষা মান-সম্ভ্রম সব কিছু হার মেনেছে যে। নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে আভিজাত্য বজায় রাখব এরই কাছ থেকে? আর তাকেই বলি আমরা আভিজাত্য, শিক্ষা, সভ্যতা?-- ছেড়ে দিলুম নিজেকে তার হাতে। একবার শুধু বললুম—'তোমার অসুস্থ শরীর'—

সে বল্লে—'তা হোক। আমার যে আনন্দ হচ্ছে তোমায় সাজিয়ে সে তো আর পাব না। রোগ ত চিরকাল আছেই আমার।' বলে আমার সামনের চুলে চপ্‌চপে করে তেল মাখিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে লাগলো।

বললুম—'কোত্থেকে আসছো? কোথায় যাবে।'

সে বল্লে—'খুলনা থেকে আসছি, সেখানেই আমার শ্বশুর বাড়ী। সেই কোন ভোরে না খেয়ে না নেয়ে মোটরে চড়েছি, বেলা একটায় হাওড়ায় এসে পৌঁছিলুম; মেয়েদের বিশ্রামের ঘরেই চান সেরে নিলুম। শরীরে তো বল নেই মোটেই, এটুকুতেই কত কষ্ট হচ্ছে। নেহাৎ বাপের বাড়ির হুতোস দিদি, তাই পরশুদিন অন্নপথ্যি করেছি আর আজই কি এতখানি পথ আসা সম্ভব হ'ত? এ যদি বাপের বাড়ী না হয়ে শ্বশুর বাড়িতে যেতে হ'ত তা'হলে আজই বোধ হয় আমার আবার জ্বর এসে যেত,' বলে একমুখ হেসে উঠল।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে তার গামছা হাতে জড়িয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে আমার থলে থেকে সিঁদুরের কৌটা বের করে চিরুনির মাথায় আঙ্গুলে করে সিঁন্দূর নিয়ে আমার সিঁথেয় লম্বা করে সিঁদুর পরিয়ে দিলে। মনে মনে ভাবলুম, যাক্‌গে বোলপুরে যখন নাম্‌বো মাথার কাপড়টা কপাল অবধি টেনে দিলেই আমার এই কেশবিন্যাস কারো চোখে পড়ার লজ্জা থেকে রেহাই পাব। ইতিমধ্যে দেখি মেয়েটি গোলাপফুল-আঁকা পুরানো একটি

নীল রঙের 'রোজ' পাউডারের টিন— বোধ হয় তার বিয়েতে বাপের বাড়ি থেকে বাক্স সাজিয়ে দেবার সময় নানা মনোহারী জিনিষের সঙ্গে এইটিও পেয়েছিল তা' থেকে খানিকটা পাউডার বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে ডান হাতের আঙুলে করে আমার মুখে মাখাচ্ছে। তখন আমার কী অবস্থা মনের! তার কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, পরম নিশ্চিন্ত মনে যতখানি পুরু করে পারলে আমার মুখে পাউডার মাখিয়ে চলল।

পাউডার মাখানো শেষ হ'লে আমার মুখখানা এপাশ ওপাশ করে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বল্লে—'দেখতো দেখি, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।' বলে খুব বিজ্ঞের মত আমার মুখশ্রী দেখতে দেখতে নিজের কৃতিত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ও তার কাজের প্রমাণ স্বরূপ আমার মুখের সামনে আয়নাটি ধরল। আয়নাতে আমার সে সজ্জিত মুখ দেখে হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলুম না। তবু মুখে হাসি টেনেই বল্লুম—''বাঃ বেশ সুন্দরই তো দেখাচ্ছে আমাকে।'

একথা শুনে খুশিতে সে যেন ফেটে পড়লো।

চিরুনিখানা হাতে নিয়ে বল্লুম—'এস, এবারে তোমার চুল আঁচড়ে দিই!'

সে তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে চিরুনিখানা ছিনিয়ে নিয়ে সামনের চুলটা দু'চার বার আঁচড়ে টান করে চুলের গোছা হাতে জড়িয়ে হাত খোঁপা বেঁধে নিয়ে ট্রাঙ্কে চিরুনি আয়না পাউডারের কৌটো বন্ধ করে আমার কাছটি ঘেষে বল্লে—' সে হবে না দিদি, মিছে কেন সময় নষ্ট করবো আমার জন্যে তার চেয়ে যতক্ষণ পারি তোমার সঙ্গে গল্প করি বরং।'

কি ছিল যে মেয়েটির মধ্যে যা' আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে।

তাকে আরো কাছে টেনে বল্লুম—'আচ্ছা, তাই বলো, গল্পই শুনি আজ তোমার কাছে।'

ব্ল্যাক আউটের জন্য ট্রেনে বাতি নেই, বাইরে সন্ধ্যে হয়ে গেছে খানিক আগে। অন্ধকারে আবছা আলোতে জানালার পাশে অতি স্নেহভরে তাকে কোলের কাছে নিয়ে বসে আছি।

সে বল্লে, 'তের বছর পেরিয়েছি এমনি সময়ে বিয়ে হ'ল আমার। এমন অবস্থা হ'বার আগে কলকাতায়ই থাকতুম, মাসে এই রাস্তা দিয়ে দু'বার যাতায়াত করতুম, মা বাবাকে দেখে আসতুম। তখন সেখানে থাকতে ভালোও লাগত; কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না। একদিন, দু'দিন—ব্যস্; তিন দিনের দিনই কেমন লজ্জা লজ্জা করতে থাকে, এ মুখ আর কাউকে দেখাতে ইচ্ছে করে না। আবার শ্বশুর বাড়ী চলে আসি। সেখানেও কিছুদিন পর মন ছট্‌পট্ করে। কি করি কোথায় যাই মন হয়। তার উপর শরীরও ভেঙে পড়েছে।'

বল্লুম, 'কি অসুখ তোমার?'

সে বল্লে, 'অসুখ কি আর দিদি একটা? ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুক ব্যথা করে। ব্যাধি-ব্যাধি, দিদি, চারদিকেই আমার ব্যাধি।'

গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। সত্যিই তো ব্যাধি, ব্যাধি যে ওর দেহে মনে

সব জায়গাই। এইটুকু প্রাণ, এইটুকু দেহ এরি মধ্যে ব্যাধিতে ছেয়ে গেছে। এমনি হয়তো আজ আমাদের প্রতি ঘরে ঘরেই, কে কার খবর রাখে, কেই বা তাদের এ'থেকে বাঁচিয়ে উদ্ধার করে।

থুতনি ধরে তার দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিলে—

ডাকলে,—'দিদি'—

বল্লুম—'কি বোন বল?'

সে বল্লে—'কর্ম্ম মহা জিনিষ জীবনে—না দিদি? এই তো আমিই বুঝি আমার জীবনে। এই শরীর নিয়ে কাজ করতে পারিনে। অবিশ্যি শাশুড়ী আমার দেবী, আমার হয়ে সব কাজই করে দেন। গিন্নিবান্নী মানুষ—তাঁর নিজেরই কত কাজ থাকে, তার উপরে আমার যা' করণীয় কাজগুলি তা'ও সব তিনিই করেন, পাছে অন্য কেউ কিছু বলে। পাঁচ জনের সংসার তো? পাঁচ-জনে পাঁচ কথাই বলবেই। তাই শাশুড়ী আমায় খুব রেখে ঢেকে চলেন। তবু যখন খেতে বসি, খাবার মুখে তুলি তখন ভিতর থেকে কেমন লজ্জা করতে থাকে; কাজ করলুম না কিছুই, ভাতের গ্রাস মুখে তুলি কি করে? তাই যাচ্ছি বাপের বাড়িতে, এবারে বেশ কিছুদিন থেকে শরীর সারিয়ে তবে ফিরব সেখানে। শাশুড়ীর অবশ্যি কষ্ট হবে, তিনি আমাকে বড় ভালোবাসেন। আপন গর্ভধারিণীর চেয়েও বেশী, তিনি সত্যিই দেবী।' বলে দু'হাতে এক করে কপালে ঠেকালে। তারপর কি কথা মনে পড়তে ফিক করে হেসে বল্লে তবে কিনা জানো দিদি—তা' দোষ করলে তো বলবেনই সেটা। বকুনিও একটু দেবেন বৈকি,—নইলে আমার দোষ শোধরাবে কি করে? আমার ভালোর জন্যই তো বলেন। আমি আবার থেকে থেকে দোষও করে ফেলি কিনা? কি ধরণের দোষ দিদি জানো? এই ধর না সেদিন পুকুরে নাইলুম পুকুরে নাইলেই আমার আবার জ্বর হয়। তা' এমন যন্ত্রণা হয় এক এক সময়ে, রোগে ভুগি, দিনের পর দিন চান করতে পাইনে, দেহের জ্বালা মনের জ্বালা—জ্বলে যায় সব। দেখ্-না-দেখ্ কেউ যখন কোথাও না থাকে চুপিচুপি পুকুরে গিয়ে পা ডুবিয়ে বসি। বেশ ঠাণ্ডা লাগে আর একটু নেমে যাই লোভ হয়—আর একটু নামি জলে, আর একটু-আর একটু, এই করে করে গলা জলে নেমে যাই। তারপর হয়কি—আর একটু নামলেই আবার ডুবে যাবো তো—তাই পা' দুটো আলগা করে দিই, ভেসে উঠি; ভেসে উঠতেই এদিকে আবার নতুন সাঁতার কাট্‌তে শিখেছি, লোভ সামলাতে পারিনে আস্তে আস্তে একটু হাত পা দু'টো নাড়ি, খানিকটা এগিয়ে যাই—তা'হলে সাঁতার কাটা হলো তো একটু? তা' না হয়, কাটলুম কিন্তু মুস্কিল হয় ঐখানেই, ঠিক সেইদিন রাত্রেই আমার জ্বর আসে। তাই শাশুড়ী আমাকে পুকুরে নামতে দেখলেই বকুনী দেন খুব।

'সেদিন হয়েছে কি আমার বড় ননদের ঘরের মেজ ভাগ্নেটি "অশথ নারাণ" করে, মাথার উপর পাঁচটি অশথ পাতা রেখে প্রত্যেকটির নামে পাঁচটি করে ডুব দেয়; গোটা মাসটা রোজই তাকে 'অশথ নারায়ণ" করতে হয়। সে এখন করেছে কি চার পাঁচ দিন 'অশথ নারায়ণ' ফেলে রেখে গিয়েছে সেদিন সে চার পাঁচ দিনের "অশথ নারাণ" করেছে; অনেকবার তো ডুব দিতে হয়েছে তাকে—ঘাটের কাছের জলটা ঘোলা হয়ে গেছে।

'সেদিন সবাই যখন এদিক ওদিক কাজে ব্যস্ত আমি ঘাটে গিয়ে পা ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি, আর ওমনি ইচ্ছে হ'ল আর একটু যাই, আর একটু যাই সামনের জলগুলি তো ঘোলা—সেখানে ডুব দিলে চুলে কাদা জলে আঁট ধরবে—একেই তো চুল নিয়ে আমার বিষম বোঝা মনে হয়— তাই জলে নেমে একটু সাঁতার আমাকে কাটতেই হচ্ছে এমন সময়ে কোথা থেকে শাশুড়ী দেখে ফেল্লেন আমাকে। তিনি খুব বকুনি দিতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি উঠে চুল মুছলুম, গা মুছলুম, আর এক মনে ভগবানকে ডাকছি যেন এই বারের মতো তিনি আমার মুখ রাখেন। কিন্তু এমনিই আমার কপাল ঠিক সেই রাত্রে হু হু করে আমার জ্বর এলো।'—বলে মেয়েটি হি হি করে হেসে উঠলো।

'শাশুড়ী শেষে আমার কাছে বসে আমাকে কত বোঝাতে লাগলেন, বল্লেন, 'দেখতো, তোমার ভালোর জন্যই তো আমি তোমাকে সাবধান করি। তোমার নিজের ভালো নিজে না বুঝলে কে বুঝবে? আমি আর কয়দিন? আমি চোখ বুঝলে যে তোমার কি হবে সেই ভাবনাই আমাকে অস্থির করে দেয়।''

'সত্যিই দিদি, আমিই হয়েছি তাঁর বন্ধন, আমার জন্য কত যে ভাবনা তাঁর। নিশ্চিন্ত মনে মরতেও পারবেন না বুঝি। অহরহ আমার ভাবনাতেই তিনি আকুল। আমি না মরলে তাঁর শান্তি নেই। তিনি বলেন, তোর মুখ চেয়েই সংসারে আছি, নয়ত কবে কোনকালে কোন তীর্থে গিয়ে পড়ে থাকতুম।''

'তিনি দেবী, আমার কাছে তিনি মহা দেবী। আমারই অদৃষ্ট দিদি; আমার কপালে আছে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা, তা খণ্ডাবে কে? নয়ত আমার স্বামী বিয়ে করবেন না, শেষে জোর করে বত্রিশ বছর বয়সে তাঁরা ছেলের বিয়ে দিলেন। স্বামী দেশে দালান তুললেন, নীচের ঘরগুলিতে সার্সি কপাট লাগালেন, দোতলায়ও দু'তিনখানা ঘর তুললেন, পুকুর কাটালেন, শেষ করতে পারলেন না—বিয়ের দু'বছর না পুরোতেই চলে গেলেন। সবগুলির দিকে তাকাই, অর্ধেক কাটা পুকুর তেমনিই পড়ে আছে। চারদিক যেন হাহা হাহা করছে। বুকের ভিতরটা কেমন করে দিদি। এই কলকাতা দিয়ে যখন যাওয়া আসা করি—ভিতরটা জ্বলে খাক হয়ে যায়; বাইরে দেখাতে পারি না। হাসিমুখে চলি, পাছে কেউ মনে ব্যথা পায়। বাবার কাছে হাসিমুখে থাকি, বাবা আরও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। মাকে বলি, মা দেখতো আমি হাস্‌ছি আর তুমি যদি অমনি করে কাঁদো তবে আমি থাকি কেমন করে? মা আরও বুক চাপড়ে চীৎকার করে কেঁদে ওঠেন, বলেন, "কী পাপ করেছিলাম আমি যে তোর এই মুখও আমাকে আজ দেখতে হচ্ছে।"ভাইরা কাঁদে, আমার কাছে কাছে থাকে, নানা গল্প করে ভুলিয়ে রাখে। শাশুড়ী কাঁদেন, আমার ছোট দেওরের নাম ধরে বলেন, "আমার সে গেল না কেন অমুকের বদলে। সে গেলে সে নিজের হাতে পায়ে যেত, এমনি করে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে যেত না; কালসাপ রেখে যেত না।" শাশুরীর দুঃখ আমার সহ্য হয় না দিদি। কাঁদতে পারি না, কারো সামনে কাঁদতে পারি না। কখন কাঁদি জানো? যখন তারা গঙ্গাস্নানে যায় তখন দোরে খিল দিয়ে কাঁদি, চানের ঘরে গিয়ে চান করতে করতে কাঁদি।

'কাঁদিনি দিদি—স্বামী মারা গেলেন তখনও কাঁদিনি। হাঁসপাতালে ছিলেন, পেটে

ক্যান্‌সার হয়েছিল, নয় দশবছরের নাকি রোগ— পেট থেকে গলা অবধি উঠেছিল। বাড়িতে যখন শেষ হয়ে যাবার খবর এলো, শাশুড়ী জা' সবাই চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি পরে যখন বুঝতে পারলুম— 'ফিট' হয়ে গেল আমার। দু'তিন দিন পরে ভালো করে জ্ঞান হ'ল; শাশুড়ীকে অমনি করে কাঁদতে দেখে চুপ করে গেলুম।

'মেয়ে একটা হ'ল আমার,—স্বামী যখন মারা যান পাঁচ মাসের পেটে ছিল। সেই মেয়ে তিন মাসের হয়ে' সেও মারা গেল। কোল থেকে মরা মেয়ে নামিয়ে দিলুম, তবু কাঁদিনি আমি, দেখলুম ভাসুর পাগলের মতো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন; নিজেকে চেপে রাখলুম। পাষাণী আমি দিদি, পাষাণ দিয়ে গড়া আমার প্রাণ'—বলতে বলতে হুহু করে সে কেঁদে উঠল। বুকে চেপে ধরলুম তাকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। কী তাকে সান্ত্বনা দেব, একি ভাষায় কুলোয়? যে মা নিজের মৃত সন্তান কোল থেকে নামিয়ে দেবার সময়ও প্রাণ খুলে একবার কাঁদতে পারেনি, তার দুঃখ কি সান্ত্বনায় নরম হয়। কাঁদুক, এই কাঁদতে কাঁদতেই হয়তো একটু হাল্কা হবে বুকের বোঝা, আর যে অন্য পথ নেই ওর।

খানিক কেঁদে নিজেকে সামলে নিলে—বল্লে, 'দিদি কিছুই তো করতে পারিনি খুকুর জন্য। এখন তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি "স্মৃতি" করছি;— দেখবে?'

আদর করে দু'হাতে তার মুখখানি নিয়ে দেখতে দেখতে বল্‌লুম— 'দেখাও তো বোন আমার।' সে উঠে ট্রাঙ্ক খুলে কাঠের গোল ফ্রেমে জড়ানো একটি কালো সাটিনের কাপড়ের টুক্‌রো বের করলে। তা'তে তার খুকুর নামে একটি কবিতা লিখে আগাগোড়া সোনালী রেশম দিয়ে সেলাই করেছে। বল্লে, 'আর একটু বাকী আছে, শেষ হয়ে গেলে পরে বাঁধিয়ে রাখব।' আস্তে আস্তে অতি যত্নে দু'হাতে সেখানি হাতে নিয়ে দেখে আবার তার হাতে তুলে দিলুম, বল্‌লুম, 'বড় সুন্দর হয়েছে।'

তার মুখ মাতৃত্বের গর্বে ভরে উঠল।

তারপর বের করলে ধুতি-জড়ানো কাঁচ দিয়ে বাঁধানো একটি কাঠের ফ্রেমে মৃত স্বামীর সিঁদূরে লেপা পদচিহ্ন।

বল্লে, 'দিদি, আর তো কিছুই নাই, এখন এই-ই আমার সম্বল'—ব'লে সেখানি কপালে ছুঁইয়ে আবার রেখে দিলো।

বিমুগ্ধ করলো মেয়েটি আমাকে আজ তার সরল বিশ্বাসে, সহজ আচরণে, প্রাণভরা আদরে। কি বলব ভাষা নেই আমার। তাকে কাছে টেনে নিলুম। আমার বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে বল্লে, 'দিদি—সংসারে আমি আর কিছুই চাইনে, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই আমার; শুধু এইটুকু চাই—সকলের মিষ্টি মুখ, সবাই যেন মনে করতে দেয় তারা আমার আপনার জন।'

তার মাথাটি আমার বুকে চেপে ধরলুম; ধীরে ধীরে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম, খানিকবাদে সে ঐ ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল। বোলপুরে ট্রেন থামল, অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে আমার কোল থেকে তার মাথাটি নামিয়ে বালিশের উপর রেখে নিঃশব্দে দরজা খুলে নেমে পড়লুম। দু'গাল বেয়ে তখন আমার দরদর ক'রে জল পড়ছে।

'পরিচয়'—১৩৪৯

কিউ

শ্রীশান্তি দেবী

কন্ট্রোলের সারিতে আজ তিন দিন কামিনী এসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তিন দিনই তার চোখের সামনে দোকানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আতঙ্কের মত। আজ তিন দিন! কামিনী র পেটে একটা দানা পড়েনি। শুধু কি তারই? জ্বরে ধুকে ধুকে হরিহর পাঁচদিন আগেও কাজে বেরিয়েছে, দু আনা চার আনা যা পেরেছে ঘরে এনেছে তাতে যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে, আর কলের জল খেয়ে তারা তাদের পেটের জ্বালা শান্ত করেছে খানিকটা! ভাগ্যি কলের জলের দাম লাগে না! নইলে—ভাবতেও কামিনীর গলাটা শুকিয়ে ওঠে।

সামনে দিয়ে সিভিক্ গার্ড রুলের গুঁতোয় লাইন ঠিক করে চলে—"এই ঠিক হয়ে দাঁড়াও এধারে।"

কামিনী আর্ত্তস্বরে বলে, "তিনদিন ফিরে গেছি বাবু, আজ চাল পাব তো?"

"সরে দাঁড়াও", গম্ভীর গলায় তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সিভিক গার্ড পরণ পরিচ্ছদে কামিনীর চেয়ে মার্জ্জিত, গয়না-পরা একটি মেয়েকে কামিনীর আগে দাঁড় করিয়ে দিল।

ফিক্ করে হেসে মেয়েটী বল্‌ল, "জানতুমই দাদাবাবু যেকালে আছে সেকালে যখনই যাই আমার চাল নেয় কে? তারপর একটু ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, "দু সের কিন্তুক আজ দিতে হবে দাদাবাবু, ইন্দুর আবার আজ সেই ব্যথাটা বেড়েছে, তার একসেরও আমার ঠেঁয়ে দিও বুঝলে?" আঁচল থেকে একটা পান বের করে বলে, "খাবে নাকি দাদাবাবু, ভাল জর্দ্দা আছে।"

আপ্যায়িত সিভিক্ গার্ড মেয়েটীর হাত থেকে পান নেয়। সামনে পেছনে সব মেয়েরাই অসহিষ্ণু, অত চাল, তবু তারা সবাই পায় না কেন? এক বুড়ী আর একজনের কানে কানে বলে, "বলি জানিস নাকি? চাল যে পেছ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়!" ওমনি একটা গুঞ্জন ওঠে, "ওমা আমরা সেই কখন থেকে হা পিত্যেশে বসে আছি আর তলে তলে এই কাণ্ড।" একটা দশ বারো বছরের মেয়ে চারদিকে চেয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে অমনি এক বিধবা তার গায়ে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়, "আচ্ছা মেয়েতো, আমি এসেছি সেই কখন আর তুই এখুনি এসে আগে দাঁড়াতে চাস? বলি ও হারামির বেটী—" কথায় কথায় বচসা বাড়ে গোলমালে লাইন থেকে ছিটকে কতক কতক এদিক ওদিক হয়ে যায়, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারীরা মেয়ে ব'লে রেয়াৎ করে না, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আবার লাইনে এনে সবাইকে দাঁড় করে। হুমকি দিয়ে ওঠে সিভিক গার্ড, "মেয়ে মানুষ হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কর, লজ্জা করে না?" ছোট ছেলে কোলে একটা মেয়ে এগিয়ে আসে, "পেটে জ্বালা ধরলে লজ্জা থাকে না বাবু, পুরুষ হয়ে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তোমাদের লজ্জা করে না তো কই?"

"চোপরাও বজ্জাত মাগী", হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কর্ত্তব্যপরায়ণ সিভিক্ গার্ড।

ঠেলাঠেলি আর গলা ধাক্কায় কামিনীর দেহটা যেন ভেঙ্গে পড়তে চায় তবু আজ কামিনী মরিয়া, চাল আজ তার চা...... ই। ছেলেটা শুকিয়ে আমসি হয়েছে হরিহর জ্বরে ধুকছে। তাদের দেশটাই না হয় সমুদ্রের কোপে পড়েছিল, সব দেশেই কি আগুন লেগেছে? চাল নেই, ডাল নেই, কেরাসিন নেই, কাপড় নেই, নেই বলতে পোড়াদেশে কি কিছুই নেই? সহরে এসেছিল তারা লোকের কথায়, এখানে নাকি এলেই চাকুরী! আর খুঁটে নিতে পার্‌লেই খাবার অভাব হয় না। এতো আর সমুদ্রের লোনা জলে ধোয়া পরিষ্কার গ্রাম নয়—কিন্তু কই? কোথায় খাবার? ময়লা ফেলবার টিনের বেড়াগুলির মধ্যে যে এঁটো পাতাগুলো পড়ে তার মধ্যে পর্য্যন্ত এক কণা ভাত লেগে থাকে না। কামিনী শুনেছে যে পশু ছাড়া মানুষও ওর থেকে খাবারের কণা সংগ্রহ ক'রে পেট ভরাত। কি যে কাল যুদ্ধ— সেদিন আর নেই!

কামিনীর মনে পড়লো সেইদিনের কথা, পুরো একদিন নয়, এক ঘণ্টাও নয়, কয়েক মুহূর্ত্ত! কয়েক মুহূর্ত্তে যে এমন অঘটন ঘটতে পারে তা কে জান্‌তো? কিন্তু কেউ না জানলে হবে কি? কথায় বলে প্রকৃতির মার! তাই সমুদ্রের জল যখন প্রচণ্ড বাতাসের বেগে ফুলে, ফেঁপে, পাগলা হাতীর পালের মত গর্জ্জন করতে করতে মানুষের সাত পুরুষের ভিটেমাটী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরী করা ফসলের ক্ষেত, ঘরের পোষা জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখী সব নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে গেল, তখন কাপড়ে বাঁধা পরস্পরের দেহ ছুঁয়ে কামিনী আর হরিহর বুঝলো তারা বেঁচে আছে, মাটীতে আছে, ভেসে যায়নি। এমন যে বাঁচা! তার পরেও তাদের না হোল শোক না হোল আনন্দ, কেবল দু'জনের মুখের ওপর দু'জনের দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল করে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলো। ব্যাপারটা যেন ভেল্কি!

এমন সময় খানিকটা দূরে কি যেন একটা নড়ে উঠলো; হরিহরের দিকে চেয়ে কামিনী বলেছিল, "ওমা, ওখানে ওটা কিগো? বড় মাছ টাছ উঠে এসেছে বুঝি?"

কাগড়ের গাঁট খুল্‌তে খুল্‌তে হরিহর বলছিল, "দুত্তোর মাছের নিকুচি করেছে, ভাগ্যি খড়ের গাদাটা ছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম, এমন সময় আবার মাছের সখ দেখ—"

কামিনীর চোখ কিন্তু সেই নড়ন্ত জীবটীর দিকেই নিবদ্ধ ছিল, গাঁট খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে গেল, "দেখ এসে কাদের ছেলে যেন—।" এগিয়ে গিয়েছিল হরিহরও, মাছ নয়, কুকুর নয়, বেড়াল নয় কামিনীর দুই বাহুর ওপর সেদিন খাবি খাচ্ছিল একটা অসহায় মানব শিশু। হরিহরের কিন্তু ইচ্ছে ছিল না যে কামিনী ছেলেটাকে রাখে—একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "রেখে দে কামিনী, যাদের ছেলে তারাই নিয়ে যাবে, আমরাই এখন কোথায় যাব তার ঠিক নেই।" সেদিন কামিনী হরিহরের কথা শোনেনি। অসহায় শিশুটীকে নিজের উষ্ণ নিটোল বুকে চেপে ধরে সন্তানহীনা কামিনী সদ্য সন্তান লাভের

একটা মধুর অনুভূতি অনুভব করেছিল। তারপর দিনেব পর দিন তারা মৃত মানুষ আর পশুব ভাসমান অসংখ্য মৃতদেহের ভীষণ একতাব মধ্যে দিয়ে, বিষাক্ত গন্ধের মধ্যে দিয়ে এসেছিল অপেক্ষাকৃত জনসঙ্কুল গ্রামে; কতকগুলো দিন তাদের কেটেছিল ভিক্ষা আর মিনতি করে. বিনিময়ে কোথাও সদয় ব্যবহার পেয়েছে কোথাও পেয়েছে নির্দ্দয় নির্ম্মম অবহেলা। তবু নৌকো নিয়ে যে বাবুরা গিয়েছিল তাদের দয়ায় তারা অনেক লোক তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে আজ ছয় মাস কামিনীর আর হরিহরের মধ্যে মূর্ত্তিমান বিবাদ ওই ছেলেটী। আহা অতটুকু নিঃসহায় শিশু, হয়ত ওর হতভাগা মা বাপ কোথায় কোন অতলে তলিয়ে গেছে, তাকে কামিনী ফেলে দেবে কোথায়? যদি তার নিজেরই হত! পারতো কি হরিহর এমন করে বলতে? তবুও এতদিন যা জুটেছে আগে হরিহরকে দিয়ে পরে যা হয় দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কামিনী—তাও ছেলেটাকে যেটুকু দেয় তাতেই হরিহর চটে যায়, বলে, "হুঁ আপনি শুতে ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডেকে আন মধ্যখানে শোওয়াই, দেব যেদিন টান মেরে রাস্তায় ফেলে—।" টুকরো টুকরো কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিল কামিনী, সিভিক গার্ডের ধমকানি শোনা যায়, "আরে! এ যে দেখছি কাণে শোনে না, এই—চাল নেবার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে নাকি?"

সচকিত হয়ে ওঠে কামিনী, আঁচল পেতে বলে, "হেই বাবা, দয়া কবে দুঃখীর দিকে তাকাও।" চুমকি হেসে সিভিক গার্ড আর চাল বিক্রেতা দৃষ্টি বিনিময় কবে।

তিন দিন পরে আজ কামিনী চাল পেয়েছে। হোক না তা লাল টক্‌টকে, হোক না অর্দ্ধেক ধান আর ছটাক-খানেক কম, তাতে কি! তবু চাল! তবু তাব সৌরভ কামিনীর নাক পর্য্যন্ত উঠে আসছে। মনে হয় যেন কতদিন কামিনী চাল দেখেনি—একদিন ছিল যেদিন তাদের গোবর মাটী দিয়ে নিকোনো ধব ধবে উঠোনে ধান শুকাতো। সিদ্ধ ধানের হাঁড়ি কামিনী নাবাতে পারতো না, হরিহরকে ডাক্‌তো, "ওগো, একটু ধরবে এসো না, হাঁড়িটা যে বড্ড ভারি—"

হরিহর হাসত, বলত, "ছেলে নেই, পুলে নেই, কার জন্যে যে তুই খেটে মরিস কামিনী! এত চাল করে হবে কি?"

কামিনীও হাসতো, মুখটা নীচু করে বলতো, "বারে! তুমি না বলেছিলে এবার ধান বেচবো না, চাল করে বেচলে লাভ হবে বেশী; তারপর সেই বাবা বদ্যিনাথের ওখানে গিযে ধন্না দেব, আরও যেন কি কি করবে?"

"ওহো।" হো হো করে হেসে উঠতো হরিহর, "এসব কথা তো তোর ভুল হয়না কামিনী, যত ভুল বুঝি শুধু আমার বেলাতেই, না?"

অপ্রতিভ কামিনী অকারণেই হয়ত ধান সেদ্ধর ন্যাতাখানা দিয়ে মুখ মুছতো বার বার।

চাল! চাল সেকি কম নাড়াচাড়া করেছে? কোথায় গেল সে সব ভোজবাজীর মত মিলিয়ে, এক ফোঁটা খাবার জল শুদ্ধু গ্রামে তাদের ছিল না।

চালের আঁচলটা সাবধানে ধরে কামিনী বস্তিটাতে ঢুকলো, এরি একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিয়েছে, পায়রার খোপের মত একখানা ক'রে ঘরে একটা করে সংসার--প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, সন্তর্পণে কামিনী ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের এককোণে ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, পাশে হরিহর এপাশ ওপাশ কচ্ছে। কামিনী ঘরে ঢুক্‌তেই সে খেঁকিয়ে উঠল্, ''বলি রোজ চাল আনবার নাম করে তুই যাস কোথায় বল দেখি? এদিকে জ্বর গায়ে পড়ে থাকি তার ওপর রেখে যাস ওই কাঁদুনে ছেলেটাকে; তবু দেখছি আজ এখন কাঁদছে না, হুঃ যেন নবাব পুত্তুর, কাঁদ্‌লেই অমনি খাবার মুখের কাছে এসে যাবে-- বলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চাল পেয়েছিস?''

''হ্যাঁ'', বেশী কথা বল্‌বার সামর্থ্য আর ইচ্ছে কামিনীর নেই। ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে দেখে কামিনী উনন্ জ্বালতে গেল। কতকগুলো ডাবের খোলা পানওয়ালার দোকানের সামনে থেকে কুড়িয়ে শুকিয়ে রেখেছিল, তাই দিয়েই কোন রকমে চাল তার সেদ্ধ হবে।

ভাত চড়িয়ে কামিনী হরিহরের কাছে গিয়ে বস্‌ল, একখানা হাত তার কপালে দিয়ে বল্‌লো, ''জ্বর তো তোমার নেই এখন, মাথা তো ঠাণ্ডা।''

''আরো জ্বর থাকতে বলিস তুই? ব'লে একদিন উপোষ কল্লে জ্বর পালাতে দিশে পায়না তা তিন তিনটে দিন শুধু জলের ওপর—'' তারপর কামিনীর দিকে চেয়ে একটু ক্রূর হাসি হেসে বলে, ''জ্বর থাকলেই বোধ হয় খুসী হতিস তুই নয়? দিব্যি গরাসে ভাত তুলে নিজে খেতিস আর তোর সোহাগী ছেলের মুখে দিতিস, কেমন?'' উত্তেজনায় হরিহর ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

''চুপ করে শুয়ে থাকোতো, ভাত হলে আগে তোমার পেট ঠাণ্ডা কর তারপর যা হয়.....'' বাকী কথাটা কামিনীর গলায় আটকে গেল, শুধু চোখের কোনটা একটু চিক্ চিক্ করে উঠ্‌ল।

মুখ নীচু করে উননের পাশে গিয়ে বস্‌ল কামিনী একটা কাঠি হাতে করে। মাটীর হাঁড়ি, আর বাঁশের কাঠি, এই তার রান্নার সরঞ্জাম। খান কয়েক শালপাতা ঘরের এক কোনে জড় করা রয়েছে, ও হ'তেই খাবার কাজ চলবে।

ভাত ফুটছে—ফুটন্ত ভাতের ঘ্রাণ ছোট্ট ঘরখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাতের যে এমন সুঘ্রাণ বেরোয় তা আগে হরিহরের জানা ছিল না, প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে দীর্ঘতর করে হরিহর সেই ঘ্রাণ টেনে নিতে লাগলো।

''হলো ভাত?'' তার ধৈর্য্য আর মানে না।

শান্ত স্বরে উত্তর দিল কামিনী, ''হলো বলে,'' ভাতের গন্ধে তারও তিন দিনের উপোষী নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

''হলো বলে'', ভেংচি কেটে হরিহর বল্‌ল, ''কত দেরী তাই বল্ না?''

হরিহরের কথার মাঝখানেই কামিনী ধপাস করে হাড়িটা নামিয়ে বল্‌লো, ''বসো।''

শালপাতায় ফেন শুদ্ধ ভাত আর খানিকটা নুন ছড়িয়ে দিয়ে কামিনী এবার ছেলেটার দিকে এগিয়ে চললো। সেই কখন ওই কচি ছেলেটাকে সে রেখে গেছে, একবার ছোঁবারও অবসর পায় নি।

হন্যে কুকুরের মত একলাফে ভাতের পাতাটার সামনে গিয়ে বস্‌ল হরিহর।

"একি!" ছেলেটার গা এমন ঠাণ্ডা কেন গো? ডুকরে উঠল কামিনী শক্ত আর ঠাণ্ডা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে।

তার দিকে একবার চেয়ে পরম তৃপ্তির আভায় হরিহরের মুখখানা ঝলসে উঠলো। তারপর গ্রাসের পর গ্রাস ভাত সে মুখে তুলে দিতে লাগলো যেন এবার আর কোন বাধা নেই সামনে, সে একাই এই ভাতগুলোর অধিকারী।

'পরিচয়' —১৩৫০

লেখিকা পরিচিতি

১। শ্রীমা (১৮৬৩ -১৯৪৩)—শ্রীমতী মানকুমারী বসুর ছদ্মনাম। ১৮৬৩ সনের ২৫ জানুয়ারী যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে জন্ম, ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতি ভাতুস্পুত্রী। পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। ১৮৭৩ সনে দশ বৎসর বয়সে বিদ্যানন্দ কণ্টিগ্রামের বিবুধশংকর বসুর সাথে ওঁর বিবাহ হয়। উনিশ বৎসর হতে না হতেই স্বামী প্রয়াত হন। ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি আরও দশটি গ্রন্থের রচয়িত্রী।

ছোটগল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার কুন্তলীন পুরস্কার পান। ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক পান ১৯৩৯ সনে। জগত্তারিনী পুরস্কার পান ১৯৪১ সালে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কাব্য শাখার সভানেত্রী হন ১৯৩৭ সালে। সমকালিন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গল্প লিখতেন। ১৯৪৩ সনের ২৬ ডিসেম্বর ৮১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

২। হেমলতা সরকার (১৮৬৮-১৯৪৩)—জন্ম-মজিলপর ২৪পরগণা পিতা আচার্য্য শিবনাথশাস্ত্রী। স্বামী ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক পাঠ্যপুস্তক রচয়িত্রী। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে নেপালে বাস করতেন। এসময়ে তাঁর রচিত 'নেপালে বঙ্গনারী' প্রকাশিত হয়। তিনি অপর দুইজন ব্রাহ্ম মহিলাব সাহায্যে দার্জিলিং মহারানী হাইস্কুল স্থাপন করেন। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'তিব্বতে তিনবছর', 'আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন কথা' প্রভৃতি।

৩। কুলবালা দেবী—

৪। সরলাবালা দাসী (সরকার) (১৮৭৫ - ১৯৫১)—নদীয়ার কাঁঠালপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহার জীবী কিশোরিলাল সরকার, স্বামী শরৎচন্দ্র সরকার। পিতামহী ছিলেন বাংলার প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থের লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর শিশির কুমাব, হেমন্তকুমাব ও মতিলাল ঘোষ তাঁর মাতুল। অল্প বয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় রত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা ভারতী পত্রিকায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সাহিত্য সাধনায় অধিক মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য, প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন, অন্তঃপুর, সুপ্রভাত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লেকচারার নিযুক্ত হন ১৯৫৩ সালে। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা এই সম্মান লাভ করেন। ১৯৬১ সালের ১ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। বচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর্য্যা, নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, পিঙ্কুর ডায়েরী ইত্যাদি। হারানো অতীত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

৫। সুমতি বালা দাসী—

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)— ১৮৫৫ সালের ৮ আগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। রবীন্দ্রনাথের দিদি। ১৮৬৭ সালের ১৭ই নভেম্বর ১৩ বৎসব বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বানীসাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করে গিয়েছেন। সুশৃঙ্খলিত গঠনশৈলি দিয়ে তিনি বিদগ্ধ মহলেও তার লেখনীর স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। সেকালের নাগরিক সমাজে বিদুষী নারী বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে। 'বালক' নামে কিশোর পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সার্থক উপন্যাস, গল্প, গাঁথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি পুরুষ-লেখকদের মতোই স্বচ্ছন্দচারিনী ছিলেন। দীপনির্বান, স্নেহলতা, কাহাকে রাজকন্যা, দিব্যকমল, গাঁথা, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচনা।

৭। সরোজিনী চৌধুরী

৮। শ্রীনী দেবী (নিরোদমোহিনী বস)—জন্ম ১২৭০ সাল। পিতা প্যারীচরণ মিত্র, স্বামী গিরিশচন্দ্র বসু (প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবাসী কলেজ)। বর্ধমান রাজস্কুলে বছর দুয়েক পড়াশুনা করবার পর মাত্র সাড়ে

বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহেব আগেই ওঁর বহু লেখা বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পারিজাত নামে একটি কাব্য গ্রন্থ ১৩৩৯ সনে তাঁব পুত্ররা প্রকাশ করেন।

৯। নৃত্যকালিদাসী—

১০। গিরিবালা সেনগুপ্তা—

১১। স্নেহলতা সেন—জন্ম ১৬ মার্চ ১৮৭৪। পিতা বিহারীলাল গুপ্ত। ১৮৮৯ সালের ২ মে বিবাহ হয়। স্নেহলতা সেন ইংরাজীতে সুলেখিকারূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁব গল্প সংগ্রহ Nehal the musician (১৯২৩) একসময় সমাদর লাভ করেছিল। ভারতীতে এই গল্প অনুবাদও করেন। ওঁর সঙ্গে শান্তি নিকেতনের প্রায় গোড়ার দিক থেকেই যোগাযোগ ছিল। তিনি এক সময় স্বয়ং শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দেন। ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানেব সঙ্গে সঙ্গে ইংবাজীতে অধ্যাপনাও করতেন। কবির সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর চিঠির আদান প্রদান ছিল।

১২। ফতেমা বেগম—

১৩। নিরুপমা দাসী—

১৪। সুশীলা সেন—

১৫। সরলাসুন্দরী মিত্র—

১৬। শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১-১৯২০)—ব্যারাকপুর ২৪ পরগণায় মাতুলালয়ে ১৮৬১ সালের ১৫ জুলাই জন্ম। পিতা শশীভূষণ বসু। শৈশবে তিন বৎসর বযসে পিতার কাছে লাহোবে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালযে শিক্ষালাভ করেন। ৬ বৎসর বয়সে লাহোর ইউরোপিয়ান স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭১ সালে মার্চ মাসে সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সঙ্গে বিবাহ হয়। শবৎকুমারী ভারতীর সম্পদকীয় চক্রের উৎসাহী সভ্যা ছিলেন। ভাবতী, ভারতী ও বালক, সাধনা, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন, মানসী, ধ্রুব, সবুজপত্র, বিশ্বভারতী, পত্রিকায স্বাক্ষরবিহীন বহু বচনা প্রকাশিত হয়। 'তাঁর শুভবিবাহ' (১৯০৬) গল্পগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎকুমাবী 'শুভবিবাহ রচয়িত্রী' এই ছদ্মনামেও গল্প লিখেছেন। ১৯১৫ সালে ফুলদানি ও অদৃষ্টলিপি উল্লেখযোগ্য রচনা। অন্যান্য গ্রন্থ—কনের কথা, যৌতুক, সোনার ঝিনুক ইত্যাদি। প্রথম রচনা—কলিকাতা, স্ত্রীসমাজ (ভাবতী)। এই লেখিকা তাঁর বিদেশ বাসের অভিজ্ঞতা সে যুগের সাহিত্যে এনেছিলেন বলে স্মরণীয়। ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭। অমলাদাস গুপ্ত—

১৮। অনুরূপা দেবী (অনুপমা দেবী) (১৮৮২—১৯৫৮)— জন্ম ১৮৮২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা শ্যামবাজারে (মাতুলালয়ে)। পিতা হুগলী, চুঁচুড়া নিবাসী মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, মাতা ধরাসুন্দরী দেবী। পিতামহ সমাজসংস্কারক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। জেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরাদেবী। স্বামী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুরূপাদেবীর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রানীদেবী' ছদ্মনামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগীতায় মুদ্রিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকায় 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস প্রকাশিত হ'লে ওঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মন্ত্রশক্তি উপন্যাস সাফল্যের সঙ্গে নাটকরূপে অভিনিত হয়। প্রায় ২৫টির মত উপন্যাস তিনি লিখেছেন। সর্বপ্রথম উপন্যাস মিবারেশ্বর (১৩০৩) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি মা, মহানিশা, পথের সাথী, বাগদত্তা ইত্যাদি, রাঙ্গাশাঁখা তাঁর ছোটগল্প সঙ্কলন।

তিনি তাঁর সাহিত্যখ্যাতির জন্য ধর্মচন্দ্রিকা, সরস্বতী, ভারতী ও রত্নপ্রভা উপাধিলাভ করেন। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী ও ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮ সালে কলকাতায় তার দেহাবসান ঘটে।

১৯। ইন্দিরা দেবী (সুরূপাদেবী) (১৮৭৯-১৯২২)---জন্ম ১৮৭৯ সনের জুনমাসে কলকাতার মাতুলালয়ে। অনুরূপা দেবীর অগ্রজা। স্বামী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কৈশোরেই সংস্কৃত কাব্যাদি অনুবাদ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি—

ফুলের তোড়া, স্পর্শমণি (১৩২২) নির্মাল্য, কেতকী, শেষদান ইত্যাদি। মৃত্যুর পর তাঁর লিখিত গীতিগাথা কাব্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

২০। সরোজ বাসিনী গুপ্ত—

২১। সত্যবানী গুপ্ত

২২। পুরবালা রায়—

২৩। সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫ ১৯২৬)—জন্ম ভাগলপুরে ৪ঠা নভেম্বর ১৮৭৫ সাল। পিতা মথুরানাথ গুপ্ত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর ভগিনী। ১৮৮৬ খ্রীঃ কলুটোলার যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়। সুলেখিকা ও কবি সরোজকুমারী স্বামীর কর্মস্থল ওড়িশায় সম্বলপুরে থাকাকালীন অনুন্নত শ্রেণীর বালক বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ থেকে ভারতী ও ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে সাহিত্য পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল হাসি ও অশ্রু, শতদল, অশোকা। এছাড়া গল্প গ্রন্থগুলি—কাহিনী, অদৃষ্ট লিপি, ফুলদানী প্রভৃতি। তাঁর অন্ধের দিব্যদৃষ্টি গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল।

২৪। হেমনলিনী দেবী—

২৫। শান্তাদেবী (১৮৯৩-১৯৮৪)—১৮৯৩ সনে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস বাঁকুড়া। স্বামী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ। অনুজা সীতাদেবী। ১৮৯৫-১৯০৮খ্রীঃ পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে, পিতৃবন্ধু নেপালচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ রামের কাছে শিক্ষা শুরু। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা পিতার গৃহে উদার স্বাধীন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। বেথুন (বীটন) স্কুল ও কলেজ থেকে প্রবেশিকা, এফ এ. ও বি. এ পাশ করেন ১৯১৪ সালে। মহিলাদের মধ্যে প্রথম হবার দরুন পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ছাত্রী অবস্থা থেকেই সাহিত্য রচনা করেছেন। বহুগল্প ইংরাজী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। ওনার ও বহুগল্প ইংরাজী সহ ভারতীয় নানা ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও যুক্ত ছিলেন—সম্পাদনা করেছেন বঙ্গলক্ষ্মী—এছাড়া যুগ্ম সম্পাদিকা ও সহসম্পাদিকা ছিলেন উৎসব ও প্রবাসী পত্রিকায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—অলখঝোরা, জীবনদোলা, দুহিতা ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ—সিঁথির সিঁদুর, বধূবরণ ইত্যাদি ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলাগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবণমোহিনী স্বর্ণপদক পান। ১৯৮৪, ৩০মে তাঁর মৃত্যু হয়।

২৬। সরসীবালা বসু (সরস্বতী) (১৮৮৮-১৯২৯)—পিতা যোগেন্দ্রনাথ রায়, স্বামী ফণীন্দ্রনাথ বসু। প্রথমে মিশনারী স্কুলে ও পরে আদি মহাকালী পাঠশালায় লেখাপড়া করেন (কলকাতা)। মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পহার' প্রকাশিত হয়। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্প রচনা ক'রে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। তাঁর 'প্রবাল' উপন্যাসখানি প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ, মানসী মর্ম্মবাণী, প্রবাসী পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিকা ছিলেন।

পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের স্বপক্ষে তিনি আজীবন যুদ্ধ করেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি বাৎসল্য ও অনুকরণ যোগ্য। তাঁর গল্পে মহিলাজনোচিত সুলভ ভাবালুতার কোন প্রশ্রয় নেই বরঞ্চ সমাজকে কষাঘাত করতে তিনি লঘু ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ রেখা, শুকতারা, মনোরমা ইত্যাদি। ১৯২৯ সালে ১৫ মে কলকাতায় মারা যান।

২৭। গিরিবালাদেবী (১৮৯১-১৯৮৩)—১৮৯১ খ্রীঃ পাবনা শহরের হরিপুর মাতুলালয়ে ওঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস পেঁচাকলি গ্রাম। পিতা পণ্ডিত দীননাথশাস্ত্রী। স্বামী পূর্ণচন্দ্র রায়। ছোট গল্প ও উপন্যাস উভয়েই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্য সেবিকা হিসাবে পরিচিতি লাভ করায় তিনি

সরস্বতী ও রত্নপ্রভা উপাধি লাভ করেন। সেকালের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর ছোট ছোট কবিতাগুলির একটি বিশিষ্টরূপ ছিল। তাঁর সাহিত্য কীর্তি পরবর্তীকালে তাকে নিরুপমা পুরস্কার ও লীলাপুরস্কারে ভূষিত করে। তার বহুল প্রচারিত উপন্যাস গুলির মধ্যে রূপহীনা, হিন্দুর মেয়ে, রায়বাড়ী উল্লেখযোগ্য। গল্পসংকলন হিসাবে তৃণগুচ্ছও সমাদৃত। সুলেখিকা বানী রায় ওঁর কন্যা। ১৯৮৩ সালের ২রা মার্চ কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

২৮। অমিয়া চৌধুরী—

২৯। শৈলবালা ঘোষ জায়া (১৮৯৪ - ১৯৫৪)—জন্ম ১৮৯৪ সালের ২ মার্চ চট্টগ্রাম কক্সবাজার। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী। মাতা হেমাঙ্গিনী। স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ।

বাল্যকালে বর্ধমান বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন ও পরবর্তীতে পিতা ও ভ্রাতার কাছে শিক্ষালাভ করেন। বিবাহোত্তর কালে পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল ছিল না। স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হয়ে যান ও ১৯২৯ সালে মৃত্যু হয়। প্রথম উপন্যাস শেখ আন্দু প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। এটি প্রকাশের পরে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবিকঙ্কন চণ্ডীর উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সরস্বতী উপাধিলাভ করেন। এছাড়াও সাহিত্যপ্রভা ও রত্নভারতী উপাধি প্রাপ্ত হন। তার প্রকাশিত ৩৮টি গ্রন্থ ছাড়াও বহু মাসিক পত্রিকায় বহু গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—নমিতা, শেখ আন্দু, জন্ম অপরাধী, জন্ম অভিশপ্তা, মচি, বিনিময়, গঙ্গাজল, স্মৃতিচিহ্ন ইত্যাদি।

৩০। সুরুচিবালা রায়—

৩১। উর্মিলা দেবী (১৮৮৩ - ১৯৫৬)—জন্ম ৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সালে ঢাকার তেলিবাগে। পিতা ভূবনচন্দ্রদাশ, মাতা নিস্তারিনী। ভ্রাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জণ দাস। স্বামী অনন্তনারায়ণ সেন।

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেত্রীছিলেন। নারী কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমসাময়িক বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় লিখতেন। দেশাত্মবোধের উপরই তার বেশীরভাগ গল্প। প্রকাশিত গ্রন্থ পুস্পহার, স্মৃতি কথা ইত্যাদি।

৩২। সীতা দেবী (১৮৯৫ - ১৯৫৪)—সংযুক্তাদেবী (শান্তাদেবী সহ) জন্ম ১৮৯৫ সালের ১০ এপ্রিল। ইনি শান্তা দেবীর অনুজা। ১৯১২ সালে বেথুন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯১৬ সালে ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম মহিলা স্নাতক হন। ১৯২৩ সালে কল্লোল ও প্রবাসী যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিয়ের পর বার্মায় যান ও ৭ বছর সেখানে থাকেন। ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় বহু ছোট গল্প তিনি লিখেছেন।

১৯৪৮ সালে লীলা পুরস্কার পান। ১৯৬০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে তিনি সভানেত্রী ছিলেন। শান্তাদেবীর সঙ্গে একযোগে বহু বই অনুবাদ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ছোটগল্প সংকলন বজ্রমণি, ছায়া বীথি, উপন্যাস রজনীগন্ধা, পরভৃতিকা, ক্ষণিকের অতিথি, মাটির বাসা, সবার উপরে ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য অনুবাদেও শান্তা দেবী, সীতা দেবীর অবদান প্রভূত। ১৯৭৪ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

৩৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫ - ১৯৫২)—জন্ম ২৪পরগণার গোবরডাঙ্গার খাঁটুরা গ্রামে, ১৯০৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন স্কুল বা কলেজে পড়াশুনা করেননি। ৯ বছর বয়সে বিবাহ হয়। যৌবনে নিজস্ব পড়াশুনার ভিত্তিতে টিচার্স সার্টিফিকেট অর্জন করেন। প্রথমে উত্তর কলকাতার সাবিত্রী শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

তিনি সরস্বতী উপাধিলাভ করেন। এছাড়াও লীলা পুরস্কার ও উল্টোরথ পুরস্কার ও অর্জন করেন। তিনশতাধিক গ্রন্থ রচয়িতা প্রভাবতী দেবীর অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস তৎকালীন প্রতিটি মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। কিশোরদের জন্যও তিনি গল্প ও রহস্য রোমাঞ্চ সহ নানাবিধ পুস্তক লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—বিজিতা, মাটির দেবতা, ব্রতচারিনী, নীড় ও বিহঙ্গ, অগ্নিশিখা, বধূবরণ, সন্ধ্যাদীপ ইত্যাদি।

৩৪। সুনীতি দেবী (১৮৯৩ - ১৯৫৩)—জন্ম ৫ আগস্ট ১৮৯৩। পিতা নৃতাত্ত্বিক ও শব্দতত্ত্ববিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার। স্বামী বিজলীবিহারী সরকার।

কল্লোল পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রথম মহিলা লেখিকা সুনীতি দেবী ১৯২১ খ্রীঃ দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ ও সতীপ্রসাদ সেনের সঙ্গে লেখক লেখিকাদের মিলন কেন্দ্র 'ফোর আর্টস ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখা বহু কবিতা ও গল্প তখনকার নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

৩৫। রেজিয়া খাতুন চৌধুরী—

৩৬। হেমমালা বসু—

৩৭। পুষ্পলতা দেবী ( )— জন্ম কলকাতার জোড়াবাগানে ঘোষবংশে। স্বামী মনীন্দ্রনাথ দেব। গ্রন্থ পুষ্পচয়ণ, বিনিময়, মরুতৃষ্ণা, নীলিমার অশ্রু।

৩৮। কিরণবালা দেবী সরস্বতী (১৮৮০ - ১৯৫৬)—মানসী ও মর্ম্মবানী পত্রিকার লেখিকা। এ ছাড়াও ভারতবর্ষ, গল্পলহরী সহ তৎকালীন বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা।

৩৯। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী— ১৮৯৩ সালের ২৩ জানুয়ারী রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস নাটাগড় ২৪ পরগণা। পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন জয়পুর স্টেটের মন্ত্রী। মাতা সরলা। স্বামী কিরণচন্দ্র সেন পাটনার এডভোকেট ও হুগলী গুপ্তিপাড়ার সেন পরিবারের সন্তান। ২৫ বছর বয়সে বিধবা হন। পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূবণমোহিনী স্বর্ণপদকে ভূষিতকরে (১৯৫৫-৫৬)। রবীন্দ্র পরস্কারও লাভ করেন (১৯৫২-৫৩)। গল্পে উপন্যাসে ভারতের বিভিন্ন সমাজে অবহেলিত নারীসমাজের মর্ম্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি গ্রন্থের লেখিকা। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ সোনারূপা নয়, রাজঘোটক ইত্যাদি, উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—ছায়াপথ, সরোজিনী (১৯৪২), সুধীর প্রেম (১৯৪০), বৈশাখের নিরুদ্দেশমেঘ প্রভৃতি। ১৯৫৮ সালে তিনি মারা যান।

৪০। আশালতা দেবী—মহিলা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, উদয়ন, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা। ২৫টির উপর উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অন্ধকারের অন্তরেতে (১৯২৫), দীপালি (১৯৩২), হে বন্ধু বিদায় (১৯৩৪), কালের কপোল তলে (১৯৩৮), নষ্ট তারা (১৯৩৯), সাথী (১৯৪০), ছন্দ পতন (১৯৪৫) প্রভৃতি।

৪১। নিখিলবালা সেনগুপ্ত —

৪২। হাসিরাশি দেবী (১৯১১-১৯৫৩)—রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত নাম চিত্রলেখা। জন্ম খাঁটুরা, ২৪ পরগণা। পিতা দিনাজপুরের আইনব্যবসায়ী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা সুশীলাবালা দেবী স্বামী খাঁটুরাগ্রামবাসী সুশীল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অগ্রজা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ৮/৯ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। বাল্যকাল থেকে চিত্রশিল্পে নিপুণা। অগ্রজা প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে যাতায়াতের ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে স্বগৃহে শিক্ষা-প্রাপ্তা। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে দরিদ্রদের সেবায় নিযুক্তা। বিখ্যাত মহিলা কথা সাহিত্যিক। ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা, গল্পভারতী, বীণা, জয়শ্রী, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও মহিলা সাহিত্য সংস্থা প্রদত্ত অর্চনা স্মৃতি স্বর্ণপদকে পুরস্কৃতা। প্রকাশিত গ্রন্থ নিষ্প্রদীপ, মানুষের ঘর, বন্দী বিধাতা, ভোরের ভৈরবী ইত্যাদি। ১৩ জুন ১৯৫৩ সালে খাটুরায় স্বগৃহে হৃদ্‌রোগে মারা যান।

৪৩। প্রতিভাকণা দাশগুপ্ত—

৪৪। আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৫৫)—জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারী কলকাতায়। পিতা চিত্রশিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাতা সরলাসুন্দরী দেবী। আদি নিবাস হুগলী বেগমপুর। স্বামী কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্ত। গৃহেই শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা গল্প উপন্যাস, রচনা

করেছেন। শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৩ জুলাই ১৯৫৫ সালে কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

লীলাপুরস্কার, জ্ঞাণপীঠপুরস্কার রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইএর সংখ্যা প্রায় দেড়শ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে সাগর শুকায়ে যায় অগ্নিপরীক্ষা, নির্জন পৃথিবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি, ছায়াসূর্য, সুবর্ণলতা ইত্যাদি।

৪৫। আশালতা সিংহ (১৯১১ ১৯৫৩)—১৯১১ সালের ১০ নভেম্বর ভাগলপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার, মাতা যোগমায়া। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। ১৩ বছর বয়সে বিবাহ হয়। সন্ন্যাস জীবনের নাম ড স্বামী চিন্ময়ানন্দ। আশালতা সিংহের সন্ন্যাশ্রমের নাম আশাপুরী।

১৬ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা অমিতার প্রেম ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নারী প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাসূচক পত্রের দ্বারা অভিনন্দিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা লীলা পুরস্কারে ভূষিত হন ও নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে সুবর্ণপদকের দ্বারা সম্মানিত। উপন্যাস ও গল্পগুলি সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে রচিত। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—অমিতার প্রেম, আবির্ভাব, মানসী, দুই নারী, ক্রন্দসী ইত্যাদি। ছোট গল্প সংকলন—অভিমান, মধুচন্দ্রিকা অন্তর্যামী প্রভৃতি। ১৯৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর দূর্গাপুরে মারা যান।

৪৬। কণাদগু—

৪৭। প্রতিভা বসু (১৯১৬ -)—১৯১৬ সালের ১৩ মার্চ ঢাকার হাসারায় জন্ম। পিতা আশুতোষ সোম। স্বামী সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বোস। শিক্ষা ঢাকা ও চুঁচুড়ার কনভেন্টে। সঙ্গীত, কবিতা ও গল্প রচনায় তাঁর ঝোঁক ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন, তার প্রতিফলনও ঘটেছে তার লেখনীতে। উপন্যাস ও গল্প সংকলন সহ মোট ৪০টি মত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তার অসংখ্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি—মনোলীলা, মনের ময়ূখ, প্রথম বসন্ত, সমুদ্রহৃদয়, পথে হল দেরী, অতলজলের আহ্বান, বিচিত্র হৃদয়, প্রেমের গল্প ইত্যাদি।

৪৮। রাণী রায় (১৯২০-১৯৫২)—মহিলা সাহিত্যিক ১৯২০ সালের ৫ নভেম্বর পাবনা হাটুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পূর্ণচন্দ্র রায়, মাতা সুলেখিকা গিরিবালা দেবী সরস্বতী। শিক্ষা প্রবেশিকা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, আই এ, আশুতোষকলেজ, বি এ (ঐ) এম এ (১৯৪০) কর্মক্ষেত্র বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগে কিছুকাল কাজ করেন। লীলাপুরস্কার (১৯৬০) নৃসিংহদাস পুরস্কার ১৯৫১ সালে অর্জন করেন। ৩০টি উপন্যাস লিখেছেন। সমসাময়িক মাসিক পত্রিকায় অসংখ্য ছোট গল্প রচনায় তার অবদান আছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—জুপিটার, প্রেম, কনে দেখা আলো, প্রেমের দেবতা, রঞ্জনরশ্মি, বর্ষাবিজয় ইত্যাদি। ১৯৫২ সালে ৬ অক্টোবর তিনি মারা যান।

৪৯। রাণীচন্দ (১৯১২ -)—মেদিনীপুর শহরে জন্মেছেন। পিতা কুলচন্দ্র দে, ভ্রাতা বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে, স্বামী অনিলচন্দ (রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব) শিক্ষা শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরনায় নন্দলালবসুর কাছে অঙ্কন বিদ্যার শিক্ষা। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ও ১৯৪২ এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ভুবনমোহিনীপুরস্কার ও রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। গ্রন্থ জোড়াসাকোর ধারে (অবনীন্দ্রনাথ সহ) ঘরোয়া (ঐ) পূর্ণকুম্ভ, জেনানাফটক (১৩৫৫) হিমাদ্রী, আলাপচারী, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব, পথেঘাটে (ভ্র ১৩৩৮) ইত্যাদি। রতমান নিবাস শান্তিনিকেতন।

৫০। শান্তি দেবী—জন্ম ১৯১৪ সালে দিনাজপুরের ধাঁকুগা গ্রামে। পিতা আশুতোষ ভাদুড়ী। মাতুল প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। স্বামী কবি অরুন মিত্র। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র অনুজা। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ সবুজচুড়ি।

গ্রন্থভুক্ত গল্পের প্রকাশকাল

সন	মাস	গল্প	পৃষ্ঠা	পত্রিকা
১৩০১	শ্রাবণ	কবির পরিণাম	১০৮	বামাবোধিনী
১৩০২	কার্ত্তিক	মুকুল ও চণ্ডজী	৭৪	মুকুল
১৩০৩	আশ্বিন	নিরুপমা		কুন্তলীন
১৩০৪	পৌষ	নিশি	৪৯৫	ভারতী
১৩০৫	ভাদ্র	হেমমালা	৪৭	কুন্তলীন
১৩০৬	শ্রাবণ	পেনেপ্রীতি	৩৪৮	ভারতী
১৩০৭	অগ্রহায়ণ	প্রভাময়ী	২১৪	অন্তঃপুর
১৩০৮	শ্রাবণ	বনভোজন	১১২	বামাবোধিনী
১৩০৯	কার্ত্তিক	বিপত্নীকের পত্নী	১৩৮	অন্তঃপুর
১৩১০	ফাল্গুন	নির্ব্বন্ধ	২৪১	অন্তঃপুর
১৩১১	আশ্বিন	সাচ্চাগিণি ঝুটাগিণি	১২৬	পরিচারিকা
১৩১২	আশ্বিন	নবউদাসীন	২৫০	নবনূর
১৩১৩	ভাদ্র	পলায়ন		কুন্তলীন
১৩১৪	ভাদ্র	আত্মোৎসর্গ	২৫	কুন্তলীন
১৩১৫	আষাঢ়	হারানিধি	৭১	বামা বোধিনী
১৩১৬	জৈষ্ঠ্য	দিদিমা	১৫	ভারতী
১৩১৭	পৌষ	অসমাপ্তকাব্য	৬৬০	মানসী
১৩১৮	শ্রাবণ	আংটি	২১৩	বামা বোধিনী
১৩১৯	শ্রাবণ	রহস্যের জাল	৪১৯	সুপ্রভাত
১৩২০	শ্রাবণ	জমির মালিক	২১৩	অর্চ্চনা
১৩২১	অগ্রহায়ণ	পিঞ্জরের বাহিরে	১৬৫	প্রবাসী
১৩২২	ফাল্গুন	প্রতীক্ষা	৫১৩	প্রবাসী
১৩২৩	ভাদ্র	খানতিনেক চিঠি	৫০২	ভারতী
১৩২৪	কার্ত্তিক	পেঁপেভূত	৩২৭	মানসী ও মর্ম্মবাণী
১৩২৫	অগ্রহায়ণ	সিঁথির সিঁদুর	১৬৪	প্রবাসী
১৩২৬	চৈত্র	উচ্ছৃঙ্খল	২১০	মানসী ও মর্ম্মবাণী
১৩২৭	আষাঢ়	বারুণী	৪৫৫	মানসী ও মর্ম্মবাণী
১৩২৮	শ্রাবণ	অনাদৃতা	৪৯৩	ভারতবর্ষ
১৩২৯	পৌষ	জামাই বাবু	৪৭	ভারতবর্ষ
১৩৩০	কার্ত্তিক	আত্মদান	৪৩১	কল্লোল
১৩৩১	আশ্বিন	কল্যাণী	৮২৭	মাঃ বসুমতী
১৩৩২	আষাঢ়	পূজার তত্ত্ব	৩৭৫	প্রবাসী
১৩৩৩	মাঘ	গাঁয়ের ডাক্তার	৬৬৬	বঙ্গবানী
১৩৩৪	ভাদ্র	রূপান্তর	৩৯১	বিচিত্রা
১৩৩৫	ভাদ্র	ঈদের চাঁদ	৬৭০	মাসিক মহম্মদী

সন	মাস	গল্প	পৃষ্ঠা	পত্রিকা
১৩৩৬	ভাদ্র	সাবধানী	৬৭৭	মানসী ও মৰ্ম্মবানী
১৩৩৭	কার্ত্তিক	নীড়ভ্রষ্ট	২৭২	মাঃ বসুমতী
১৩৩৮	ভাদ্র	উমাপতি	২৮৩	গল্পলহরী
১৩৩৯	অগ্রহায়ণ	দর ও দস্তুর	৮৮৭	ভারতবর্ষ
১৩৪০	বৈশাখ	অভিমান	১৫	উদযন
১৩৪১	ভাদ্র	পরিণীতা	৯	জয়শ্রী
১৩৪২	আষাঢ	মরুতৃষ্ণা	২৫৩	প্রবর্ত্তক
১৩৪৩	আশ্বিন (শারদীয়)	নীড়চ্যুতা	৯	দীপালি
১৩৪৪	আশ্বিন (শারদীয়)	রাজুর মা		আনন্দবাজার
১৩৪৫	আশ্বিন (শারদীয়)	মনস্তত্ত্ব		আনন্দবাজার
১৩৪৬	জৈষ্ঠ্য	নিতাইদাসের মেয়ে		বঙ্গশ্রী
১৩৪৭	ভাদ্র	পরিশেষ	১১১	পরিচয়
১৩৪৮	ভাদ্র	লুক্রেশিয়া		শনিবারের চিঠি
১৩৪৯	শ্রাবণ	পথের বোন	২১	পরিচয
১৩৫০	বৈশাখ	কিউ	৭১৬	পরিচয়

—